সচিত্র মাসিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১৩২৮ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ১৩২৮

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম, এ

প্রকাশক

সাহিত্য-প্রচার-সমিতি লিমিটেড

২৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ ।

মালঞ্চ—৫ম বর্ষ

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বিষয় সুচী

কার্ত্তিক ১৩২৮ হইতে ১৩২৮ চৈত্র

গল্প উপন্যাস

প্রবন্ধ

বিবিধ প্রসঙ্গ — ৫০১, ৬২৫, ৭৭৭, ৮৫৭

(১) আগুন নিভিল কি? (২) কি হইয়াছিল কি হইতে পারে (৩) সাহিত্যিক স্মৃতিপদক (৪) অক্ষয়পদক।

(৫) ইয়োরোপের বিপ্লব (৬) মূল্য বৃদ্ধি—স্বাভাবিক গতি ও উন্নতি (৭) আকস্মিক ও অস্বাভাবিক দুর্ম্মূল্যতা (৮) ভিক্ষা।

(৯) প্যাটেলের বিল—...আন্তর্জাতিক বা

কবিতা

চিত্র সূচী

৫ম বর্ষ } কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৩২৫। { ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আগুন নিভিল কি?

সমস্ত পৃথিবীতে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল। যে ভীষণ লোকক্ষয়কর সমরানল চারি বৎসর যাবৎ সমগ্র এই পৃথিবী ব্যাপিয়া সব ছারখার করিতেছিল,—এত দিনে সত্যই কি তাহা নির্ব্বাপিত হইল? রণরঙ্গিণী মহাঘোরা মহাকালী যেন সংহারলীলায় প্রমত্তা হইয়া প্রচণ্ড-তাণ্ডবে এই ধরাধাম বিধ্বস্ত করিতেছিলেন, সত্যই কি লীলাময়ী সে লীলা আজ সংবরণ করিলেন? জগৎবিধ্বংসী ভীম এই ঝঞ্ঝাবর্ত্তের পর সত্যই কি আবার শান্তির স্নিগ্ধ অরুণরাগরেখা বিচ্ছিন্নমেঘ গগনপটে দেখা দিল?

জগৎবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নিয়ত এই কামনাই করিতেছিল, বিধাতার চরণে কাতরে এই প্রার্থনাই করিতেছিল,—বিধাতার কৃপায় সে কামনা কি আজ পূর্ণ হইল? প্রার্থনা কি সফল হইল?

আগুন নিভিল। জর্ম্মাণী আগুন জ্বালাইয়াছিল, শেষে নিজে পুড়িল। যাহাদের এই ভীমপ্রজ্বানলে সঙ্গে টানিয়া নিয়াছিল, তারাও পুড়িল।—ফরাসীবৃটিশপ্রমুখ প্রতিপক্ষ শক্তিসমবায়ের জয় হইল। এই জয়লাভে বৃটিশপ্রজা ভারতবাসীর কৃতিত্বও কম হয় নাই।

বৃটিশ সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কগণ শতমুখে বার বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম বৎসর যখন দুর্দ্দম দ্রুত গতিতে বিপুল জর্ম্মাণবাহিনী ফ্রান্সে মার্ণনদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, রাজধানী পেরিস্ যায় যায় হইয়াছিল, ভারতীয় সেনা গিয়া সেই প্রবল স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল। হটিয়া জর্ম্মাণশক্তি ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে যে লাইনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনবৎসরের অধিককাল তার এদিকে বহু প্রয়াসেও জর্ম্মাণী বড় অগ্রসর হইতে পারে নাই,—মোটের উপর প্রায় সেই লাইনেরই এধারে ওধারে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে।

পশ্চিম এসিয়াতেও যে বিজয়ী বৃটিশবাহিনী মেসোপটেমিয়া দখল করিয়া ক্রমে সিরিয় প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে অগ্রসর হইতেছিল,—অনেক পরিমাণে যাহার ফলেই তুরস্ক এখন অবসর হইয়া পড়িল, সে বৃটিশবাহিনীও প্রধানতঃ বৃটিশ নেতৃত্বাধীন ভারতেরই বাহিনী। তাই এই বিজয় গৌরব আজ আমাদেরও বড় গৌরব। ভারতের বিপুল জনসঙ্ঘকে সমরশক্তিতে শক্তিমান্, সমরবিদ্যায় সুশিক্ষিত, সামরিক নীতিশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিতে পারিলে, ভারতের যে এই জনবল যে বৃটিশসাম্রাজ্যের কত বড় দুর্জ্জয় বল হইতে পারে, ইহাতে তাহারও বড় একটা পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু এখনও ভারতীয় জনবল বৃটিশ সমরশক্তির ও রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্রমাত্র, যন্ত্রিত্বে কেহ নয়। যন্ত্রত্বে যে কৃতিত্ব ভারতবাসী দেখাইয়াছে, যে সহায়তা বৃটিশশক্তিতে দান করিয়াছে, তাহার ফলে কি যন্ত্রিত্বের অধিকারে তাহার কোনও দাবী হয় নাই? এ দাবী কি জগতেও শান্তিস্থাপক পরিষদে অথবা ভবিষ্যৎ বৃটিশসাম্রাজ্যমণ্ডলে স্বীকৃত হইবে না?

কে জানে? আমাদের দাবী আছে, কিন্তু হাত কিছুতে নাই। যে ক্ষেত্রে হাত কিছু নাই, দাবী যতই থাক, দাবীর অনুমত কোন পথ নির্দ্দেশের প্রয়াস মিথ্যা। ইয়ো-

য়োপের এবং ইয়োরোপীয় প্রভাবাধীন দেশ ও জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিধাতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, সব তাঁহাদেরই হাতে। যুগযুগান্তের কর্ম্মফলে আমাদের যাহা প্রাপ্য, কর্ম্মফলদাতা বিশ্ববিধাতা তাঁহার মানদণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওজনে তাহাই আমাদের ভাগ্যে বিধান করিবেন। বেশী আমরা পাইতে পারি না,—কম কাহারও দিবার অধিকার নাই। এ জগতে যে যাহা পাইবার যোগ্য, সে তাহা পাইয়াছে, চিরদিনই পাইবে। যে কর্ম্মে যে ফল যাহার ভোগ্য, বিশ্বধর্ম্মধর বিশ্বরাজ তাহা হইতে কখনও তাহাকে বঞ্চিত করেন না। অপূর্ণ ভ্রান্ত মানব যদি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চায়, দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া সময়ে বিধাতার ন্যায়বিধান সে প্রয়াসকে ব্যর্থ করে।

যাহা হউক, বিধাতার সূক্ষ্ম ন্যায়বিধানে ভারতের কর্ম্মফলে ভারতের ভাগ্যে কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহা দেখিবার কি বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই।

যে বিভীষিকায় আমার দারুণ ভীত হইয়াছিলাম, সেই বিভীষিকা যে আপাততঃ দূর হইল, তাহাই এখন আমরা বড় ভাগ্য বলিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বেও বহু দূরদর্শী রাজনীতি এবং মনীষীগণ বলিতেছিলেন, ভীষণ এই সমরানল-প্রবাহ ভা... র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের ও ভারতের প্রধান রাজপুরুষগণও এইরূপ বিপদের আশঙ্কায় ভারতের জনবল ও ধনবল সংগ্রহ করিয়া ভারত রক্ষার আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব উঠিয়াছিল, আশঙ্কিত এই বিপ্লবের বেগ ভারত অল্পদিনের আয়োজনে সম্বরণ করিতে পারিবে কি না, এরূপ সন্দেহও অনেকে করিয়াছিলেন। ইয়োরোপের বড় অঞ্চল এই বিপ্লবে যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা কাণে শুনিয়াই আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। সেই মহামার বিপ্লব যদি নিজেদের মধ্যে আসিয়া পড়িত, যে কি হইত, তাহা কল্পনায় আঁকিতেও ভয় করে। এই যে বিভীষিকা আমাদিগকে এত ভয় দেখাইতেছিল, এত উদ্বেগ অশান্তিতে আমাদিগকে পীড়িত করিতেছিল, তাহা যে দূর হইল,—মহাঘোরাবর্ত্তময়ী নিশার অবসানে শান্তির উষালোকচ্ছটা যে আবার আমরা দেখিতে পাইলাম,—ইহাই এখন আমাদের বড় ভাগ্য, বড় আনন্দ। তার জন্য বিশ্বপতির চরণে ভক্তিনত হইয়া প্রণাম করিতেছি।

রহস্য

জর্ম্মণী ও জার্ম্মাণ-মিত্রশক্তিসমূহ সহসা যে ভাবে একে একে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহা মনে করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বেও জর্ম্মাণশক্তি দুর্জ্জয় বলিয়া অনুভূত হইত। পূর্ব্বদিকে মধ্য এসিয়ায়—প্রায় ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত সমিত্র জর্ম্মাণশক্তির প্রভাব প্রসারিত এবং গতি প্রায় অবাধ হইয়াছিল। পশ্চিমে প্রচণ্ডবিক্রমে জর্ম্মাণবাহিনী পেরিসের অদূরে মার্ণ নদীর তীর পর্য্যন্ত আবার অগ্রসর হইয়াছিল। সঙ্কট যে কত বড়, কত ভয়াবহ হইয়াছিল, বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণের উক্তি হইতেই তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে দলে দলে তখন মার্কিণযোদ্ধা ফ্রান্সে আসিতে লাগিল, ক্লান্ত বিপন্ন ফরাসীবৃটিশের সহায় হইয়া নব উদ্যমে তাহারা যুঝিতে আরম্ভ করিল।—জর্ম্মাণবাহিনী হঠিল,—হঠিয়া ক্রমে তাহারা পুরাতন হিণ্ডেনবার্গ লাইনে গিয়া ব্যূহ রচনা করিল,—এ ব্যূহও স্থানে স্থানে এক আধটু ভাঙ্গিল। এ পর্য্যন্ত জর্ম্মাণীই প্রায়তঃ তার শত্রুপক্ষকে দুর্দ্দমবেগে আক্রমণ করিয়াছে,—শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আয়োজন বড় কিছু তার করিতে হয় নাই। যুদ্ধের প্রথম হইতেই জর্ম্মাণী যেরূপ বিক্রম-সংঘটন শক্তি, চতুরতা ও কূটচক্রের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে কিছু হঠিয়াও জর্ম্মাণী যদি আক্রমণের উদ্যম ছাড়িয়া আত্মরক্ষায় তাহার শক্তি নিয়োগ করে, সহজে প্রতিপক্ষ মার্কিণ সহায়তা লাভ করিয়াও তাহাকে যে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিবেন, এরূপ অনেকেই ভরসা করেন নাই।

কিন্তু সহসা যেন যাদুমন্ত্রে সমিত্র জর্ম্মাণ শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথমে দুর্দ্ধর্ষ বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য বুলগেরিয়া যে কঠোর কোনও সংগ্রাম করিয়াছিল, এরূপ পরিচয়ও তখনকার কোনও সংবাদে পাওয়া যায় নাই। তবে বুলগেরিয়ার সঙ্গে জর্ম্মাণীর জাতিগত বা রাষ্ট্রগত ঘনিষ্ঠ কোনও সম্বন্ধ কখনও ছিল না,—এই যুদ্ধে মিত্ররূপে জর্ম্মাণীর পক্ষে সে যোগ দিয়াছিল।—কিন্তু এরূপ সব মিত্রতা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের হিসাবেই ঘটে,—অন্তর্জ্জাতিক কোনও প্রীতির সম্বন্ধ কমই দেখা যায়। শত্রুপক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া স্বার্থহানির ভয়ে অথবা অধিকতর স্বার্থলাভের আশায় পুরাতন মিত্রপক্ষকে ছাড়িয়া তাহার শত্রুপক্ষে যাওয়া বিচিত্র ব্যাপার কিছুই নয়। শত্রুর

প্রাবাল্য দেখিয়া বৃথা সংগ্রামে আপনার ধন জন ক্ষয় করা মূঢ়তা মনে করিয়াই হউক, অথবা অন্তর্ব্বিপ্লবে পীড়িত হইয়াই হউক, বুলগেরিয়া সহজেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বুলগার-রাজের সিংহাসন ত্যাগ, বুলগেরিয়ায় কৃষিবল-প্রধান শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংবাদে অন্তর্ব্বিপ্লবের আভাসই পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ঘটনা—আত্মসমর্পণের অনেক পরে হইয়াছে। ঠিক যে কিভাবে কখন কি ঘটিয়াছে এখনও তাহার কোনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

তারপর তুর্কীর কথা। তুর্কী রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা যে অতি সঙ্কটপূর্ণ হইয়াছিল, ইহার আভাস মধ্যে মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। জর্ম্মাণী তুর্কীর বক্ষে যেন পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছিল, ইহাতে তুর্কীদের মধ্যে অসন্তোষের ভাবও একটা প্রকাশ পাইতেছিল বলিয়া মনে হয়।—দক্ষিণ হইতে বৃটিশ সেনা অগ্রসর হইতেছিল,—ওদিকে বুলগেরিয়ার পতনে, জর্ম্মাণীর সঙ্গে যাতায়াতও অনেক পরিমাণে বন্ধ হইল। জর্ম্মাণী নিজেও তখন পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে বড় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায় তুর্কীকে যথোপযুক্ত সহায়তা দান জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। বিপন্ন তুর্কীকে কাজেই আত্মসমর্পণ করিতে হইল। তুর্কীর পতনের নিদান বোধহয় এইরূপই হইবে,—অন্ততঃ বাহিরের অবস্থা দেখিয়া ত এই রকম মনে হয়।

তারপর অষ্ট্রীয়ার কথা। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য কোনও দিনই দৃঢ়সম্বদ্ধ ছিল না। যে অসাধারণ সংঘটন-শক্তির বলে জার্ম্মাণী বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইয়াও প্রুসিয়ারাজ কাইসার নেতৃত্বাধীনে সুদৃঢ়সম্বদ্ধ এক ফেডারাল * সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, যেরূপ সংঘটনশক্তি অষ্ট্রীয়াতে কখনও দেখা যায় নাই। জর্ম্মাণীতে জর্ম্মাণ ব্যতীত শ্লাভ জাতীয় লোকও অনেক ছিল। কিন্তু জর্ম্মাণী তার সকল প্রথাকেই একেবারে জর্ম্মাণ করিয়া নিয়াছিল। জর্ম্মাণে শ্লাভে পার্থক্য কিছু লক্ষিত হইত না। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের প্রধান একভাগ হাঙ্গারী। রাজা এক হইলেও হাঙ্গারী পৃথক ভাবে শাসিত একেবারে একটি পৃথক রাজ্য। অধিবাসীরাও সম্পূর্ণ পৃথক জাতি,—ভাষাও পৃথক। ইহারা 'ম্যাজিয়ার' নামে পরিচিত, ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির ন্যায় আর্য্য-পর্য্যায় ভুক্তও নয়। খাস অষ্ট্রীয়ানরা জাতিতে জর্ম্মাণ, কিন্তু অষ্ট্রীয়া সংলগ্ন অন্যান্য বহুপ্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় শ্লাভ। এই তিন জাতি মিলিয়া এ পর্য্যন্ত এক হইতে পারে নাই,—আন্তরিক একটা জাতিগত বৈষম্যের ভাবই বরং ছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেশগুলিকে অনেকটা জোরেই একত্র বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়াসাম্রাজ্যে শাসনও প্রজাবর্গের উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী শাসন ছিল না।

এই যুদ্ধ প্রধানতঃ জর্ম্মাণীর যুদ্ধ, যেসব বড় স্বার্থ এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, তাও প্রধানতঃ জর্ম্মাণীর স্বার্থ। যে ভাবেই গোড়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হউক, অষ্ট্রীয়া এই যুদ্ধে জর্ম্মাণীর সহায়ক মিত্র ভাবে যুঝিয়াছে। অষ্ট্রীয়ার জর্ম্মাণ জাতীয় প্রজাগণ জর্ম্মাণভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া জর্ম্মাণ গৌরবে কিছু আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শ্লাভ ম্যাজিয়ার প্রভৃতি প্রজাগণের সেরূপ হইবার কোনও কারণ নাই। যুদ্ধে অশেষ ক্লেশ প্রজারা পাইয়াছে। জাতীয়ভাবে বিভোর, জাতীয় গৌরবের আশায় মুগ্ধ জর্ম্মাণ প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহা সহিতে পারে। কিন্তু শ্লাভ মেজিয়াররা কিসের মোহে, কিসের লোভে এত ক্লেশ সহিবে? তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ অবশ্য যারপর নাই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শাসনশক্তির প্রভাব যতদিন অক্ষুণ্ন ছিল, বাধ্য হইয়া তাহারা সহিয়াছে, অসন্তোষজাত বিদ্রোহভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখনই এই প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল, শক্তির ভিত্তি টলিয়া উঠিল,—অসন্তুষ্ট প্রজার বিদ্রোহে অষ্ট্রীয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অষ্ট্রীয়ায় যে এই বিপ্লবে, বিপ্লবের ফলে অষ্ট্রীয়ার পতন তাও অনেকটা বুঝা যায়।

কিন্তু জর্ম্মাণীর এই পতন অতি বিস্ময়কর,—রহস্যও বড় জটিল।—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী একাগ্র সাধনায় জর্ম্মাণী যে অমিত শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, সমগ্র জর্ম্মাণ জাতি যে একপ্রাণ একমন্ত্রে দীক্ষিত, দুর্দ্ধর্ষ এক সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল,—বিজ্ঞান বলে তাহারা যে জলে স্থলে ও আকাশে ক্রিয়াশীল বিপক্ষ-বিধ্বংসন-অদ্ভুত সব যন্ত্র

* বহুরাজ্যের সমবায়ে গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলি যার যার আভ্যন্তরিক শাসনে স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলের সমান রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এবং বাহিরের অন্যান্য সব দেশ ও জাতির সঙ্গে সকল সম্বন্ধে এক কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে মিলিত—এইরূপ শাসন প্রণালীকে 'ফেডারেশন' বা 'ফেডারাল' শাসন প্রণালী বলে। জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য এইরূপ এক ফেডারাল সাম্রাজ্য ছিল। সুইজারলণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেস এইরূপ 'ফেডারেল' রিপাব্লিক।

গড়িয়াছিল, দেশ দেশান্তরে অত্যাশ্চর্য্য কূট চক্রজাল বিস্তার করিয়াছিল,—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তি যে সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিক্রমে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই, সত্যের দিকে চাহিলে ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তবে সহায়ক মিত্রশক্তি সমূহের পতনে জর্ম্মাণীকে যারপরনাই সঙ্কটে পড়িতে হয়, এবং অতি বিচ্ছৃঙ্খল অরাজক অথচ বহুদূর বিস্তৃত এক রুষরাজ্যের মধ্য দিয়া ব্যতীত বহির্জগতের সঙ্গে তার যাতায়াতের পথও বন্ধ হইয়া পড়ে। বাহিরে আর কোনও দেশ হইতে খাদ্য বা যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ এ অবস্থায় জর্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার পর আবার প্রতিপক্ষ অষ্ট্রীয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি উত্তর সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলির মধ্যদিয়া ঘাটি স্থাপন করিয়া নিলে, জর্ম্মাণীর রক্ষাব্যূহকে বড় বেশী দূর টানিয়া নিতে হয়। ওদিকে অষ্ট্রীয়া, বুলগেরিয়া তুরস্ক প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত সমিত্র ফরাসী-বৃটিশ পক্ষের বহু সেনা মুক্ত হইয়া জর্ম্মাণীর উত্তর সীমান্তের দিকে প্রেরিত হইতে পারে। এ অবস্থা যারপরনাই সঙ্কটের অবস্থা। এই সঙ্কটে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ত একেবারেই সম্ভব নয়, প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষাও অতি দুরূহ ব্যাপার। হয় তাহা বৃথা প্রয়াস বলিয়াই জর্ম্মাণ হাল ছাড়িল,—অথবা সেরূপ কোনও চেষ্টার অবসরই হইল না। কারণ, ইতিমধ্যে জর্ম্মাণীতে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। স্বয়ং কাইসার এবং তাঁহার সহযোগী অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ প্রায় সকলেই সহসা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। জর্ম্মাণীতে এই ঘটনা যারপর নাই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? স্থায়ী সন্ধির প্রতীক্ষায় সমরবিরামে যে সব সর্ত্ত জর্ম্মাণীকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, জর্ম্মণের ন্যায় তেজস্বী ও পরাক্রান্ত জাতির পক্ষে যে তাহা অতি গ্লানিকর, সে কথা বলাই বাহুল্য। এইরূপ সব সর্ত্ত যে জর্ম্মাণীকে শিরপাতিয়া নিতে হইল ইহাও কম বিস্ময়ের কথা নহে। তবে হার মানিলে এইরূপই করিতে হয়। ইহার গ্লানি জর্ম্মাণী নিজেও এখন অনুভব করিতেছে, ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে এই কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদধ্বনি উঠিয়াছে। কিন্তু সমিত্র ফরাসী বৃটিশ পক্ষ যে জর্ম্মাণীর প্রতি অত্যাবশ্যক অতি কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এরূপ দোষও তাঁহাদের দেওয়া যায় না। যে ভাবেই হউক, অত বড় প্রবল শত্রুকে কায়দায় আনিতে পারিলে, এমন করিয়াই তাঁহাকে ছাঁদিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে হয়, তার হাতের সব অস্ত্র কাড়িয়া নিতে হয়, যে শেষ মীমাংসা একটা হওয়ার আগে আর সে বিপক্ষতা কিছু না করিতে পারে। ইহাই বিচক্ষণ রাজনীতি। এরূপ না করিলেই বরং অতি ব্যাকুবি ইহাদের হইত।

কিন্তু জর্ম্মাণীর সহসা এ দুর্গতি কেন হইল? বাহিরের সঙ্কট অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এই অন্তর্বিপ্লবে জর্ম্মাণীর সামরিক শক্তি এমন অভিভূত হইয়া না পড়িলে, এত শীঘ্র যে সে এতদূর হীনতা স্বীকার করিয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব এমন করিয়া প্রতিপক্ষের হাতে সঁপিয়া দিত, এরূপ মনে করা কঠিন। জর্ম্মাণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ, প্রজামণ্ডলীর মতিগতি এতদিন যেরূপ ছিল—অথবা বাহির হইতে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহাতে রাজকীয় শাসন বিরোধী এরূপ একটা বিপ্লব স্বপ্নবৎ অগোচর ঘটনার মতই মনে হয়। বস্তুতঃ কোন কোনও ফরাসী সংবাদপত্র এরূপ সন্দেহও প্রকাশ করিতেছেন, যে জর্ম্মাণীতে এই রাষ্ট্রবিপ্লব বড় একটা ভাণ হয়ত হইবে।

রুষিয়ায় রাজশাসন পদ্ধতি প্রজাকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, বহু প্রকারে প্রজা তাহাতে পীড়িত হইয়াছে,—সেখানে ভীষণ এই যুদ্ধের বড় একটা সঙ্কটকালে রাজবিরোধী প্রবল প্রজাবিপ্লব ঘটিতে পারে। অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে সেখানেও এরূপ বিপ্লব এ সঙ্কটে খুবই সম্ভব। এই দুই দেশের বিপ্লবে এমন বিস্ময়ের কারণ কিছু নাই। কিন্তু জর্ম্মাণীর কথা আলাদা। আধুনিক গণতন্ত্রনীতির মানে ধরিলে জর্ম্মাণীতে কাইসারের প্রভুত্ব বড় বেশী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রভুত্ব জর্ম্মাণ প্রজার বিরুদ্ধে কখনও প্রযুক্ত হয় নাই। কাইসার ও তাঁহার অমাত্যবর্গের লক্ষ্য ছিল, জর্ম্মাণশক্তিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত করিয়া সর্ব্বত্র জর্ম্মাণ প্রভাব ও জর্ম্মাণ গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই শক্তি কাইসারের নেতৃত্বাধীন জর্ম্মাণ প্রজার শক্তি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। নূতন এক জাতীয় মহিমাবোধে উদ্বুদ্ধ, জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত ও জাতীয় স্বার্থে একপ্রাণ হইয়া, সমগ্র জর্ম্মাণ প্রজামণ্ডলী শিক্ষায়, শিল্প বিজ্ঞানবাণিজ্যে, সম্পদে ও সামরিক বিক্রমে সকল দিকে দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে, সকলকে অভিভূত করিয়া সর্ব্বত্র আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

করিতে পারে, এবং সেই প্রতিষ্ঠাতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়,—এই লক্ষ্য ধরিয়া এই ভাবেই জর্ম্মাণ জাতিকে তাঁহারা গঠন করিয়া তুলিতে ছিলেন। কাইসারের স্বার্থ জর্ম্মাণীর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া মিলিয়াছিল। জর্ম্মাণ প্রজাও তাহা অনুভব করিয়া কাইসারের এত বেশী অনুগত হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাজার প্রভুত্ব যত বেশীই হউক, রাজার সেই প্রভুত্বশক্তি যদি প্রজার পীড়নের না হইয়া প্রজাকে উন্নত ও শক্তিমান্ করিয়া আপনাকে বড় করিয়া তুলিতে চায়, প্রজা সে রাজার বিরোধী কখনও হয় না। কারণ সকল স্বার্থে সকল উন্নতিতে প্রজাও রাজার সঙ্গে একটা সমতা দেখিতে পায়, সমান গৌরব অনুভব করে। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, জর্ম্মাণীতে কাইসারের সঙ্গে জর্ম্মাণ প্রজাবর্গের সমস্বার্থে এইরূপই একটা ঘনিষ্ঠ সমপ্রাণতার সম্বন্ধ ছিল। সেই জর্ম্মাণীতে সহসা প্রজারা এমনই বিপ্লব উপস্থিত করিল, সৈন্যগণ এমনই অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, যে কাইসার সিংহাসন ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, আর জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট একেবারে এমন হীনভাবে হার মানিয়া প্রতিপক্ষের হস্তে যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিলেন! সঁপিয়া দিয়া নিরুপায় হইয়া এখন হায় হায় করিতেছেন, প্রতিপক্ষের কৃপাভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "ওগো, অত কঠিন হইও না, একটু দয়া কর!, আমরা যে একেবারেই গেলাম। এখন যে অনাহারে মরি!"

দেখিয়া শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাই না। বিলাতে এক টেলিগ্রামে দেখিলাম, বড় একটি জর্ম্মাণ রণতরীবহর ইংলণ্ডের উপকূলে যেদিন যখন আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছিল, বৃটিশ নৌ-নায়কগণ জর্ম্মাণীর এই হীনতায় মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছিলেন, মনের দুঃখে কেবিনে গিয়া মুখ ঢাকিয়াছিলেন। এই মহাযুদ্ধ নাটকের বিপরীত রসাশ্রিত আকস্মিক এই অদ্ভুত পরিসমাপ্তি, ইহা কি দুই মাস পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন?

কি হইয়াছিল? কি হইতে পারে?

জর্ম্মাণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা যে ঠিক কিরূপ হইয়াছিল, এখনই বা ঠিক কি হইতেছে, তাহা স্থির বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন ব্যাপার। অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী যত সংবাদ আসিতেছে, তাহার মধ্যে মোট মোট যে কথাগুলি কতক বুঝা যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

কাইসারের পদত্যাগের গুজব অক্টোবর মাসের প্রথমার্দ্ধেই উঠিয়াছিল। কখনও হাঁ হাঁ, কখনও না না, এইরূপ নিত্য নূতন কথা তখন শুনা যাইত। এরূপ কথাও তখন শুনা যাইত, জর্ম্মাণীর জঙ্গীলস্করেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, শ্রমজীবীরাও অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। ইহারা আর যুদ্ধ করিতে চায় না, সন্ধি চায়।

আরও শুনা গেল, রুষবিপ্লব মন্ত্র বোলশেভিক বাদ জর্ম্মাণ সৈনিক ও শ্রমজীবিদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—জর্ম্মাণ সোয়ালিষ্ট দলও বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজবিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আবার সংবাদ আসিল, কাইসারের সিংহাসন ত্যাগের কথা সম্ভবতঃ একটা ভুয়া গুজব মাত্র,—কেহ যেন শ্রদ্ধায় এ গুজব গ্রহণ না করে। জর্ম্মাণীর প্রজাসভা রিচষ্ট্যাগে সকল দল—সোয়ালিষ্টগণ পর্য্যন্ত এক মত হইয়া ঘোষণা করিল, কাইসারের শাসনে তাহাদের অটল শ্রদ্ধা আছে, এই শাসনই তাহারা মানে। কতদিন এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আসিল না। জর্ম্মাণী আত্মসমর্পণ করে করে, অথচ করিতেছে না। মার্কিনের রাষ্ট্রপতি উইলসনের নোটের যে উত্তর জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির হইল, তাহাতে, এরূপ বুঝা গেল না যে জর্ম্মাণী সহজে আত্মসমর্পণ করিবে। বেশ একটু তেজের কথাও তার মধ্যে ছিল। (এইখানে একটু মজার কথাও বলিয়া লই—জর্ম্মাণীর এই উত্তর যে দিন বাহির হইয়াছিল, কলিকাতার কাপড়ের বাজার কিছুদিন হইতে নামিয়া সেইদিন আবার চড়িয়াছিল।) ওদিকে অষ্ট্রিয়ার বিপ্লব বাড়িতে লাগিল। তুর্কী আত্মসমর্পণ করিল। অষ্ট্রিয়াও সত্বর আত্মসমর্পণ করিল। তার পরেই সংবাদ আসিল, জর্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ ফ্রান্সে যাইতেছেন, সন্ধির প্রতীক্ষায় সমর বিরতির সর্ত্ত আলোচনার জন্য। কিন্তু আলোচনা কিছুই হইল না। রাষ্ট্রপতি উইলসন নির্দ্দেশ করিলেন, সেনাপতি ফোস্ সমরবিরতির সে সর্ত্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন, অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট এক সময়ের মধ্যে জর্ম্মাণ প্রতিনিধিগণকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই সর্ত্ত ঘোষণা করা হইল। তখন কিছুদিন ধরিয়া কাইসারের পদত্যাগের কথা আবার খুব প্রচারিত হইতেছিল। কাইসারও সত্যই রাজপদ ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। সর্ত্তপত্রে জর্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলেন। যুদ্ধ সেইদিনই থামিল। জর্ম্মাণীতে

এক আস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। জর্ম্মান চ্যান্সেলর প্রিন্স ম্যাক্স রিজেণ্ট বা রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কাউন্সিলে সোসিয়ালিষ্ট বা সামাজিক সব্বসামাঞ্জবাদী দলের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা স্থান গ্রহণ করিলেন। আর চ্যান্সেলর বা প্রধান সচিব হইলেন, বার্লিনের একজন সাধারণ নাগরিক; —দর্জ্জি সম্প্রদায়ের প্রধান।

চরম কোনও গণতান্ত্রিক দল বা সোয়ালিষ্ট প্রবল হইয়া যে জর্ম্মাণীর সকল শাসনশক্তি দখল করিয়াছে, জোর করিয়া কাইসারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, এরূপ কোনও কথা শুনা যায় নাই। সংবাদ এই যে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় নাকি বলিয়াছিলেন, "ইহাতেই যেন জর্ম্মাণীর মঙ্গল হয়"। রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে কাইসার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন,—কোনও রূপ বাধা দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেহ করিল না। তাঁহার মহিষী ও রাজপরিবারের কর্ত্তা ও পুত্রগণ সকলে বার্লিনে আছেন, একদল সৈন্য সাবধানে ও সম্মানে তাঁহাদের রক্ষা করিতেছে। কেবল কাইসার কেন? অন্যান্য যে সব রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও সচ্ছন্দে যাঁহার যেখানে খুসী চলিয়া গিয়াছেন। প্রজারা যখন বিপ্লব উপস্থিত করে, রাজাকে এমন সহজে ছাড়িয়া দেয়না, ধরিয়া আটকাইয়া রাখে, পাছে তিনি কোনও অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র করেন

কেহ কেহ বলেন, সেনাপতি ফোসের ঘোষিত সর্ত্তগুলির কথা বার্লিন রাজপ্রাসাদে পৌঁছিবামাত্র কাইসার পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গ এখনও সেনাপতিপদে আছেন। ফ্রান্স বেলজিয়াম হইতে সেনা লইয়া জর্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। সেনাপতি ম্যাকেনসেনও অষ্ট্রিয়া বুলগেরিয়া অঞ্চল হইতে তাঁহার সেনাসহ সম্প্রতি জর্ম্মাণীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সব সেনার মধ্যে কোনও রূপ বিদ্রোহের কথা এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। ইহাঁরা দুইজন কাইসারেরই অতিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।

জর্ম্মাণীতে রুষিয়ার মত কোনও বিশৃঙ্খল অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। পরিবর্ত্তন যাহা হইতেছে, রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও ধীরসংযতভাবে তাহা হইতেছে। কাটাকাটি মারামারি লুঠপাঠ—সর্ব্বত্র দলে দলে প্রবলের অবিচার অত্যাচার —এরূপ সব ঘটনা কোথাও কিছু হইতেছে বলিয়া শুনা যায় না, যেমন নাকি রুষিয়ায় ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে।

সোয়ালিষ্ট দল অনেকস্থানে প্রবল হইলেও সর্ব্বপ্রাধান্য কোথাও লাভ করিয়া প্রচলিত বিধিব্যবস্থা, সমাজসংস্থান সব একেবারে উলটপালট করিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঘোরবিপ্লববাদী রুষিয়ার চরম সোসিয়ালিষ্ট বোল্‌শেভিক্‌-বাদ জর্ম্মাণীতে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তেমন কোনও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। জর্ম্মাণ সোয়ালিষ্টরা অনেক পরিমাণে সংযত ও ধীর। ইহারাও বোল্‌শেভিক্‌ মতকে প্রশ্রয় দিতেছেন না, চাপিয়া রাখিতেই চাহিতেছেন।

জর্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট যে কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও অভিমত কোনও পক্ষ ব্যক্ত করিতেছেন না। কোথাও কোথাও সাধারণ লোকের মধ্যে রিপাব্লিকের ধূয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু শাসনের দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের—এমন কি সোসিয়ালিষ্ট এরূপ নায়কবর্গেরও যে কি অভিপ্রায়, তাহা স্পষ্ট কিছু বুঝা যাইতেছে না। সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গও নাকি নূতন শাসনপদ্ধতির নূতন মতে আসিয়াছেন। কিন্তু এই নূতন মত ঠিক কি, কাইসারী সিংহাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অন্তরে এই মতের সমর্থিত কি না, তাহা কেহই বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।

এই সব কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা হইতে বাস্তবিক কিসে কি ঘটিয়াছে, কতকটা তার অনুমান করা যায়।

জর্ম্মাণী যখন যুদ্ধে নামিয়াছিল, এই আশায় সে প্রলুব্ধ হইয়াছিল, যে যেরূপ আয়োজন সে করিয়াছে, তাহাতে অতি সহজেই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া সে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না। প্রতিপক্ষও চারিবৎসরকাল কঠোর সংগ্রামে তাকে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। যুদ্ধে যখন নামা হইয়াছে, জয়লাভ করিতেই হইবে, কাইসার এবং তাঁহার অমাত্য ও সেনানীবর্গের দৃঢ় এই পণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যেন সর্ব্বস্বপণ করিয়া জার্ম্মানী এদিকে ওদিকে তার শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছে। নির্ম্মম হইয়া সেনা বলি দিয়াছে, আয়োজনে অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাশিত জয়লাভ ঘটে নাই। অতিদীর্ঘকাল এই যুদ্ধ চালাইতে হইবে যখনই বুঝিতে পারিয়াছেন, দেশে খাদ্যাদিবিতরণ সম্বন্ধে অতি

কঠোর নীতি জর্ম্মাণশাসকগণ অবলম্বন করিয়াছেন। এত লোকক্ষয়, ধনক্ষয়—অশনে বসনে এত ক্লেশ ক্রমে প্রজার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

বিদেশী শত্রু দেশ জয় করিবে, ধনমানশক্তি ও স্বাধীনতা সব কাড়িয়া নিবে, এরূপ আশঙ্কায় অশেষ অসহনীয় ক্লেশকে মাথায় ধরিয়াও দেশভক্ত দেশরক্ষায় জাতির মানরক্ষায় যুঝিতে পারে। কিন্তু পরের দেশ জয় করিব, পরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইব, এ আকাঙ্ক্ষায় এত দীর্ঘ কাল এত ক্লেশ কোনও জাতি সহিতে বড় প্রস্তুত হয় না। বাধা যত কঠিন হইয়া উঠে, ক্লেশ যত বাড়িতে থাকে, ততই তাদের উৎসাহ উদ্যম নরম হইয়া পড়ে। তারা ভাবে, মিছা কেন এ উৎপাতের বোঝা বই, এত শোক দুঃখ সই, নিজের ঘরে নিজের মানে যদি নিজে সুখে শান্তিতেও থাকিতে পারি, তাই কেন থাকি না? যুদ্ধে জয়লাভ জর্ম্মাণীর পক্ষে যতই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, যুদ্ধের বিপক্ষে প্রজাসাধারণের চিত্তে উত্তেজনা ততই বাড়িয়াছে। প্রত্যেক জর্ম্মাণ প্রজা-পরিবার এই যুদ্ধে যত শোকের ব্যথা পাইয়াছে, অভাবের ক্লেশ সহিয়াছে, কাইসার কি তাঁহার পারিষদবর্গ কাহারও পরিবারকে সেরূপ কোনও শোক বা অভাবের দুঃখ পাইতে হয় নাই। সাধারণ প্রজাদের অপেক্ষা যুদ্ধজয়ে স্বার্থ মান ও গৌরবের আশাও তাঁহাদের অনেক বড়। ইহারা অবিজয়ে যুদ্ধ ছাড়িতে ইচ্ছুক হইবেন কেন? সুতরাং সপারিষদ কাইসারের সঙ্গে তাঁহার সাধারণ প্রজাদের যুদ্ধ চালান সম্বন্ধে মতবিরোধ অবশ্যই ঘটিয়াছিল। কাইসার প্রজাবর্গের যত প্রিয় ও যত ভক্তিভাজনই হউন, তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াও যুদ্ধ ছাড়িয়া শান্তিস্থাপনে তাঁহাকে বাধ্য করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রজা সাধারণের মনে হইতে পারে। প্রজারা যে শান্তির জন্য অতি ব্যগ্র হইয়াছিল, ইহার আর একটি প্রমাণ এই যে কাইসার দুই বৎসর পূর্ব্বেও একবার প্রজাদের ভরসা দিয়াছিলেন, আগামী শীতের আগে জর্ম্মাণীর বিজয়ে যুদ্ধের অবসান হইবে। আরও এক শীত দুঃসহ এই যুদ্ধের ক্লেশ পাইতে হইবে, এই ভয়ে জর্ম্মান প্রজা তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরেও কতবার কত রকম আশা ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তিনি প্রজাদের যুদ্ধ উৎসাহী রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মার্কিণ সেনার আগমনে শেষে জর্ম্মাণ সেনাকে যখন অতদূর অগ্রসর হইয়া দ্রুত আবার হটিতে হইল, ওদিকে বুলগেরিয়া তুর্কী অষ্ট্রিয়াও হাল ছাড়িল, জয়ের আশা একেবারেই লুপ্ত হইল;—তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ প্রজার মধ্যে ভীষণ একটা উত্তেজনাই স্বাভাবিক। এই উত্তেজনায় বাতাস দিবারও লোক ছিল। জর্ম্মাণ সোয়ালিষ্টগণ অনেকে প্রথম হইতেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন। রাজা ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণী সমূহের সুখ সুবিধার জন্য দরিদ্র প্রজাসাধারণের প্রাণ ও যৎসামান্য সুখ সুবিধা সব এই ভাবে বলি দেওয়া যে কত অন্যায়, এই ন্যায় বিরোধী শাসননীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাসাধারণের অভ্যুত্থান যে আবশ্যক—ইত্যাদি সব মত সোয়ালিষ্টগণ যুদ্ধক্লিষ্ট অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছিল। সর্ব্বশেষে রুষিয়ার বোলশেভিবাদ—সামাজিক সর্ব্বসাম্যকৃবাদ ও সকল শাসনবন্ধনমুক্তিবাদের চরম মত সমূহও জর্ম্মাণসৈনিক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল।

এই সব আত্মীয় প্রজাসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অতিপ্রবল একটা উত্তেজনা, শান্তির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা—যাঁহারা যুদ্ধ ছাড়িতে প্রস্তুত নন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বড় একটা বিদ্রোহের ভাব—জনসাধারণের মধ্যে কেন না হইবে?

এই উত্তেজনা এই বিদ্রোহভাব কোনও উপায়ে দমন করিয়া এই সঙ্কটকালে আরও কঠোর যুদ্ধ চালান একেবারেই অসম্ভব। প্রথমে হয়ত চেষ্টা হইয়াছিল কিছু সুবিধার সর্ত্ত পাওয়া যায় কি না।—তাই রাষ্ট্রপতি উইলসনের নোটের ঐরূপ উত্তর কাইসারের গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন বুঝিয়াছিলেন, জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বাহিরে ও ভিতরে অতি সঙ্কটেই পড়িয়াছে, এ সুযোগ তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? ওদিকে উত্তেজিত বিদ্রোহোন্মুখ জর্ম্মাণ সৈনিক ও সাধারণ প্রজারাও দাবী করিতে লাগিল, যে পণেই হউক সন্ধি করিতেই হইবে। কিন্তু যে কোনও পণ ত কাইসারপ্রমুখ গর্ব্বিত জর্ম্মান রাজন্যবর্গ, অভিজাত জর্ম্মাণনায়কগণ সহজে গ্রহণ করিতে পারেন না। উত্তেজনায় আত্মহারা নিরুপায় প্রজা তখন এখানে ওখানে—যেখানে পারিল, বিদ্রোহের পতাকা [illegible]। কাইসারের আর উপায়ান্তর রহিল না। কিন্তু এই সব হীন সর্ত্ত স্বীকার করিয়া নেওয়া—বিশ্বব্যাপী বিজয়প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বহুদিনের বহুযত্নে গড়া এই সব বহুমূল্য—বুকের রক্তের মত সময় সম্ভার শত্রুর হাতে সঁপিয়া দেওয়া—জর্ম্মাণীর সিংহাসনে বসিয়া মহাতেজস্বী কাইসারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। তাই মর্য্যাদারক্ষা যখন একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখনই বোধ হয় রাজপদ ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলেও, কাইসারের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার সংস্কার জর্ম্মাণপ্রজার চিত্ত হইতে এমন ভাবে দূর হয় নাই যে তাঁহার প্রতি কোথাও কেহ অসম্মান দেখাইবে, বা অত্যাচার করিবে।

ভবিষ্যতে কি হইবে, কাইসার কি করিবেন, জর্ম্মাণপ্রজারাই বা তাঁহার সম্বন্ধে কি করিবে, তাহা হয়ত এই সঙ্কটে, [illegible] নিরুপায় অবস্থায় কেহই ভাবেন নাই—ভাবিতে পারেনও নাই।

প্রজা অসাধ্য বিজয় ও গৌরবের মিথ্যা আশায় আর যুদ্ধের ক্লেশ সহিতে পারে না, কাইসার ও মানের দায়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া এরূপ সঙ্কটেও অতি হীন কোনও সন্ধিতে সম্মত

হইতে পারেন না। উত্তেজক অন্যান্য কারণও বহু ঘটিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, জর্ম্মাণীতে বোধ হয় তাহাই হইয়াছে। জর্ম্মাণ নায়কগণ, যতদূর বুঝা যায়, এখন পরিতপ্ত। কিন্তু আর উপায় নাই। নূতন করিয়া কোনও শাসনশক্তি গড়িয়া নূতন আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া; সকল মিত্র-বিযুক্ত অবস্থায় এমন প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিছুই আর জর্ম্মাণী করিতে পারে না। সম্প্রতি রণবিশারদ সেনাপতি হিণ্ডেনবর্গও বলিয়াছেন, জর্ম্মাণীর বর্ত্তমান অবস্থা অতি সঙ্কট পূর্ণ, একা ফরাসীর বিরুদ্ধেও জর্ম্মাণী আর এখন যুদ্ধ করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতেছেন, কাইসারকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া জর্ম্মাণী গণতান্ত্রিক বা সোয়ালিষ্ট গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্রতন্ত্রের ঠাট খাড়া করিয়াছে মাত্র। কারণ এই ছলে পরম, গণতন্ত্রবাদী মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসনকে ভুলাইয়া তারা সুবিধামত সন্ধির সর্ত্ত করিয়া নিতে চায়। চতুর জর্ম্মাণ যুদ্ধে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন কূটচক্রে সন্ধিতে সুবিধা করিয়া নিবার চেষ্টা করিবে।

শেষ কথাটি সত্য হইতে পারে, কিন্তু আগের কথাটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। জর্ম্মাণীতে প্রজাবিদ্রোহ, গণতান্ত্রিক বা সোয়ালিষ্ট মতের প্রাধান্য, কাইসারের পদত্যাগ ঘটনাচক্রে আপনি ঘটিয়াছে। নানাদিক হইতে নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া নিরুপায় জর্ম্মাণী সন্ধির জন্য এই হীনতা স্বীকার করিয়াছে। তার জন্য পরিতপ্তও যথেষ্ট হইতেছে। এখন সন্ধির পরিষদে চাতুরীর খেলা খেলিয়া যত দূর সম্ভব নিজের স্বার্থরক্ষায় বাঞ্ছিতের চেষ্টা করিতে পারে।

তবে জর্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে কাইসার বা অন্যান্য রাজন্যবর্গের কোন স্থান আবার হইবে কি না,—সে কথা কেহই এখন স্থির বলিতে পারেন না।

দুর্জ্জয় শক্তি জর্ম্মাণী সংগ্রহ করিয়াছিল। এই শক্তির বলে সকলকে অভিভূত করিয়া সকলের উপরে আপন প্রভুত্ব জর্ম্মাণী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। তার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুরই বিচার করে নাই। অভীষ্টসাধনে যখন যাহা প্রয়োজন নির্ম্মমভাবে তাহাই করিয়াছে। কিন্তু জর্ম্মাণীর চক্র যতবড়ই হউক, বিধাতার চক্র তার অনেক বড়। কেহ দেখে নাই, কেহ ভাবে নাই, এমন দুর্লক্ষ্য অচিন্তনীয় পথে বিধাতার সেই চক্র আসিয়া জার্ম্মাণীর চক্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রসংস্থানে প্রবল ও কূটচক্রী মানব আপন স্বার্থসিদ্ধির আশায় বিশ্বরাজের বিশ্বনীতিকে যতই অবজ্ঞা করুক, যতই লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাক, বিশ্বরাজ তাকে চূর্ণ করিয়া আপন ধর্ম্মের গৌরব একদিন রক্ষা করিবেনই। কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ পথে সেই রক্ষার উপায় কবে আসিবে, মুগ্ধ মানবের সাধ্য কি তাহা দেখিতে পায়?

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অশেষ অবিচার ও অত্যাচার, অসহায় দুর্ব্বলকে তার হীনতায় চিরকাল চাপিয়া রাখিবার জন্য কত ছল, কত কূটকৌশল, কত দাম্ভিক বলপ্রয়োগ—আবার তাহারই সফলতা ও জয়জয়কার—সব দেখিয়া সত্যই অনেক সময় মনে হইয়াছে, এজগতের উপরে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বুঝি কেহ নাই, জগৎ কেবল দানবীয় শক্তিরই লীলা ভূমি। কিন্তু আজ বিধাতা যেন তাঁহার ন্যায়দণ্ডধারী মঙ্গল হস্ত বাহির করিয়া দেখাইলেন,—দুর্ব্বলের সহায়, পীড়িতের ত্রাণকর্ত্তা, প্রবল পীড়কের শাস্তিবিধাতা ধর্ম্মরাজ তিনি জাগ্রত আছেন। সময়ে তাঁহার ধর্ম্মের শাসনই জয়যুক্ত হইবে।

সাহিত্যিকে স্মৃতি পদক

নিম্ন দুইটি বিজ্ঞাপন আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য সেবিগণের জ্ঞাপনার্থে নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

মাইকেল লাইব্রেরী, খিদিরপুর:—উক্ত লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত আগামী "মধুসূদনে" "বঙ্গ সাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান" এই সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখককে একটি স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধ ফুলস্কেপের ২৫ পৃষ্ঠার অনধিক ও আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত পাঠাগারে সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

অক্ষয় পদক

বাঙ্গালার গৌরব, সাহিত্যরথী স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি আই, ই মহোদয়ের কাব্যসমূহ-সম্বন্ধে যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে ঢাকার জেনারেল্ পোষ্ট মাষ্টার রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গাঙ্গুলী বাহাদুর একটী রজতপদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কি পুরুষ কি মহিলা সকলেরই এই প্রবন্ধরচনায় অধিকার রহিয়াছে। প্রবন্ধের আয়তন ফুলস্কেপ কাগজের পঁচিশ পৃষ্ঠার বেশী না হয়। আগামী মাঘমাসের শেষ তারিখের মধ্যে উহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক সন্দর্ভসমূহ পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা কোনও বঙ্গসাহিত্যিক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবে। তৎপর নির্ব্বাচিত প্রবন্ধটি ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের আগামী বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত হইবে এবং প্রবন্ধকারকেও সেই সময়ই উল্লিখিত পদক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড লিখুন। ইতি, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৫ সন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
শক্তি আশ্রম, ঢাকা।

শিলালিপি

(১)

কলেজ হইতে মস্ত একটা উপাধি লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছি। নেহাৎ ছোট চাকুরি করিবার ইচ্ছা নাই, বড় চাকুরিই বা কোথায় মিলে। বাবা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, 'যায়গা জমী আছে; চাষ আবাদ দেখ, বাগান কর, পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার হো'ক।" পরামর্শ মন্দ নয়, আজ কাল অনেক বড় বড় লোকের পর্য্যন্ত পাড়াগাঁয়ের দিকে মন গিয়াছে। কাজটা একান্ত হেয় বলিয়া লোকের কাছে গণ্য হইবে না। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কাজকর্ম্মের কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমার উপাধিলাভ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা আবশ্যক।

(২)

সিটি কলেজে পড়িতাম। তৃতীয়বারের পর আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকমাস থার্ডইয়ারে পড়িয়া দেখিলাম, আমার শক্তি অপেক্ষা পুস্তকের গুরুত্ব অনেক বেশী; বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন সদর দরজা পার হওয়া আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সুতরাং বি এ, এম এ, উপাধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। এ সমস্ত উপাধির আজকাল কোন আদরও নাই। যে নেহাৎ মূর্খ সেও কদর্য্যভাসায় মাসিকপত্রে দুই কলম লিখিয়া পাঠায় যাহারা বি এ, এম এ, উপাধি পাইয়াছে তাহারা নিতান্ত 'অমানুষ'; না পারে দু'পয়সা আয় করিতে, না জানে গুরুজনের সঙ্গে ব্যবহার; যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি লয় নাই তাহারাই প্রকৃত মানুষ। তাহাদের মধ্যে আমিও একজন 'মানুষ' হইলাম।

আমার উপাধিটা অন্যরকমের। যেদিন ঠিক বুঝিলাম, আমাদ্বারা বি এ পাশ করা কিছুতেই হইবে না, সেই দিন হইতে দেশের সাহিত্যে মনোযোগ দিলাম। দেখিলাম আমা অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেক নিকৃষ্ট—এমন কি হেঁবো, কেল্লো পর্য্যন্ত বড় বড় নামজাদা কাগজের এক এক জন মস্ত লেখক। কাজটা নিতান্তই সহজ। কালি, কলম আর একটুকরা কাগজ লইয়া বসিলেই হয়। নোট মুখস্ত করিয়া মরিতে হয় না, ডিক্সিকের পাতা উল্টাইতে হয় না, ইতিহাস পড়া অনাবশ্যক। প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম—কবিতা লেখায় পরিশ্রম অনেক কম, চৌদ্দ কিম্বা ষোল লাইন লিখিলেই সুন্দর একটী ছোট কবিতা হয়, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া মরিতে হয় না। কিন্তু লিখিতে গিয়া দেখি—মস্ত বিপদ; কেবল নিথর, বিথর, পাথার প্রভৃতি কতগুলি শব্দ আসিয়া জড় হয়, মিল কিছুতেই বাধে না, যদিও বা মিল হয়, তাহাতে অর্থের খোঁজ পাওয়া যায় না। মিল না হইলে বরং কিছু কিছু ভাব-প্রকাশ করা যায়; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়রা বা পাঠকমহাশয়রা ত আবার মিল না হইলে কিছুতেই ছাড়িবেন না। সুতরাং ভারি মুস্কিলে পড়িয়া শেষে কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিলাম। ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে আবার আর এক রকমের বিপদ উপস্থিত হইল। "ফুট-ফুটে জোছনা। সুর সুর করে বাতাস বইতে সুরু করলে। কলিকাতা সহর। ছোট্ট একটী গলির মোড়ে চাঁদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সুমুক দিকে একটা মোটর চলে গেল।" ইত্যাদি পৃষ্ঠা পনর লিখিয়া দেখি তাহাতে কোন ভাব প্রকাশ পায় নাই, চরিত্রও ফুটিয়া উঠে নাই, এমন কি বিশেষ কোন ঘটনারও সন্নিবেশ হয় নাই। বিশেষতঃ গল্পের শেষটা কি রকম করিলে ভাল হয়, কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। Byron বলিয়াছেন কাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় এবং শেষেই মস্ত বিপদ। আমি মনে করি কবিতার গোড়া, মধ্য, শেষ সকল যায়গাতেই সমান বিপদ, কোথাও কম নহে। গল্পের গোড়া হইতে অনেকদূর একরকম বেশ চলে, শেষে গিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া কবিতা এবং গল্প লেখা দুইই ছাড়িয়া দিলাম। দিনকতক পরে আবার লেখার ঝোঁক মাথায় ঢুকিল। স্থির করিলাম—এবার আর ছোট খাট বিষয়ে হাত দিব না। ছোট বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করাই শক্ত, কোন্‌খানে একটু অমিল হইল, কোথায় একটু ত্রুটি রহিয়া গেল, ছোট কবিতা এবং গল্পের মধ্যেই সেটা বেশী করিয়া লোকের নজরে আসিয়া পড়ে। তাই অনেক ভাবিয়া শেষে

স্থির করিলাম, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ লইয়া গদ্যে একখানা মস্ত নাটক লিখিব। গদ্যে বীররসের ভাবটা কেমন প্রকাশ পায় দেখিব। বিশেষতঃ আজকাল বীরগণের আদরও অনেকটা বাড়িয়াছে—পুস্তকের কাটতি বেশী হইবে। দিনরাত্রিভোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমে এক অঙ্ক লিখিয়া খাড়া করিলাম। মনে হইল—বেশ হইয়াছে, কবিতা এবং গল্পের মত চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই; বন্ধুসমাজকে একেবারে বিস্মিত, অভিভূত, স্তম্ভিত করিয়া দিব। একে একে সকলকে ডাকিয়া একটা মস্ত সভা করিলাম। সভার মধ্যে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটু কাঁপিয়া নিজের লেখা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইতে লাগিল ইতিমধ্যেই কেহ কেহ চাপা হাসি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পড়া শেষ হইয়া গেল। সকলে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কেহই প্রশংসা করিল না; এক এক জনে এ দোষ সে দোষ করিয়া আমার রচনার অসংখ্য দোষ দেখাইতে লাগিল। কোথায় আমার পূর্ব্বের অহঙ্কার আর কোথায় বর্ত্তমান অবস্থা! আমি মুখখানা এতটুকু করিয়া বসিয়া রহিলাম। সকলে যখন চলিয়া যায় তখন শুনিলাম একজন অস্ফুটস্বরে আর একজনের নিকট বলিতেছে, আমি মস্ত একটা fool, আমার লেখা কিছুই হয় নাই। এত আশা ভরসার পর উপাধি লাভ হইল fool!

এই ঘটনার পর কলেজের বন্ধুদিগের সহিত আমি আর সাহিত্য-আলোচনা করি নাই।

থার্ড ইয়ার হইতেই কলেজের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ী আসিয়া চাষ আবাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। অন্যান্যবার যে ফসল হইত এবার তার চেয়ে অনেক বেশী হইল। শীতকালে তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিয়া কিছু টাকাও পাওয়া গেল। তখন পুষ্করিণীটা কাটাইবার মতলব হইল; একদল লোক নিযুক্ত করিয়া দিলাম।

একদিন গোঁফে এসেন্স মাখিয়া, মাথায় রুমাল জড়াইয়া তীরে দাঁড়াইয়া মাটীকাটা দেখিতেছি, এমনসময়ে দেখি—পুকুরের মাঝখান হইতে কি একটা কালকাল শক্ত জিনিষ মজুররা মাটীর সঙ্গে উপরে ফেলিয়া দিল। কাছে গিয়া মাটি সরাইয়া দেখি—চমৎকার পালিশ গোলাকার একখণ্ড শিলালিপি। মূর্খ লোকগুলির কোদালের ঘায়ে ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে। শিলালিপিখণ্ডের গোল কিনারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা এবং নীচে সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের হাতে-লেখা অক্ষরের মত ছোট ছোট দুইটী অক্ষরে লেখা 'ভজ'; আর তাহার একদিকে অস্পষ্ট কতগুলি কিসের চিহ্ন। পুরাকালের কোন রাজা তাঁহার প্রজাদিগকে কৃষ্ণ, শিব, বা কালী প্রভৃতি কোন দেবতাকে সতত ভজনা করিবার উপদেশ দিবার জন্য বড় একখানা পাথরে কোন কবিতা খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পাথরেরই একখণ্ড এই হইতে পারে ভাবিয়া আমার কল্পনা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল।

মূর্খ লোকগুলা এই অমূল্য জিনিশখানি ভাঙ্গিয়া আবার দুইখণ্ড করিয়াছে চিন্তা করিয়া তাহাদের উপর আমার ভারি রাগ হইল। মনে করিলাম—এখনই কাজ হইতে তাদের বরখাস্ত করিয়া দেই। কিন্তু লোকগুলি মূর্খ বলিয়াই আবার মনে দয়া হইল,—আহা, বেচারীরা ভালমন্দ কিছুই চেনে না! পৃথিবীর একআনি সুখভোগ করিবার যোগ্যতাও উহাদের নাই। পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের সুখ উহারা কি জানিবে? এইপ্রকার আলোচনা করিয়া এমন জিনিশটা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে বলিয়াও উহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।

শিলা দুইখণ্ড লইয়া ভাল করিয়া জলে ধুইতেছি আর অক্ষর দুইটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে আমার কল্পনা সেই রাজা, রাজ বাড়ীর অট্টালিকা, তাঁহার পুত্রকন্যা, রাজ্য, রাজরাণী লইয়া এক বিকট সৃষ্টি পাকাইয়া উঠাইতে লাগিল। আমি যেখানে বসিয়া শিলাখণ্ড ধুইতেছি, সেই খানেই হয়ত একদিন এক মস্ত রাজা মুকুট পরিয়া সোনা-রূপায় ঝলমল সিংহাসনের উপর বসিয়া হীরামুক্তা খচিত পোষাক পরিধান করিয়া পাত্রমিত্রদিগের সহিত রাজকার্য্য করিতেন, হাজার হাজার ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনিতেন, গল্প শুনিতেন; রাজ্য জয়ের বন্দোবস্ত করিতেন, কবির কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া রাজকন্যার বিবাহ দিতেন। ঐ যে দূরে সমস্ত গায়ে কাঁটাভরা শিমূল গাছটা দাঁড়াইয়া আছে, ঐখানে হয়ত মস্ত মস্ত দাড়ি গোঁফওয়ালা, তলোয়ার হাতে ধরা, জমকাল পোষাক পরা, একটা ভীষণ চেহারার কোল পাহারা দিত; কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কত কবি, কত গায়ক তাহার হাতে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া বিদায় হইতেন। আমার

স্ত্রী যেখানে বসিয়া কড়িখেলার আয়োজন করিতেছে, সেখানে হয়ত এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক রাজকুমারী সোনার খাটে শুইয়া ঘৃতে জ্বালা প্রদীপের আলোকের সম্মুখে রাজকবির রচিত কাব্য পাঠ করিত। আর যেখানে ঐ কাঁটা-গাছের ঝোপগুলি রহিয়াছে সেখানে হয়ত রাজার নাট্যশালা ছিল; শত শত কাচের লণ্ঠন, ঝাড় এক সময়ে সমস্তরাত্রি ঐ যায়গা আলোকিত করিয়া রাখিত, নাচগান হাসি কৌতুক সর্ব্বত্র মুখরিত করিয়া তুলিত। আমার পড়িবার ঘর যেখানে সেখানে বসিয়া রাজপুত্র হয়ত পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। যেখানে আমি স্যাণ্ডোর ডাম্বেল এক্সারসাইজ করি, সেখানে সম্ভবতঃ তাঁহার অস্ত্রশালা ছিল। কালের প্রভাবে এ সকল কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে; এখন আর চিহ্নমাত্র নাই! আমার হাতের এই শিলাখণ্ড ছাড়া সেই রাজা, তাঁহার রাজ্য, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ বোধহয় পৃথিবীর গর্ভেও কোথাও লুকাইয়া নাই!

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। কোন প্রকারে চোখের জল সামলাইয়া শিলাখণ্ড দুইখানি লইয়া আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং গোপনে আমার বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

শিলাখণ্ড দুইখানি পাইয়া আমার লেখক-প্রাণ ভারি চঞ্চল হইয়া উঠিল। নূতন বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়া পুরাতন নিষ্ফলতার কলঙ্ক মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মনে করিলাম শিলাখণ্ড দুইখানি কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিই, আর ঐ সঙ্গে উহা কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও ঐ সম্বন্ধে আমারই বা কি ধারণা লিখিয়া পাঠাই।

পুকুর কাটাইতে গিয়া আমি যে মূল্যবান্ জিনিশটী লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্ত্রীকেও দেখাইলাম না। তাহার বিশেষ কারণ আছে।

(৪)

শতকরা একজন লোকেরও নাকি স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় হয় না। আজকাল বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীর সঙ্গে দুই এক জনের হয়, বিবাহ হইয়া গেলে আর সেটা থাকে না। লোক মাত্রেই বিবাহের নূতনত্বটার উপরে নিতান্ত অনিচ্ছা-বশতঃই না হইলে নয় বলিয়া চির পুরাতন সংসারবন্ধে চোখ বাঁধা বলদের মত বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রণয়ে সুখী হইয়া যাঁহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারা অসাধারণ ভাগ্যবান্; রাজামহারাজা নবাব সুলতান অপেক্ষাও অনেক সুখী। আমি তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।

দুইটী প্রাণীতে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, গোলাপেও কাঁটা আছে, সূর্য্যমণ্ডলের উপরেও মাঝে মাঝে কাল দাগ দেখা যায়; আমার স্ত্রী-চন্দ্রে কলঙ্ক ছিল—সে তাহার বাচালতা। মুখের দরজা তাহার সর্ব্বদাই খোলা থাকিত; এবং আমি যাহা কিছু করি, না করি, লিখি না লিখি সে তাহার এমন সমালোচনা করিত, যাহাকে সত্য বলিয়া ভাবিতেও কষ্ট হয়, প্রিয় ত কোন মতেই বলিতে পারি না।

সকল লোকের দোষ কিছু না কিছু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু নিজের স্ত্রীর দোষ কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না। যে আমাদের সকলের চেয়ে বেশী আপনার তাহার দোষটাই আমাদের চোখে বেশী পড়ে এবং বেশী করিয়া আমাদের প্রাণে বাজে। উপরওয়ালার মুখে stupid সহ্য করিতে পারি, স্ত্রী অক্ষম বলিলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। স্ত্রীর সঙ্গে মাসে মাসে আমার ঝগড়া হইত।

আবার সে আমার লেখার যতই কঠোর সমালোচনা করুক না কেন আমিও মধ্যে মধ্যে তাহাকে আমার রচনা না দেখাইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার কোন লেখা তাহার হাতে পড়িলেই সে প্রথম খানিকটা পড়িয়াই হাসিয়া কুটিকুটি হইত, পরে আবার আগাগোড়া পড়িয়া যা না তাই বলিতে আরম্ভ করিত। তিলমাত্র জ্ঞানলাভ না করিয়াই ছাই ভস্ম লিখিবার চেষ্টা কেন করি; আমার রচনার মধ্যে মানুষের শিখিবার, জানিবার, উপভোগ করিবার কি আছে; আমার মত লোকের সাহিত্য ভাণ্ডারে দিবার মত কি আছে,—ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন করিয়া আমার মাথাগরম করিয়া দিত। কোন কোন দিন সুর করিয়া আমার কবিতা পড়িয়া, হাত পা নাড়িয়া, নানাপ্রকার মুখভঙ্গী দেখাইয়া, আরও কত কি কাণ্ড করিয়া অবশেষে আমার বহু পরিশ্রমের লেখাগুলি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সম্ভাবনায় ছোট ছেলের কাগজের চুলার জন্য রাখিয়া দিত।

এ অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করিতাম ; কিন্তু আমার আদর্শ গ্রন্থকারগণের নিন্দা যখন সে করিত, তখন আমি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতাম না। নূতন কবিদের মধ্যে যাঁহার লেখা আমি সকলের চেয়ে বেশী পছন্দ করিতাম, একদিন তাঁহার কয়েকটী কবিতা স্ত্রীকে পাঠ করিতে দিয়া আমি সগর্ব্বে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—দেখি বেচারা এবার কি দোষ ধরিতে পারে। চারি পাঁচটী ছোট কবিতা পড়িয়া সে কহিল, "ওমা ! এ কোন্ পুরুষ মানুষের লেখা গো ? এ যে কেবলই কান্নার সুর ! বিউনী, আকুলি, নেতিয়ে—এই সব শব্দ ছাড়া আর একটা শব্দও কি খুঁজে পেলে না ?" "তোমার মত মেয়ে মানুষের কাজ নয় এ লেখার দোষ গুণ সমালোচনা করা"—বলিয়া তাহার হাত হইতে কবিতার বইখানি কাড়িয়া লইলাম। "তোমার পুরুষ কবিটী আমার মত মেয়ে মানুষের কাছে অনেক কাজের কথা শিখে নিয়ে লিখতে পারে। আজকালকার দিনে পুরুষমানুষেও যদি কেবল কান্নার সুর ধরেই বসে থাকে, তা হ'লে, ভক্তচূড়ামণি, দেশের কোন উপকারই হবে না।" এই উত্তর হইল। সেদিন তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি তাহার মুখ দর্শন করি নাই।

নিতান্ত সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে অমূল্য জিনিষটী পাইয়াছি মূঢ় বালিকার হাতে পড়িলে তাহার মর্য্যাদা থাকিবে না—ভাবিয়া আমি তাহা গোপনে রাখিলাম।

(৫)

লুকাইয়া লুকাইয়া মস্ত বড় নামজাদা দুইখানা মাসিক পত্রের সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখিলাম। যাহা লিখিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই,—পুরাতন দীঘি খনন করিতে গিয়া একখানা শিলালিপির ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। তাহার আকার গোল, কিনারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ; এক যায়গায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের হাতে লেখা অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে 'ভজ' এই শব্দটী লেখা আছে। শিলালিপির তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই কথা কয়টীই ভাল করিয়া আধুনিক সাহিত্যিকের ন্যায় লিখিতে গিয়া আমার দশ বার খানা পৃষ্ঠা লাগিল। কবিতা এবং গল্প লিখিতে গিয়া আমি সফলতা লাভ করিতে পারি নাই, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এবার প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হাতে লইয়া সেই ক্ষোভ মিটাইয়া লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। পত্রের ভাষাটাকে আমি আদর্শ ভাষায় পরিণত করিতে যত্নের ত্রুটি করিলাম না। গল্পে যে ভাষা আমি ব্যবহার করিতাম, ঘসিয়া মাজিয়া তাহাকে আরও অনেক সুন্দর করিবার চেষ্টা করিলাম। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বহুদিন হইতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত আছে, সে শব্দগুলা নিতান্ত কঠোর ; সাহিত্যের ভাষা সকল যায়গায়ই নিতান্ত মোলায়েম হওয়া দরকার। সংস্কৃত শব্দ যতই সহজ, প্রচলিত হউক না কেন, সেগুলি সংস্কৃত শব্দ ত বটে। তাহাতে সংস্কৃতের গন্ধ আছেই আছে.—সে গন্ধটা ভারি খারাপ। বাঙ্গলা ভাষার জল দিয়া তাহাকে যতই ধুইয়া মুছিয়া ফেলি না কেন সে গন্ধ কিছুতেই যায় না। দুঃখীকে দুখি লিখিতে পারি, শ্রীদামকে ছিদাম করিতে পারি ; কিন্তু দুখি এবং ছিদামের মধ্য দিয়া যে দুঃখী এবং শ্রীদামের হাওয়া বয়, সে কথা কে অস্বীকার করিতে পারে ? অতএব আমার মত যে সংস্কৃত শব্দকে, তা সে মূলই হউক আর অপভ্রংশই হউক, বাঙ্গলা সাহিত্যের রাজ্য হইতে একেবারে দূরে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে—আশে পাশে ইন্টার্ণ করিলেও চলিবে না। জানিনা কি উদ্দেশ্যে এখনও অনেকে সংস্কৃত শব্দ নিজেদের লেখায় স্থান দিয়া আসিতেছেন। হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শী, আরবী, ইংরাজী, নাগী, সকল শব্দ ব্যবহার করিতে পারা যায় ; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল এ বিষয়ে অনেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা সাহিত্যের কল্যাণের জন্য জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তথাপি সংস্কৃতশব্দকে নিজেদের পুস্তকে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। আমি দেখিয়াছি একজন মহাপুরুষ "পুস্তকগত" বা "পুঁথিগত" বিদ্যার স্থানে "কিতাবতী" বিদ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার কলম অক্ষয় হউক, তিনি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকুন। যতদিন বাঙ্গলাভাষা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গলা দেশ থাকিবে, যতদিন জগতের লোক সাহিত্য চর্চ্চা করিবে, ততদিন বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিবিধানকারী সেই মহাত্মার যশ কিছুতেই লুপ্ত হইবে না।—কি বলিতে বলিতে কি পর্য্যন্ত আসিয়াছি ! যাউক, সে কথার আর প্রয়োজন নাই।

আমি আমার সেই মার্জ্জিত সরল, সুন্দর, আদর্শ ভাষায় লিখিত পত্র দুইখানি আমার গ্রাম্য বন্ধুদের দেখাইলাম।

তাহারা আমার সহরের বন্ধুদের মত অমন অকালকুষ্মাণ্ড ছিল না। সকলেই আমার লেখার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হইয়া গেল। আমি কি করিয়া এমন ভাষা, এমন সাহিত্য প্রত্নতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম ভাবিয়া তাহারা কিনারা করিতে পারিল না।

একজন তখনই আমাকে উপাধি প্রদান করিল, "প্রত্নতত্ত্ব বারিধি", একজন বলিল, "প্রত্নতত্ত্বজ্ঞান-বারিধি", আর একজন আর একটু বদলাইয়া করিল "প্রাচীনতত্ত্ব জ্ঞানার্ণব।" আমি হাসিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলাম; এবং বেশ ভাল করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে তাহারা লেখার প্রকৃত দোষ গুণ ধরিতে পারে, কোথায় কি শিখিবার বুঝিবার আছে নির্ণয় করিতে তাহারা বিশেষ সুনিপুণ; চেষ্টা করিলে এবং আমাকে আদর্শ বলিয়া অনুকরণ করিলে প্রত্যেকেই কালে ভাল লেখক হইতে পারিবে।

অ... এই পাড়াগাঁয়ের যুবকদের মধ্যেও একটা "মুখপোড়া" চেষ্টা করি[illegible]ছিল, সে বলিল, "ভাষাটা নিতান্তই মেদিনীপুরের গিন্নিদের ভাষার মত হ'য়ে গেছে!" এবং সকলে যখন আমার উপর সুন্দর সুন্দর উপাধিবর্ষণ করিতেছিল, তখন সে বলিয়া উঠিল, "পেত্নীতত্ত্বের কমলা নেবু!"

(৬)

নিন্দুকের কথা আলাদা। আমি সে কথায় কাণ না দিয়া চিঠি দুইখানি পাঠাইয়া দিলাম।

যত শীঘ্র সম্ভব উত্তর আসিল, আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া শিলালিপিখানি পাঠাইয়া দেই তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয়রা অতিশয় আনন্দিত হইবেন। পরীক্ষার্থ তাহা সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট পাঠান একান্ত আবশ্যক।

এবার আমার মনে একটা কৌতুকের অভিসন্ধি উদিত হইল। শিলাখণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য দুইজন সম্পাদকেরই তুল্য আগ্রহ। এই অমূল্য দ্রব্যটুকু পাইয়া আমি যেরূপ আনন্দে বিভোর হইয়াছি, তাহা লাভ করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়রাও ঠিক সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়েরই চিঠির ভাবে সেটা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নিশ্চয়ই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন শিলাখণ্ড হাত করিতে পারিলে তাঁহাদের মস্ত লাভ। অনেক দিন ধরিয়া তাহার এদিক, ওদিক, কিনারা, মধ্য, নানা আকারে নানা ভঙ্গিমায় পত্রিকায় ছাপা হইতে থাকিবে। ছবির উপরে, নীচে, দুইদিকে অসংখ্য টীকা-টীপ্পনী লেখা হইবে। গবেষণা, তত্ত্বনির্ণয়, আবিষ্কারের চোটে চারি পাঁচ মাস পর্যন্ত কাগজের অর্দ্ধেক ছাইয়া যাইবে। কাগজের কাটতি বাড়িবে। বিস্তর টাকা রোজগার হইবে। এই অবস্থায় আমি যদি একজনকে জানাইয়া দেই যে আমার সেই বহুমূল্য জিনিশটী লইবার জন্য আরও একজন তাঁহারই মত ব্যাকুল, তাহা হইলে দুইজনে মস্ত ঝগড়া বাধিয়া যায়! কি জিনিশটী আমি তাঁহাদিগকে দিবার জন্য প্রস্তুত, তাহাতে প্রকৃতই তাঁহাদের কোন অভিলাষ পূর্ণ হইবে কিনা সবিশেষ না জানিয়াই হয় ত তাঁহারা কাগজে কাগজে মস্ত ঝগড়া, বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্নতত্ত্বের ন্যায় একটা উচ্চ বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহার মত লোকের পক্ষে এইরূপ অকারণে ঝগড়া বাধাইয়া তুচ্ছ আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা নিতান্ত ঘৃণার কথা ভাবিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম।

চিরশান্তিপ্রিয় ঈশ্বরের যত্নেই হউক আর সম্পাদক-যুগলের সৌভাগ্য বশতঃই হউক, শিলাখণ্ডটুকু আমার হাতে আসিবার পূর্ব্বেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার একভাগে লেখা ছিল 'ভ' আর একভাগে লেখা ছিল 'জ'। এই ভ আর জ দুই অক্ষর দিয়া দুইজনকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় দুইখানা পাথর দুইজনের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

পাঁচ ছয় দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল শিলা দুইখানি দুইজন বড় বড় প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে; আগামী মাসের কাগজে আমার ফটোগ্রাফসহ শিলালিপির ছবি বাহির হইবে; পরীক্ষায় যে তত্ত্বনির্ণয় হয়, যে বিষয় আবিষ্কৃত হয় তাহা পরে আমাকে জানান হইবে। আমার ছবি ও আমার আবিষ্কৃত শিলালিপির ছবি কাগজে ছাপা হইবে, এই আনন্দের প্রথম মোহটা কাটিয়া গেলে একটা বিপদ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একই সময়ে দুই কাগজে আমার শিলালিপির তত্ত্ব আলোচিত হইতে থাকিলে একদলের লেখক আর এক দলকে জব্দ করিতে গিয়া হয়ত কোন তত্ত্বই নির্ণীত করিতে পারিবেন না, হয়ত আমার আশা, ভরসা সকল মাটী করিয়া বসিবেন।

দুপুরবেলা এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে চামড়ার

ব্যাগ হাতে, চশমা চোখে, ছাতি মাথায় এক ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় হাজির। পাড়াগাঁয়ের দস্তুর মত প্রশ্ন করিয়া জানিলাম—ইনি একজন সম্পাদকের দূত। পাড়াগাঁয়ের দস্তুর মত আহার, বিশ্রাম করাইয়া আমাকে তাঁহার নিকট অশেষ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইল—সে আমার নামধাম শিক্ষা, বংশ পরিচয় সম্বন্ধে। অবশেষে তাঁহাকে আমার একখানি ফটোগ্রাফও দিতে হইল। বিদায়কালে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আমার অনুরোধ জানাইলাম, যে পর্য্যন্ত শিলালিপি সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হয় সে পর্য্যন্ত যেন শিলালিপি সম্বন্ধে কোন কথা বা তাহার ছবি কাগজে ছাপানো না হয়।

বিকালবেলা আবার ঠিক সেই অভিনয়। এবার আসিলেন অপর পত্রিকার সম্পাদকের চর। তাঁহাকেও আমার শেষ অনুরোধ জানাইয়া দেওয়া হইল।

বৃথা চেষ্টা। পরমাসে দেখিতে পাইলাম দুইখানা কাগজেই আমার শিলাখণ্ডের নানা আকারের ছবি, ইতিমধ্যেই বিস্তর টীকা টিপ্পনী, আমার নিজের ছবি এবং জীবন চরিতের ভগ্নাংশ ছাপা হইয়াছে। একখানা কাগজে শিলাখণ্ডের উপর লেখা 'ভ' আর একখানা কাগজে 'জ'। দুইখানা কাগজে আমার ছবিও উঠিয়াছে দুই রকম—একখানার সঙ্গে আর একখানার তেমন কোন সামঞ্জস্য নাই; জীবনচরিতও সম্পূর্ণ আলাদা—একজনে যে অংশ বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন আর একজন তাহার কাছ দিয়াও যান নাই। নামটী মাত্র এক, গ্রামের নামেরও বানান ভিন্ন।

প্রথম ভাবিয়াছিলাম আমাকে এবং আমার শিলাখণ্ড লইয়া দুইদলে ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। এখন আশঙ্কা হইল দুই কাগজওয়ালা এবং দুই প্রত্নতত্ত্ববিৎ আমাকেই আবার দুইজন লোক করিয়া না ফেলেন। শেষে ভাবিলাম, "তা' করে করুক। তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যাইবে না। এখন একটা কিছু বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে হয়।"

অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত দিন কাটাইতে লাগিলাম—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হইতে কি উত্তর আসে, পুরাকালের কোন্ রাজা, কোন্ রাজ্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুম হয় না; দিনে ছটফট্ করিয়া সময় কাটে, পড়ার ঘরেই সময় বেশী চলিয়া যায়। সুরবালা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে? দিনরাত অমন ক'রে কাটাচ্ছ কেন?" আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। সত্য কথাটা তাহার নিকট ভাঙ্গিয়া বলিলে ত এখনই সে আমার সমস্ত চিন্তালহরী ভাঙ্গিয়া দিবে, কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে। সুতরাং মৌন থাকাই আমার একমাত্র উপায় রহিল। জানালার ফাঁক দিয়া, কবাটের আড়াল হইতে সে আমার পড়ার ঘরে উকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। আমি অনেক কৌশলে তাহাকে থামাইয়া রাখিতাম, আমার চিঠিপত্রও দেখিতে দিতাম না। পাছে কিছু বুঝিয়া ফেলে ভাবিয়া সে মাসের মাসিক পত্রিকা যাহাতে তাহার হাতে না পড়িতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলাম।

একমাস চলিয়া গেল। দ্বিতীয় মাসের শেষে পাথর খণ্ড দুইখানা সম্পাদকদ্বয়ের মারফৎ ফেরৎ আসিল, চিঠি আসিল পরমাসের কাগজে সকল বিবরণ ছাপা এক্ষে।। পরমাসের কাগজ বাহির হইল; দেখিলাম—টীকা-টিপ্পনী, গবেষণা, বিচার মীমাংসায় প্রত্যেক কাগজের পনর বিশ পৃষ্ঠা বোঝাই। গাঢ় মনোযোগের সহিত আগাগোড়া পাঠ করিয়া একখানা কাগজ হইতে সারমর্ম্ম এই পাইলাম,—পাথরখানার বয়স অনুমান হাজার বছর। হাজার বছর পূর্ব্বে ঐ পাথরখণ্ড যে শিলালিপির অংশ সেই শিলালিপি খোদিত হয়। প্রাপ্ত অংশে 'ভ' অক্ষরটীর মত একটী অক্ষর আছে। অক্ষরটী "ভজকৃষ্ণ, ভজশিব—" এইরূপ কোন কথার আদি অক্ষর হইবে। যে নৃপতি ঐ শিলালিপি খোদিত করেন, তিনি নিঃসন্দেহ হাজার বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল আমাদের গ্রামে। সে গ্রামের পূর্ব্বনাম ছিল কুন্দকেলি, এখন হইয়াছে কাকুন্দিয়া। ঐ গ্রামে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে রাজবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে।

অপর পত্রিকার লেখায় যে মীমাংসা হইয়াছে তাহা এই, শিলালিপির ভগ্নাংশে 'জ' এই অক্ষরটী লেখা আছে। একাদশ শতাব্দীতে জয়দেব নামে কোন রাজা কামন্দকী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এক শত্রুবিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি এক শিলালিপি খোদিত করেন। 'জ' অক্ষরটী তাঁহার নামেরই আদি অক্ষর। তিনি যে স্থানে

রাজত্ব করিতেন তাহার বর্ত্তমান নাম কাকুবন্দ। উক্ত স্থানে অনুসন্ধান করিলে রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ মিলিতে পারে।

(৭)

উভয়বিধ মীমাংসা পাঠ করিয়া আমার প্রথম জ্ঞান হইল, মস্ত ভুল করিয়াছি; দুইখণ্ড পাথরই এক ব্যক্তির নিকট পাঠান উচিত ছিল। তাহা হইলে সত্য নির্ণয় হইত; এইরূপ দুই প্রকারের মীমাংসা হইত না। এখন ইহার মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? শেষে দেখিতে পাইলাম দুই প্রকার মীমাংসার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে—হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের এইখানে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, অনুসন্ধান করিলে এইখানেই তাঁহার রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাইতে পারে।

কথাটা একটু বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখিবামাত্র আমার মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটা তড়িৎক্রিয়া হইয়া গেল। চেষ্টা করিলে কে জানে প্রমাণ করা যাইতে পারে আমিই সেই রাজকুলের একজন বংশধর। আহা! এমন কথা সঠিক প্রমাণ করিতে পারিলে "কুমার বাহাদুর" উপাধিলাভ আমার পক্ষে একটা বেশী কিছুই নয়।

এই কথা মনে উদয় হওয়াতেই আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিয়া আমি সেই ভগ্নপুরী খোঁজ করিয়া বাহির করিব; যতদিন আমি এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে না পারি ততদিন অন্য কোন বিষয়ে মন দিব না; এ কাজ হইতে আমাকে কেহ নিরস্ত করিতে পারিবে না। রাজবংশে আমার জন্ম,- এই কথা যদি কোন দিন প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি তাহা হইলেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ করিব, নচেৎ বিশ্রাম, আনন্দ, পৃথিবীর সকল সুখের নিকট আমার এই চিরবিদায়। চপলা স্ত্রীকে আমার এই সঙ্কল্পের বিষয় কিছুই জানান হইল না! কাহারও কাছেই কিছু বলা হইল না।

আমার মাথায় মস্ত নেশা লাগিয়া গেল। আমি লোকজন লইয়া প্রত্যহ আমাদের বাড়ীর সকল যায়গা খুঁড়িয়া দেখিতে লাগিলাম। পিতৃদেব ইতি পূর্ব্বেই বাড়ীঘর সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার হাতে দিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি আমাকে কোন কথাই বলিলেন না। স্ত্রী আমার কাণ্ড দেখিয়া বলিল, "ওকি, এমন করে সমস্ত বাড়ী খুঁড়ছ কেন?" আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম সে কথা স্ত্রীলোকে বুঝিতে পারিবে না।

যে জিনিষটা সহজে পাওয়া যায় তাহার জন্য মানুষের বেশী ঝোঁক হয় না; কিন্তু যে জিনিষ পাওয়া একান্ত কষ্টকর, অথবা যাহা নিতান্তই কল্পনার সৃষ্টি, তাহাই লাভ করিবার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা বেশী হয়। রাজপুরীর ভগ্নাংশ আবিষ্কার করিয়া আপনাকে রাজবংশজাত বলিয়া প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে সময় মত আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আমি বিস্তর পয়সা খরচ করিতে লাগিলাম। নিজের বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ শেষ হইলে, আশেপাশের যায়গা, তারপর অনুমতি লইয়া পরের বাড়ীর কোন কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গ্রামে যত মাঠ ছিল স্থানে স্থানে তাহা খুড়িয়া দেখিলাম। ভাঙ্গা মঠ, জীর্ণ কোঠাবাড়ী কত পরীক্ষা করিলাম; খাতার কাগজে কত কি লিখিলাম; কিন্তু হাজার বছরের আগেকার রাজপুরীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, প্রমাণও কিছু করিতে পারিলাম না।

যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলাম, ততই আমার ঝোঁক বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বেশী করিয়া পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। শরীরের চেহারা খারাপ হইয়া গেল। আমার অবস্থা দেখিয়া সুরবালার বিশেষ ভাবনা হইল। কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও আমি তাহাকে কিছুই বলিলাম না।

এইরূপ অবস্থায় একদিন আমি পড়িবার ঘরে বসিয়া শিলাখণ্ড দুইখানি, মাসিকপত্রগুলি, সম্পাদকদ্বয়ের পত্র কয়খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি আর কত কি ভাবিতেছি; এমন সময়ে সুরবালা—(ভুলক্রমে পড়িবার ঘরের দরজা আটকাইয়া বসি নাই)—ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আর গোপন করা চলিবে না দেখিয়া অতিশয় গম্ভীরভাবে ব্যাপারটা তাহাকে কতক বুঝাইয়া দিলাম। সে প্রথম কোন কথা বলিল না। মাসিক পত্রিকাগুলি পড়িল, সম্পাদক দুইজনের পত্র কয়খানা দেখিল, অবশেষে অন্য কাগজের নীচ হইতে শিলাখণ্ড দুইখানি বাহির করিয়া একবার ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিল। চাহিতেই তাহার মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল। এ কয়দিনে আমার মুখের কালিছায়া যত তাঁহার মুখে পড়িয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। সে

হাসিয়া এই বলিয়া উঠিল, "এই পোড়াকপাল নিয়ে তুমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছ, খেটে খেটে হাড়গিলা হ'য়ে যাচ্ছ ? আমি ভাবি না জানি ব্যাপারখানা কি ! এ যে তোমার ঠাকুরদাদার আমলের ভাঙ্গা পাথুরে বাটীর তলাখানা ; যেমন আমার ভাঙ্গা কপাল, তেমন তোমার বুদ্ধি, আর তোমার পেত্নীতত্ত্বের আলোচনা !"

আমি অবাক হইয়া সুরবালার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার বলিল, "এই বুদ্ধি নিয়ে আবার বড়াই কর মেয়েমানুষ কিছুই বোঝবার যোগ্য নয় ! পাথরখানার নীচে ঠাকুরদাদার নাম লেখা রয়েছে, তাও বুঝতে পার নি ?"

সুরবালার কথা উড়াইয়া দিবার উপায় ছিল না। আমার পিতামহের নাম ছিল ভজহরি মুখোপাধ্যায়। সুতরাং আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রী আরও জানাইয়া দিল যে উক্ত পাথুরে বাটীর তলাখানা সে-ই পুকুরে ফেলিয়া দিয়া ছিল।

অতঃপর নিশ্চিন্ত হইয়া কিছু জলযোগাদি করিয়া ঐ সকল মাসিকপত্র, আমার যত কিছু লেখা, ঐ সম্পর্কীয় চিঠি পত্রগুলি সমস্ত পুকুরের জলে ফেলিয়া আসিলাম, এবং তার পরদিন যে বন্ধু আমাকে 'পেত্নীতত্ত্বের কমলালেবু' উপাধি দিয়াছিল, তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভালবাসা।

এই যে বিশ্ব-জীবন ধারা
তুলিয়া রূপের লহরী
অসীমে হয় আপন হারা
আপন হৃদয় পর করি !

থাকতে খুকা চাহেনা মন
মুক্ত যাচে বন্দী হ'তে,
প্রেরণা কে করে প্রেরণ—
হর্ষে সকল দুঃখ স'তে ?

যে আনন্দে বন্দে কবি
নিত্য নূতন ছন্দেতে,
শিল্পী আঁকে মধুর ছবি
বুঝবে কি তা অন্ধেতে ?

পূর্ণকে যে পূর্ণ রেখে
রচলো বিরাট সৃষ্টি এ

'মায়ার লীলা' শাস্ত্র লেখে
প্রেমিক বলে প্রেম যে সে।

আনন্দ যার অনুভূতি—
সৎচিদেতে থাকে যে,
সৌন্দর্য্য তার দেহের দ্যুতি
মনের নাগাল পাবে কে ?

সীমানা তার পায় কে খুঁজে,
কোন খানেতে আদি শেষ
ওজনটা তার কে দেয় বুঝে,
ধরতে পারে কাল কি দেশ ?

পাত্র বিচার করেনা সে
এমন ধারা জাতনাশা
যে জন তারে ভালবাসে
তার কাছে সে 'ভালবাসা'।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

ফ্রি-লাভ-বনাম-মুক্তপ্রেম।

যৌন-সমস্যা নিয়ে বর্ত্তমানের সমস্যা-সঙ্কুল সাহিত্য-জগত কিছু বেশী মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাব্য-রসিকের দল আক্ষেপ করে বল্‌ছেন যে মিথুন-রাগের দরদস্তুর-মাফিক চর্চ্চার বাজার হঠাৎ মন্দা পড়ে গিয়েছে এবং তা' থেকে অনুমিত হচ্ছে যে যৌবন বুঝি বা বাংলা মুল্লুক ছেড়ে যায়। অপর দিকে ফ্রি-লাভ বা স্ত্রী-পুরুষের স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচন মূলক মিলন প্রতিষ্ঠিত করা, এবং মিলনান্তে অনুরাগ বিরাগে পরিণত হ'লে ভ্রম-সংশোধন করে' নূতন ভ্রমে পড়া কি উপায়ে সম্ভব তা' নিয়েও গবেষণা সুরু হয়েছে।

বিদেশে এ ব্যাপার নিয়ে প্রতিভাশালী কবিরা যা' বলা-কওয়া করেছেন তার পরিচয় এদেশের কাগজে পত্রে যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা দিয়েছে। তা' ছাড়া, এদেশের কবি-প্রতিভাও এমন একখানি বই পাঠক-মণ্ডলে নিক্ষেপ করেছেন, যাতে মানুষের যৌন-বুদ্ধির ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে,—অবশ্য যদি এইদিক থেকে বইখানিকে দেখতে চাওয়া যায়; বইখানির নাম 'ঘরে-বাইরে'। এ কেতাবের মজা এই যে এতে যৌন-সমস্যার কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না, অথচ মানুষকে যৌন-ব্যাপার নিয়ে বিব্রত করে তোলে। কবি এখানে তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে হেঁয়ালীর উত্তর দাবী করতেই দাঁড়িয়েছেন, এবং নিজে সর্ব্বপ্রকার ধরা-ছোঁয়ার অতীতই থেকে গিয়েছেন। তবে উক্ত কেতাব প্রকাশ হবার পর একদল লেখক ও পাঠকের মতিগতি যা' লক্ষ্য করা গেল, তাতে বলা যায় যে কবির প্রতিজ্ঞা "মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া" বিকল্পে সার্থক হয়েছে; অর্থাৎ নরনারীর সব চেয়ে বড় মোহের মুখ থেকে সকল বাধা অপসারিত করে' দেওয়াই যে মুক্তি, এমন ধারণা অনেকেরই মনে দেখা দিয়েছে।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অভিমতগুলির মধ্যে আমার চক্ষুকর্ণের সঙ্গে যে কয়টীর পরিচয় হয়েছে, তা' মোটের ওপর এই :—

(১) আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধু আশা কচ্ছেন যে আমরা দীর্ঘতমা ঋষির সমসাময়িক যুগকে ঘুরে ফিরে সামনে পাবো। সেকালে যেমন নারীরা স্বেচ্ছাবিহারিণী ছিলেন, এবং একের গৃহিণীকে অন্যে ক্ষণিক খেয়ালবশে কামনা করলে গৃহস্বামীর তরফ থেকে আপত্তি চলতো না, ভবিষ্যতেও তাই হবে; কেননা সেইটেই ছিল নির্ম্মল ও কল্যাণকর প্রথা; শ্বেতকেতু ঋষির মনে পাপ ঢুকেই অমন চমৎকার প্রথাটা না-হক উঠে গিয়েছে।

(২) দু'নম্বরের দাবী হচ্ছে এই। বিবাহান্তে যদি প্রকাশ পায় যে পরিণীতা অপর কারুর প্রতিই অনুরক্তা ছিল; অথবা ঘটনাচক্রে পরে হয়ে পড়েছে—তা' হলে তাকে কাম্য-মিলনে সাহায্য করে' নূতন স্ত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা করা।

এ মতটীও আমার এক বন্ধুর; ইনি সম্ভবতঃ হতাশ-প্রণয়ী, নতুবা আজও অবিবাহিত কেন?

(৩) তৃতীয় মত অধিকাংশ কবির। এ মতে প্রেমই হচ্ছে একমাত্র condition, আর ঐ প্রেম যৌবনের দুষ্ট ক্ষিদে কি চিরদিনের শান্ত ক্ষিদে, সেটা স্থিরের আগেই নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে' নেওয়া চাই। যদি বলেন, কি উপায়ে? তার উত্তর—রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে ললিতা ও বিনয় যেমন পরস্পরকে বুঝে পড়ে নিয়েছিল, কিম্বা গোরা যেমন তার শিষ্যা সুচরিতাকে লুফে নিয়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যৌবনের বিচারশক্তি সমস্ত ভাবী-জীবনকে কি করে' represent করবে? যদি হৃদয়ের ও রুচির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের পূর্ব্বরুচির মাঝ-খানে বিদারণ-রেখা দেখা দেয়? এই যে সবুজপত্রে কোনো লেখক কল্পনা করেছেন যে 'ঘরে বাইরের' সন্দীপ 'গোরা' চরিত্রেরই পরবর্ত্তী বিকাশ, এবং বিমলা ও নিখিলেশ যথা-ক্রমে ললিতা ও বিনয়েরই পরের সংস্করণ—এ কল্পনার সম্ভাব্যতা কি অসম্ভব? যদি না হয়, তবে প্রচলিত ক্ল্যাসিক বিবাহ-প্রথা আর প্রস্তাবিত রোম্যান্টিক বিবাহ-প্রথার ফলে তফাৎটা কি দাঁড়ায়? উত্তরে, চতুর্থ মত এসে পড়ছে—এ মত কবির নয়, কাব্য-রসিকদের;—এ মত অনুসারে—

(৪) পরস্পরের নির্ব্বাচিত নরনারী রেজেষ্টারী অফিসে বা সমাজপতিদের কাছে প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়ে এসে

যাবৎ-রুচি সুখে সচ্ছন্দে ঘরসংসার করবে,—রুচি বদ্‌লে গেলে তথাকথিত সমিতিতে খবর দিয়ে লোক বদ্‌লে ফেলবে —ছেলেমেয়ে যা' জন্মাবে তাদের মানুষ করবার জন্যে শিশুশালা প্রতিষ্ঠিত থাকবে - গভর্ণমেণ্ট বা সমাজরক্ষণ সমিতি ঐ সমস্ত শিশু উপার্জ্জনসক্ষম হয়ে ফ্রি লাভের জের টানতে না শেখা পর্য্যন্ত খবরদারি করবে এবং তার ব্যয়ভার বহন করবার জন্যে একটা নির্দ্ধারিত নিয়মে গৃহস্থদের কাছ থেকে Tax আদায় করবে। বুড়োবুড়ির দল আত্মহত্যা করে তো ভালই, আর না হয়, তাদের জন্যেও পিঁজরা-পোলের ব্যবস্থা করা যাবে।"

উক্ত প্ল্যানের সরবরাহকারীরা সম্ভবতঃ কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর কবিতা "উর্ব্বশী" থেকে পংক্তি উদ্ধার করে' মনে মনে নারীজাতিকে বল্‌তে চান :—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—সুন্দরি, রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!

* * * *

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল;
তোমার মদিরগন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লুব্ধ-কবি ফিরে মুগ্ধচিত্তে
উদ্দাম সঙ্গীতে।

* * *

মুক্তবেণী বিবসনে বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনি!"...

এঁদের মতে, ঐ যে বিশ্বশুদ্ধ লোকের 'বাসনা' নামক পদ্মফুলটীর ওপর পাদপদ্ম রেখে সুন্দরীটী দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই হচ্ছেন অদ্বৈত প্রেম রহস্য। সেই জন্যেই রবীন্দ্র সাহিত্যের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি ঐ পদ্মটীর সঙ্গেই সংলগ্ন দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যে ধ্যান ভঙ্গে তাঁর তপস্যার ফল-স্বরূপ—"ঘরেবাইরে" বইখানিকে ঐ 'সুন্দরী ও রূপসী'রই শ্রীচরণে দান করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ, উক্ত কাব্যের মধ্যমনি বিমলার দু'পাশের দু'টী চরিত্র আসক্তির সূত্রে ঐ সুন্দরীটির সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। একজন তাকে জড়াতে চেয়েছে, তাই সফলকাম না হলেও পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা করতে পেরেছে—ইনি সন্দীপ; আর অপরে তাকে ছাড়াতে চেয়েছে, ফলে বত্রিশ নাড়ীতে টান পেয়ে যাবজ্জীবন কেঁদে মরেছে, শেষে প্রাণটা পর্য্যন্ত খুইয়েছে কিনা তাতেও সন্দেহ—কেননা কবি বলেছেন, "মাথায় বিষম চোট লেগেছে, কি হয় তা' বলা যায় না।"

প্রবন্ধান্তরে এই "ঘরে-বাইরের" উপর আমি একটী অর্থারোপ করেছিলুম,— * কিন্তু সে-ব্যাখ্যা নাকি আমারই জটিল-বুদ্ধি-প্রসূত। সরলতা যে আমার মধ্যে একেবারেই নেই, এ বিষয়ে আমার সকল বন্ধুই একমত—এ অবস্থায় কবির সরলতাকে আমি যে স্বকীয় বুদ্ধির আয়নায় বক্র করেই দেখবো এতে আর আশ্চর্য্য কি! অতএব মিনিট কতকের জন্যে কাব্য-রসিকের আসনে বসে ব্যাপারটা দেখা যাক্—

কবির সরল ইঙ্গিত অনুসরণ করলে ও-বই থেকে যা' পাওয়া যায় তা' এই যে আসক্তি বর্জ্জন করতে কবি নিষেধই করছেন। তিনি বলেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে সন্দীপের কাছা ধরে থাক,—আর যদি ও বস্তু খোয়াতে চাও তবে নিখিলেশের শিষ্য হ'তে পার। বলা বাহুল্য, কোনো কাব্য-রসিক এই রসের হাটে খামকা প্রাণটা লোকসান করে ফেলতে রাজী হতে পারেন না—অতএব উক্তগ্রন্থ থেকে যদি তাঁরা এই সরলার্থ নিষ্কাষণ করে থাকেন যে প্রেম, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বমুক্ত ভোগস্পৃহা (তা' সে দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, যাই হোক) আর "দিল্লীর লাড্ডু" একই জিনিষ, সুতরাং পস্তাবার আগে ভরপুর খেয়ে তারপর পস্তানোই ভাল—তা' হলে তাঁদের সরলতার মানহানি ঘটে না। এ-হেন সরল বুদ্ধিবলে কবি-শিষ্যেরা যে মিথুন-রাগের চর্চ্চা ও ফ্রি-লাভের জন্যেই হাঁফিয়ে উঠবেন, তাতে আর সন্দেহ কি!

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে উপরে যতগুলি প্ল্যানের উল্লেখ করা গিয়েছে, তার প্রত্যেকেরই মূলে এই প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসটীর কাজ চলছে যে প্রেম হচ্ছে একটী আসক্তিগর্ভ বৃত্তি; অতএব যৌন সমস্যার মীমাংসা করতে হলে ঐ আসক্তিকে মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। সৃষ্টির যাবতীয় পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি চেতনার এই বহির্মুখী গতির স্রোতে ভেসে চলেছে—মানুষই কেবল 'বুদ্ধি' নামক অতি-

* । প্রাণের নমুনা—[পরিচারিকা]

রিক্ত উপসর্গের জ্বালায় দুনিয়াকে ভোগের স্বর্গ করে তুলতে দেরী করছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই যখন তার এই দুর্গতি ঘটেছে তখন অজ্ঞানবৃক্ষের ফুল অর্থাৎ কাব্য শুঁকিয়েই যে তার দুর্গতি দূর করতে হবে, কাব্য-রসিকদের অন্ততঃ এই বিশ্বাস। তাঁরা বলেন,—এতদিন ধরে' ঐ চেষ্টাই সাহিত্যে চল্‌ছিল,—এমন কি, সদ্‌গতির দিনও বুঝিবা বাঁচা কবিদের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছিল; কিন্তু শুনছি যে গোলোযোগ ঘটেছে। তবে কবির দল এখনও আশা ছাড়েন নি, এই যা' ভরসা। ভাদ্রের 'ভারতী' থেকে রিপোর্টটা তুলে দিচ্ছি :—

"আজকাল একদল ক্রিটিক প্রেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের হুঙ্কারে ভয় পেয়ে নবীন ও তরুণ কবিরা পর্য্যন্ত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক ভাবকে চাপা দিয়ে মানসনদের তটে বকধার্ম্মিকের মত আধ্যাত্মিকতার টোপ ফেলে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। এই অকালপক্ক আধ্যাত্মিকতার অত্যাচারে কাব্য-রসিকদের যে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হচ্ছে, সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। নরনারীর স্বাভাবিক রক্তের টান রুদ্ধ করে দিয়ে কবি যদি কিছু রচনা করেন, তবে তাতে ছন্দের ও শব্দের কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য থাকতে পারে, কিন্তু স্বভাব-সঙ্গত ভাবের সৌন্দর্য্য কিছুতেই থাকবে না। খালি intellect এর জোরে ভাল কাব্য লেখা যায় না; তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাব্য যাতে কবির গোপন প্রাণের গভীর অনুভূতি আছে। প্রেম হচ্ছে মানব-হৃদয়ের সনাতন ধর্ম্ম; ও ধর্ম্মকে পুলিপোলাও চালান করে' দিয়ে কোনো কবি প্রথম শ্রেণীতে প্রোমোসন পান নি। অতএব ক্রিটিকেরা যতই চীৎকার করুন বা যতই ধিক্কার দিন, কবির মানস-নদ থেকে প্রেমের উৎপল তাঁরা কিছুতেই উৎপাটন করতে পারবেন না।"

উক্তিগুলি কোনো অপরিচ্ছন্ন মতি শক্তিশালী লেখকের, সুতরাং তাঁর ধারণার ভ্রান্তি ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করতে আলস্য করবো না। যৌন-সমস্যা সম্বন্ধে কোনো মীমাংসায় উপনীত হবার আগে, উদ্ধৃত অভিযোগের বিচার অসঙ্গতও হবে না—কেন না, আমার বক্তব্যের মূলসূত্র এইখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে বেরুবে।

(১০)

প্রথমতঃ, প্রেমের বিরুদ্ধে কোনো ক্রিটিক কর্ত্তৃক যুদ্ধ বিঘোষিত হয়েছে একথা সত্য নয়। আষাঢ়ের ভারতীতে আর্টের সঙ্গে কবিত্বের তফাৎ যা' দেখানো গিয়েছিল, তাকে আর যাই বলা হোক, যুদ্ধ ঘোষণা কোনমতেই বলা চলে না। তাতে intellect এর কথা ছিল বটে, কিন্তু সে এই অর্থে যে আত্মার জোরে যে intellectual pictures আঁকা যায় তাই আর্ট—দৃষ্টান্ত 'চার ইয়ারী কথা' 'ফরমায়েসি গল্প' প্রভৃতি; অপর পক্ষে intellect এর জোরে, যে emotional pictures আঁকা যায় তাই কাব্য—দৃষ্টান্ত 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদি। এই জন্যই গোড়ায় বলা ছিল যে বঙ্গ সাহিত্যের সুর এক পর্দ্দা চড়ে গিয়েছে।

উদ্ধৃত রিপোর্টে 'গোপন প্রাণ' বল্‌তে লেখক যা' বুঝেছেন, আসলে তা' আসক্ত মনের স্মৃতি-ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বস্তু intellect'কে inspire করে না, পরন্তু intellect এর আলোয় নিজেকে আবেগ-চিত্রে বা কাব্যে সাজিয়ে তোলে। এই প্রাণ বা ইচ্ছাশক্তি নিয়েই হিপ্‌নটিজম্ শাস্ত্রের কারবার। কিন্তু আত্মা বলতে যা' বোঝায় তা' এই বৈজ্ঞানিক প্রাণের যমজ সুহোদর নয়—সেটী থাকে intellect এর পশ্চাতে এবং তারই আলো intellect এর গায়ে পড়ে আর্টিষ্টিক চিত্র জেগে উঠে। এই আত্মার অনিচ্ছাশক্তি বল নিয়েই ভারতবর্ষীয় spiritualism শাস্ত্রের কারবার। কিন্তু অত পৃথক পৃথক নামের দরকার দেখছি নে,—দেহের একই artery যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামের Pressing points লাভ করেছে, একই মন তেমনি বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বুদ্ধি আত্মা প্রভৃতি নামান্তর প্রাপ্ত হয়েছে। মনের যে অংশ intellect এর উপরে আছে তার নাম অনাসক্ত মন বা আত্মা, আর যে অংশ নীচে আছে তাই আসক্ত মন বা 'প্রাণ'।

আত্মা-বিচ্ছিন্ন প্রাণের অতিরিক্ত চর্চ্চার ফলভোগে যে পাঠকের মন materialistic হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ খুঁজতে বেশী দূর যাবার দরকার নেই—উদ্ধৃত রিপোর্টেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ দুর্লক্ষণ দেখে ভয় পাবার কিছু নেই—মানব সমাজের এ ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়ে কাব্য-যুগের কুফল ধ্বংশ করতে আর্ট অবলীলাক্রমেই সক্ষম হবে। বলা বাহুল্য, প্রেমও যখন একটি মনোভাব, তখন ও-ভাবেরও বিকাশ ঐ মনের বিকাশেরই প্রণালী সাপেক্ষ। সে যাই হোক, ক্রিটিকদের পক্ষ থেকে না হলেও যুদ্ধ ঘোষণা যে একটা হয়েছে, আর 'প্রেমের বিরুদ্ধে' না হলেও তা' যে

'প্রেমেরই পঙ্ক' থেকে, তার নজির আছে। 'প্রেম' ছাড়া আর তাল ঠুকে বেড়াতে চায় কে!

দৃষ্টান্ত—

(১) "লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে।
রবীন্দ্রনাথ (সবুজ পত্র)

(২) "কালের পেয়াদা যখন কবির যশঃসীমানার খুঁটী ওপড়াতে আসবে, তখন তাঁর কোনো সমালোচক সে কৌতুক দেখবার জন্যে বসে থাকবেন না,—কিন্তু ইতিমধ্যে অধিকার যে তাঁর।"

রবীন্দ্রনাথ (সবুজ পত্র)

আর পুঁথি বাড়াবো না; এর পাশে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করে দিই:—

"দম্ভ করিও না;
যতবড় হও তুমি,—তোমার চেয়েও
বড় আছে বিশ্বতলে; নতুবা
প্রকৃতি সহিবে না তব স্বেচ্ছাচার।"

তবে, কাব্য-রসিকেরা আশ্বস্ত হতে পারেন, যে কবির ঐ দম্ভমেধ-যজ্ঞের ঘোড়া কোনো ক্রিটিক ধরেন নি,—ধরেছেন এক আর্টিষ্ট।

প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক ভাব যে কি, তা' স্ত্রী-পুরুষ ভেদে প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব লক্ষ্য করলে দেখা যায়। স্বভাবের কাজই হচ্ছে প্রাণীদের স্বপ্রভাবে আনা—আর মানুষের কাজ হচ্ছে স্বভাবের টানে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতন হাত পা' ছেড়ে না ভাসা। আধ্যাত্মিকতার টোপ গিলে যে-সকল কাব্য-রসিকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়, তাঁদের ধারণা সম্ভবতঃ এই যে আত্মার অভাবের নামই প্রেম আর প্রেমের অভাবের নামই আত্মা। কিন্তু সত্য কথা এই যে প্রেম আত্মারই স্বভাব এবং আসক্তি অনাত্মার ধর্ম্ম। মানুষ স্বভাবতঃ পশুমতি, যদি সে পশুপতি বা মানুষ হতে চায়, তবে প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বাভাবিক আসক্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সজাগ থাকবে, এইটিই হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে তার আধ্যাত্মচেতনার দাবী। অসাবধান মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক রক্তের টান আপন নিয়মেই নরনারীর অভ্যন্তর থেকে নিজের বর্ণকে শুভ্র করে' দেহচ্যুত হবে,—এজন্যে একদল কবি মোতায়েন রাখা বাহুল্য মাত্র।

কবির মানস-নদে অর্থাৎ কাব্যে যখন প্রেম-পঙ্কজ নামক সনাতন প্রসূনটি ফুটে ওঠে, তখন ধরে নিতে হবে যে তাঁর "গোপন প্রাণের গভীর অনুভূতি মূলে" যথেষ্ট পরিমাণ পঙ্ক জমা হয়েছে। যাঁরা স্বাভাবিক ধর্ম্মের ক্রীতদাস, এ স্বাভাবিক তথ্যটি বিস্মৃত হওয়া তাঁদের উচিৎ নয় যে পঙ্ক তলায় না থাকলে পঙ্কজ উপরে ফোটে না। অতএব একথা যদি সত্য হয় যে কবিদের গোপনে প্রাণের পঙ্কোদ্ধার করে' তাঁদের মানস-নদকে নির্ম্মল করা সম্ভব হবে না তবে সে দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী ক্রিটিক আর কবির মধ্যে কে যে বেশী হবেন তা' নির্ণয় করাও শক্ত হবে।

"প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে তোমারে আপন জেনে—" কবি রবীন্দ্রনাথের ওযুক্তি আমরাও শুনেছি; এযুক্তির অন্তর্নিহিত রহস্য Hypnotism and personal magnatism নামক কেতাবে পাওয়া যাবে,—কিন্তু কাব্যের পাতায় এ জাতীয় পোলিটিক্যাল প্রেমের ফোয়ারা খুলে দিয়ে সকলকে কাজ ভুলিয়ে নিজের কাছে টেনে আনবার দরকার? এই কি মুক্ত পুরুষের লক্ষণ?

(২)

কথা পেড়েছি যে আত্মার অভাবের নামই প্রেম নয়,—তবে 'ভারতী'র রিপোর্টারের কথার ভাবে বোধ হয় যে আত্মার চর্চ্চা করবার উপযুক্ত কাল হচ্ছে বার্দ্ধক্য। 'মরণ-কালে হরিনাম'—প্রবাদ হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ বটে; তবে জীবনে জীবনে আবাদ চালাবার মতন লোভনীয় প্রবাদ নিশ্চয়ই ওটি নয়। এই ভারতবর্ষে নবীন ও তরুণ বয়সেই মানুষ আত্মবোধ লাভের জন্যে গুরুগৃহে বাস করতো, আর ওবুদ্ধি অর্জ্জন করবার পর গার্হস্থ্য জীবনে অধিকার লাভ করতো। শৈশবে যন্ত্রবদ্ধ শাসন, যৌবনে আত্মহারা প্রেম বা আসক্তির চর্চ্চা ও প্রৌঢ়াবস্থায় বিস্বাদ ও শুষ্ক জীবন যাপনের পর বৃদ্ধ বয়সে পরিপক্ক আধ্যাত্মিকতা লাভ যদি সম্ভব হ'ত—তা' হলে কাব্যরসিকদের উপর কোনো ক্রিটিকই অকালপক্ক আধ্যাত্মিকতার অত্যাচার করে' বদনামের ভাগী হতে চাইতেন না—চাই কি জীবনে ও কাব্যে ওদলকে মিথুন-রাগ-চর্চ্চার অবাধ অধিকার দিয়ে বাংলা দেশকে অনন্তযৌবনসম্পন্ন (!) করেই তুলতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে উপরে ওঠা বৈজ্ঞানিক প্রণালী হলেও অভ্রান্ত প্রণালী নয়। বিজ্ঞান যে কোন

কালেই 'আত্মাকে দর্শন' করে না, তার প্রমাণ বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্র সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চার পরও কাব্য রসিকেরা স্বাভাবিক রক্ত লোলুপতা প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ কচ্ছেন না।

কিন্তু কাব্য রসিকেরা Sex সম্বন্ধে যতই মানসিক বর্ব্বরতা প্রকাশ করুন না কেন, কবির 'আইডিয়াল' অবশ্যই বেয়াড়া রকমের কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ থেকে এবিষয়ে তাঁর কথা তুলে দিচ্ছি :—

Sex-psychology সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নানা লোকে নানা কথা চিন্তা করিতেছে; তাহা যে কোনও বিশেষ দলের দলপতির কথা, এমন মনে করিবেন না। আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকে মুক্তি মনে করি না। Sexকে অনিয়ন্ত্রিত উন্মত্ততায় পরিণত করিয়া সমস্ত জীবনকে আবিল করিয়া তোলা, এবং কল্যাণের নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় পথকে পরিহার করা আমি কখনই ভাল মনে করি না। আমি মুক্তিকেই চরম লক্ষ্য বলি,—সেই মুক্তি আত্মবিস্মৃত উন্মাদের নহে তাহা আত্মসমাহিত ধীরেরই অধিগম্য। * * * *

কবির কথার সঙ্গে কাব্য রসিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধ পাওয়া গেল—তবু একটি জিনিস এখানে দেখবার আছে। কবি "সমস্ত জীবনকে আবিল" করে তোলবার পক্ষপাতী না হলেও মুক্তিকে লক্ষ্যের আগায় ধরে' মানুষকে চলতে বলেন। এই চলার পথে যদি Sex সম্বন্ধীয় দু'একটা ছোটখাটো কলঙ্ক মুক্তিকামীর জীবনে ঘটে, তা' হলে কবি সম্ভবতঃ উপমা যোগাবেন—"কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা চন্দ্রের মধ্যেই থাকে, তারার মধ্যে নয়।" উক্ত উপমা থেকে "তারার" কথাটি তুলে দিয়ে যদি "সূর্য্যের" বসিয়ে দেওয়া যায়, তা' হলেও ওকালতীর মানে বদলে যায়—কেননা চন্দ্র যদি মুক্তিকামীর উপমা হয়, তা' হলে সূর্য্য হবেন মুক্তপ্রাণীরই উপমা। কবি রবীন্দ্রনাথ মুমুক্ষু,—অতএব কলঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে মুক্তিকে তিনি Sex-psychologyর আগায় ধরেছেন—সেই একই মুক্তিকে Sex-psychologyর গোড়ায় ধরলে সোনার চাঁদ ছেলেরাই নিষ্কলঙ্ক তপনের মতন হয়ে উঠতে পারে এবং কবিরাও উপমা অন্বেষণের দায় থেকে অব্যাহতি পান। সাদাসিদা ও অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য জীবনে অনেক মুক্তপ্রাণ নিষ্কলঙ্ক নরনারী খুঁজলে মেলে—কিন্তু মুক্তি প্রচার করতে করতে যখন আমরা পদমর্য্যাদা বাড়িয়ে তোলবার লক্ষ্যে ফিরি তখন পদমর্য্যাদায় ভ্রূক্ষেপহীন অনাড়ম্বর মুক্তপ্রাণতাকেই চিনে উঠতে পারিনে। সে যাই হোক্—যে মুক্তির অন্বেষণে কবি ফিরছেন যদি কখনও তা' মিলে যায়, তা' হলে তিনি দেখতে পাবেন যে এদেশের দাম্পত্য-নীতি মোটের মাথায় ঐ মুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে, আর সেই জন্যেই এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও একটা আশাতিরিক্ত শান্তি ও সহনশীলতা দেশে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। বলা বাহুল্য, আমি কলঙ্ক অসহিষ্ণু নই—এমন কি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যেন আমরা জীবনের ভুল, ত্রুটি, স্খলন ও পতনকে পরস্পর মার্জ্জনা করেই নিতে পারি; কিন্তু কলঙ্কী শশাঙ্কদের স্পর্দ্ধাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার পরামর্শ কাউকেই দিতে পারি নে। যা' আর্ষপ্রয়োগ হিসাবে উপেক্ষা করা চলতে পারে, তাকে নিয়ম হিসাবে চালানো হয়নি বলে আক্রোশ প্রকাশ করার নামই সত্য-বিদ্বেষ।

(৩)

আমি 'ফ্রি-লাভ' ব্যাপারটির পক্ষপাতী না হলেও 'মুক্তপ্রেম' ব্যাপারটির উপর Sex-psychology প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এই মুক্ত প্রেম বলতে কি বোঝায় তা' দেখা যাক্—

আনন্দ বা প্রেমের উৎসটিকে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-উপলক্ষ্যনিরপেক্ষ করে' নিজের মধ্যে পাওয়ার নামই প্রেমে মুক্তি বা মুক্ত-প্রেম লাভ করা। 'আনন্দের উৎসটী' নিজের মধ্যে থাকা যে একান্তই আবশ্যক, এ উপদেশ কবি রবীন্দ্রনাথই বারংবার দিয়েছেন—কিন্তু ঐ উপদেশের উৎস কবিসম্রাটের মুখে থাকলেও তাঁর বুকে যে উদ্দিষ্ট আনন্দের উৎস আছে এ-সাক্ষ্য কবির হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত উপন্যাসগুলির নায়ক-নায়িকা-চিত্রে দিতে চায়নি; এখানে পুরুষের প্রীতি নারীর অঞ্চল ও নারীর প্রীতি পুরুষের কোঁচার মুড়োর উপরই নির্ভর করেছে। বস্তুতঃ মুক্তির জমির উপর Sex এর চিত্র এঁকে দেখাবার সময় কবির বুক বরাবরই তাঁর মুখের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে এসেছে। শুধু তাই নয়, 'ভূমৈব সুখং' কথাটীর উপর রবীন্দ্রনাথ যে অর্থারোপ করেছেন তা' থেকেও দেখা যায় যে 'আনন্দের উৎস' কবির মুখে থাকলেও বুকে নেই। আনন্দকে নিজের মধ্যে পাওয়া মানেই সমগ্রকে পাওয়া, আর ঐ সমগ্রকে

যে পেয়েছে তার চিত্ত সন্তোষামৃত-তৃপ্ত হতেও বাধ্য; কিন্তু কবির অর্থারোপে ও বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছে এই যে বিশ্বগ্রাসী অসন্তোষ বা রাক্ষুসে 'ক্ষিধে' হচ্ছে যথার্থ সুখের। কবি বক্তৃতায় যাই বলুন, দেখা যাচ্ছে যে 'আনন্দ' 'প্রেম' বা 'মুক্তি' প্রভৃতি ভাবগুলিকে নিজের বাইরে posit করে' সেইদিকে চিত্তের চালনা করাই তাঁর নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—ফলে, শেষবয়সের স্বীকারোক্তি মূলক কবিতায় "কি দিয়ে যে হৃদয় ভরি" বলে' তাঁকে অনুতাপও করতে হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা হয় যে এ উপায়ে কবির মোহ বরাবরই 'মোহ'ই থেকে যাবে, এবং 'দ্রৌপদীর বস্ত্র সম' অসন্তোষই বেড়ে বেড়ে চল্‌বে—'মুক্তি' রূপে ও-জিনিষ কোনোকালেই জ্বলে উঠ্‌বে না। শুন্‌তে পাওয়া যায়, কোনো কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-লাভের নেশায় সারাজীবন কোশাকুশি ও পুষ্পচন্দনের আড়ম্বরময় চর্চ্চা চালিয়ে শেষটা মরেও ও-নেশা ছাড়্‌তে পারেন নি—ফলে, 'ব্রহ্মে'র স্থানে 'ব্রহ্মদৈত্য'ত্বই লাভ করেছিলেন! তা' ছাড়া প্রমথবাবু বলেন—"বিশ্বামিত্রের তপোবল আমাদের সকলের নেই; তিনিও যখন নূতন সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন, তখন আমরাও যে মোহকে মুক্তিরূপে জ্বালিয়ে তুল্‌তে গিয়ে নিরাশ হব, এতে আর সন্দেহ কি।"

কিন্তু যাক্ ও-কথা। Sex-psychology র সুষ্ঠু রূপ দেখ্‌তে হলে ঐ আনন্দকেই সর্ব্বাগ্রে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে, নিজের বাইরে কল্পনা করলে চল্‌বে না। যে প্রণালীর সাহায্যে এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তারই নাম হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। প্রেম-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা এটা নয়, পরন্তু এইটাই হচ্ছে গোড়ার কথা। ইংরাজীতে যাকে Self-love বলে, ভারতবর্ষীয় 'ব্রহ্মবিদ্যা' বল্‌তে ঠিক তা' বোঝায় না,—যদিও আসলে এ জিনিষও Self-love ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কোনো কোনো পাশ্চাত্য দর্শনে Self-loveকে যে-ভাবে ব্যাখ্যাত দেখা গিয়েছে তাতে মনে হয় যে নিজের ভিতরকার অহঙ্কারকে ভালবাসাই সেই সকল দার্শনিক মতে Self-love; এই জাতীয় Self-love এরই শেষ কথা হচ্ছে "কর্ত্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার" যা রবি বাবুর "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রচার করেছে। কিন্তু ভারতীয় Self-love 'ও-ধরণের ego-mania নয় এর অর্থ হচ্ছে নিজের ভিতরকার "নিরহঙ্কারকেই" ভালবাসা, আর এর শেষ কথা—"ভ্রাতৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।" প্রেমকে নিজের মধ্যে পাওয়ার পর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোনো বালাই যে আর থাক্‌তেই পারে না, এ-সত্য সহজেই অনুমেয়,—কিন্তু এর পর মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাটা সহজেই এসে পড়ে। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সাহায্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ প্রেমকে যথাযথ ভাবে চালনা কর্‌বার শক্তি ও সংযম তখন অনায়াসেই হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব্বে বলেছি, এই অবস্থাতেই নরনারীর সংসার-প্রবেশে যথার্থ অধিকার জন্মায়; সে মিলন দুঃখময় হয়ে ওঠ্‌বারও কোনো সম্ভাবনা থাকেনা—আর তা' এই জন্যে যে অনাসক্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রেম দুঃখ মাত্রকেই বহন ও অতিক্রম কর্‌তে সক্ষম।

এখন প্রচলিত-হিন্দুবিবাহ-প্রথার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে চক্ষুষ্মান মাত্রেরই নজরে পড়্‌বে যে এ বিবাহনীতিও ঠিক উক্ত 'আইডিয়ালের' উপর প্রতিষ্ঠিত। নরনারীর কাছ থেকে কোনোরকম ছোট প্রত্যাশা করে' এ আইডিয়ার ভিত গাঁথা হয়নি,—পরন্ত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ প্রথার কাঠামো গড়া হয়েছিল।

'I slept and dreamt that life was beauty
I woke and found that life was duty—'

এই 'motto'র মধ্যে জাগ্রত চেতনা থেকেই যে ও-প্রথা জন্মলাভ করেছিল তা' দেখলেই চেনা যায়। Sex এর বর্ত্তমান মতিগতি যদি ঐ কাঠামো থেকে আজ দূরে গিয়েই পড়ে থাকে, তবে সে দোষ কাঠামোর নয়—ঐ মতিগতিরই। এ অবস্থায় Sex এর হৃদ্‌রোগ দূর কর্‌তে গিয়ে সামাজিক discipline নষ্ট করা বা ঘটনার আকার বদ্‌লাতে চাওয়া নিতান্তই আনাড়ি চিকিৎসা হবে—অন্ততঃ আমার তো এই বিশ্বাস। "আমাদের প্রবৃত্তি আসক্তির ঘোড়ায় চড়ে চার পা তুলে ছুট্‌তে চাইছে অতএব তার জন্যে পথ প্রস্তুত কর"—এই যদি কবিদের দাবী হয় তা' হলে ক্রিটিকেরা তাদের দেবে, দেবার জন্যে অবশ্যই বল্‌তে পারেন—"আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না, তোমাদের ইতর চিত্তবৃত্তিকেই সংযত কর।" আসল কথা, নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে যে দুঃখ জমে উঠ্‌ছে, তার প্রতিবিধান ঘটনার আকারের দিকে নেই,—আছে সেই মনেরই প্রকারের দিকে যা' ঘটনাকে ঘটিয়ে তোলে।

অতএব, মানুষের কল্যাণ যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের সমগ্র চেষ্টা ঐ প্রকারকেই মনুষ্যোচিত করে দেবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠুক।

(৪)

কিন্তু আনন্দ বা প্রেমকে নিজের মধ্যে পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিম্বা তার দরকারও নেই এমন কথাও শুনতে পাওয়া যায়। একথা যদি সত্য হয়, তা' হলে অক্ষম ব্যক্তিরা সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজ্ঞার শাসনই অগত্যা শিরোধার্য্য কর্বে; এটা একটু কষ্টকর বলে আর কি করা যাবে; জঙ্গলের পথ আর কোন্‌কালে পানতুয়া খাওয়ার মতন সহজ হয়ে থাকে? ব্যবস্থা যেখান থেকে প্রচারিত হবে, সেখানে অক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করবার জন্যে আদর্শ-বিধিকে তো আর পঙ্গু করা যায় না! নরনারী যদি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তার চরম মনুষ্যত্বের মধ্যে নিজেকে সহজ করে' তুলতে না পারে—তা' হলে আদর্শ-বিধির বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করবার নীচতা থেকেও যেন অন্ততঃ নিজেকে বাঁচিয়ে চলে।

তা' ছাড়া, প্রচলিত দাম্পত্য-বিধির intellectual দিক্ যাঁদের চোখে না পড়ে বা emotion এর ঊর্দ্ধে যাঁরা চোখে ধোঁয়া দেখেন, আর একটী কথাও তাঁদের জিজ্ঞাসা করবার আছে। রুচি বা শিক্ষাদীক্ষার গরমিলে দাম্পত্য-জীবন যদি পীড়াজনকই হয়ে ওঠে, তা' হলেই বা দেহের দিকে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটাতে হবে কি হিসাবে? রুচি-বৈচিত্র্য যদি মনের ধর্ম্ম হয়, তা' হলে মনঃপীড়ার ঔষধ কি মনো-রাজ্যেই মিল্‌তে পারে না? বিশেষ বিশেষ রুচিস্তরের সমরেখায় অবস্থিত রুচিবান ও রুচিবতীদের সঙ্গে মানস-মিলনই চিত্ত সরস রাখ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

উত্তরে হয়তো জবাব শুনবো,—তারই বা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে কোথায়? আমরা যে অতিমাত্রায় পারিবারিক—সামাজিক তো বড় বেশী নই!

একথা পল্লীজীবনে হয়তো বড় বেশী সত্য নয়, কিন্তু মোটের মাথায় যে সত্য, তা' আমি মানি। প্রমথ বাবু যে প্রস্তাব করেছেন, "What we want to do is to apply our spiritual freedom to our social life" এ প্রস্তাবের সার্থকতা তখনই স্বীকৃত হবে, যখন "আত্মার সঙ্গে আত্মা মিল্‌লে দেহের সঙ্গেও দেহ মিল্‌বে" * এই খুনে বুদ্ধিটী থেকে কবিকুলের মস্তিষ্ক অব্যাহতি পাবে। আত্মা যে শুধু আসক্তি একেবারেই নয়, পরন্তু আসক্তির end, এ সত্য আমাদের মনে কেটে না বসা পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক জীবনের মুক্তে পারিবারিক জীবনের দ্বার মুক্ত করা নিরাপদ হবে না—অথচ এটা হওয়াও যে অত্যাবশ্যক, তাতে সন্দেহ নেই; কেন না, জীবনের সংস্পর্শে জাতীয় প্রতিভার বিকাশ যত সহজ হতে পারে, কেতাবের পাতা থেকে তত সহজ হয় না।

সে যাই হোক্—প্রেম এই কথাটীর মধ্যে কাম-লোক আর রূপ-লোককে ঘুলিয়ে ফেলেই যে আমরা Sex-psychologyকে বুদ্ধির মধ্যে জটিল করে তুলছি, আশাকরি তা' দেখানো গিয়েছে। Sex-সম্বন্ধে শিব-বুদ্ধি আর শিব-বাহনের বুদ্ধি যে অভিন্ন নয়, একথা যদি পরিষ্কার হয়ে থাকে, তা'হলে 'ধর্ম্মের ষাঁড়'কেই 'ধর্ম্ম' বলে, ভুল কর্‌বার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে উদ্ধার-লাভের চেষ্টায় কাব্য-রস যদিও বা একটু কমতি হয়, তবু রসিকেরা আত্মবশ হয়ে উঠ্‌তে পার্‌বেন।

শ্রদ্ধেয় মালঞ্চ-সম্পাদক মহাশয় তাঁর 'বিবাহ-বন্ধন' প্রবন্ধে সাধারণের সুখবোধ্য করে' Sex-psychology সম্বন্ধে যা' বলেছেন, তা'তে সকলদিকের কথাই অতি সুন্দর-ভাবে আলোচিত হয়েছে; তাঁর ঐ প্রবন্ধ ধীর বিবেচনা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে এতই চিত্ত-স্পর্শী ও সুসম্পূর্ণ, যে তারপর মালঞ্চে আর এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য না চালালেও ক্ষতি ছিল না। তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়' হিসাবে এটীকেও তাঁর চিন্তাধারার সহযাত্রী রূপে রক্ষা করা গেল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

---

* 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধ—[সবুজপত্র]

কে ?

ওগো বাঁশিতে আজ কেঁদে বেড়ায়
কাহার আকুল ডাক
সারা আকাশ ভ'রে
আমার হৃদয় যে আজ পাগল হয়ে
বাহির হতে চায়
কাহার অভিসারে।

ফুলের মাঝে গন্ধ হয়ে কে আমারে ডাকে
আমি পাই না কেন খুঁজে,
দূর আকাশে চপল হাসি
হেসে লুকায় মেঘে
আমি বুঝতে নারি কে যে।

আমার প্রিয় জনের হৃদয় মাঝে
প্রেমরূপে ব'সে
বাজায় মোহন বাঁশি,
আমি আকুল আলিঙ্গনে তারে
বাঁধতে চাহি বুকে
কেঁদে ফিরে আসি।

চুম্বনে চাই পান করিতে
প্রিয়ার অধর হতে
আমার মেটে না যে তৃষা,
আমায় আকুল করে পাগল করে
ফাঁকি দিয়ে যাওয়া
তোমার কেমন ভালবাসা ?

সারা জগত ভরে কেবল তোমার
আভাষ টুকু পাওয়া
আমার এই কি হবে সার ?
ওগো এ অভাগার প্রেমের পিয়াস
মিটবে না কি কভু
শুধু রইবে হয়ে ভার ?

শ্রীবিনোদ মোহন চক্রবর্ত্তী।

স্মৃতিস্তম্ভ।

তৃতীয়বার চেষ্টাতেও যখন বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন সংকল্প করিলাম আর বৃদ্ধপিতার কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থের ধ্বংস করিব না। বিশেষতঃ তিনি যখন পৌত্র পৌত্রীর মুখদর্শন করিয়াছেন তখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

পিতৃদেব আমাকে পুনরায় পড়িতে আদেশ করিলেন বটে, কিন্তু আমি সে আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। স্পষ্টই বলিলাম,—আমি আর পড়িব না, যাহাতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।

আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বাবা পাবনা জেলায় নলদীর জমিদারের একটি ক্ষুদ্রমহলে তহশীলদারের কার্য্য করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণ কোনরূপে নির্ব্বাহ হইত।

বৃদ্ধবয়সে তিনি একার্য্যও ভালরূপ চালাইতে পারিতেন না। জমিদার হরকান্তবাবু বাবাকে চাকরী ইস্তাফা দিতে বলিলেন। হাতে একটি পয়সা নাই, এ অবস্থায় চাকরী গেলে পরিজনবর্গ অন্নাভাবে মারা যাইবে। এচিন্তায় বাবা অধীর হইয়া পড়িলেন। দেশে পৈত্রিক যে জমাজমি ছিল তাহাও বাকী খাজনার দাবীতে নিলাম হইয়া জমিদার সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। অন্নচিন্তা পিতৃদেবের বড় বেশী দিন করিতে হইল না। হঠাৎ একদিন যমরাজা তাঁহাকে তলব দিলেন। তাঁহার সংসারের সকল যাতনার অবসান হইল।

আমি বাল্যকালে মাতৃহীন। মাতৃস্নেহ কিরূপ জানি

না। সকল স্নেহের আধার পিতৃদেবকে হারাইয়া চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম। সংসারে একমাত্র স্ত্রী মনোরমা ও দুইটী বালক বালিকা লইয়া আমি অকূলে ভাসিলাম। শিশুসন্তান দুইটীর মুখে একমুষ্টি অন্ন দিব, এসংস্থানও আমার ছিল না। গৃহে সামান্য যাহা কিছু আসবাব ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া দেশে যাওয়াই স্থির করিলাম। দেশে কোথায় থাকিব, ভিটায় ঘরখানি নাই! কে আমাকে আশ্রয় দিবে? আমার জীবনে মাত্র তিন-বার দেশে আসিয়াছি। এ হতভাগার দুঃখ কে বুঝিবে? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, আমাদের জ্ঞাতি উমা-কান্ত কাকার বাড়ী গিয়া উঠিব। তিনি অবশ্য আমাদিগকে তাঁহার গৃহতলে একটু স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। পরে যেভাবে হয় জীবনোপায়ের একটা পন্থা অবলম্বন করা যাইবে।

প্রাতে যখন ফরিদপুর ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিলাম, তখন প্রাণ আমার আনন্দে মাতিয়া উঠিল। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে কাদিরপুর অভিমুখে রওনা হইলাম। কাদিরপুর ফরিদপুর হইতে চারিক্রোশ পশ্চিমে যশোহর রোডের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আমি আমাদের ঐ পল্লীবাসে কোথায় থাকিব, কি উপায়ে অন্নের সংস্থান করিব, কিছুকালের জন্যে এ চিন্তা ভুলিয়া নির্নিমেষ লোচনে রাস্তার উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

"বাবুজী? এই তো কাদিরপুর, আসিয়াছি। কোন্ বাড়ী যাইবেন?" হঠাৎ গাড়োয়ানের প্রশ্নে আমার মোহ ভাঙ্গিল। আমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্তর করিলাম,—"উমাকান্ত রায়ের বাড়ী যাইব।" গাড়ী যথাস্থানে থামিল।

বৃদ্ধ উমাকান্তকাকা গৃহের বারেন্দায় বসিয়া তাম্রকূট সেবনে তৎপর ছিলেন। হঠাৎ আমাদিগকে দেখিয়া যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। আমার দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের গণ্ডস্থল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। তাঁহার অমায়িক স্নেহে দুঃখ অনেকটা লাঘব হইল।

উমাকান্তকাকার যত্নে ও চেষ্টায় পিতৃশ্রাদ্ধ কোনরূপে সম্পন্ন করিলাম। তিনি আমাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"মানুষ অবস্থার দাস। জানতো বাবাজী! স্বয়ং রামচন্দ্র বালির পিণ্ডদান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া-ছিলেন।" জ্ঞানবৃদ্ধের বাক্যে আমার হৃদয়ের যাতনা প্রশমিত হইল।

অভাব মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অনেক হাটাহাটি ও খোসা-মোদের পর ফরিদপুরের কালেক্টারীতে ৩০৲ টাকা বেতনে একটি চাকরী যোগাড় করিয়া লইলাম। প্রত্যহ বেলা ৮টার সময় গরম গরম দুইটি ভাত কোনরূপে উদরস্থ করিয়া পদব্রজে আফিসে রওনা হইতাম। আফিসে পৌছিতে কোনদিন একটু বিলম্ব হইলেই সেরেস্তাদার বাবুর চোক্ রাঙ্গানি ও ধমকের চোটে আমার উদরের অন্ন দুইটি চাউল হইয়া যাইত। পেটের দায়ে গোলামী করি, তাই নীরবে সকল সহ্য করিতাম।

কয়েকদিন একটু চেষ্টা করিয়া দুইটি 'প্রাইভেট টিউসনী' যোগাড় করিয়া লইলাম। ইহাতেও আমার মাসিক ২০৲ টাকা আয় হইতে লাগিল। প্রত্যহ আফিসের পর ছাত্র পড়াইয়া গৃহে ফিরিতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া যাইত। উমাকান্ত কাকা আমার আশায় বারেন্দায় বসিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিত।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া টাকা কয়েকটি আনিয়া উমাকান্ত কাকার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি সজল নয়নে বলিলেন, "বাবাজী! আমি টাকা গ্রহণ করিব না। তুমি রাখিয়া দাও। দেখ কোনরূপে রামকান্ত রায়ের ভিটায় প্রদীপ জ্বালাইতে পার কি না।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অবিশ্রান্ত নয়নজলে গণ্ড ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। (রামকান্ত রায় বাবার প্রপিতামহ উমাকান্ত কাকা ও বাবা এক বৃদ্ধ-প্রপিতামহের সন্তান)।

এইভাবে কিছুকাল কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের ফলে আমার কিছু টাকা জমিল। এখন পৈত্রিক ভিটায় বাস করার অভি-প্রায় উমাকান্ত কাকাকে বলায় তিনি সহাস্য বদনে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, একবার জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। তোমাদের বাড়ী ও জমাজমি জমিদার সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমি তৎপরদিন প্রাতে জমিদার মহাশয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। সজ্জন জমিদার মহাশয় বলিলেন,—"আমার

বকেয়া খাজনা ও নালিশের খরচের টাকা পাইলেই আপনার সম্পত্তি আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি।" আমি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরাইয়া লইলাম।

পৈত্রিক ভিটার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী কয়েকখানি গৃহ প্রস্তুত করা হইল। আমি শুভদিনে শুভক্ষণে সস্ত্রীক গৃহে প্রবেশ করিলাম। আজ আমার হৃদয় অব্যক্ত আনন্দে পরিপূর্ণ। উমাকান্তকাকা সজল-নয়নে আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—

"বাবাজী! আজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। এই মাটীর বলে কাদিরপুরের রায়েরা দোল দুর্গোৎসব বারমাসে তের পার্ব্বণ করিয়া গিয়াছেন। এখন সেই মাতা বসুন্ধরা কি শুধু তোমাদের পেটের দুইটী অন্ন দিতেও কুণ্ঠিতা হইবেন? বাবাজী! চাকরীতে পেট ভরে না। আবাদ কর। "আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ গান ধরিল—

"মন তুমি কৃষি-কায় জান না।
এমন মানব জমি রইল পতিত।
আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা॥"

বৃদ্ধের উপদেশ বাণী আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলাম।

এখনও আমি চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যেহেতু পয়সার অভাব। কয়েক বৎসর বেশ ফসল জন্মিল। পাট বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা আরও কিছু জমি করিয়া লইলাম। ভগবান্ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। আমার অদৃষ্ট ফিরিল। আমি চাকরী ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

"আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা" বৃদ্ধের বাক্য সফল হইল। বাস্তবিক আমার ভাগ্যে সোনা ফলিল।

এখন আমার জমি আবাদের জন্য ছয়জন কৃষাণ ও ৮।১০টী বলদ খাটে। আমার কিছুর অভাব নাই। গোলা-ভরা ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের শাক সবজী ফুল ফল, গোয়ালার গাভীর খাঁটী দুধ ঘৃত। "আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ" স্মরণ করিয়া কিছু কিছু অর্থও ব্যাঙ্কে জমা করিতে লাগিলাম। অঋণী অপ্রবাসী হইয়া সুখে সচ্ছন্দে আমার দিন কাটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এইরূপ সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া দশ বৎসর চলিয়া গেল। একদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখি অদূরে পেয়ারা গাছ তলায় ছিন্ন মলিন বসনে পরিহিত একটী মুসলমান যুবক বাহু মস্তকে দিয়া ভূমি শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে। যুবকের জীর্ণ মলিন দেহ, চোক কোঠরগত, আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সে যেন একবিন্দু করুণার ভিখারী হইয়া কাতর নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমি তাহাকে আসিতে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে ধীর পদবিক্ষেপে আমার নিকট আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাড়ী কোথায়?"

সে উত্তর করিল—ময়মনসিংহ জেলায় বরদিয়া গ্রামে।

"তোমার নাম কি?"

"রহিম খাঁ।"

"তুমি কি চাও?"

"আমি আপনার বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিব এই অনুমতি চাই মাত্র।"

রহিমের কথায় ও ভাব ভঙ্গিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলাম—এই রহিমখাঁকে আমাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লও রহিমও সেইদিন হইতে আমাদের বাড়ীর একজন হইয়া দাঁড়াইল।

রহিম আসার পর হইতে আর সাংসারিক বিশেষ কোন কার্য্য দেখিতে হয় না। সে দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করে। কোন কার্য্যেই তাহার মান অপমান বা ঘৃণা ছিল না। কর্ম্মই যেন তাহার জীবন। দিবারাত্রি এক সময়ও সে অবসর থাকিতে ভাল বাসিত না। সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। রৌদ্র বাতাস বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত তবু সেদিকে লক্ষ্য নাই। যেন মহাযোগী যোগে নিমগ্ন। সে আমার কিম্বা মনোরমার কোন আদেশ পাইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিত। কেন সে আমাদের জন্য শরীরের রক্ত জল করিতে প্রস্তুত আমি তাই সময় সময় চিন্তা করিতাম। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

রহিমের আর একটী দোষ বা গুণ ছিল, সে বড় বেশী গান গাহিত। সময় নাই অসময় নাই সর্ব্বদা তাহার মুখে

গান রহিয়াছে। আমি প্রথম কয়েকদিন তাহার এই অবিশ্রান্ত-গানে বিরক্তি অনুভব করিতাম বটে; কিন্তু যখন দেখিতাম রহিম মুসলমান হইয়াও শ্যামাবিষয়ক গানে অনুরক্ত এবং প্রত্যেক গানটী ভাবে বিভোর হইয়া নিজের অবস্থানুযায়ী গাহিতেছে তখন বিস্মিত হইয়া যাইতাম।

রহিমের কণ্ঠস্বর মধুর না হইলেও ভাবের মাদকতায় পথিকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিত। একদিন রহিমকে বলিলাম— রহিম! তুমি অনেকদিন আমার এখানে আছ, একদিন ও তো মাহিয়ানার টাকার কথা বল না। তোমার উপযুক্ত প্রাপ্য গ্রহণ কর।

"না বাবু টাকা দিয়া কি হইবে" বলিয়া রহিম গান ধরিল।

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদ্‌ছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

* * * * *

প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥

আর এক দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। রহিম পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ধানের বোঝা মাথায় লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। এমন সময়ে একটী বৃষ তাহাকে আক্রমণ করিয়া শৃঙ্গাঘাতে ভূমিশায়ী করিল। রহিমের উঠিবার শক্তি নাই। ক্ষত বিক্ষত দেহে রুধির ধারা বহিতেছে। এ অবস্থাতেও তাহার গানের বিরাম নাই। রহিম যেন সমস্ত যাতনা ভুলিয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে বসিয়া গাহিতেছে।

"আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুখ আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের ক্রিমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের ক্রিমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি! বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥"

অতিরিক্ত পরিশ্রমে রহিমের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। দেহে আর সে কান্তি নাই। জীর্ণশীর্ণ পাণ্ডু দেহে যেন মৃত্যুর আভা আসিয়া দাঁড়াইল। আমার নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও সে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে কাল কাটাইতে লাগিল। একদিন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া হাত ধরিয়া বলিলাম ভাই রহিম! তুমি আর পরিশ্রম করিওনা। পরিশ্রম করিলে তুমি মরিয়া যাইবে। রহিম সহাস্যবদনে আমার দিকে তাকাইয়া গান ধরিল।—

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূতপ্রেত হবি,।
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাষ, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্যগণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
একা ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে॥
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

আমি রহিমের ভাবতরঙ্গ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। তাহার অঙ্গে আমার হস্ত স্পর্শ হওয়া মাত্র বুঝিলাম, তাহার বেশ জ্বর রহিয়াছে। এ জ্বরের বিরাম ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটু কাস দেখা দিল। আহারের রুচিও কমিয়া আসিল। কৃষ্ণ পক্ষের শশিকলার ন্যায় রহিমের সৌন্দর্য্য ও শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম বটে, কিন্তু হতভাগ্যের মুখে হাসি ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। যেন তাহার হৃদয়ে কত আনন্দ। রহিম আমার জন্য দেহপাত করিতে বসিয়াছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সহর হইতে সুযোগ্য চিকিৎসক আনিলাম। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ভীষণ ক্ষয়রোগ রহিমকে আক্রমণ করিয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু হায়! রহিমের অধরপ্রান্তে আনন্দরেখা নৃত্য করিতে লাগিল। যথাসাধ্য যত্নে রহিমের চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু সে এক বিন্দু ঔষধও গ্রহণ করিল না। আমার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল।

এখন আর রহিমের উঠিবার শক্তি নাই। সে আপনার মনে বিছানায় পড়িয়া কখন উচ্চকণ্ঠে কখনও বা মৃদুকণ্ঠে মায়ের নাম গাহিয়া কাল কাটায়। একদিন প্রাতে দেখিলাম রহিমের জ্বরের বেগ বড় প্রবল হইয়াছে। সে করযোড়ে মুদ্রিত নয়নে বিছানায় পড়িয়া গদগদকণ্ঠে গাহিতেছে।

"মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লাম আগে ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমার কমি খরচ বেশী, তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে, কেবল কালী নাম
ভরসা আছে॥

গান থামিয়া গেল। রহিম মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া পুনরায় গান ধরিল।

"মায়ের চরণ তলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমার, বিদায় দিলেও নাহিকো যাব।
আমি দুইবাহু প্রসারিয়ে, চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥

গাহিতে গাহিতে অবিরল অশ্রুধারায় রহিমের গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ রহিমের বদনমণ্ডলে বিকাশ পাইল। আমি অবাক্ হইয়া সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম এবং মনে মনে রহিমকে প্রণাম করিলাম।

রহিম চোক মেলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে "হরেন্দ্র মনোরমা!" মনোরমা! বলিয়া ডাকিল। হঠাৎ এইরূপভাবে আমাদের নাম ধরিয়া ডাকায় আমার হৃদয়ে বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার হইল। আমি নিকটে অগ্রসর হইলাম। রহিম বলিল, ভাই হরেন্দ্র! মনে করিও না আমি প্রলাপ বকিতেছি। মনোরমাকে ডাক। তোমরা উভয়ে আমার নিকটে বস। আজ এই অন্তিমকালে প্রাণ খুলিয়া আমার দুঃখময় জীবন কাহিনী তোমাদের নিকট বলিতে বলিতে ইহধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করি।

আমি ও মনোরমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রহিমের নিকট গিয়া বসিলাম। রহিম আমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল।

ভাই! এই দীর্ঘ সময়েও আমাকে চিনিতে পার নাই। বাল্যকালে তুমি ও আমি পাবনায় একস্কুলে একশ্রেণীতে পড়িয়াছি।

সে অনেকদিনের কথা। আমার প্রকৃত নাম বিনোদ বিহারী সরকার। বাবা পাবনায় কোন জমিদারের আমমোক্তার ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই আমি বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করি এবং বিবাহ করিবার জন্য একটু অধীর হইয়া পড়ি। পিতৃদেবও পুত্রের এতাদৃশ ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না। তিনিও পুত্রবধূর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন অপরাহ্নে ঐ সতী পতিব্রতা তোমার গৃহলক্ষ্মী মনোরমা দেবী বালিকাবয়সে আমাদের বাসার পাশ দিয়া স্কুল হইতে পিতৃগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। আমি গৃহ হইতে সেই অপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলাম। জানিতাম ইনি পেস্কার রাধাকান্ত বাবুর দুহিতা। সুতরাং ইহার পাণিগ্রহণ আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি বিবাহ করিতে হয় তবে ঐ মনোরমাকেই বিবাহ করিব। নচেৎ বিবাহের সাধ এজীবনের মত বিসর্জ্জন দিব। বাবা আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুত্রের ধনুর্ভঙ্গপণ, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া একদিন রাধাকান্তবাবুর নিকট তাঁহার কন্যারত্নকে ভাবিপুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিলেন। রাধাকান্তবাবু বাবার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু বাবা কিছুতেই ছাড়িলেন না। পুনঃ পুনঃ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাকে অপমান করিয়া বিদায় দিলেন।

সেই দিনই ঘটনাটী আমার কর্ণগোচর হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যেভাবে হউক বাবার অপমানের প্রতিশোধ নিশ্চয় গ্রহণ করিব। কাহাকেও কিছু বলিলাম

না। তুষানলের ন্যায় প্রতিহিংসানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগে পিতৃদেব ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সংসারে আমার-আমার বলিবার আর কেহ ছিল না। তহবিল তসরূপে বাবা অনেক টাকা দেনা হইয়াছিলেন।

আমাদের সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল দেনার জন্যে নিলাম হইয়া গেল। আমি পথের ফকির হইয়া বাহির হইলাম।

কিছুদিন পরে একদিন জানিতে পারিলাম রাধাকান্ত বাবু পেন্‌সিয়ান লইয়া বাড়ী গিয়াছেন। আগামী পরশ্ব তোমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ। কথাটা শুনিবামাত্র পৃথিবী যেন আমার তলদেশ হইতে সরিয়া গেল। দারুণ শেলাঘাতে আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। পিতৃ-অপমানের প্রতিহিংসানল হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিবাহের দিন একখানি তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছুরিকা গোপনে সঙ্গে লইয়া রাধাকান্তবাবুর গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম এবং যথাসময়ে বরযাত্রিগণের সঙ্গে মিশিয়া বিবাহস্থলে প্রবেশ করিলাম। যখন রাধাকান্তবাবু তোমার হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যারত্ন সম্প্রদান করিতেছিলেন, তখন আমি অদূরে দণ্ডায়মান। সে সময়ে আমার হৃদয়ের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা এই অন্তিম সময়ে তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? কন্যাসম্প্রদান করিয়া রাধাকান্তবাবু যখন বাহিরে যাইতেছিলেন, আমি তখন তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম এবং সুযোগ বুঝিয়া সেই বস্ত্রান্তরে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সবলে তাঁহার বক্ষে আঘাত করিলাম। তিনি চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাহার পর কি হইল জানি না। আমি দ্রুতপদবিক্ষেপে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। কেহ আমার পশ্চাদনুসরণ করিল বলিয়া মনে হইল না। আমি বরাবর মাঠ পার হইয়া পদ্মার কুল ধরিয়া চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে ঘাটে একখানি ডিঙ্গি নৌকা দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং স্রোতের অনুকূলে নৌকা বাহিয়া পদ্মার মাঝখানে উপস্থিত হইলাম। প্রবলস্রোতে নৌকা তীরবেগে ছুটিল। আমি নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া খরস্রোতা পদ্মা কু'লকু'ল্ ধ্বনিতে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। মাঝে ক্ষুদ্রতরণীতে আরোহী হতভাগ্য একা আমি। জগতে আমার কেহই নাই। জানিনা কতক্ষণ এইভাবে চলিলাম। পরিধেয় বসন ও ছুরিকাখানি পদ্মার গভীর জলে সবলে নিক্ষেপ করিলাম। হঠাৎ মনে উদয় হইল—এজীবনে আর কাজ কি? মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। কুল্‌কুল্ ধ্বনিতে পদ্মাও যেন আমার হৃদয়বাণীতে সায় দিল। আমি আর চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। মাতর্গঙ্গে! বলিয়া অগাধ জলে ঝাঁপ দিলাম।

কিছুকাল স্রোতের অনুকূলে গা ভাসাইয়া চলিলাম। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। তাহার পর যে কি হইল বলিতে পারি না।

যখন আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন চোক মেলিয়া দেখি বালার্ককিরণ উদ্ভাসিত পদ্মাসৈকতে আমি শায়িত। কয়েকজন মুসলমান অগ্নি জ্বালাইয়া আমাকে স্বেক দিতেছে। আমার শরীর অবসন্ন। কথা বলিবার শক্তি নাই। আমি পুনরায় চোক বুজিলাম। কিছুক্ষণ স্বেক দিবার পর উহারা ধরাধরি করিয়া আমাকে নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে লইয়া গেল। আমি যাহার একান্ত যত্ন ও চেষ্টায় জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহার নাম মামুদ আলি সেক। আমি তাহার নিকট মুসলমান রহিমখাঁ পরিচয় দিয়া তাহার আশ্রয়ে রহিলাম। সেও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। দীর্ঘকাল তাহার আলয়ে জীবনযাপন করিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম আজীবন ঐ ভাবে কাটাইব। কিন্তু হায়! হঠাৎ দারুণ কলেরায় একদিন স্ত্রীপুত্রগণ সহ মামুদ আলি ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তাহার সাধের সাজান বাগান শ্মশানে পরিণত। আমি সেই শূন্য শ্মশানে আর থাকিতে পারিলাম না। তাই আবার ছুটিয়া তোমাদের দ্বারে আসিলাম। রাধাকান্তবাবুর একমাত্র তোমরাই বর্ত্তমান। মনে সংকল্প করিয়াছিলাম জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটাদিন তোমাদের দাসত্ব করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আজ আমার ভবলীলা সাঙ্গ হইতে চলিল। জানিনা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কিনা।

রহিম কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া কাতর নয়নে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং পুনর্ব্বার

মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ক্রমে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাহার বদন মণ্ডলে প্রকাশিত হইল। রহিম ঊর্দ্ধ নয়নে করযোড়ে গদগদ কণ্ঠে গাহিল—

"দে মা স্থান শান্তি নিকেতনে।
দয়াময়ী মা তোর পুণ্যময় অভয় চরণে॥
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপভারে ভারাক্রান্ত,
মতিভ্রান্ত পড়ে ভব বনে॥"

রহিমের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। স্থির দুই নয়নের দু'টী ধারা গণ্ডবাহিয়া আমার উরুদেশ সিক্ত করিল। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। আমি রহিম, রহিম, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, সাড়া পাইলাম না।

* * * * * *

ঐ যে যশোহর রোডের পার্শ্বে আমার পুষ্করিণীর চালায় স্তম্ভটী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, উহা রহিমের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারই সমাধির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত।

টুক্‌রী।

কাঁঠাল ত পাড়াগেঁয়ে কৃসাণের মত
স্থূল সুপুষ্ট দেহ, অচিক্কণ রূপ,
এক ঘরে বাস করে পরিজন শত
প্রাণ তার আতিথেয় সারল্যের রূপ।

নারিকেল রুগ্নক্ষীণ তপোক্লিষ্ট দেহ
ব্রাহ্মণের মত তার হৃদয় গম্ভীর,
দেহ শুষ্ক-বক্ষভরা স্বরগের স্নেহ—
টলটল সুশীতল করুণার নীর।

বুনো লিচু সেও হায় না রেল না কুল
টেরিকাটা অতি জ্যাটা গোসাঁইএর ছেলে,
গ্রামের বিলাতী কুল পোকায় আকুল
সহরের লোক যথা পাড়াগাঁয়ে গেলে।

জাম্ সে ত আমার মতন দীন কবি
স্বল্প রস তাও কসা শুধু আঁঠি হায়
রাখালের প্রিয় সে যে দীনতার ছবি
রাখিলে থাকেনা যাহা দুদিনে ফুরায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গৃহহীন।

সেবার আই, এ পরীক্ষা দিয়া মহীন্দ্র যখন গ্রামে আসিয়া হাজির হইল তখন গ্রামের ছেলেরা তাহাকে ধরিয়া বসিল—"মহীন্ দা, একটা থিয়েটার পার্টি[illegible]াল, মহীন্দ্র কহিল—"থিয়েটার ত করতে চাস্. কিন্তু সে কর্‌বেই বা কে, আর দেখ্‌বেই বা কে?" ছেলেদের মধ্যে হরিদাস লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"হেঃ, ভারিত বলচ তুমি মহীন্‌দা, সহুরে লোক বলে ভেবনা যে তোমরাই সব পার, সব জান, কিন্তু এই গ্রাম্য ভবঘুরের দলটিকে ছাড়িয়ে যাওয়া কিন্তু অনেক সহুরে লোকের সাধ্যিই নয় তা বলে রাখ্‌চি—আচ্ছা সেজন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না, ও হয়ে যাবে।" এই মহীন্ দাদাটিকে কোন কাজের দিকে একবার ঝুকাইয়া দিলে সেকাজ যে হাসিল হইবেই সে বিষয়ে ছেলেদের বিন্দুমাত্র সংশয়ও ছিল না; তাই অত্যুৎসাহী যুবকদলটি আসিয়া মহীন্দ্রকে পাইয়া বসিল, মহীন্দ্র কহিল "তা করতে চাস্

করবি, আমি শুধু দেখব বই ত নয়" হরিদাস অভিমানের সুরে বলিল,—"তা বই কি মহীন্ দা, কোন্‌দিন কোন্ কাজটা তোমাকে ছাড়া করেছি বল ? জেনে শুনে নিজকে সব থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে আমাদের মনে কষ্ট দিলে, সেকি খুব ভাল হবে, না তাতে তুমিই মনে শান্তি পাবে ?" মহীন্দ্র হাসিয়া কহিল,—"আচ্ছা সব ঠিক্ ঠাক্ করগে, আমার পার্টটুকু আমাকে দিয়ে যাস্"। হরিদাস কহিল—"তা হলে ওবেলা একবার এদিকে এসো মহীন্ দা, তোমাকে ছাড়া ত কিছু হবে না," বলিয়া উৎসাহী দলটি লইয়া একটা বাঁশের শাঁকোর এপাড় হইতেই ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘ অবসরপ্রাপ্ত যুবকদের থিয়েটারের মহলায় 'মালঞ্চী' মুখরিত হইয়া উঠিল; স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে মহলা চলিতে লাগিল, সেদিন হরিদাস মুখে যত বড়ই কথা বলুক না কেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল তাহার বিপরীত। মহীন্দ্র মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল, যে শৈব্যা সাজিবে তাহাকে নিয়া, একেত তাহার গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকমের মোটা, তার উপর মহীন্দ্রের হাজার নিষেধ সত্বেও ছেলেটা সখি'কে 'ছকি' বলিয়াই বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, মহীন্দ্র ত্যক্ত হইয়া কহিল—"একি যাত্রা পেয়েচিস্ নাকিরে ? কিহে হরিদাস, এই নিয়েই কি বুক ফুলিয়ে জাঁক করছিলে ?" হরিদাস জবাব দিল—"ও হয়ে যাবে মহীন্ দা, মানুকে ত আর কোন দিন প্লে করেনি, এই মানুকে, আবার বল না শোন শোন মহীন্ দা, এবার ও নিশ্চয়ই পারবে।" মাণিক কাশিয়া কুশিয়া গলা ঝাড়িয়া কহিতে উদ্যত হইলেই মহীন্দ্রের ভাইয়ের মেয়ে মলিনাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই চুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, হরিদাস অসহিষ্ণু হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল "বসলি যে মানুকে ? কিরে মলিনা, এই রৌদ্দুরে কেনরে ?" মলিনা জবাব না দিয়া মহীন্দ্রের কাছে গিয়া কহিল, "চল ছোটকাকা, বাবা ডাকচেন," খপ্ করিয়া মহীন্দ্রের ডান্‌হাতটি চাপিয়া ধরিয়া হরিদাস কহিল "আর একটু থেকে যাও মহীন্ দা, যা বা মলিনা বলগে যে ছোটকাকা এক্ষুনি যাচ্ছে" মলিনা কহিল, "নাগো, এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে, কে একজন ঠাকুর এসে বসে রয়েচে যে," মহীন্দ্র উঠিয়া কহিল "চল্লুম ভাই, পারি ত এক্ষুনি ফিরে আস্‌ব।" হরিদাস দুঃখিত হইয়া কহিল, "যাচ্ছ যাও মহীন্ দা, কিন্তু মনে থাকে যেন যে সবই তোমার উপর নির্ভর করচে, আমরা কিন্তু তোমার জন্য এইখানেই বসে থাক্‌ব।" মহীন্দ্র কহিল, "আসচি ভাই, একান্ত না পারি ওবেলা দেখা হবে" বলিয়া মলিনার হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া বাহিরের ঘরে পা দিতেই মহীন্দ্রের পিতা বলিয়া উঠিলেন "এই যে এসেচিস্ বোস্—এই দেখুন কালী দা, ওকে ত ছেলে বেলা থেকেই দেখচেন।" মহীন্দ্র দেখিল পিতার নিকটে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ। মহীন্দ্র নিকটে যাইয়া ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল, কিছু সময় পরে অপরিচিত ব্রাহ্মণটি কহিলেন—"যাও বাবা, সারাটা বছর খেটে খুটে এসেছ একটু আমোদ প্রমোদ কর্‌বে বৈকি।" মহীন্দ্রও আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া গেল। বৈশাখের খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সেই খররৌদ্র মাথায় করিয়া মহীন্দ্র আবার সেই থিয়েটারের মহলাতেই ফিরিয়া চলিল। যেখানে পথের মাঝে ছোটবেলার সেই অতবড় বট-গাছটা কাত হইয়া পড়িয়াছিল সেইখানে আসিয়া মহীন্দ্র ফিরিয়া দেখিল কে একটা ছোড়া তাহারই নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিতেছে, মহীন্দ্র বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইতেই অতুল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল,—"গলাটা প্রায় ভেঙ্গে ফেলুলুম, একটা ডাকও কি শুন্‌তে পাওনি মহীন্ দা ?" মহীন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল "কেনরে অতুল ?"

মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া হাঁপ ছাড়িয়া অতুল কহিল, "ঐ যে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েচে মনাদিদি, তোমাকে ডাক্‌তে বলে দিলে—এস।" মহীন্দ্রের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না, আজ সে অনেক দিনের কথা, যেদিন সে ঐ একটি মাত্র নামের সঙ্গেই বিশেষ করিয়া পরিচিত ছিল, ঐ একটি মাত্র প্রাণীর মনস্তুষ্টির জন্য আম পাড়িয়া, ফুল কুড়াইয়া তাহার দীর্ঘ অবসরের অলস মধ্যাহ্নগুলি কর্ম্মময় ও মধুময় হইয়া উঠিত। তারপর প্রায় ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে, বহুদিনের অদর্শনে সেত সবই ভুলিয়া গিয়াছে। অতীতে বাল্যের খেলাঘরে সে যে সুখের খেলা রচনা করিয়াছিল তাহা ত অনেকদিন আগেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, তবু আজ এই একটা অপ্রত্যাশিত আহ্বানে সেই ভাঙ্গা চুরা ঘরখানি আবার নূতন হইয়া উঠিল, সেই লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া মুহূর্ত্তে প্রাণটাকে একটা অজানা পুলক-প্রবাহে কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়া জোয়ার জলের মতনই

আবর্ত্ত রচিয়া বহিয়া গেল। মহীন্দ্র খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করিল—"কে দাঁড়িয়ে আছেরে অতুল?" অতুল জবাব দিল "মনাদিদি," মহীন্দ্র বলিল—"কেন ডাক্‌চে জানিস্ কিছু?" অতুল কহিল—"তা কেমন করে জান্‌ব মহীন্ দা, তোমাকে ডাক্‌তে বলে দিলে তাই ছুটে এলুম এস না ঐ যে রোদ্দারে দাঁড়িয়ে রয়েচে" বলিয়া মহীন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। নিকটে পৌছিতেই মহীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কিরে মন্টু, এতবড় হয়েচিস্? কই বাড়ী এলুম শুনেত একটিবার দেখাও করলিনে, একটা প্রণামও করলিনে, সব ভুলে টুলে গেলি নাকিরে?" নত হইয়া প্রণাম করিয়া নির্ম্মলা কহিল—"বাড়ী যে এসেচেন তা শুনেচি, কিন্তু বাবার অসুখ বলেই দেখা কর্‌তে পারিনি।" মহীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোর বাবার অসুখ? কি অসুখ তাঁর?" ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ম্মলা জবাব দিল—প্রায় একমাসের উপর হ'ল ম্যালেরিয়ায় ধরেচে, এখন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পর্য্যন্ত পারচেন না, বাড়ী এসেচেন শুনে একবার ডাক্‌তে বললেন।" নির্ম্মলার চক্ষু ভিজিয়া আসিতেছিল দেখিয়া মহীন্দ্র কহিল—"সে খবর ত পাইনি মন্টু, তা' নাহলে বাড়ী এসেইত তোদের খবর আগে নিতুম, আমি ভেবেছিলুম তোরা তোর বাবার সঙ্গে রংপুরেই আছিস্। আমি যেন না জেনে নাই বা এলুম, খবর তত্ত্ব নাই বা নিলুম, কিন্তু তোরা ত আমাকে একটিবার ডেকে পাঠাতে পার্‌তি" মহীন্দ্রের এই অভিমান পূর্ণ অভিযোগটুকু নির্ম্মলার বিষণ্ণ মুখের বেদনার ছায়া মুছাইয়া দিয়া কি যেন কিসের জন্য রাঙ্গা করিয়া তুলিল, কিন্তু এর উপর আর জবাব দেওয়া চলে না বলিয়াই নির্ম্মলা অন্যদিকে ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মহীন্দ্র কহিল—"চল"—পথে চলিতে চলিতে মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"তোর বাবার অসুখ কিন্তু চিকিৎসা করে কে?" সহসা নির্ম্মলার মুখ খান বিবর্ণ হইয়া গেল, কোন রকমে নিজকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—"কেউ না"—নির্ম্মলার ধরাগলায় এই "কেউ না" মহীন্দ্রের প্রাণে দারুণ শেলের মতই বিঁধিয়া ঠেকিল, উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?" তেমনই ভাবে নির্ম্মলা কহিল—"বিনিপয়সায় ত কেউ আস্‌তে চায়না, গরীব দুঃখীকে ভগবান এমনই বিড়ম্বিত করে পাঠিয়েছেন যে মরবার সময়টাতেও তারা এক কৌটা অসুধ খেতে পায় না" বলিয়া নিজের চক্ষু মুছিয়া ফেলিল, মহীন্দ্র কোন কথা কহিল না কিন্তু নির্ম্মলাদের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"যদি জীবনভরে শুধু দুঃখই পেতে এসে থাকিস ত মুখ বুজে সব সয়ে যাস্, মিছে ভগবানের উপর অভিমানে দুঃখের বোঝা আরও ভারী করে তুলিস্ নে যেন। এইটে যেন মনে থাকে যে এই যে তাঁর বঞ্চনা এর মধ্যেও তিনি তোর জন্য অনেকখানি সঞ্চয় করে রেখেছেন," বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অদূরে শয্যার উপর নির্ম্মলার পিতার কঙ্কালসার দেহটাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, মহীন্দ্র রোগীর পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিয়া কহিল—"চক্কোবত্তি খুড়া, আমাকে চিন্‌তে পারেন?" রোগী চক্ষু মেলিয়া কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"মহীন্ না?" মহীন্দ্র কহিল—"হাঁ খুড়া, এখন কেমন আছেন?" রোগী মুখ বিকৃত করিয়া বুঝাইল যে ভাল না, মহীন্দ্র কহিবার মতন আর কিছু না পাইয়া হাত পাখাটা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল, রোগী ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, মহীন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। যে গৃহে একদিন সচ্ছলতার অভাব ছিলনা সেই গৃহে আজ দরিদ্রের শতকোটি চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, গৃহের বহুমূল্য আসবাবগুলি কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিল না, নির্ম্মলার মাতা যোগমায়াকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই মহীন্দ্র উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, "থাক্, থাক্ বাছা বলিয়া হাতের বার্লির বাটিটা নীচে রাখিয়া কহিল—"ভাল আছিস ত রে মহীন্?" মহীন্দ্র কহিল—"তেমন কোন অসুখ নেই খুড়িমা, একরকম ভালই আছি," যোগমায়া তক্তপোষের একধারে বসিয়া কহিল, "দেখ্‌ছিস্ ত ভগবান কি বিপদেই ফেলেছেন, একমাসের উপর হল ম্যালেরিয়ায় ধরেচে, প্রথম প্রথম জ্বর নিয়েই রোগী-বাড়ী হাঁটাহাটি করতেন, নিষেধ শুন্‌তেন না, শেষে যখন রোগে শক্তিহীন করে দিলে তখন উপায়ান্তর না দেখে বাড়ী নিয়ে এলুম, বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে কেই বা আমাদের দিকে ফিরে চাইবে, নানান্ কথা ভেবেইত দেশে ফিরে এলুম, ঘরে যা কিছু ছিল তা বেচে কিনে ত এই একটা মাসের উপর চালিয়েছি, কিন্তু এর পরে যে কি উপায় হবে তাত ভেবে পাচ্ছিনে।" মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া কহিল,—"এখন

ভাবছি এখান থেকে সেখানে থাকাই ভাল ছিল, সেখানে পরের কাছে হাত পাত্‌তে ত আমার তেমনি লজ্জা হোত না যেমন আমার নিজের দেশে এসে আপনার লোকের কাছে হচ্ছে, তার উপর লোকে যে টিট্‌কারী দেয় সেইটেত কিছুতেই সইতে পারছিনে মহীন্‌।" বলিয়া দুইচক্ষু মুছিয়া ফেলিল, মহীন্দ্র কহিল—"জানি সবই খুড়ীমা, আজকাল পরই যে বেশী আপনার হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু এই দুঃখটা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে যে এতকষ্টের ভেতরে থেকেও তোমরা একবার আমাকে ডেকে পাঠাওনি, আমি কি এতই অকর্ম্মণ্য যে তোমাদের কোন কাজেই লাগ্‌তে পারিনে ?" যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কিন্তু কোন্ মুখেই বা তোকে ডেকে পাঠাই বল দেখি, জানিস্‌ত বাবা কর্ত্তার সঙ্গে তোর বাবার সঙ্গে সেই যে ৪।৫ বৎসর আগে ঝগড়া হয়ে গেল সেই হতেই ত আমি সব অধিকার হারিয়ে বসে আছি, একবার ভাবলুম তুই বড় হয়ে সেই ছেলেবেলার সব ভুলেটুলে শেষে যদি সেই খুড়ীমারই অপমান করে বসিস্। কিন্তু যত কিছুই ভাবিনা কেন এটা ঠিকই জান্‌তুম যে কর্ত্তাদের মনে যাই থাকনা কেন, তুইত আমার কোলে পিঠে গড়া মহীন্, তুই আর কিছু অধর্ম্ম করবিনে, তাই তুই এসেছিস্ শুনে শেষে মেয়েটিকেই পাঠিয়ে দিলুম— কইরে মঠু এদিকে এসে তোর মহীন্‌দাকে একটা পান দিয়ে যারে" যতদূর সম্ভব মাথা নীচু করিয়া ঘরে ঢুকিয়া নির্ম্মলা পান সাজিতে বসিয়া গেল, মেয়ের দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"মেয়েও ত' চৌদ্দতে পা দিল, কি দিয়ে যে কি করব ভেবেই পাইনা মহীন্, ঐ যে বলে বিপদ্ একা আসে না আমারও হয়েচে তাই, ওঁর যদি এমন না হত, ত ভাববার আর কি ছিল ? তা যেমন কপাল করে এসেছি তেমনত।" নির্ম্মলা পান সাজিয়া মহীন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যোগমায়া কহিল—"এত যে দুঃখ পাচ্ছি তবু মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস্ বাবা ? মনে হয় যিনি এ সব দিচ্ছেন তিনিই একদিন এ সবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবেন, তাইতেই ত সব তুচ্ছ করে বুক বেঁধে বসে আছি।" মহীন্দ্র কহিল—"তাই থেকো খুড়ীমা, যেটুকু নিয়ে আছ সেইটুকুই তোমাকে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করবে।" তারপর প্রায় দশমিনিটের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না, হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মহীন্দ্র কহিল—"চল্লুম খুড়ীমা," যোগমায়া কহিল—"আস্‌লি ত এত শীগ্‌গীরই চলে যাচ্ছিস্ কেন, উনিও ত ঘুমুচ্ছেন, কিসের জন্য ডাকলেন তা একবার শুনে যাবিনে ?" মহীন্দ্র কহিল—"সে কথা শুন্‌বার সময় হবে খুড়ীমা, কিন্তু তোমরা মা আর মেয়েতে মিলে যে খুড়োকে বিনি চিকিৎসায় মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করে তুলেচ এ'ত আমি সইতে পারছিনে, আমি চল্লুম ডাক্তার ডাক্‌তে" বলিয়াই মহীন্দ্র ঘরের বাহির হইয়া গেল, গৃহের মধ্যে একটি মাতৃহৃদয় যে তাহাকে পরম স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছিল ও আর একটী তরুণ হৃদয় যে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হইয়া বারংবার তাহারই পায়ের নীচে লুটাইয়া পড়িতেছিল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

(২)

সেদিন রাত্রে আহারে বসিয়া মহীন্দ্র চেঁচাইয়া উঠিল "কইগো মেজ বৌঠান, একবার এদিকে এস না।" এক বাটি দুধ লইয়া মেজ বৌঠান মোহিনী, রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল, কিছুই ত খেলেনা ঠাকুরপো" বলিয়া হাতের বাটিটা নীচে রাখিয়া কহিল— "আর দুটি খাও", মহীন্দ্র কহিল—"আর কত খাব বল, এর বেশী ত কোনদিন খাইনে বৌঠান, বাড়ী এলেই যা দুটো খাই, তা না হলে কল্‌কাতার খাওয়া যদি চক্ষে দেখ্‌তে ত দুঃখু করতে, না হয় রান্না ভাল, না আছে আদর যত্ন, যাই বল বৌঠান্ তোমাদের হাতধোয়া জলটুকুরই অশেষ গুণ, নইলে সেটা উড়েবামুন হাজার চেষ্টা করেও ত ঐ হাতধোয়া জলটুকুর মতন রান্না করতে পারে না।" মোহিনী হাসিয়া কহিল—"দুদিন পরে আর একখানি নতুন হাতের ধোয়াজল এ বৌঠানদের হাতধোয়া জলের চেয়ে আরও ভাল লাগবে ঠাকুরপো, নয় কি ?" বাকী দুধটুকু গিলিয়া ফেলিয়া মহীন্দ্র কহিল "তা বল্‌তে পারিনে বৌঠান, তোমার মতন এতবড় একটা ভবিষ্যদ্বাণীত করতে পারছিনে, ভাল হোক্ মন্দ হোক্ সে বিচার পরে করা যাবে কিন্তু বড় বৌঠানকে যে দেখ্‌ছিনে" ; মোহিনী কহিল "ভাশুর ঠাকুরের অসুখ, তাই ঘরেই আছেন," মহীন্দ্র বলিল—"রোগ যেন দাদাকে ছাড়তেই চায়না, বলি একবার চেঞ্জে যান্, তা বলে কি জান ? বলেন 'বাড়ী ফেলে যাই কি করে', কিন্তু কথাটাও ঠিক্, মেজদাদা ত সহরে মক্কেল নিয়েই ব্যস্ত ; বাকী আমি—

আমাকে ত নির্ব্বাসিত করেই রেখেচ, বাড়ীতে একজন না থাক্‌লেই বা চলে কি করে? কিন্তু একবার চেঞ্জে না গেলে শেষে মুস্কিলে পড়তে হবে।" মোহিনী গম্ভীর হইয়া কহিল—"এই শনিবার তোমার মেজদাদা বাড়ী আস্‌লে কথাটা একবার তুলো ঠাকুরপো, একবার ঘুরেটুরে এলে ওসব সেরে যাবে" মহীন্দ্র জবাব দিতে যাইতেই দেখিল তাহার বড় বৌঠান প্রেমদা ঘরে ঢুকিতেছে, দেখিয়া কহিল—"দাদা এখন কেমন আছে বড়বৌঠান?" প্রেমদা কহিল—"এই ত একটু ঘুমুলেন, জ্বরটা খুবই বেড়েচে," মহীন্দ্র কহিল—"এক কাজ কর বড়বৌঠান, দাদাকে বলে কয়ে একবার চেঞ্জে পাঠিয়ে দেও, দিব্বি চেহারা নিয়ে ফিরে আস্‌বেন," হাত নাড়া দিয়া প্রেমদা কহিল—"পোড়া কপাল আমার! সেত হাজার দিনও বলে দেখেছি, সেকি তোমার আমার কথায় গ্রাম ছেড়ে যাবে ঠাকুরপো!" আসন হইতে উঠিতে উঠিতে মহীন্দ্র কহিল—"দেখি বলে কয়ে যদি পাঠাতে পারি, আমার ত এখনও প্রায় দুমাস ছুটী আছে, আমি না হয় সঙ্গে যাব।" প্রেমদা হাসিয়া কহিল—"তা বৈকি, মেয়ের বে মেয়ের সঙ্গেই দেখা নেই—কেমন?" দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহীন্দ্র কহিল—"তার মানে?" মোহিনী প্রেমদার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া কহিল—"তার মানে ঘটক এসে পাত্র দেখা, তার মানে পাঁজী দেখে দিন ধার্য্য করা, তার মানে দেবেন বাবুর ছোট মেয়ের সঙ্গে শ্রীমানের শুভ পরিণয়, এই ত তার মানে, এরপরে যদি কিছু থাকে ত সে তোমরা জান," লজ্জায় মরিয়া গিয়া মহীন্দ্র কহিল—"এরই মধ্যে এত তাড়া যে বৌঠান? এত সব কাণ্ড কারখানা হল আর আমি ঘুনাক্ষরেও কিছু জান্‌তে পেলুম্‌না, আমার বে ত দিচ্ছ—কৈ আমার মত নিয়েচ?" এক সঙ্গে মোহিনী ও প্রেমদা হাসিয়া উঠিল, মোহিনী কহিল—"এতে যে মতামত জিজ্ঞেস্ না করলেও চল্‌বে তা আমরা জানি ঠাকুরপো, যদি একান্তই নিতে হয় ত বের পর নেয়া যাবে, কিন্তু ভাইঝিটির বয়সের হিসেব রাখকি ঠাকুরপো?" মহীন্দ্র হাসিয়া কহিল—"বয়সের হিসেব তোমরাই বেশী রাখ, বয়সের হিসেব না থাক্‌লেও মাথায় যে বেশ বেড়ে উঠেচে তা ত চক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।" মোহিনী কহিল—"সময়ে বে না দিলে লোকে তোমাদেরই নিন্দে কর্‌বে, ঋতি চক্কোত্তি কত চেয়েচে জান?—তিনটি হাজার, এত টাকা আস্‌বে কোত্থেকে ঠাকুরপো? ভাশুর ঠাকুর ত একবছর ধরে রোগেই ভুগ্‌চেন, একা ওঁর উপরই ত সব নির্ভর করচে, তাই তোমারি শরণাপন্ন হয়েচি।" মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "আমাকে কত টাকায় দিলেন বৌঠান?" মোহিনী কহিল—"পাঁচটি হাজার নগদ, জিনিসপত্তর ত আছেই, শ্বশুরঠাকুরেরই ত বেশী ইচ্ছে, দেখ্‌লে না দুপুরবেলা সেই কালী চক্কোত্তিকে?" মহীন্দ্র কোন জবাব দিলনা, মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"মলিনার বের দোহাই কেন দিচ্ছ বৌঠান, বল তোমাদের ইচ্ছে, নইলে মলিনাকে বে দেবার মতন টাকা ত বাবার সিন্দুকে এখনও রয়েচে।" মোহিনী সুর করিয়া বলিল—"বিদেশে থাক ঠাকুরপো কিন্তু কি দিয়ে যে কি হয় সে খবর রাখ কি?" মহীন্দ্র বুঝিল এই কথার জের কতদূরে গিয়া পৌঁছিবে তাই কথাটা চাপা দিয়া কহিল—"জান্‌তে চাইনে বৌঠান, তোমাদের ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে—কিন্তু খেয়ে উঠে মুখটা যে শুকিয়ে গেল, একটা পানটান ও কি দেবে না তোমরা?" বলিয়া মোহিনীর সঙ্গে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হইলেও নির্ম্মলার পিতার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেই লাগিল। সেদিন অবস্থা এমনই খারাপ হইল যে মহীন্দ্র ভাবিল আজই বুঝি সব শেষ হইবে, সেবানিরতা খুড়ীমার দিকে চাহিয়া আজ তাহারও দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল, আর একটা কথা নিরন্তরই তাহার মনে উঠিতেছিল যে—যে মৃত্যুপথযাত্রী সে ত ভাবনা চিন্তার হাত এড়াইয়া, সব হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশ হইতেছে কিন্তু দরোজার পাশে বসিয়া ঐ যে অশ্রুমুখী মেয়েটি ভুলুণ্ঠিত হইতেছে উহার কি উপায় হইবে? রোগী ক্ষীণকণ্ঠে চাহিল—"জল"—মহীন্দ্র শশব্যস্তে উঠিয়া কহিল—বাটিতে ত একটুও জল নেই খুড়ীমা,—ছিঃ কেঁদোনা, তাঁকে ডাক তিনিই উপায় করে দেবেন।" যোগমায়া বাটিতে জল ঢালিয়া দিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল—"এত ডাকও কি তিনি শুন্‌বেন না বাবা? কি হবে মহীন্ আমাদের, যদি এই ডাক গিয়ে তাঁর কাণে না পৌঁছায়," মহীন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল—"চুপ কর খুড়ীমা, তিনি দীনেরই বন্ধু, তাঁকেই ডাক মিছে চোখের জল ফেলে

ওঁকে অস্থির করে তুলোনা; দেখ্‌চনা কেমন করচেন—ও কব্‌রেজ মশাই, একবার এদিকে আসুননা।" বারান্দায় কবিরাজ ডাক্তার ও পাড়ার জন্ন কয়েক লোক বসিয়াছিল, মহীন্দ্রের আহ্বানে তাহারা ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বাহির হইয়া গেল, মহীন্দ্র সকল বুঝিয়াও ধীর স্থির হইয়া বসিয়াছিল কারণ তাহাকে অধীর হইতে দেখিলে খুড়ীমা যে একান্তই কাতর হইয়া পড়িবে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না, এমন সময়ে রোগী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"মহী"—নির্ম্মলা বাবার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল—এই যে আমি বাবা, আমাদের ফেলে কোথা যাচ্ছ বাবা", মহীন্দ্র নিজের দুই চক্ষু মুছিয়া কহিল—"চুপ কর মহী, দেখ্‌চিস্‌নে তোদের চোখে জল দেখে ওঁর চোখেও জল এসেচে, যে এ সংসারের মায়া কাটিয়ে যাচ্ছে তাকে আর মায়ায় বেঁধে রাখ্‌তে চাস্‌নে"। অদূরে দরোজা ঠেস্ দিয়া যোগমায়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল, মহীন্দ্র চাহিয়া দেখিল সে মুখে সুখ দুঃখের অতীত একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ যোগমায়া উঠিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"আচ্ছা যাবার ইচ্ছে হয়েচে যাও কিন্তু মহীকে দিয়ে যাচ্ছ তার উপায় আমি কি করব বলে যাও—" মুমূর্ষুর বক্ষপিঞ্জর বার দুই অস্বাভাবিক ভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া একটা চাপা শ্বাস বড় কষ্টেই, চোখের জলের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, অস্পষ্টভাবে কহিল—"মহীন্ রইল—" তারপর আর বলা হইল না। মহীন্দ্র দূরে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল হঠাৎ নির্ম্মলার চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল সকলে ধরাধরি করিয়া নির্ম্মলার পিতাকে ঘরের বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে।

* * * * *

দাহ কার্য্য শেষ করিয়া মহীন্দ্র শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, বাকী রাত্রিটুকু বিছানায় পড়িয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল যে এই দুঃস্থ পরিবারের কি উপায় হইবে, সে নিজে যে তেমন কিছু সাহায্য করিবে তাহারও ত সম্ভাবনা নাই কারণ সেও ত এখন পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, পারিবারিক মনোমালিন্য থাকায় আরও মুস্কিলে পড়িয়াছে, নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল নির্ম্মলার কথা, চৌদ্দতে পা দিয়াছে—এখনই বিবাহ দেওয়া উচিৎ কিন্তু সেই বিবাহ করেই বা কে আর দেয়ই বা কে? একটা কথা বড় সংগোপনে মহীন্দ্রের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিতেই খোলা জানালা দিয়া দিনের আলোক আসিয়া তাহার চক্ষে লাগিল, সারাটা রাত্র এক মিনিটও না ঘুমাইয়া শারীরিক অবসাদ ও মানসিক দুশ্চিন্তা লইয়া মহীন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিল, ঘরের বাহির হইতেই মহীন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা হাঁকিলেন—"মহানরে"—"যাচ্চি" বলিয়া হাতটা মুখটা ধুইয়া মহীন্দ্র পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ কহিলেন—"ওবাড়ীর নবীন বুঝি কাল মরলে!" মহীন্দ্র কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ"—"চোখমুখ তোর অমন হয়েচে কেনরে? অসুখ করেচে নাকি?" মহীন্দ্র জানিত প্রকৃত কথা কহিলে পিতা কষ্ট হইবেন তাই কথাটা চাপা দিয়া কহিল—"রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি—" মিনিট দশেকের মধ্যে বৃদ্ধ কোন কথা কহিলেন না, তারপর হুকায় গোটা দুই লম্বা টান্ দিয়া কহিলেন—"জানিস্ ত সব, আমি ত কখন চোখ বুজি তার ঠিক নেই, তাই সময় থাক্‌তে তোদের একটা বিধি ব্যবস্থা করে যেতে চাই, দেখ্‌চিস্ ত মলিনা তেরোতে পা দিয়েচে, এখন বেন্না দিলে লোকে আমারই নিন্দে করবে, মতি চক্কোত্তি তিনটি হাজার চাইলে, ছেলেটি এন্ট্রেন্স পড়চে। দেবেনবাবুর কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছি, বেশ ভদ্দর লোক, ঢের আগেই সবগুলি টাকা দিয়ে দিলে,—হ্যা-হ্যা তোর ইস্কুল কবে খুল্‌বেরে?" মহীন্দ্র জবাব দিল—"পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয়নি, কলেজ খুল্‌তে এখনও দুমাস বাকী," বৃদ্ধ কহিলেন—"দু মাস! তাহলে ঐ দুটো দিনই ভাল, মলিনার হোক্‌গে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, আরটা না হয় আষাঢ়ে হইবে।" মহীন্দ্র নতমুখে কহিল—"আষাঢ়ে না হয়ে কিছু দিন পরে হলে কি চলে না বাবা?" অবাক হইয়া বৃদ্ধ কহিলেন—"বলিস্ কিরে মহীন্? টাকাটা এনে খরচও করা হয়েচে যে, ওসব ছেলেমানুষী করিস্‌নে। এই বুড়ো-বয়সে একটু শান্তিপেতে দে। যা কিছু রেখে গেলুম তোদের জন্যই, পরের টাকা এনে পরকে বুঝ দিয়ে তোদের সব্বই বজায় রাখ্‌লুম, যা-যা ওসব পাগলামী করিস্‌নে, তোর মেজদাদা বুঝি কাল বাড়ী এসেচে, তাকে একবার পাঠিয়ে দে" কহিয়া বৃদ্ধ পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ মলিনার বিবাহ হইয়া গেল; দিনদশেক পরে রাত্রে আহারে বসিয়া মহীন্দ্র মোহিনীকে কহিল—

"মেজবৌঠান একটা কথা", "কি কথা ঠাকুরপো ?" মহীন্দ্র কহিল—"দেবেন বাবুর টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিতে দাদাকে বোলো, সেখানে আমি বে করতে পারচিনে।" দুই-চক্ষু কপালে তুলিয়া মোহিনী কহিল—"ওমা, সে কি কথা, অমন সুন্দরী মেয়ে, অতগুলি টাকা—", মহীন্দ্র কহিল—"থাকগে, টাকায় আমার প্রয়োজন নেই, আর সুন্দরী মেয়ে না হলেই যে আমি বে করব না এমন কথাও ত আমি কোন দিন বলিনি, ও বিয়ে আমি করতে পারচিনে কারণ আছে," মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কারণটা কি শুনি", মহীন্দ্র কহিল—"আজ থাক; আর একদিন শুনো, তোমার মেয়ের বে, সে ত হয়েই গেছে তবে আর কেন পীড়াপিড়ী করচ বৌঠান", মোহিনী বলিল—"কিন্তু পাঁচটী হাজার যে এনেচ সে কথা কি ভুলেই গেলে ?", মহীন্দ্র কহিল—"বাবা যা কিছু জমা করেছেন তাই থেকে, দিয়ে দেওগে, তোমার পায় পড়ি মেজবৌঠান্ আমাকে বাঁচাও"। মোহিনী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, বুঝিতে পারিল না যে এমন কোন কারণ থাকিতে পারে, যাহার জন্য তাহার এই এল, এ পাশকরা দেবরটি একটি সুন্দরী মেয়ে ও পাঁচটি হাজার টাকা হেলায় উপেক্ষা করিয়া খেয়াল বশতঃ কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে. মোহিনী কহিল—"তা দেখি বলে কিন্তু একটু ভেবে চিন্তে দেখলে পারতে ঠাকুরপো, শেষে যেন পস্তাতে না হয়," মহীন্দ্র উঠিয়া কহিল—"ভাববার কথা বোলোনা বৌঠান, একমাস ধরে ভেবে দেখেছি কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য পথ নেই" বলিয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, মোহিনী অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল "লেখা পড়া শিখলে ছেলেরা এম্নি বিগড়ে যায় বটে।"

(৪)

যোগমায়ার ঘরে ঢুকিয়াই মহীন্দ্র দেখিল সদ্যস্নাতা নির্ম্মলা মাতার পূজার জন্য চন্দন ঘষিতেছে। এই ভক্তি-পরায়ণা, ভাগ্যহীনা মেয়েটির দিকে চাহিয়া মহীন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তখনই তাহা মুছিয়া ফেলিয়া কহিল,—"খুড়ীমা কইরে মণ্ট ?" চন্দন ছাড়িয়া উঠিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা কহিল—"স্নান করতে গেলেন, এখুনি আসবেন" বলিয়া একখানা চৌকী আনিবার জন্য অগ্রসর হইতেই মহীন্দ্র কহিল—"থাক থাক অতিথি সৎকারে প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে যা এতক্ষণ করছিলে সেইটে কর, বেশ মানা চ্ছল—যেন গৌরী ঠাকুরুনটি!" এই "তুমি" "আমি" সম্বোধনে ওরূপ প্রশংসায় নির্ম্মলার সারা মুখ-লাল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায় কিন্তু পা উঠিল না, কিছু সময় পরে মহীন্দ্র হাসিয়া কহিল—"আমি ত কলকেতা যাচ্ছি কিন্তু কবে যে ফিরব তাও ঠিক নেই, হয়তঃ এই শেষ দেখা।" শিহরিয়া উঠিয়া নির্ম্মলা কহিল যান্—কি সব বিশ্রী কথা যে বলেন আপনি;—কিন্তু আবার ফিরবেন কবে ?" মহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বললুমই ত যে আর ফিরে আসব না। তেমন কোন বাঁধাবাঁধি ত নেই আমার যে ফিরে আসতেই হবে—" আর বলা হইল না। একজোড়া সজল আরক্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া সে মুখের কথা হারাইয়া ফেলিল। কি সে দৃষ্টি! বিশ্বের শতকোটি রহস্যের জন্মাধার। সেই অশ্রুসজল দৃষ্টি মহীন্দ্রের মর্ম্মে গিয়া কহিল—"কোন বাঁধাই নেই কি ? মিথ্যা কথা, আসতে হবেই, জেনে শুনে কেন আত্ম-প্রতারণা করচ—" মহীন্দ্র মুখ নত করিয়া কহিল—"যদি কখনও প্রয়োজন বোধ কর ত আমাকে চিঠি দিও—", সিক্ত বস্ত্রে যোগমায়া প্রাঙ্গনে পা দিয়া কহিল—"মহীন্ নাকিরে ?" ব্যস্ত হইয়া মহীন্দ্র দরোজার সম্মুখে আসিয়া কহিল—"হাঁ খুড়ীমা, আজ কলকাতা যাচ্ছি তাই দেখা করতে এলুম।" যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া ঠাকুর ঘরে প্রনাম করিতে চলিয়া গেল। সেখানে বিশ্ব-দেবতার দুয়ারে মাথা ঠোকাইয়া ঘণ্টা আধেক ধরিয়া কি যে প্রার্থনা করিল তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু যখন মুখ তুলিল তখন দেখা গেল তাহার বিগলিত প্রার্থনা সারা মুখ-খানি সিক্তিত করিয়া নামিয়াছে। সোজাসুজী ঘরে ঢুকিয়াই মহীন্দ্রের হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—"যাচ্ছিস্ ত মহীন্ কিন্তু আমাদের কি বলে যাস্ বাবা ? আমি যে আর পারচিনে" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল! মহীন্দ্র যোগমায়ার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কহিল—"চোখের জল ফেলনা খুড়ীমা, ওতে আমাদেরই অমঙ্গল হবে। এতটুকু বয়সের সময় যে শেকল নিজের হাতে তোমার প্রাঙ্গনে বসে পরিয়ে দিয়েচ, তা আজ ত আর ছিঁড়ে যেতে পারব না"—বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

(৫)

এই সংসারে মানুষ কতই না আশা করে কিন্তু তাহার

কয়টা আশাই বা পূর্ণ হয়। প্রাণান্ত চেষ্টায় ও যত্নে যে সুখের ঘর-পরিণামহীন মানুষ গড়িয়া তোলে, কোন হিংসা-কৌতুকপ্রিয় দেবতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে সে সুখের ঘর অকস্মাৎ একদিন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুলায় মিশিয়া যায়। তথাপি মানুষ ঘুরিয়া ফিরিয়া আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া সম্ভব অসম্ভব সত্য মিথ্যা নিয়া এই দুনিয়ার একান্তে একটা মায়ার প্রাচীর ঘেরিয়া দিয়া মনে ভাবে—'দিন এমনই সুখে যাইবে—'কিন্তু সেই মায়ার প্রাচীর যে তখনি পড়িয়া যাইতে পারে সেই কথা শত সহস্রবার মনে উদয় হইলেও, অন্তরকে চক্ষু ঠার দিয়া কল্পনার খেয়াল বশতঃ উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ নেশার ঝোঁকে জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। তারপর হঠাৎ একদিন নেশা ভাঙ্গিয়া গেলে জাগিয়া দেখে যে কে যেন কোথা হইতে দুর্ব্বাসার নিষ্ঠুর অভিশাপের মতন আসিয়া সুখের ঘরে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া ছাই করিয়া দিয়া গিয়াছে। তখন জীবনটাই তাহার নিকট একটা নিষ্ঠুর অভিসম্পাতের মতন বোধ হয়।

মহীন্দ্রের পিতার মনের আশা ভগবান পূর্ণ করিলেন না। অতি অকস্মাৎ কি যেন কিসের জন্য বৃদ্ধের ডাক আসিল—বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। কলিকাতা বসিয়া মহীন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া পৃথিবী শূন্য মনে করিল। যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। কালাশৌচ বলিয়া মহীন্দ্রের বিবাহ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রহিল। মহীন্দ্র হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

* * * * *

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহীন্দ্র মেজদাদা জগন্নাথের এক চিঠি পাইল। বাড়ী পৌছিবার জন্য কড়া তাগাদা দিয়া জগন্নাথ চিঠি লিখিয়াছিল সুতরাং সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে মহীন্দ্র বাড়ী রওনা হইল।

সকাল বেলা খাবার খাইয়া মহীন্দ্র ভাবিতেছিল—"একবার খুড়ীমাদের খবরটা নিয়ে আসি" এমন সময় বড়দাদা প্রিয়নাথ ডাকিল—'মহীন্‌রে, 'যাচ্চি' বলিয়া মহীন্দ্র ঘরে ঢুকিতেই জগন্নাথ কহিল—"তা হলে এই মাঘ মাসেই হয়ে যাক্, একটা বছরের উপর হল টাকাটা এনে খরচ করেচি আর কি দেরী করা উচিৎ হয়রে? না তাতে, ভদ্রতা রক্ষা হয় বল্ দেখি?" মহীন্দ্র জবাব দিল—এদ্দিন যখন তাঁরা অপেক্ষা করেচেন তখন না হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌বেন, একজামিন্‌টা হয়ে গেলে—" জগন্নাথ উগ্র হইয়া কহিল—"অবাক্ কর্‌লি যে মহীন্। একজামিন্? সে যে প্রায় একবছরের কথা? না হে সেটি হচ্চে না, এই মাঘ মাস হাতছাড়া কর্‌বার জো নেই" প্রিয়নাথ কহিল—"জানিস্‌রে এতে বাবারই নিন্দে। যা যা মতি বুদ্ধি ঠিক করে ফেল্‌গে যা—।" জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিল—'তাহলে দেবেন বাবুকে চিঠি দিই?" মহীন্দ্র নতমুখে কহিল—"মাপ কর মেজদাদা, আমি বে কর্‌ব না।" মুহূর্ত্তে জগন্নাথ ক্ষিপ্র ব্যাঘ্রের মতন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"বে কর্‌বিনে কেন লক্ষ্মীছাড়া? বে কর্‌বিনে বলেই ত বিধবার সর্ব্বনাশ কর্‌তে সুরু করেচিস্—" মহীন্দ্রের মুখ শাদা বিবর্ণ হইয়া গেল। মনে মনে কহিল অন্তর্যামী, তুমি ত সবই জান, অন্যায় যদি কিছু করে থাকি ত শাস্তি দিও কিন্তু খুড়ীমার নাম করে এমন ভাবে যারা আমার অপমান কর্‌বে তাদের ভাই বলে কেমন করে উপেক্ষা করব প্রভু?" তারপর মনে পড়িল খুড়ীমার সেই বিষণ্ণ মুখখানি। সেই সতী সাধ্বীর চরণ উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া হঠাৎ সোজা হইয়া কহিল—"সেই বিধবার মেয়েকে যদি বে করি তা হলে সে কি খুব অন্যায় হবে বলে মনে করেন মেজদাদা? বরং তাকে মহৎ বলেই আমি ভাব্‌ব।" জগন্নাথ চেঁচাইয়া কহিল—"বাড়ী থেকে দুর হয়ে যা। মনে থাকে যেন এই বাড়ী ঘর বাবা যা কিছু রেখে গেছেন তাতে তোর কিছুমাত্র অধিকার নেই, ফের এই ঘরে মাথা দিবি ত অপমানী হতে হবে বলে দিলুম।" মহীন্দ্র কহিল—"মায়ের পেটের ভাই হয়ে যদি আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌তে চাও ত কর, তাতে এতটুকু দুঃখ পাব না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই কথাটা যেন মনে থাকে যে তুমিই তোমার ছোট ভাইকে বঞ্চিত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।" তারপর প্রিয়নাথের দিকে ফিরিয়া কহিল—"তুমিও কি আমাকে এতটুকু স্থান দিবে না বড়দাদা?" প্রিয়নাথ এতক্ষণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল হঠাৎ মহীন্দ্রের এই কাতর প্রার্থনায় ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার চক্ষের জল নামিয়া আসিল, কহিল—"তোর মেজদাদার কথা শোন্‌রে মহীন্, আর পাগলামী করিস্‌নে—"বলিয়াই দুই চক্ষে হাত দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। মহীন্দ্র কহিল—"জানি বড়দাদা তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বে না, দিলে তোমারও আশ্রয় পাওয়া ভার হয়ে উঠবে। মিছে আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনে, আমি চল্লুম" বলিয়াই দুইহাতে চোক চাপিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

প্রিয়নাথ চিরদিনই অল্প কথা বলে। কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মাথা দিতেই চাহে না। ভাল খাওয়াটা আর নিয়মিত নিদ্রাটা হইলেই তাহার হইল। এমন যে নিরীহ প্রিয়নাথ সেও রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—"একটু বোঝালে কি আর ফিরতনা—তা গোড়া থেকেই চটাচটি সুরু করলি। আজকাল ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি কড়া কথায় পোষমানে? যা যা খুঁজে দেখ কোন দিকে গেল। মা মরা ছোট ভাইটি,—অমন করে তাড়িয়ে দিয়ে ঐসব বিশ্রী হ'ল কি ভাল করলি জগাই? দেখলিনে ছোঁড়াছু' চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল।" বলিয়া নিজের চক্ষু মুছিয়া জানলার দিকে সরিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার যখন বাহিরের গাছ গুলিকে একান্তই অস্পষ্ট করিয়া দিল তখন প্রিয়নাথ ফিরিয়া দেখিল জগন্নাথ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথের গৃহের সম্মুখে আসিয়া প্রিয়নাথ ডাকিল—'জগাইরে', জগন্নাথ বাহির হইয়া কহিল "কি", প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়রে সে হতভাগা?" জগন্নাথ মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"জানি নে", প্রিয়নাথ শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"খুঁজতে যাসনি?" "না"। টলিতে টলিতে নিজের শয্যায় আসিয়া প্রিয়নাথ লুটাইয়া পড়িল। এবার আর তাহার অশ্রু বাধা মানিল না। শত অপরাধ করলেও ভাই ত! মা মরা ছোট ভাইটি—প্রেমদা স্বামীর অস্ফুট ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া ঘরে ঢুকিতেই প্রিয়নাথ কহিয়া উঠিল—"চল প্রেমদা, এবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই, এ বাড়ীর দাস দাসীর যে অধিকার আছে ততটুকুও অধিকার না নিয়ে এ বাড়ীতে বাস করা ত আমার সাধ্যে কুলোবে না প্রেমদা" বলিয়া আবার উচ্ছসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(৬)

ঘরের বাহির হইয়া মহীন্দ্র ছুটিয়া সেইখানে গেল যেখানে একবৎসর পূর্ব্বে তাহার স্নেহময় পিতার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, চিতার উপর লুটাইয়া পড়িয়া মহীন্দ্র কাঁদিতে লাগিল। মা যে কেমন জিনিষ তাহা ত সে জানেনা, কোন শৈশবে মাতৃহীন হইয়া পিতার স্নেহেই ত সে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরা যে তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিল এ দুঃখ ত সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলনা, ঐ স্নেহময় ভবন, যেখানে জীবনের অর্দ্ধেক সময় হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, সেই শান্তি আগারের দরোজা ত আজ হইতে তাহার সম্মুখে বন্ধ হইয়া গেল। মাকে কোনদিন মনে পড়ে নাই, কিন্তু এই পরম দুঃখের দিনে সর্ব্বাগ্রে সেই মার কথাই মনে পড়িল, মা থাকিলে বুঝি সহোদর ভাইরা এমন নিষ্ঠুর-ভাবে তাড়াইয়া দিতে পারিতনা, মাথার উপর অন্ধকার আকাশে চাঁদ উঠিল, মহীন্দ্র চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া ভাবিল—এখন কোথায় যাই,—কোথায়ও ত আশ্রয় মিলিবেনা, সারাটাদিন অনাহারে শ্মশানে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মহীন্দ্র এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে হাটিবারও শক্তি তাহার রহিলনা, শরীর ক্রমেই অবশ হইয়া আসিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মহীন্দ্র প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল তারপর কি যেন কি ভাবিয়া নির্ম্মলাদের বাড়ীর উদ্দেশে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল, প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া মহীন্দ্র ডাকিল "খুড়ীমা", গৃহমধ্যে বুঝি একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, শশব্যস্তে যোগমায়া দরোজা খুলিয়া কহিল "আয় বাবা, এত রাত্রিরে যে—" মহীন্দ্র জবাব না দিয়া সোজা ঘরে ঢুকিয়াই শুইয়া পড়িয়া কহিল—"কিছু খেতে দেও খুড়ীমা প্রাণ যায় যে—"। যোগমায়া উঠিয়া গিয়া একবাটি দুধ আনিয়া কহিল—"আর ত কিছু দিতে পারলুমনা বাবা, গরীব মানুষ কিই বা খেতে দেব এই দুধ ফোটাই সম্বল, খুব ক্ষিদে পেয়েচে বুঝি?" মহীন্দ্র এক চুমুকে পান করিয়াই আবার শুইয়া পড়িল, যোগমায়া পরম স্নেহে গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"অসুখ করেনি ত বাবা?" কোন রকমে উচ্ছ্বসিত অশ্রু নিবারণ করিয়া মহীন্দ্র কহিল—"না খুড়ীমা", তারপর মিনিট দশের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"গ্রামে কি আমাদের কথা নিয়ে খুব ঘাটাঘাটি হচ্চে খুড়ীমা?" যোগমায়ার মুখ শুকাইয়া গেল, নীচু করিয়া কহিল—"কাণে যদি কিছু শুনে থাকিস্ ত আর গোপন করি কি করে, যে ভাবে দিন কাটাচ্চি সে তুই কি জানবি মহীন্।" বলিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, মহীন্দ্র সহজ শান্তকণ্ঠে কহিল—"আর কষ্ট পেতে হবেনা খুড়ীমা, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, সংসার আমাকে বঞ্চিত করেচে, মায়ের পেটের ভাইরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে তাই নিরুপায় নিরাশ্রয় হয়ে তোমারই কাছে ফিরে এসেচি।"

যোগমায়া কান্দিয়া উঠিয়া কহিল—"কি বল্‌চিস্‌রে মহীন্, কে-তাড়িয়ে দিলে রে?" মহীন্দ্র যোগমায়ার মুখে হাত দিয়া কহিল—"চুপ কর খুড়ীমা, অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েচে, এখন শুধু কান্নাকাটি কর্‌লে কি হবে! আশীর্ব্বাদ কোরো যেন বাকী কয়টা দিন তোমাকে শান্তিতে বেঁচে থাক্‌তে দিতে পারি।" যোগমায়া কহিল—"না মহীন্ আর কান্দ্‌ব না। আমার এখন ত আর কান্দ্‌বার সময় নেই, আমার যে মস্ত বড় কাজ বাকী রয়েচে—" বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেয়ে কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, পরম স্নেহে মেয়েকে বুকে করিয়া যোগমায়া কহিল—"আয়রে হতভাগি, তোর মার কাছে থেকে ত জীবনভরে শুধু দুঃখই পেয়ে গেলি; আজ যার হাতে তোকে দিচ্চি তার কাছে গিয়ে তুই সুখী হোস্ এই আশীর্ব্বাদ করচি—" বলিয়া মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া মহীন্দ্রের নিকট আনিয়া কহিল—"আর আমাকে জড়িয়ে রাখিস্‌নে মহীন্, হাতধরে নে, তোকেই দিয়ে গেলুম, দুঃখিনী বিধবার মেয়ে বলে সংসারে কারুর মেয়ের চেয়ে কিছুতে কম হবে না—" বলিয়াই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল, নির্ম্মলা মহীন্দ্রকে গড় হইয়া প্রণাম করিতে যাইয়া মহীন্দ্রের পার উপর হইতে আর মাথা তুলিতে পারিলনা, সেই চিরবাঞ্ছিত চরণ দুইটির উপর সে তাহার সঞ্চিত অশ্রু উৎস খুলিয়া দিল। মহীন্দ্র চক্ষু মুছিয়া হাত ধরিয়া নির্ম্মলাকে উঠাইয়া কহিল—"মনে পড়ে মণ্ঠু সেই কথাটা সেদিন যে বলেছিলুম,—যে যত দুঃখ পাও মুখ বুজে স'য়ে যেও, ভুলেও তাঁর উপর অভিমান কোরোনা, যিনি এই দুঃখের মাঝে আমাদের মিলিয়ে দিলেন তিনিই একদিন এই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বেন" বলিয়া নির্ম্মলার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

(৭)

জগন্নাথ মহীন্দ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিলনা, উত্তরের ভিটি ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"ইচ্ছে হয় ঘর তুলে থাক্‌তে পার, কিন্তু এ বাড়ীর খড় গাছাটিতে পর্য্যন্ত তোমার কোন অধিকার নেই সে কথা যেন মনে থাকে।" নির্ম্মলার মাতাকে কাশীতে তাঁহার এক ভগ্নীর কাছে রাখিয়া আসিয়া মহীন্দ্র গ্রামের ইস্কুলের হেড্ মাষ্টারী লইয়া বসিল। সকল হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্ত্রী নির্ম্মলার স্নেহে যত্নে মহীন্দ্রের হৃদয়ের গভীর ক্ষতটা শুকাইয়া উঠিতেছিল। আড়ম্বরহীন খড়ের চৌচালা ঘরে স্নেহময়ী ভার্য্যার সেবাশুশ্রূষায় দিনগুলি অপেক্ষাকৃত সুখেই কাটতেছিল কিন্তু অকস্মাৎ একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় সকল ওলট্ পালট্ হইয়া গেল। রান্নাঘরের পিছনদিকে একটা জায়গায় বেড়া দিয়া মহীন্দ্র কতগুলি শাক্ জন্মাইয়াছিল। সেদিন দুপুরবেলা চাকর দিয়া মোহিনী সবগুলি শাক্ উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, নির্ম্মলা সকলই দেখিয়াছে কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই। বেলা পাঁচটার সময় এক হাঁটু ধুলা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত মহীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া চেঁচাইয়া উঠিল "একটু জল চাই যে—" স্বামীর সাড়া পাইয়া রান্না ঘর হইতে জল লইয়া নির্ম্মলা বাহির হইয়া দেখিল স্বামী রান্না ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, নির্ম্মলা স্বামীর সম্মুখে জলের গ্লাস তুলিয়া ধরিল, এক চুমুকে জলগ্লাস পান করিয়া মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"একদিনে এতগুলি শাক্ দিয়ে কি হবে মণ্ঠু?" নির্ম্মলার হৃদয় বারংবার শিহরিয়া উঠিল, সে জানিত যে এই সংবাদ স্বামীর কাণে গেলে একটা কিছু ঘটিয়া বসিবে, তাই জবাব না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "উত্তর দিচ্চনা যে—কি হবে এতগুলি শাক্ দিয়ে?" নির্ম্মলা কহিল—"আজই ত আর সবগুলি রান্ধ্‌চিনে" "আচ্ছা থাক্" বলিয়া মহীন্দ্র হাতমুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারে বসিয়া মহীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"শাক কই মণ্ঠু?" নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গেল, কহিল—"আজ রান্না হয়নি ত—" মহীন্দ্র বলিল—"ও বেলা বল্লে রান্না কর্, কিন্তু এখন বল্‌চ রান্না হয়নি?" নির্ম্মলা অতি কষ্টে একটু হাসিয়া কহিল—"কি যে স্বভাব হয়েচে তোমার, একটুতেই রেগে ওঠ। আজ না খাও কাল ত খেতে পার্‌বে"। মহীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—"খাবার কথা বল্‌চিনে কিন্তু কৈ সে শাক দেখি", নির্ম্মলা অনুনয় করিয়া কহিল—"কেন মিছামিছি জুলুম কর, খেয়ে ওঠ তারপর দেখো, কাঁচা শাক দিয়ে কি কর্‌বে এখন?" মহীন্দ্র জিদ্ করিয়া কহিল—"একটা কিছু ঘটেচে নইলে তুমিত কোনদিন কিছু লুকোতে না মণ্ঠু, সব খুলে বল, নইলে রইল তোমার ভাত" বলিয়া মহীন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিতেই নির্ম্মলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আমার মাথা খাও, উঠ না, বল্‌চি—খেয়ে ওঠ, সবই খুলে বল্‌ব"—"না—না এক্ষুণি সব বল্‌তে হবে নইলে—" "থাক্ থাক্ বল্‌চি, তুমি তখন

ইস্কুলে, দুপুর বেলা দেখি মেজদিদি চাকর দিয়ে সবগুলি শাক্ তুলে নিচ্চেন, আমি বউমানুষ আমি কি গিয়ে বল্‌ি 'তোমরা নিওনা' তাই চুপ করে রইলুম—"স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নির্ম্মলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল আর বলা হইল না, ভাতের থালা ঠেলিয়া রাখিয়া মহীন্দ্র উঠিয়া গেল, স্বামীকে যে হাতে পায়ে ধরিয়া খাইতে অনুরোধ করিবে তখন নির্ম্মলার এমন সাহস হইল না, যেমন ভাত তেমন ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, রান্নাঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া শয়ন ঘরে যাইয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"কেন রাগ করে উঠে এলে—চল—", মহীন্দ্র কহিল—"রাগত তোমার উপর করিনি," "আমার উপর রাগ না করে থাক, খেতে এস, তুমি না খেয়ে উপোস্ করে থাক্‌লে আমি যে কতকষ্ট পাব সেকি আর তুমি জাননা, তোমার পায় পড়ি চল—খেতে চল।" মহীন্দ্র কহিল—"শরীর ভাল নেই, তাই আর খাব না, মিছামিছি কান্নাকাটি করে লাভ কি? যাও খাওগে"। নির্ম্মলা বুঝিল যে স্বামীকে কিছুতেই ফিরাইয়া নেওয়া যাইবে না তাই উঠিয়া গিয়া পান আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া কহিল—"কোন দিন কোন কথা ফেলনি কিন্তু আজ আমার একটা কথা রাখতেই হবে," মহীন্দ্র কহিল "কি কথা শুনি?" স্বামীর হাতদুইটি নিজের মাথার উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আমার দিব্যি করে বল, রাখবে কিনা", মহীন্দ্র হাত নামাইয়া কহিল—"বল"—মিনতিপূর্ণ স্বরে নির্ম্মলা কহিল—"এই নিয়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে যেতে পারবেনা, ওদের যা খুসী করুক না কেন, দিনান্তে আমরা দুটি খেতে পার্‌লেই হল, আজকাল তোমার যে রকম মেজাজ হয়েছে তাতে আমি কত ভয় পাই জান? কখন যে কি করে বস তার ঠিক নেই, তোমার পায়ে পড়ি, আজ কিন্তু আর ঝগড়া বাধাতে যেতে পার্‌বে না," মহীন্দ্র কহিল—"আচ্ছা তাই হবে, যাও খেতে যাও," নির্ম্মলা আর একবার স্বামীর হাত দুইখানি মাথায় ঠেকাইয়া কহিল—"মনে থাকে যেন আমার দিব্যি" কহিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল, বিছানায় শুইয়া মহীন্দ্র কিছুতেই শান্তি পাইল না, খানিক পরে হঠাৎ উঠিয়া দরোজা খুলিয়া জগন্নাথের গৃহের অভিমুখে চলিল, বারান্দায় জগন্নাথকে দেখিয়াই মহীন্দ্র কঠোরস্বরে কহিল—"এসব কি হচ্চে মেজদাদা?" জগন্নাথ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"কি সব"; মহীন্দ্র আরও উষ্ণ হইয়া কহিল—"নিজের শরীর জল করে যা তৈয়ের কর্‌ব তাতেও কি আমার অধিকার থাক্‌তে নেই?" জগন্নাথ মোহিনীর নিকট সকলই শুনিয়াছিল, কহিল—জায়গাজমী কিনে শরীর জল করগে, পরের জায়গায় শরীর জল্ কর্‌লে সে বৃথাই হবে বলে দিচ্চি", মহীন্দ্র কহিল—"পর পর বলে খোঁচা দিচ্চ মেজদাদা, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই বলেই চুপ করে আছি নইলে আদালতে বসে তোমাকে এ কথা স্বীকার করতে হত যে এ বাড়ীতে তোমারও যতটুকু অধিকার আছে আমারও ততটুকু অধিকার আছে, বাবা যখন কোন উইল রেখে যাননি তখন একথা তোমার স্বীকার কর্‌তেই হ'ত।" ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতন হুঙ্কার দিয়া জগন্নাথ কহিল—"কি আদালতের ভয় দেখাচ্চিস্ আমাকে? যা না আদালতে, কিন্তু আদালতে যাবার আগে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, পরের জায়গায় বাস করে আবার বাড়ী চড়াও হয়ে মার্‌তে আসিস্? বেরো বাড়ী থেকে, নইলে চাকর দিয়ে কাণ ধরে বের করে দেব।" দপ্ করিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত মহীন্দ্রের মাথায় লাফাইয়া উঠিল, উন্মাদের মতন চিৎকার করিয়া কহিল—"বাড়ী চড়াও হয়ে মার্‌তে আসিনি মেজদাদা, কিন্তু একদিন বুঝি তাও আস্‌তে হবে, তুমি বড় ভাই হয়েই যখন তোমার মর্য্যাদা রাখ্‌তে চাইলে না তখন আমিই বা কি করে সে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখি?" বলিয়াই মহীন্দ্র এমন একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য জগন্নাথের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চীৎকার করিয়া কহিল—"যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমাকে মার্‌তে চাস, বেরো আমার বাড়ী থেকে—" বলিয়াই পায়ের খড়ম্ উঠাইয়া ছুড়িয়া মারিল, নিক্ষিপ্ত খড়মে ঝনাৎ করিয়া মহীন্দ্রের কপাল হইতে রক্তধারা নামিয়া আসিল। ক্ষত স্থানটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মহীন্দ্র কহিল—"বেশ করেচ মেজদাদা, এ আমার উচিৎ শাস্তি, কিন্তু ভাই ছাড়া আর কেউ ত এমন শিক্ষা দিতে পার্‌তনা, আশীর্ব্বাদ কোরো যেন আজ থেকে এইটে ভুলে না যাই যে রাগের মাথায় তাঁকে ভুলে নিজেই অন্যায়ের প্রতীকার কর্‌তে গিয়ে গুরুজনের অমর্য্যাদা করার চেয়ে বড় পাপ আর নেই" বলিয়াই রক্তাক্ত দেহ লইয়া নিজের গৃহের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী বলিয়াছে তাই নির্ম্মলা রান্নাঘরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আহার করিল না। দুইটি উৎকণ্ঠিত কান শয়ন ঘরের দিকে পাতিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল। মহীন্দ্রের চীৎকার শুনিয়া রান্নাঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া শয়ন গৃহের সম্মুখের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মহীন্দ্র বারেন্দায় পা দিতেই নির্ম্মলা ছুটিয়া যাইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"কেন গেলে ঝগড়া করতে—একি—কে মারলে" বলিয়াই নির্ম্মলা মূর্চ্ছিতের মতন স্বামীর পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। স্ত্রীর সংজ্ঞালুপ্ত দেহ বুকে করিয়া ঘরে আনিয়া মহীন্দ্র চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই নির্ম্মলা উঠিয়া বসিয়া আবার কান্দিতে লাগিল। মহীন্দ্র স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল—"কান্দলে কি হবে মণ্ঠু? ও আমার না হলেই যে চল্‌ত না। মেজ দাদা উচিৎ শাস্তিই দিয়েছেন।" নির্ম্মলা স্বামীর ক্ষতস্থান বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—"আর যদি কোন দিন এমন করে ঝগড়া বাধাতে যাবে ত আমি আত্মঘাতী হয়ে মরব তা বলে রাখ্‌ছি।"

এই ঘটনার দিন দশেক পরে একদিন পান সাজিতে বসিয়া প্রেমদা কহিল—"আচ্ছা বড় ভাই হয়ে জন্মেছিলে কেন বলতে পার? ভগবান কি শুধু ঘুম আর ঐ হুকোটা হাতে দিয়েই তোমাকে পাঠিয়েছেন?" প্রিয়নাথ পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিল—"কি করব বল?" প্রেমদা কহিল—"ঠাকুরপোকে তোমরা সকলে মিলে এমন করে পুড়িয়ে মারচ, ধর্ম্মের কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবে শুনি?" একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ কহিল—"তাই ত ভাব্‌চি প্রেমদা। যখন ভাবি বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।" প্রেমদা কহিল ভাল চাওত ওর টাকা পয়সা ঘর দোর সব ফিরিয়ে দেও। মা-মরা ভাইটি, যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেচ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কি সুখে থাক্‌বে তোমরা?" এক ফোটা চক্ষের জল প্রিয়নাথের গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল, কহিল—"কি করব বল? নিজেই নিজের ঘরে বন্দী হয়ে আছি। জগাত ওকালতী ছেড়ে ছুড়ে এসে সব গ্রাস করে বসেচে। তার উপর কথা কইতে যাই, শেষে আমাকেই পথে বসাক্‌। এই রোগা শরীর নিয়ে তখন ত আর খেটে খেতে পারব না প্রেমদা।" নিশ্বাস ফেলিয়া প্রেমদা কহিল—"কিন্তু আমিও বলে রাখ্‌চি ঐ চোখ দুটি দিয়ে দেখ্‌তে হবে যে কি দুর্গতি তোমাদের হচ্চে। ভুলে যেওনা যে ধর্ম্ম এখনও সংসার ছেড়ে পালায় নি।" প্রিয়নাথ বলিয়া উঠিল—"শুধু ঐ টুকুই আমাদের সম্বল প্রেমদা। খাঁটি জিনিষটুকু হাত ছাড়া করোনা, দেখবে একদিন সবই হবে।" বলিয়া পাশ বালিশটাকে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

(৮)

মাসখানেক পরে একদিন স্বামীর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলা দেখিল মহীন্দ্র শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে। কিন্তু সে যে কান্দিতেছিল তাহার চিহ্ন তখনও বিদ্যমান ছিল। ইস্কুল ছাড়িয়া এমন অসময়ে কেন যে মহীন্দ্র একাকী ঘরে বসিয়া কান্দিতেছিল নির্ম্মলা তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাছে গিয়া কহিল—"এত সকালেই ইস্কুল ছুটী হয়ে গেল?" জামার পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া নির্ম্মলার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মহীন্দ্র কহিল—"ইস্কুলের কাজ আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। এখন উপোস করে মরতে হবে।" স্বামীর জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে নির্ম্মলা কহিল—"অদৃষ্টে যদি তাই থাকে তবে তাই হবে, কিন্তু কাজ গেল কি করে?" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহীন্দ্র কহিল—"সেক্রেটারী জবাব দিয়েছেন।" নির্ম্মলা বলিল—"গেলই বা ওকাজ আরও কত কাজ পাবে।" মহীন্দ্র কহিল—"এই গ্রামে বসে চাকরী কোথায় পাব মণ্ঠু?" "তা হলে একবার সহরে যাও না, একটা না একটা কাজ মিলে যাবেই।" "তোমাকে কার কাছে রেখে যাব?" এবার আর জবাব মিলিল না। স্বামীর জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে মিনিট পাঁচেক পরে কহিল—"এখানে যখন সুবিধে হবে না তখন সহরে যাওয়া দরকার। যে কয়দিন সেখানে থাক্‌বে সে কদিন নাহয় যদুরমা এসে ঘরে শোবে। ভয়কি, আমার কিন্তু মোটেই ভয় করবে না। মহীন্দ্র উঠিয়া কহিল—"একটি কিছু করতেই হবে, উপোস্ করে ত আর মরতে পারব না" বলিয়া হাত মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

তিনদিন পরে স্ত্রীকে সাবধানে থাকিতে বারংবার উপদেশ দান করিতে করিতে রাত্রির গভীর অন্ধকারে চাকুরীর অন্বেষণে মহীন্দ্র গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল সাম্‌নের বুধবার না পারে বৃহস্পতিবার নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নির্ম্মলা আলো লইয়া দরোজা পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইল। মহীন্দ্র যখন অন্ধকারে

অদৃশ্য হইয়া গেল তখন শয্যায় আসিয়া নির্ম্মলা লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বামী যে তাহার হৃদয়ের কতখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা সে টের পাইল। এবং কতখানি জায়গা যে খালি করিয়া দিয়া চলিয়া গেল সে কথা ত আজ সে ছাড়া আর কেহই জানিল না। শূন্যহৃদয় ভরিয়া হাহাকার জাগিয়া উঠিল। সারাটা রাত্র নির্ম্মলা একটিবারও চক্ষু না বুজিয়া কাঁদিয়াই কাটাইল।

কয়েকদিন ধরিয়া শেষ রাতে নির্ম্মলার একটু একটু জ্বর হইতেছিল, কিন্তু স্বামীকে বলিয়া তাহাকে অযথা ব্যস্ত করিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। যে রাত্রে মহীন্দ্র চলিয়া গেল সেই রাত্রের শেষ দিক্‌টায় কম্প দিয়া নির্ম্মলার জ্বর আসিল। সকাল বেলা আর উঠিয়া বসিবার ক্ষমতা রহিল না। যদুর মা বুড়া মানুষ, রাত্র থাকিতেই উঠিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা একাকী সারাটা দিন রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতের মতনই পড়িয়া রহিল। একবার কহিয়া উঠিল "জল দেও—" কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিশ্বাস ফেলিল। স্বামী ত এখন আর কাছে নাই, সে যে প্রবাসে। কোন রকমে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া জল আনিতে যাইতেই নির্ম্মলা মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। সারাটি দিনে আর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি বাড়িয়া চলিল। যদুর মা ঘরে ঢুকিয়াই কহিল "কৈগো ছোট বউঠাকরুণ, এরই মধ্যে আলো নিভালে।" সন্ধ্যার পর নির্ম্মলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"শরীরটা ভাল লাগচে না যদুর মা তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি।" রাত্রে নির্ম্মলার জ্বর আরও বাড়িয়া উঠিল। সারারাত্র অজ্ঞান হইয়া কাটাইয়া যখন চক্ষু মেলিল তখন দেখিল বেলা হইয়াছে। যদুর মা কাছে দাঁড়াইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। নির্ম্মলা কি যেন কহিতে চাহিল কিন্তু কহিতে পারিল না। আবার দুই চক্ষু বুজিয়া আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাহার মনে হইল কে যেন মায়ের মতন আদর করিয়া সারা গায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। নির্ম্মলা ভাবিল বুঝি তাহার মা-ই আসিয়াছে। কহিল—"একটু জল দেও মা, দুদিন যে একটু জলও খেতে পাইনে।" প্রেমদা মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"আমি যে তোর দিদিরে লক্ষ্মী। দেখ দেখি চিন্‌তে পারিস্ কিনা?" বলিয়া পরম স্নেহে নির্ম্মলাকে একবার বুকের কাছে টানিয়া চাপিয়া ধরিল। প্রেমদা নির্ম্মলাকে বার্লি জ্বাল দিয়া খাওয়াইয়া দিল, এই দুইদিন ধরিয়া নির্ম্মলা একাকী এই শূন্যগৃহে পড়িয়া রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, পিপাসার সময় একটু জলও ত খাইতে পায় নাই, এই কথা মনে করিয়া প্রেমদার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল, মনে মনে কহিল—"পাপ যতখানি করেছি তার ত প্রায়শ্চিত্ত নেই কিন্তু এখন জেনে শুনে আর পাপের বোঝা ভারী করে তুলব না।" এমন সময়ে নির্ম্মলা চক্ষু মেলিয়া কহিল—"তুমি কে?" প্রেমদা নির্ম্মলার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিয়া কহিল, "আমাকে চিন্‌লিনে বোন্, আমি যে তোর দিদি হইরে" নির্ম্মলা বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল, শেষে কহিল—"চিনেছি বই কি, মাকে না চেনে কে? আচ্ছা, সেই যে অন্ধকারে চলে গেল, আর কি ফিরে আসবে না?" প্রেমদা বুঝিল নির্ম্মলা প্রলাপ বকিতেছে, হায়রে এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই কি সে শতকোটি বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া দেবরের শাসনবাক্য লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল? নির্ম্মলা ঘুমাইয়া পড়িলে যদুর মাকে সেইখানে বসাইয়া রাখিয়া প্রেমদা নিজের ঘরে যাইয়া স্বামীকে কহিল —"আজই ঠাকুরপোকে তার পাঠাও, দেরী কোরোনা, করলে শেষ দেখাটাও দেখতে পাবে না।" প্রিয়নাথ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—"এতই খারাপ হয়ে পড়েচে?" প্রেমদা আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল—"বাড়ীশুদ্ধ লোকের অভিশাপ কি আর অমনি যায়? যদুর মার মুখে যখন শুনলুম, যে লক্ষ্মী আমার দুদিন ধরে জ্বরে অচেতন হয়ে আছে তখনই কিন্তু আমার বুক কেঁপে উঠেচে, মনে হল এই তার শেষ, একটু অসুধও পড়ল না, প্রলাপের মধ্যে কেবলই ঠাকুরপোর কথাই বল্‌চে; তোমার পায় পড়ি, ঠাকুরপোকে একটিবার সংবাদ দাও আর ওবাড়ীর ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে এস।"

কালবিলম্ব না করিয়া প্রিয়নাথ ডাক্তার ডাকিতে গেল, সংসারের সকল কাজ তুচ্ছ করিয়া প্রেমদা নির্ম্মলার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল, প্রিয়নাথ মহীন্দ্রকে তার পাঠাইয়া আসিল; দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল, নির্ম্মলা একইভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিল, দুপুররাত্র অতীত হইয়া গেল, প্রেমদা জাগিয়া বসিয়াছিল হঠাৎ মহীন্দ্রের বিকৃত কণ্ঠস্বর কাণে পৌঁছিল—"যদুরমা বেঁচে আছেতরে?" শশব্যস্তে প্রেমদা দরোজা খুলিয়া দিল, মহীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই যেখানে

নির্ম্মলার রোগক্লিষ্ট শীর্ণ দেহখানি পড়িয়াছিল সেইখানে বসিয়া পড়িল, প্রেমদা কাছে আসিয়া কহিল—"শান্ত হও ঠাকুরপো," এই নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও প্রেমদাকে দেখিয়া মহীন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কহিল—"এই দেখাতেই কি তোমরা আমাকে তার করে এনেচ বড়বৌঠান?" প্রেমদা চক্ষে আচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল, মহীন্দ্র স্ত্রীর জ্বরোত্তপ্ত শীর্ণ হাত দুইখানি বুকে করিয়া সারাটা রাত্র কাঁদিয়া কাটাইল, ভোর হইতেই নির্ম্মলা চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক স্বরে কথা কহিতে লাগিল, মহীন্দ্র কাছে বসিয়া হাতপাখা করিতেছিল ও মাঝে মাঝে সযত্নে স্ত্রীর কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছিল। হঠাৎ নির্ম্মলা কহিল—"আজ কি বার বল্‌তে পার?" মহীন্দ্র স্ত্রীর মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া কহিল—"আজ যে সোমবার মণি," নির্ম্মলা কহিল—"বুধবার আস্‌বে বলে গেলে কিন্তু এলে না কেন?" মহীন্দ্র কাতরভাবে কহিল—"জানই ত চাকুরী পাওয়া সহজ নয়, এর কাছে ওর কাছে ঘুরে দিন কতক দেরী হয়ে গেল।" নির্ম্মলা বলিল—"যদি মরে যেতুম ত ফিরে এসে দেখতেও পেতে না। মহীন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"ছিঃ, ওকথা বলতে নেই, শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে, চিন্তা কি?" নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল—"আমি কিন্তু ঠিকই জানতুম যে তুমি না এলে এ প্রাণ কিছুতেই যাবে না," বলিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া কহিল—"একদিন আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছিলে আজ আবার সেই দিব্যিই কর যে আর ওদের সঙ্গে ঝগড়া করবে না," বলিয়া স্বামীর হাতদুইটি নিজের মাথার উপর চাপিয়া ধরিল, মহীন্দ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—"তাই হবে মণি, তোমাকে ছুঁয়েই দিব্যি করচি," কিছু সময় পরে নির্ম্মলা আবার কহিল—"মরে গেলেও কি লোকের সঙ্গে দেখা হয়, স্বামী স্ত্রীর কি মিলন হয়?" মহীন্দ্র চক্ষু মুছিয়া কহিল—"একথা কেন বলচ মণি?" "না-না তুমি বলনা হয় কিনা," মহীন্দ্র বলিল—'হয় বৈ কি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধত শুধু এ জগতের নয়, সে সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরের, মরে গেলেও আবার একদিন স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়।" মহীন্দ্র দেখিল নির্ম্মলার রক্তহীন বিবর্ণ মুখখানা সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলা জ্ঞান হারাইয়া স্বামীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল, মহীন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাক্তার ডাকিল, ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল, নির্ম্মলার শুষ্ক ওষ্ঠপুটে আর একবার ক্ষীণহাসির রেখা দেখা দিল, তারপর চিরবাঞ্ছিত চরণ দুইটির মধ্যে মাথা রাখিয়া জন্মের মতন চক্ষু মুদ্রিত করিল, মহীন্দ্রের চক্ষের অশ্রু-উৎস কিসের উত্তাপে যেন শুকাইয়া গেল। কোথা হইতে যেন অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে কল্যাণী মূর্ত্তিটিকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিল আজ মহীন্দ্র তাহাকেই বুকে করিয়া শ্মশানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল, প্রেমদা ধুলায় পড়িয়া আত্মঘাতী হইতে লাগিল। প্রিয়নাথ দরোজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল কিন্তু জগন্নাথ একটিবার ঘরের বাহিরও হইল না।

*　　*　　*　　*　　*

নির্ম্মলার সঙ্গে মহীন্দ্র জীবনের সকল সুখ শান্তি নদীকূলে চিতার আগুনে বিসর্জ্জন দিয়া অনেক রাত্রিতে শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিল।

*　　*　　*　　*　　*

মোহিনীর চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া জগন্নাথ দেখিল মহীন্দ্রের ঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ব্যস্তে জগন্নাথ ঘরের বাহির হইয়া জ্বলন্ত গৃহের দিকে যাইতেই পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহীন্দ্র কহিল—"ফিরে যান্ সেজদাদা, ঐ যে ঘরখানি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্চে ওর প্রত্যেক খড়গাছাটি শরীরের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে তুলেছি, ওতে আমার অধিকার নেই বললে ত শুনব না, আমার ঘর আমিই আজ পুড়িয়া ছাই করে দিয়ে গেলুম, যে ঘরটির প্রত্যেক পরমাণুটি পর্য্যন্ত আমাকে আকর্ষণ করে রাখতে চায়, সে ঘর থাকলে ত আমি বাঁচতে পারতুম না, তাই নিজের হাতেই সব শেষ করে দিয়ে গেলুম—" বলিয়াই যেখানে কিছু সময় পূর্ব্বে নির্ম্মলার চিতা জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া গিয়াছিল সেই দিকে চলিয়া গেল।

অনুতপ্ত হৃদয়ে জগন্নাথ যখন যাইয়া শয়ন করিল তখন শুনিতে পাইল নদীতীরে শ্মশান ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—"মণি, মণি আয়, ফিরে আয়—"

প্রভাত হইতেই জগন্নাথ মহীন্দ্রের খোঁজে বাহির হইল কিন্তু আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

আকুল আহ্বান।

মন্দির দ্বার মুক্ত করিয়া
রেখেছি তোমারি তরে,
পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে রেখেছি
এস দেব মম ঘরে।

তৃষিতের তৃষা এস নিবারিতে
পূর্ণ করিতে প্রাণে,
তাপিতের চিত করিতে শীতল
শান্তির সুধা দানে।

বাসনা পূরাতে এস বাঞ্ছিত
মুছে দিতে আঁখি-ধার,
বুক হতে মোর তুলে লবে এস
যতেক বেদনা ভার।

শোকের বজ্র পড়িয়াছে শত
ক্ষুদ্র বুকেতে মোর,
শ্রাবণের ধারে ঝরিয়াছে কত
তপ্ত নয়ন-লোর।

ব্যগ্র পরাণে বেদনার ভার
আর নাহি সহা যায়
আকুল আবেগে ডাকিতেছি তাই
স্থান দেবে এস পায়।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ঈশ্বরবাদ।

(৺কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ইংরাজী প্রস্তাব হইতে
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ M. A, F. S. S, F. R. E. S.
কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মধর্ম্মই ভবিষ্যতে ভারতের ধর্ম্ম হইবে। এমন কি, সমগ্র ভূমণ্ডলের ধর্ম্ম হইবে, এরূপ আশাও কেহ কেহ পোষণ করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়, কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় যে সকল আশা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহা কেবল নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে অনুরাগাতিশয্যেরই ফল মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি নির্ণয় ও উহার মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষাপূর্ব্বক প্রাগুক্ত আশা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

---

* ৺কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগের পর তিনি ৺গয়াধামে গমন করিয়া পিতৃতর্পণাদি করেন। কেশবচন্দ্র সেন সেই দিতেছেশময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত কহিল—"এ। হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যে অপরাপর হিন্দুর পাইনে।" পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতর্পণ করিলেন ইহা "আমি যে তোর"ল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাহার অসন্তোষ কিনা?" বলিয়া প‍ৃলেন এবং হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ করিয়া "কুসংস্কারপূর্ণ" হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, এরূপ ইঙ্গিতও করিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র 'Brahmo Theism in India' শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া কি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই প্রস্তাবটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা জানা আবশ্যক। "ধর্ম্ম" শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশ্বাস, উপাসনা ও নীতি-প্রণালীর বহুরূপ বিভিন্ন সমালোচনাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হয়। এই পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাতে এতরূপ মতবাদ লক্ষিত হয় যে 'ধর্ম্ম' শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কতকগুলি আস্তিক (বা ঈশ্বরবাদী) ও কতকগুলি নাস্তিক। প্রথমোক্ত মতবাদ গুলির মূলভিত্তি ঈশ্বর কল্পনা। শেষোক্ত মতবাদগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথবা অস্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষ্ফল প্রতিপন্ন করে। শেষোক্ত মতবাদের উদাহরণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও কোমতের ধ্রুববাদ।

আস্তিক ধর্ম্মবাদগুলিও বহুতর শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। একরূপ ধর্ম্মবাদ ঈশ্বরপ্রকাশিত (Revealed Theology) বলিয়া খ্যাত এবং অন্য একরূপ ধর্ম্মবাদ প্রকৃতিমূলক বা স্বভাবসিদ্ধ (Natural Theology)। প্রথমোক্ত ধর্ম্মবাদগুলি স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত অথবা ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের নিকট লব্ধ উপদেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত ধর্ম্মবাদগুলি ঈশ্বরের কল্পনা ও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নৈতিকতার নিয়মাবলী মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি হইতে প্রাপ্ত। ঈশ্বরপ্রকাশিত ধর্ম্ম আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—একেশ্বরবাদী (Monotheistic) ও বহ্বীশ্বরবাদী (Polytheistic)। প্রকৃতিমূলক ধর্ম্মও দুই ভাগে বিভক্ত, বিবেকমূলক (Rational) ও সহজ-জ্ঞানমূলক (Intuitional)। শেষোক্ত ভাগটি পুনরায় বিভাজ্য, কারণ উহার কতকগুলি বিবেকসংশ্লিষ্ট ও কতকগুলি বিবেক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট।

এখন দেখা যাউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক,—(১) ইহার মতবাদ (২) ইহার নৈতিক উপদেশাবলী। দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলের স্বীকৃত এমন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, যাহা হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মবাদের এই দুইটি অপরিহার্য্য বিষয়ের পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়। কেবল "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে, যাহাতে উক্ত ধর্ম্মের প্রধান মতগুলি এবং সংস্কৃত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত কতিপয় নীতিকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমি মতগুলির কথাই প্রথমে আলোচন করিব। নৈতিক উপদেশ সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা যাইবে। মতগুলি স্থূলতঃ এইরূপে বিবৃত করা যায়:—

"একমাত্র ঈশ্বর আছেন অনন্তকালব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্রবিদ্যমান। তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অদ্বিতীয়, সকল মঙ্গল ও জ্ঞানের আকর, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি তুলনারহিত পরমাত্মা। তাঁহার উপাসনাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আস্তিক। কিন্তু আস্তিক মতবাদের কোন্ শ্রেণীতে ইহার স্থান? ঈশ্বর প্রকাশিত আস্তিক মতবাদ আছে, আবার যাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত নহে এরূপ আস্তিক মতবাদও আছে। শেষোক্ত শ্রেণীকে সংক্ষেপার্থে আমি মানসপ্রসূত (Metaphysical) বলিব।

"পুস্তকের নাম—Brahmo Theism in India (ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ঈশ্বরবাদ) ইংরাজী ভাষায় লিখিত, শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত. বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম মানুষের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং ভারতবর্ষে (উহা) প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই (Brahmoism inadequate to the wants of man and not likely to be prevalent in India) ২৪৯ নং বৌবাজার রোড, ষ্টানহোপ প্রেসে আই, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ৭ই এপ্রিল ১৮৬৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ, ১০০ ছাপা হইল। গ্রন্থস্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।"

আমরা নিম্নে এই প্রস্তাবটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিতেছি। হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর কি ব্রাহ্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর সে সম্বন্ধে কোন সম্পর্কে বিতর্কের পুনরুত্থাপন আমাদের অভিপ্রেত নহে। কবি-সম্রাট হেমচন্দ্রের এই লুপ্তপ্রায় এবং বাঙ্গলায় অপ্রকাশিতপূর্ব্ব প্রস্তাবটি বাঙ্গালী পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে এই আশায় আমরা উহা 'মালঞ্চ'র পাঠকগণকে উপহার দিলাম। অনুবাদ অযোগ্য হইলেও, আশাকরি, পাঠকগণ উহা হইতে হেমচন্দ্রের অসাধারণ তর্কশক্তির পরিচয় পাইবেন। এই প্রবন্ধে হেমচন্দ্র যে গভীর চিন্তাশীলতা, সতর্ক বিচারশক্তি, আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তার্কিকগণের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকাখানিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে ও মানবের নৈতিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল উপদেশবাক্য আছে তাহা ঈশ্বরবাক্যমূলক নহে, পরন্তু মানবের বুদ্ধি অথবা সহজজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ ইহা মানসপ্রসূত আস্তিকধর্ম্ম (Metaphysical theism)। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম আধুনিক য়ুরোপের প্রকৃতিমূলক আস্তিক ধর্ম্মবাদ শ্রেণীর যে বহুবিধ ধর্ম্মবাদ আছে তাহারই অন্যতম। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে ঈশ্বরবাক্যই আস্তিক ধর্ম্মবাদগুলির প্রাণস্বরূপ। কি হিন্দু, কি খৃষ্টিয়ান, কি মুসলমান সকলেই ঈশ্বরপ্রকাশিত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে ; এবং বহ্বীশ্বরবাদী গ্রীক্ ও রোমীয়গণও অরেকল্ নামক দৈববাণীমন্দিরে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতে যাইত। তাহার পর কিন্তু এক অভিনব দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দৈব ও নৈতিক রহস্যোদ্ঘাটনে মানবচিত্তকেই একমাত্র সম্বল করিয়াছে।

প্রকৃতিমূলক ঈশ্বরবাদ প্রথমতঃ বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তিকেই সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় না দেখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সহজজ্ঞান (Intuition) নামক এক গূঢ়তর বৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বর বাক্যের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না দেখিয়া, অবশেষে বুদ্ধিবৃত্তি ও সহজজ্ঞান উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে কিরূপ ভাবেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেবল বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন অথবা কেবল সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছেন অথবা উভয়ের সংযুক্ত শক্তির সহায়তা লইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। আমি দুইটি বৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করিব। প্রথমে বিবেকের বিষয় দেখা যাউক। এই বৃত্তির সহায়তায় কি আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে উপনীত হইতে পারি ? প্রকৃতিমূলক আস্তিক ধর্ম্মবাদিগণ বলেন, হাঁ পারি। এই মতের ভিত্তিস্বরূপ প্রধান তর্ক এই যে, মানব মানসনেত্রে প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যে ও ঘটনাবলীতে সঙ্কল্পের (design) লক্ষণ দেখিতে পায় এবং তাহা হইতে একজন মহাসঙ্কল্পকের কল্পনায় উপনীত হয়।

আমার বিবেচনায় এ তর্কটিতে একটি বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সহজজ্ঞানের কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী এবং তাহাদের নিয়ম ও পারম্পর্য্যই মানবচিত্তের গোচর হয়। কারণ ও কার্য্যের অনুক্রম ও প্রণালীর সহিত সঙ্কল্পের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ কোথায় ? কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং উক্ত কার্য্য কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী। ইহা ব্যতীত মনুষ্যের মন আর কি জানিতে পারে ? কারণ, কার্য্য, এবং ঐ সকল নিয়ম যে কাহারও চিন্তা বা সঙ্কল্প-প্রসূত তাহা কে বলিল ? সঙ্কল্পের অস্তিত্বই প্রমাণ করিতে হইবে কিন্তু তাহা না করিয়া প্রকৃতিমূলক আস্তিক ধর্ম্মবাদিগণ উহাকে স্বীকৃত বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহার উপর সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব রচনা করেন, এবং শুদ্ধ তাহাই নহে, তাঁহাকে আবার বিশ্বের শাসনকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করিয়া বিনা প্রমাণ প্রয়োগে স্বীকার করিয়া লন। ইহা তর্কের নিয়ম বিরুদ্ধ। তর্ক বা যুক্তির দোহাই দিয়া আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে প্রকৃতির দৃশ্যমান ঘটনাবলীর সমষ্টির একটি আদি কারণ আছে। কিন্তু এই আদি কারণের প্রকৃতি কি ? সেটা কি রাসায়নিক (chemical) না স্থিতিশীল (statical) না গতিশীল (dynamical) ? সেটা কি জড় না জীবিত ? সেটা কি জ্ঞানহীন শক্তি, না বিবেকযুক্ত চেতন পদার্থ ? যদি বিবেকযুক্ত চেতন পদার্থ হয়, তবে তাঁহার গুণ ও চিত্তের ভাব ও বৃত্তি সকল কি কি ? যুক্তিদ্বারা কি আমরা এই সকল বিষয় অবগত হইতে পারি ?

প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদিগণ (Natural Thiologists) বলেন যে এই আদি কারণ এক বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক গুণবিশিষ্ট পদার্থ। যে যুক্তিপ্রণালীতে এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হন তাহা এই যে, কার্য্যমাত্রেরই তৎসদৃশ উপযুক্ত কারণ আছে, মনুষ্য বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক গুণবিশিষ্ট সুতরাং মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তাও সেইরূপ বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন। কিন্তু এই আদি কারণ কেবল আধ্যাত্মিক গুণবিশিষ্ট হইবে কেন ? মন ও আত্মার ন্যায় জড়জগৎ এবং মানবদেহের জড়াংশও সেই একই কারণ হইতে উদ্ভূত। তবে ঐ যুক্তি অনুসারে উক্ত আদিকারণও জড়গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত, অথবা জড় এবং আত্মা উভয়বিধ পদার্থের

সংমিশ্রণ হওয়া উচিত। আমরা এ পর্য্যন্ত ত কোন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক কারণ হইতে জড়গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখি নাই অথবা কোন জড়পদার্থ হইতে আধ্যাত্মিক জীবের উৎপত্তি দেখি নাই।

ধরিয়া লইলাম এই আদিকারণ আধ্যাত্মিক চেতন পদার্থ। যুক্তিসহায়তায় আমরা কি তাহার গুণাবলী, চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব অবগত হইতে পারি? এ বিষয়ে আমাদের নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, নতুবা এরূপ পদার্থের পূজা অসম্ভব। কিন্তু মানববুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। কেবল অনুভূতির দ্বারা ইহা দর্শন ও বিচার করিয়া থাকে এবং সেই অনুভূতিগুলি, সহজজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলে, কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যিক অবস্থার প্রভাবে বিচলিত হইয়া থাকে; সুতরাং মানববুদ্ধির সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমপ্রমাদ ও একদেশদর্শিতায় কলুষিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব যুক্তি ঈশ্বরের গুণাবলি সম্বন্ধে কেবল সম্ভাবনার আভাস মাত্র দিতে পারে।

মনুষ্যের নৈতিক ও চিত্তবৃত্তিঘটিত গুণগুলি ঈশ্বরেও আছে বলিয়া অনুমান করা হয়, কিন্তু শান্ত জীবের গুণাবলীর সহিত অনন্তস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টার গুণাবলীর সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি? উদাহরণস্বরূপ বিবেচনা করা যাউক অপূর্ণ নরজীবের গুণাবলীর পর্য্যালোচনাদ্বারা ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায়পরতার বিচার করা কি সম্ভব বা যুক্তিসঙ্গত? বিশ্বজগতে মানব নয়নের বহির্ভূত অন্যান্য বহু ব্রহ্মাণ্ড ও মানববুদ্ধির অগম্য বহুশ্রেণীর সৃষ্টজীব বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং আমাদের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনাকালে উহাদের বিষয়ও চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা ন্যায়, অন্যায়, সুবিচার, দয়া পাপ ও মুক্তির বিষয় যেরূপ ধারণা করিয়াছি তাহা হয়ত একজন সর্ব্বজ্ঞ বিচারকের ধারণা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। অতএব আমরা আদিকারণকে যে সকল গুণে সজ্জিত করি তাহা কেবল মনুষ্যজাতির গুণাবলীর কল্পিত উৎকর্ষের সারসঙ্কলন মাত্র।

এতদ্ব্যতীত যদি তুলনা দ্বারাই মীমাংসা করিতে হয় তবে মনুষ্যস্বভাবের দোষগুলিই বা বর্জ্জিত হয় কেন? দোষত্যাগ করিয়া কেবল গুণগুলিই বা গ্রহণ করা হয় কেন?

মানুষের দয়া আছে বলিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায় ঈশ্বরেরও দয়া আছে এবং ঈশ্বর অসীম বলিয়া তাঁহার দয়াও যদি অসীম হয় তবে তাঁহার ক্রোধও ত অসীম হওয়া উচিত। যদি ঈশ্বরের প্রেম অনন্ত হয় তবে তাঁহার বিদ্বেষই যে অনন্ত হইবে না কেন? এক কথায়, যদি মনুষ্যের স্বভাব হইতে ঈশ্বরের গুণাবলী সৃজন করিতে আরম্ভ করি তবে মনুষ্যের সকল দোষগুণই ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করিতে আমরা বাধ্য হইব।

কিন্তু যদি স্বীকারই করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ আমরা যুক্তিদ্বারা এরূপভাবে নির্ণয় করিতে পারি যে তাহা খাঁটী সত্য না হইলেও সত্যের কাছাকাছি যায়, তবে তাহাতেই কি মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে? মানবহৃদয় কি আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা করে না? ঈশ্বর আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন, তিনি প্রাণদানও করেন হরণও করেন, তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে দণ্ডিত করেন এবং সাধুকে ভালবাসেন ইহাই কি যথেষ্ট? মানববুদ্ধি এত কৌতূহল পরবশ যে ঈশ্বর কিরূপ, কোথায় আছেন ও কোথা হইতে আসিবেন, এ সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে এবং কেন সৃষ্ট হইল? পাপ জগতে কোথা হইতে আসিল? পাপ ও মৃত্যুর সৃষ্টিকর্ত্তা কে? জীবনটা কি এবং মৃত্যুই বা কি? যে ভঙ্গুর দেহের মধ্যে আত্মা বাস করে তাহার ন্যায় আত্মাও কি ক্ষণস্থায়ী? যদি না হয় তবে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কোথায় যাইবে? কোথায় এবং কি ভাবে উহা মৃত্যুর পর গৃহীত হইবে পাপীগণের কিরূপ শাস্তি হইবে? এবং ধর্ম্মাত্মাগণের কোথায় এবং কি পুরস্কার হইবে?

এই সকল এবং এতৎসদৃশ অন্যান্য অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, এবং বিশ্বনিয়ন্তা নৈতিক সংবিধানের আপাতঃদৃশ্য বহুবিধ বিরোধিতার সামঞ্জস্য করিতে হইবে। কিন্তু এই সকলের বিধাতা ভিন্ন আর কে তাহা করিতে সমর্থ? মানববুদ্ধি এই সকল দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, কুটিল দার্শনিক ব্যূহমধ্যে পথ হারাইবার ভয় নাই কি? এ সকল বিষয়ে দার্শনিক বিচার আরম্ভ করিলে তাহা কি অবশেষে সংশয় ও জটিল তর্কের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িবে না? এইজন্যই প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদ সর্ব্বদাই টলটলায়মান— একবার যুক্তির দক্ষিণবাহুর উপর নির্ভর করিতেছে, আর বার সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিতেছে। এইরূপ হইবারই কথা। ঈশ্বরবাক্যের বন্ধনরজ্জু না থাকিলে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রতি-

মুহূর্ত্তে বায়ুতাড়িত পোতের ন্যায় দিগ্বিদিকে ভাসিয়া বেড়াইবে তাহার সন্দেহ নাই।

উপরিলিখিত আপত্তিগুলি খণ্ডন করিবার একমাত্র উপায় বিদ্যমান আছে, তাহা এই—যে ঈশ্বর আছেন এইটুকু মাত্র বিশ্বাস থাকিলেই মনুষ্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে কোমতের ভাষায় নিম্নলিখিত উত্তর মাত্র প্রদান করিতে পারি ; এরূপ মত কীদৃশ পিচ্ছিলভূমিতে দণ্ডায়মান তাহা তিনি যথার্থরূপে তাঁহার স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"যখন এই দার্শনিক মতবাদ জড়জগৎ হইতে প্রসারিত হইয়া ক্রমে মানবের প্রতি প্রযুক্ত হইল এবং মনুষ্যের নৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতিতে ইহার মূলমন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত হইল, তখন একেশ্বরবাদ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল যে তাহার আর ফিরিবার পথ রহিল না। সাক্ষাৎ ঈশ্বরলব্ধ চিরস্থায়ী উপদেশের প্রতি স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীনবশতঃ যে বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল তাহা এখানে তর্ক বা প্রমাণ প্রয়োগের আশ্রয় ও অধীনতা গ্রহণ করিল। কিন্তু ঐ সকল তর্ক বা প্রমাণ সর্ব্বদাই প্রতিবাদ ও খণ্ডনের আশঙ্কাযুক্ত। যেমন "প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদ" এই অসঙ্গত নামে অভিহিত প্রমাণপরম্পরা। এই ঐতিহাসিক আখ্যা হইতেই তর্ক ও বিশ্বাসের ক্ষণিক সম্মিলন সূচিত হয়। ইহার পরিণাম তর্কে বিশ্বাসের লোপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে পুরাতন ঈশ্বরকল্পনা এবং নূতন প্রকৃতিকল্পনা এই পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তু একত্রিত হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে ঈশ্বরবাদ (Theology) অতিপ্রাকৃতিক দর্শনের (Metaphysics) কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী কল্পনার আপাতিক সামঞ্জস্যবিধানের জন্য স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞানের সাহায্যতায় এরূপ কল্পনা করা হইল যে একজন ঈশ্বর আছেন তিনি কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সৃজন করিয়া নিজে কখন তাহা পরিবর্ত্তন করিবেন না এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্রকৃতির হস্তে চিরদিন ও বিশেষভাবে পালন করিবার জন্য অর্পণ করেন। এইরূপ কল্পনার সহিত রাজনীতিকগণের ব্যবস্থাধীন রাজতন্ত্রের (Constitutional Royalty) নিকট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই কল্পনাটীতে অতিপ্রাকৃত দর্শনের পরিষ্কার ছাপ দেখা যায়। ইহাতে প্রকৃতিকেই প্রধান চিন্তা ও কৌতূহলের বস্তু করা হইল—এবং পরমেশ্বরকে চিন্তা হইতে বহুদূরে এরূপ অনধিগম্য স্থানে স্থাপন করা হইল যে স্বভাবতঃই তাঁহার অন্বেষণ কার্য্য হইতে চিন্তা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইল। জনসাধারণের সদ্বিবেচনা এ মতবাদ কখনই গ্রাহ্য করে নাই, কারণ ইহা ঈশ্বরবাদের অন্তর্ভূত ঈশ্বরে যথেচ্ছাচারিতা ও অনন্তকালব্যাপী ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি কল্পনার বিরোধী। সুতরাং সাধারণ লোকের চিত্তবৃত্তি যে প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদের এতগুলি সুবিজ্ঞ প্রতিপাদককে নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।" *

কিন্তু বিবেক একক ঈশ্বর বাক্যের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিলেও সহজ জ্ঞান একক অথবা বিবেকের সহায়তায় উচ্চ কার্য্য সমাধা করিতে পারে না কি ? এই প্রশ্নই এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে।

আমি মনুষ্যের অনুভূতিগুলির প্রকৃতি ও মূল সম্বন্ধে দুরবগাহ তর্কে নিমগ্ন হইতে চাহিনা, অথবা যাহাকে প্রাথমিক নীতি (first principles) বলে তাহা বাস্তবিক ভূয়োদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণের ফল কি না তাহারও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব না। এই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে চিরকাল বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং ম্যাক্‌কষ্ সাহেব বলেন যে এই তর্কে অনেকেই দিশাহারা হইয়া বিভ্রমপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। মানবচিত্তের সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ও উক্ত মতবাদীদের প্রচারিত শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া আমি কেবল এইটুকু পরীক্ষা করিতে চাহি যে ঈশ্বরের কল্পনা এবং তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজ জ্ঞানলব্ধ কি না ; এবং তাহা হইলেও কোন আস্তিক ধর্ম্মবাদের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইলে ঈশ্বর বাক্যের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে কি না ?

"সহজ জ্ঞানসকল" স্বভাবসিদ্ধ, অপরিহার্য্য এবং সার্ব্বজনীন" † বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন উহারা স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট নিত্যবস্তু এবং একটি পৃথক্ মনোবৃত্তির দ্বারা অনুভূত হয়। অপর কেহ কেহ বলেন যে উক্ত জ্ঞানসকল ক্রমবিকাশ সাপেক্ষ এবং "মনোবৃত্তিগণের সহিত উহাদের নিকট সম্বন্ধ আছে।" ‡

* Positive Philosophy, translated by Harriet Martineau V. II. pp. 421 and 422.

† See Mc. Cosh. Intuitions of the mind, Introduction p. 4. Revised edition. ‡ Ibid p. 18.

প্রথমে স্বাধীন সহজ জ্ঞানের মত আলোচনা করা যাউক। যাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন যে কোন কোন বিশেষ বিষয় অনুভব করিবার জন্য একটি পৃথক চিত্তশক্তি আছে। উহা বিবেক, স্মৃতিশক্তি বা চিন্তাশক্তির অধীন নহে। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল ব্যক্তিই কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর তথ্য এই শক্তির বলে সমানরূপে বিশুদ্ধ ও অভ্রান্তভাবে অনুভব করিতে পারে এবং ঐ সকল তথ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ বলা যায়।

এই শ্রেণীর অনুভূতি গুলির মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকেও স্থান দেওয়া হয় এবং সহজ জ্ঞানলব্ধ তথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগের পোষকতার জন্য বিবেক বা ঈশ্বর বাক্যের আবশ্যকতা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে সহজজ্ঞানলব্ধ তথ্য "স্বভাবসিদ্ধ, অপরিহার্য্য ও সার্ব্বজনীন।" অতএব আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যদি সহজজ্ঞানলব্ধ হয় তবে সকল যুগে এবং সকল দেশে সকল মনুষ্যেরই উক্ত জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা উচিত। তাহাই যদি হইল তবে এমন কেন দেখা যায় যে কোন কোন সমগ্র জাতি ও সমাজ বিশেষের মধ্যে শুধু ঈশ্বর কেন কোন দেবতারই কল্পনা মানব-হৃদয়ে বর্ত্তমান নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটীর সত্যতা সম্বন্ধে একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারক সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমেরিকার অসভ্য জাতীয় আবিপোন শ্রেণীর একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তাহার বিবেচনায় কে এই উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্রময় গগনমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণই বা এ বিষয়ে কি মত পোষণ করিতেন। সে উত্তর দিল, "আমার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ কেবল পৃথিবীর বিষয়ই চিন্তা করিতেন এবং ভূমিতে অশ্বদের জন্য প্রচুর তৃণ ও জল পাওয়া যাইবে কি না এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। আকাশে কি হই-তেছে বা কে গ্রহ নক্ষত্র সৃজন করিল, তাঁহারা এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করেন নাই।" * উক্ত বাক্যের লেখক বলেন যে ঐ জাতীয় বর্ব্বরদিগের ভাষায় ঈশ্বর বা দেবতা বুঝায় এরূপ কোন শব্দ নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় অতি অল্প, কিন্তু এরূপ একটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া গেলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যে সহজজ্ঞানলভ্য এরূপ মত খণ্ডিত হইয়া যায়।

অপিচ, যদি ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান মনের স্বভাবগত হয়, প্রাচীন ও ইদানীন্তন কালে মানবগণের মধ্যে প্রতিহিংসা-পরায়ণ, কামপরবশ, বা নিষ্ঠুর ঈশ্বরের কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইল? ঈশ্বরজ্ঞানে অবশ্যই ঈশ্বরের গুণাবলীর জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত, এবং এরূপ জ্ঞান অবশ্যই একই বস্তু এবং একই গুণাবলী নির্দ্দেশ করিবে। অতএব, ঈশ্বরজ্ঞান যদি প্রকৃতি-গত, আজন্মলব্ধ এবং সহজজ্ঞানমূলক হয়, তাহা হইলে কি ঈশ্বরসম্বন্ধে এতরূপ বিকৃত কল্পনা মনে স্থান পাইতে পারে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা মিথ্যা ও কাল্পনিক, অর্থাৎ যে সকল লোকের মনে এরূপ ধারণা আছে, তাহাদের ঈশ্বরজ্ঞান আদৌ নাই। হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান যে সহজজ্ঞান এবং সহজজ্ঞানের যে একটি পৃথক এবং স্বাধীন চিত্তশক্তি, এরূপ মতের কি হইল? ম্যাক্ কশ "অন্তর্নিহিত জ্ঞানবাদের একজন উৎসাহশীল পৃষ্ঠপোষক হইলেও এরূপ বিশেষ চিত্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকারের বিরোধী। তিনি বলেন:—

"এই গ্রন্থে সহজজ্ঞানের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে যাঁহারা এই মতের পোষকতা করেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে এইরূপ সহজ সংস্কার বাস্তবিক বর্ত্তমান আছে এবং ইহা মৌলিক অর্থাৎ বিশ্লেষণ দ্বারা বিভাজ্য নহে ও স্বাধীন,—অর্থাৎ অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না। তাঁহাদিগকে উক্ত সহজজ্ঞানটীর ক্রিয়াপ্রণালীও স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। উহা বুদ্ধিতে কি চিত্তের আবেগে কি শুদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা বলিতে হইবে। বিশেষতঃ, উহা যে বস্তু প্রত্যক্ষ ও প্রকটিত করিল, তাহার যথার্থ স্বরূপ কি, ও তাহার কতটুকু প্রকটিত হইল, তাহাও বলিতে হইবে। ঈশ্বর কি ভাবে প্রকাশিত হই-লেন—আত্মারূপে বা বস্তুরূপে? শক্তিরূপে, না কারণরূপে, না কেবল জীবনরূপে? তিনি কি জীবিত ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইলেন, না অনন্ত ঈশ্বররূপে, না পবিত্র অর্থাৎ

* Max Muller's History of Sanskrit Literature, second edition, p. 539.

যথাসম্ভব বিশুদ্ধ উত্তর দিতে হইবে। এবং সেই উত্তরের সহিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষতঃ ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল অপকৃষ্ট কল্পনা এতদিন মানবচিত্তে স্থান পাইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যদি আংশিক বা অঙ্গহীন ঈশ্বরমাত্র উক্তরূপে আবিষ্কৃত হন, যদি একটা গুণহীন সত্তা মাত্র অথবা অন্ধশক্তি, অথবা ছায়াময় জীবন বা ক্রিয়াশীলতা মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট গুণগুলিদ্বারা ভূষিত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অপর পক্ষে, যদি উক্তরূপে আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে জ্ঞান ও উৎকর্ষ ও অসীমতার সমস্ত গৌরবে দীপ্যমান পরমেশ্বর ষোড়শকলায় পূর্ণ হইয়া চিদাকাশে উদিত হন, তবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে যে কিরূপে এতদিন ধরিয়া মানবজাতি তাঁহাকে এরূপ বিকৃত, অন্ধকারময় এবং ভয়ানক আকারে দর্শন করিল।" †

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে ঈশ্বর-জ্ঞান এবং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কোন বিশেষ সহজ জ্ঞানশক্তি বা মানসেন্দ্রিয়ের অধিকারভুক্ত নহে। বাস্তবিক এরূপ শক্তি বা চিত্তবৃত্তি অলীক কল্পনাসম্ভূত।

অপর কেহ কেহ বলেন, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকরূপে আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান প্রকৃতিসিদ্ধ সহজজ্ঞান। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক ধারণাগুলি কতদূর স্বভাবজ। এই মতাবলম্বী দার্শনিকগণের মতগুলি ম্যাক্‌কশ বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, –

"ঈশ্বর বন্দনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবজাত একথা যথার্থই বলা যাইতে পারে। মনুষ্যকে ইহা অন্বেষণ করিতে হয় না। ইহা আপনা হইতেই আইসে। মনুষ্যকে কেবল ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে এবং ইহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই চারি-দিক হইতে ইহা আসিয়া চিত্ত অধিকার করিবে। যেমন উদ্ভিদ বা প্রাণী বীজ হইতে আপনিই উদ্ভূত হয়, ইহাও সেইরূপ হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আপনিই উৎসারিত হইবে। যেমন সূর্য্য হইতে আলোক আইসে, ইহাও সেইরূপ প্রকৃতির সকল পদার্থ হইতে আসিয়া মানবচিত্তে প্রতিভাত হইবে।" ‡

তাঁহার মতে নানা উপকরণের সংযোগে মনুষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞানে উপনীত হয়। তিনি বলেন, উক্ত "উপ-করণগুলি কতক পরীক্ষালব্ধ এবং কতক সহজজ্ঞানলব্ধ।" *

"(১) কতকগুলি তথ্য। তাহা সাধারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা অবগত হওয়া যায়।"

(২) কার্য্যকারণ বিধি। বস্তুটী উপস্থিত হইলেই সহজ জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। বস্তুটী একটি কার্য্য এবং সহজজ্ঞান তাহার কারণ চাহে।

(৩) অন্যান্য সহজজ্ঞান অন্যান্য তথ্য অবলম্বন করিয়া বিচারের সহায়তা করে এবং ঈশ্বরকে বিবিধ গুণে ভূষিত করে।"

এই তিনটি মূল কথার তিনি অবতারণা করিয়া বহুবিধ যুক্তিদ্বারা উহা সমর্থিত করিয়াছেন। উক্ত যুক্তি সকল প্রকৃতির ব্যাপারাদিতে যে সঙ্কল্পের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান, আমি চিন্তা করিতেছি, প্রীতি করিতেছি এবং কামনা করিতেছি, এইরূপ অহংজ্ঞান হইতে সংগৃহীত। সংক্ষেপে আমি পূর্ব্বেই যে সকল যুক্তির কথা বিবেকসহায় প্রকৃতিমূলক ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। যে অধ্যায়ে তিনি এই সকল অভিমতের সমর্থন করিয়াছেন, তাহা যিনি পাঠ করিবেন তিনিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান এবং ঈশ্বরে আরোপিত গুণাবলির ভিত্তি বিবেক বা যুক্তির উপরই স্থাপিত। তথাপি ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে কিরূপে মানবহৃদয় হইতে উৎসারিত স্বতঃসিদ্ধ সহজজ্ঞান বলা হয় ইহা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমি বুঝিতে পারি নাই। যদি ভূয়োদর্শন হইতেই এই জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং প্রকৃতির বাহ্যিক ব্যাপারাদি এবং আমাদিগের মনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারাদির পর্য্যা-লোচনা ব্যতীত আদিকারণ ও ঈশ্বরের নৈতিক গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম না হয় তবে এই জ্ঞানকে সহজজ্ঞান কেন বলিব এবং অন্যান্য যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়

† Intuitions of the mind, revised edition p. 378.

‡ Intuitions of the mind p. 377.

* Ibid pp. 379-89.

রহিল ? হইতে পারে, যে ঈশ্বরজ্ঞানের কতকগুলি উপকরণ আমাদের সহজ জ্ঞানশক্তি দ্বারাই অনুভূত হয় যথা,—কার্য্য-কারণবিধি এবং অহংজ্ঞান। ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে যে এই সকল মূল উপকরণ সহজজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সিদ্ধান্তটী যে বিশুদ্ধ যুক্তিমূলক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তেই এইরূপ সহজজ্ঞানলব্ধ উপাদান থাকে, সুতরাং আমাদের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানকেই সহজলব্ধ, ও স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। অন্যান্য অনেক তথ্যেই (উক্ত গ্রন্থকারের ভাষায়) "আমরা অন্বেষণ না করিয়া কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা এবং মনুষ্য-সাধারণ চিত্তশক্তি প্রয়োগদ্বারা উপনীত হইয়া থাকি।"* অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আমাদের তর্কের উপাদান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হয় বটে, কিন্তু সেটা উপযুক্ত উপাদান-সুলভ নহে বলিয়া, তথ্য বা জ্ঞাতব্যবিষয় বা সিদ্ধান্তটা সহজজ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া নহে। তাহা ছাড়া, উল্লিখিত মতটীর সহজজ্ঞানলভ্য তথ্যের সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্য কোথায় রহিল ? অর্থাৎ উহা "স্বভাবসিদ্ধ, অপরিহার্য্য ও সার্ব্বজনীন" কিরূপে হইল ? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বর-বিশ্বাস সার্ব্বজনীন নহে। ম্যাক্‌কশ স্বয়ং যুক্তি প্রয়োগদ্বারা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরবিশ্বাস যে স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন, এ মতটী ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত। কিন্তু এই জাতীয় দার্শনিকগণের মতগুলি যদি যুক্তিপোষিত, প্রকৃতিমূলক ঈশ্বরবাদের সহিত বস্তুতঃ এক বলা যায়, কেবল নাম মাত্রে ভেদ থাকে, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এবং ধ্রুববাদের প্রবর্ত্তক তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় যে সকল তর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

কিন্তু আমাদের ঈশ্বর ও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা যেরূপই হউক, ঈশ্বরবাক্যের অভাবে ঈশ্বরবাদ থাকিতে পারে কি না সে বিষয়ে এখনও মীমাংসা হইল না। ইহা বড়ই বিচিত্র বোধ হয় যে ম্যাক্‌কশ স্বয়ং নিজ তর্কগুলির বিরুদ্ধে উক্ত প্রশ্নের "না" উত্তরই দিয়াছেন। কেবল একটু মাত্র বিশেষ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যাঁহারা এ বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে চর্চ্চা করিবেন, তাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান প্রকৃতিমূলক ঈশ্বরবাদ-কর্ত্তৃক দৃঢ়ীভূত ও বিস্তারিত হইতে পারে। তিনি বলেন, "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঈশ্বরবন্দনা জাগরিত ও জীবিত রাখিবার পক্ষে ঈশ্বরবাক্যই প্রকৃষ্ট উপায় এবং তাহাই সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে। অতএব শিশুদিগকে অতি অল্প বয়সেই উহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উপায় দ্বারাই আমরা নিঃস্বব্যক্তির গৃহে ও বিষয়ী ব্যক্তির অন্তরে জ্যোতির রেখা প্রবেশ করাইতে পারি এবং এই উপায় দ্বারাই তাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত করিতে পারি।" সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিক কোমৎও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন, "বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ যেভাবে অতি-প্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদিগণ (Metaphysical Deists) দ্বারা প্রচারিত হয়, অর্থাৎ যে মতে একজন মাত্র লোকোত্তর ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার ও মনুষ্যের মধ্যে কেহ মধ্যস্থ নাই—একটা ছায়াময় কল্পনা মাত্র; তাহার উপর বুদ্ধি, নীতি বা সমাজের যথার্থ হিতসাধক কোন ধর্ম্মমতের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না।" †

আমাদের মনে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও তাহাই বলে,—যে যুক্তি অনুসারে, এবং বহু লোকের উপকারার্থই হউক বা অত্যল্প সংখ্যক লোকের উপকারের জন্যই হউক, যে ধর্ম্মবাদ ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া এবং আমাদের উচ্চতম প্রেম ও ভক্তির পাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহার ভিত্তি ঈশ্বর প্রকাশিত উপদেশের উপর স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রতীতি না থাকিলে, তিনি যে সত্য সত্যই চিন্তা ও অনুভব করেন এ সম্বন্ধে অখণ্ডনীয় আশ্বাসবাক্য না পাইলে, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিবেকানুমোদিত প্রেম বা ভক্তি বা জীবন্ত বিশ্বাস হইতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত কে আমাদিগকে এরূপ আশ্বাসবাণী দিতে পারেন ? তাঁহার নিজ বাক্য শুনিলেই আমরা তাঁহার প্রকৃতি ও চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। তিনিই বলিতে পারেন, কি তাঁহার প্রিয় এবং কি তাঁহার অপ্রিয়। তিনিই আমাদের যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। কি কার্য্য করিলে তিনি প্রীত হইবেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বুদ্ধির অগম্য এমন একটি ছায়াময় বস্তুর পূজা—যাহার গুণাগুণ

* Intuitions of the mind p. 388.

† Positive Philosophy, Vol II—p 251.

আমাদিগকেই রচনা করিয়া লইতে হয়— নাস্তিকতা অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক। গিবন বলিয়াছেন, "দর্শনবিদ্যা, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা ও আশার, বড় জোর সম্ভাবনার, ছায়াময় সূচনা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে না। ঈশ্বরবাক্য ব্যতীত পরলোকের অস্তিত্ব এবং মানবাত্মা মৃত্যুর পর যে অদৃশ্য লোকে গমন করে তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বর্তমান নাই।" গিবন যদিও বিদ্রূপের ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর শাসিত এই মত পোষণ করিতে হইলে কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে সত্য।

ঈশ্বর-বাক্য যে ঈশ্বরবাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তাহার আর একটি কারণ এই যে উহা না থাকিলে উক্ত ধর্ম্মবাদের স্থায়ী ভিত্তি থাকে না। কোনরূপ ঈশ্বরবাদকে ধর্ম্মমতে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি লিখিত মূলসূত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। উহা না থাকিলে উক্ত মত দৃঢ়তা লাভ করে না। অনবরত বাদানুবাদ ও বিসম্বাদে উহা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ চিন্তা প্রবৃত্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা করিবে। অবশেষে ধর্ম্মমতটি সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক ব্যক্তির কল্পনানুসারে এক একটি পৃথক এবং বিকৃত আকার ধারণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়। এই দার্শনিক ঈশ্বরবাদটির বয়ঃক্রম এখনও অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই ইহার অবলম্বিগণ বিভিন্ন নেতার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও উপাসনায় যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য পাওয়া দুর্ঘট।

এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করিতে হইলে ঈশ্বরবাক্য অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ এই দুইটীর একটি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে :—হয় ঈশ্বরে ও ঈশ্বরবাক্যে প্রত্যয়, না হয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরবাক্য উভয়ই পরিবর্জ্জন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কি বিষয়ে আমার মতে অসম্পূর্ণ তাহা বলিলাম। এক্ষণে উক্ত ধর্ম্ম ভবিষ্যতে ভারতের প্রচলিত ধর্ম্ম হইবে কি না তাহার বিচার করিব। আমি ভারত সম্বন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিব, কারণ প্রথম অঙ্কুরে ইহা হিন্দু ঈশ্বরবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ ইহার সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রসার লাভের সম্ভাবনা (যাহা ব্রাহ্মগণ এত প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন) বর্ত্তমানকালে এত অল্প যে এবিষয় কালের বিচারাধীন রাখাই উচিত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ভবিষ্যতে ভারতের প্রচলিত ধর্ম্ম হইবে? এই প্রশ্ন দুই দিক হইতে দেখা যাইতে পারে।

(১) কেবল মতবাদ হিসাবে ইহার কতদূর প্রসার লাভ সম্ভব?

(২) প্রসার লাভ করিলেও ইহার প্রতিপত্তি কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিবে?

সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমে ইহাই নির্ণয় করিতে হইবে যে অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করিতে পারিল না কেন? হিন্দুধর্ম্ম এই যে প্রথম অপর প্রতিযোগী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাইল তাহা নহে। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাহের সহিত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল এবং মুসলমান ধর্ম্ম তরবারি সহায়তায় স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। খৃষ্টীয় জেসুয়িট, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ শত শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও হিন্দুর মানসপ্রসূত,—অধিকন্তু রাজার পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্ম হইয়াছিল। কিন্তু যদিও উক্ত ধর্ম্ম সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অধিকাংশ লোকের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তথাপি যে দেশে ইহার জন্ম সে দেশে উহার চিহ্ন মাত্র নাই। অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতবর্ষকে কঠোর শাসনাধীন রাখিয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম কোরাণ ও মহম্মদের তরবারিকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জেসুয়িটদিগের সময় হইতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ বহু চেষ্টা করিয়াছেন এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্ম এখন ভারত শাসকগণের ধর্ম্ম, তথাপি উহা ভারতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। যখন চিন্তা করা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম যৌবনশক্তি সম্পন্ন নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহার জন্ম কোন দূর অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তখন অধিকতর বিস্মিত হইতে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের এই অসাধারণ জীবনীশক্তির দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃতি, এবং সমস্ত ধর্ম্মমতের প্রসার-নীতি। সচরাচর হিন্দুধর্ম্ম অবিশুদ্ধ বহ্বীশ্বরবাদ অথবা ঘোর পৌত্তলিকতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এবং ইহাকে প্রাণ

ও রোমদেশীয় বহ্বীশ্বরবাদ ও বর্ব্বরজাতিগণের পৌত্তলিকতার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে (myst'cal pantheism) গূঢ়তত্ত্ব সমন্বিত সর্ব্বেশ্বরবাদও বলিয়া থাকেন। এইরূপ মতভেদের কারণ এই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ইহাকে দেখা হয় এবং সমগ্র বস্তুটিকে না দেখিয়া অংশমাত্র দেখা হয়। সমগ্রভাবে দেখিলে ইহার যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধ হয় এবং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বর-বাদ, বহ্বীশ্বরবাদ এবং পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ। বেদে একেশ্বরবাদের প্রাধান্য, পুরাণে বহ্বীশ্বরবাদের প্রাধান্য এবং আধুনিক পৌত্তলিক উপাসনায় উক্ত দুই মতেরই সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই মিশ্রিত ভাবের কারণ ভারতে আর্য্যগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্ভূত। ধ্রুববাদের প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কল্পনার ক্রমবিকাশের যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই যে ব্যক্তি বিশেষের হউক বা জাতিবিশেষের হউক, মনুষ্যের মন ক্রমে ক্রমে তিনটি অবস্থায় উপনীত হয়। প্রথম পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বহ্বীশ্বরবাদ এবং তৃতীয় একেশ্বরবাদ। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ বহ্বীশ্বরবাদের অবস্থা অতিক্রম করিয়া একেশ্বর কল্পনায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে আর্য্যজাতির লোকসংখ্যা ভারতে অধিক থাকায় এবং তাহাদের মন তখনও একেশ্বর কল্পনার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত না হওয়ায় তাহারা বহ্বীশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতায় আসক্ত ছিল। কালক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির সংমিশ্রণ বশতঃ আর্য্যজাতির অধোগতি হইল এবং বহ্বীশ্বর কল্পনা (যাহার চিহ্ন বেদেও দৃষ্ট হয়) পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিল। এবং তাহারই ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। এই ধর্ম্মে সকল উপাদানগুলি স্থান লাভ করিল। ইন্দ্র, যম, বরুণ, এবং অন্যান্য প্রাগ্-বৈদিক দেবতাগণ রক্ষিত হইলেন বটে, কিন্তু একজন পরমেশ্বরের অধীন হইলেন। কোলব্রুক তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবে স্থানে স্থানে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, পুরাতন দেবদেবীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যথার্থ পৌরাণিক ধর্ম্মবাদ সমগ্রভাবে লইলে এরূপ নহে। পরমেশ্বরকে একবার সিংহাসনে বসাইলে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক জাতিই পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কোন না কোন দেবতার কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু পরমেশ্বরবাদ স্থাপিত হইবার পর সে সকল দেবতাই স্বাধীন দেবতার আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া পরমেশ্বরের দাস বা সেবক স্থানীয় হইয়াছেন। এই কারণেই আমরা খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে angel প্রভৃতি অতিমানুষ, আধ্যাত্মিক এবং অমর জীবের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমার বোধ হয় উঁহারা আর কেহ নহেন পূর্ব্বোক্ত আসনচ্যুত দেবতা, এক্ষণে ঈশ্বরের স্বর্গীয় অনুচরের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা তাঁহার চিরদাস হইয়া তাঁহারই বার্ত্তা বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। হিন্দুদিগের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে। দেবতাগণ সিংহাসনচ্যুত, কিন্তু দাসের ন্যায় হীনাবস্থাপ্রাপ্ত অথবা পদচ্যুত না হইয়াও এখনও পূর্ব্বের মত নিজ নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদী বহ্বীশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিক সকল শ্রেণীর মানবেরই উপযোগী।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি এইরূপে নির্ণীত হইল। এখানে দেখা যাউক, কোনও ধর্ম্মমত প্রসারিত করিতে হইলে কি কি উপাদান আবশ্যক।

ইতিহাস হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতের বিরোধী ধর্ম্মমতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইলে শেষোক্ত মতে কোন নূতন বস্তু থাকা প্রয়োজন। এমন কোন উপদেশ তাহাতে থাকা উচিত যাহা শ্রোতৃবর্গ পূর্ব্বে শুনে নাই বা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহে। যে কোন ধর্ম্মের গতি নিরীক্ষণ করিলেই এই মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ আমি সংক্ষেপে পুরাতন বহ্বীশ্বর বাদের প্রকৃতি এবং খৃষ্টীয় ও ইস্-লাম ধর্ম্মের প্রসার বিষয়ে আলোচনা করিব।

ইহা প্রবাদসিদ্ধ যে, গ্রীক, রোমীয়, হিন্দু, মিশরীয় প্রভৃতি সকল বহ্বীশ্বরবাদই পরস্পর ক্ষমাশীল ও ঈর্ষ্যাহীন। রোমীয় সম্রাটদিগের শাসনকালে শত বিভিন্ন আকারের বহ্বীশ্বরবাদ একত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিদ্যমান ও বর্ত্তমান ছিল। অথচ, এক শ্রেণীর লোকে অপর শ্রেণীর লোককে আপনার দলভুক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে বা দলভুক্ত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। হিন্দু বহ্বীশ্বর-বাদিগণও যে কখনও অপর কোন জাতিকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে এরূপ জানা যায় নাই। এরূপ হইবারই কথা। কারণ যখন সকল ব্যক্তিরই ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে প্রায় একরূপই ধারণা ছিল,

এবং উপাসনা প্রণালীরও সৌসাদৃশ্য ছিল, তখন এক শ্রেণীর বহ্বীশ্বরবাদীর অপর এক শ্রেণীর বহ্বীশ্বরবাদীকে নিজধর্ম্মানুযায়ী আচার ও ক্রিয়াদি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য অনেক সময়ে এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের অনুকরণ করিত এবং পরস্পরের দেবতাকে আপনার দেবতার সহিত পূজা করিত, কিন্তু নিজ পুরুষানুক্রমাগত ধর্ম্ম একবারে পরিত্যাগ কখনই করিত না। এই কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে যে যে যুগে বহ্বীশ্বরবাদই প্রচলিত ধর্ম্মমত ছিল, সেই সেই যুগে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর এইরূপ একটা অব্যক্ত অঙ্গীকার ছিল যে একজাতি অপর জাতির ধর্ম্মমত ও আচারের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইহুদী জাতি যখনই কোন দেশে গিয়া বাস করিয়াছে তখনই উক্ত দেশের অনেক লোককে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে দেখা যায়। *

য়ুরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দ্রুত প্রসার হইতেও উক্ত বিষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন একেশ্বরবাদের কল্পনা, পরলোকের অস্তিত্ব ও বিশ্বজনীন দয়া ও প্রেমের উপদেশ লইয়া উক্ত ধর্ম্ম আবির্ভূত হইল, তখন যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুদেবদেবীর কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের হৃদয়ে এক নূতন তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। দলে দলে লোক নূতন ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিল। কারণ উক্ত ধর্ম্মের ঈশ্বরকল্পনা সরলতর এবং নৈতিক উদ্দীপনা উচ্চতর। কিন্তু যেইমাত্র আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী একেশ্বরবাদ ইস্লামের আকারে আবির্ভূত হইল, এবং আরব, সিরিয়া, পারস্য এবং এসিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডের অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনই খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রসারবেগ মন্দীভূত হইল। ইস্লাম ধর্ম্ম উদ্ভূত না হইলে যে যে দেশে কোরাণের আধিপত্য দৃষ্ট হয় সেই সেই দেশে বোধ হয় বাইবেলই ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া পূজিত হইত। বোধ হয়, এই কারণেই অধুনা খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে সকল দেশের লোকের নিকট একেশ্বরবাদ, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, পরলোকে (পাপপুণ্যের) দণ্ড ও পুরস্কার প্রভৃতি মতবাদ একেবারে অজ্ঞাত নহে, সে সকল দেশে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। ভারতে ও চীনদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রসার-বেগ এত অল্প যে আদৌ লক্ষ্য করা যায় না।

মুসলমানধর্ম্মের ইতিহাস হইতেও একটী উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যতদিন উক্ত ধর্ম্ম আরব, মিশর ও মূরদিগের দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, ততদিন উহার প্রসারবেগ অত্যন্ত বিস্ময়জনক হইয়াছিল। কিন্তু একদিকে স্পেনদেশ, এবং অপর দিকে ভারতবর্ষ পৌঁছিবামাত্র উহা এত বাধা প্রাপ্ত হইল যে উহার প্রসারবেগ একবারে স্তম্ভিত হইল। তদবধি হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম এই দুই সীমার মধ্যে উহা স্থির হইয়া রহিল।

উক্ত দুই বিষয় নির্ণীত করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যৎ বিস্তার বিষয়কপ্রশ্নের আলোচনায় প্রত্যাগমন করা যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের একতা পূর্ণতা বা উৎকর্ষ, জ্ঞান, দয়া এবং উপাসনায় প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুরা কি এ বিষয় উত্তমরূপে অবগত নহে? মোক্ষমূলর এ বিষয়ে কি বলেন শুনা যাউক। *

"কি প্রকৃতিমূলক, কি ঈশ্বরবাক্যমূলক, সকল ধর্ম্মমতেরই মূলমন্ত্রধ্বনি বেদের স্তোত্রগুলির মধ্যে বর্ত্তমান আছে এবং যখন প্রতিমাপূজকদিগের প্রচণ্ড গীতবাদ্যের কিম্ভূত নিনাদে আমাদের কর্ণ বধির হয়, তখনও ঐ ধ্বনি একবারে লয়প্রাপ্ত হয় না। উহার মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস, হিতাহিত বিবেচনা, ও ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন এবং ধার্ম্মিকগণকে প্রীতি করেন এই ধারণা বর্ত্তমান আছে। এই সকল তথ্য আমাদের দৃষ্টিতে যতই সামান্য বোধ হউক, উহাদিগের প্রথম আবিষ্কারের কথা ভাবিলে আমাদের মনে যে অসীম ভক্তির উদয় হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ সকল তথ্য "ঈশ্বরপ্রকাশিত" বলিলে হয়ত উক্ত শব্দের পবিত্রতার লাঘব হয়। কিন্তু 'আবিষ্কৃত' শব্দ প্রয়োগ করিলেও উহাদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়। কারণ, তাহা হইলে, পুরাতন ও আধুনিক সকল ধর্ম্মের সার তথ্যগুলিকে গ্যালিলিও এবং নিউটনের আবিষ্কারগুলির সহিত এক শ্রেণীতে নিক্ষেপ করা হয়।"

এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মকে অধুনা সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বিবেচনা করা উচিত নহে। তাহা সত্য বটে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের মিশ্রিত প্রকৃতির বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য হইলে এ আপত্তির

* Sale's Koran (preface)

* History of Ancient Sanskrit Liter. p. 538.

প্রাবল্যের অনেক হ্রাস হয়। বস্তুতঃ যীশুর প্রচারিত উপদেশের সহিত প্রটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক, ক্যালভিনিষ্টিক্ প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে সম্বন্ধ, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বেদের সহিত সেই সম্বন্ধ। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পুরাণগুলি ঈশ্বর-প্রণোদিত স্তোত্রকারগণের রচিত সূত্র ও প্রবন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুনামধারী প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই উহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। সরলতর তত্ত্বগুলির একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ এই যে উহারা অন্যান্য নিকৃষ্টতর ও অপরিশুদ্ধ ভাবের সহিত যতই মিশ্রিত হউক না কেন, উহাদের প্রভাবে নিকৃষ্টতর ভাবগুলি পরিবর্ত্তিত ও নূতন গঠনপ্রাপ্ত হয়। একেশ্বর কল্পনা একবার মনে স্থান পাইলে, উহা বহ্বীশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতার সংসর্গেও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে না। মোক্ষমূলর এই কথাটী অতি সুন্দরভাবে নিম্নোদ্ধৃত বচনে বিবৃত করিয়াছেন।

"কিন্তু বেদের বহ্বীশ্বরবাদের মধ্যে একটি একেশ্বরবাদ ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান আছে, এবং অসংখ্য দেবতার স্তবের মধ্যেও পৌত্তলিক শব্দবিন্যাসের কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এক অদ্বিতীয় ও অনন্ত ঈশ্বরের স্মৃতি গতিশীল মেঘের অন্তরালে নীলাকাশের মত বিরাজমান দেখা যায়।" একজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তির নিম্নোদ্ধৃত চমৎকারোদ্দীপক বচনও আমার এই মতের পোষকতা করে।

"পৌত্তলিকতাশব্দে যদি এরূপ বুঝায় যে আমাদের ঈশ্বর-কল্পনা কেবল একটি মৃন্ময়ীমূর্ত্তি বা প্রস্তরখণ্ডে নিবদ্ধ এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের গুণাবলীর উচ্চ ধারণাগুলি আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিয়া চিত্তকে ঊর্দ্ধে উন্নীত করিতে পারে না, তাহা হইলে আমরা বলি যে আমরা পৌত্তলিক নহি এবং পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করি, এবং যাঁহারা আমাদিগকে এইরূপ নীচশ্রেণীর পূজাপদ্ধতির পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞতা ও অযথা দোষ-দর্শিতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। কিন্তু যদি ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিতার দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা কল্পনাবলে তাঁহার গৌরবময় আত্মপ্রকাশগুলিকে মূর্ত্তির আকারে দর্শন করি, তাহা হইলে আমরা উক্ত মূর্ত্তির উপাদানগুলিকে ঈশ্বর মনে করিতেছি,' এরূপ অভিযোগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, যখন পূজার সময় প্রগাঢ় ও আন্তরিক ভক্তিরসে তন্ময় হওয়ায় আমাদের মনে জড় পদার্থের চিন্তাও স্থান পায় না? একজন প্রিয় ও ভক্তিভাজন বন্ধু পরলোকগমন করিলে তাঁহার চিত্রদর্শন করিয়া যদি আমাদের হৃদয় প্রীতি ও ভক্তিরসে পূর্ণ হয় এবং যদি আমরা কল্পনা করি যে তিনি স্বয়ং চিত্রে বর্ত্তমান থাকিয়া চিরাভ্যস্ত প্রীতি ও স্নেহের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দর্শন করিতেছেন, এবং যদি আমরা এইরূপ মনে করিয়া প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করি, তবে কি আমরা তাঁহার প্রতি ঘোরতর অবমাননা প্রদর্শন করিতেছি এবং একখণ্ড চিত্রিত কাগজকে উক্ত বন্ধুস্থান করিতেছি বলিয়া অভিযুক্ত হইব?" §

অতএব আমি আশঙ্কা করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদে এমন বিশেষ কিছুই নাই যাহা হিন্দুধর্ম্মের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে। বৈদান্তিকগণের মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তুলনা করিলে এ বিষয় আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। তাঁহাদিগের মত সংক্ষেপে এই। একজন ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। এবং এই জ্ঞানলাভ করা এবং ইহার সত্যতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ করিতে পারাই অন্তিম সুখলাভের উপায় স্বরূপ এবং তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানলাভ করিতে বা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে মনুষ্যকে প্রথমতঃ পুণ্যশীলতা, উপাসনা ও ধ্যানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিবিধান করিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই পারিবে না।

আমার বিবেচনায় কোনও জাতীয় একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের একত্ব এই মতাবলম্বী হিন্দুদার্শনিকদের ন্যায় ওজস্বিতার সহিত প্রচারিত হয় নাই। বৈদান্তিক মতের সার মর্ম্ম (আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়) এই ;—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম।" এই মতবাদের মর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যকে কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে চলিবে না। অন্যান্য সমস্ত বস্তুকে, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত ঈশ্বরে সন্নিবিষ্ট করিয়া বিস্মৃত হইতে হইবে। কেবল চিন্তা করিলে চলিবে না যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা নিজের জ্ঞানশক্তি-দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে ; এবং মনুষ্যের প্রতীতি যখন এতদূর দৃঢ় হইবে, তখনই তাহা পূর্ণ প্রতীতিতে পরিণত

§ Quoted in the preface to the "Chips from a German Workshop."

হইবে, এবং এই পূর্ণপ্রতীতিই মানবাত্মার মুক্তির অপরিহার্য্য উপায়।

উপাসনার সফলতা সম্বন্ধে বেদান্তসারের প্রথম বাক্যগুলি হইতেই দেখা যায় যে এই ঈশ্বরবাদমূলক দর্শনশাস্ত্রের গঠনে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। বৈদান্তিকগণের মতে উপনিষদ অধ্যয়নদ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানলাভই মনুষ্যের মুক্তির পথ এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দমন, বাসনাবর্জ্জন এবং নিয়ত ধ্যান ও উপাসনাদ্বারা হৃদয়কে শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই উপনিষদ্ অধ্যয়নের উপযুক্ত। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মকর্ম্ম হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে। উপাসনা ও ধ্যানদ্বারা মনের একাগ্রতা অভ্যাস হয়, এবং এই একাগ্রতাই ঈশ্বর বিষয়ে সত্যজ্ঞান লাভের অপরিহার্য্য উপায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের একত্ব এবং উপাসনার উপকারিতা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, যিনিই 'বেদান্তসার' এবং 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' একত্র পাঠ করিবেন, তিনিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে ব্রাহ্ম ঈশ্বরবাদের প্রধান মত গুলি হিন্দু বেদান্ত দর্শন হইতেই উদ্ভূত। বস্তুতঃ রাজা রামমোহন রায় উপনিষদ্ হইতে যে সকল সূত্র ও বচন উদ্ধৃত বা অনূদিত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ স্বরূপ এবং তাহার পর এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরবাক্য অস্বীকার এবং কঠোর তপস্যার নিন্দা ভিন্ন আর অধিক কিছুই করা হয় নাই। সত্য বটে, বেদান্ত দর্শনে, তপস্যার কঠোরতা ও যোগের একাগ্রতা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিবেচনায় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের উপাসনা যদি সম্ভব হয়, তবে বৈদান্তিকদিগের অবলম্বিত পথেই সম্ভব। ঈশ্বরবাক্য না থাকিলে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে একজন মধ্যস্থ না থাকিলে, আধ্যাত্মিক পরমাত্মায় যথার্থ জীবন্ত বিশ্বাস (কেবল কাল্পনিক বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না) একাগ্রচিন্তা এবং ধ্যেয়বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মনিমজ্জন ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না।

আমার বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শন একই বস্তু। অধুনাতন ব্রাহ্মরা বেদান্তের অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেক অতিপ্রাকৃতিক কল্পনার সন্নিবেশ করিয়াছেন, যথা,—পার্কার হইতে এবং পাশ্চাত্য আধুনিক অন্যান্য লেখকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সহজজ্ঞানের কল্পনা। কিন্তু মূলতঃ দেখিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদান্তজাতীয় অতিপ্রাকৃতিক ঈশ্বরবাদ এবং ইহা ভারতের ভবিষ্যতে ধর্ম্মমত হইবে কি না তাহা এখনও স্থির হইল না। আমরা দেখিতেছি বেদান্তমত সাফল্য লাভ করিতে পারিল না এবং অন্যান্য দেশে ঈশ্বরবাদও প্রসারলাভ করিল না। অতএব ইহা একরূপ নিশ্চিত যে ব্রাহ্মধর্ম্মও জনসাধারণের ধর্ম্ম হইতে পারিবে না। হিন্দুগণ মনুষ্যজাতির সাধারণ ধারণারই প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলেন যে একটা অতিপ্রাকৃতিক বা কাল্পনিক ধর্ম্মমত কখনও সাধারণ বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতের স্থান অধিকার করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে সাংসারিক চিন্তায় সতত ভ্রাম্যমান বিষয়ী ব্যক্তির মন কখনও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগী একাগ্রত্ব লাভ করিতে পারে না। তাঁহারা এইরূপ তর্ক করেন যে কেবল কল্পনার কর্ম্ম নহে, প্রকৃত বস্তুতে জীবন্ত বিশ্বাস না থাকিলে কোন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। এবং সাধারণ মানবমন সতত সাংসারিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকায়, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরে এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস স্থান পাইতে পারে না। এ বিষয়ের এইরূপ সাধারণ বুদ্ধিমূলক ধারণা প্রতিকূলমতাবলম্বী দার্শনিকগণেরও অনুমোদিত। অগস্ত কোমৎ একস্থানে (যাহার কিয়দংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) বলিয়াছেন :—*

"সাধারণ একেশ্বরবাদের কল্পনার সহিত আধুনিক বহ্বীশ্বরবাদের কল্পনার ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শেষোক্ত কল্পনায় বহুদেবতাকে এমন একজনের ইচ্ছার অধীনে অব্যবহিত, নিয়মিত, এবং চিরস্থায়ীভাবে স্থাপিত করা হয়, যিনি তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সাধারণ সহজজ্ঞান অমাত্যহীন ঈশ্বরকল্পনা নিষ্ফল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং তাহা অসঙ্গত নহে।" ম্যাককশ এই মতের সমর্থন করিয়া বলেন যে প্রকৃতিমূলক ঈশ্বরবাদ, যাঁহারা তদ্বিষয়ে একাগ্রতার সহিত চর্চ্চা করিয়া থাকেন এরূপ অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই উপযুক্ত, এবং "লিখিত ঈশ্বরবাক্য ভিন্ন মানবজাতির জনসাধারণের মনে উক্ত মতের সত্যতা স্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে না, অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বৃথা কল্পনা, অলীক তর্ক, এবং অবিশ্বাসিতা হইতে উহাকে রক্ষা করিতে পারে না।" তিনি বলেন :—"আমার

* See Positive Philosophy Vol II pp. 251-2.

স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মানবমণ্ডলীর অধিকাংশ লোকই শীঘ্র কোনরূপ, (সম্ভবতঃ মর্ম্মনদিগের মত) নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্মে নিপতিত হইবে ; এবং দার্শনিকগণ নিজ নিজ লালিত কল্পনাগুলির অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং অচিন্তাশীল জনসাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না, অন্ততঃ কোন কল্যাণজনক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না এবং বিস্তার করিবার বাসনাও পোষণ করিবেন না ; এবং জনসাধারণও তাঁহাদের সূক্ষ্ম ও সুদূরগামী দার্শনিক গবেষণাগুলি যে কার্য্যতঃ উপহাসাস্পদ এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিব্যঞ্জক মন্তব্য জ্ঞাপন ব্যতীত অন্য কোনরূপে উহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবে না।" *

এই সকল উক্তি মানবপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মনুষ্যচিত্তে প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়মিশ্রণের এরূপ প্রবণতা আছে যে ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা কিছুতেই বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা যায় না। ইহুদীগণ, যে সময়ে ঈশ্বর পবিত্র পর্ব্বতশিখরে তাহাদিগকে বিধান দান করেন অথবা যখন তিনি অগ্নিস্তম্ভের অথবা ধূমস্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও পুনঃ পুনঃ পৌত্তলিকতায় নিপতিত হইয়াছিল, খৃষ্টানগণও, যীশু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট গমন করিবার জন্য যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহার অনতিকাল পরেই সকল প্রকার কুসংস্কারপূর্ণ আচারকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেন, এবং এ পর্য্যন্ত রোমান্ ক্যাথলিক-গণ উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যদি আমরা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও মুসলমানগণের সাধারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের যথার্থ অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় দেখিতে পাইব যে খৃষ্টে বা মহম্মদে, গীর্জ্জায় বা মসজিদে, তাহাদের বিশ্বাস যতদূর প্রকৃত ও সুদৃঢ়, ঈশ্বরের অরূপ ও অতীন্দ্রিয় কল্পনায় ততদূর নহে। Chips from a German Workshop নামক গ্রন্থের প্রণেতা যথার্থই বলিয়াছেন যে "বহু ধর্ম্মমত একত্র পর্য্যালোচনার ফলে যদি কোন তথ্য অতি পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে—প্রত্যেক ধর্ম্মমতেরই পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য্য।"

* Intuitions of the mind, Part III. p. 389.

উপরি লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হয় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে অথবা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভের প্রয়াস পাইলে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া হীনতর উপাসনাপদ্ধতিতে পরিণত হইবে। ইহার মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম নিম্নগতির লক্ষণ দেখাইতেছেন। প্রথমে যে ভাবে ইহা কল্পিত হয়, তাহাতে বাহ্য আড়ম্বরের সহিত ইহার কোন সংস্রব থাকিবে না, ইহার কোনরূপ বাহ্যিক আচার বা ক্রিয়াদি থাকিবে না, কেবল চিন্তা ও ধ্যান, জ্ঞানার্জ্জন ও পরহিতৈষণা ইহার প্রধান অঙ্গ হইবে, এইরূপ বোধ হইয়াছিল। সংক্ষেপতঃ ইহা অল্প সংখ্যক লোকেরই ধর্ম্মমত বলিয়া পরিগণিত হইবে এইরূপ মনে হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু কিছুদিন হইল দেখা যাইতেছে ইহার সে উচ্চ আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার ভক্তগণ ইহাকে সাধারণের নিকট পরিচিত করিবার বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন এবং তজ্জন্য এরূপ বাহ্য জাঁক জমক ও উৎসবাদির শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছেন যাহাতে লোকের নয়ন মন আকৃষ্ট করিতে পারা যায় এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় ও কল্পনাশক্তির উপর প্রভাববিস্তার করিতে পারা যায়। অগ্রে উড্ডীয়মান পতাকাশ্রেণী ও তৎপরে সাধারণ লোকের চিত্তহারী বাদ্য-ভাণ্ড লইয়া পথে পথে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিহিত নগ্নপদ ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মবিষয়ক গান বা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। অপরদিকে সাধারণ সংস্কারবশতঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রধান উপদেষ্টাকে দেববৎ পূজা করিবার একটা প্রবৃত্তিও লক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মদের শ্রেষ্ঠতার অভিমানের প্রতি যাঁহারা ঈর্ষ্যাযুক্ত নয়নে কটাক্ষপাত করেন, তাঁহারা এইরূপ ব্যাপারে অনেক তীব্র সমালোচনার বিষয় দেখিতে পাইবেন। একজন হিন্দু অথবা একজন রোমানক্যাথলিক নিশ্চয়ই বলিতে পারেন যে এইরূপ শোভাযাত্রা যদি ঈশ্বর-ভক্তির উচ্ছ্বাস উৎপাদনের উপযোগী বিবেচিত হয়, তবে কোন পবিত্র দেবমন্দিরে পুষ্প বা গন্ধ দ্রব্য উপহার দেওয়ায় বা ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবাদিতে দীপাবলী প্রজ্বলিত করায় ক্ষতি কি? অথবা একজন পবিত্রচরিত্র সাধু বা পরলোকগত বীরের পূজাই বা কেন না করিব? আমাদের নিকট এ সমস্তই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরপূজা অবশ্যই পরিণামে কোন মূর্ত্তি বা বেদিকার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সাধারণ লোকের মনে পরিণামে নিশ্চয়ই একজন ত্রাণকর্ত্তা

বা মধ্যপুরুষ বা ভবিষ্যদ্বক্তা বা জড়মূর্ত্তি ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবে। ইহা এক শ্রেণীর বা অপর শ্রেণীর লোকের দোষ নহে। ইহা মানবপ্রকৃতির একটি স্বাভাবিক দোষ বা অপূর্ণতার লক্ষণ যে, সাধারণ লোকে একটা অজ্ঞাত-বস্তুর কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অদৃশ্য ঈশ্বরে যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে কোনরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান বা উৎসব বা মূর্ত্তির সহায়তা অপরিহার্য্য। জনসাধারণের চিত্ত একটা কল্পনায়ত্ত পূজ্যবস্তু ('যাহার' ধ্যান ও উপাসনা করিতে পারা যায়) না পাইলে কিছুতেই সন্তোষলাভ করিতে পারে না। অপিচ প্রেম ও ভক্তির পাত্র যদি দেশে বা কালে কল্পনাতীত দূরে স্থাপিত হয়, তবে মনুষ্য স্বভাবতঃই তদ্বিষয়ে অনুরাগবিহীন হইয়া পড়ে। সাংসারিক ব্যাপারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া লোকে প্রায়ই পরম প্রিয়বন্ধু ও ভক্তিভাজন উপকারককেও বিস্মৃত হয়। একটা স্মৃতিচিহ্ন বা কোনরূপ স্মারকবস্তু না থাকিলে, প্রেম বা কৃতজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না। যেমন লৌকিক প্রেমের চিহ্ন একটি অঙ্গুরীয়, বা পালক, মৃত্তিকাস্তূপ বা মর্ম্মরমূর্ত্তি, তেমনই উপসনাগৃহ বা দেবমন্দির, দেবমূর্ত্তি বা বেদী ঈশ্বরভক্তির পবিত্র চিহ্ন স্বরূপ। মানব হৃদয়ে এক প্রকার প্রবৃত্তি দেখা যায়, যাহাকে বীর-ভক্তি বলিয়া থাকে। আমরা নূতন ও পুরাতন সকল সমাজেই ইহার প্রাধান্য দেখিতে পাই। সকলেই মহৎব্যক্তির প্রতি ভক্তি অত্যধিক আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং যাহারা অধিক ভক্তিভাবসম্পন্ন তাহারা ভক্তিভাজন বীর বা সাধুপুরুষগণকে দেবতার পদে উন্নীত করে। ধর্ম্মবীরগণ সকল দেশে ও সকল কালে মূর্ত্তি-দ্বারাই হউক বা অন্যপ্রকারেই হউক ঈশ্বরোচিত পূজালাভ করিয়াছেন, এবং ড্রাইডেন তদ্বিরচিত কবিতায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল ফিলিপের বীরপুত্র সম্বন্ধে নহে, প্রত্যেক মনুষ্য যিনি শ্রবণোৎসুক জনসমূহের বহু উচ্চে আসনলাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও তুল্যরূপে প্রযুক্ত।

"শ্রোতৃগণ চমৎকৃত তারস্বর সঙ্গীতের স্বরে ;
সাক্ষাৎ দেবতা বলি উচ্চরবে কোলাহল করে ;
সাক্ষাৎ দেবতা বলি প্রতিধ্বনি উঠে স্তরে স্তরে।
কর্ণ সুধা করি পান,
উল্লাসে পূরিল প্রাণ :—
নৃপতি ভাবিল আমি সাক্ষাৎ দেবতা এই ভবে,
দেবত্বের দর্পভরে নৃপশির দুলিল গরবে,
রবি শশী গ্রহ তারা কাঁপিয়া উঠিল যেন সবে।"

আমরা ব্রাহ্মদিগকে দোষ দিতেছি না। কেবল এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া দেখাইতে চাহি যে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরবাদমূলক ভিত্তির উপর একটা সর্ব্বোপযোগী ধর্ম্মমত সংস্থাপন কতদূর দুষ্কর ও অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি দ্বারা বোধহয় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদান্তদর্শনের ন্যায় হয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির চিত্তে আশ্রয় অন্বেষণ করিবে, নতুবা কোটি অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে জড়তাদুষ্ট কুসংস্কারের আকারে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মসংস্কারকগণের একটি সাধারণ ভ্রম এই যে তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত কল্পনার ক্রমবিকাশের নিয়ম লক্ষ্য করেন না, অর্থাৎ, ধর্ম্মমতগ্রহণকারীর জ্ঞানের অবস্থার সহিত তাহার ধর্ম্ম ও নীতিসংক্রান্ত বিশুদ্ধতার যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না। য়ুরোপের মধ্যযুগে খৃষ্টান-ধর্ম্মের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্মের প্রসার ও অবনতি, বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব ও পতন, ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে ধর্ম্মমত যতই উৎকৃষ্ট ও তাহার মূল যতই পবিত্র হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কার ব্যতীত উহার গ্রহণ অসম্ভব এবং নিকৃষ্টতর অবস্থায় অবনতি অনিবার্য্য। অর্থাৎ মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সকল যতই অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইবে, নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ততই অধিকতর সংস্কার-লাভ করিবে।"

অতএব বিবেচ্য বিষয়টী এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জনার বিষয়ে পরিণত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে ব্রাহ্মগণ যতদূর সূক্ষ্মবুদ্ধিলাভ করিয়াছেন ততদূর সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? মানবজাতির সমগ্র অতীতকাহিনী পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এরূপ সম্ভাবনা একটা কাল্পনিক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু যদি এরূপ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ-সংক্রান্ত পুনঃসংস্কার যে ধর্ম্মমত প্রচার অপেক্ষা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জনার উপর অধিকতর নির্ভর করিতেছে, এই কথাই কি প্রতিপন্ন হয় না? বাস্তবিক শিক্ষাই—

উত্তম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, ভূগর্ভতত্ত্ব, রসায়ন, জ্যোতিষ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তথ্যগুলির বহুল প্রচারই—উক্তকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে—যদি ঈশ্বরবাদের মত ও বিশ্বাস ভ্রান্ত সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্নকরা একবারে অসম্ভব না হয়। শত শত বচন বা ধর্ম্মোপদেশেও একজন হিন্দুকে, পৃথিবী একটি কচ্ছপের পৃষ্ঠে ভার ন্যস্ত করিয়া আছে অথবা সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এক দৈত্যের ক্রিয়া এইরূপ অলীক সংস্কারের অযৌক্তিকতা বুঝাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহাকে ভূগোল, জ্যোতিষ, প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ব্যাপারাদি যে সকল নিয়মের দ্বারা চালিত ও সংযমিত হয় ইত্যাদি শিক্ষা দাও, অমনি তাহার সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণাগুলি যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এ কথা সত্য বটে, যে ধর্ম্মমত অনেক সময়ে প্রচার দ্বারা বৃদ্ধি ও প্রসারলাভ করে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতগুলি প্রচার দ্বারা প্রসারলাভের উপযোগী নহে। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করা চলে; বাইবেলের ও কোরাণের মূল বচনের উপর মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনা চলে; মানবগণকে ঐ বচন শ্রবণ ও পালন করিতে অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া বা আদেশ করাও চলে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের দুরবগাহ মতগুলি প্রচার করা চলে না। উক্ত মত সকল কোন বিদ্যালয়ের গৃহমধ্যে এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া যায়। কারণ ব্রাহ্মদিগকে প্রধানতঃ ভ্রান্ত সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে—অন্ততঃ তাঁহারা যাহাকে ভ্রান্তসংস্কার বিবেচনা করেন—হিন্দু, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় বিবিধ প্রকারের ভ্রান্ত সংস্কার। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বশিক্ষার বিস্তার কি এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত, নিরাপদ এবং সহজ উপায় নহে? এত পরিশ্রম যে বিপরীতদিকে প্রযুক্ত হইয়া অনর্থক নষ্ট হইতেছে, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। সংস্কারকার্য্য অধিকতর ফলদায়ক হইত, উহার মঙ্গলপ্রভাব অধিকতর স্থায়ী হইত, ব্রাহ্মগণ যদি নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের পরিবর্ত্তে দেশবাসিগণকে উক্ত মতে উপনীত হইবার উপায় শিখাইতে অধিকতর যত্ন করিতেন;—অর্থাৎ একটা কাল্পনিক ধর্ম্মমণ্ডলী নির্ম্মাণ করিবার দুরাশায় যত অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত এক্ষণে ধাবমান হইয়াছেন, তত অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত যদি যথার্থ ও সারগর্ভ শিক্ষার বিস্তারে মনোনিবেশ করিতেন।

এ পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের নৈতিক উপদেশাবলীর বিষয় কিছুই বলি নাই। তাহার প্রথম কারণ এই যে উক্ত উপদেশগুলি সহজে নির্ণয় করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই।

ধর্ম্মমতের এই একমাত্র কার্য্যতঃ ব্যবহারোপযোগী অংশটি ব্রাহ্মেরা অতি অনিশ্চিত অবস্থায় রাখিয়াছেন। তাঁহারা কোন নৈতিক নিয়মাবলী বিধানাকারে নিবদ্ধ করেন নাই, অথবা, তাঁহাদের নৈতিক উপদেশগুলির মূল কি তাহাও বুঝাইয়া দেন নাই। তাঁহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে তাঁহাদের নিজস্ব কিছুই নাই। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী এই, যে নৈতিক উপদেশ যে স্থানেই পাইবেন, নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্মের পবিত্র গ্রন্থ হইতে (প্রধানতঃ বাইবেল এবং আংশিকভাবে হিন্দু শ্রুতি হইতে) উপদেশ সংগ্রহ করিয়া অসম্বদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল নৈতিক উপদেশ পুরাতন বা সর্ব্বজনসম্মানিত হইলেও তাহাদের পুনরুক্তির বাধা নাই। কিন্তু এইরূপ কার্য্যপ্রণালীর যৌক্তিকতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মেরা বলেন প্রত্যেক গ্রন্থ হইতেই (ধর্ম্মসম্বন্ধীয়ই হউক বা অন্যবিষয়কই হউক) আমরা উপদেশ নির্ব্বাচন করিয়া লইব—কিন্তু কে উক্ত নির্ব্বাচনের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবেন এবং কিসের দ্বারাই বা উহার বিচার হইবে, এবং নির্ব্বাচিত উপদেশাবলীর লঙ্ঘনই বা কিরূপে নিবারিত হইবে? চুরি করা উচিত নহে, নরহত্যা বা পরস্ত্রীহরণ অত্যন্ত দূষনীয় ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু উক্ত অপরাধের দণ্ড কি হইবে এবং কিরূপে তাহা প্রয়োগ করা হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মসংক্রান্ত এইসকল অত্যাবশ্যক বিষয়ে একবারে নীরব। উহাতে পরলোকের কথা আছে এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বের কথা আছে, কিন্তু পরলোকের প্রকৃতি কিরূপ, কিম্বা মানবাত্মা পার্থিব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে উহা সঙ্কুচিত হয়। এরূপ হইবারই কথা, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলঘটিত দোষটি, অর্থাৎ ঈশ্বরবাক্যের অভাব উহার পরলোকসম্বন্ধে কোনরূপ দুঃসাহসিক কল্পনারোহণের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় স্বরূপ। ব্রাহ্মগণ (অন্যান্য কল্পনা-সহায় দার্শনিকদের ন্যায়) তাঁহাদের দলের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মভীরু ও সাধুশীল তাঁহাদের উৎসাহ ও সান্ত্বনার জন্য কেবল (জীবন

যাহা সত্যই বলিয়াছেন) "একটা আশা, একটা আকাঙ্ক্ষা, ঊর্দ্ধমাত্রায় একটা সম্ভাবনা মাত্রের আভাস দিতে পারেন।" ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকল নৈতিক উপদেশ দিয়া থাকেন তাহা যীশু, মহম্মদ, পুরাতন হিন্দু শ্লোককারগণ, এবং নূতন ও পুরাতন দেবপূজকগণের আদেশ ও নিষেধবাক্যের পুনরুক্তিমাত্র। বাস্তবিক সে সকল উপদেশ পুরাতন কথা, তাহাতে এমন কোন নূতন চিন্তার লেশ নাই, যাহাতে তাহা নবজীবন লাভ করিতে পারে। অতএব আমি আর অধিক মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া এ বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

বর্ত্তমান বিষয়ের কেবল আর একটি কথা আছে, যাহার সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাহা তথাকথিত শিক্ষিত দেশীয়গণের অবস্থা সংক্রান্ত। ব্রাহ্ম-প্রচারকগণের হস্তে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অতি নির্দ্দয় নিন্দা-বাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রধান প্রতিনিধি এই শ্রেণীর লোকদিগকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিবার সুযোগ প্রায় কখনও পরিত্যাগ করেন না। ব্রাহ্মবেদী হইতে উচ্চারিত প্রত্যেক বক্তৃতা ও গানের ধুয়া এই শ্রেণীর লোক-গণ। শিক্ষিত দেশীয়গণ সকলেই ভণ্ড বলিয়া ভৎসিত, এবং নিন্দাবাদের অভিধানে যতপ্রকার দুর্বাক্য আছে তাহাদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। অতএব এই শিক্ষিত দেশীয়গণকে এবং তাঁহাদিগের অপরাধটা কি তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণ প্রয়োগমতে 'শিক্ষিত দেশীয়গণ' বলিলে যাঁহারা উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই বুঝায়। কিন্তু ব্রাহ্মবেদী হইতে যে বক্তৃতাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে ব্রাহ্মেরা উক্ত শব্দগুলির অনুরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন। পরিষ্কার বোধের জন্য আমি 'শিক্ষিত দেশীয়গণকে' দুইভাগে বিভক্ত করিব—যাঁহারা ব্রাহ্ম এবং যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকগণ ধর্ম্মমত ও উপাসনা বিষয়ে বিশুদ্ধ হিন্দুদিগের মত পরিবর্জ্জন করিয়াছেন এবং হিন্দু-আচারব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে চলিতে অসম্মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যদিও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে প্রথমোক্ত শ্রেণীর ন্যায়ই হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, তথাপি প্রকাশ্যে হিন্দুসমাজভুক্ত আছেন, এবং সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক বিষয়ে পিতা, স্ত্রী, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের কুসংস্কারের বশ্যতা স্বীকার করেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ব্রাহ্মগণ শিক্ষিত দেশীয়গণকে কি জন্য ভণ্ড নামে আখ্যাত করেন। 'ব্রাহ্মগণ' বলিয়া আমি তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধির কথাই বলিতেছি, যাঁহাদের মুখদিয়া এই নিন্দা-বাদ নির্গত হইয়া থাকে। ভণ্ড বলিয়া যে দোষ দেওয়া হয়, তাহা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মমণ্ডলীর বহির্ভূত ব্যক্তিগণের উদ্দেসে। কারণ একজন ভক্তবৎসল ধর্ম্মোপদেশক যে নিজের বিশ্বস্ত শিষ্যমণ্ডলীর মুখে জগৎসমক্ষে এরূপ ক্ষতিজনক কলঙ্কলেপ প্রদান করিয়া নিজ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বাস্তবিকও তাহা নহে, কারণ ব্রাহ্মবেদী হইতে যে সকল নিন্দাবাদ ও অভিযোগ বর্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত শ্রেণীর শিক্ষিত দেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাতের সূচনা দৃষ্ট হয় না। অন্ততঃ তাহাতে এমন কোন কথা নাই যাহাতে কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে, যে নিন্দাবাদগুলি তাঁহাদের প্রতিও প্রয়োগ করা বক্তার অভিপ্রায়। অতএব আমি ধরিয়া লইলাম যে যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন তাঁহাদের প্রতি দোষারোপই উক্ত নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য। উহার মধ্যে ভণ্ডতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভি-যোগ, এবং এই বিষয়েই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ করিব।

তবে, কথাটা এই যে শিক্ষিত দেশীয়গণ (যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন) সকলেই ভণ্ড। ভণ্ডতার অর্থ বিশ্বাসের বিরুদ্ধা-চরণ। অতএব আমাদের নির্ণয় করা আবশ্যক ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিত দেশীয়দিগের বিশ্বাস কি?

শিক্ষিত দেশীয়গণ ধর্ম্মকে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে করেন। তাঁহারা কোন ধর্ম্মবাদকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিতে খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা ব্রাহ্ম কেহই ভ্রান্তসংস্কার বা অযৌক্তিকতা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হইতে পারেন না, কারণ হিন্দু থাকিয়া বিশ্বাসের মানরক্ষা করা যেরূপ অসম্ভব, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হইলেও সেইরূপ অসম্ভব। হিন্দু, হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও ভ্রাতা সকলেই হিন্দু। এক্ষেত্রে যে সমাজে জন্ম সেই সমাজে অবস্থান ভিন্ন গতি কি? মনুষ্যবিদ্বেষী হইয়া মানবসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে বাস? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলেন, তাঁহাদিগের কি এই অভিপ্রায়? জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যে সমাজে বাস করিতে হইবে, সেই সমাজের আচার

ব্যবহারাদি পদদলিত করাই কি কর্ত্তব্য? এই তর্ক আরও একটু প্রসারিত করা যাউক। এক ব্যক্তির স্থির ধারণা হইল, রাজতন্ত্র দুষ্য ও অহিতকর। তবে কি তাহার পক্ষে রাজহত্যাই কর্ত্তব্য হইল? এবং সকল দেশে ও সকল কালে রাজা অতি, ঘৃণ্য রাক্ষস বিশেষ ইত্যাকার নিজমত প্রচার করাই কি তাহার উচিত? আমার ত মনে হয় প্রত্যেক নগরবাসীর উচিত, রাজতন্ত্র বিষয়ে নিজের মত ভিতরে যাহাই হউক, যে দেশে বাস করিতে হইতেছে, সেই দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি অন্ততঃ বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করা, এবং যতদিন উক্ত দেশে বাস করিতে হইবে ততদিন প্রচলিত রাজবিধানগুলি যতই অসঙ্গত বোধ হউক না কেন, তাহার বশ্যতা স্বীকার করা। অন্ততঃ ধর্ম্মান্ধ বা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেক নগরবাসীরই এই নিয়ম প্রতিপালন করা সাধারণতঃ উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিত দেশীয়গণ উন্মাদগ্রস্তও নহেন, ধর্ম্মান্ধও নহেন, সুতরাং মানবজাতিসাধারণ সদ্বুদ্ধির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মোৎসবাদি তাঁহারা সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করেন। তাঁহারা ইহার দোষ দেখিতে পান, এবং তাহার জন্য আক্ষেপ করেন, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহা সহ্য করেন। তাঁহারা দোষটার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করেন কিন্তু বলপ্রকাশ করিয়া নহে। সামাজিক রীতি ও আচারাদি, এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচারাদি তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমোদন করেন, সংশোধনেরও ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করেন, এবং যাঁহাদিগের সহিত জীবনের নানারূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সংশোধন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিনা বল প্রয়োগে অথচ সম্যক্‌রূপে ঐ কার্য্য সমাধা করেন। আপনাদের নিজগার্হস্থ্যচক্রের মধ্যে এবং কখন কখন অধিকতর প্রকাশ্যভাবে প্রচলিত শিষ্টাচারঘটিত বহুবিষয়ে শিক্ষিত দেশীয়গণ পুরাতন প্রথা অগ্রাহ্য করেন; মাতা, পিতা, ভগ্নী, বন্ধু ও আত্মীয়গণ তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াও দেখেন না; অতি মন্থরগতিতে ক্রমশঃ গভীর মূল প্রথার আধিপত্য শিথিল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের চরিত্রপ্রভাবে নূতন ও বিরোধী মতগুলি ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিপত্তি ও বিস্তার লাভ করে। হিন্দুসমাজের বিষয় যে কেহ অবগত আছেন, সত্য করিয়া বলুন, উক্ত সমাজে কত বিরোধী ভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং উহা শিক্ষিত দেশীয়গণের কার্য্যের ফল কি না? বাস্তবিক কোন ব্যক্তিকে নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে হইবে বলিলে এই মাত্রই বলা হয় যে তাহার নিজের চরিত্রে এবং সাধারণ কার্য্যপরম্পরায় নিজের বিশ্বাস ও অভিমত কি তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে তদ্বিরুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিবারণের উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া নির্ভয়ে বলিতেছি যে শিক্ষিত দেশীয়গণ ইহা সম্পূর্ণরূপে এবং সরলভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু এরূপ কোন সমাজ নাই যাহার সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার ব্যবহারাদির সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যবিদ্বেষী হইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন এবং সকল প্রিয়তম এবং নিকটতম আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যকতা বা প্রশংসনীয়তা দেখেন না। সুতরাং যে সমাজে তাঁহারা অদৃষ্টক্রমে পড়িয়াছেন, সেই সমাজেই থাকিয়া এবং যে সকল ব্যক্তিকে প্রেম ও ভক্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছে তাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করিয়াই তাঁহারা সন্তোষলাভ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে কোন কোন সময়ে হিন্দুসমাজের প্রচলিত যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের (কারণ অনেক গুলি আচার যুক্তিবিরুদ্ধই বটে) অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও স্পর্শক্ষম ও বাস্তব দেবতা স্বরূপ—যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম, পবিত্রতম এবং মধুরতম—তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করা অধিকতর পাপজনক ও অকর্ত্তব্য।

গোপাল।

হেরিলাম সন্ধ্যাবেলা সেই গো-পালকে
পুরাতন, পরিচিত। অস্পষ্ট আলোকে
ঘুরিতেছে ত্রস্তপদে অশ্রুপূর্ণ আঁখি
—আদরে, আগ্রহে নাম ধরে 'ডাকি' 'ডাকি'—
ক্ষুদ্র এক দলচ্যুত হৃত বৎস তরে,
শত গাভী দূরে রাখি ব্যাকুল অন্তরে!

কৌতূহলে জিজ্ঞাসিনু তাঁরে—উপেখিয়া
শত ধেনু, ক্ষুদ্র এক বৎসের লাগিয়া
ঘুরিতেছ কেন এত? কহিল রাখাল—
"হারায়ে' গিয়াছে সে যে, ছেড়ে গেছে পাল!"
চিনিনু গোপালে তবে; এই গোপালন।
কাঁদিয়া স্মরিনু মনে,—"পতিতপাবন!"

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সত্যরক্ষা।

কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং করুণাময় মুখোপাধ্যায় উভয়েই এক সময়ে কানপুরে বেশ নামজাদা এবং সম্পন্ন লোক ছিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল P. W. D.র হেডক্লার্কের পদে কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া মোটা বেতন এবং অবশেষে "রায়বাহাদুর" খেতাব লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রচুর প্রতিপত্তি। তাঁহার সুনামে নিন্দুকেরা চাপা গলায় একটা টিপ্পনী জুড়িয়া দিত—কৃষ্ণরাম বাবু, মহাশয় লোক সন্দেহ নাই। যে কেহ "কনট্রাক্ট" বা অন্য কোনও কাজে তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই জানে, তাঁহার আশা চিরদিনই বড়, এবং কখনও সন্তুষ্ট হয় না। তিনি পাকা লোক সে বিষয়েও তাহারা নিঃসন্দেহ। কারণ, কেমন করিয়া কাঁচা পয়সা আদায় করিতে হয় সে বিষয়ে তাঁহার মত পাকা হাত কেহ কোথায়ও দেখে নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিবৎসর বিলক্ষণ জাঁকজমকের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন সেই উপলক্ষে তিনি সেই অঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালীদের সকলকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রত্যেককে প্রচুর চর্ব্ব চোষ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বা বড় ছাঁদা ধরিয়া দিতেন। যাহারা নুন খায় অথচ গুণ গায় না, তাহারা রাশি রাশি মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া বলিত—এটা পাকা চাল, উঁচু দরের সামাজিক বশীকরণ।

করুণাময় বাবু সেই বিভাগের সকলের চেয়ে বড় কণ্ট্রাক্টর। কেহ বলিত তাঁহার নগদ টাকা বিশ লাখ, কেহ বলিত পঞ্চাশ লাখ। ইহারা দুইজনে বাল্যকাল হইতে হরিহরাত্মা। একদিনেই দুই বন্ধু নগদ তিনটাকা, দুইখানা গামছা এবং জোড়া তিনেক কাপড় সম্বল লইয়া কানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে যুগে প্রবাসী বাঙ্গালীর গৃহে বাঙ্গালী মাত্রেই আত্মীয়ের মত গৃহীত হইত। বহু অপোগণ্ড, নিরাশ্রয় ও অযোগ্য একবার কোনও মতে বাহির হইতে পারিলেই এই সহানুভূতির বলে তরিয়া যাইত। ইহারাও ইহারই বলে প্রথমে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছিলেন তারপর যা কিছু, তা নিজেদের পরিশ্রম ও যোগ্যতার গুণে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুর্গাপূজা ছাড়া অন্যান্য অনেক পূজাই করিতেন। তাঁহাকে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হইত, কাজে কাজেই কোনটায় বাঙ্গালী, কোনওটায় বা হিন্দুস্থানী, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিতেন। তবে বড় মেজো সেজো ছোট প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সাহেব সুবা বহুবারই নিমন্ত্রিত হইতেন। কারণ তিনি জানিতেন দেবতার হাতে পরকাল আর ইহাদের হাতে ইহকাল।

এই দুই আশৈশব বন্ধুর অনেক জিনিষই বদলাইয়াছিল। ইহারা ছিলেন যুবক, চঞ্চল ও কৃশ। পরিবর্ত্তনশীল কাল ইহাদিগকে প্রৌঢ়, গম্ভীর এবং হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু একটা জিনিষ, ঘটনা ও কালের সংঘাতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; সেটি তাঁহাদের অকৃত্রিম গভীর বন্ধুত্ব। দুইটি নিঃস-

হায় যুবক যেদিন এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পাঠ সাঙ্গ করিয়া দারিদ্র্যের আঘাতে অস্থির হৃদয়ে চোখের জল মুছিয়া অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাদের সকল সম্বলের শ্রেষ্ঠ সম্বল ছিল এই অকপট প্রেম। তাঁহাদের শীর্ণ বুক সেদিন ইহা-তেই ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণধন বাবু মাঝে মাঝে বলিতেন "ভায়া তোমার একটা টাইটেল্ (খেতাব) না হলে আর ভাল দেখায় না। এক যাত্রার পৃথক ফল হওয়াটা ঠিক নয়।"

করুণা বাবু নানা কারণে নিজের নিরাভরণ নামই পছন্দ করিতেন। তিনি বলিতেন "তুমি ওটা বিনা মাশুলে পেয়েছ। আমি ওর মাশুল যোগাতে পারবো না। কাজ্ নেই ভাই ওসব ঝঞ্ঝাটে। বেশ আছি।"

অবসর পাইলেই উভয়ে বসিয়া ধূমপান ও গল্পাদি করি-তেন। নিন্দুকের দল বলিত কোন্ কোম্পানির লোহিতাভ তরল-পদার্থ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সাহেবদের কিরূপ মুখরোচক হইবে তাঁহারা সে সময় তাহা পরখ করিয়া লইতেন। যাহা হউক তাঁহারা যে যথার্থই হরিহরাত্মা, এবিষয়ে স্তাবক ও নিন্দুক উভয় দলের কোনও দিন মতভেদ হয় নাই।

করুণা বাবুর সুখের সংসারে একদিন অতর্কিত ভাবে এক মহা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকা গৃহে প্রাণত্যাগ করিলেন। বহুদিন পরে দুঃখের এই প্রকাণ্ড ধাক্কা, তাহার উপর যৌবনের সেই মনের বল ও সহিষ্ণুতা আর নাই, সুতরাং বিষন্নতা ও ঔদা-সীন্যের ছায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি একে একে কয়েক বৎসরের মধ্যে কাজকর্ম্ম গুটাইয়া ঠিকাদারীতে ইস্তফা দিলেন এবং সুরার মাত্রা চড়াইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ-ধন বাবুর সমবেদনা ও প্রবোধ এই ওলট পালট ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই মাতৃ-হীন মেয়েটিকে কোলে লইয়া চোখের জল ফেলিতেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভায়া! উটিকে আমার বৌমা ক'রব দিব্যি মেয়েটি হ'য়েছে, ও বড় হ'লে আমার ছোট ছেলের সঙ্গে খাসা মানাবে" বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। দুই বন্ধু অতঃপর এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পরকে মধ্যে মধ্যে "বেহাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণধন বাবু পেন্সন লইলেন। সাহেব আরও দুই বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি সম্মত হইলেন না। উভয়েরই এখন নানা কারণে প্রবাস ভাল লাগিত না। দেশে ফিরিবার জন্য দুইজনেই ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন, হয়ত দেশে গেলে অশান্ত মনে শান্তি পাইবে। ছিদ্রান্বেষীরা বলিত "আরত সেই প্রভুত্ব নাই, চারিদিকে সেলাম জোটে না, নিত্য পকেটভরা টাকা আসে না, আর "ষ্টাইল" খাটো করাও মহা অসুবিধা, কাজেই ডালরুটির দেশে গরমে পচিয়া লাভ?" একদিন দুই বন্ধু কানপুরের মায়া কাটাইয়া জন্মভূমির দিকে রওনা হইলেন। কানপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীরা সবাই চোখের জল ফেলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন, সবাই আক্ষেপ করিলেন, "আজ আমরা মস্ত অভিভাবক হারাইলাম।" এই বিচ্ছেদের আঘাতে নিন্দুকেরা ইহাদের স্বজাতি-বাৎসল্য, অমায়িকতা, পুরুষকার, যোগ্যতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ বুঝিতে পারিল। তাহারাও প্রশংসা করিল, তাহাদের চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। দুই চারিজন, যাহারা জীবনে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই, মাঝে মাঝে ইহাদের বরাতের জোর এবং ছেঁড়া জুতা ও পুরাণো কাপড়ের ময়লা পুটুলি লইয়া কানপুরে আসার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সত্য ও প্রত্নতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

(২)

দেশ ভাল লাগিল না। তাঁহাদের সমবয়সী, বাল্যের বন্ধু ও সঙ্গী প্রায় কেহই জীবিত নাই। যাহাদের সঙ্গে উঠা বসা যায়, মেলা মেশা কথাবার্ত্তা চলে এমন লোকের একান্ত অভাব। যে সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহারা অভ্যস্ত, ভাল করিয়া জীবন যাপন করিতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহার অনেক গুলিই গ্রামে দুষ্প্রাপ্য। বহুকাল সহরে বাস করিয়া গ্রামের বন জঙ্গল, ভাঙ্গা চুরা মেটে রাস্তা, চারিদিকের ফাঁকা ফাঁকা ভাব, সর্ব্বব্যাপী নির্জ্জীবতা, তুচ্ছ কথা ছোট খাটো ব্যাপার লইয়া কলহ, কুৎসা, দলাদলি, মামলা, সকলের উপরে ম্যালেরিয়ার লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও তাহার আনুষঙ্গিক নীচতা তাঁহা-দিগকে দিন দিন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। চল্লিশ বছর আগে তাঁহারা যে গ্রাম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, এগ্রাম যেন সেগ্রাম নহে। তাঁহারা বহু বৎসর এ মুখো হন নাই, সুতরাং কানপুরে বসিয়া গ্রামের এই বিভীষিকাময় চিত্র তাঁহাদের মনে জাগে নাই। ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, ঘোষ, সেন, বাড়ুয্যে পাল প্রভৃতি সেকালের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারগুলির বংশধরেরা

চাকরী ওকালতী প্রভৃতি উপলক্ষে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, কর্ম্মস্থলেই তাহারা বাড়ীঘর করিয়াছে। কোনও কোনও বাড়ীতে দুই চারিজন প্রাচীনা বিধবা এবং যাহারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে অক্ষম, অথবা যাহাদের সহায়সম্বল মুরুব্বি প্রভৃতি নাই তাহারাই ম্যালেরিয়াজীর্ণ-শরীরে প্লীহায় পেট-মোটা শীর্ণকায় স্ত্রীপুত্র লইয়া পৈত্রিক ভিটায় পড়িয়া আছে। তাঁহারা যে সরলতা, শান্তি ও মাধুর্য্যের আশায় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে তাহা পাইলেন না। সুদীর্ঘকাল সহরে বাস করিয়া তাঁহাদের অভ্যাস রুচি এবং জীবনযাত্রার প্রথা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং গ্রামে স্থায়ী বাস অসম্ভব—দুইজনেই ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিলেন। আত্মীয়, প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের সামাজিক ও নিমন্ত্রণে পরিতুষ্ট করিয়া দুই বন্ধুতে আবার একসঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণধনবাবু বলিলেন—"ভায়া! আবার একসঙ্গে পাড়ি। দেখা যাক্ এযাত্রায় কি ফল ফলে!" করুণাময়বাবু উত্তর করিলেন "সেবার আর কি আছে ভাই? সেবারে সবটাই ছিল ভবিষ্যতে, আশার দিকে, গড়বার দিকে। এবার আর আশাভরসা কি আছে? যা করবার, যা হবার সে সব ত চুকিয়ে ফেলা গেছে।

(৩)

ইঁহারা আসিয়া ভবানীপুরের কাছাকাছি দুইটা বাড়ী ভাড়া লইলেন। স্থির হইল সুবিধামত পাশাপাশি দুই খণ্ড জমি কিনিয়া উভয়ে বাড়ী তৈয়ারী করিবেন। তাঁহারা যে পাড়ায় বাস করিতেন সেখানে একটা খুব জমকাল "হরিসভা" ছিল। তথায় প্রায়ই সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা, ভাগবৎ পুরাণাদি পাঠ হইত। কৃষ্ণধনবাবু মাঝে মাঝে বলিতেন "চল হে! যে চাঁদাটা দেওয়া গেছে তা উশুল ক'রে আনা যাক্।" করুণাময় বাবুর অত গোলমাল, লম্ফঝম্ফ কান্নাকাটি ভাল লাগিত না। তাঁহাকে অগত্যা অনুরোধে ঢেঁকি গেলার বিড়ম্বনা সহিতে হইত।

কৃষ্ণরাম দেখিতে দেখিতে হরিপ্রেমে মজিয়া গেলেন। বেলা পাঁচটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা দশটা পর্য্যন্ত নিত্যই হরিসভায় কাটাইতেন। তাঁহার হাবভাব চালচলনও বদলাইতে আরম্ভ করিল। তিনি গঙ্গাস্নান, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ভাগবৎ শ্রবণ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতিতে মন দিলেন। গোস্বামীর মুখে শুনিলেন—তামসিক আহার, বিষয়াশক্তি প্রভৃতি ভক্তির অন্তরায়। পরদিন নিরামিষ আহার ধরিলেন। গৃহিণী বলিলেন "এ বয়সে মাছ মাংস ছাড়লে, অত উপোষ ক'রলে শরীর থাকবে কেন? এতদিন মাছ মাংস খেয়ে এসেছ, এখন এসব তোমার শরীরে সইবে না।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"শরীর আর ক'দিন গিন্নী? ওপারের ভাবনাটা ত ভাবা উচিত। শরীরই যত বন্ধনের মূল। ব্রাহ্মণের ছেলে বিষয়রসে মজে এতকাল কাটিয়েছি। আর কেন ভোগের কথা তুলছ?"

গৃহিণী কর্ত্তাটিকে ভালরূপেই চিনিতেন। তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন চিরদিন তাহাই করিয়াছেন, অন্যের কথা কখনও কানে তোলেন নাই। গৃহিণী চোখের জল মুছিলেন; অগত্যা দুধ, ঘি ছানা প্রভৃতি সাত্ত্বিক আহারের ভালরকম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

করুণাময় এবার বন্ধুর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিলেন না। দিনকয়েক হরিসভায় গিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া যাওয়া বন্ধ করিলেন। কৃষ্ণরাম তাঁহার এই নাস্তিকতায় দুঃখিত হইতেন। তাঁহার বিশ্বাস এ যাত্রায়ও পৃথক ফল ফলিবে না। তিনি একদিন বন্ধুকে বলিলেন "ভায়া! আর কেন, ওপারের তাগিদ ত আসছে। ব্রাহ্মণের ছেলে এসব অনাচার ছাড়, ধর্ম্মে মতি দাও।"

করুণাময় উত্তর করিলেন "একবার কানপুরে যে বছরগুলো কাটান গেছে সে সব মনে পড়লে বোধ হয় না আমাদের মত পাষণ্ডের মুক্তি হ'তে পারে। ওসব অনর্থক বাজে হুজুক ক'রে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।"

কৃষ্ণরাম আবেগভরে বলিলেন "ভায়া! কলির জীবের মুক্তি খুব সহজ। ভগবান্ তাদের জন্য কোল বাড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের দিকে আসছেন আর আমরা পিছন ফিরে সরে যাচ্ছি। তিনি যে পতিত-পাবন, পাষণ্ড উদ্ধারই যে তাঁর কাজ! মার মত তাঁর যে অক্ষম বওয়াটে ছেলের জন্যই বেশী দরদ।" করুণাময় হাসিয়া উত্তর করিলেন "বেশ বওয়াটে ছেলেই থাকা যাক। তাঁর দরদটা আরও বাড়বে। আমার ধাতে ভাই ভক্তি টক্তি বরদাস্ত হয়না। কানপুরে আমাদের ধর্ম্মোটর্ম্মো সম্বন্ধে যে মতটা ছিল, আমার মনে হয় সেইটাই সবসে আচ্ছা। উপায় কর খাও, দাও, দশজনকে খাওয়াও, ক্ষমতায় কুলোয় ত পাঁচজন

গরীবকে দুচার পয়সা সাহায্য কর, আর বাকী সময়টা ফুর্ত্তি কর, আরাম কর।"

কৃষ্ণরাম চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বিষণ্ণ মুখে বলিলেন "বলকিহে? তোমার যে এখনও সেইভাব, সেই ভোগীর নাস্তিকতা। ওসব ছাড়—সৎসঙ্গ কর, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ শোন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাক; তিনি ডাক শুনবেন।"

এবার করুণাময় জোরে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বা! তুমি এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা আওড়িয়ে গেলে। যাক্ তুমি তা হলে ভগবানকে ডাক না শুনিয়ে ছাড়ছো না। হবিষ্যি মবিষ্যি করে গলার জোর কমিয়ে ফেলছো ভয় হয় অতদূরে ডাক পাছে না পৌঁছায়, আর যা ব'লেছ, আমার সেই একভাব, তোমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে—যথা পূর্ব্বং তথা পরং। বুড়বয়সে ভাই ও সব সাত্ত্বিকতা আমার শরীরে পোষাবে না। তোমার সংসারে গিন্নী বজায় আছেন, দেখবার লোক আছে। বৃথাই ভাবছো আমার কেউ অভিভাবক নেই"।

কৃষ্ণরাম হাল ছাড়িয়া "রাধে-গোবিন্দ" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আর দুই একটা কথার পর উঠিয়া গেলেন। তিনি অতঃপর বড় একটা এমুখো হইতেন না। বন্ধুর দশা ভাবিয়া যখন দুঃখ হইত তখন মনকে প্রবোধ দিতেন যে যাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করে কর্ম্মফল কে খণ্ডাইবে?"

করুণাময় কিছুদিন পরে বন্ধুর ব্যবহারে বুঝিতে পারিলেন একটা মস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণরামের পূর্ব্বেকার মত এবং কথার উপর নির্ভর করিয়া মেয়ে বড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, বিবাহের কথা ভাবেন নাই, কারণ কৃষ্ণরাম কথা দিয়াছেন, আর বিবাহের পর ত মেয়ে পর হইয়া যাইবে, যতদিন কাছে থাকে থাক। বন্ধুর মতিগতির যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে, পূর্ব্বেকার মতগুলা তিনি যেরূপ দ্রুতগতিতে বাতিল করিতেছেন, তাহাতে হয়তো বা কোনোদিন অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের আধ্যাত্মিক মহিমা বুঝিয়া সেই দিক্‌টায় জোর দিয়া বসিবেন। কানপুরে নানাকারণে দুইজনকেই সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে হইত। সাহেবেরা মাঝে মাঝে হিন্দুদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিতেন। ইঁহাদের মনেরভাব তখন যেরূপ ছিল তাহাতে ইঁহারাও সেই মতে সায় দিতেন। কানপুরে ইঁহারা সকলকেই মেয়েদের বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিতে উপদেশ দিতেন। সুতরাং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এতদিন মেয়ে বড় করিয়া রাখা মোটেই অসঙ্গত ঠেকে নাই। বন্ধুর ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য জন্মিল।

তিনি পরদিন কৃষ্ণধন বাবুর বাড়ী গিয়া কথাটা উত্থাপন করিলেন। গৃহিণী বলিয়া পাঠাইলেন "ও ত ঠিকই আছে, উনি একবার কর্ত্তার সঙ্গে কথাটা খোলসা ক'রে ফেলুন। পরে দিনস্থির করে যোগাড় যন্ত্র করা যাবে।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কথা পাড়িতেই তিনি কোষ্টী পাঠাইতে বলিলেন, কারণ গণ, যোটক প্রভৃতি বিচার করাটা দরকার।

করুণাময় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি হে! সুধার মা যেদিন ওকে ফেলে যায় তুমিই যে ঐ কথা বলেছিলে। ওর নাম যে তুমিই পছন্দ ক'রেছিলে। আজ আবার পাঁচ কথা তোল কেন? কুষ্টিতে যখন ওর রাক্ষসগণ ওঠে, তখন তুমি ব'লেছিলে এতে বাধবে না। তোমার অরুণের দেবগণ। আর ওরা দুজনে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মিশে এসেছে। ওরা সব কথাই জানে ওদের দুটির কিরকম ভাব তাতো দেখেছ। তুমিই তা নিয়ে কতদিন হেসেছ। ওদের কথাটা একবার ভেবে দেখ।" কৃষ্ণরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভায়া সব কথা ঠিক কিন্তু কি জান, হিন্দুর বিবাহটা সাহেবদের লভ' (Love) নয়, বড়শক্ত জিনিষ; মূলেই ভোগের জন্যে নয়। শাস্ত্র বলেছেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মকর্ম্মের সহায় রামায়ণে দেখনি শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞের সময় সোণার সীতা গড়াতে হয়েছিল? অরুণ হচ্ছে দেবগণ; একটি দেবগণের মেয়ের সঙ্গে ওর বেশ সাত্ত্বিকতার স্ফুরণ হবে। রাক্ষসগণ হলে কি হয় জান? দেবগণের সাত্ত্বিকতাটুকু রাক্ষসগণে খেয়ে নেবে। আর যখন কথা দিয়েছি তখন যে আমরা ভোগবাসনাও বিষয়-রসে মত্ত। শাস্ত্র যা বলেন তা হিঁদুর ছেলের, বিশেষ ব্রাহ্মণের ছেলের, অমান্য করা কি উচিৎ?"

করুণাময় অবাক্ হয়ে গেলেন; মনের [illegible] করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ! যাই বল, [illegible] দোহাই দাও, কাজটা মহা অধর্ম্ম, মহা অন্যায় হচ্ছে। [illegible] বুড়োবয়সে ঐসব দলেপ'ড়ে মতিভ্রম হয়েছে।" অর্থাৎ

তোমার শাস্ত্রকর্ত্তারা যদি থাকতেন, তাঁরাই নিশ্চয় বলতেন ঐ বিবাহ দেওয়াই ধর্ম্ম, না দেওয়া মহা অধর্ম্ম। ওরা ডাগর হয়েছে ওরা মনে মনে জানে ওরা স্বামী-স্ত্রী ; কেবল মন্ত্র পড়াটা বাকী। আমি সাদাসিধে যা বুঝি তাতে আমার মন স্পষ্টই ঐ কথাই বলছে।"

কৃষ্ণরাম উত্তর করিলেন "তোমার মনের যে শোধন হয় নি। তুমি যে অনাচার ছাড়নি। শাস্ত্র বলেছেন—"

করুণাময় নিজেকে আর দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন "থামো, আমি তোমার কাছে শাস্ত্র শুনতে আসিনি। শেষ কথাটা খোলসা ক'রে ব'লে ফেল, আমিও চলে যাই।"

কৃষ্ণরাম চুপ করিয়া রহিলেন। করুণাময় অধীর হইয়া বলিলেন "তা হ'লে কথাটা হচ্ছে অরুণের সঙ্গে সুধার বিবাহ তোমার মত নয়। সুতরাং আমাকে অন্য চেষ্টা করতে হবে, এই ত ?

কৃষ্ণরাম কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিলেন "ভায়া! শাস্ত্র যখন নিষেধ করছেন —"

করুণাময় অধীরভাবে বলিলেন—"আরে ছাই, তোমার মতটা কি তাই বল। আমার যখন শাস্ত্রের মত জানবার দরকার পড়বে, তখন ভাট পাড়ায় পাতি আনতে পাঠাব।"

কৃষ্ণরাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "শাস্ত্র যা বলেন আমি কি ক'রে তার অন্যথা করি ?"

করুণাময় "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। কৃষ্ণরাম ভাগবত বন্ধ করিলেন। সে দিন পাঠে মন বসিল না।

(৪)

মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। কন্যার বিবাহ, বিশেষতঃ বয়স্থা এবং হৃষ্টপুষ্ট কন্যার বিবাহ যে কত বড় লাঞ্ছনা, কি বিষম দুর্ভোগ, বঙ্গদেশে কাহারও বোধহয় তাহা অবিদিত নাই। প্রথম প্রথম তিনি বড় ঘরে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ভাল পাত্রের জন্য যত টাকা খরচ করিতে হয় তিনি রাজি। সকলেই মেয়ে দেখিয়া পিছাইয়া যান, তাঁহারা ছোট মেয়ে চান, টাকা চান না। যাঁহারা স্পষ্টবক্তা এবং 'বাপকেও উচিত কথা বলিতে ছাড়ে না' তাঁহারা খোলাখুলি বলিলেন "এত বড় ধেড়ে মেয়ে নিয়ে কি করিব ?" "ছেলের বাপের সঙ্গে এ মেয়ে মানাতে পারে, ছেলের সঙ্গে মানাবে না!" "এ বয়সে বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েরা দু তিন ছেলের মা হয়" ইত্যাদি।

করুণাময় বড় ঘরের আশা ত্যাগ করিলেন। ঘটক ঘটকীরা মধ্যবিত্ত ঘরে পাত্রান্বেষণে ছুটিল। কত জায়গা হইতেই কথা আসে, কোনও না কোনও খুঁতে সবগুলিই ফস্‌কাইয়া যায়।

কানপুরে থাকিতেই করুণাময় বাবুর মাঝে মাঝে অত্যধিক হৃৎস্পন্দন (Palpitation) হইত। এবার বুকে রীতিমত ব্যথা ধরিতে লাগিল। মদ মাংস ত চলিতই, তাহার উপর এই বয়সে দুর্ভাবনা, সুতরাং রোগটা বাড়িয়া পড়িল। বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বলিলেন Heart disease, (হৃদ্রোগ) কখন কি হয় বলা যায় না। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মেয়েটিকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করা চাই।

কৃষ্ণধনের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইয়াছে। কেহই বিবাহের কথা তোলেন নাই। করুণাময় সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, ও বাড়ীর কাহাকেও যেন তাঁহার পীড়ার কথা জানান না হয়। কৃষ্ণধন শাস্ত্রপাঠ, নাম জপ প্রভৃতিতে মনোযোগ গভীরতর করিয়াছেন। এখন আর বড় একটা বৃথা সময় নষ্ট করেন না ; সুতরাং কথাটা মোটেই তাহার কানে উঠিবার সুযোগ পাইল না।

করুণাময় এখন স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, কখন ডাক পড়ে ঠিক নাই। তিনি পাত্রের জন্য মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; যত টাকা লাগে লাগুক, ভাল ছেলে চাই—অবিলম্বে চাই" সকলকেই ব্যাকুলভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন। এবারেও প্রায় সেই পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! কেহ বলেন "বড় ডাগর মেয়ে" কেহ বা "রাক্ষসগণ" দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। তিনি নিজেও তেমন মনের মত পাত্র পান না। অনেকেই সবে পাশ করিয়াছে, বাড়ী ঘর সংস্থান তেমন কিছুই নাই। আর যাহারা রোজগারে নামিয়াছে তাহাদেরও বেতন ৩০ ৲ টাকা হইতে ১০০ ৲ টাকা পর্যান্ত। তাঁহার পছন্দ হয় না, আজকালকার বাজারে একশ টাকা আবার টাকা!

শেষকালে একটি পাত্র স্থির করিয়া ফেলিলেন। ছেলেটি এম-এ, বি-এল, হাইকোর্টে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তিন ভাই, শ্যামবাজারে একখানি মাঝারি রকমের বাড়ী আছে, পরীক্ষায় ভাল পাশ করিয়াছে, বেশ চালাক চতুর। ১০০ ৲ ২০০ ৲ টাকায় সীমাবদ্ধ রহু বিড়ম্বনাময় নিশ্চিতের

চেয়ে এই বিস্তৃত অনিশ্চিত যে ঢের ভাল। তিনি নিজেই ত এই অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিয়া যা কিছু করিয়াছেন। সাতদিন পরেই একটা লগ্ন। সেই লগ্নেই বিবাহ হইবে। বরের বাপ যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাতেই সম্মত।

(৫)

অরুণ এতদিন বাড়ী ছিল না। সে রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, সুতরাং এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও টের পায় নাই। তাহার কলেজের ছুটি হইয়াছে, এই বিবাহের তিন দিন আগে সে বাড়ী আসিয়াছে। প্রতিবার যেমন কাকা বাবুর বাড়ীতে সকলের সঙ্গে দেখা করিতে যায়, এবারও তেমনি কাকা বাবুকে প্রণাম করিতে গেল। তাহার মা একবার ভাবিলেন, ছেলেকে বলি, কিন্তু কি বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অরুণ গিয়া দেখিল একি! সবাই বিষণ্ন বিব্রত। দরজায় তিন চারজন বড় বড় ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়াইয়া। সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—কর্ত্তার অসুখটা খুব বাড়িয়াছে। এ কেমন হইল? বাড়ীতে এসে ইহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না, তাহার বাবাও ত কোন কথা বলিলেন না! সে কাকা বাবুর ঘরের দিকে গিয়া দেখিল, বাহিরে কিছু দূরে সুধা দাঁড়াইয়া। সে চমকিয়া গেল, এই সেই সুধা? সে কি কোন কঠিন ব্যারামে ভুগিয়া উঠিয়াছে? তাহার মুখ যে শাদা হইয়া গিয়াছে, রক্তের চিহ্ন মাত্র নাই; তার ধবধবে দেহখানি—এতো তার আকৃতি নয়, বিকৃতি!" তাহার মন অস্থির হইয়া পড়িল। সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সুধারাণী ব্যাপার কি?"

অরুণ ছেলে বেলা হইতে তাহাকে আদর করিয়া সুধারাণী বলিয়া ডাকিত। সুধা এডাক শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল, একটু ধীরে ধীরে বলিল "বাবার বুকের ব্যারামটা মাসখানেক হ'ল বেড়েছে। কাল থেকে বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।"

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল "কাল থেকে বাড়াবাড়ী যাচ্ছে? বাবাতো কিছু বল্‌লেন না?" সুধার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অরুণ তাহাকে খুব স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, "ভয় কি সুধারাণী? বড় বড় ডাক্তার এসেছেন, চিকিৎসা ভাল রকম চলছে ভয় কি? আমি এখুনি গিয়ে বাবাকে মাকে ডেকে আনছি।" সুধা ব্যাকুল হইয়া বলিল "আপনি অমন কাজ করবেন না। জ্যাঠা মশায় বাবার অসুখের কথা মোটেই জানেন না। বাবার বারণ আছে। আপনি ডাকবেন না।

অরুণ উত্তর করিল "বেশ সুধারাণী! আপনি বলতে সুরু করলে যে! ছ'মাস ধরে রুড়কি গিয়েই দেখছি তোমাদের কাছে পর হ'য়ে গেলাম। এ কি রকম! বাবাকে জানাতে বারণ আছে? কাকা বাবুর অসুখ বাবা জানলেন না! বাবা যখন টের পাবেন, তোমাদের আর আমাদের বাড়ীর কারও মুখদর্শন করবেন না জান? সুধার চোক ছাপাইয়া জল পড়িতে লাগিল। অরুণ বলিল "আচ্ছা, আমি বড়দার কাছে কথাটা জিজ্ঞাসা করছি তুমি কেঁদোনা, কাকা বাবু সেরে উঠবেন। ডাক্তাররা কি বলেন শুনিগে।" তার পর সে রোগীর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে কাকা বাবুর ঘরে গিয়া দেখিল ডাক্তারেরা একে একে হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত; তাঁহাদের মুখ ভার। তাঁহার ছেলেরা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মুখ উৎকণ্ঠায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। রোগী মাঝে মাঝে বলিতেছেন আমাকে আপনারা আর চারটে দিন বাঁচিয়ে রাখুন, তারপর আমি সুখে মরতে পারব।" ডাক্তারেরা আশ্বাস দিতেছেন "ভয় কি তেমন কিছু নয়, আপনি মন থেকে সব দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন।" তাঁহার মুখে আবার সেই কথা, "আর চারটে দিন বাচান। আর চারটে দিন ধরে রাখুন।" ছেলেদের চোক ভিজিয়া উঠিয়াছে, অরুণের চোখও জলে ভরিয়া গেল; সে যে ইহাকে চিরকাল পিতার মতই দেখিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তাররা "যে ঔষধ চলছে চলুক, রোগীকে খুব আশা দেবেন এ টাকটা তা হ'লে শিগ্‌গির কেটে যেতে পারে। রাত দিন দুর্ভাবনা ভেবে ভেবে ঐ রকম দাঁড়িয়েছে, কিছু বাড়াবাড়ি দেখলেই খবর দেবেন।" বলিয়া দর্শনীর টাকা পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। রোগী চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া রহিলেন, বেশী কথা কওয়া ডাক্তারের নিষেধ। তাঁহার বড় ছেলে কাছে বসিয়া রহিল, আর সকলে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ বাহিরে আসিয়া সুধার মেজদাকে জিজ্ঞাসা করিল "মেজদা ব্যাপারটা কি বলতো;" সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "বাবার Heart disease (হৃদরোগটা) খুব বেড়েছে।" অরুণ আবার জিজ্ঞাসা করিল "বাবা জানেন না, সুধার কাছে শুনলাম তাঁকে জানান বারণ। ব্যাপারটা কি?

আমিতো কিছুই বুঝতে পারলাম না।" সে পূর্ব্বের মতই [illegible] ভাবে বলিল "কেন তুমি কি কিছু শোননি? আর [illegible] সঙ্গে তোমার দেখা না করাই উচিত।" অরুণ [illegible] বলিল "আমি কিছুই বুঝছি না। আমি [illegible] থেকে ফিরছি।" অরুণ [illegible] প্রশ্ন করিয়া [illegible] আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে ব্যাপারটার একটা [illegible] কাহিনী বাহির করিয়া লইল। তাহার বিশ্বাস হইল না। সে কাতর ভাবে বলিল "তোমায় জোড়হাত করছি মেজদা, বল ব্যাপারটা সত্য না ঠাট্টা।" মেজদা আর একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল "আমার বাবা মৃত্যু-শয্যায়, আমাদের এখন ঠাট্টা করবার মত সময় বা মনের অবস্থা নেই।" অরুণ চটিল না। সে বুঝিল নৈরাশ্য ও আতঙ্কের কতবড় তিক্ততায় তাহার এই সুহৃদ আজ এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছে। এই নিরপরাধ পরিবারটির উপর কি প্রকাণ্ড দুর্ভাগ্যের, কত বড় মর্ম্মান্তিক বেদনার, নিষ্ঠুর বজ্র উদ্যত রহিয়াছে, সে তাহা স্পষ্ট বুঝিল। সুধার সেই হাসিতে উজ্জ্বল, অশ্রুতে স্নিগ্ধ মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। অরুণ কাঁদিয়া ফেলিল।

মেজদার চোখও জলে ভরিয়া গেল। সে বলিল "তোমাদের দোষ কি ভাই। সবই আমাদের বরাত। মা গেলেন, বাবা চলেছেন, জ্যাঠা মশায় সুধার মুখের দিকে চাইলেন না। কানপুরে ওর একটু মাথা ধরলে উনি অস্থির হয়ে পড়তেন"— সে আর বলিতে পারিল না। অরুণ কিছুক্ষণ চোখ মুছিয়া বেশ দৃঢ় স্বরে বলিল "আমি সুধাকে ঐ লগ্নেই বিবাহ করিব তোমরা শ্যামবাজারে বারণ করে পাঠাও।"

সুধার ভাই হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অরুণ বলিল "বোধ হয় বাবার আপত্তির কথা ভাবছ। এতে পিতৃসত্য পালন করা হবে, পিতার অমান্য করা হবে না। দেব ধর্ম্ম সবাই জানে, বাবাও জানেন তাঁর আমি কুপুত্র নই।" এবার সুধার দাদা বলিল "তুমি সব কথা জান না ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর জ্যাঠামশায় টের পেলে একটা কাণ্ড বাঁধবে, বিবাহও হবে না, বাবা সেই shock এ (আঘাতে) মারা পড়বেন; সুধার [illegible] আছে তাই হবে। নিয়তি কে খণ্ডাবে ভাই!

অরুণ উত্তর করিল "বেশ বাবা টের পাবেন না তোমরা এই দুটো দিন ব্যাপারটা গোপন রেখে।" সুধার দাদা তখন বলিল "বাবার সঙ্গে একবার কথাটা কয়ে দেখো। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। একি সম্ভব?"

অরুণ বলিল "বেশ তিনি একটু সুস্থ হ'ন। আমি বিকাল [illegible] এসে কাকা বাবুকে কথাটা ব'লব। তোমরা ব্যাপারটা [illegible] রেখো, বাবার কাণে না ওঠে।"

সুধার দাদা বাড়ীতে কাহাকেও কিছু বলিল না, ব্যাপারটা যে সম্ভব হইতে পারে সে নিজেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অরুণ হয়ত ঝোঁকের মাথায় বলিয়া গেল, বাড়ী গেলে আবার কি মত হয় কে বলিতে পারে? জ্যাঠা মশাইকে কেহ কখনও কথা পাল্টাইতে দেখে নাই, তিনিই যখন এমন করিলেন, তখন কাহাকে বিশ্বাস?

(৬)

সেইদিন সন্ধ্যার পর অরুণ আসিয়া ধীরে ধীরে করুণাময়ের বিছানায় তাঁহার পায়ের কাছে বসিল। করুণাময় চোক মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?" অরুণ উত্তর করিল "আজ্ঞে আমি অরুণ। এখন কেমন আছেন কাকা বাবু?"

করুণাময় বলিলেন "আমার আবার থাকাথাকি! যাবার বয়স হ'য়েছে, এখন গেলেই হয়। তুমি কবে এলে? ভাল আছ বাবা? কলেজ বন্ধ হয়েছে?" অরুণ উত্তর করিল "আজ্ঞে আমি ভালই আছি। আজ সকালে এসেছি। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।" করুণাময় বলিলেন "বেশ ত, বল।"

অরুণ বলিতে লাগিল "এখানে কি হ'য়েছে, আমি কিছুই জানতাম না। ওবেলা মেজদার কাছে সব কথাই শুনে গেছি। আপনি আর ভাববেন না। আমি ঐ লগ্নেই সুধাকে বিবাহ ক'রব। আপনারা শ্যামবাজারে বারণ ক'রে পাঠান।"

খানিকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর করুণাময় ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন "বাবাজি! কথাটা খুবই উত্তম। কিন্তু তোমরা কেউ কৃষ্ণরামকে জান না। ও চিরকালই একরোখা লোক। আমি যখন পারিনি ভুলাবতে কেউ ওর মত বদলাতে পারবে না; তুমিও না, তোমার মাও নয়। আর তোমাকেই বা তোমার বাপের মতের বিরুদ্ধে এত বড় একটা কাজ করতে কি ক'রে বলি?'

অরুণ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল "কেন? বাবা যে সত্য করেছিলেন আমি সেই সত্য রক্ষা ক'রবো। কথাটা এখন চাপা থাক। কাযঁ চুকে গেলে বাবা জানবেন, তা হ'লে কোন গোলযোগই ঘটবে না।"

করুণাময় ভাবিতে লাগিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কৃষ্ণরামকে আমি যতটা জানি তোমরা কেউ ততটা জান না। তুমি যদি তার অমতে বিবাহ কর, সে তা হ'লে আর এ জন্মে তোমাদের মুখ দর্শন করবে না। নিশ্চয় যেন সে তোমায় ত্যাজ্যপুত্র ক'রবে।"—

"কাজ কি বাবাজি অত ফ্যাসাদে? আমি বলি, সুধার বরাতে যা আছে তাই হবে। জেনে শুনে কি ক'রে তোমায় পথে বসাই?"

অরুণ আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল "বাবা যদি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেন, তা হ'লেই পথে বসব? আমার বাপ আর সুধার বাপ দুজনে নিঃসম্বল অবস্থা থেকে এত ধন মান উপার্জ্জন ক'রেছেন, আর আমি লেখাপড়া শিখে পেটের ভাত ক'রে খেতে পারব না? আপনারা জানেন আমি আরামের পড়া নিইনি, নিজের ইচ্ছায় ইঞ্জিনিয়ারিংএর কঠোর খাটুনিতে গিয়েছি।"

করুণাময় অবাক হইয়া গেলেন। এ বলে কি! যে কখনও তাঁহাদের সম্মুখে ঘাড় উচু করিয়া কথা বলে নাই, তাহার মুখে এমন নির্ভীক, এমন স্পষ্ট, এমন তেজের কথা! করুণাময় ভাবিতে লাগিলেন। অরুণ বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "এতে যদি আপনি অমত করেন, তা হ'লে জানবেন আপনারা দুই বন্ধুই ধর্ম্মে পতিত হবেন। আর আমাকেও কেউ খুঁজে পাবেন না।"

করুণাময়ের দুই চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি আনন্দে গদগদকণ্ঠে বলিলেন "আমি অমত ক'রব ব'লছ অরুণ! এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে বাবা? আমি ত তা হ'লে সুখে মরতে পারি। তোমার বাবা যদি তোমায় বিষয়ে বঞ্চিত করেন, সুধার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি উইলে তার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখেছি। বেশ, কথাটা এখন চাপাই থাক।" অরুণ তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল। করুণাময়ের দুই চোখ বহিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কাশিপুরের শ্মশানে যে আগুন জ্বলিয়াছিল এই পনর বৎসর কাল তাঁহার ভিতরটা তাহাতেই দগ্ধ হইতেছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, আজিকার এই অশ্রু যেন কোন দেবতার মঙ্গল ঘটের পূত শান্তিজল। বহু বৎসরের হাহাকার স্তব্ধ করিয়া আজ যেন কাহার প্রসন্ন হাস্য তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল; কি গভীর শান্তি কি নিবিড় সান্ত্বনা, কি মদির আনন্দ, আজ এই দেব শিশু তাঁহাকে দিয়া গেল! তিনি প্রাণ ভরিয়া অরুণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ তাঁহার মনে হইল কৃষ্ণরাম ঠিক বলিয়াছেন, ভগবান তাঁহাকে ভোলেন নাই, তিনি যথার্থই কান পাতিয়া আছেন। অধম সন্তানের জন্য তাঁর এত স্নেহ, এত দরদ! করুণাময় প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন।

(৭)

আজ গোধূলিলগ্নে অরুণের বিবাহ। করুণাময়ের ব্যারামটা অতিশয় বাড়িয়াছে। বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। বিবাহের কথা কেহই জানে না। ছেলেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে, তাহাদের মা নাই।

কথাটা কেমন করিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় হরিসভায় কৃষ্ণরামের কাণে পৌছিল। তিনি শুনিলেন নয়টার লগ্নে এই বিবাহ। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। শাস্ত্র বলেন "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ" আর করুণাময় তাঁহার পুত্রকে বিদ্রোহী করিল! হায়! হায়! এই বিবাহ যে ভোগের বিবাহ। ইহাতে একটা ব্রাহ্মণের ছেলের ধর্ম্মকর্ম্ম সব মাটি হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া গেলেন।

এ কি তাঁহার গৃহিণী, ছেলেরা, সবাই ওবাড়ি চলিয়া গিয়াছে! তিনি রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া করুণাময়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। যদি এই বিবাহ বন্ধ না হয়, এ জীবনে সেই কুপুত্রের মুখ দেখিবেন না।

কৃষ্ণরাম গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর দরজায় অনেকগুলি গাড়ী দাঁড়াইয়া। বটে! এই নাস্তিককে তিনি সকলের সামনে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার একজন পরিচিত ডাক্তার বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া মোটরে চাপিলেন। তিনি কৃষ্ণরামবাবুকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন

"এই যে, আপনি এসেছেন। যান, যান, উনি আপনাকে দেখতে চাইছেন। হয়ত আপনাকে কিছু বলে যাবেন, এরপর আর সময় পাবেন না।"

কৃষ্ণরাম চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু? করুণার কি কিছু অসুখ করেছে?"

ডাক্তার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি জানেননা রায় বাহাদুর? আমাকে যে মাস খানেকের ওপর এঁরা call (ডাক) দিচ্ছেন! এখুনি হার্টফেল্ করতে পারে, বড় জোর যদি রাতটা কাটে।"

কৃষ্ণরাম ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। সামনের ছোট উঠানটিতে বিবাহ সভা। তখন পুরোহিতরা তাড়াতাড়ি করিয়া সবে মাত্র সম্প্রদান শেষ করাইয়াছেন। অরুণ পিতাকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। সে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল "বাবা, আপনার সত্য আমি রক্ষা করিছি।"

"বেশ ক'রেছ বাবা!" বলিয়া করুণাময়ের ঘরের দিকে ছুটিলেন। সিঁড়িতে করুণাময়ের বড় ছেলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। সে বলিল "জ্যোঠামশায় এসেছেন। আপনার কাছে লোক পাঠাচ্ছিলাম। বাবা আপনার জন্যে ছটফট কচ্ছেন।"

কৃষ্ণরাম দ্রুতবেগে করুণাময়ের ঘরে ঢুকিলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন "করুণ! কি করলি ভাই! এমন কাজ করিস্ নি। আমাকে এত বড় শাস্তি দিস্ নি। মাপ কর্ ভাই, আমাকে এইবারটা মাপ কর।" তিনি বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

করুণাময় ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি জানতাম তুমি আসবে—ভালবাসারই জয় হবে। তোমার জন্যই বোধহয় প্রাণটা এখনও আছে।" কৃষ্ণরাম আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভাই! আর কটা দিন অপেক্ষা কর, আমিও যাব; এক যাত্রায় পৃথক্ ফল ফলাস্‌নি ভাই!"

করুণাময়ের চোখে জল আসিল। তিনি স্তিমিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন "তোমার ছেলে-বউকে আশীর্ব্বাদ কোরো ভাই। আমি চল্লাম। এরা সব রইল, দেখো।"

কৃষ্ণরাম অধীরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি ওদের আশীর্ব্বাদ করছি। তুমি আমায় প্রাণ খুলে ক্ষমা কর। আর কটাদিন অপেক্ষা কর ভাই! আবার আমরা এক যাত্রায় বেরিয়ে পড়ব।"

করুণাময় একটু স্থির হইয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন "এক যাত্রায় পৃথক্ ফল ফলেনি ভাই! আমি তাঁর করুণায় বঞ্চিত হইনি। তুমি তাঁকে ডেকেছ, আমিও তার ফল পেয়েছি। দয়াময় এই অধম সন্তানকে দয়া করেছেন।" তাঁহার দুই চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

গান।

রাত পোহাল ওরে কানাই আর কতরে করবি দেরী?
ধরা চূড়া বাঁশী নিয়ে আয়রে ও ভাই ত্বরা করি।

থা'কনা ভাই আজ মাখন খাওয়া,
মায়ের আদর সোহাগ পাওয়া,
ওরে আমরাও ত মায়ের ছেলে,
তাই ব'লে কি এতই করি?

ওই দেখ যমুনার জলে
সোনার কিরণ পড়ল গ'লে
বলাই দাদার সঙ্গে নিয়ে
আয়না—কেন এত দেরী?
আমরা শ্রীদাম সুদাম সখা,
তোমাদেরই প্রেমে মাখা;
ধেনু নিয়ে বাঁশীর রবে
চল্‌রে পথ মুখর করি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেনগুপ্ত

রামায়ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষ।

হিন্দুর আদি কাব্য রামায়ণ কোন সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী তদ্বিষয়ে অদ্যাপি এক মত হইতে পারেন নাই। রামায়ণের স্থানে স্থানে জৈন এবং বৌদ্ধ মতের এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের পঞ্চতন্ত্রের গল্পের অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ ইহা বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী আধুনিক কাব্য বলিয়া মনে করেন। মহাভারতে রামায়ণের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন, অথচ রামায়ণোক্ত বুদ্ধদেবের নাম বা পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নানাবিধ সুযুক্তির অবতারণা করিয়া রামায়ণের রচনাকাল মহাভারত রচনার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের আদিতেই আমরা সেই নীরস ও জটিল তর্কের অবতারণা করিয়া পাঠকদিগের বিভীষিকা জন্মাইতে চাই না। তাঁহারা ঐ জটিল তর্কে প্রবেশ না করিয়াও মহাভারত রচনাকালে আর্য্যগণের বসতি বিস্তার, অসভ্যজাতি সমূহের আর্য্যানুগত্য স্বীকার, সকল শ্রেণীর লোকেরই রীতি, নীতি ও সামাজিক ব্যবহারের উৎকর্ষ, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ প্রণালীর উন্নতি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক তত্ত্বগুলির সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়াই সাধারণ জ্ঞানে মহাভারত হইতে রামায়ণের প্রাচীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এতদনুসারে রামায়ণের বয়স বর্ত্তমান সময়ে ন্যূন পক্ষেও ৫০০০ পাঁচ-হাজার বৎসর বলিয়া অবিতর্কে স্বীকার করিলে সত্যের বিন্দু-মাত্র অপলাপের আশঙ্কা নাই।

সকলেই একথা জানেন যে রামায়ণ পৌরাণিক কাব্য, ইতিহাস নয়। কিন্তু ধৈর্য্য এবং অভিনিবেশ সহকারে কল্পনা ও রূপকের কুহেলিকা ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহাতে সুদূর অতীতের অনেক ঐতিহ্যতত্ত্বের ক্ষীণ জ্যোতি আমাদের সমক্ষে প্রতিভাসিত হয়। অদ্য আমরা সেই ক্ষীণরশ্মির সাহায্যে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন ভারতবর্ষকে একবার দেখিবার জন্য চেষ্টা করিব।

নানা জাতি

রামায়ণ রচনাকালে ভারতবর্ষ এবং তাহার সন্নিহিত দেশগুলিতে কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট কোন, কোন জাতীয় মানবকুল বাস করিত, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা এবং সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে রামায়ণের দশস্কন্ধ রাক্ষস, সহস্রশীর্ষ নাগ, দীর্ঘলাঙ্গুল বানর সপক্ষ গৃধ্র, মহাবল অসুর, দৈত্য, অদ্ভুত-পরাক্রম গন্ধর্ব্ব চতুর্মুখ-পঞ্চমুখ দেবতা ও তাহাদের সহিত নানাবিধ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত নরগণের অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠ করিলে প্রথমতঃ আমাদের বিষম রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদিগকে মানব জাতির অন্তর্গত বিবিধ শ্রেণীর মানব বলিয়া মনে না করিয়া বিভিন্ন মৌলিক জীব বলিয়াই মনে হয়। স্থূলভাবে রামায়ণ পাঠে বোধহয় যেন ইহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী; কবি যেন কেবল কল্পনা বলে তাহাদের উপরে মানব ধর্ম্মের আরোপ করিয়া অদ্ভুত রহস্যময় কাব্যের সৃষ্টি করিয়া-ছেন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু, কাফ্রি, শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, রেড ইণ্ডিয়ান এবং পীতাঙ্গ চীনেম্যানের মধ্যে জাতিগত যেরূপ পার্থক্য, ঐ সকল নর বানর বা রাক্ষসাদির মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পার্থক্য ছিল না। আজকাল যেমন পৃথিবীর নানা মৌলিক মানবের মধ্যে অনবরতঃ যৌন সম্মিলন ঘটিতেছে, তৎকালেও এরূপ সম্মিলনের বাধা ছিল না।

দাক্ষিণাত্য নিবাসী "বানর" নামক যে কপিশাঙ্গ মিশ্র জাতির সাহায্যে আর্য্যকুল ধুরন্ধর শ্রীরামচন্দ্র দ্রাবিড় জাতীয় কৃষ্ণাঙ্গ রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া তদ্দেশে আর্য্য প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই বানরগণ অনুন্নত জাতি হইলেও শিক্ষালোক বঞ্চিত একান্ত অসভ্য জাতি ছিল না। ইহাদের মধ্যেও বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্পানুশীলন ছিল। বানর রাজ বালী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও নির্ব্বাসিত সুগ্রীবের প্রধানামাত্য বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান যখন সুগ্রীবের সহিত,

তদবস্থ নির্ব্বাসিত বিপন্ন রামের মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া শ্রীরামসকাশে উপস্থিত হন তখন পার্ব্বত্য বানর-জাতির শিষ্টাচার ও যুক্তিপূর্ণ সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"নানৃগ্বেদ বিনীতস্য না যজুর্ব্বেদ ধারিণঃ,
না সাম বেদ বিদুষঃ শক্য মেবং বিভাষিতুম্।
নুনং ব্যাকরণং কৃৎস্ন মনেন বহুধা শ্রুতম্,
বহুব্যাহরতা নেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।
* * * * *
অবিস্তর মসন্দিগ্ধ মবিলম্বিত মব্যথম্,
উরঃ স্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যম স্বরম্
সংস্কার ক্রম সম্পন্নামদ্রুতামবিলম্বিতাম্,
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয় হর্ষিণীম্ "
(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩য় সর্গ)

"ঋক্ সাম বা যজুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য লোকে এমন বাক্য বলিতে পারে না। ইনি এত বক্তৃতা করিলেন অথচ একটী বাক্যদুষ্ট বা অপশব্দও প্রয়োগ করিলেন না। ইহাতে বোধহয় ইনি ব্যাকরণসঙ্গত বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। বক্ষ ও কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত মধ্যম স্বর অবলম্বন করিয়া ইনি পদবিন্যাস ক্রমানুসারে শ্রুতিকটুতা দোষ শূন্য সংক্ষিপ্ত বাক্যে যে সকল কল্যাণীয় সুসংস্কৃত বাক্য বিন্যাস করিলেন তাহা বড়ই সন্তোষজনক " ইহা কি বানর জাতির ভাষাভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত নহে? নিতান্ত অসভ্য জাতির কি ভাষায় এমন অধিকার সম্ভবে?

কেবল ভাষাজ্ঞানে নহে, নীতিজ্ঞানেও "হনুমান" একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যখন সীতার অনুসন্ধানার্থে ছদ্মবেশে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গভীর নিশায় গুপ্তভাবে রাক্ষসেশ্বরের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নানা জাতীয়া পত্নী এবং উপপত্নী মহলে অপরিচিতা সীতাকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখন আকর্ণ বিশ্রান্ত-নয়না, স্খলিতবসনা, মুক্তপয়োধরা, মদবিহ্বলা ও নিদ্রাতুরা যুবতীবর্গকে দেখিয়া হনুমান মনে করিয়াছিলেন—

"পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্,
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি।"
(সুন্দরকাণ্ড ১১শ সর্গ)

অর্থাৎ "আমি যে অবরোধবাসিনী নিদ্রিতা পরপত্নীগণকে গোপনে দেখিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ম হইতেছে।"

বিধবা বিবাহ ও মৃত ভ্রাতৃদার গ্রহণ করা বানর সমাজে নিন্দনীয় না হইলেও ইহাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ জাতি বলা যায় না। ইহারা চরিত্রহীন বর্ব্বর জাতি হইলে দেশ কাল পাত্রাভিজ্ঞ মহাকবি বাল্মীকি কখনও হনুমানের মুখে একথা বলাইতেন না। বস্তুতঃ বেশভূষার পারিপাট্যহীনতা হেতু আধুনিক বাবুর দল অদ্যাপি যে সকল সরলপ্রাণ বন্যজাতিকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন নীতিজ্ঞানে তাহারা নিতান্ত হেয় নহে। যে সকল বাবুরূপী বানর রেলগাড়ী বা ষ্টীমারের ভিড়ের মধ্যে লজ্জা-ভয়-সঙ্কুচিতা বেপমানা কুলাঙ্গনাগণের উপরে সাধ করিয়া পড়িয়া গিয়া আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করেন, বন্য সর্দ্দার হনুমানের নিকটে তাহারা নীতিশিক্ষা করিতে পারে। বানর-কামিনীগণ খুব মদ্যপানাসক্তা এবং নৃত্যপরায়ণা হইলেও তাহারা বনবিহঙ্গীর ন্যায় স্বাধীনভাবে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত না। তাহাদের মধ্যেও কথঞ্চিৎ অবরোধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বানররাজ সুগ্রীব যুদ্ধযাত্রা কালে "স্ত্রী দর্শন ক্ষমাঃ" অর্থাৎ যাহাদের রাজান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার আছে, তাহাদেরই হাতে অন্তঃপুরের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

বানরজাতির সৌন্দর্য্যবোধ এবং অবস্থানুসারে আড়ম্বর-প্রিয়তাও দেখা যাইত। বানর রাজা সুগ্রীব শ্রীরাম সকাশে যাত্রাকালে বহু মূল্যবান অলঙ্কার ধারণ করিয়া এবং "পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মানেন মূর্দ্ধনি" রূপে (মস্তকে পাণ্ডুর ছত্র ধ্রিয়মান হইয়া) গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ "শুভ্র প্রাসাদ শিখর-শোভিত" "ফল পুষ্প শোভিত বৃক্ষ ঝাটিকাপূর্ণ" "সুদৃশ্য তোরণ সমন্বিত" পার্ব্বত্যনগরী কিষ্কিন্ধ্যার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নিহত বালীরাজের শবদেহ যে শিবিকায় আরোপণ করিয়া শ্মশানে নেওয়া হইয়াছিল "সেই শিবিকা নানা বৃক্ষলতা বিচিত্র পক্ষী পুষ্প পত্রাদির চিত্রে শোভিত, জালময় বাতায়নযুক্ত, বিবিধ কারুকার্য্য খচিত তরুণ সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল এবং রাজযোগ্য আসন সমন্বিত ছিল।" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৫শ সর্গ)। ইহাতে মনে হয় যে তাহারা তৎকালে আর্য্য দেব-নরগণের অনুকরণে সুন্দর সুন্দর যান বাহনাদি নির্ম্মাণ করিতেও শিখিয়াছিল। আবার সুন্দরা-

কাণ্ডের একাদশ সর্গে হনুমানের মুখে রাক্ষসনাথ রাবণের গৃহ-সজ্জাদির যে সুবিস্তৃত বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় * তাহাতে তো তাহাদিগকেও সৌন্দর্য্যানভিজ্ঞ আমমাংসাশী বর্ব্বর জাতি বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগকে কতকটা বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণের মত পান, ভোজনাসক্ত ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব জাতি বলিয়াই অনুমিত হয়।

বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ।

হিন্দুগণের অসবর্ণ বিবাহের মত তৎকালে বিভিন্ন মৌলিক জাতিগুলির মধ্যেও যৌন সম্মিলন ঘটিত। হনুমানের মাতা বানরী ছিলনা ঐ নারী—

"অপ্সরাপ্সর সাং শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা।
অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেশরিণো হরেঃ॥"

"অপ্সরাশ্রেষ্ঠা 'পুঞ্জিকাস্থলা' কেশরী বানরের পত্নী হইয়া 'অঞ্জনা' নামে পরিচিতা হইয়াছিল।" ঐ অপ্সরা "বিখ্যাতা ত্রিষুলোকেষু রূপেণাপ্রতিম ভুবি" ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ রাক্ষসরাজ রাবণও "ময়দানবের" গৌরাঙ্গী কৃশোদরা কন্যা মন্দোদরীর অলোকসামান্যরূপে মোহিত হইয়া নানা শ্রেণীর পত্নীগণ-মধ্যে তাহাকেই পাটেশ্বরী করিয়াছিলেন। মন্দোদরীর পিতা "ময়" দানব হইলেও তাহার মাতা দানবী নহেন। তিনি "হেমা" নাম্নী এক পরম রূপবতী অপ্সরার গর্ভজাতা। রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ দৈত্যেশ্বর বলির দৌহিত্রী "বজ্রজ্বালা"কে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তদীয় কনিষ্ঠ বিভীষণের সুশীলা পত্নী "সরমা" মানসসরোবর-তীরবর্ত্তী গন্ধর্ব্বরাজ "শৈলুষের" কন্যা। এই ভ্রাতৃত্রয় আবার নর জাতীয় "বিশ্রবা" ঋষির ঔরসে রক্ষ-সুমালি-দুহিতা "কৈকসীর" গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যক্ষেশ্বর "কুবের" ইহাদেরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাবণের মাতামহ "সুমালি"ও বিশুদ্ধ-রাক্ষস নহে। সুকেশ নামক রাক্ষসদলপতির ঔরসে, তদীয় গন্ধর্ব্বজাতীয় পত্নী "বেদবতীর" গর্ভে সুমালির জন্ম। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ও "দানবরাজকুমারী পৌলোমী শচির" পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মানব (ভারতীয় হিন্দু) গণের সহিতও নানা জাতীয় সম্পর্কের বহুল দৃষ্টান্ত নানা পুরাণে দৃষ্ট হয়। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ "যযাতি" গন্ধর্ব্ব-রাজ বৃষপর্ব্বদুহিতা "শর্ম্মিষ্ঠা"কে, মধ্যম পাণ্ডব "ভীমসেন" রাক্ষসকন্যা "হিড়িম্বাকে", তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগকন্যা "উলুপী"কে, আভিজাত্যগর্ব্বিত মহামানী কুরুরাজ "দুর্য্যোধন" নরকাসুর-পৌত্রী "ভানুমতী"কে এমন কি হিন্দুর আদর্শ শ্রেষ্ঠতম পুরুষ স্বয়ং "শ্রীকৃষ্ণ" ভল্লুকাভিহিত জম্বুবান-কন্যা ভল্লুকী "জাম্ববতী"কে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহারা সকলেই যে নানা জাতীয় মানব, তাহা বুঝিতে আর কোন সংশয় থাকে না। মহারাজ দশরথের পরম মিত্র যে জটায়ুপক্ষী, রাবণের সীতাহরণ কালে তৎসহ ভীষণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে এবং শ্রীরামচন্দ্র যে জটায়ুর যথাশাস্ত্র সৎকার করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তদীয় শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন, লঙ্কা সমরে রণাঙ্গনে "শ্বেত-বসন পরিহিত" "মাল্যানুলেপনাদি বিশোভিত" যে গরুড়ের সহিত শ্রীরামচন্দ্র সম্ভ্রমসৎকারে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহারা কি বিহঙ্গম?

রাজনীতি।

মহাকাব্য রামায়ণে তৎকালীন, নর, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই সামাজিক রীতি নীতি এবং রাজনৈতিক অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। আমরা তাহা হইতে তদানীন্তন "নর"-রাজগণের রাজনীতি স্থূলভাবে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে ভারতের সমস্ত হিন্দু নরপতিই "রাজতন্ত্র" প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেন বটে কিন্তু সেই "রাজতন্ত্র" স্বেচ্ছাতন্ত্র নহে। রাজগণ তখন ব্রাহ্মণ, গুরু, পুরোহিত এবং ঋষি প্রণীত শাস্ত্রবাক্যে অনুশাসিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট "নিয়মতন্ত্রে"ই রাজ্য চালনা করিতেন। তাঁহারা গুরু ও পুরোহিতবর্গের নির্দেশানুসারে সুযোগ্য মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিয়া বর্ত্তমানকালেরই মত নানা বিভাগের কার্য্যভার বিভিন্ন মন্ত্রীর উপরে অর্পণ করিতেন।

মহারাজ দশরথের "ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ, অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোর্থবিৎ"—সুমন্ত্রী ছিলেন।

এই আট জন মন্ত্রী ব্যতীতও বশিষ্ঠ, বামদেব, সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়নাদি বিবিধ বেদজ্ঞ ঋষি তাঁহাকে রাজকার্য্যে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। এই ঋষিগণের আদেশে রাজগণকে অনেক সময়ে নিতান্ত কঠোরভাবে আত্মদমন করিয়া সুকঠিন

* ১৩২৫, আশ্বিন মাসের মানসে "শূর্পণখার অভিমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত। দশরথের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ "সগর" বহু সন্তানের পিতা ছিলেন। কিন্তু——

"স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠ সগরস্যাত্ম সম্ভবঃ,
বালান্ গৃহিত্বা তু জলে সরয়্যা রঘুনন্দন ॥
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জত স্থান্নিরীক্ষ্য বৈ।
এবং পাপ সমাচারঃ সজ্জন প্রতিবাধকাঃ ॥
পৌরাণা মহিতেযুক্তঃ পিত্রা নির্ব্বাসিতঃ পুরাৎ।
তস্য পুত্রোংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান ॥"

(আদিঃ ৩৮শ সর্গ)

"মহারাজ সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ বালকগণকে ধরিয়া সরযূনদীর জলে নিক্ষেপ করিত এবং নিমজ্জমান বালকগণকে দেখিয়া হাস্য করিত। তখন সজ্জন প্রতিবাধক এবং নাগরিকগণের অনিষ্টকারী বলিয়া পিতা সগর পুত্র অসমঞ্জকে নির্ব্বাসিত করেন।" কোনও প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে শাসিত দেশের রাজাকেও এতদপেক্ষা কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় না।

সেই সুপ্রাচীনকালেও রাজগণ এমন সাবহিতভাবে রাজ্যশাসন, দুষ্টদমন এবং শিষ্ট পালন করিতেন যে তৎকালে প্রজাসাধারণ রাত্রিকালেও দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া সুনিদ্রা-সুখ উপভোগ করিত। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন চোরের উপদ্রব ছিল না। দশরথ রাজার প্রাণবিয়োগান্তে মৌদ্গল্যাদি ব্রাহ্মণবর্গ শীঘ্র ভরতকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বশিষ্ঠকে যে সকল অনুরোধ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তৎকালে রাজকতার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

"না রাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ,
শেরতে বিবৃত দ্বারাঃ কৃষি গোরক্ষ জীবিনঃ।"

"অরাজক দেশে ধনবানগণ সুরক্ষিত হয় না, এমন কি কৃষক ও গোরক্ষকেরাও দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ঘুমাইতে পারে না।"

অন্যত্র—

"না রাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ,
কথা ভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ ॥"

(অযোধ্যা ৬৭তম সর্গ)

অর্থাৎ অরাজক দেশে কথাশীল (সুবক্তা) ব্যবহারজীবিগণ অভিনন্দনযোগ্য হইলেও কেহ তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে না। এই শ্লোকার্থে তৎকালেও ব্যবহারাজীবের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

চিত্রকূটে শ্রীরাম সহ ভরতের সাক্ষাৎকার সময়ে রাজনীতিবিৎ শ্রীরামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভরতকে রাজ্যপালন সম্বন্ধে যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে তৎকালীন রাজনীতির কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে আমরা সেই সুদীর্ঘ উপদেশ হইতে কিয়দংশের মাত্র মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়া তদানীন্তন রাজনীতির আভাস দিলাম। শ্রীরামচন্দ্র সস্নেহে ভরতকে বলিয়াছিলেন—

"রাজনীতিজ্ঞ নৃপতিবর্গ শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা প্রত্যহ রাত্রিশেষে জাগরিত হইয়া সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা চিন্তা করিবেন। মন্ত্রগুপ্তিই বিজয়ের মূল বলিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। কার্য্য সাধনের পূর্ব্বে সামন্ত নৃপতিগণকেও তাহা জানিতে দিবেন না। বহু মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবে না। উপযুক্ত হইলে মন্ত্রীবংশধরদিগকেই মন্ত্রীপদ প্রদান করা উচিত। যে সকল কর্ম্মচারী সুবিদ্বান, চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও অর্থলুব্ধ বা রাজ্যকামী হয় এমন মন্ত্রীকে, কিম্বা যে সকল দুষ্ট ভৃত্যসদাচারী কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে দূষিত পথ প্রদর্শন করে এমন ভৃত্যকে, আর যাহারা অর্থলিপ্সা হেতু রাজাকে স্বেচ্ছানুরূপ ঔষধ সেবন করাইয়া দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত রাখে এমন রাজবৈদ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিবেন। শূর, সৎকুলজাত, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, ভক্তিমান (রাজভক্ত) এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিবে। তিন চারি বার ইহাদের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা সন্তোষজনক বোধ করিলে তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নীত করিয়া দিবে।

আরও—

"কচ্চিদ্বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্,
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে।
কালাতিক্রমেণ হ্যেব ভক্ত বেতনয়োর্ভৃতাঃ,
ভর্ত্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ তম সর্গ)

"সৈন্যদিগকে যথাকালেই উপযুক্ত ভাতা এবং বেতন দিবে। বেতনাদি দিতে কখনও বিলম্ব করিও না। ভাতা

ও বেতনাদি দিতে বিলম্ব ঘটিলে ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া মহান্ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।" *

জ্ঞাতিবর্গকে সর্ব্বদা বশে রাখিবে। কখনও শত্রুকে দুর্ব্বল মনে করিয়া উপেক্ষা করিবে না। পার্শ্ববর্ত্তী, অপরাপর রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি, সীমান্তরক্ষক, কারারক্ষক ও বিচারকাদির কার্য্যাবলী যেমন গুপ্তচর দ্বারা সর্ব্বদা অবগত হইবে, নিজ রাজ্যের সর্ব্ববিভাগের কর্ম্মচারীর কার্য্যাকর্য্যও তেমনই গোপনভাবে চরমুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবে। বিশ্বাসী গুপ্তচর নিযুক্ত করিতে হইবে। নাস্তিক বা তার্কিকদিগকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না। কৃষক ও বাণিজ্যাজীবি বৈশ্যগণকে স্ব স্ব কার্য্যের উন্নতির জন্য রাজা সর্ব্বদা সাহায্য করিবেন। নাগবন (যে বনে হাতী থাকে) রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিবে। রাজকীয় কোন গুহ্য কথা নারীজাতির নিকটে বলিবে না। প্রাতঃকালে স্বয়ং নগর ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে নগরের অবস্থা অবগত হইবে এবং দিবসের প্রথমভাগে সভাগৃহে রাজবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক সকল প্রজাকে দর্শন দিবে। রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত কখনও এমন মিশামিশি করিবে না, যাহাতে তাহারা নির্ভীক ভাবে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে সাহসী হয়।

দুর্গ, ধনভাণ্ডার, শস্ত্রাগার, যন্ত্র-(যুদ্ধযন্ত্র)-শালা এবং শিল্পীদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রজাবর্গের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিবে। অমাত্য ও বিচারকগণ উৎকোচগ্রাহী না হইতে পারে সর্ব্বপ্রযত্নে এমন ব্যবস্থা করিবে। রাজা স্বয়ং নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। একদিকে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এবং অপরদিকে জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ এবং মরুদুর্গ বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। দীর্ঘ রোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, দুর্ভিক্ষাদি-বিপদগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ, মিথ্যাবাদী বা সৈনিকবলহীন রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে না। বর্ত্তমান যুগেও রাজতন্ত্র মতানুবর্ত্তি রাজাদের পক্ষে এই নীতিগুলি সর্ব্বথা অনুসরনীয়। এই উপদেশে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের রাজগণেরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

তখন রাজগণের চাল-চলন, উৎসব আমোদ বা বিদেশে অভিযান প্রভৃতি বড়ই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। ভরত যে সময়ে শ্রীরামের সন্দর্শন লাভার্থে চিত্রকূটে যাত্রা করেন সে সময়ে—

"* * ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্ম বিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে॥" (অঃ ৮০ সর্গ)

"যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ভূনিম্নস্থ প্রদেশের অবস্থা বুঝিতে পারেন (ভূতত্ত্বজ্ঞ), যাঁহারা সূত্রদ্বারা পরিমাপাদি করিয়া থাকেন, (আমিন), খননপটু শূর (খনক সৈন্য), যন্ত্রচালক, কর্ম্মান্তিক (বেতনগ্রাহী) স্থপতি, যন্ত্রনির্ম্মাতা (ইঞ্জিনিয়ার) বৃক্ষচ্ছেদক, পথ প্রস্তুতকারী, সূত্রধর, সূপকার, সুধাকর (চুণ প্রস্তুতকারী), বংশকার ও চর্ম্মকার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর শিল্পী ও কর্ম্মচারিগণ আগে আগেই যাত্রা করিলেন।" তৎপরে বৃক্ষচ্ছেদন ও প্রস্তর চূর্ণ করিয়া এবং নিম্নভূমি ও গর্ত্ত মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া সমতল রাস্তা প্রস্তুত করা হইল; বৃক্ষশূন্য প্রদেশে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করা হইল। জলপূর্ণ প্রদেশের জল নিষ্কাশন এবং জলশূন্য প্রদেশে সরোবর খনন করা হইল। পথের উভয় পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ এবং পতাকা সন্নিবেশ করা হইল। শুষ্কপথ চন্দনগন্ধি জলে সিক্ত করা হইল। সুজল ও সুফল প্রদেশে শিবির স্থাপিত হইল। পরিখা ও সুধাধবলিত প্রাচীর বেষ্টিত, বিটঙ্ক (পায়রার জন্য নির্ম্মিত খোপ) শোভিত, সপ্তভূমিক প্রাসাদ (সাততালা অট্টালিকা) বিরাজিত, কর্পূরগন্ধে সুবাসিত সেই সকল শিবির দ্বারা অযোধ্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মহাশোভান্বিত হইল। (অযোধ্যা ৮০ সর্গ)

এই অভিযানের সঙ্গে বহুসংখ্যক মণিকার, কুম্ভকার, সূত্রকার (তাঁতী) শস্ত্রনির্ম্মাতা (কর্ম্মকার) মায়ূরক (ময়ূর-পুচ্ছ দ্বারা ব্যজনাদি নির্ম্মাতা) ক্রকচাজীব (করাতী), মণিমুক্তাবেধক, কূপখনক, জলগর্ভে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরে সেতু নির্ম্মাণক্ষম স্থপতি, দন্তব্যবসায়ী (হস্তিদন্ত দ্বারা নানা দ্রব্য নির্ম্মাতা) গন্ধোপজীবী (পারফিউমার),

* মাসিডনাধিপতি ফিলিপের (আলেকজাণ্ডারের পিতার) পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় রাজ্যে নগদ টাকা বেতন দিয়া সৈন্য রাখার প্রথা ছিল না। সামন্তগণ জায়গীর পাইতেন। মোগল রাজত্বকালেও এই প্রকার সৈনিকবৃত্ত্যধিকার প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার দোষ দেখিয়া এখন সর্ব্বত্র সৈন্যদিগকে নগদ টাকা বেতন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অতি প্রাচীনকালেই এই আধুনিকী রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধাদির সময়ে বেতনাতিরিক্ত ভাতাও সৈন্যগণ পাইত।

কার, কম্বল প্রস্তুতকারক, ধূপ প্রস্তুতকারী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবনাজীব (দর্জ্জি), কৈবর্ত্ত (জলযানচালক) উষ্ণজল দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দনকারী, (জাপানে অদ্যাপি এই শ্রেণীর ভৃত্য আছে), বহুসংখ্যক হস্ত্যশ্বরথ, যুদ্ধোপকরণ এবং চতুরঙ্গিণী সেনা যাত্রা করিল। (অযোধ্যাকাণ্ড ৮৩ সর্গ)। এই বর্ণনা হইতে সেই প্রাচীন ভারতে কিরূপ শ্রম বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছিল, কত প্রকার বিচিত্র বৃত্তিদ্বারা তৎকালীন ভারত-সন্তানগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

শিল্পসমৃদ্ধি।

তৎকালে রাজকীয় চেষ্টাতেই দেশে বিবিধ প্রকার শিল্পের এরূপ উন্নতি হইয়াছিল। রাজপরিবারের বিলাসোপকরণ-নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধবিভাগের কার্য্যে বহুসংখ্যক শিল্পজীবী প্রতি-পালিত হইত। তখন পুরুষ ও রমণী, উভয় শ্রেণীই স্বর্ণময় কেয়ূর, কুণ্ডল, হেমসূত্রগ্রথিত মণিমালা, বলয় এবং কাঞ্চী-দাম ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান কালের মত তখনও ধনবান্ লোকেরা সূক্ষ্মবস্ত্রের যথেষ্ঠ আদর করিতেন। রাজপরিবারেও সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। বনযাত্রা কালে—

স চীরে পুরুষ ব্যাঘ্রঃ কৈকেয্যাঃ প্রতিগৃহ্যতে,
সূক্ষ্মবস্ত্র মবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্তহ। (অযোধ্যা ৩৭ সর্গ)

"পুরুষ ব্যাঘ্র রাম কৈকেয়ী প্রদত্ত সেই মুনিজনোচিত চীরবস্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।" রাজবধূ সীতা দেবীকে তাপসীবেশ ধারণ করিতে হয় নাই। তিনি "সুবর্ণতন্তু খচিত পীতবর্ণ কৌষেয় উত্তরীয়, মণিময় কুণ্ডল, হার কঙ্কণাদি ধারণ করিয়াই বনবাসিনী হইয়াছিলেন। জরির পোষাক নির্ম্মাণের জন্য তখনও বিভিন্ন প্রকারের "তন্তুকারের" উল্লেখ দেখা যায়। অযোধ্যায় রাজভবন—

"মহাকপাট নিহিতং বিতর্দ্দি শতশোভিতম্,
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুম তোরণম্।

"সুবৃহৎ কপাট সংযুক্ত ছিল, ভবনপ্রাচীরের শত শত বেদিকার উপরে কাঞ্চন প্রতিমা সকল স্থাপিত ছিল এবং তোরণ দ্বার মণিবিদ্রুম রাজিতে শোভিত ছিল।" তাহার-অভ্যন্তর—"মণিমুক্তাভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্" এবং "সারদৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দ্দদ্ভি বিরাজিতম্।" কোন অট্টালিকা "স্ফাটিক ও কাঞ্চনময় বিচিত্রস্তম্ভ শোভিত" কোন হর্ম্ম্য "বৈদূর্য্য-কৃতসোপান কিঙ্কিণীজালশোভিত" ছিল। কোথায়ও বা "বজ্রস্ফটিক শোভিত দান্তুতোরণ" দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। অতিরঞ্জিত কবিকল্পনা হইতে প্রভূত পরিমাণে "ডিস্কাউন্ট" বাদ দিলেও এই স্থাপত্য বর্ত্তমান মিসরের ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী অট্টালিকারাজির উপরের আসনে স্থানলাভ করিবার যোগ্য। যে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটক মিসর ভ্রমণ করিতে গিয়া তত্রত্য "ফিঙ্কস" শোভিত "অ্যামন" দেবের মন্দির, সুবৃহৎ "পাইলন" রাজি বা পুরাতন "হেলিওপোলিসের" ধ্বংস চিহ্ন দেখিয়া ঐ দেশকেই জগতের আদিম স্থাপত্যাগার বলিয়া মনে করেন, রামায়ণোল্লিখিত বর্ণনাগুলি তাঁহাদের প্রণিধানযোগ্য। "ফিনিসিয়া দেশে কাচের উৎপত্তি হইয়াছিল" বলিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা কি রামায়ণোল্লিখিত "স্ফাটিকস্তম্ভ" "স্ফটিকময় গবাক্ষ" এবং "স্ফটিকময়ী বেদিকা" প্রভৃতি শব্দগুলিকে "প্রক্ষিপ্ত" নামক "হজমীগুলির" অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন মহাকবি বাল্মীকি আদিকাণ্ডের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় তদানীন্তন ভারতীয় প্রধান প্রধান নগরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে, দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বাসিগণ নগরনির্ম্মাণ-বিদ্যায় বর্ত্তমান কোন সভ্যজাতি হইতে হীন ছিলেন না। বর্ত্তমান জয়পুর নগরের সরল রাজ-পথ, প্যারিস নগরীর প্রমোদাগার ও নাট্যশালা, ইউরোপীয় দুর্গমালাসুরক্ষিত নগর এবং বিপণিমালা দেখিলে বাল্মীকির বর্ণনীয় অযোধ্যা নগরীর কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিযোজন বিস্তৃত, পুষ্পোদ্যানে সুশো-ভিত, সরলাকার সুদীর্ঘ রাজপথে সুবিভক্ত কুণ্ডলকঙ্কণ ও মুকুটাদি ভূষিত চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপিত সুবিদ্বান জনমণ্ডলী অধ্যুষিত বিলাসপরায়ণ নরনারীগণের ক্রীড়াগৃহশোভিত নানা বাদ্যধ্বনি ও নর্ত্তকীবৃন্দের নূপুর নিক্কণে মুখরিত সহস্র সহস্র শতঘ্নী অস্ত্রে সুরক্ষিত অযোধ্যা নগরীর রাজপথ সহস্র সহস্র বলায়ু, সিন্ধু, কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশীয় সুলক্ষণ অশ্ব এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র এবং মৃগমন্দ্রাদি নানা জাতীয় ঐরাবত পদভরে কম্পিত হইত, নানা আয়ুধসম্পন্ন সেনা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া যখন অযোধ্যা নগরী পৃথিবীর অপরাপর দেশবাসিগণের নিকটে স্বীয় নামের সার্থকতা প্রতি-পাদন করিত, শঙ্খঘণ্টারতি শব্দে যখন অযোধ্যার

সান্ধ্যবায়ু কম্পিত হইত, গান্ধর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ নৃত্যগীতপরায়ণ নাগরিকগণের আনন্দ-কোলাহলে যখন নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত হইত, তখন পৃথিবীর বহু স্থানেই তামসযুগ পূর্ণবিক্রমে আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ দে।

উপলব্ধি।

সেইত যামিনী—
বাকা চাঁদ আঁকা যার গায়,
সেইত কামিনী—
পতিব্রতারূপে শোভা যে পায়;
সেই ত মাধুরী—
গোবিন্দপদারবিন্দে অনুরাগ আনে,
সেই ত চাতুরী—
ইহলোকে সুরলোক নিকটে যে টানে। (কালিদাস)

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী।

ভারতের মুক্তিবাদ।

"বৈরাগ্য বিহনে মুক্তি নাহি হয়।"

সর্ব্ব ধর্ম্মের উপদেশ;

[এই প্রবন্ধটি "প্রবাসী" পত্রিকার অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় ছাপানর জন্য পাঠান হইয়াছিল। 'প্রবাসীর" সম্পাদক মহাশয় ইহার দীর্ঘতার জন্য এটিকে ছাপিতে অসম্মত হন। আমি দূরে থাকায়, কাটাকুটি করিলে ইহার ভাব ও অঙ্গ নষ্ট হইতে পারে.এই আশঙ্কায়, তাঁহাকে কাটাকুটি করিতে অনুমতি দিতে পারি নাই। সুতরাং প্রবন্ধটি না ছাপানর জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আমার বিশেষ নালিস্ নাই। কিন্তু তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে ইহাতে কতকগুলিন অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে যাহা বাদসাদ দেওয়া আবশ্যক। তাহার উত্তরে আমাকে বলিতে হইতেছে যে তিনি যে প্রবন্ধটি ছাপাইয়াছিলেন, ও যাহার এইটি প্রতিবাদরূপে লিখিত হয়, সেটি সর্ব্বতোভাবে এত অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে তাহার প্রতিবাদে মুখ্য বিষয় ছাড়া কতকগুলিন আনুসঙ্গিক কথা না বলিলে বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝান যায় না। সে প্রবন্ধের লেখক, হিন্দু শাস্ত্রে বৈরাগ্য, বন্ধন ও মুক্তি শব্দ দ্বারা কি কি বস্তু বুঝায় তাহা আদৌ না জানিয়া, অন্নকথার কাব্যের ভাবে ও ভাষায় ভারতের বৈরাগ্য ও মুক্তিবাদের নেতা, কপিল, ব্যাস, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণকে, ভ্রান্ত লোক বলিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া, ভারতের যত অমঙ্গল দুর্দশার দায়িত্বও তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকন্তু একজন আধুনিক কবি ও উপন্যাস লেখককে তাঁহাদের শীর্ষোপরি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদি কোন দুষ্ট লোক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাস্তায় ধরিয়া অপমান করে ও বলে যে "তুমি চুরি ও খুন করিয়াছ" সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আপনার মান বাঁচাইবার ও নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথা বলিতে হয়। যদি বিচারক বলেন, "আমি অত শত কথা শুনিতে চাই না; ও যেমন তোমাকে এক কথায় দোষী করিয়াছে, তুমিও তেমন এক কথায় আপনার সাফাই দেও,"—তাহা কতদূর সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হয় বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। দোষ দেওয়া যত সহজ, সাফাই দেওয়া তত সহজ নহে। "প্রবাসীর" প্রবন্ধটি পড়িলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের মুক্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণ মাসিকপত্রিকা-পাঠকের কতদূর অজ্ঞতা থাকিলে একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় এরূপ একটি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে এরূপ আলোচিত প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারে। এ জন্য আমাকে বিষয়টি বুঝাইবার জন্য কিছু বিস্তারিতভাবে লিখিতে হইল।]

লেখক।

গত আশ্বিন মাসের "প্রবাসী" পত্রিকার মুখপাত স্বরূপ শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বোধহয় সকল- স্বধর্ম্মপ্রিয় বাঙ্গালীই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম (পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ) অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালি বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে কেহ কেহ সাংখ্য বেদান্ত দর্শনাদি মুক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনও করিয়া থাকেন। এলাহাবাদের স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীশচন্দ্র বসু এই শ্রেণীর বাঙ্গালীর একজন আদর্শ পুরুষ ও দৃষ্টান্তস্থল ব্যক্তি ছিলেন। আমি মুক্তিশাস্ত্রে একজন শিক্ষানবীশ মাত্র। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত প্রবন্ধের যথাযথ উত্তর কোন পত্রিকায় না দেখিয়া, নিজের অনুপ-যোগিতা বুঝিয়াও, সত্যের অনুরোধে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম।

"প্রবাসীর" প্রবন্ধের আরম্ভটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা দ্বারা লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুর মনের ভাব ও অভি-প্রায় উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।—

যখন মায়াবাদের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" ইত্যাদি সূত্রে দেশের আকাশটা ছেয়ে গিয়েছিল, যখন শতাব্দী শতাব্দীর ত্যাগমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মনে দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে অমৃতের পথটা কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়েই আছে, যখন সমস্ত হিন্দুর প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই জগতটা একটা বিরাট অন্ধকার দিয়ে গড়া—এখানে আছে শুধু দুঃখ আর পাপ—আছে শুধু অশ্রু আর শোক—আছে শুধু দারিদ্র্য আর অপমান, তখন বাঙালীর কানে কানে বাঙালীর কবি নির্ভিক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—এ এক অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্জ্বল্য-মান সংগ্রাম—ত্যাগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। বাঙালী সে দিন তার চিন্তার পুরাতন ও সনাতন পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—একি শুনি?"

উদ্ধৃত কবিতার লাইন গুলিন্ কবি স্যার রবীন্দ্রনাথের লেখনিপ্রসূত।

প্রবন্ধটির আলোচনার প্রারম্ভেই একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। তাহা এই যে, হিন্দু দর্শন বা মুক্তিশাস্ত্রে "বৈরাগ্য," "বন্ধন," "মুক্তি" প্রভৃতি শব্দকে পারিভাষিক শব্দ (technical terms) বলা যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ গুলির ন্যায় এই সকল শব্দের অর্থ মনীষী পরম্পরায় বহুগবেষণা ও কঠোর সাধনার ফল স্বরূপ যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট (precise and defined) ভাবে দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অর্থ যদি সাধারণ সাহিত্যের সমজাতীয় শব্দের অর্থের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সাহিত্যে চলিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আলোচনায় চলে না, সত্যের অপলাপের সম্ভাবনা হয়। সুরেশবাবু "বৈরাগ্য" শব্দকে "অপ্রবৃত্তি" শব্দের সহিত এক ভাবাত্মক করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন, ও যে 'সত্য সত্য' করিয়া তিনি বিহ্বল তাহার মুণ্ডপাত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া-ছেন যে "মানুষের এই ঘোর অধর্ম্ম অপ্রবৃত্তিকে মানুষের অন্তর থেকে দূর করতে হবে, নইলে মানুষ কোনদিন আপনাকে সার্থক করে তুলতে পারবে না।" হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে "অপ্রবৃত্তি" নামে মানুষের কোন বৃত্তি ধরা হয় নাই, এবং ইহা একটি পারিভাষিক শব্দও নহে। হিন্দু দার্শনিকেরা মনুষ্য প্রকৃতির বৃত্তি গুলিন দুই শ্রেণীতে বা "মার্গে" বিভক্ত করিয়াছেন,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ। প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি গুলিনকে বহির্মুখী বলা হয়, অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ, তাহারা জড় পদার্থের সেবক। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি গুলিন অন্তর্মুখী, তাহাদের অন্তর্জগতের সহিত সম্বন্ধ ও তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধক। অপ্রবৃত্তি মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক গতি নয়, ইহা রোগী, অলস, বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ। সুরেশ বাবুর ন্যায় "অপ্রবৃত্তিরূপ মহা অসুর" কল্পনা করা কাব্যের ভাবে ও ভাষার সত্যাপলাপ শক্তির পরিচায়ক, কেননা "অসুর" শব্দত পুংলিঙ্গ বটেই, অধিকন্তু ইহা একটি প্রবল-প্রবৃত্তি-প্রধান জাতিকে বুঝায়। প্রবৃত্তি পশুজাতির ও পশুজাতীয় মনুষ্যের লক্ষণ। নিবৃত্তি উন্নত মনুষ্য ও বীরপুরুষের লক্ষণ, ইহা বহু পুরুষকার-সাপেক্ষ, তাহা পরে বুঝান যাইবে। সাধারণ মনুষ্য প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির সমষ্টি।

বৈরাগ্য শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য ও ভোগ্য-বিষয়ে 'অনাসক্তি'। (বিষয়তুচ্ছধীঃ—শব্দকল্পদ্রুম)—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা। কখন কখন ভাবের ভাষায় বৈরাগ্যকে "বিষয় বিতৃষ্ণা" বলা যায়, কিন্তু তাহাদ্বারা প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হয় না। জ্ঞানী ও সাধুব্যক্তিদিগের বিষয়ে যেমন অনুরাগ নাই, সেইরূপ বিতৃষ্ণা বা দ্বেষও নাই, সাম্য বা অবিচলিত ভাব তাঁহাদের লক্ষণ (সমত্বং যোগ উচ্যতে—গীতা)। তাঁহারা শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে, অর্থাৎ স্ব স্ব আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে তৎপর, কিন্তু কর্ম্মফলে স্পৃহা রাখেন না। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইন্দ্রিয় বিষয়রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সুরেশবাবু উহাদিগকে "আলিঙ্গন" করিতে যেরূপ লালায়িত, সেরূপ কখন হইবেন না। কেননা আগ্রহের সহিত বিষয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করা পশুপ্রকৃতির লক্ষণ। যাহাকে Art বলে, তাহা ইন্দ্রিয়বিষয়কে আসক্তিপূর্ণ আলিঙ্গনের ফল নহে। Art উহাদের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও স্থূল আবরণ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ও সারাংশ গ্রহণ। ইহা একাগ্রতারূপ অন্তর্মুখী বৃত্তির কার্য্য, বহির্মুখী বৃত্তির নয়। দয়া, ক্ষমা, মাতাপিতার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কামশূন্য প্রেম, ইহাদের বিষয় বাহ্যবস্তু হইলেও, ইহারা অন্তর্মুখী বৃত্তি। ইহারা ত্যাগের ভাবান্তর, ভোগসিদ্ধির নহে। এইরূপে দেখা যাইবে যে মনুষ্যের যত উন্নত বৃত্তি সে সব নিবৃত্তিমূলক ও অন্তর্মুখী, পশুবৃত্তিগুলিই প্রবৃত্তি-মূলক ও বহির্মুখী। নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে আহার, নিদ্রা, ভয় ও অপত্যোৎপাদন, এই কয় বিষয়ে মনুষ্য ও পশু সমান, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্ব। পশুপ্রকৃতির লোক ভিন্ন কে না বলিবে যে ধর্ম্মসাধনের মূল উপায় নিবৃত্তি, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্তিমার্গে নিয়োজিত করা? সুতরাং মুক্তির কথা ত দূরে থাকুক, সামান্য মনুষ্যত্বলাভ করিতে গেলেও নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ আবশ্যক। এই নিবৃত্তি মনুষ্যকে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া গিয়া অবশেষে নির্ব্বাণ মুক্তিতে উপনীত করিতে পারে। বৈরাগ্য দ্বারাই নিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। মানুষের প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতঃই এত প্রবল যে তাহাদিগকে জাগরিত ও উত্তেজিত করিবার জন্য ইন্ধনের আবশ্যক নাই।

বৈরাগ্য শব্দ হইতে "বৈরিগ্গী" (বৈরাগী) হইয়াছে বলিয়াই যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই টিকি ও কৌটা ধারণ করিয়া কৌপীন পরিতে ও খোলা হাতে ভিক্ষাবৃত্তি লইতে হইবে তাহা নয়। সুবেশধারী জবাকুসুম তৈলসিক্ত-কেশ বাবুর মধ্যেও বৈরাগ্য থাকিতে পারে। পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী লোকও বৈরাগ্যবান্ হইতে পারেন, আর অনায়াসলব্ধ অন্নপুষ্ট গেরুয়াধারী সন্যাসীর মধ্যেও ঘোর বিষয়লিপ্সা থাকিতে পারে। বৈরাগ্যবান পুরুষ স্বীয় প্রকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ী কেবল সাধন ভজন কার্য্যে দিনাতিপাত করিতে পারেন, অথবা সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবীরও হইতে পারেন। বেদান্ত-দর্শন প্রণেতা বেদব্যাস ও তাহার মায়াবাদী ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কয়জন কর্ম্মবীর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকল মানবজাতির উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপ স্বরূপ হইয়া শত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোকিত করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ৩২ বৎসর জীবনের কার্য্যকলাপ অদ্যাবধি এই দেশ হিমালয়ে বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও দ্বারকা হইতে পুরি পর্য্যন্ত স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের লেখনিপ্রসূত লোকপরম্পরাগত, বহুকষ্টে রক্ষিত পুঁথিগুলির বর্ত্তমান সভ্যজগতে যেরূপ আদর ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে ও অধিকতর পাইতে থাকিবে, তাহার শতাংশও আজকালকার সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত, মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে ঝুড়ি ঝুড়ি উৎপাদিত কাব্য ও উপন্যাস লেখকদের ভাগ্যে কখনই ঘটিবে না। এই দুই শ্রেণীর লেখার মধ্যে হীরকের সহিত কাচখণ্ডের তুলনা দিলেও শেষোক্তগুলির গৌরববৃদ্ধি করা হয়।

দেখা গেল যে সুরেশবাবু হিন্দুমুক্তিশাস্ত্রের বৈরাগ্যশব্দের অর্থ মূলেই বুঝেন না। "বন্ধন" ও "মুক্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা তদনুরূপ। তাঁহার প্রবন্ধে বন্ধন-শব্দের ত ছড়াছড়ি—তালে বেতালে নানারকম সুরে। কিন্তু ইহার যে কি অর্থ তিনি বুঝিয়াছেন তাহা জানান নাই। একি স্ত্রীপুত্রের বন্ধন, না বিষয়ের বন্ধন, না ঋণদারিদ্র্যের বন্ধন, না রোগ শোকের বন্ধন, না জেলের বন্ধন? হিন্দুর মুক্তিশাস্ত্র বলেন যে এসব-গুলিন গৌণবন্ধন এবং একটি মুখ্য বা মূল বন্ধনের ফলমাত্র, সেটি মনুষ্যের কর্ম্মসংস্কার-বন্ধন। দেখা যায় যে

মনুষ্যমাত্রেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যু হয়। রোগে, শোকে, দুশ্চিন্তায়, জরায়, মৃত্যুভয়ে, অবশেষে মৃত্যুতে মানুষকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন মৃত্যুতে সকল সুখসম্পদ, আশাভরসা ফুরাইয়া যায় ও আত্মীয় স্বজনগণকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইতে হয়। এই ভোগ যদি একজন্মেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে ইহার কোন অর্থ না থাকিলেও শেষ আছে, জগতের লটারি খেলায় যা হইবার তা হইয়া গেল! কিন্তু হিন্দুদিগের বিশ্বাস—আর এ বিশ্বাস মনীষীদিগের বহু তত্ত্ববিচার, সাধনা ও যোগসমাধির ফলে ও শিক্ষায় হিন্দুমাত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে—যে জীবের কর্ম্মসংস্কার স্থূলদেহের মৃত্যুর পরেও তাহার সূক্ষ্মশরীরের (প্রেতদেহের) স্মৃতিকে জাগরিত থাকে, এবং ঐ কর্ম্মসংস্কার ফলে জীবমাত্রই সংসারচক্রের মধ্যে বার বার অবশ হইয়া ঘুরিতে থাকে ও বার বার জন্ম, জরা, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই যে অনাদিকাল হইতে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া জীবের দুঃখসঙ্কুল জগতে পুনঃ পুনঃ আগমন ও তন্নিবন্ধন সুখ অপেক্ষা অধিকাংশ দুঃখভোগ, ইহারই নাম বন্ধন। এই বন্ধন না ছিন্ন হইলে চিরকালই অচ্ছান্ত বন্ধন থাকিয়া যাইবে। মহাপ্রলয়ে জগৎব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলেও অমুক্ত জীবের কর্ম্মসংস্কারের নাশ নাই, তাহা অব্যক্তপ্রকৃতিতে লীন বা সুপ্ত থাকিবে মাত্র, পুনর্বার ভোগের জন্য পরসৃষ্টিতে জাগরিত হইবে হিন্দু দার্শনিকেরা বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও বহু গবেষণা ও সাধনার দ্বারা এই বন্ধন হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় আবিষ্কার ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে উপায় এই যে এই সংসার আপনার দেহ ইন্দ্রিয়াদি ঘটিত প্রকৃতি হইতে আপনাকে (আত্মাকে) স্বতন্ত্র বলিয়া জানা ও কার্য্যতঃ সেইরূপ ব্যবহার করা, ও তজ্জন্য আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ ও তদুপযোগী সাধনের ব্যবস্থা। যদি এই বন্ধনের বাহিরে, এই জগৎব্যাপারের সহিত অসংশ্লিষ্ট কিছু থাকে, তাহা এই জগতে থাকিয়াও ইহার নয় (which is *in* this, but not *of* this, world), জগৎ না থাকিলেও যাহার অস্তিত্ব থাকে, জীবের দেহত্যাগ হইলেও যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের সারাংশরূপে থাকিয়া যায়, সেই আত্মা বা পরমাত্মাবাচ্য বস্তুকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত বা তাঁহাতে একীভূত হইতে পারার নাম নির্ব্বাণ মুক্তি। কর্ম্ম ও পুনর্জন্মবাদ এই মুক্তিবাদের ভিত্তি, সুতরাং যাঁহারা ঐ বাদ মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধে আলোচনা যুক্তিবহির্ভূত। যাঁহারা Ether বলিয়া বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের Light সম্বন্ধে তর্ক করা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। মানুষের অনেক জ্ঞাতব্য জিনিস অনুভব (intuition বা যোগদৃষ্টি) দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহাদের আশ্রিত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বা যুক্তিযুক্ততা দেখিয়া তাহাদের সত্যাসত্য বিচার করাই সমীচীন ঈশ্বরজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, অনুমান ও অনুভব সাপেক্ষ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে "সংসার-বন্ধনে মুক্তি"-বাদীরা যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে মনুষ্যের দেহত্যাগের পর আত্মার কি অবস্থা হইবে, ও সংসার-বন্ধনে মুক্তির সুখ কে ভোগ করিবে, তাহার কোন খবর রাখেন কি? ও আত্মার সে অবস্থার জন্য তাঁহাদের আচার্য্যেরা কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? হিন্দুমতে পূর্ণ আত্মজ্ঞান না লাভ করিয়া, সংসার হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক না জানিয়া, ও সেই পার্থক্যজ্ঞান বদ্ধমূল করিবার জন্য যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় তদভিপ্রায়ে কর্ম্মসংস্কারের মূল বাসনা উপযুক্ত সাধনার দ্বারা ছেদন করিতে প্রয়াস না পাইয়া, কেবল সংসারবন্ধনের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া সুখ অনুভবের প্রয়াসের নাম মুক্তি হইতে পারে না ও সে আকাঙ্ক্ষা বিফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেন না সংসারে যাহাকে সুখ মনে করা যায় তাহাও অনেক সময়ে কালধর্ম্মে দুঃখে পরিণত হয়। স্ত্রী, পুত্র, স্বাস্থ্য, বন্ধু, ধন, সম্পদ প্রভৃতি চিরকাল থাকে না, অনেক সময়ে ইহারা দুঃখের কারণও হইয়া উঠে। হিন্দুশাস্ত্রে জীবন্মুক্ত মনুষ্যের কথা পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনকাদির মতন তাঁহারা বহুসম্মানিত পুরুষ, কিন্তু তাঁহারা এই সংসারের অসারত্ব জানিয়া তাহার মায়াবন্ধন কাটাইয়াছেন, ইহার মধ্যে থাকিতে কোন মতেই ইচ্ছুক নহেন, দেহান্তে ইহার হস্ত হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। কেহ যদি এই বন্ধনের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিয়া তাহাকে মুক্তি বলিতে চাহেন তাঁহারা বলুন, কিন্তু তাঁহাদের এই মুক্তিতে আনন্দলাভের ভান করা দৈত্যের হাসি মাত্র।

এ ধরা দুখের ভরা (this world is a vale of tears) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় মাত্রেই পরিণামে তাপদায়ক ও দুঃখময়, ইহা যে কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধদের মত তাহা নহে, সকল উন্নতজাতির ধর্ম্মের নেতারা এই কথা বলিয়াছেন। * কেবল যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি, অদূরদর্শী, স্বার্থপর ব্যক্তি, যাঁহারা আপনাদের আপাততঃ সুখে সকলের সুখ কল্পনা করেন ও পরের দুঃখ গায়ে মাখেন না, যাঁহারা রোমের সম্রাট নীরোর ন্যায় জগৎ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়াও আপনাদের চারকড়ার "বীণার ঝঙ্কার" বাজাইয়া আনন্দ ও সস্তায় বাহবা পান, তাঁহারাই সংসার-বন্ধনে মুক্তির কথা বলিবেন ও তাঁহাদের সর্পমুগ্ধকারিণী বিদ্যা দ্বারা মূঢ়প্রকৃতির লোকদিগকে ভুলাইতে পারিবেন।

সুরেশবাবু স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দোহাই দিয়াছেন। উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের "ঘরে-বাইরে" নামক প্রহেলিকায় সখের তাত্ত্বিক নিখিলেশ বাবু একজন বৈরাগ্যবিদ্বেষী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাপদাদার জমিদারীর অনায়াস-লব্ধ অন্নে পুষ্ট হইয়া, প্রজাদের হাড়ভাঙ্গা মেহেনতের ও দুঃখের টাকা অযথা রূপে ও পরিমাণে নিজস্ব করা ও তদ্দ্বারা ভোগবিলাসের চূড়ান্ত করা রূপ মিথ্যার স্তূপের উপর বসিয়া, "স্ত্রী কি সহধর্ম্মিণী ?"—সমস্যার সত্য আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত দিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর অত্যাচার-পীড়িত প্রজা পঞ্চু, যক্ষ্মারোগে সদ্যমৃত পত্নীর চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন তাঁহার সমক্ষে তাঁহার মাষ্টার চন্দ্রকান্ত বাবুর নিকট তাহার দুরবস্থার কথা জানাইল, তখন নিখিলেশ বাবু তাহাকে এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতে উদ্যত হন নাই! কিন্তু সেকেলে, সাদাসিদে, স্বল্পবেতনভোগী মাষ্টার বাবু পঞ্চু ও তাহার ছেলেপিলেকে কিছুদিন নিজের বাড়ীতে রাখিয়া, যখন তাহাকে কাপড়ের ব্যবসা করিবার জন্য কিছু টাকা ধার দিয়া তাহার নিকট একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইলেন, তখন নিখিলেশ বাবু সেই হ্যাণ্ডনোট লেখান কার্য্যটিকে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিয়া টিপ্পনি করিলেন—"মাষ্টার মশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ—তিনি বলেন মনের ইজ্জৎ চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।" বাঃ! বেশ কথা! কিন্তু নিখিলেশ বাবু নিজে পরোপার্জ্জিত টাকায় বাবুয়ানার ও সখের পরাকাষ্ঠা করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর জন্য কত হাজার টাকার গহনা গড়াইয়াছিলেন ও তাহার জন্য মোটা বেতনের মেমমাষ্টার রাখিয়া দিয়াছিলেন; আর তাঁহার জন্মতিথির দিন তাঁহার দুই ভাজ কে তিন হাজার করিয়া টাকা দিয়া প্রণাম করিতেন; তাহার উপর তাঁহার স্ত্রী বিমলাকে নিয়া সেকেলে বাদসা নবাবদের বিলাসের খেয়ালের মতন একটি খেয়াল করিয়া তাহার দ্বারা নিজের সিন্দুক হইতে ছয় হাজার টাকা চুরি করার প্রশ্রয় দিয়া সেই টাকা ও তাহার গহনার বাক্স একটি দেশোদ্ধারী গুণ্ডার হস্তগত করাইয়াছিলেন। এ সবের জন্য কি তিনি আপনাকে কোনদিন তাঁহার প্রজাদিগের নিকট ঋণী মনে করিয়াছিলেন ও তাঁহার মনের ইজ্জৎ চলিয়া গিয়াছিল ভাবিয়াছিলেন? অধিকন্তু, গরীব পঞ্চু তাঁহার অজ্ঞাতে কোন দিন "টানাটানির সময়" তাঁহার বাগান হইতে কয়েকটা নারকেল চুরি করিয়া যেরূপ কিছু দিন পরে তাহার শোধ স্বরূপ এক ঝুড়ি ঝুনো নারকেল তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল, নিখিলেশবাবু কি তাঁহার প্রজাদিগকে তাহাদের নিকট অযথাভাবে গৃহীত টাকার প্রতিশোধ দিবার কোন দিন প্রস্তাব করিয়াছিলেন? বাংলার জমিদারির ইতিহাস, তাহার অত্যাচার, ও জমিদারতনয়দের খামখেয়ালি খরচের কথা কে না জানে? যাহা হউক, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে নিখিলেশ বাবু ও পঞ্চুর সংসার-দৃষ্টি একরূপ হইতে পারে না, একেবারে উল্টা হওয়াই সম্ভব। নিখিলেশ বাবু অবশ্য বৈরাগ্যকে একটা "ঘোর" বা নেশা মনে করিতেন। কিন্তু গরীব পঞ্চু তাহার নিজের অত্যাচারী জমিদার হরিশকুণ্ডু ও প্রতিবেশী খামখেয়ালি জমিদার নিখিলেশ বাবুর ধরণধারণ, কার্য্যকলাপ দেখিয়া যে ভাবিয়াছিল, "দয়া-ধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ জগতে নেই" এ সংসারটা কিছুই নয়, ও একটা সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি

* পৃথিবীর অধিকাংশ কবিরাও দুঃখের সুরই গাহিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী কবি কাঁদিয়াছিলেন—

হায় পিতা পতিত পাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কানন?
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়ন জলে
দেখিয়া কি হও নাথ আনন্দে মগন?—

দুঃখ সঙ্গিনী।

নিয়াছিল, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বলা বাহুল্য যে পঙ্কুর অবস্থার লোকের সংখ্যাই জগতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অধিক, নিখিলেশ বাবুর অবস্থার লোক দেশের সৌভাগ্যক্রমে খুবই কম। কিন্তু যে অল্পসংখ্যক নিখিলেশ বাবুরা আছেন, তাঁহাদের চালচলন দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে হৃদয়বান্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির, নিজের অভাব না থাকিলেও, বিষয়ের উপর ঘৃণা হইবার কথা। নিখিলেশ বাবু পঙ্কু সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি যা টিপ্পনি করিয়াছিলেন তাহা যদি কোন এংলোইণ্ডিয়ান উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভারতের ঋণ-পীড়িত প্রজার সম্বন্ধে করিতেন, তাহা হইলে উঁহার নৃশংসতার আলোচনায় দেশী সংবাদপত্রে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। যাহাকে ইংরাজিতে বলে cynicism তাহার চূড়ান্ত এই নিখিলেশ-পঙ্কুর ব্যাপারে আছে, অন্যান্য ব্যাপারের উল্লেখের স্থান ও সময় এখন নাই। পাঠক মহাশয় আর একবার পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিবেন। যখন পঙ্কু চোরাই নারকেলের শোধস্বরূপ ঝুনো নারকেলের ঝুড়ি তাঁহার নিকট আনিল, তাহার দুঃখ দারিদ্র্যের কথা জানিয়াও নিখিলেশ বাবুর উদার মনে এই ভাব উদয় হইল—"বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।" এইরূপ হৃদয়শূন্য ডেঁপোমি আজকাল সর্ব্বজ্ঞতার ভাণে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। এই নিখিলেশ বাবুর দল মিথ্যার জঞ্জালের মধ্যে বাস করিয়া, মিথ্যা খাইয়া, মিথ্যা পরিয়া, অহোরাত্র মিথ্যার সহিত আদান প্রদান করিয়া, আজ সত্যের আবিষ্কারক ও শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অধিকন্তু, যে ভারতবর্ষের পুরাতন মনীষীরা সাংসারিক জীবনে সম্পূর্ণ সত্য ত দূরে থাকুক, চারিআনা সত্যও পালন করিতে পারা যায় না বলিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কাটিয়া কলম চালাইতে চান।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সুরেশবাবু "বন্ধনের ভিতর মুক্তির" দ্বারা গীতার কর্ম্মযোগকে উদ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গীতার কর্ম্মযোগ যে নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করা তাহা মনে রাখা চাই, তাহাতে বিষয়ে আসঙ্গলিপ্সা বা আলিঙ্গনের ভাব কিছুমাত্র নাই। আর সেই কর্ম্মযোগ নির্ব্বাণ মুক্তিপ্রদায়ক জ্ঞানযোগের ভিত্তি মাত্র। কর্ম্ম-যোগের উদ্দেশ্য চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তাহাকে জ্ঞানযোগের উপযোগী করে, আর ইহার উপদেশ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অমরত্ব ও জীবদেহের নশ্বরত্ব বুঝাইয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা উল্লেখ করিয়াছেন। গীতা কর্ম্ম-যোগ ছাড়া অধিকারী ভেদে সন্ন্যাস যোগ, ভক্তিযোগ, ক্রিয়া-যোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতির উপদেশ করিয়াছেন,—কিন্তু সকলকেই জ্ঞানযোগ-লব্ধ নির্ব্বাণমুক্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন ও তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। গীতা ইহাও বলিয়াছেন যে জগতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাববিশিষ্ট তাহা পরমেশ্বরের বিভূতি, কিন্তু ইহা বলেন নাই যে তুমি বিষয়ের সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া যাও, তাহার কারণরূপ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিও না। সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত বিভূতি বর্ণন করিয়া অষ্টম অধ্যায়ে ২০—২১ শ্লোকে গীতা বলিয়াছেন:—"এই ব্যক্ত ভাব (জগৎ) হইতে পৃথক ও শ্রেষ্ঠতর আমার (পরমাত্মার) এক অনাদি অব্যক্ত ভাব আছে, যাহা সমস্ত সৃষ্টির বিনাশ হইলেও বিনাশ হয় না। সেই অব্যক্ত অক্ষরই পরমা গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরমধাম।" আর সেই পরমা গতির সাধক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৮—৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন:—"ইহলোকে জ্ঞানসদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করেন, এবং লাভ করিয়া অবিলম্বেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।" ইহা সত্য যে বড় বড় হিন্দু সাধকেরা (রাম-প্রসাদ প্রভৃতি) বলিয়াছেন যে "চিনি হ'তে চাইনে মা, চিনি খেতে ভালবাসি" কিন্তু সে চিনি ব্রহ্মসত্ত্বারূপ চিনি, সাক্ষাৎ ভগবদনুভূতি, যাহার স্বাদ পাইলে সাংসারিক কোন দ্রব্যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহা এই পাপতাপ-দগ্ধ সংসারের ধূলাবালি মিশান চিনি অথবা কাতরা-গুড় নয়, যাহার স্বাদ লইতে গিয়া সংসারী জীব মক্ষিকার মত তাহাতে হাবুডুবু খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাও স্বীকার করি যে প্রকৃতি ভেদে জগতে এমন মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন, যাঁহারা এই নশ্বর জড়জগৎ ছাড়া এক নিত্য চৈতন্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেব এই শ্রেণীর লোক ছিলেন বলিয়া খ্যাত, অন্ততঃ বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এই শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ লোকের পক্ষে সুখে দুঃখে সমভাবে থাকিয়া সংসারের

কর্ত্তব্যপালন করাই শ্রেয় ধর্ম্ম। কিন্তু সুখে দুঃখে সমান কিরূপে হওয়া যায়? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে পারিলে ইঁদুরদের আর ভয় থাকে না, কিন্তু ঘণ্টা বাঁধে কে? সুখে দুঃখে সমান হইতে গেলে অসাধারণ চিত্তবল চাই। সেই চিত্তবল লাভ করিতে গেলে একাগ্রতার অভ্যাস আবশ্যক, ও তাহার জন্য চিত্তের বিক্ষেপজনক সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। এ জন্যই বুদ্ধাদি মহাত্মাগণ সেইরূপ বৈরাগ্যমূলক সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের মতন কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদী, তাঁহাদেরও নির্ব্বাণমুক্তি-প্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যু, ভোগের শেষ হইলে হয়, সুতরাং তাহা এই সংসারের বন্ধনের মধ্যে প্রাপ্য নয়।

সুরেশ বাবু বলিয়াছেন যে "বৈরাগ্যের ভিতরে মানুষ কোন দিনই আপনার জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে না।" তিনি জীবনের অর্থ কাহাকে বলেন, ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কখনও তাহার খোঁজ করিয়াছেন কি না, তাহা না জানাইলে এ কথাটার সার্থকতা বুঝা যায় না। "জীবনের অর্থ" যদি ইংরাজির meaning of life-এর অনুবাদ হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে ইউরোপের পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদের মধ্যে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ও পরমেশ্বরকে প্রার্থনারূপ ঘুষ দিয়া যে পরস্পরের প্রতি সিংহশার্দ্দূলের ব্যবহার হইতেছে, ৭০ মাইল রেঞ্জের কামান ও জেপোলিনের বোমা দিয়া যে peace be unto all men সুসমাচারের ঘোষণা হইতেছে, তাহাকেই কি ঐ meaning খুঁজিয়া পাওয়ার দৃষ্টান্ত ধরিতে হইবে? তাহা হইলে বৈরাগ্যবাদী হিন্দুদিগের পক্ষে সে অর্থ খুজিয়া না পাওয়া শাপে বর হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত meaning of life সম্বন্ধে কোন শেষ মীমাংসায় উপনীত হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহাদের সভ্যতাটি একটি "লাগে তুক না লাগে তাক" ও "জোর যার মুলুক তার" হুড়োহুড়ির ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষের ঋষিরা বহুকাল পূর্ব্বে জীবনের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের শেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন। সে কথাটি এই যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধন মনুষ্য-জীবনের অর্থ বা প্রয়োজনীয় বিষয়, ইহার দ্বারা সাংসারিক জীবনে মঙ্গল ও পরকালে পরমার্থ লাভ হয়। এই চারিটির মধ্যে মনুষ্যের যাহা কিছু আবশ্যক তাহা পাওয়া যায় ও ইহাদের সাধনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। আর এই সাধনার সুবিধার জন্য যে চতুর্বর্ণাশ্রমের স্থাপনা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি মার্গ এই সাধনার ধারাবাহিক ও ক্রমবিকাশশীল প্রধান পন্থা। মোক্ষ সাধনের জন্য যে উৎকৃষ্টতম বৈরাগ্যের আবশ্যক তাহার নাম "পরবৈরাগ্য"। অর্থাৎ মানুষ যখন পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত (স্থিতধী—গীতা) হইতে পারে, তখন সে প্রকৃতির (জগতের) সমস্ত গুণের প্রতি বীতস্পৃহ হয়, এমন কি পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদ তো দূরের কথা, যোগের সিদ্ধি ও ব্রহ্মের ঈশ্বরস্বরূপ ঐশ্বর্য্যও তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। কেবল আত্মানন্দভোগই তাহার পরম পুরুষার্থ হয়। ইহাকে 'পরবৈরাগ্যের' অবস্থা বলে (তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্—পাতঞ্জল দর্শন ১—১৬)। এই অবস্থায় মানুষকে জীবন্মুক্ত বলা যায় ও সেই মানুষই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী। এই সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বলা যায় যে "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি"। কিন্তু এ অবস্থা যাহার তাহার হয় না, কচিৎ কখন কাহারও হয়। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কেহ যোগসিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে, এবং এইরূপ যত্নশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কচিৎ কেহ আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হয়।" আরও বলিয়াছেন (৬—৪৫) যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠানকারী, পাপমুক্ত যোগী, অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরমাগতি লাভ করেন।" নির্ব্বাণবাদীরা এ কথাটি উত্তমরূপে স্মরণ রাখেন, এজন্য তাঁহারা যাকে তাকে ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা গুহ্য বিদ্যা বলিয়া চিরকাল রক্ষিত হইয়াছে। সকল দেশের ও ধর্ম্মের জ্ঞানীদিগের এইরূপ আচরণ, ইহা হিন্দু ঋষিদের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নহে। যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, (Matthew VII—6)—'Give not that which is holy unto dogs, neither cast ye your pearls before swine'. তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রথমে কেবল God's chosen people ইস্‌রেলাইটদের জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহারা যখন গ্রহণ করিল না, তখন স্যামেরিটান ও জেন্‌টাইলদের মধ্যে প্রচারের জন্য তাঁহার শিষ্যদিগকে আদেশ করেন। ইহা দ্বারা বুঝা উচিত যে নির্ব্বাণবাদ আছে বলিয়া

যে জগৎ ওলট পালট হইয়া যাইবে তাহার আশঙ্কা নাই। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—তবে এরূপ জ্ঞান জগতের কোন্ কাজে আসে? বেল পাকিলে কাকের কি? তাহার উত্তর এই—যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব সকল সাধারণ লোকে না বুঝিতে পারিলেও তাহার স্থূল তত্ত্বগুলি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিকীর্ণ হইয়া অনেক কল কারখানায় ও মনুষ্যের জন্য কাজে লাগিতেছে। সেইরূপ যে জ্ঞানের উপর নির্ব্বাণবাদের ভিত্তি, ও যে কর্ম্মবাদের উপর জ্ঞানবাদীদের সাধন প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞান ও সাধন পরম্পরারূপে মনুষ্য-জীবনের আর তিনটি প্রয়োজনের (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের) সাধক। আর চতুর্ব্বর্ণাশ্রম সেই সাধনের উপায় বলিয়া ঐ জ্ঞানের কথা হিন্দু সমাজের স্তরে স্তরে বিকীর্ণ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কেবল যে মোক্ষের জন্য বৈরাগ্যের আবশ্যক তাহা নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম (ভোগ) সাধনের জন্যও ন্যূনাধিক পরিমাণে বৈরাগ্যের আবশ্যক। এই বৈরাগ্যের নাম "অপর বৈরাগ্য।" এই তিন বর্গের প্রত্যেকটির সাধনায় যিনি যে পরিমাণে বৈরাগ্যবান্, অর্থাৎ ত্যাগী ও সংযমী হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিবেন। ধর্ম্মার্থী ব্রহ্মবাদী হউন বা ঈশ্বরবাদী হউন, কৃষ্ণভক্ত হউন বা খৃষ্টভক্ত হউন, আস্তিক হউন বা নাস্তিক হউন, সকল বাদই বলিয়াছেন যে জগতের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, মান অপমানকে তুচ্ছ বা তুল্য জ্ঞান না করিতে পারিলে, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিগতস্পৃহ ও সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত না হইতে পারিলে, ধর্ম্মজীবনে উৎকর্ষতা লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীচৈতন্য, সক্রেটিস্ হইতে যীশু ও মহম্মদ, কপিল হইতে কাউণ্ট টলষ্টয়, সকল ধর্ম্মোপদেশকেরা এই একই কথা বলিয়াছেন। এখানে কেহ কেহ—অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি মানে খৃষ্টানদের Salvation ও God অর্থে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর দুই বুঝেন ও দুইকে এক করেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ধর্ম্ম দ্বারাই ত মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ধর্ম্ম ও মোক্ষের জন্য পৃথক পৃথক সাধন কেন, ও ঈশ্বর মানে না যে নাস্তিক তার আবার ধর্ম্ম কি? হিন্দু বলিবেন ধর্ম্ম মুক্তির সোপান বটে, কিন্তু মোক্ষ প্রধানতঃ তত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ, ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্ম সাপেক্ষ, আর সেই কর্ম্ম সকাম, কেন না কোন না কোনরূপ স্বর্গাদি উচ্চগতির সুখ লাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুক্তিতে কোনরূপ সুখের কামনা নাই, মুক্তির যে আনন্দ তাহা সর্ব্ব সুখ স্পৃহা ত্যাগ করিলে স্বতঃই আসে, ইহা কোনও ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধির গোচর বিষয় সাপেক্ষ নহে। ধর্ম্ম সাধারণ লোকের আয়ত্তাধীন, ইহা এম্ এ পাস অবধি নিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্টসিপ পাইবার মত বিশেষ অধ্যয়ন (সাধন) ও জ্ঞানবুদ্ধির আবশ্যক। আর ঈশ্বর বা দেবতাদি না মানিলেও মানুষ সুকর্ম্ম দ্বারা ধার্ম্মিক হইতে পারে—যথা বুদ্ধদেবাদি—তবে সে কিছু কঠিন কথা বটে। যেমন মায়ের স্নেহ ও বাপের শাসন না পাইয়া আপনার বুদ্ধিতে চলিলে ছেলে বয়ে যাইবারই সম্ভাবনা। অবশ্য যাহার যেরূপ বিশ্বাস মরণান্তে তাহার সেইরূপ গতি হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—কেন না মনের সংস্কার অনুযায়ী মানুষের ইহ ও পরজীবনের গঠন হয়। আস্তিক ধর্ম্ম ঈশ্বর বা দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত দেবলোক বা স্বর্গলোক পর্য্যন্ত নিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। নির্ব্বাণ মুক্তির ব্রহ্মলোক তাহারও অতীত।

মোক্ষ ও ধর্ম্ম সাধনের জন্য সুরেশ বাবুর শ্রেণীর লোক ছাড়া সকল শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিই বৈরাগ্যের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু অর্থ, আর তাহার উপর আবার কাম (ভোগ) সাধনের জন্য বৈরাগ্য—এ আবার কি কথা? এ যেন বিড়ালতপস্বীর চান্দ্রায়ণ-ব্রত! কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়া যিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্ম হারাইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহাকে পদে পদে লোভ সম্বরণ করিতে হইবে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা বর্জ্জন করিতে হইবে, সে জন্য সময়ে সময়ে ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইবে, অল্পে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, ও সদুপায়ে উপার্জ্জনের জন্য যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ত্যাগ-স্বীকার আবশ্যক তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। পরিশেষে, কাম বা ভোগ চরিতার্থের জন্যও বৈরাগ্য বা ত্যাগের আবশ্যক। সকলেই জানেন যে যাঁহারা অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অসংযমী তাঁহাদের ভোগের ক্ষমতার হ্রাস হয়, অল্পবয়সে শরীর জরাজীর্ণ হয়, অকাল-মৃত্যুও হয়। সুতরাং ভোগেও ত্যাগশীল হওয়া আবশ্যক। এজন্য একটি কথা দাঁড়াইয়াছে যে "ভোগে ত্যাগ, ত্যাগে

ভোগ।" অর্থাৎ যাহারা ভোগে অসংযমী তাহাদের ভোগ শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হয়, যাহারা সংযমী তাহাদেরই প্রকৃত ভোগ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কামতৃপ্তি হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বৈরাগ্য বা ভোগে অনাসক্তি সকল সুখ, শান্তি ও সফলতার মূলে, ও মনুষ্যজীবনের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার জন্য পর্য্যায়ক্রমে গাঢ় ও গাঢ়তর হওয়া আবশ্যক। ইহাই মনুষ্যের এই দুর্গম সংসারযাত্রায় একমাত্র সোজা পথ। যাঁহারা এই রাস্তা ধরিতে বা ধরিয়া চলিতে পারেন না তাঁহারা আত্মহারা ব্যক্তি, তাঁহারা নিজের তত্ত্ব কখনও খুঁজিয়া পান না। অবশ্য সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে যাঁহাদের সমস্ত সার্থকতা, যাঁহারা আহার নিদ্রার পর কাব্য উপন্যাস পড়িয়া একদিকে নিদ্রা ও অপর দিকে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নিজের জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু যাঁহারা জগতের ও জীবের সমস্ত তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া আত্মার নিত্যত্ব ও জগতের নশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া "তত্ত্বমসি" ও "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"—প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এই অদ্বৈতের একবস্তুত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের রাস্তার মর্ম্মকে খুঁজিতে গেলে কিছু বিলম্ব ও কষ্টস্বীকার করিতে হয় বটে। ইহা তীব্র পুরুষকার, বহু গবেষণা ও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ, এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"নায়ং আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলিয়াছেন—This fearless synthesis, embodied in the simple words *Tat-tam-asi*, seems to me the boldest and truest synthesis in the whole history of philosophy.

এই প্রবন্ধের শীর্ষে উল্লিখিত হইয়াছে যে "বৈরাগ্য-বিহনে মুক্তি কভু নাহি হয়," ইহা সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশ. এ স্থলে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মই যে কেবল বৈরাগ্যবাদী তাহা নহে। পৃথিবীর বাকি দুইটি প্রধান ধর্ম্ম, সেমেটিক জাতীয়দের খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মমতেও জগদ্ব্যাপার তুচ্ছ ও ত্যাজ্য, মনুষ্যের কল্যাণ জগত ছাড়িয়া জগতাতীত পুরুষের সান্নিধ্য-লাভ করা, স্বর্গ বা নিরন্তন সুখের রাজ্য এ জগতে হইতে পারে না। বস্তুতঃ যদিচ জগতকে তুচ্ছকরা বিষয়ে হিন্দু-ধর্ম্মকে সাধারণ লোকে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী করে, কেননা হিন্দুরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের অপেক্ষা এই উপেক্ষা কার্য্যতঃ দেখায়, বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগ্যবাদী। হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বিকার ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াও সংসার ধর্ম্ম পালনের যথেষ্ট গৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন কি গৃহস্থাশ্রমে স্ব স্ব বর্ণের ধর্ম্মপালন করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় না করিলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, ইহা গীতাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ও যুক্তিদ্বারা দেখান হইয়াছে। সাংখ্য বেদান্তাদি ষড়দর্শন আশ্রম ধর্ম্মপালনের পক্ষপাতী, আর চতুর্বর্ণাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে সকল শাস্ত্রেই অন্যান্য আশ্রমের আশ্রয় ও কেন্দ্র স্বরূপ বলিয়া উচ্চতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সন্ন্যাস প্রধান ধর্ম্ম, এই উভয় ধর্ম্মেই গৃহস্থাশ্রমের স্থান অতীব সঙ্কীর্ণ। যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মবাদ, হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকে সন্ন্যাস আশ্রমের একটি সোপানমাত্র করিয়াছে, তাহার অভাবে বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তাহাদের উপদেশানুযায়ী পালন করিতে গেলে সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হয়। শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই শ্রমণ-প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা জানেন, তাহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বর্ত্তমান কর্ম্মশীল, জগৎ ব্যাপারে দৃঢ়চেষ্ট ও ভোগ বিলাসে রত পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার তীব্র বৈরাগ্য ভাবটির দিকে সাধারণ লোকের দৃষ্টি পড়ে না। এমন কি কেহ কেহ বলেন যে ইহাদের ধর্ম্মই ইহাদিগকে এরূপ কর্ম্মশীল ও জগৎ-কার্য্যে পৌরুষবান করিয়াছে। অথচ যীশুখৃষ্ট যেরূপ অনস্থানির্ব্বিশেষে সকলকে সর্ব্বত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, এমন আর অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। He that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me (Matthew X—38) অর্থাৎ সর্ব্ব-ত্যাগ করিয়া (মাতাপিতা প্রভৃতি) ও সর্ব্ব কষ্ট দুঃখ অঙ্গীকার করিয়া যে না আমার সঙ্গে আসিবে সে আমার যোগ্য শিষ্য নয়, ইহা তাঁহার একটি প্রধান উপদেশ। এক-জন ধনীপুত্র তাঁহাকে মুক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—Go sell whatsoever thou hast and give to the poor and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me (Matthew XIX—21). Sermon on the Mount এ তিনি সকলের উচ্চস্থান দিয়াছেন তাহাদের না যাঁহারা সংসারের ধনমান ঐশ্বর্য্য সম্পদের চেষ্টা না করিয়া,

দুঃখ কষ্টে কোন রকমে দিন যাপন করে, কাল কি খাইবে তাহার ভাবনা রাখে না। অর্থাৎ যেরূপ লোক সুরেশ বাবুর মতে নির্ব্বাণবাদের শিক্ষায় ভারতবর্ষে হইয়াছে। এই জগতের ঐশ্বর্য্য সম্পদকে তিনি কত ঘৃণা করিতেন তাঁহার আরও দুইটি উক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—No man can serve two masters……ye cannot God, and Mammon. (Matthew VI—24.) "Lay not up for yourselves treasures upon earth………but lay up for yourselves treasures in heaven ; for where your treasure is there will your heart be also. (Matthew VI—19.—21.) সেন্টপলও এইরূপ জগদ্বিদ্বেষী বাক্য বলিয়াছেন—To be carnally (worldly—Webester) minnded is death, but to be spiritually minded is life and peace. (Romans VIII—6.)

যীশুখৃষ্টের শেষের উক্তিটি নূতনবাদীদের বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা যাঁহারা যীশুর উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবাদ ও অবতারত্ব মানেন না, তাঁহারা পুরাকালের স্যার টমাস মুরের Utopiar ন্যায় একটি Kingdom of heaven on earth কল্পনা করেন ও তাহার ক্রমে ক্রমে স্থাপনার আশা রাখেন। কিন্তু যীশুখৃষ্ট উক্ত উক্তির দ্বারা মর্ত্তলোকে স্বর্গের সম্ভাবনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এই কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যখন গবর্ণর পাইলেট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—Art thou King of the Jews ? তিনি উত্তর দিলেন—My Kingdom is not of this world. মহম্মদীয় ধর্ম্মের স্বর্গের ভাব যে অনেকটা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মতন, অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়া কোন লোক, যেখানে ঈশ্বর angels বা পয়গম্বরগণ বেষ্টিত হইয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাহা অনেকেই জানেন। কোরান শোনার অভ্যস্ত নাই, এ জন্য একজন সুবিখ্যাত মুসলমান জ্ঞানী, মৌলানা জেলালুদ্দিনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি—Have we not been told in the Koran that all of us will return unto Him ? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই মর্ত্তে স্বর্গ বা মুক্তি ভোগ করিবার আশা বা চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু, সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই প্রকারান্তরে নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য প্রয়াসী, কেননা নির্ব্বাণ-বাদের সার মর্ম্ম এই যে এ পৃথিবীতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। খৃষ্টানের eternal life ও মুসলমানের "বেহেস্ত" সেই অবস্থাকেই বুঝায়। তবে হিন্দুরা বলিবেন যে তাঁহারা কর্ম্মপাশ ছেদ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্তির প্রকরণ জানেন না। তাঁহারা যাহাকে মুক্তি বলেন তাহা হিন্দুদিগের স্বর্গ, দেবতা বা angelsদের লোক, যে অবস্থা পুণ্যবিশেষ দ্বারা দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কেন না পুণ্য সকাম ধর্ম্ম, ইহার ক্ষয় আছে, সুতরাং ইহা কালধর্ম্মে ক্ষীণ হইলে স্বর্গবাসী মানুষকে পুনরায় মর্ত্তে ফিরিতে হইবে (গীতা—৯-২১)।

যাহাহউক নূতনবাদীদিগের মনে রাখা উচিত যে পুরাতন যে সকল মহাত্মারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহারা কেহই মর্ত্তে স্বর্গবাদের পোষকতা করেন নাই, বরং বিরুদ্ধেই বলিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের মতে এই পৃথিবীতে পাপ ও দুঃখের প্রাবল্য চিরকালই থাকিবে, সুতরাং এখানে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই বিশ্বাসের মূলে একটি প্রাকৃতিক সত্য আছে তাহা হিন্দু দার্শনিকেরা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সত্যটি এই যে সৃষ্টিকারিণী শক্তি (প্রকৃতি বা মায়া) ত্রিগুণময়ী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণের সমষ্টি।* এই তিন গুণের ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয় ও চলে

* সাংখ্য মতে পুরুষ (Soul or Spirit) ও প্রকৃতি (Matter and Force) এই দুইয়ের সংযোগে সৃষ্টি হয়। এই দুইটি জগতের মূলতত্ত্ব। ইহা দ্বৈতবাদ। বেদান্ত মতে মূল তত্ত্ব একই, পুরুষ বা ব্রহ্ম, প্রকৃতি তাহার শক্তি বা ইচ্ছা বা মায়া। ইহা অদ্বৈতবাদ। উভয় মতেই প্রকৃতি অনাদি ও নিত্য হইলেও তাহার কার্য্য, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েতেই, অনিত্য বা নশ্বর। জীবের মৃত্যু তো সকলেই জানেন, প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডও থাকে না। উভয় মতেই পুরুষ বা আত্মা অপরিণামী, অনাদি ও অমর। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের doctrine of polarity বেদান্তের সহিত কতকটা মেলে। এই মতে First Cause একই, দুই নহে, এবং Spirit and Matter, Ignorance and Knowledge, good and evil, God and Satan, life and death তাহার opposite (positive and negative) poles. সাধারণ ঈশ্বর বিষয়ক সংস্কার অপেক্ষা যে এই মত যুক্তিমূলক তাহা বলা বাহুল্য। এক ঈশ্বরকে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করিয়া তাঁহাকে "মঙ্গলময়" বলিয়া স্তুতিবাদ করা, ও উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইবার

ও ইহার সর্ব্বদা পরস্পরকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিতেছে। সত্বগুণের প্রাবল্য হইলে রজোগুণ তাহাকে পরাভূত করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করে ও অবশেষে কৃতকার্য্য হয়, আবার রজোগুণকে দমন করিয়া তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, তাহার পর পুনরায় সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়। অনাদিকাল হইতে এরূপ চক্রবৎ গতি চলিতেছে ও চলিবে। এই গতি স্বয়ং ঈশ্বরেরও রোধ করিবার শক্তি নাই। সত্বগুণের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্টির উৎপত্তি, রজোগুণের প্রাদুর্ভাবে তাহার ক্রমবিকাশ, ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে তাহার ধ্বংশ হয়, বা প্রলয় উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রকৃতির নাম প্রলয়ঙ্করী। এই প্রলয় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যুগান্তরে খণ্ড বা আংশিক হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোন অংশের নাশ হয়, এবং বহু যুগান্তরে (হিন্দুশাস্ত্র মতে এক সহস্র মহাযুগে—৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসর বা ব্রহ্মার এক কল্পান্তে) সার্ব্বভৌমিক বা মহাপ্রলয় হয়, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির নাশ হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এখনও মহাপ্রলয় মানিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহাদের Geology ও Astronomy বিদ্যা দ্বারা খণ্ড প্রলয় প্রমাণিত হয়। অন্ততঃ এই পৃথিবীতে কত পরিণাম হইয়া গিয়াছে ও হইবে তাহার ঠিকানা নাই। কত কত দেশ, জীবনিবাস, ও নানা রকমের জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া গিয়াছে ও পরেও হইবার সম্ভাবনা। আমাদের চক্ষের সামনেই তো আগ্নেয়গিরির প্রকোপে ও ভূমিকম্পে কত কত স্থান, সমৃদ্ধিশালী নগর, উপনগর তাহাদের নিবাসিগণের ও সভ্যতার কীর্ত্তির সহিত ভূগর্ভসাৎ হইয়া গেল। যে ভূখণ্ডকে আমরা আজ আমাদের পৃথিবী বলিয়া জানিতেছি, তাহা ও তাহার বর্ত্তমান জীবনিবাস ও মনুষ্যের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া কোন রসাতলে যাইবে কে বলিতে পারে? সুতরাং যখন মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী ও এই পৃথিবীও একদিন থাকিবে না, তখন Kingdom of heaven on earth কোথায় থাকিবে, আর তাহার জন্য এত প্রয়াস কেন? কিন্তু আত্মা অমর, সুতরাং ইহার সেই অবস্থাই যুক্ততম যাহার পরিবর্ত্তন ও বিনাশ নাই। আর সত্বগুণই হইল জীবের সুখের ও উন্নতির মূল, কিন্তু যখন রজ ও তমোগুণের প্রাবল্যে তাহা স্থির থাকিতে পারে না, আর এই দুইটি মিলিয়া সত্বগুণ অপেক্ষা যখন সর্ব্বদাই প্রবল থাকে, তখন পৃথিবীতে দুঃখ অমঙ্গলের যে সর্ব্বদাই আধিক্য থাকিবে তাহা বুঝা কঠিন নহে। ঈশ্বরেরও সাধ্য নাই যে তিনি সত্যযুগ (Kingdom of heaven) কে চিরস্থায়ী করিয়া রাখেন।

প্রকৃতির এই সার্ব্বভৌমিক গতিবিধির দ্বারা যেমন সৃষ্টির লয় ও মানুষের মুক্তিতত্ব বুঝা যায়, সেইরূপ জাতিগত ও ব্যক্তিগত গতিদ্বারা মনুষ্য জীবনের কঠিনতম সমস্যাগুলির উত্তর পাওয়া যায়, কেননা যাহা macrocosmএ চলিতেছে তাহা microcosm এও চলিতেছে। কেন ভারতের হিন্দুদিগের আজ এইরূপ দুরবস্থা, পুরাতন জ্ঞানের আলোক নিভিয়া গিয়া আজ এত অন্ধকার, পূর্ব্বের শৌর্য্য বীর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তার স্থানে আজ কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়পরবশ জড়ভাব? আর কেন যীশুখৃষ্টের বৈরাগ্য প্রধান ও জগততুচ্ছকারী ধর্ম্মের অবলম্বীরা আজ একদিকে কর্ম্মবীর আর একদিকে জড়বাদী হইয়াছেন? যে যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, কেন আজ তাঁহার ভক্তেরা অন্য জাতির লোককে বিনা অপরাধে প্রথমে এক গালে চড় মারে, তাহাতে সে গরীব যদি কাঁ, কুঁ করে তাহা হইলে তার দ্বিতীয় গালে আর এক চড় দেয়, এবং তাহাতে ক্রন্দনরূপ প্রতিবাদ করিলে তাহার কাপড় চোপড় কাড়িয়া লয়? যে বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার ব্রহ্মদেশের শিষ্যরা কেন পচা মাছ খাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে? উত্তর এই যে প্রকৃতির সত্ব, রজ, তমোগুণের

ন্যায় পাপ ও অমঙ্গলের দায়ীত্ব বহিবার জন্য একটি সয়তান কল্পনা করা বালোচিত ব্যবস্থা। সাংখ্যের প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের "বন্ধন" বাইবেলের forbidden treeর ফল খাইয়া আদমের "পতন" একই জিনিষ। প্রথমটি বিজ্ঞান, দ্বিতীয়টি রূপক। উপনিষদে সংসার বা প্রকৃতিকে অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে (উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম—গীতা ১৫—১)। আদম, পুরুষ বা জীবাত্মা; প্রকৃতি, সংসার বৃক্ষ বা forbidden tree. সর্পরূপী সয়তান জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ (হিন্দুশাস্ত্রে সর্প অমরত্বের পরিচায়ক আর রজ্জু পাপের রূপক); যাঁহারা ঈভ, অবিদ্যা বা অজ্ঞান, যাহার জন্য আত্মার বন্ধন বা পতন হয়। যাঁহারা ঈভ স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাকে অবিদ্যারূপে কল্পনা করায় আপত্তি করিবেন, তাঁহাদের বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ও মুক্তিদায়িনী সরস্বতী দেবী ও স্ত্রীলোক, আর বাইবেলে যীশুর মাতা, সুতরাং জগতের কল্যাণ প্রসবিণী হইতেছেন Virgin Mary. জগতে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

প্রাদুর্ভাবে পরাভবে জাতি বিশেষের উন্নতি ও অবনতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন হয়। এই উন্নতি অবনতি অপরিহার্য্য, এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ভিন্ন চরিত্র বিষয়ে সাধারণ মানুষ একেবারে প্রকৃতির অধীন। কোন জাতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয় তখন তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষতা হয়। কিন্তু এদিকে কতকটা উন্নতি হইলে রজোগুণ প্রবল হইতে থাকে, ও তাহাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষ ও বহু আকাঙ্ক্ষা, অন্যের উপর প্রভুত্বের চেষ্টা, বিলাসিতা, রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। এইরূপ কিছুদিন যাইতে যাইতে তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে লোভ, মোহ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নৃশংসতা প্রভৃতি হীনবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাহারা আপনাদের অধোগতি, এমন কি ধ্বংশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। এই মনুষ্যভাগ্যের চক্রগতি বৌদ্ধদের একটি জাতকে রূপকভাবে বর্ণিত আছে। হিন্দুদের পুরাণেও এ ভাবের কথা পাওয়া যায়। ইউরোপের খৃষ্টান জাতিরা সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বারা উন্নতির যথেষ্ট সাধন করিয়া আজ প্রবল তমোগুণাধীন হইয়া পরস্পরের বিনাশে উদ্যত হইয়াছে ও আপনাদের সভ্যতার পায়ে আপনারাই কুঠার মারিতেছে। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের তুলনায় ইউরোপীয়দিগের অবস্থার সত্ত্ব হইতে তমোতে পরিণতি অতি অল্প সময়েই হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা রজস্তমোগুণ-প্রধান জাতি, ইহাদের কর্ম্মশক্তিও যেমন বলবতী ধ্বংশকারিণী শক্তিও তদ্রূপ। কিন্তু হিন্দুরা বহুকাল জ্ঞানানুশীলন দ্বারা সত্ত্বগুণপ্রধান জাতি হইয়াছিল বলিয়া আজ তমসাচ্ছন্ন হইয়াও টিঁকিয়া আছে, কেননা সত্ত্বগুণই জীবের রক্ষণ ও পালনকর্ত্রী শক্তি (preservative principle.)

এই তো গেল জাতির সাধারণ উন্নতি অবনতির কথা। এখন কি কারণে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতি ও অধোগতি হয় ও আপনার আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও শিক্ষা দীক্ষার বিপরীত কার্য্য করে? যথা যীশুর শিষ্যেরা কেন, তাঁহার শিক্ষার বিপরীতভাবে কার্য্য করে, তাহারা কি ভণ্ড? হিন্দু দার্শনিক বলিবেন তাহা নহে, তাহারা স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিরও প্রকৃতি স্বতন্ত্র—কেহ বা সত্ত্বপ্রধান, কেহ বা রজোপ্রধান, কেহ বা তমোপ্রধান, আর সাধারণ মনুষ্য এই তিন গুণের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মেশামেশি গুণযুক্ত। এই কথা গীতার কয়েকটি শ্লোকে উত্তমরূপে ব্যক্ত আছে, তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। (তৃতীয় অধ্যায় ২৭, ২৮ ও ৩৩ শ্লোক)—"প্রাকৃতিক গুণসমূহ দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি অহংজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া 'আমি কর্ত্তা' ইহাই মনে করে। কিন্তু যে অর্জ্জুন, যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ (অর্থাৎ কোন কর্ম্মের কোন গুণ) তত্ত্বতঃ অবগত হইয়াছেন, গুণ সকল আপনার অনুরূপ বিষয়ে ধাবিত হয় জানিয়া কর্ত্তৃত্ব অভিমান করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরও প্রকৃতি আপন গুণের অনুরূপ বিষয় অনুসরণ করে, মানুষের ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে, এজন্য তাহাদিগকে নিগ্রহ কি করিবে, তাহা করা বিফল।" ভাবার্থ এই যে যাহার শরীরে সত্ত্বাদি যে গুণ প্রবল তাহার সেইরূপ কার্য্য হয়, সে অবশ হইয়াও সেইরূপ কার্য্য করিবে। এজন্য অনেকে বুঝিয়া সুঝিয়াও স্বভাব দ্বারা বাধ্য হইয়া তদ্বিপরীত আচরণ করেন। কেন যে খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা অনেক সময়ে স্ব স্ব ধর্ম্মের উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন তাহার উত্তর এইখানে পাওয়া গেল। তবে কি মানুষ একেবারে অসহায়, তাহার কোন স্বাধীনতা বা কিছুই নাই? অবশ্য আছে। তাহাই জানিবার জন্য দর্শন শাস্ত্র আবশ্যক। যাঁহারা আত্মার ও প্রকৃতির তত্ত্ব জানেন আপনাকে প্রকৃতির সহিত জড়াইয়া তাহার বশীভূত হন না, স্বতন্ত্রভাবে থাকেন, তাঁহারা দ্রষ্টা স্বরূপ স্ব স্ব গুণের বিচার করিয়া আপনার প্রকৃতিকে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিয়া, সংশোধন করিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতিজয়ী হন। কিন্তু ইহার জন্য চেষ্টা ও উপযোগী সাধনা চাই। যেমন কথায় চিঁড়ে ভেজে না, সেইরূপ ভাবে (কুসংস্কাররূপ) ভবি ভুলিবার নয়। জ্ঞান ভক্তির যম নিয়মাদি * সাধনদ্বারা বহুকাল-সঞ্চিত কর্ম্মের পাহাড় পর্ব্বত গলাইতে হইবে।

* যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।
নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান।
—পাতঞ্জল দর্শন, ২—৩০,৩২।

সুরেশবাবুর বিশ্বাস যে হিন্দুদের ত্যাগধর্ম্ম ও নির্ব্বাণবাদ তাহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা ও হীনপ্রভ করিয়াছে। এটি একেবারে অমূলক কথা। উপরে দেখান হইয়াছে যে, যীশুখৃষ্টের ত্যাগধর্ম্ম ও জগদ্‌বিদ্বেষী মুক্তিবাদ খৃষ্টান জাতিদিগকে নিষ্কর্ম্মা ও হীনপ্রভ করে নাই ও জগৎকে ভুলাইয়া দিতে পারে নাই। মুসলমানদের বিশ্বাস "খোদা সাচ্চা, দুনিয়া ঝুটা" যখন প্রবলতম ছিল, তখন তাহা তাহাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের গতিরোধ করে নাই। জাতিবিশেষের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পরিবর্ত্তনে তাহাদের উন্নতি অবনতি হয়। হিন্দুরা চিরকালই অকর্ম্মিষ্ঠ ও বীর্য্যহীন ছিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ইতিহাসবেত্তারা শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, বিদ্যায়, কলায় তাহাদের শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যে যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও রাজন্য (ক্ষত্রিয়) দিগের হৃদয়ে সাংখ্য বেদান্তের মুক্তিবাদ আসন পাইয়াছিল, সেই যুগে ভারতবাসী তখনকার জানিত সসাগরা পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তখনকার সপ্তদ্বীপসমন্বিত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিস্তার যে এখনকার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল তাহা ইতিহাসবেত্তারা বলিয়াছেন। পুরাণ-কথিত সত্য ও ত্রেতাযুগের সম্রাট্‌দের ইতিহাসে অনেক কবি-কল্পনা থাকিলেও, তাঁহাদের মধ্যে যে অনেক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর সেই যুগে অনেক অসাধারণ মহিলারাও ভারতকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, নল, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজারা জ্ঞানমার্গী ছিলেন, ও মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহিলারাও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি রাজা ও বীরগণ নির্ব্বাণ-মুক্তির পন্থী ছিলেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে, দয়াধর্ম্মে, ত্যাগে ক্ষমায়, পবিত্রতায়, সত্যপরায়ণতায় ও সকল উৎকৃষ্ট মনুষ্য-ধর্ম্মেই উক্ত মহাত্মারা চিরকাল মানবজাতির আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবেন। কিছুকাল অন্ধকারের পর পুনরায় বৌদ্ধ-যুগে—সেও নির্ব্বাণবাদের যুগ—চন্দ্রগুপ্ত, বৈরাগী রাজা অশোক; কণিষ্ক প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী সম্রাটেরা ভারতের নাম চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর ভারতবর্ষে পুনরায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের শলাকা প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল। তখন ভীরু বাঙ্গালি জাতি পর্য্যন্ত নাগা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া নাগপুরে ও চাম্বা সুকেত মণ্ডি প্রভৃতি বর্ত্তমান সিমলার নিকটস্থ পার্ব্বত্যদেশে, ও সমুদ্রপারে যাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সকলে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য বাঙ্গালী রাজা জয়াপীড় দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল যুগেই, যখন ভারত বিদেশীয় রাজাদের হস্তগত হয় নাই, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভারতবাসীকে হীনপ্রভ না করিয়া সাত্ত্বিক বলে বলীয়ান্ করিয়াছিল। ভারতের বাহিরেও প্রভূত পরাক্রমশালী রোমসম্রাট্ মার্কস অরেলিয়স এণ্টোনাইসের জ্ঞানবৈরাগ্যের কথা কোন্ ইতিহাসপাঠক না জানেন? আমাদের সময়ের আরও নিকটে বৈরাগ্যের জলন্তমূর্ত্তি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলস্বরূপ বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ও বাংলাদেশে জ্ঞানালোচনার একটি নবযুগ উপস্থিত হইল। আর আজ বৈষ্ণব-প্রধান বাংলার সুবর্ণবণিক জাতি, বৈরাগ্যবাদী হইয়াও, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু বিষয় বুদ্ধি ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা আছে তাহার পরিচয় দিতেছে। নির্ব্বাণবাদী জৈনধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারিরা বর্ত্তমান ভারতবর্ষে আর একটি বিষয়কর্ম্মে দক্ষতার দৃষ্টান্ত।

বস্তুতঃ জ্ঞানী ও ত্যাগী না হইলে এই শরীর ও প্রাণকে মানুষ হাসিতে হাসিতে কর্ত্তব্যের দ্বারে ও মৃত্যুর মুখে আহুতি দিতে পারে না। জগতের ইতিহাসে সকল প্রকৃত কর্ম্ম-বীরেরা জানত বা অজানত নিবৃত্তি মার্গের অনুগামী ছিলেন। যাঁহারা জগতের সুখ দুঃখ সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান না করিতে পারেন, আপদ বিপদ ভয় বিভীষিকাকে পদাঘাত না করিতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারা কোন স্বার্থহীন পরোপকারক মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সকল মহৎ কার্য্যের মূলে এই বিশ্বাস, যে আমার আত্মা ও তাহার বিবেক বুদ্ধিই আসল বস্তু, তাহার জন্য আর যাহা কিছু ছাড়া যায়, সুতরাং সে গুলিন কিছুই নয়। এইভাবে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক কোন প্রামাণিক শাস্ত্রকার ইহাকে মিথ্যা বলেন নাই, অনিত্য বা নশ্বর বলিয়াছেন, ও তাহার সহিত ব্যবহারের বিধি শাস্ত্রকারেরাই করিয়া দিয়াছেন। সংসারের সহিত মানবাত্মা যে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়, তাহাকেই অলীক বা মিথ্যা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে

পারিলে মানুষ যে সাত্ত্বিকবলে বলীয়ান্ হয়, তাহা একটি বৈজ্ঞানিক উপমা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। গ্রীক পদার্থতত্ত্ববিৎ আর্কিমিডিস lever যন্ত্রের অসীম শক্তি বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছিলেন যে তিনি এই জগত্তব্রহ্মাণ্ডকে একটি ক্ষুদ্র বংশদণ্ড বা লৌহদণ্ড দ্বারা ঘুরপাক খাওয়াইতে পারেন, যদি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁহার lever ও তাহার fulcrum বসাইবার জন্ত একটু বিন্দুমাত্র স্থান পান। আত্মতত্ত্ববিৎ ভারতীয় মনিষীরা এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রয়োগ করিয়া প্রকৃত সাধনার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে মানুষ যদি আপনার আত্মাকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র করিতে পারে, তাহা হইলে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় হইতে লইয়া সমস্ত প্রকৃতি তাহার বশীভূত হয়, জগতে তাহার কোন ভয়ের কারণ থাকে না, জগতই তাহার অনুগত হয়। যে যাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে সেই তাহাকে জয় করিতে পারে। সংসারকীটেরা চিরকালই আপনাদের রিপু ও ইন্দ্রিয়দিগের দাস হইয়া থাকে, স্ত্রৈণেরা স্বীয় স্ত্রীরও ঘৃণার পাত্র হয়। যে ব্যক্তি আপনাকে ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া না জানিয়া প্রকৃতির দ্রষ্টা বলিয়া জানে সেই মানুষই জ্ঞানী ও সুখী।

নির্ব্বাণমুক্তিবাদী গীতাশাস্ত্র কর্ম্মযোগের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন (২য় ও ৩য় অধ্যায়ে) সেরূপ আর কোন ভাষায় কোন শাস্ত্রে নাই। তাহার সার মর্ম্ম দিতেছি :—"সাধারণ মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কিন্তু ফলকামনাহীন হইয়া কর্ম্ম করিবে। এজন্য যোগস্থ হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিতচিত্ত ও নির্লিপ্ত হইয়া, কর্ত্তব্যমাত্র জ্ঞানে কর্ম্ম কর। যে নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা মুক্তির দ্বারস্বরূপ তাহা কর্ম্ম না করিলে সিদ্ধ হয় না (যেমন চাকুরি না করিলে পেন্সনে অধিকার হয় না)। ধর্ম্ম কতকগুলি কর্ম্মের সমষ্টি, আর ঐ ধর্ম্ম মনুষ্যের ইহ ও পরকালের মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ উপায়। কর্ম্ম না করিলে জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। যাহার অন্তরে ভোগ ও কর্ম্মের বাসনা আছে, সে বাহিরে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে রোধ করিলেও তাহার মনে নূতন কর্ম্মের সঞ্চয় হইবে ও সে মিথ্যাচার দোষে দূষিত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, ও জ্ঞানই মুক্তির মুখ্য উপায়। জনকাদি জীবন্মুক্ত সাধুগণ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব অন্ততঃ লোকশিক্ষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান উচিত।

যদি মহানুভবগণ সকল বিষয়ে বৈরাগী হইয়া অলসভাবে লোকসমক্ষে অবস্থান করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিলে সংসারের কি শোচনীয় অবস্থা হয় ?" অতএব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে "যদিও ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত আছি"—ইত্যাদি। এই কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্য গীতার শেষ শ্লোকে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদের সার উপদেশরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শ্লোকটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক। সঞ্জয় এই বলিয়া গীতাকথন শেষ করিলেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতি মতির্মম।

অর্থাৎ "যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ একত্র হন, সেইখানে সর্বসিদ্ধি, ভাগ্যলক্ষ্মী, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য, ও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি বা ধর্ম্ম বিরাজ করিবে।" শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত অবস্থার আদর্শ, অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুর্হস্তে পুরুষকার ও উদ্যমের মূর্ত্তিস্বরূপ। সুতরাং শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে যেখানে পুরুষকার সম্পন্ন উদ্যমশীল ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ পরমার্থমুখী বা ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন, সেখানে উল্লিখিত সর্ব্ববিধ মঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইংরাজির God helps those who help themselves এই শ্লোকের আংশিক ভাব প্রকাশ করে। God helps those who help themselves with absolute trust and reliance on Him বলিলে যুক্ততর অর্থ হয়, যদিও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। গীতার সকল মুখ্যশ্লোকের একটি লৌকিক ও একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। উক্ত শ্লোকটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই যে যখন জীবাত্মা (অর্জ্জুন) ও পরমাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) একত্রিত বা একত্রীভূত হন, তখন জীবের সকল অমঙ্গল দূর হয় ও পরম সুখ শান্তি লাভ হয়।

আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা অপরিস্ফুটতা ও অঙ্গহীনতা দোষে দূষিত হইলেও, যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ও উল্লেখ করিয়াছি, আশা করি তাহা দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বৈরাগ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম যে নিষ্কাম কর্ম্ম—তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে, বরং পরস্পরের অনুকূল। সুতরাং সাধুদিগের নিবৃত্তিমার্গ যে দিকে ধাবমান্, সাংসারিক ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গলের পথ সেইদিকেই অপেক্ষাকৃত মৃদুমন্দ

গতিতে প্রবাহিত। গীতাশাস্ত্র যেরূপ সর্ব্বধর্ম্মবাদের সমন্বয় করিয়াছেন, হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সেইরূপ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গের সমন্বয় করিয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে আশ্রম ধর্ম্মের মূলে বসান হইয়াছে। যদিচ চতুর্ব্বর্ণাশ্রম এখন এক প্রকার লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব (spirit) দূর হয় নাই, এখনও তাহার ধর্ম্ম সম্যক না হউক আংশিক ভাবে আচরিত হইতে পারে। যথা, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রকৃত আচরণ—সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আচার্য্যের নিকট শিক্ষা-মাত্রপরায়ণ হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করা। সেরূপ শিক্ষা টোলে বা কলেজে বা আচার্য্য বিশেষের নিকট হইতে পারে। সেইরূপ গার্হস্থ্যাদি আশ্রমেরও সারভাগের অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব। সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন, আশ্রিত পরিবার ভৃত্যাদির যথাযথ পালন, যথাশক্তি অতিথিসৎকার ও সদুদ্দেশে দান, প্রতিবেশী ও বন্ধু প্রভৃতির সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও সহায়তা প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা এখনও উৎকৃষ্টরূপে গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম-পালন হইতে পারে। অবশ্য যাঁহারা নিখিলেশ বাবুর ন্যায় সহধর্ম্মিণীর পাট উঠাইয়া দিয়া, স্ত্রী ও পরশ্রমলব্ধ অর্থ লইয়া আজগুবি খেয়ালে নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুর গৃহস্থধর্ম্ম পালন হয় না। সৌভাগ্য-ক্রমে অধিকাংশ লোককেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হয় ও তাঁহাদের গৃহিণীদিগকে প্রত্যুষে উঠিয়াই হাঁড়ি চড়াইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ওরূপ বাদসাহি খেয়াল চরিতার্থ করা পোষায় না। এরূপ দম্পতিরা পরস্পরের সেবায় ভালবাসায়, সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, রোগে শোকে একপ্রাণতায়, পরস্পরকে চিনিতে পারেন ও স্বামীর পক্ষে সহধর্ম্মিণী যে কি জিনিস ও স্ত্রীর পক্ষে সহধর্ম্মিণীর অধিকার কি গৌরবের বিষয়, তাহা বুঝিতে পারেন। আরও বুঝিতে পারেন যে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়কে গাঢ় করিবার জন্য বাড়ীতে গুণ্ডা পুষিবার আবশ্যক নাই। যদি দাম্পত্য প্রণয়ে কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকে, যদিচ্ছাচারী না হইতে পারিলে যদি প্রণয়ের ফুল না ফোটে, তাহা হইলে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কি? স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যদি স্বামীর প্রভুত্ব আর তাহার নিজের দাসীত্বের পরিচায়ক, তাহা হইলে পুত্রের পিত্রনুরাগ ও পিতৃভক্তি সেইরূপ অত্যাচারের পরিচায়ক নহে কি? শিশু যে মা বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া যায় সে কি কেবল তাঁহারা খাইতে দেন বলিয়া—তাহার মধ্যে কি সম্বন্ধজনিত অনুরাগ নাই? কর্ত্তব্য-জ্ঞানের স্থানে স্বার্থজ্ঞানকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি করিলে মনুষ্যজীবনের কোন্ সম্বন্ধটা থাকে?

সুরেশ বাবু যে পুরাতন ঘৃণা করিয়া নূতন পথের ডঙ্কা বাজাইয়া অন্য লোককে আহ্বান করিতেছেন তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়া গিয়াছে। চার্ব্বাকের দল সকল সময়েই মিষ্টবাক্য (চারু+বাক) দ্বারা বাহ্যদর্শী ও ভোগবিলাসী লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়াছেন। মোহিনীবিদ্যায় তাঁহারা পটু। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" আর "কমনীয় সংসার বন্ধনং স্বীকৃত্য মুক্তিং ত্যজেৎ" একই কথা। * * * *

দুঃখের বিষয় এই যে ভোগবিলাসিতার আতিশয্যে আজকালকার বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য ভারতীয় জাতিগণ অপেক্ষা অধিকতর তমোগুণী ও জড়োপাসী হইয়া পড়িতেছে। এজন্য তাহাদের বিপরীত বুদ্ধি হইতেছে। উপরে দেখান হইয়াছে যে প্রাকৃতিক গুণের তারতম্য অনুসারে মানুষের বুদ্ধির ও রুচির বিভিন্নতা হয়। কোন এক মাতাল একটি বিশিষ্ট ভোজে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামী ও সভাস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—"ওগো মশাইরা, আমি সন্দেশ রসগোল্লা কিছুই খেতে চাই না; খাজাগজা আমার দাঁতে লাগে; পান্তুয়া রাবড়িতে আমার অরুচি। ও সব আপনারা যত পারেন খান, আমার জন্য রেখে আপনাদের কম করিবার দরকার নাই। তবে যদি গরীবের উপর দয়া করেন তা হলে আমি চাই কেবল—কিঞ্চিৎ চানাচুর ও কাঁকড়া ভাজা!" সাহিত্য ও ধর্ম্ম ভোজে বোধ হয় আজকাল অনেক বাঙ্গালীরই এইরূপ দুর্দ্দশা।

শ্রীঅমৃতলাল রায়।

পল্লী-কুটিরে।

তরুণ তপন জাগিয়া তখনো ওঠেনি গগন কোলে,
তন্দ্রা-তরল তিমির তখনো তমালের তলে দোলে,
সারি সারি শত মরালের তরী বাঁধিয়া মৃণাল ডোরে
কনক মেঘের পুরীতে পরীরা উড়িয়া গিয়াছে ভোরে,
আকাশে, বাতাসে ভাসে তাহাদের কণ্ঠের মৃদু গান,
মর্ম্মেতে পশি' তন্ত্রী পরশি' চঞ্চল করে প্রাণ!
সুখ স্বপনের পুলকে আকুল চিত্ত আবেশে ভোর,
আপনা ভুলিয়া বসেছিনু একা কুটিরের দ্বারে মোর,
পল্লীজননী, খুলে দিলে একি স্বর্ণ স্বপন দ্বার,
অন্তর মাঝে উথলি' উঠিল কি সুখের পারাবার!

চারিদিকে শুধু উঠিছে উলসি' বিহগকুজন গীতি,
মুহু মুহু মুহু ভেসে ভেসে আসে মেহেদী ফুলের প্রীতি,
অমর লোকের সুষমা যেন গো ফুটিয়া উঠিছে ধীরে,
শুধু হাসি, গান, মৃদু আলো ফুল আমার কুটির ঘিরে
সহসা হিয়ায় ফুলে ফুলে আজি রচিল স্বপন ঘোর,
বাঁশরীর রব বাজিল মধুর উদাস হৃদয়ে মোর;
কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে ধ্বনিল পল্লীগরিমা গান,
নমো কবিতার হে আদি-জননী; করুণাবিভল প্রাণ;
তাপিতের তরে কুটির দুয়ার মুক্ত করেছ তুমি,
ধন্য হউক পরাণ আমার তোমার চরণ চুমি'!

আবার যখন সন্ধ্যা বালিকা লজ্জা অরুণ মুখে,
জরী ঝলমল নীল অঞ্চল দোলাইয়া গেল সুখে,
তিমিরে জোয়ার উঠিল জাগিয়া ডুবে ডুবে গেল দেশ,
রূপসী রজনী এলাইয়া দিল কুঞ্চিত কালো কেশ.
জননী গো, একি শান্তি গভীর নেমে এল তোর বুকে,
ধীরে ধীরে ধীরে মুদে আসে আঁখি আদরে সোহাগে সুখে!
শ্যামল শস্যে চিতার কালিমা পলকে ডুবিয়া গেল,
দগ্ধ অসাড় অন্তরে মোর জীবন বন্যা এল!
মৃদুল বাতাসে শত নব আশা পক্ষ মেলিয়া ধীরে,
স্বর্গসুখের সুষমা মাখিয়া ফিরিল বক্ষনীড়ে!

আজি এ তোমার স্নেহ বিগলিত অযাচিত করুণায়,
নয়নে আমার সুখবারিধারা উছসি' বহিয়া যায়,
কতদিন হায়, বসিয়া বসিয়া মানবের দ্বারে দ্বারে,
কাঁদিয়াছি কত ব্যাকুল ব্যথায়, আকুল বেদনা ভারে,
কেহ ওগো, কভু ফিরেও চাহেনি কহেনি একটি কথা,
তুমি স্নেহময়ি, অঞ্চল বায়ে ঘুচাইলে সব ব্যথা,
তোমার স্নেহের কর পরশনে পুলকি' উঠিছে কায়,
নমো, নমো, নমো পল্লীজননী, প্রণমি তোমার পায়,
চিরদিন মাগো, দিও পদধূলি, অঞ্চল দিও পাতি,
চরণ-রেণুর বিলাসে উলসি' উঠিবে পরাণ মাতি'!

শ্রীসন্তোষকুমার পাল।

কোন্ পথে।

(১)

বৈকাল বেলা; রৌদ্র পড়িয়াছে; রাস্তায় জল দিয়া গিয়াছে,—দুপুরের গরমের পর এখন রাস্তা এবং রাস্তার উপরের বাতাসটি বেশ একটু স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিজলী বৈকালে চুল বাঁধিয়া টিপ পরিয়া হাত পা মুখ সাবানে ধুইয়া, ভাল একখানি কাপড়ে সাজিয়া খোলা জানালাটির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। একটি অতি সুরূপ ও সুবেশ যুবক হাতে সুদৃশ্য মিহি ছড়ী দুলাইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সহসা বিজলীর দিকে তার দৃষ্টি পড়িল, অতি সুন্দর ঢুলুঢুলু চক্ষু দুটি তুলিয়া সেও বিজলীর দিকে চাহিল। বিজলী একটু চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যুবক থামিল, জানালার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল। কাছেই একটা পান সিগারেটের দোকান ছিল। দোকানের কাছে গিয়া সে একটি মিঠা খিলি কিনিয়া মুখে পুরিল,—একটি সিগারেট

কিনিয়া ধীরে ধীরে ধরাইল। দুই একবার বিজলীদের জানালার দিকেও চাহিল। বিজলী আবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কে ওই লোকটি! বেশ সুন্দর চেহারা ত! আর চক্ষু দুটি কেমন! দিব্যি—যেন শিবঠাকুরের মত! যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে এদিক ওদিক কয়বার পায়চারী করিল। বিজলীর দিকেও মধ্যে মধ্যে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেছিল। বিজলীর কি হইয়াছিল, এক একবার সরিয়া গিয়াও আবার জানালার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইতেছিল।

"কি দিদিমণি! কি দেখ্‌ছ?"

ঝি আসিয়া তাম্বুলরাগরক্ত অধরে ঈষৎ হাসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

বিজলীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল,—চমকিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। থতমত খাইয়া কহিল, "না, ও কিছু না। এম্‌নিই দেখ্‌ছিলাম———"

ঝি রাস্তার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বিজলীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি দেখ্‌ছিলে?—হুঁ!—তা দেখবার মত হ'লে—দেখ্‌তে হয় কি?—তা লজ্জা কি দিদিমণি? এস না।"

ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া তাকে জানালার কাছে টানিয়া আনিল। বিজলী হাত একটু টান দিল,—কিন্তু বেশী জোর করিল না। লজ্জায় মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকে চাহিবেনা ভাবিয়াও একবার না চাহিয়া পারিল না। যুবক তখনও তাহাদের দিকে চাহিয়া ওপারে দাঁড়াইয়াছিল। একটু মুচকি হাসিয়া একদিকে কিছু দূর সরিয়া গেল, আবার ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি কহিল, "বেশ বাবুটি—যেন রাজপুত্র রগো! আহা, অম্‌নি বর যদি তোমার হয় দিদিমণি——"

"দূর!"

বিজলী জোর করিয়া ঝির হাত ছাড়াইয়া সরিয়া আসিল। ঝি রাস্তার দিকে আর একবার চাহিয়া কহিল, "তা পালাও আর যাই কর দিদিমণি, বাবুটির কিন্তু তোমাকে চোকে খুব ধ'রেছে। ইস্! এখনও হা ক'রে চেয়ে আছে। তা দেখ্‌তে তুমিও ত রাজ কন্যেটির মত, যদি——"

বিজলী ছুটিয়া একেবারে ঘর হইতে বার হইয়া গেল।

বিজলীর বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইয়াছিল,—এখনও বিবাহ হয় নাই। পিতা মহীন্দ্রবাবু একেবারে দরিদ্র না হইলেও ধনী নন। কলিকাতার কোনও সরকারী আফিসে চাকরী করেন, বেতন এখন দুইশত টাকা। দুইটি ছেলে কলেজে পড়ে, ছোট আরও তিন চারিটি ছেলে মেয়ে আছে। স্ত্রী এবং একটি বৃদ্ধা পিসিও আছেন। দিনকাল যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে সঞ্চয় তেমন কিছু করিতে পারেন নাই, সুতরাং এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টায় ছিলেন, যদি সুলভে একটি সুপাত্র মিলে। বিজলীকে তিনি কোনও ইস্কুলে পড়িতে দেন নাই। ঘরে কখনও ভাইদের কাছে, কখনও নিজে সে পড়িত। পুস্তক মহীন্দ্রবাবু নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন,—কোনওরূপ নাটক নভেল পড়া একেবারেই নিষেধ ছিল। মহীন্দ্রবাবু বহুকাল কলিকাতাবাসী,—আত্মীয়স্বজনও বেশী ছিল না, বিজলী বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও বড় যায় নাই, —লোকসমাজে মিশিবারও অবকাশ বড় একটা পায় নাই। যারপরনাই সরল শান্ত ও মিষ্ট স্বভাব তার ছিল,—কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই একরূপ হয় নাই, লোকচরিত্রের জটিল বৈচিত্র্যও বড় কিছু বুঝিত না।

সুরূপ কুরূপ কত লোক সে রাস্তায় দেখিয়াছে,—সুরূপ যে তাকে চোকে ভাল লাগিত, হয়ত আরও দেখিতে ইচ্ছা করিত। আবার কুরূপ যে তাকে ভাল লাগিত না। বেশী বিকৃত হইলে, কখনও হাসিত,—কাছে কেহ থাকিলে দেখাইয়া দু কথা বলিত। কিন্তু তার প্রশান্ত চিত্তে কাহাকেও দেখিয়া কোনও বিক্ষোভ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। আজও হইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু ঝির সেই কথাগুলি তার চিত্ত ভরিয়া নূতন একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। পিতা মাতা ও ভাইরা মধ্যে মধ্যে তার বিবাহের কথা আলোচনা করিতেন, কত সম্ভাবিত বরের রূপ গুণের বিশ্লেষণ করিতেন, —বিজলী কখনও কখনও তা শুনিত। খুব সুরূপ ও গুণবান্ কোনও পাত্রের কথা যখন হইত, তার মনে হইত—অমন সকল মেয়েরই হয়—আহা, এই রকম একটি বরের সঙ্গে যদি তার বিবাহ হয়, তবে বেশ—বেশ হয়! সেই বরের আকৃতি সে কল্পনায় মানসপটে আঁকিয়া তুলিবারও চেষ্টা করিত। কিন্তু কি আঁকিত, কতদূর আঁকিতে পারিত, সেই জানে।

আজ যখন সেই সুরূপ ও সুবেশ যুবককে সে দেখিয়া-

ছিল, তার চেহারা—বিশেষ তার সুন্দর চক্ষু দুটি সত্যই তার চোকে বড় বেশ লাগিয়াছিল। অমন হয়ত আরও কত জনের সুন্দর মুখ, ঢুলু ঢুলু সুন্দর চক্ষু, তার চোকে কত ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু তারাও যেমন তার মনে কোনও দাগ ফেলিতে পারে নাই, এই যুবকও হয়ত পারিত না। হয়ত বা ইহাকে চোকে একটু বেশীই ভাল লাগিতেছিল, কারণ ঝি আসিয়া যখন ধরিল, সে একটু লজ্জাই পাইয়াছিল। যুবককে যে সে তখনকার মত কিছু মুগ্ধদৃষ্টিতেই দেখিতেছিল, সে কথা নিঃসঙ্কোচে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে নাই। যাহাহউক, তাও হয়ত সে ভুলিয়া যাইত,—হয়ত দুই একদিন মাঝে মাঝে মনে পড়িত, তারপর আর ও কথা ভাবিত না। কিন্তু ঝি বলিয়াছিল, অমন একটি বর যদি তার হয়, তবে বেশ হয়। আরও বলিয়াছিল, তাকে ঐ যুবকটির চোকে ধরিয়াছে,—তখনও সে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কথাগুলি বিজলীর মনে কেমন অনমুভূতপূর্ব্ব একটা চঞ্চল পুলকের সাড়া তুলিয়াছিল। সেই পুলক আবার নূতন একটা লজ্জার ভাবও তার মনে তুলিল,—আরও একবার সে যখন তার দিকে চাহিল, যেন নূতন চোকে দেখিল। আহা, সত্যই যদি ওই বাবুটি তার বর হয়! বাবুটির সুন্দর মুখখানি, ঢুলুঢুলু চক্ষু দুটি, সুসজ্জিত সমস্ত দেহখানি লইয়া সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি তার মন ভরিয়া অপূর্ব্ব এক আনন্দের লহর তুলিয়া ভাসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লজ্জা—যেমন লজ্জা আর কখনও সে জীবনে অনুভব করে নাই—তাকে বড় কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝির কাছেও সে দাঁড়াইতে পারিল না। ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মা নীচে পাকের আয়োজন করিতেছিলেন,—বিজলী মার কাছে গেল। মার মুখপানে সে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিল না,—সরল মুক্তভাবে রোজ যেমন কথা বলিত, তেমন কোনও কথাও তার মুখে আজ ফুটিল না। মনে সেই নূতন আনন্দময় ভাবের তরঙ্গ নৃত্য করিতেছিল,—অথচ মনে হইতেছিল, তাহাতে সে মার কাছে যেন কত অপরাধী হইয়াছে।

মা কহিলেন, "কিলো বিজলী, কি হ'য়েছে তোর?"

"না, কিছু না।"

নত মুখে বিজলী কোটা তরকারীগুলি দুই চারিখানি করিয়া থালার এ ধার হইতে ওধারে সরাইয়া রাখিতে লাগিল।

মা কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, আর তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না। বিজলী আবার উপরে গেল। ঝি গৃহমার্জ্জনা করিতেছিল, বিজলীর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। বিজলী হাসি চাপিতে চাপিতে লাল মুখখানি ফিরাইয়া নিয়া পাশের একটি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বিজলী যখন শুইল,—সেই যুবকের মূর্ত্তিখানিই তার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আহা, কে ও! উহার সঙ্গে কি তার বিবাহ হয় না? আহা যদি হয়,—তবে সে কেমন বেশ—বেশ হয়! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, সেই যুবকের সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া সে যেন কোথায় যাইতেছে। তার সেই সুন্দর মুখে মিষ্ট হাসিয়া ঢুলুঢুলু সেই চোক দুটি তার মুখের উপর রাখিয়া কত সোহাগ করিয়া সে কত কথা কহিতেছে। কোথায় যাইতেছে? সেই বরের ঘরে? আহা, হঠাৎ তার পিতা মাতার কথা মনে পড়িল,—ছোট ছোট ভাইবোন্ গুলির কথা মনে পড়িল। হায়! হায়! তাদের ছাড়িয়া সে কোথায় যাইতেছে! গাড়ীর দরজা ফাঁক করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল। তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ঘরে বিছানার একপাশে সে শুইয়াছিল, সকলেই নিদ্রিত, তবু তার বড় একটা ভয় আর লজ্জা হইল। মনে মনে যেন সে মরিয়া গেল। ছি! কে সে কিছুই জানে না, একদিন পথে দেখিয়াছে, আর অমনই স্বপ্নে দেখিল—সে তার বর, আর তার সঙ্গে সে গাড়ী চড়িয়া যাইতেছে! ছি, কেন সে এই সব ছাই কথা ভাবিতেছিল। ঝি যেন কি? ছি, অমন কথা বলিতে আছে? হ'ক্ না খুব সুন্দর,—অচেনা লোক, কে, কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর, কিছুই ত সে জানে না। হয়ত একটি টুকটুকে সুন্দর বউও তার ঘরে আছে। না না, ওসব কথা ভাবিতে নাই। আর সে ভাবিবে না। ঝি যদি কিছু বলে, তাকে গালি দিবে।

সকাল হইতে বিজলীকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। ঝির দিকে চোক্ তুলিয়া একবারও চাহিল না,—কথাও বড় একটা বলিল না। একা ঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই সরিয়া যাইত। ঝিও বিজলীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মুখ ফিরাইয়া মধ্যে মধ্যে মুচকি হাসিল। কিন্তু কথা আর কিছু তুলিল না।

(২)

"ওপারের ওই খালি বাড়ীটার নতুন ভাড়াটে এসেছে দিদিমণি, দেখেছ ?"

বিজলী স্নান করিয়া ছাদে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া দু হাতে চুল ঝাড়িতেছিল। তখন ঝি আসিয়া একটু হাসিয়া এই কথা বলিল।

বিজলী সহজভাবে উত্তর করিল, "হাঁ, কাল বিকেলে অনেক জিনিষ এসেছে দেখেছি। বোধহয় ওরা বড়লোক, ভাল ভাল আসবাব দেখ্‌লাম।"

"কে এসেছে জান ?" ঝি হাসিল চোকে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"না,—কে এসেছে ?"

ঝির চোকে মুখে তীব্রতর আর একটা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। কহিল,—"শুনবে ? সেই বাবুটি—" বলিয়াই ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

বিজলীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তমাত্র।—পরেই আবার সেই লালমুখ কেমন যেন পাংশু হইয়া গেল ! অন্তরে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিতে উঠিতেই কেমন অজানা আতঙ্কে তাহা দমিয়া গেল। অর্দ্ধ-অবশ জড়িত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "সেই বাবুটি—কেন—"

ঝি হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন, তা কি আমি জানি ? তবে মনে হয়—কি মনে হয় ব'লব দিদিমণি ?"

বিজলী কিছু কহিল না,—স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঝি কহিল, "তোমাকে দেখবে বলে। বলিনি, বাবুটি তোমার ওই ফুলের মত মুখখানি দেখে ভুলেছে ?"

চটুল হাসিভরা মুখে বিজলীর দাড়ি ধরিয়া ঝি একটু নাড়িল। বিজলী মুখ ফিরাইয়া একটু সরিয়া গেল।

ঝি কহিল, "তা অত লজ্জা কি গো ! বয়েসের কালে অমন ভালবাসাবাসি কত হয়,—আরও অমন রূপ যদি থাকে। রূপে কে না ভোলে দিদিমণি ?—ওমা ! ব'লতে না ব'লতে—ওই দেখনা, বাবুটি ছাদে এসে দাঁড়িয়েছেন। তোমায় দেখবে ব'লে নয় কি ? ভালবাসার প্রাণ কিনা, অমনি সাড়া পেয়েছে তুমি ছাদে এসেছ—"

সত্যই সেই যুবকটি ছাদে আসিয়া রেলিং ধরিয়া তাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তা খুব বড় রাস্তা নয়, অনতি-প্রশস্ত গলি। ছাদে ছাদে ব্যবধান খুব বেশী নয়, বেশ স্পষ্ট তাকে দেখা যাইতেছিল। বিজলী একবার চাহিয়া দেখিল,—দেখিয়াই ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেল। যুবক একটু মুচকি হাসিল। ঝির চোকে তার চোক পড়িল,—ঝিও তেমনই একটু মুচ্‌কি হাসিয়া নীচে চলিয়া আসিল।

(৩)

রাস্তার উপরেই দ্বিতলের বড় ঘরটি সুন্দর আসবাবে সাজান,—সুন্দর দুটি খোলা আরমারীতে ঝক্‌ঝকে সব সুন্দর বইএর সারি। দেয়ালে কত সুন্দর জাঁকাল ফ্রেমে বাঁধান ছবি। কার্পেট মোড়া মেজের উপরে চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়াম,—আরও কত সুচারু সৌখিন দ্রব্য পরিপাটি-ভাবে সজ্জিত। পাশেই আর একটা ঘরে জানালার নীচের খড়খড়ির উপরে কতদূর পর্য্যন্ত সুন্দর পাতলা পর্দ্দা টাঙ্গান,—উপরের ফাঁক দিয়া খাটের সুচারু ফ্রেমের সঙ্গে নেটের মশারী দেখা যাইতেছে। বাহিরে পাগড়ীপরা গম্ভীরমূর্ত্তি এক দারোয়ান, ভিতরে একটি পরিচ্ছন্ন চাকর ও একটি শাদাসিধা পাচক ব্রাহ্মণ—এই কয়জন মাত্র উপরি লোক। কোথাও আমিরী রকম জাঁকাল বিলাসবাহুল্য এমন নাই যাহা দেখিয়া সসম্ভ্রম সঙ্কোচে কেহ দূরে সরিয়া যাইতে চায়, অথচ সর্ব্বত্রই অতি মনোজ্ঞ এমন একটি পারি-পাট্য রহিয়াছে, যাহা দেখিয়া লোকে তৃপ্ত হয়, আরও দেখিতে চায়।—যুবকটি বোধ হয়, কোনও সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে,—সৌখিন অথচ সুমার্জ্জিত রুচি।

বিজলী যতবার তাদের রাস্তার পাশের উপরকার ঘর-টিতে আসিয়াছে, ওবাড়ীর মুক্তদ্বার গৃহটির সুপরিপাটি সাজ-সজ্জার দিকে তার দৃষ্টি পড়িয়াছে, চোকে বেশ ভালও লাগি-য়াছে। বাবুটিকেও মধ্যে সে ঘরে দেখিয়াছে,—কিন্তু যখনই দেখিয়াছে, চোকে চোকে পড়িয়াছে, সে সরিয়া গিয়াছে।

দুইদিন এই ভাবে গেল, বেশভূষা সম্বন্ধে বিজলী সাধারণতঃ একটু আলুথালু রকম ছিল। কিন্তু এ দুইদিন তাকে সেইরূপ আলুথালু কখনও দেখা গেল না। মা বকিয়াও তাকে পরিষ্কার কাপড়ে রাখিতে পারিতেন না। নিজে সে বাক্স খুলিয়া ভাল ছাটাকাটা দুটি ব্লাউজ আর ভাল পাড়ের খান দুই তিন ভাল ধোয়া কাপড় বাহির করিয়া নিয়াছিল। বেশ পরিপাটি ভাবে তাই সে পরিয়া থাকিত, মধ্যে মধ্যে আরসিতে গিয়া মুখ দেখিত, চুলগুলি একটু এদিক ওদিক হইয়া পড়িলে, অমনিই হাত দিয়া তা

ঠিক করিয়া দিত, মুখ কখনও একটু ময়লা মনে হইলে, আঁচলে ঘসিয়া ঘসিয়া পুছিয়া নিত। কাছে কেহ না থাকিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তার পাশের সেই ঘরটিতে আসিত,—এটা, ওটা নাড়িতে, চোরের মত রাস্তার ওপারের দিকে চাহিত, আবার চলিয়া যাইত। কিন্তু কেহ থাকিলে, এই ঘর মুখীও কখনও হইত না।

দিন দুই গেল। সন্ধ্যার পর একদিন মুক্তগবাক্ষ আলোকোজ্জ্বল সেই সুসজ্জিত গৃহে দুই সপ্তকে একতান হার্মোনিয়ামের সুরে মিশান মধুর গম্ভীরকণ্ঠে বড় মধুর সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। বারান্দায় বসিয়া বিজলী পান সাজিতে ছিল। হাতের পান হাতে রহিল, উৎকর্ণ হইয়া সে সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে ঘরের মধ্যে গেল, সেই সঙ্গীত সুধা লহরী যেন তাকে টানিয়া নিল। ঘরে আলো ছিল না। জানালার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। যুবক গায়িতেছিল। দুর্লভ প্রেমপাত্রীর প্রতি প্রেমিক হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস সেই গানে ব্যক্ত হইতেছিল। মুখখানি ঈষৎ উত্তোলিত, ঢুলু ঢুলু সে চক্ষু দুটি—যেন আজ বুকভরা প্রেমের মদির আবেশেই ঢুলু ঢুলু—বাহিরে দিকে তার বিভোর দৃষ্টি নিবদ্ধ যেন মুক্ত আকাশ পথে তার প্রাণের আকুল বেদনা তার সেই প্রেমপাত্রী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছে। ঘর অন্ধকার—কেহ দেখিতেছে না—মুগ্ধ বিজলী নিঃকুণ্ঠ নিঃসঙ্কোচ চিত্তে মুক্তনেত্রে তার দিকে চাহিয়া রহিল। আহা, কি সুন্দর! কি মোহন সুকুমার ওই মূর্ত্তি! এমন করিয়া ত আর কখনও সে দেখে নাই! চাহিয়া চাহিয়া—চক্ষু ভরিয়া সে দেখিতে লাগিল,—আর সেই সঙ্গীত যেন দুটি কাণে তার অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তার মনে হইতেছিল, আকুল সঙ্গীতে প্রাণের ওই আকুল কামনা—আকুল বেদনা—তাকেই সে জানাইতেছিল,—আকুল দৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকেই সে খুঁজিতেছিল। বড় আবেগময় এক একটি কথা যখন উচ্ছ্বাস কম্পিতস্বরে ব্যক্ত হইতেছিল, বিজলী সমস্ত প্রাণ ভরিয়া যেন সেই বেদনার প্রতিবেদনা জাগিয়া উঠিতেছিল—দেহ যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া অবশ হইয়া আসিতেছিল। সমস্ত জগৎ সে ভুলিয়া গেল,—সে কে, কোথায় আছে, কি করিতেছে—কিছুই তার মনে ছিল না—অপূর্ব্ব এক সঙ্গীতময় স্বপ্নরাজ্যের মাধুরীসাগরে সে ডুবিয়া গেল।

"বিজলী!"

সহসা মাতার কঠোর কণ্ঠে সে চমকিয়া উঠিল। স্বপ্নবিভোরতা তার টুটিয়া গেল। ছি ছি! কি লজ্জা! কি করিতেছে সে! চমকিয়া একটা লাফ দিয়া সে সরিয়া আসিল। ঘর অন্ধকার, তবু সে ভাবিয়া পাইল না, কোথায় তার মুখখানি সে লুকাইবে!

মা কহিলেন, "কি কচ্চিস্ দাড়িয়ে ওখানে?"

বিজলী কিছু বলিল না, ঘর হইতে নতমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। মা সেই জানালার কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইলেন,—একটু ভ্রূকুটি করিলেন। বাহিরে আসিয়া পাশের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন, আলোর কাছে একটা কি বই খুলিয়া বিজলী তার দিকে চাহিয়া আছে।—

মা কহিলেন, "নীচে আয়।"

বিজলী বই রাখিয়া মার সঙ্গে নীচে চলিয়া গেল। মা মৃদুস্বরে কহিলেন, "জানালার কাছে গিয়ে আর অমন দাঁড়াস্‌নে।"

পরদিন পুরাণ কাপড় ছিঁড়িয়া কয়টি পর্দা তৈয়ারী করিয়া মাতা জানালায় টাঙাইয়া দিলেন।

বিজলী যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। মনে মনে সংকল্প করিল,—আর ওদিকে ফিরিয়াও চাহিবে না, ও কথাও আর কখনও ভাবিবে না।

সেদিন ও ঘরেও সে গেল না। সন্ধ্যার পর আবার সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। বিজলী উপরে একটি ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গীত তার কাণে গেল—কাণ তুলিয়া সে শুনিল। সুললিত ছন্দে গ্রথিত, সুমধুর কণ্ঠে গীত গানের পদগুলিতে প্রেমিকার অদর্শনে বিরহী প্রেমিকের হৃদয়বেদনা যেন তপ্ত তরল ধারে উছলিয়া পড়িতেছিল। বিজলী কাঁপিয়া উঠিল। হাতের বই ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। নীচে ছোট একটি ঘরে তার দিদিমা (পিতার পিসিমাতা) সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। বিজলী সেই ঘরে গেল। বৃদ্ধা সম্মুখে গঙ্গাজলের কলগুটি লইয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, বিজলী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—দিদিমার কাছে গিয়া বসিল। দেয়ালে একখানি হরগৌরীর চিত্র টাঙ্গান ছিল, সেই চিত্রের উদ্দেশ্যে গৃহতলে বিজলী প্রণাম করিল,—করিয়া চিত্রের দিকে চাহিল। মহাদেবের ওই চক্ষু দুটি—ওমা! ও যে তারই সেই চক্ষু! আর

তার পাশে ওই গৌরী—ছিঁ ছি! একি হইল। দেবতাও তাকে আজ এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিতেছেন? অপরাধ কি তার এতই বড় হইয়াছে? বিজলীর চক্ষে জল আসিল।

দিদিমা একটু হাসিলেন—মুখের একটি মন্ত্র শেষ করিয়া কহিলেন, "ওকিলো বিজলী! হঠাৎ এসে ছবিকে প্রণাম ক'ল্লি যে।"

বিজলী একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "তা দেবতার ছবি—প্রণাম ক'ত্তে হয় না?"

"হয় বই কি! তা তোরা করিস্ কই? ছেলেবেলায় কত ব্রত নিয়ম আমরা ক'রেছি। এখন ত সে সব পাট উঠেই গেছে। বড় হ'য়ে যখন উঠ্‌লি—তোর মাকে বল্লুম, মেয়েকে চাঁপাচন্দনের ব্রত করাও।—তা কথা কাণেও তুল্লে না। বল্লুম ওতে মহাদেবের মত বর হয়—"

বিজলী মুখখানি ফিরাইয়া নিল। ছি! পিসিমাই বা আবার এ ছাই কি বলিতেছেন! কোথাও কারও কাছে কি তার আজ একটু স্বস্তি নাই? দিদিমা আরও কয়েকবার জপ করিয়া কহিলেন, "ব্রত যদি করাত—এদ্দিন কি বিয়ে হ'ত না? অবিশ্যি হ'ত। আমাদের সময় মেয়েরা এই পাঁচ ছ বছর বয়স থেকেই কত ব্রত ক'ত্ত। তাই না সকাল সকাল তাদের বিয়ে হ'য়ে যেত। এখন হয় না। হবে কেন? ব্রত নিয়ম কেউ করে না, দেবতা বামুণে কারও ভক্তি নেই,—বর না মেয়ে মানুষের শিব, সেই শিব কি কেউ আরাধনা না ক'রে পায়? স্বয়ং মা যে ভগবতী, তিনিও দুই জন্মে কত তপিস্যে ক'রে তবে মহাদেবকে পেয়েছিলেন। তা কত বল্লুম, আর কিছু না হ'ক শুধু চাঁপাচন্দনের ব্রতটাও যদি তোকে করাত—"

বিজলী আবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।—কহিল, "তোমার ও চাঁপাচন্দনে কাজ নেই দিদিমা! আর কিছু ব্রত করাও না?—"

"ওতে যে সাক্ষাৎ শিবের মত বর হয় লো।"

"না, ওতে আমার কাজ নেই। বর টর কিছু আমি চাইনে। তুমি ত কত পূজো কর, ব্রত কর,—বর চেয়ে কর?"

দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, "দূর আবাগী! কি বলে শোন না! আমাদের কি আর বর চাইতে আছে? যিনি ছিলেন, তিনি এখন নারায়ণ। এখন সেই নারায়ণকে পেলেই ত মুক্তি হ'য়ে যায়। আহা, কবে যে তা পাব, কবে যে পাপক্ষয় হবে—!"

"পূজো ক'ল্লে কি নারায়ণকে পাওয়া যায় দিদিমা?"

দিদিমা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আমরা কি আর পূজো করি দিদি? এ ত খেলা করি। পূজোর মত পূজো যদি কেউ ক'ত্তে পারে, নারায়ণ তাকে দয়া করেন বই কি? হুঁ—!"

"তবে আমিও পূজো ক'র্ব্ব দিদিমা।"

"তোর বাপ মা কি তা দেবে? তাদের হ'ল একেবে খিষ্টেনী মত—"

"বিজলী!"

বাহিরে মাতার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

"কি মা!" বিজলী উঠিয়া গেল।

ও বাড়ীতে এখনও সঙ্গীত হইতেছিল। বিজলী যে দিদিমার পূজোর ঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল, মাতা ইহাতে একটু সন্তুষ্ট হইলেন। হাঁ, তাঁর ইঙ্গিত বিজলী বুঝিয়াছে। আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে উৎকণ্ঠা তাঁর হইয়াছিল, তা অনেকটা দূর হইল। পাক হইয়াছিল। ছোট ভাই বোন্ কয়টিকে আহার করিতে আদেশ দিয়া তিনি কি কার্য্যে উপরে চলিয়া গেলেন।

(৪৮)

"হাঁ, দিদিমণি! কি হ'য়েছে তোমার?"

"কেন, কি হবে?"

"আজ দুদিন বড্ড ব্যাজার ব্যাজার দেখছি তোমায়। মুখখানির দিকে চাইলে মনে হয় বুকভরা যেন কত দুঃখু তুমি চেপে রাখ্‌তে চাচ্ছ।"

বিজলী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "না, দুঃখ কি আমার? ছি!"

ঝি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "ছি কল্লে কেন দিদিমণি? সত্যিকার যদি বড় কোন দুঃখু কারও হয়, সেটা ত আর দোষের কথা কিছু নয়। তবে কেউ বা খুলে ব'ল্‌তে পারে, কেউ বা পারে না। পারলে বুকের ভার বেশ হালকা হয়। আর না পারলে সেই ভারে লোক গুমরে মরে।"

বিজলীর পাশেই ঘরের মেঝের তেলমখলায় কি একটা ছোট দাগ পড়িয়াছিল। বিজলী হাঁটুর উপরে যেই দিকে মুখখানি ঈষৎ ফিরাইয়া রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া জোরে সেই

রাগটি রগড়াইতে লাগিল। ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ক'হল, "হুঁ—! দুঃখু যে পেয়েছে, সেই পরের দুঃখু বোঝে। আমারও একদিন বড় একটা দুঃখু হ'য়েছিল,—কত এমনি গুমরে মরেছি। তবে সে কতদিনের কথা, এখন মনটা অনেক হাল্কা হ'য়ে গেছে। হুঁ—! তবে কারও অমন দুঃখু দেখ্লে, নিজের সেই দুঃখু আবার মনে পড়ে, প্রাণটা কেঁদে ওঠে।"

ঝির গলাটা একটু কাঁপিয়া উঠিল,—অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু দুটি একটু মার্জ্জনা করিল। তার মিষ্টি কথা গুলিতেও বড় স্নেহময় একটা সহানুভূতির সাড়া বিজলী অনুভব করিতে-ছিল। ঝি যখন তার দুঃখের কথা তুলিল, তাহাতে এমনই একটা করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছিল যে বিজলীর প্রাণেও ঝির প্রতি তেমনই যেন একটা স্নেহময় সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া উঠিল। কেমন যেন একটা সাথিত্বের সমপ্রাণতা সে ঝির সঙ্গে অনুভব করিল। তার ইচ্ছা হইল, ঝির সব কথা সে শোনে, আর তার প্রাণেরও সকল বেদনা ঝির কাছে বলিয়া বুকের ভার লঘু করে।

বাহিরে সিঁড়ির দিকে কি একটা শব্দ হইল। বিজলীর মা উপরে আসিতেছিলেন। পাশেই একটা তাকের উপরে চিরুণী ও চুলের ফিতা ছিল। অতি ক্ষিপ্রহস্তে ঝি তা টানিয়া নিয়া বিজলীর চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল, বিজলীও একটু ঘুরিয়া ঠিক হইয়া বসিল। বিজলীর মা গৃহে প্রবেশ করিলেন।—ঝি কহিল, "এই যে মা,—হাত খালি আছে, ভাবলুম দিদিমণির চুলটা বেঁধে দিই। আহা, কি চুল দিদিমণির মাথায়, দুহাতে যেন গোছা ধরা যায় না। আর কি নরম—যেন পশমের মত। দেখ্লেই ইচ্ছে করে, হাতে নেড়ে চেড়ে বেঁধে দিই। তা পারিনে ত রোজ,—আজ হাত খালি আছে, ভাবলুম চুলটা আমিই বেঁধে দিই। এখনও বেলা আছে, হ'লেই উনুনে আঁচ দিয়ে দোকানে যাব।"

মা কহিলেন, "তা দেও বাছা,—ইচ্ছে যদি হয়, দেবে না কেন? হাত যেদিন খালি থাকে তুমিই ওর চুল বেঁধে দিও। —হাঁ বিজলী, চুল বাঁধা হ'লে হাত মুখ যখন ধুবি, জটু, বাণু ওদেরও গা হাত পা পুছে দিস্। আর ঝি, ওর চুল বাঁধা হ'লে—আমি একবার বিন্দুদের বাড়ী যাব, আমায় পৌঁছে দিয়ে এসে তারপর উনুনে আঁচ দিয়ে দোকানে যেও। তার ছেলেটির বড় ব্যামো ক'দিন, একবার সে দেখে আসব। ওদের একজন লোক নিয়ে ফিরে আসব এখন। ফিরতে যদি একটু দেরী হয়, রান্নাটা চড়িয়ে দিস্ বিজলী—"

ঝি কহিল, "তা মা রুগী দেখ্তে যাবে, দেরী যদি হয়ই, কিচ্ছু ভেবোনা। আমি সব গুছিয়ে দেব,—দিদিমণিই বরং রাঁধ্বে! কেমন পারবে না দিদিমণি?"

বিজলী কেমন অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তা কেন পারব না? তা—তোমার কি—বেশী দেরী হবে মা?"

মা কহিলেন "না,—বেশী দেরী কেন হবে? তবে—সত্যিই ত রুগী দেখ্তে যাচ্ছি—কতদিন বিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় না—একটু দেরী যদি এমন হয়ই—তা ভয় কি? ঝি র'য়েছে, তোর দিদিমা আছেন—ওরাও হয়ত এরি মধ্যে এসে প'ড়বে———"

ঝি কহিল, "ওমা, ভয় কি গো! ক'ল্কেতা সহর, চারদিকে কত লোক, রাস্তায় কত লোক আনাগোনা ক'চ্চে, ভয় কি? আমরাও ত বাড়ীতে র'য়েছি। না মা, তুমি ভেবোনা, কখনও ত বেরোওনা,—একদিন রুগী দেখ্তে আপনার লোকের বাড়ীতে যাচ্ছ—দেরী যদি একটু হয় ত হবে। দিদিমণিকে দিয়ে আমি রান্না বান্না সব করিয়ে রাখ্ব এখন।"

গত দুইদিন বিজলী রাস্তার ধারের ঘরটিতে একেবারেই যায় নাই। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে, তবু যায় নাই,—শক্তপণে আপনাকে বাঁধিয়া সে রাখিয়াছিল। মাও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টও হইয়া-ছিলেন। মনে যেটুকু উদ্বেগ তাঁর ছিল, একেবারে চলিয়া গেল। আহা, ছেলে মানুষ, অত কি বোঝে? একদিন একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছিল। তা, লক্ষ্মী মেয়ে, একটু ইসারা করিতেই সামলাইয়া গিয়াছে।

এ দুইদিন মনে না হউক, বাহিরের আচরণে বিজলী সত্যই সামলাইয়াছিল। কিন্তু আজ তার কি হইল, কিছুতেই পারিল না। মা বাড়ীতে নাই,—দিদিমা তাঁর পূজা আহ্নিক ও তার আয়োজনাদি লইয়া নীচের ঘরটিতেই প্রায় থাকেন, সংসারের কোন দিকে কিছু লক্ষ্য করেন না। ছোট ভাইবোন্ গুলি সব ছাদে খেলা করিতেছে। কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না। একটিবার—শুধু একটিবার

—আর ত কিছু নয়, শুধু একটিবার মাত্র ওঘরে গেলে ক্ষতি কি ?

ধীরে ধীরে কম্পিত-চরণে বিজলী দ্বারের কাছে গেল, —একটু দাঁড়াইল। মনে হইল, কে যেন পিছন হইতে দেখিতেছে। চমকিয়া বিজলী ফিরিয়া চাহিল। না, কই, কেহ ত কোথাও নাই। কম্পিত বক্ষে কম্পিত চরণে বিজলী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জানালায় পর্দ্দা টাঙ্গান রহিয়াছে। পর্দ্দাগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ তার মাতার নিষেধের মত দ্বার আড়াল করিয়া দাড়াইয়া আছে।

বিজলী বড় ভয় পাইল। কিন্তু হৃদয়ের সেই দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা যে ভয়কে অভিভূত করিয়া উঠিল। বিজলী সামলাইতে পারিল না,—ধীরে ধীরে পরদার কাছে গিয়া পরদাটা একটু সরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। ওই যে, আহা, ওই যে! ওই যে সে বাড়ীর সম্মুখের ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাদেরই জানালার দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া আছে! একটিবার যেন তাকেই দেখিতে চাহিতেছে। বিজলী চাহিল—চোকে চোক পড়িল। যুবক একটু হাসিল। —পরদা টানিয়া দিয়া বিজলী ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত শরীর তার কাঁপিতে লাগিল।—দ্রুতপদ-ক্ষেপে সে নীচে চলিয়া আসিল।

ঝি তাড়াতাড়ি পাকের সব যোগাড় করিয়া দিল। বিজলী গিয়া পাক চড়াইল। ঝি দরজার কাছে বসিল।—বিজলীর বড় ইচ্ছা হইতেছিল, ঝির সেই দুঃখের কথা শোনে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কেমন বাধ বাধ লাগিল। কিন্তু ঝি নিজেই কথা তুলিল।

"ব'লতে ব'লতে মা এসে পড়লেন, কথাটা হ'ল না। হাঁ, তা কি হয়েছে তোমার দিদিমণি ?"

"কি হবে ? কিছু হয় নি।"

"না, হয় নি,—আমি যেন কিছু বুঝিনে। জান দিদি-মণি, তোমাকে কত ভালবাসি। কি চোকেই যে তোমাকে দেখেছিলুম, মা যদি ঝাঁটা মেরেও তাড়িয়ে দেন, তবু বোধ হয় তোমায় ছেড়ে যেতে পারিনে। প্রাণের টান এম্‌নিই ঘটে। তোমার মনটি যেন আমি তোমার মুখখানির মতই দেখ্‌তে পাই।"

বিজলী উঠিয়া গিয়া হাতা দিয়া ডাইলে একটা নাড়া দিল।

ঝি কহিল, "আচ্ছা, তুমি আজ কদিন ওঘরটিতে একে-বারেই যাওনা কেন ?"

বিজলী ডাইলে আরও একটা নাড়া দিয়া কহিল, "দর-কার কিছু হয় না—যাইনে।"

"হুঁ—! দরকার হয় না!' আমি যেন বুঝিনে কিছু! পর্দ্দা দেওয়া হ'য়েছে কেন ? মা বারণ করেছেন তোমায়।"

বিজলী বসিয়া নীরবে ওবেলার সাঁতলান মাছগুলি গণিতে আরম্ভ করিল।

ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুঁ—! তা কথায় ধমকে কি আর প্রাণ কেউ কারও বেঁধে রাখ্‌তে পারে ? পরদা দিয়ে চোক ঢাকা যায়, প্রাণ কি কেউ ঢেকে রাখ্‌তে পারে ? কতকালের কথা—যমুনা তীরে কদমতলায় যখন শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ত, রাধিকা পাগল হ'য়ে ছুটত, দড়ী দিয়ে বেঁধেও কি জটিলে কুটিলে তাকে ঘরে রাখ্‌তে কখনও পেরেছে ?"

বিজলী সমস্ত দেহ ভরিয়া যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ চঞ্চল উচ্ছ্বাসে বহিয়া গেল,—বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি বলিতে লাগিল, "নিজে জানি, তাই বুঝি দিদিমণি! ব'লছিলুম না—অমন বুকে চাপা দুঃখে আমিও একদিন গুমরে ম'রেছি।—তা শুনবে দিদিমণি আমার কথা ?"

কৌতুহলটা বড় প্রবল হইয়াই উঠিতেছিল।—এবার বিজলী মুখ ফিরাইয়া কথা কহিল।

"কি, বলনা শুনি ?"

ঝি তার প্রথম জীবন সম্বন্ধে একটি গল্প বলিল। দূর কোনও গ্রামে ভাল গৃহস্থের মেয়ে সে ছিল। গ্রামে একটি মেয়ে ইস্কুল ছিল, একটু লেখা পড়াও সে শিখিয়াছিল। ক্রমে তার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইল, এই তার দিদিমণিরও এখন যেমন হইয়াছে। কিন্তু তবু বিবাহ হইল না। কোন সম্বন্ধেই তার বাপের পছন্দ হইত না। প্রতিবেশী একটি যুবক ছিল—দেখিতে বেশ। কলিকাতায় তাদের দোকান ছিল—মধ্যে মধ্যে দেশে যাইত। কলিকাতায় থাকিত কিনা, বেশ ফিট্-ফাট বাবুটির মতই চলিত ফিরিত। ঘাটে পথে যেখানেই সে যাইত, সে তাকে দেখিত। সে একদৃষ্টিতে তার দিকেই চাহিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম তার বড় লজ্জা করিত। তাকে দেখিলেই সে পলাইয়া যাইত। শেষে কি হইল তারও তাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত। আর সে পলাইত না,

সেও চাহিয়া চাহিয়া তাকে দেখিত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে ঘাটে যাইতেছিল, পথে কেহ ছিল না, তার সঙ্গে দেখা হইল। তার হাতখানি ধরিয়া কত ভালবাসার কথা সে বলিল,—আহা, কি যে সে সব কথা! জীবনে কি তা সে আর কখনও ভুলিতে পারিবে? তারপর কত দেখা হইত, কত কথা তারা বলিত। একদিন তার মা দেখিয়া কত গালি দিল,—বাপ তার বাপকে ডাকিয়া কত ধমকাইয়া বলিয়া দিল, আর কখনও তার ছেলেকে তার মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিলে তাকে খুন করিয়া ফেলিবে। তার বাপও তাকে কত শাসন করিল,—কলিকাতায় দোকানের কাজে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু সে গেল না। কদিন আর তাদের সাক্ষাৎ হইল না। দুজনেই সমান পাগল হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। একদিন সে গোপনে খবর দিল,—রাত্রিতে একস্থানে তার সঙ্গে দেখা হইল। সে কহিল, "তোমার বাপ রাগিয়া আছেন, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না। তা আমি সব বন্দোবস্ত করিয়াছি,—আমার সঙ্গে পলাইয়া কলিকাতায় চল। সেখানে তোমাকে আমি বিবাহ করিব।" বলিয়া তার হাত ধরিয়া সে কত কাঁদিতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই তারা পলাইয়া আসিল। কলিকাতায় তাদের বিবাহ হইল। তারপর, আহা, দুই তিন বৎসর কি সুখেই তারা ছিল! শেষে কলেরায় তার গঙ্গালাভ হইল। মনের দুঃখে আর সে দেশমুখো হইল না,—কাশী গেল। কিছু টাকা কড়ি আর গহনাও ছিল। কয় বৎসর তাতেই চলিল! শেষে পেটের দায়ে সে দাসীবৃত্তি আরম্ভ করিল। আগে কাশীতেই ছিল। ৫।৬ বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছে।

কথাগুলি মোটের উপরে সত্য। তবে ঝি যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন সে কুমারী নয়, বালবিধবা। কিন্তু বিজলী, ঝি যেমন বলিয়াছিল, কথাগুলি তেমনই বিশ্বাস করিল। ঝির সেই কাহিনীর সঙ্গে তার নিজের যে কাহিনীটুকু, তা যেন একেবারে মিলিয়া গেল। ঝিকে তার এখন বড় আপন বলিয়া মনে হইল। তাই ত! ভালবাসিলে এমনই বুঝি হয়। আহা, ওই বাড়ীর উনি—তাকে কি সত্যই এমন ভালবাসিয়াছেন? তিনি কি তাকে বিবাহ করিতে চাহিবেন? কিন্তু তার বাবা যদি রাজি না হন, তবে—? না, না, কেন রাজি হইবেন না? মেয়েকে অমন বরের হাতে কে না দিতে চায়?

ঝি কহিল, "ভালবাসা এমনি জিনিস—তার জন্য হাজার দুঃখ পেলেও সে সুখ। প্রথম বয়সের ভালবাসা,—যারা বুড়ো হ'য়েছে তারা তার মরম বোঝে না। নইলে ভালবাসার পথে এমন ক'রে আগলে দাঁড়াতে চায়? মা ত পরদা দিয়েছেন, তা সত্যি যদি তুমি ভালবেসে থাক, প্রাণ যদি তোমার টানে,—পরদা তাকে ধ'রে রাখতে পারবে? হাঁ দিদিমণি! বলনা, সত্যি কি তুমি ওই বাবুটিকে ভালবাসনি?"

বিজলী লজ্জায় হাঁটুর উপরে মাথাটি গুঁজিয়া রাখিল। না ও বলিতে পারিল না। হাঁ কথাও লজ্জায় মুখে সরিল না।—

ঝি একটু হাসিয়া কহিল, "হুঁ, বুঝেছি! আগেই ত বুঝেছি। বলিনি তোমায় বড় ভালবাসি—তোমার মনটি তোমার মুখখানির মতই দেখতে পাই? তা বেসেছ—বাসবেই ত,—এমন কার্ত্তিকের মত লোকটি—চোকে দেখে কেনা ভালবেসে পারে? আর কি জান দিদিমণি, ভালবাসা—ও যখন হবে তা হবেই। অমন আপনা থেকে এই যে ভালবাসা—জানা নেই শুনো নেই—অথচ চোকে চোকে দেখা হ'ল, আর প্রাণের সঙ্গে প্রাণটা বাঁধা পড়ে গেল, এই হচ্ছে আসল ভালবাসা। আহা, এমন ভালবেসে যে ভালবাসা পেয়েছে, তার মত ভাগ্যি আর কার! তা বলতে পারি দিদিমণি—বাবুটিকে কদিন দেখছি,—তুমি যেমন ভালবেসেছ, তিনিও তেমনি ভাল তোমায় বেসেছেন। এখন দুটি হাত যদি এক তোমাদের হয়, তবেই সব মঙ্গল। আহা, ডাল ত একেবারে পু'ড়ে গেল। একঘটি জল দেও শীগগির। মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন, কি ব'লবেন তবে?"

বিজলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডালের কড়াতে কতখানি জল ঢালিয়া নাড়িয়া দিল।

সদর দরজায় কে কড়া নাড়িল, ঝি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিজলার মা স্বর্ণময়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাকের ঘরের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঝি কহিল, "তা মা, তুমি এই এদ্দুর হেঁটে এলে, উপরে গিয়ে বরং জিরোও একটু। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দিদিমণিই রাঁধবে এখন।"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "কিলো, পারবি বিজলী?"

বিজলী কহিল, "পারব।"

স্বর্ণময়ী হাত পা ধুইয়া উপরে গেলেন।—ঝি আর ওসব কথা কিছু তুলিল না। তাড়াতাড়ি বিজলীকে দিয়া পাক সারিয়া ফেলিল।

(৫)

বিজলী এখন আপন মনে স্বীকার করিয়া নিল, ওবাড়ীর ওই সুন্দর বাবুটিকে সে তার বরের মত ভালই বাসিয়াছে। এতদিন সে তা করিতে পারে নাই।—বাবুটির দিকে তার মন টানিত, কিন্তু সে টান হইতে তার মন সে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিত। বাবুটিকে দেখিতে তার ভাল লাগিত, দেখিতে বড় ইচ্ছা করিত,—কিন্তু ভাল যাতে না লাগে, দেখিতে যাতে ইচ্ছা না হয়, তার জন্য অবিরত একটা সংগ্রাম সে করিত যদিও সে সংগ্রামে তার মন ক্ষতবিক্ষত হইত। অত যে মন টানে, অত যে ভাল লাগে, তাহাকে—কেন তা ঠিক বুঝিত না অথচ—আপনার কাছেই আপনাকে বড় অপরাধী তার মনে হইত। কিন্তু এই কুণ্ঠা, এই দ্বিধা—এই সংগ্রাম ও সংযমের প্রয়াস তার প্রায় চলিয়া গেল।—বাবুটিকে যে সে তার বরের মত ভালই বাসিয়াছে—এ কথা ঠিক বুঝিয়া সে এখন স্বীকার করিয়া নিল। ঝি তার মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিয়াছে,—কথাটা ত সত্যই!—যতই না বলিয়া সে চাপিয়া দিতে চাক্, সেই 'না' ত তার প্রাণ মানিতে চাহিতেছে না। সকল চাপ ঠেলিয়া এই সত্যটাই যে তার মন ভরিয়া উঠিতেছে, ওই বাবুটিকে সে ঠিক তার বরের মত ভাল বাসিয়াছে। তা ইহাতে দোষ কি? অমন ভাল লাগিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। কেন বাসিবে না? ভাল বাসিয়া এত ভাল তার লাগিতেছে, কেন বাসিবে না? এমন ভালবাসা নাকি আপনিই হয়, তারও তাই হইয়াছে। দোষ ইহাতে কি থাকিতে পারে? ঝি বলিল, বাবুটিও তাকে ভালবাসিয়াছেন। তাকে কেন তবে সে ভাল বাসিবে না? ঝির কথা যদি সত্য হয়—সত্যই হইবে, তারও ত তাই মনে হয়,—তবে সত্যই ত তিনি তার বর হইবেন, তার বাবাকে বলিয়া তাকে বিবাহ করিবেন। আহা, সে দিন কবে আসিবে! তখন ত ওঁর কাছেই সে থাকিবে, কত কথা তাঁর শুনিবে,—আরও কত ভাল বাসিবে, আরও কত ভাল তা লাগিবে! তবে বড় লজ্জা করে। তা লজ্জা ত করিবেই। সবারই করে। এখন করিতেছে, শেষে আর করিবে না। তাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। তা কারও সামনে না থাকুক, লুকাইয়া একটু দেখিবে, তাতে দোষ কি? মা অত বোঝেন না। ঝি বলিয়াছে, যারা বুড়া হইয়াছে ভালবাসার মরম তারা বোঝে না। ঠিকই বোধহয় বলিয়াছে—তা মাকে সে জানিতেও দিবেনা, যে সে ওঁকে এত ভাল বাসিয়াছে।

কিন্তু—তবু যেন মনটার মধ্যে কেমন এক একটা খোঁচা দিয়া উঠে, যেন মনে হয় এটা ভাল হইতেছে না। না, ও কিছু নয়। মা দোষের মনে করেন, তারও তাই মনটা একটু কেমন কেমন করিয়া উঠে। মারই ভুল। না, এতে দোষ কি হইতে পারে? ভালবাসা ত ভাল কথা, সুখের কথা।

লজ্জা করিত, মাকেও ভয় করিত, আপনার মনটাও কখনও একটু খুঁৎ খুঁৎ করিত, কিন্তু আর বিজলী আপনার মনকে সংযত করিতে পারিল না। যখনই উপরে কেহ না থাকিত, চোরের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া সে রাস্তার পাশের সেই ঘরটিতে ঢুকিত, পরদা একটু সরাইয়া দেখিত। কখনও তাকে দেখিতে পাইত, কখনও পাইত না। যখন পাইত না, ক্ষুণ্ণ মনে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিত। যখন পাইত, আনন্দ যতই হউক, বড় লজ্জা করিত, একটু দেখিয়াই পলাইত। চোকে চোকে যদি কখনও পড়িত, মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিত, অতি ত্রস্ত সে ছুটিয়া আসিত।

স্বর্ণময়ীরও যেন কেমন একটু সন্দেহ হইয়াছিল। বিজলীকে তিনি যেন চোকে চোকে রাখিতেছেন। নীচে হাজার কাজে জোড়া থাকিলেও, বিজলী উপরে আসিলেই তিনি যখন তখন আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। কখনও নীচে নিজের কাছে তাকে ডাকিয়া নিতেন, এমন অনেক কাজে তাকে নিয়োগ করিতেন, যে সব আগে কখনও বিজলীকে তিনি করিতে বলিতেন না।

সকালে একদিন বিজলী তার দাদার কাছে শি পড়া বুঝিয়া নিতেছিল, ঝি স্বর্ণময়ীর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দুই একবার চাহিয়া চুপি চুপি কহিল—"মা, একটি তোমায় ব'লব।—কদিন ভাবছি——"

স্বর্ণময়ী যেন চমকিয়া উঠিলেন, হাতের কাজ রাখিয়া কহিলেন,—"কি ঝি? কি হ'য়েছে?"

ঝি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মা, আমাদের আর এ সংসারে কেই বা আছে? তবে তোমাদের কাছে আছি,—তোমরাই মা বাপ—দাদাবাবু দিদিমণি খোকাবাবু খুকুমণিরা—ওরাই এখন-ছোট ভাইবোনের মত। তোমাদের ভাল মন্দ কিছু দেখ্‌লে প্রাণটার নাকি বড় বাজে -"

স্বর্ণময়ীর বুকটার মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ঝি কি বলিতে চায়? কি ভালমন্দ সে দেখিয়াছে?

"কেন, কি হ'য়েছে? কিসের ভাল মন্দ?"

ঝি কহিল, "এই ব'ল্‌ছিলুম কি মা, দিদিমণির বে টে এখন দেবে না? এত বড় হ'য়েছে—"

হঠাৎ ঝি আজ এ কথা কেন বলে? স্বর্ণময়ী যেন থমকিয়া গেলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ, বড় ত হ'য়েছেই. চেষ্টাও ত উনি ক'চ্চেন। তবে ভাল ঘর বর পানমা, টাকারও যোগাড় নেই—"

"তা মা, যে ক'রে হ'ক্, শীগ্‌গিরই দেখে শুনে বিয়েটা দিয়ে ফেল,—আর দেরী মোটেই ক'রোনা।—"

"কেন লো? এ কথা কেন আজ বল্‌ছিস্?"

"ব'ল্‌ছি কেন? তা মা, তুমি কি কিছু দেখ না?"

স্বর্ণময়ীর মুখ শুকাইয়া গেল।

"কি———"

"কি আর ব'লব মা, তুমিও ত দেখ্‌ছ। ওই যে ওপারের খালি বাড়ীটার বাবুটি এসেছে,—উনি লোক ভাল নয়। নিশ্চয় কোনও বড় লোকের ঘরের কাপ্তানী ছেলে—ওরা না ক'ত্তে পারে এমন কাজ নেই। আমি ত দেখ্‌ছি—এসেছে অবধি হা ক'রে এই দিকেই চেয়ে থাকে। অবিশ্যি তাতে এমন কিছু দোষ হ'ত্তনা, তুমি ত পরদা টাঙ্গিয়েই দিয়েছ। তা মা, দিদিমণির এই সোমত্ত বয়েস, আর বাবুটিও দেখ্‌তে—তা সত্যি কথাও ব'ল্‌তে হয়—দেখ্‌তে যেন রাজপুত্তুরটির মত। (অতি চাপাস্বরে) আমি ত দেখ্‌ছি, দিদিমণি—কেউ যখন না থাকে—চোরের মত চুপি চুপি ওই ঘরে যায়—পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখে। দু তিন দিন আমার চোকে প'ড়েছে—"

স্বর্ণময়ী নির্ব্বাক্। কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। ঝির মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

ঝি বলিতে লাগিল; "তা মা, লোকে বলে; এই যৈবন কাল—তোমরাও বে দেওনি—মনটা অমন ধগবক ক'রে ওঠে বই কি? চোকে চোকেই কত সব্বনাশ হ'য়ে যায়। তা একটা বাড়াবাড়ি না হয়, তাই ব'ল্‌ছিলুম—যে ক'রে হয়, একটি বর টর দেখে বিয়েটা দিয়ে ফেল। আর যদ্দিন না হয়, দিদিমণিকে একটু চোকে চোকে রেখো। আটকুঁড়ির ছেলে! কোত্থেকে এসে পদ্দা হ'য়েছে? ইচ্ছে হয় মুখে মুড়ো ঝাঁটা মেরে আসি!"

স্বর্ণময়ী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "হুঁ—আমারও তাই সন্দ একটু হ'য়েছে, তা দোহাই ঝি - এ কথা কাউকে যেন ব'লিস নি। আজই আমি বাবুকে ব'লব, তাড়াতাড়ি ক'রে একটা সম্বন্ধ দেখেন। খুব ভাল না হ'ক,—চলন সই যেমন পাওয়া যায়, কারও হাতে এখন দিয়ে ফেলতে পাল্লেই বাঁচি বাছা!

"হাঁ, তাই ক'রো। আর একটু চোকে চোকে দিদি-মণিকে রেখো। আ মও অবিশ্যি রাখি—তবে—"

"তাই রাখিস্ বাছা,—আমি ত সর্ব্বদা পারিনে, কাজকর্ম্ম অনেক। তা তুই ঘরে আছিস্, আপনার লোকের মত দরদও একটা হ'য়েছে,—আমি যখন না পারি. একটু চোকে চোকে ওকে রাখিস্ বাছা। ওঘরে যদি একলা কখনও যেতে দেখিস্, সঙ্গে সঙ্গে যাস্। ছাদে কখনও গেলেও সাথে সাথে যাবি।"

"তা যাব বই কি মা, তা যাব বই কি? তোমাদের নুন খাই, এইটুকু ভাল তোমাদের দেখ্‌ব না? আর ব'ল্‌তে কি মা, বয়েসের কাল—বে হয়নি—মনটা একটু এদিক ওদিক টল্‌তে পারে, নইলে দিদিমণি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। নিজের বোন্‌টির মত ওকে আমি ভালবাসি। দেখি কি হয়,—বলে ক'য়ে বুঝিয়ে ওর মনটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'র্‌ব—যদি মনের কথাটা ধ'ত্তে পারি। তা তোমরাও শীগ্‌গির একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখ। আর ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার কথাও বলি। ওমা, কি সব্বনেশে লোক গা। গেরস্তর মেয়ে—না হয় একটু ব'য়েসই হ'য়েছে,—তা মুখপোড়া তুই কি বাইরের পথ চোকে দেখিস্ নে? যদি পাত্তুম মা, ঘাটের মড়ার মুখে নুড়োর আগুন জ্বেলে দিয়ে আসতুম।"

স্বর্ণময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। ঝি কহিল, "হাঁ, আর একটা কাজ ক'রো মা। দিদিমণিকে তুমি নিজে কিছু ব'লোনা,—ওতে কে জানে হয়ত উল্টো উৎপত্তি

হবে। আর কে জানে—হয়ত কিছুই নয়—মিছে কেবল মনে একটা নূতন কথা উঠে দেওয়াই হবে। কথায় বলে—'ওরে পাগলা শাক নাড়িস্ নে।' তা শীগ্‌গির ক'রে বিয়েটা দিয়ে ফেল, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"হুঁ—তা ঠিক বটে। আচ্ছা, তাই করা যাবে। তবে তুইও একটু চোক্ রাখবি, জানলি।"

"তা আর ব'ল্‌তে হবে কেন মা?"

ঝি তার কাজে চলিয়া গেল। স্বর্ণময়ী কতক্ষণ নীরবে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তারপর গভীর একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হাতের কাজে আবার হাত দিলেন।

রাত্রিতে স্বর্ণময়ী স্বামীকে সব কথা বলিলেন। মহীন্দ্রবাবুও বড় ভীত—উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন,—খুব ভাল না পান, চলন সই গোছের একটি পাত্র খুঁজিয়া অতি শীঘ্রই কন্যার বিবাহ দিবেন! টাকা যা লাগে, অন্য উপায়ে না পারুন—স্ত্রী গায়ে গহনা ত কিছু আছে—তাই বেচিয়াই না হয় সংগ্রহ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

অপরাধী।

তোমার সাথে হয় গো পাছে পথের মাঝে চোখোচোখি
তাইতে আমি পাশ কাটিয়ে যাই।
গলি ঘুঁজি মধ্যে শুধু করে বেড়াই লুকোলোকি
সদর পথে যাবার সাহস নাই।

আঁধারে তাই গা ঢাকা দেই তাইতে আঁধার ভালবাসি
আলোকে তাই শিউরে উঠি ডরি'
তপন উজল আঁখি তোমার বিপুল তব তেজোরাশি
চাইতে গেলে ঝলসে' আমি মরি।

ভাবছি আমি দিচ্ছি ফাঁকি কাহার কাছে, হরি হরি,
বাড়াই শুধু কোপানলের ঋণ।
নিজের ব্যাপার দেখে দেখে নিজেই আমি হেসে মরি
এমন করে চলবে কত দিন?

দৃষ্টি তোমার বজ্রশিখা ঘুরছে সারা ধরাময়
আড়াল গুহা গোপন ঘন বনে
তীরে বিঁধা পাখী যেমন নীড়েও ফিরে মরে রয়
উপায় কোথা আছে পলায়নে?

বিরাট সভা ডেকে তুমি লক্ষ কোটি নয়ন পরে
যথায় কোটী চন্দ্র তপন জ্বলে
সকল গ্লানি সকল কলুষ দেখাইবে নগ্ন করে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে'?

শ্রীকালিদাস রায়

মাদুরা।

সে বৎসর বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে আমাকে দাক্ষিণাত্যের ত্রিচিনপল্লী সহরে কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। ত্রিচিনপল্লী হইতে মাদুরা খুব বেশী দূর নহে। সমস্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ঘুরিবার মতলব করিয়াই আমি বাহির হইয়াছিলাম। ত্রিচিনপল্লী হইতে মাদুরা, টিন্নেভেলি, টুটিকোরিন এবং রামেশ্বরে যাইবার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিল। 'রথ দেখা ও কলাবেচা' কোন দিকেই আমার কম নজর ছিল না। দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান সহরগুলি প্রায় সমস্তই প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শনে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ 'এন্‌সেণ্ট হিন্দু আর্কিটেক্‌চার' বলিতে

প্রধানতঃ দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যশিল্পকেই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য পৃথিবীর সকল প্রদেশ হইতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পর্য্যটকেরা মদ্রদেশে আসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তিবহুল মদ্রদেশেও মাদুরা অতুলনীয়। এমন কি তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনপল্লীও এ বিষয়ে ইহার সমকক্ষ নহে। ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ মনিষী লিখিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া যে পর্য্যটক মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির দেখেন নাই,মানবের শিল্পপ্রচেষ্টা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য বহুদিন হইতেই মাদুরা দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছিল। এইবারে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ মনে করিলাম।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন একজন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, অঘটন-ঘটন-পটিয়ান্ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। ইনি অশুদ্ধ, অর্দ্ধশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অজস্র কথা বলিতে পারেন। ইনি নগ্নপদে বা 'চপ্পল'চরণে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিতেও ক্লান্তি বোধ করেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ইনি সকারণে বা অকারণে তামিল ভাষায় হাসিতে পারেন, টেলিগু ভাষায় কাঁদিতে পারেন, ইহা আমি জানি। কেনারী ভাষায় কাশিতে পারেন কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। ইনি সত্যমিথ্যার প্রভেদ সীমা অতিক্রম করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন। ইনি সব জানেন, কেননা যে কোন বিষয়ের প্রশ্নেরই একটা সরাসরি জবাব দিতে ইনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। কোন বিশেষ ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইঁহার চতুরতার প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে এবং দেবতার নিগ্রহে, আমি ইঁহাকে সহচর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চাটুভাষায় এমন আশ্চর্য্য দোরস্ত লোক আমি জীবনে দেখি নাই। কিন্তু লোকটি প্রভুভক্ত—যদিও জীবনে তিনি বহু প্রভুর সেবা করিয়াছেন। স্বার্থোদ্ধারের জন্য তিনি আমাহেন দীনহীনকে তাঁহার পরিচিত সমাজে একেবারে ম্যাটসিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বহুস্থানে আমার সম্মানের জন্য তাঁহার বন্ধুরা ভোজ এবং সান্ধ্যসম্মিতির আয়োজন করিয়াছেন। যদিও শেষে জানিতে পারিয়াছিলাম যে ঐ সকলের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিতেন। আমার সম্বন্ধে ইঁহার অতিবাদে শিক্ষিত সমাজে আমাকে বহুবার লজ্জায় অবনতমস্তক হইতে হইয়াছে। কিন্তু এত উপদ্রব সত্ত্বেও এই স্কন্ধগত শনিগ্রহকে আমার এড়াইবার উপায় ছিল না। ইনি আমার কোন হুকুমই অমান্য করিতেন না। আমার মনে হয় যে, আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিলেও ইনি আমার খাতিরে একবার চেষ্টা করিতে ছাড়িতেন না। এহেন সঙ্গীরত্নকে লইয়া আমি মাদুরা যাত্রার আয়োজন করিলাম। কিন্তু সময়কালে কোন বিশেষ ঠেকা বশতঃ তিনি আমার সঙ্গ লইতে পারিলেন না। আমি একাই চলিলাম। ইনি পরদিন মাদুরায় আমার সহিত মিলিত হইবেন, এইরূপ কথা থাকিল। পথে ডিণ্ডিগালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কেল্লা এবং কোডাইকেনাল রোড, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বিশাল শৈলমালা ব্যতীত দেখিবার মতন আর কিছুই চক্ষে পড়িল না। কোডাইকেনাল এবং উতকামন্দ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দার্জ্জিলিং এবং সিমলা। চলিত-ভাষায় কোডাইকেনাল 'কোডি' এবং উতকামন্দ 'উটি' নামে অভিহিত হয়। কোডাইকেনাল রোড ষ্টেশন হইতে মোটরে চড়িয়া 'কোডি' যাইতে হয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার, ঠিক আমাদের হিমালয় প্রদেশের মতন। ডিণ্ডিগালের পার্ব্বত্য কলা অতি উপাদেয় ফল। কলাগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের চাঁপা কলার মতন। কিন্তু স্বাদ অতি চমৎকার। এই কলা যেমন পুষ্টিকর, তেমনি সহজপাচ্য। শুনিয়াছি খুব বেশী জ্বরের মধ্যেও রোগীকে এই কলা পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে যেমন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে মিহিদানা এবং সীতাভোগ, যশোর ষ্টেশনে সরপুরে এবং গরভাজা, পয়সা থাকিলে যাত্রিমাত্রেরই খাবার নিয়ম আছে, ওদেশে ডিণ্ডিনাল ষ্টেশনের 'হিল্‌প্লান্টেন্' সম্বন্ধেও তাই। সুতরাং বলাবাহুল্য যে আমিও সে নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই। দাক্ষিণাত্যের রেলপথে বাঙ্গালীযাত্রীর খাদ্যবস্তুর বড়ই অভাব। সে দেশে ক্ষীর বা ছানার কোন খাদ্যই মেলে না। কেবল নানাজাতীয় ঝালফুলুরি আর কদাচিৎ কিছু কিছু ফল পাওয়া যায় মাত্র। মিষ্ট যাহা পাওয়া যায় তাহা আমাদের মুখে রোচে না।

মাদুরা ষ্টেশনে পৌছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। ষ্টেশনটি বেশ বড় এবং সুগঠিত। আমি ট্রেন হইতে নামিবার পূর্ব্বেই এযুগের নিয়মানুযায়ী এক পুলিসপ্রভু আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন; খবর যে আগেই
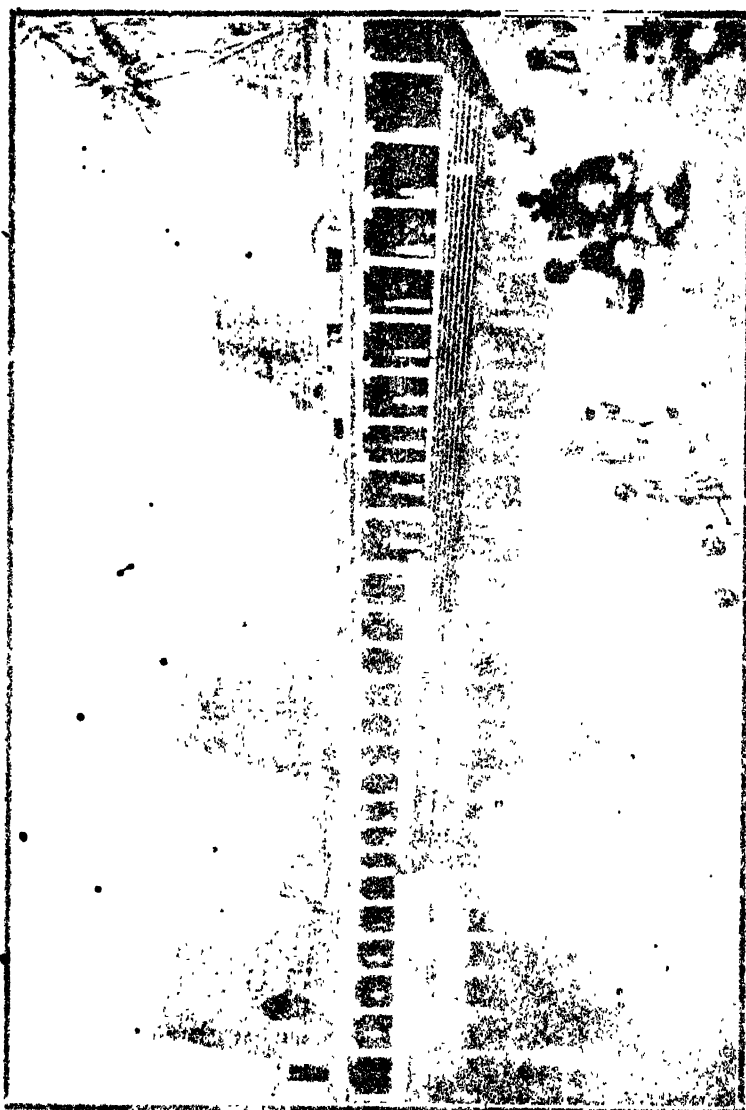
পৌঁছিয়াছে তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ষ্টেশনের নিকটেই অঙ্গমাল চৌলৃট্রি নামে একটি যাত্রীনিবাস আছে। আমি সেখানে যাইয়া দোতলায় একটি সুন্দর ঘর বাছিয়া লইলাম। উহার ভাড়া দিন ছয় আনা হিসাবে দিতে হইত। একজন অতি সদালাপী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ উক্ত যাত্রিনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমাকে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আমার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বন্দোবস্তের ভার তিনি গ্রহণ করায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি শুব্রামানিয়া নামক কষ্টি পাথরের ন্যায় কাল, মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী এক দ্বাদশবর্ষীয় বালককে আমার বাহনরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে ছেলেটা তামিলছাড়া আর কোন ভাষাই জানে না। সুতরাং তার সঙ্গে কথা বলিতে আমি বাক্‌যন্ত্রের ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কেবল ইসারা এবং ইঙ্গিতেরই সাহায্যে যতদূর সম্ভব কাজ আদায় করিয়া লইতাম। প্রয়োজনীয় কতকগুলি বস্তুর তামিল নাম নোট বহিতে লিখিয়া লইলাম। ঐ শব্দগুলির সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী এবং মুখভঙ্গী মিশাইয়া তাহাকে আমার প্রয়োজন বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। ছেলেটা ছিল বুদ্ধিমান, যতক্ষণ সে আমার মনের ভাব না বুঝিত, ততক্ষণ সে কৌতূহলের হাসি হাসিত। তখন তার উজ্জ্বল চক্ষুদুটি আমার দিকে চাহিয়া যেন জ্বলিতে থাকিত। শেষে যখন সে আমাকে বুঝিতে পারিত, অমনি আনন্দে করতালি দিয়া আজ্ঞাপালন করিতে ছুটিয়া যাইত। দিন রাত্রি সে ছায়ার মতন আমার অনুসরণ করিত। বাহন মিলল বটে, কিন্তু আহারের ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইল। মান্দ্রাজের আহার অতি অদ্ভুত। রান্নার প্রধান মসলাই লঙ্কা এবং তেঁতুল। সে মাছই কি, আর মাংসই কি, সব একাকার। সে কি ঝাল! আমি পূর্ব্ববাঙ্গলার লোক হইয়াও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছি। ও দেশের ব্রাহ্মণেরা আমিষ স্পর্শ করেন না। কাজেই হোটেল প্রভৃতিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা নিরামিষ। কিন্তু সে নিরামিষের অর্থ লঙ্কা আর তেঁতুলের ঘোলায় ডাল সিদ্ধ করা। আর তরকারী যা কিছু, তাও ঐ একই পদ্ধতির। কেবল "পিপার ওয়াটার" ব'লে ডা'লের উপরের জল-টার সঙ্গে কি এক জাতীয় সুগন্ধি পাতা মিশাইয়া একপ্রকার সুপ্‌ তৈরি করা হয়, সেটা নেহাৎ অখাদ্য নয়। এ ছাড়া "বাটার মিল্‌ক," অর্থাৎ আমরা যাহাকে বলি ঘোল, তাও কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘোল জিনিষটি দধিরই দুই-শততম ডাইলিউসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই 'পিপারওয়াটার' 'বাটারমিল্‌ক,' আর চাটি ভাত আসিত হোটেল থেকে, আর কিছু গরম দুধ আসিত গোয়ালের কাছ থেকে, তাই দিয়াই দুবেলা আমাকে শরীর রক্ষা করিতে হইত। পরদিন যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইয়া সঙ্গীরত্নের আশায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত আইয়ার, কত আইয়েঙ্গার, কত নাইড়ু কত মুদলিয়ার কত চেট্টি গাড়ী হইতে নামিলেন, কিন্তু আমার কৃষ্ণস্বামী আইয়ার নামিলেন না। আমি নিরাশ হইয়া যাত্রিনিবাসে ফিরিয়া আসিলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন এইরূপ নিরাশ হইয়া আমি গরম হইয়া উঠিলাম এবং মিষ্টার আইয়ারকে এক জরুর টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলাম যে এই তার পাইয়াও যদি তিনি আসিতে বিলম্ব করেন ত কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া আমি তাঁহাকে বরতরফ করিব। সেদিন আর ষ্টেশনে গেলাম না। মুখভার করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম। যথাসময়ে শিখাতিলকধারী, মুণ্ডিতশীর্ষ, চপ্পরচরণ, মসীবিনিন্দিতবর্ণ, রক্তচক্ষু, আইয়ারপুঙ্গব আসিয়া আমার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িলেন এবং "Mr. Sen save me" অর্থাৎ "সেন মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে আমি বুঝি সত্যসত্যই তাঁহার বিরুদ্ধে হেড আপিসে রিপোর্ট দিয়াছি। যাহা হউক আমি অভয় দিতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। এখন আর তাঁকে পায় কে? তিনি সহরে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে বাঙ্গলা হইতে একজন দিগ্‌বিজয়ী বক্তা মাদুরায় শুভাগমন করিয়াছেন। পরদিন সকাল বেলায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পূর্ব্ব হইতেই সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। আমি এই অচিন্তিতপূর্ব্ব মুস্কিলে পড়িয়া মনে মনে হায় হায় করিতে লাগিলাম। কাজকর্ম্ম, সহর দেখা সব চুলোয় গেল। দিন রাত্রি কেবল শুষ্ক রাজনীতি আর সমাজনীতির আলোচনা করিয়া একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিলাম। আমার আস্‌বাবের মধ্যে ছিল মাত্র একখানি বিছানা। আগন্তুকদিগকে তাহার উপরেই বসিতে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু তাঁরা বিছানায় না বসিয়া মাটিতেই বসিতেন। মান্দ্রাজে ইহাই

রীতি। তখন মান্দ্রাজীরা বাঙ্গলাকে তীর্থ এবং বাঙ্গালীকে মন্ত্রগুরু বলিয়া মনে করিতেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতাম। কিন্তু সে গর্ব্ব আজ কোথায়! দলে দলে লোক আসিতেন, কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা ১টা বাজিয়া যাইত আমরাও তারপরে স্নানাহার করিয়া একটু বিশ্রামান্তে পুনরায় মজলিস্ করিয়া বসিতাম। রাত্রি ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিত। এইভাবে দুই তিন দিন গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কৃষ্ণস্বামী, কি মন্ত্রে জানি না, একেবারে রামনাদের সুপ্রসিদ্ধ সেতুপতি মহারাজকে ভুলাইয়া লইয়া যাত্রিনিবাসে হাজির। আমার শিরে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সসম্ভ্রমে, অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি অপেক্ষা করিলেন না, কেবল আমাকে শোনাইয়া গেলেন যে সেইদিন অপরাহ্ণে মাদুরা সঙ্গীত সমাজের বার্ষিক উৎসব হইবে, আর আমাকে সেই উৎসব-সভায় 'হিন্দু মিউজিক' বিষয়ে বক্তৃতা করিতেই হইবে। হরি হরি! কৃষ্ণস্বামী এইবার আমাকে একেবারেই মজাইলেন। ভাবিতে লাগিলাম দুনিয়ার এত লোক মরিতেছে, কৃষ্ণস্বামী কেন পূর্ব্বদিন মরিল না। প্রথমতঃ আমি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে বিশেষ অভ্যস্ত নহি, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতকলায় আমার জ্ঞান এবং অধিকার যৎসামান্য, তৃতীয়তঃ সময় এত সঙ্কীর্ণ যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করিবারও অবসর নাই, চতুর্থতঃ মান্দ্রাজে আসিয়া সেতুপতির অনুরোধ কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। কাজেই আমার মনে হইতেছিল যেন রাজদ্বারে আমার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, আমাকে মরিতেই হইবে। সুতরাং সাহসে বুক বাঁধিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই বিধেয়।

অপরাহ্ণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার জন্য গাড়ী আসিল আমি আমার সেই স্কন্ধগত শনিকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেতুপতি হাইস্কুলে সভার আয়োজন হইয়াছিল এবং সেতুপতি মহারাজ স্বয়ং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বহু কালোয়াত সেদিনের সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। আর আমি তার মাঝখানে ঠিক 'হংসমধ্যে বকো যথা' রূপে যাইয়া হাজির হইলাম। যথাবিধি সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আমি যূপকাষ্ঠ-সম্বদ্ধ জীববিশেষের ন্যায় মনে মনে কাঁপিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার ডাক পড়িল। আমিও ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেই বৎসর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মানের সীমা নাই। সুতরাং উঠিবামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে সকলে আমাকে অভিনন্দিত করিলেন। এইবারে আমার inspiration আসিল। আমি অনুপ্রাণিত হইলাম। হঠাৎ মনে পড়িল কান্ত-কবির সেই গান—

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে—
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী, শুভ্র কমলাসীনা,
রোধি তটিনী জলপ্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।
যেথা আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরি গুণ গান নারদ,
মন্ত্রমুগধ করিত জগৎ,
টলাইত ভগবান্।
যেথা যোগীশ্বর পুণ্য পরশে,
মূর্ত্তরাগ উদিল হরষে,
মুগধ কমলাকান্ত চরণে,
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা বৃন্দাবন কেলিকুঞ্জে,
মুরলী রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আরকি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আরকি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আরকি আছে সে প্রাণ।

অমনি হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আমি প্রথমে গানটী আবৃত্তি করিলাম। উহার ছন্দে তালে এবং ঝঙ্কারে অনেকেই মুগ্ধ হইলেন বলিয়া বোধ হইল। নিভাজ সংস্কৃত শব্দগুলির একটু অর্থাভাসের অতিরিক্ত কেহই কিছু বুঝিলেন না। কিন্তু আমি যখন উহার ইংরাজী অনুবাদ সভাকে শুনাইয়া দিলাম, তখন বহুলোক গীতটি আর একবার বাঙ্গালায় আবৃত্তি করি-

বার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমার এই বারের আবৃত্তি আগের চেয়ে অনেক ভাল হইল এবং আবৃত্তির তালে তালে সভাস্থ বহু লোক অঙ্গ দোলাইতে লাগিলেন। বঙ্গভাষার শব্দমাধুর্য্যের মহিমা সেদিন যেমন বুঝিয়াছিলাম, তেমন আর এজীবনে কখনও বুঝি নাই। আরও একবার আমাকে গানটির অনুবাদ সভাকে শুনাইতে হইল। আমাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না, কারণ সভায় অনেকেই তামিলাক্ষরে গানটি অবিকল লিখিয়া লইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্বর্গীয় কান্ত-কবির প্রতিভা এবং পুণ্যবলে আমি "হিন্দু মিউজিকের" যূপ-কাষ্ঠ হইতে সেদিনের মত প্রাণ বাঁচাইয়া ঘরে ফিরিলাম। পরদিন আর Iyerকে বিশেষ করিয়া ধমকাইয়া বলিয়া দিলাম যে আর যদি তিনি আমার কথা লইয়া বাহিরে সোর-গোল করেন ত তাঁহাকে—তজ্জন্য অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষতি যাহা হইবার তাহা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছিল, এবং যে ১৫।২০ দিন আমি মাদুরায় ছিলাম, তার একটি দিনও আমি বাগ্‌যন্ত্রকে অতিমাত্রায় ক্লান্ত না করিয়া নিস্তার পাই নাই। সহরের বহু শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় একটা বিশেষ লাভ হইয়াছিল এই যে মাদুরা সম্বন্ধে প্রাচীন এবং আধুনিক জ্ঞাতব্য সকলই আমি তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম। মদুরা অতি প্রাচীন নগর। স্থলপুরাণের সাক্ষ্য মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, রামাবতারের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও মাদুরা হিন্দুরাজা-দিগের রাজধানী ছিল। তখন ইহার নাম ছিল মধুরাপুরী। পুরাণমতে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাভিযানকালে রাজা অনন্ত-গুণ পাণ্ড্য মধুরাপুরীর অধিপতি ছিলেন। কিম্বদন্তী এই যে অনন্তগুণের একাদশ পুরুষ পূর্ব্বে মহারাজ কুলশেখর পাণ্ড্য কর্ত্তৃক মধুরাপুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থলপুরাণে এই বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। কোন কালে দেবরাজ ইন্দ্র খেয়ালবশে ত্রিশিরা এবং বৃত্র নামক দুই ব্রাহ্মণপুত্রকে নিহত করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ অর্জ্জন করেন। পাপমুক্তির জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহাকে পৃথিবীর সকল তীর্থ দর্শনের উপদেশ দেন। তদনুসারে ইন্দ্র তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া অবশেষে কদম্ববন বা আধুনিক মাদুরায় উপনীত হন। এই কদম্ববনেই শচীপতি অনাদিসুন্দরলিঙ্গের দর্শন পাইয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যুগযুগান্ত পরে সুন্দরলিঙ্গ ঋষিরূপ ধারণ করিয়া কদম্ববনের নিকটবর্ত্তী কল্যানপুরের রাজা কুলশেখরকে কদম্ববনে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে কুলশেখরকর্ত্তৃক এই পরম রমণীয় নগর এবং সুন্দরলিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরলিঙ্গ নবনির্ম্মিত নগরের উপরে মধু অর্থাৎ অমৃত বর্ষণ করেন। ইহা হইতেই মধুরা নামের জন্ম।

মতান্তরে মাদুরা, মথুরার অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কারণ ইহাকে অনেকে দক্ষিণ মথুরা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে যদুবংশীয় কোন রাজা দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া দ্বিতীয় মথুরা নামে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মথুরা হইতেই মধুরা এবং ক্রমে মাদুরা নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

পৌরাণিক কাহিনী ছাড়িয়া দিলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতা-ব্দীর শেষ ভাগ হইতে মাদুরায় পাণ্ড্যবংশীয়দিগের প্রভুত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। মিষ্টার নেল্‌সন্ তাঁহার মাদুরা গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে ১১০০ সালেই সর্ব্বপ্রথম মাদুরায় পাণ্ড্য-প্রভুত্ব তিরোহিত হয় এবং মুসলমানের আধি-পত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই মুসলমান প্রভাব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। ১৩১৪ সালে—মালেক কাফুর, শেষ রাজা প্রক্রম পাণ্ড্যকে পরাভূত করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করেন এবং মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের অধিষ্ঠানমন্দির ব্যতীত আর সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। মুসলমানের পরে মহীশুরের সেনাপতি কম্পলা উদেয়ার এবং তাঁহার বংশধরগণ ১৪৫১ সাল পর্য্যন্ত মাদুরার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তারপরে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী কাল মাদুরার সিংহাসন লইয়া অজস্র কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল। শেষে ১৫১০ সালে ইহা সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উক্ত রাজ্যের হিন্দু সেনাপতি নায়কদিগের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে।

১৫৫৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পতন হয় এবং ১৫৫৯ সালে নায়কেরা মাদুরায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের মহারাজ তিরুমল নায়ক—দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি ১৬২৩ হইতে ১৬৫৯ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আধুনিক মাদুরায় বিশ্ব-বিস্ময়কর স্থাপত্য গৌরব সমস্তই এই নায়ক শিরোমণির অবদান-চিহ্ন। ১৭৩৬ সালে মাদুরা কর্ণাটের চাঁদসাহেবের হস্তগত হয়। পরে চাঁদ সাহেবের হাত হইতে

ইংরাজ রাজ ইহা কাড়িয়া লন। যুগযুগান্তব্যাপী এত টানাটানি, এত কাড়াকাড়ি, এত ভাঙ্গাগড়া, এত উপদ্রব এবং অত্যাচার সহিয়াও মাদুরা আজও পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে! মাদুরায় দেখিবার বস্তু অনেক। তন্মধ্যে এমন জিনিষও আছে যাহা ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বহুদিন কাটিয়া যায়। মানবের হস্ত, শিল্পের সাধনায় এমন অদ্ভুত অধ্যবসায় পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখাইয়াছে কিনা জানি না। একদিকে চেষ্টার বিরাটত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, অন্যদিকে সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য্যে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কি অস্ত্রে কাটিয়া কি যন্ত্রের সাহায্যে এমন প্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ডগুলিকে বহুদূর হইতে বহিয়া আনিয়া এমন স্তরে স্তরে সাজান হইয়াছিল, কি মসলার সাহায্যে কালজয়ী অমোঘ বন্ধনে বাঁধা হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

মাদুরার প্রাচীন মন্দির খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সে মন্দিরের এখন কোন অস্তিত্ব নাই। বর্ত্তমান মীনাক্ষী মন্দির প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ-মান্যরাজশ্রী তিরুমল সেবারি আয়ালু গারু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পৃথিবীর ইহাই শ্রেষ্ঠতম মন্দির বলিয়া প্রখ্যাত। এই বিশাল মন্দির প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে মীনাক্ষী দেবী এবং অপরাংশে সুন্দরেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত। এই যুক্ত মন্দিরের বিস্তার বহুদূরব্যাপী। সমস্তটা মিলাইয়া বাঙ্গলার একখানি গ্রামের সমান হইবে। শ্রীরঙ্গমের সপ্তপ্রাচীর বেষ্টিত, ছাব্বিশ সহস্র নরনারীর বাসভূমি, সুবিস্তৃত—শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরও এই মন্দিরের অপেক্ষা ছোট। নেল্‌সন্ সাহেব তাঁহার মাদুরা গেজেটিয়রে, স্থলপুরাণ হইতে এই মীনাক্ষী এবং সুন্দরেশ্বর বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুরাপুরীর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কুলশেখরের পুত্র মলয়ধ্বজের প্রধানা মহিষী কাঞ্চনমালা বন্ধ্যা ছিলেন। মহারাজ মলয়ধ্বজ পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিয়া সস্ত্রীক শোকনাথম্ দেবের মন্দিরে—পুত্র বাঞ্ছা করিয়া ধন্না দেন। শোকনাথম্ দেবের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি মাদুরায় বিদ্যমান আছে। এই যজ্ঞ এবং ধন্নার ফলে রাজদম্পতি মীনাক্ষীকে কন্যারূপে লাভ করেন। ইহার অন্য নাম ছিল তথাথকৈ। মীনাক্ষীর রূপের সীমা ছিল না। এই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার আবির্ভাবে রাজপুরীর সকলেই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু নবজাতা বালিকাটিকে ত্রিস্তনী দেখিয়া তাহার পিতামাতার আনন্দালোকে একটু বিষাদ কালিমা মাখিয়া গেল। পরে দৈববাণী হইল যে, স্বামী সন্দর্শন মাত্র মীনাক্ষীর তৃতীয় স্তন বিশুষ্ক হইবে। বয়স্থা হইয়া মীনাক্ষী তাঁহার বিষন্ন পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনারা ক্ষুব্ধ হইবেন না। নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বর এইরূপ অস্বাভাবিক অঙ্গ দিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি সেই বিশ্বাসেই সঙ্কল্প করিয়াছি যে ব্যক্তি আমাকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিব।" কন্যার এই পণের কথা রাজা পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিলেন। নানাদিক্ দেশ হইতে বীর রাজন্যবর্গ মধুরা-রাজাত্মজার এই সমরাহ্বানে উপস্থিত হইয়া একে একে পরাজিত হইতে লাগিলেন। বালিকার রণপাণ্ডিত্যে দর্শকজনের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখনও কেহ জানিতনা যে স্বয়ং ভবানী শাপবশে মীনাক্ষীরূপে মধুরাপুরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবশেষে ভগবান সুন্দর সিদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হইয়া মীনাক্ষী দেবীকে রণে আহ্বান করিলেন। প্রথম দুই বারের আক্রমণে সেই শক্তিরূপিণীরই জয় হইল। কিন্তু তৃতীয়বারে উভয়ের চারি চক্ষু মিলিত হওয়ামাত্র মীনাক্ষীর তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হইল এবং তিনি পরাস্ত হইলেন। সুতরাং এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিলনা যে এইবারে মীনাক্ষীর স্বামী স্বয়ং আসিয়াছেন। মহাসমারোহে সুন্দরেশ্বরের সহিত মীনাক্ষীদেবীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। অপুত্রক পিতার মৃত্যুর পরে মীনাক্ষীদেবীই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং স্বামী সুন্দরেশ্বর অভিভাবক রূপে রাজ্য পালনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল রাজৈশ্বর্য্য সম্ভোগের পরে, তাঁহারা উভয়ে স্বধাম কৈলাশপুরে মহাপ্রস্থান করেন। মাদুরার মন্দিরে আজও তাঁহারা পার্ব্বতীপরমেশ্বর রূপে কোটী ভক্তের পূজা পাইতেছেন। মীনাক্ষী মধুরার রাণী ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূজাই আগে হইয়া থাকে। স্বামী সুন্দরেশ্বরের পূজা পরে হয়।

মন্দির দর্শনকালে যিনি আমার প্রদর্শক (guide) ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে দেবী ভগবতীর মীনাক্ষী নাম কেন হইল? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

যে মৎস্তজননী যেমন তার স্নেহসিক্ত প্রশান্ত চক্ষে তার লক্ষ সন্তানের দিকে চাহিয়া থাকে, বিশ্বধাত্রী ও ঠিক সেই রূপেই বিশ্বের কোটিজীবের দিকে দিনরাত্রি চাহিয়া রহিয়াছেন। তাই তাঁর এক নাম মীনাক্ষী। কি সুন্দর! মন্দিরের মধ্যে একস্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর নারী মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রদর্শক আমাকে বলিয়াছিলেন, যে উক্ত মূর্ত্তিতে শিল্পী মীনাক্ষীর ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন: বাস্তবিক সে কি মূর্ত্তি! কি সুন্দর তার চক্ষুদ্বয়! যেন স্নেহকরুণার নির্ঝর তাহা হইতে অজস্র উৎসারিত হইতেছে। মাতৃভাবের মহিমায় পাষাণের কঠোরতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যত চাহিয়া দেখা যায়, ততই তাহাকে নবনীত-সুকোমল বলিয়া মনে হইতে থাকে। র‍্যাফেল ম্যাডোনা রচিয়াছিলেন চিত্রে, হিন্দু ভাস্কর রচিয়া গিয়াছেন পাষাণে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ঊর্ম্মিলা।

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "কাব্যের উপেক্ষিতা" পাঠে)

হে মুনে, নিপুণ করে ধরি বীণাখানি,
না জানি কি সকরুণ তুলিয়া ঝঙ্কার,
সৃজিলে অমিয়মাখা নাম ঊর্ম্মিলার;
পুলকে তমসাতটে কাঁপিল বনানী।

স্মরণে আজিও প্রাণে জাগে নিশিদিন,
কে বালা সরমনতা রুচির আননা,
চকিতা কুরঙ্গী হেন করুণ নয়না,
গুপ্ত অশ্রুজলে কার হাসিটি মলিন।

রঘুকুললক্ষ্মী তুমি, রাজর্ষিনন্দিনী,
সুমিত্রা নন্দন জয়া, তবু চিরদিন
জানকী চরণতলে জ্যোছনা বিলীন
তারাসম জ্যোতিহারা কেন বিষাদিনী?

হায় কবি! মানি মোরা বিকচ কমল
পরিপূর্ণ সুষমায় উজলে কানন;
অস্ফুট মল্লিকা কভু নহে কি শোভন
পার্শ্বে তার? অনাদৃত তার পরিমল?

অয়ি শুভে! তোমা লাগি বিষণ্ন সকলি।
প্রশান্ত সাগর ক্ষুব্ধ তোমারে স্মরিয়া,
তোমারি করুণ গীতি হৃদয়ে বহিয়া
ব্যথিতা সরযূনদী উঠিছে উথলি।

যেই মৌন সন্ন্যাসীর ব্যর্থ অভিসারে
প্রেমাশ্রু নির্ম্মাল্যখানি রচিলে উন্মনা;
নিখিল হৃদয়মাঝে আজিও কল্পনা
খুঁজি ফিরে ভ্রাতৃভক্ত সেই দেবতারে।

কাব্যের চন্দনছায়া-বিচ্যুত লতিকা
উপেক্ষা অনলে কি গো পড়িবে লুটায়ে?
নহে নহে—কবিকুল রেখেছে সাজায়ে
সমবেদনার অশ্রু চর্চ্চিত বেদিকা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

অনুকম্পা।

রমানাথ কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও সাহেবের আফিসে চাকরী করিবার মত বিদ্যাটুকুও লাভ করিতে পারে নাই। বাগ্দেবীর নির্ব্বন্ধ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা বটে, কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হইতে কোন বঙ্গসন্তানের মুক্তি নাই। কাজেই রমানাথ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মন দিল। দু চারটা পাটের কলে পর পর কাজ করিয়া দেখিল তাঁহার ধাতে

চাকরীর আরাম এবং সৌভাগ্য সহ্য হইতেছে না। শেষে রমানাথ যৎসামান্য পুঁজি লইয়া বড় রাস্তার ধারে বাজারের মধ্যে একটা ছোট পানবিড়ির দোকান খুলিয়া বসিল। জায়গাটা ব্যবসায়ের পক্ষে মন্দ ছিল না। দেখিতে দেখিতে খরিদ্দারও মন্দ জুটিতে লাগিল না। ক্রমে একটু গরম চা ও ঠাণ্ডা সরবতের ব্যবস্থাও রমানাথ করিল। Tea Cess Company-র ওখান হইতে অনেক রকম চায়ের মহিমাকীর্ত্তন-যুক্ত ছবি আনিয়া দোকানে ঝুলাইল সকালে সন্ধ্যায় কলের গান ও হারমোনিয়ম চলিতে লাগিল। বন্ধু বান্ধবেরা বলিল, "রমানাথ বেশ করেছে। ২৫।৩০ টাকার জন্য উদয়াস্ত পরের দাসত্ব করার চেয়ে এ ঢের ভাল। মাস গেলে খরচ খরচা বাদে চল্লিশটা টাকা ওর থাকে।"

সহরে একটা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের বাটী পরবর্ত্তী রেলষ্টেশনের নিকটে কোন গ্রামে। প্রত্যহ দশটার সময় স্কুলে আসেন ও বৈকালে বাড়ী চলিয়া যান। পণ্ডিতমহাশয় প্রত্যহ যাতায়াতের পথে রমানাথের দোকানে একটু বিশ্রাম করেন। তিনি অবশ্য চা কিম্বা সরবত কিছুই গ্রহণ করেন না; তবে রমানাথ নাকি নিকষ কুলীনের ছেলে এবং পণ্ডিত মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিত, তাই। রমানাথ নিজে হাতে ঘটি মাজিয়া গঙ্গাজল আনিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে হাত মুখ ধুইতে দিত, "নৃপতি" ডাব (নেয়াপাতি নাকি "নৃপতির" অপভ্রংশ, যথা নেয়াপাতি ভুঁড়ি অর্থাৎ নৃপতির মত ভুঁড়ি। অবশ্য পণ্ডিত মহাশয়ের মতে) স্বহস্তে কাটিয়া দিত এবং গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া পাণ সাজিয়া দিত। স্কুলের দুষ্ট ছেলেরা বলিত, রমানাথ নাকি কবিরাজী নস্যও রাখিত।

একদিন বৈকালবেলা পণ্ডিত মহাশয় রমানাথের দোকানে বসিয়া আছেন, এমন সময় বুঝিলেন পশ্চাৎ দিক হইতে কে যেন তাঁহার উত্তরীয়ের প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। চাহিয়া দেখেন, একটি ছাগ শিশু তাঁহার উত্তরীয়ের এক প্রান্ত মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পরমানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে। যুদ্ধের বাজারে, এই দারুণ বস্ত্র-দুর্ম্মূল্যতার দিনে ছাগশিশুকে দিয়া উত্তরীয় ভক্ষণ করানটা তিনি পছন্দ করিলেন না। উড়ানিখানি টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রমানাথ, এ পাঁঠা কার?" রমানাথ কহিল "আজ্ঞে, আমার।" "পাঁঠা পুষেছ কেন?" "আজ্ঞে মা কালীর কাছে মানত আছে। আমার বুড় ব্যায়রাম হয়েছিল, তাই মা কালীর কাছে মানত করেছিলেন, প্রতিমা গড়িয়ে পূজা করবেন, আর পাঁঠা বলি দেবেন।" পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "রমানাথ, এমন কাজ কখনো করো না। পালন করে কি হত্যা করতে আছে? তাতে মহাপাপ।" একটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে স্বহস্ত-রোপিত বিষবৃক্ষকেও ছেদন করিতে নাই। তুমি এ পাঁঠা এখনি বিলাইয়া দাও কিংবা বিক্রয় করিয়া ফেল।" কথাটা রমানাথের সমস্তদিন ধরিয়া মনে হইতে লাগিল। তাই ত, পালন করিয়া কি হত্যা করিতে আছে! রাত্রে বাড়ী গিয়া সমস্ত কথা সে মাকে বলিল। মা শুনিয়া বলিলেন, "তাই কি হয় বাছা? মা কালীকে মানত করে যে পাঁঠা পুষেছ, তা ছাড়া কি অন্য পাঁঠা দিতে আছে? পণ্ডিতের একি ছিষ্টি ছাড়া বিধেন গা?" পরদিন হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের যাতায়াতের সময় রমানাথ পাঁঠাটাকে একটু আড়াল করিয়া রাখিত।

পূজার দিন রাত্রে রমানাথের গৃহে পদধূলি দিবার জন্য রমানাথ পণ্ডিত মহাশয়কে এমন জিদ্ করিয়া ধরিয়া বসিল যে পণ্ডিত মহাশয় সে প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ছোট একখানি দোচালার মধ্যে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ পূজোপকরণ সম্মুখে সাজাইয়া পুরোহিত মহাশয় পূজায় বসিয়াছেন; রমানাথের মাতা আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিতেছেন, আর রমানাথ একধারে বসিয়া প্রতিমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। সমুখে ছোট একটু উঠান চাঁছিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, এবং উপরে ছোট একখানি সামিয়ানা খাটান রহিয়াছে। এক পাশে খান দুই ঘুঁটে জ্বালাইয়া একটু আগুণ করিয়া ঢুলি ঢাক তাতাইতেছে ও ভাঙ্গা কাঁসীখানা চিৎ করিয়া ফেলিয়া কাঁসীদার বালক বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে। ক্রমে বলিদানের সময় উপস্থিত হইল। পাঁঠাটাকে স্নান করাইয়া পুরোহিতের সমুখে আনা হইল। পুরোহিত তাহার কাণে মন্ত্র এবং কপালে সিঁদুর দিয়া বলিলেন, "লইয়া যাও।" মায়ের দিকে চাহিয়া রমানাথ চঞ্চল মনটাকে অতি কষ্টে শান্ত করিয়া লইল। ভাবিল, একি দুর্ব্বলতা মনের, ছি! এমন সময়

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "রমানাথ, এই শাঁখ নিয়ে যাও, কামার কোপ মারবার আগে এর একটু জল পাঁঠার মুখে দিও।" রমানাথ কম্পিত হস্তে শাঁক লইয়া যূপ-কাষ্ঠের নিকট আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। যূপকাষ্ঠ ফেলিবার জন্য যে লোকটা পাঁঠাটাকে দুই হাঁটুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে দেখিল যূপকাষ্ঠ অত্যন্ত নড়িতেছে। কহিল "রমা, পাঁঠা ধর। আমি হাড়কাঠ ঠিক করি।" নিরুদ্দিষ্ট শিশুপুত্রকে ফিরিয়া পাইলে জননী যেমন আগ্রহে তাকে বুকে চাপিয়া ধরেন, তেমনি করিয়া রমানাথ পাঁঠাকে বুকে তুলিয়া লইল। শাঁখটা কখন হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে তার ঠিক নাই। কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "মটর।" মটরের তখন সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই পরিচিত স্নেহস্বর শুনিয়া 'মটরে'র লুপ্তপ্রায় চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে তাহার সমস্ত জীবনিশক্তিটুকু একাগ্র করিয়া ঘাড় তুলিয়া রমানাথের মুখের উপর তাহার পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিল। রমানাথ দেখিল, কি মর্ম্মভেদী করুণ সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যেন বলিতেছে, ওগো প্রভু, ওগো পালক, আমায় রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও। ওই দেখ যূপকাষ্ঠ, ওই দেখ শানিত খড়্গ, ওই দেখ জল্লাদ; এরা আমায় হত্যা করবে। ও কি! অমন করে চেয়ে আছ কেন? আমায় কি চিনতে পারছ না? তুমি যে আমায় কত ভাল বাসতে। তুমি যে মুখে তুলে ভাত খাওয়াতে, আদর করে চা খাওয়াতে, দিনে সহস্র কাজের মধ্যে সহস্রবার 'মটর' বলে ডেকে আমার সাড়া নিতে, রাতে দশবার শয্যাত্যাগ করে আমি কেমন আছি সন্ধান নিতে। এত আদর করেছিলে, এত ভালবেসেছিলে কি শেষে হত্যা করবে বলে? না, না— মানুষ তুমি, সৃষ্টির গৌরব তুমি, হিংস্র পশুতেও ত এমন কাজ করে না। ওগো প্রভু, ওগো পালক, ওগো পিতা, আমায় রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও। কে যেন রমানাথের হৃদপিণ্ডটা লৌহকঠিন মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল; মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলার মধ্যে দপ দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে রমানাথের একটি শিশু পুত্র ছয়বর্ষের হইয়া মারা গিয়াছিল। রমানাথের বিকৃত মস্তিষ্ক "মটরের" মুখে সেই মৃতপুত্রের মুখচ্ছবির সাদৃশ্য অনুভব করিল। মটরকে বুকে করিয়া এক লাফে প্রতিমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চিৎকার করিয়া বলিল, "আমি একে কখনও বলি দিতে দেব না।" একি ব্যাপার! পুরোহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কর কি রমানাথ, তুমি কি পাগল হলে না কি?" পণ্ডিত মহাশয় এক পাশে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাঁহার পায়ের গোড়ায় আছড়াইয়া পড়িয়া রমানাথ বলিল, "রক্ষা করুন, পণ্ডিত মশায়।" পণ্ডিত মহাশয় একেবারে উঠিয়া দাড়াইলেন, বলিলেন, "ভয় কি রমানাথ? অনুকল্প বিধান কি শাস্ত্রে নাই? আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি, মা এ বলি গ্রহণ করবেন না। তুমি অন্য বলি প্রদানের ব্যবস্থা কর। পুরোহিত মহাশয় যদি অসম্মত হন, আমি মায়ের পূজা সম্পূর্ণ করবো।" পুরোহিত দেখিলেন, বড় বেগতিক, সুতরাং তিনি অন্য কথা না কহিয়া ঘণ্টা নাড়ায় মন দিলেন। ঢাকীকে খুব জোরে বলিদানের বাজনা বাজাইতে বলিয়া রমানাথ একটা পাকা চালকুমড়ার গায়ে সিঁদুর মাখাইয়া মহানন্দে তাই নিজেই বলি দিল। ছাগমুণ্ড প্রাপ্তি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কামারটা ইতি মধ্যেই নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছিল। সে রাত্রে পাতে নিরামিষ মহাপ্রসাদ দেখিয়া নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেহ কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাদেবী যে প্রসন্নমুখে ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নন্দগোপাল।

[এই পদ্যটি একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির ভিতর দেখিতে পাই, ভনিতায় দেখা যায় ইহা জনৈক মুসলমান ভক্ত কবি ফকির হবির দ্বারা বিরচিত।]

"দেখ নাই অপরূপ নন্দ গোপাল।
কপালে চন্দন ফোঁটা, বিনোদ টালনি ঝোঁটা
গলে দোলে বকুল মাল ॥

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপম।
করেতে মোহন বেণু নির্ম্মল কোমল তনু
অতসি কুসুম জিনি শ্যাম ॥

কটিতে পীতাম্বর, দেখিতে মনোহর
মুকুন্দ মোহন যদু রায়।
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলে, সুনাদ মুরলীস্বরে
তিন লোক মোহিত যার॥

ফকির হবির বলে, কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মন করে হিয়া, কানুরে সমুখে থুইয়া
নিরবধি দেখহ সদায়॥

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব।

আমাদের দুর্গতি—উপায় কি?

গত আশ্বিন সংখ্যার মালঞ্চে আমাদের দুর্গতির কথা লিখিতে গিয়া বঙ্গরমণীর ভীষণ অধঃপতনের কথা কিছু বলিয়াছিলাম। বঙ্গনারীর ধর্ম্মে অনাস্থা স্বামিভক্তি হীনতা, বিলাসবাসনের আধিক্য প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের তখন উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু সব জিনিশেরই দুইটা দিক আছে। সত্য স্পষ্ট কথা বলিতে গিয়া, আমি নারী হইয়া, নারীর দোষ ও ত্রুটির কথা বেশ সহজ ভাবেই বলিয়া গিয়াছি। কিন্তু নারীর এই ত্রুটি ও অধঃপতনের জন্য দায়ী কি শুধু নারী জাতিই? যাঁহাদের উপর নারী জাতির নৈতিক উন্নতি নির্ভর করে, তাঁহারা কি, সর্ব্বাংশে না হউক আংশিক ভাবেও দায়ী নন? অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেই অভিজ্ঞতার ফলে, মনে হয় যে বাল্যিকাবয়সে সুশিক্ষার অভাবের সহিত বিবাহিত জীবনে স্বামীর নিকট সৎশিক্ষার অভাবও বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। এখনকার যুবকেরা, কিশোরী বা যুবতী স্ত্রীকে (কেননা বালিকা স্ত্রী এখন আর কাহারও দূরদৃষ্ট বা শুভাদৃষ্ট ক্রমে ঘটে না) সৎনীতি শিক্ষা দিতে যত্নবান হ'ন না। তাঁহারা বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায়, প্রেমের মদিরায় আত্মহারা হইয়া সদসৎ বিবেচনা হারাইয়া বসেন। যে স্ত্রী চিরজীবনের সঙ্গিনী, ধর্ম্মে কর্ম্মে সহকারিণী, মৃত্যুর পরেও যাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, তাহাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে না পারিলে সাংসারিক জীবন যাত্রা যে একটা বিরাট নিষ্ফলতা, ও সারা জীবনই যে অশান্তির আগার হইয়া উঠে, তাহা বোধ করি তাঁহারা মনে ধারণাও করিতে পারেন না। ক্ষণিক সুখ-মোহগ্রস্ত যুবক উক্ত সত্যটি উপস্থিত বুঝিতে না পারিলেও অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। ক্ষণিক মোহে তিনি স্বহস্তে যে বিষ বৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহার বিষময় ফল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়। হিন্দুর রীতি নীতি সকলই ধর্ম্মমূলক। সেই ধর্ম্মভাব দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়াতে, সকলই যেন খেলার মত হইতেছে। বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সময় সেই যে, "যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম" অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক"—এই মহৎভাব লইয়া শপথ করা হয়; কার্য্যে তাহার একবর্ণও প্রতিপালন করিতে কেহ চেষ্টা করেন না। কেহ কেহ এমনও আছেন, যে সে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ সারা জীবনেও বুঝিতে বা জানিতে ইচ্ছা করেন না। হিন্দু গৃহস্থ সংসারের কর্ত্তা বা অভিভাবক যিনি হন্, তাঁহার যেমন প্রত্যেক পরিজন ও প্রতিপাল্যকে সৎপথে ও সুশাসনে রাখা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রত্যেক স্বামীরও নিজ নিজ স্ত্রীকে সুশাসনের সহিত সৎপথে চালিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের স্বামীর কাছে যেরূপ শিক্ষা হয়, এরূপ আর বোধ করি কাহারও কাছে হয় না। কেননা প্রেমের সহিত যে সৎশিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই কালে সুফল প্রসব করে। অপরকে সুখী করিতে না পারিলে যে নিজে সুখী হওয়া যায় না, এই মহাজন বাক্য প্রত্যেক কার্য্যের সহিত ধীরভাবে বুঝাইয়া দিলে, বালিকাও তাহা ধারণা করিতে পারে। তবে শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে নিজেকেও শিক্ষিত করা আবশ্যক। আমি যাহা অপরকে শিক্ষা দিব, নিজে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিব, এরূপ লোকের কাছে কেহই শিক্ষালাভ করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মে, স্বামীর আসন কত উচ্চে, তাহা এখনকার প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন বা নবীনারা অনেকে জানেন না। স্বামী একাধারে বন্ধু,

সখা, ভর্ত্তা, ত্রাতা, গুরু, ইহজীবনে সুখশান্তিদাতা, পরলোকে ইষ্টদেবতা। জগদীশ্বরের পরেই স্বামীর স্থান। কিন্তু অধুনা সে ভাব দিন দিন লোপ পাইতেছে। তাহার কারণ, স্বামী হইয়া, গুরু হইয়া, তাঁহারা নিজের পদ, নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন না। প্রথম হইতে স্ত্রী যদি স্বামীর গুরুত্ব কিছু দেখিতে না পায়, তবে তাহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মিবে কেমন করিয়া? পুরুষ তোমরা নিজেরা যদি সকল সময় হাল্কাভাবে চল, তবে তোমার স্ত্রীর চরিত্র কি কখনও ধীর হইতে পারে? তুমি যে নিজেই তোমার আপাত-সুখের জন্যই তাকে হাল্কা ও ছ্যাবলা করিয়া নিতেছ। কেহবা স্ত্রীর মনযোগাইবার জন্যই কেবল ব্যস্ত। একালে [illegible] কেহ সম্পন্ন ঘরের কন্যা বিবাহ করিয়া আনেন, তিনি [illegible] করেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেন, যাহাতে তাহার [illegible] বিষয়ে কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। তাহাতে যদি সর্ব্বস্বান্তও হইতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হন্ না! গৃহে যদি মাতা ভগ্নী বা অপর আত্মীয়া কেহ থাকেন, তাঁহাদের পদে পদে স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন না, যেন দিব্যাঙ্গনার কোন বিষয়ের অভাব না হয়। শত অভাব লইয়াও তোমরা কেন থাক না, ভ্রমেও বধূকে বুঝাইতে চেষ্টা কর না যে তুমি রাজার কন্যা হইলেও দরিদ্রের ঘরণী—যে ঘরে তুমি প্রতিষ্ঠিত হইলে, সে ঘরে তোমার আসন সকলের নীচে। একদিন তুমি এই ঘরে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবে বটে, কিন্তু তাহা, নীতি ধর্ম্মজ্ঞান ও সংযমের দ্বারা, মার্জ্জিত সেবাপরায়ণতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দ্বারা। একটা সামান্য চলিত কথা আছে, "যদি বড় হবি তবে ছোট হ"। বড় হইতে হইলে, প্রথমে তাহাকে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে হয়। কেননা যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা চিরাচরিত, সে দেশে এভাবে চলিতে না পারিলে সাংসারিক জীবন বড়ই দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়ে; অবশ্য একক যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের বড় একটা আসে যায় না। পল্লীগ্রামে এখনও এমন সম্পন্ন গৃহস্থ অনেক আছেন, যাঁহারা বহু পরিবার একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করেন। অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখা যায়, যদিও তাঁহারা বাহিরে বেশ একান্নবর্ত্তী ভাবে আছেন বটে; কিন্তু অন্তরে (বা অন্তঃপুরে) প্রায় কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। সকলেই নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে, অসুখে কালযাপন করেন। কেহই অন্যের জন্য সামান্য ক্ষতি বা সামান্য কষ্টও স্বীকার করেন না। সেই হিসাবে, কাহারও নিকট, কোন বিষয়ে সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করিতেও পারেন না। এই সব অসুবিধা ও অশান্তি, প্রায়ই নিজ হাতে গড়া। একটু চেষ্টা করিলে যদি ইহার অর্দ্ধেকও কমে তাহা কি প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিৎ নয়। এই সংসারই স্বর্গ, সংসারই নরক। পূর্ব্বপুণ্যফলে এবং জগদীশ্বরের কৃপায় যিনি মনোমত ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, শত দুঃখও তাঁহাকে বোধ হয় বিচলিত করিতে পারে না। যাহার চিন্তায় সুখ, ভোগে তৃপ্তি, আশায় আনন্দ, সে যদি সকল সুখদুঃখ অংশভাগিনী না হয়, গৃহের গৌরব, ব্যথার [illegible] নানাপ্রকারে গৃহের অশান্তি আনয়ন [illegible] মর্ম্মান্তিক যাতনা বই আর কি বলিব [illegible] এখন আর অনেকে সামান্য আয়ের [illegible] বিবাহ করিতে সাহস করে না। কেন না তাহাদের ম[illegible] সর্ব্বদাই এই ভয় হয় যে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার করিব, শান্তি তৃপ্তি লাভ করিব, এ আশা বিড়ম্বনা। তৎপরিবর্ত্তে বোধ হয়, দুঃখের বোঝাই বেশী বহন করিতে হইবে। এই সংসারে বাস করিয়া যিনি সকলের হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য। অনুগত ভৃত্য, বিনীত সন্তান, স্নেহময়ী ভার্য্যা, দেহে স্বাস্থ্য ও মনে শান্তি লইয়া যিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এ মর জগতে তিনিই ভাগ্যবান্। এই সংসারে বাস করিয়াও তিনি স্বর্গভোগ করেন। তাঁহাদেরই পুণ্যফলে ভারত আজিও রসাতলে যায় নাই। জীবনে সুখশান্তিহীন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জীর্ণশীর্ণ হইয়া, যাহারা অতিকষ্টে জীবনভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া গভীর আক্ষেপে যে কয়েকটা, অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আশাকরি, তাহাতে কেহ রুষ্ট না হউন, অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। একজনও যদি এই সকল দোষ আলোচনা করিয়া, নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান, আমার মত অজ্ঞ প্রবীণার কলম ধরা সার্থক মনে করিব। হে বঙ্গবধু! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জননী! তোমরা সুখী হও, ইহাই আমার একান্ত কামনা। তোমরা হাসিমুখে কথা কও, আমরা দেখিয়া তৃপ্ত হই। তোমরা স্বামী পুত্র লইয়া সুখে ঘরকন্না কর, ইহাই দেখিতে বাসনা করি। তোমরা সুখী হইলে তোমাদের বংশধরেরাও সুখী ও নীরোগ হইবে। কায়মনচিত্তে আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমাদের সুমতি দিন।

তোমাদেরই—জনৈকা প্রবীণা।

নিবেদন

(গান)

এই শুধু কর হরি—
যাতনা বেদনা যাহা দাও সখা
সহিতে যেন গো পারি।

অটল বিশ্বাস থাকে তোমা'পরে
শত দুঃখে যেন না ভুলি তোমারে,
দিবানিশি যেন কেটে যায় মোর
ও পদ কমল স্মরি।

সুখ দুঃখ সখা সকলি অনিত্য,
আসে চলে যায় তুমি-মাত্র সত্য
এযে, ভ্রান্তিদায়িনী মায়ার ধরণী
শুধু, সার তব পদতরী।

আবরিত আঁখি মায়ার আঁধারে
খুলে দাও সখা নেহারি তোমারে,
তুমি যে আমার চির আপনার
জীবনের ব্যথাহারী।

হাসিয়া কাঁদিয়া কেটে যায় বেলা,
শেষ হবে যবে জীবনের খেলা
পাঠায়ে সংসারে ভুলে আছ যারে
তারে, নিও গো আপন করি।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

পল্লীর প্রাণ

(২০)

যাদব বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, হতভাগা মিসেটা তার কথা মত ঘোষালদের কাছে ঘাট স্বীকার করে নাই,—এই সংবাদ যথা সময়ে বেণীবাবুর অন্তঃপুরেও পৌছিল। খুঁটি নাটি সব কথা শুনিবার জন্য রাজতরঙ্গিণীর অদম্য একটা কৌতুহল হইল। যাদব এখন তার যমের অরুচি ওই গুণ্ডা ভাইটার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে, তাহাও ত জানা দরকার। দ্বিপ্রহরে ভোজনে বসিয়াই ঝিকে তিনি আদেশ করিলেন, "বলি ও ঝি, ওলো দ্যাখ্ না বেয়ারা গুলো কোথায় গেল। মুখপোড়াদের বল্, পাল্কি নিয়ে আসুক। আর বিছানা নিয়ে পাল্কীতে পেড়ে দিগে যা। আমি বেরোব এক্ষুণি।"

ভোজনান্তে বারান্দার এক ধারের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া রাজতরঙ্গিণী আচমন করিলেন। ঝি হাতে জল ঢালিয়া দিল। আচমনান্তে বারান্দার মাঝামাঝি আসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিলেন। ঝি আগেই সেখানে একমুঠা চাউল, একঘটি জল ও পাণ দোক্তা সাজাইয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। সেই চাউল চিবাইয়া রাজতরঙ্গিণী দুই তিন ঢোক জল মুখে ঢালিয়া কুলকুচি করিয়া নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিলেন। তারপর ঢক ঢক করিয়া তিনপোয়া ঘটি আন্দাজ জল গিলিয়া কয়েকটি পাণ ও কতখানি দোক্তা মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে হাঁপাইতে লাগিলেন। ঝি পাশে দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছিল। কহিল, "বেয়ারা পাল্কি নিয়ে এসেছে মা।"

রাজতরঙ্গিণী একটা ঝাঁপ দিয়া উত্তর করিলেন, "এসেছে ত বসুক না একটু! কোন্ বিয়ের লগ্ন এক্ষুণি উতরে যাচ্ছে তাদের। ওমা, এই ত খেয়ে উঠলাম—এক্ষুণি ধেয়ে অদ্দূরে যেতে পারি? সে পারে যারা মাইনে খেয়ে পরের কাজ করে। আমি কি কারও মাইনে খাই, না কারও বাড়ী কাজ করি যে দুপুরে খেয়েই অমনি ছুটতে হবে।"

ঝি কহিল, "বালাই! বালাই! সাতজন্ম তোমার এমনি অক্ষয় ঐশ্বয্যি বজায় থাকু, তুমি কেন মা তা ক'ত্তে যাবে। তা জিরোও একটু, বেলাটা পড়ুক, শেষে যাবে।

বেয়ারারাই থাকুনা একটু ব'সে, কাজ ত আর কিছু নেই। ও গোবিন্দ, বেয়ারাদের বল্ না গিয়ে, মাঠাকুরুণ একটু জিরিয়ে বেলাটা প'ড়লে শেষে বেরোবেন। তারা যেন পাল্কি নিয়ে দোরেই ব'সে থাকে। কোথাও যায় না যেন, একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠেই উনি যাবেন,—তখন আবার ডাকাডাকি হাকাহাকি না ক'ত্তে হয়।

বিশেষ প্রসন্ন হইয়া রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "হাঁ, একেই বলে ঝি! বল্‌তে হয় না কিছু, আপনি বুঝে ঠিক যেমনটি চাই তাই ক'র্‌বে। আমার নারি ভাগ্যি ভাল, তাই তোর মত এমন দরুদী ঝি পেয়েছি বাছা। হাঁলো শুষ্‌নীর মা, বউমার খাওয়া হ'য়েছে?"

শুষ্‌নীর মা তাঁহার পুত্রবধূর ঝি। খোকাটিকে কোলে লইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহিণীর প্রশ্নে উত্তর করিল, "হাঁ গিন্নী মা, তিনি ত খেয়ে দেয়ে কখন ঘুমিয়েছেন।"

রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "মাগো, যেন রাজকন্যে! দশটা না বাজতেই খেয়ে অমুনি ঘুমোন চাই। বাড়ীতে পাঁচজন লোক র'য়েছে, কে কি খেলে না খেলে একবার দেখ্‌তে হয় না?—আমি শাশুড়ী, একটি দিন যদি খাবার সময় আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। হাবাতের মেয়ে—তপিস্যে ভালই ছিল, এই ঘরে এসে পড়েছে।—যেমন তেমন গেরস্তর ঘরে হ'লে ঝাঁটা মেরে দূর ক'রে দিত! কি বলিস্‌লো ঝি, দিত না?"

"থাক্ মা, আমাদের আর ওসব কথায় কাজ কি?" এই বলিয়া ঝি শুষ্‌নীর মার দিকে চোক বাঁকাইয়া একটু চাহিল।

"কেনলো, ভয় কি তোর? শুষ্‌নীর মা লাগিয়ে দেবে? তা দিক্ না।—তুই আমার লোক, কে তোর কি ক'র্‌বে? দয়া ক'রে এনেছি, তাই সে ঘরের বউ। নইলে সে কে যে তোকে জ্বালা দেবে, কি আমাকে অপমান ক'র্‌বে? ভাতারের বড়াই? তা তার ভাতারই এখনও আমারটা খায় পরে, আমি তার ভাতারেরটা কিছু খাই পরি নে। হাঁ! তা কর্ত্তা চিরজীবী হ'য়ে থাকুন, তাঁর কোলে মাথা রেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে চ'লে যাব। কিসের ভয় লো তোর? হাঁলো শুষ্‌নীর মা, তোর এত বড় বুকের পাটা যে আমার ঝির নামে গে বৌমার কাছে লাগাস!—জানিস ঝাঁটা মেরে তোকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিতে পারি? খোকামণিকে রাখতে আর ঝি কি মিল্‌বে না ভাবছিস্?—এস, দাদামণি এস!" রাজতরঙ্গিণী পৌত্রের দিকে হাত দুটি বাড়াইলেন। শুষণীর মা খোকাকে তাঁহার কোলে দিয়া কহিল, "ওমা, আমি কেন লাগাতে যাব গিন্নী মা? লাগাতে কোনও কাণখাকী কখনও কিছু শুনেছে?"

ঝি কহিল, "শুন্‌লে মা! তোমার সাম্‌নে আমায় কাণখাকী ব'লে গাল দিল!—আমি কাণখাকী, আর তুই চোকখাকী দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নে যে গিন্নীমা সাম্‌নে, আর তাঁর সাম্‌নেই তাঁর লোক আমি—আমায় এত বড় গালটা দিলি! এতে গিন্নীমারই অপমান করা হ'ল না?"

রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "হালো, শুষ্‌নীর মা! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর? আমার তুই অপমান করিস্! এ আস্পর্দ্ধা তোকে কে দিলে? জানিস্, তুই ত ঝি, আমি যদি বলি, তোর মনিব ওই বউকে শুধু আমি দূর করে দিতে পারি!"

"সে কি মা! সে কি মা! তোমায় আমি অপমান ক'ত্তে পারি? এবাড়ীর কর্ত্তাই হ'লে তুমি। বৌমা কে? তোমার ছেলের বৌ—সে ত তোমার দাসী। আর আমি ত সেই দাসীর দাসী মা। আমি পারি তোমাকে অপমান ক'ত্তে?"

"হাঁ, সেইটে মনে রাখি্‌বি। জান্‌লি? সাবধান হয়ে কথা ব'লবি! নইলে এমন খেয়ে শুয়ে আর কোথাও কাজ মিল্‌বে? আমার বাড়ীতে ঝি চাকরের যেমন সুখ এমন আর কোথাও আছে? তা দেখিস, আমার ঝিকে আর গাল মন্দ কিছু দিস্‌নে যেন। হাঁ!"

"আমি ত আর ওকে কানখাকী বলিনি গিন্নী মা—"

"হাঁ, তা ব'ল্‌বি কেন? ও কি কান খেয়েছে যে কানখাকী ওকে ব'ল্‌বি? তুই-ই বরং চোকখাকী, চোকের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাস্‌নি যে আমি এখানে ব'সে আছি—ষাট! ষাট! দাদা আমার! যাদু আমার! সোনার চাঁদ আমার! কেঁদোনা! শুষ্‌নীর মা গাল দিচ্চে। ওকে দূর করে দেব! দশটা ভাল ঝি তোমার রেখে দেব! কেঁদোনা!—না এছেলেও হ'য়েছে অমনি বজ্জাৎ। ওই খোলে ত জন্মেছে, ভাল এর চাইতে আর আস্‌বে কোথেকে? আমি পিত্তেস্‌ই—আমার গন্ধ, যদি সইতে পারে। নে বাছা নে,—একটু শান্ত ক'রে নিয়ে রাখগে।"

শুষ্‌নীর মা খোকাকে লইয়া ওদিকে চলিয়া গেল। খোকা চুপ করিল।

"যাই, একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই। আবার এক্ষুণি ত যেতে হবে।"

দেহভার বহু আয়াসে তুলিয়া রাজতরঙ্গিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মন্থর চরণক্ষেপে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঝি তাড়াতাড়ি গিয়া গৃহতলে একটি শীতলপাটি বিছাইয়া, কয়েকটা বালিস নামাইয়া শিয়রে পায়ের কাছে ও দুই পাশে ক্ষিপ্রহস্তে রাখিয়া দিল। রাজতরঙ্গিণী তাঁহার বিপুল বপু সেই শীতলশয্যায় বিন্যাস করিলেন। ঝি কহিল, "একটু হাওয়া ক'র্‌ব মা ?"

"তুই যে থাস্‌ দাস্‌নি এখনও। নবনে ছোঁড়াটাকে বরং ডেকে দে। খেলা ক'রেই ত বেড়ায়—একটু হাওয়া করুক না এসে। তুই যা, বরং খাওয়া দাওয়া ক'রগে। খাওয়া দাওয়া হ'লে ঘুমুস্‌নি যেন—এই ধর ঘণ্টাখানেক দেড়েক বাদে এসে আমায় তুলে দিবি। জান্‌লি ?"

নবনেকে ডাকিয়া দিয়া ঝি গেল।

বেলা তখন প্রায় আড়াইটা, যড়্‌বাহকবাহিত-শিবিকারূঢ়া রাজতরঙ্গিণী যাদবের বাসায় আসিয়া উপনীতা হইলেন।

"কৈ গো বউ মা! এলে দেশ থেকে ?"

চমকিয়া চারুমুখী ক্ষিপ্র চরণক্ষেপে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া মহিয়সী ধনিগৃহিণীকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বারান্দায় বসাইলেন। ঘটিভরা জল ও পাণ আনিয়া দিলেন। যথারীতি জলতাম্বুল সেবনান্তে রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "তা এলে দেশ থেকে বাছা ? তোমার শাউড়ী আছে ত ভাল ?"

"হ্যাঁ, আছেন ভালই।"

"মাগী মানুষ মন্দ নয়,—লোকে বলে বুদ্ধি শুদ্ধিও রাখে। তবে গুমোর আছে কিছু। নয় গো ?"

"হ্যাঁ—তা—ওই এক রকম মানুষ—আপনারা সব ভাল আছেন ত ?"

"হ্যাঁ, ওই এক রকম আছি বাছা! খাই দাইও বেশ, ব্যামো পীড়েও তেমন কিছু নেই—তবু গতরটার যেন সোস্তি পাইনে তেমন। কত্তা বলেন, বেশী মোটা হ'য়েছ। হ্যাঁ মা সত্যিই কি এমন বেশী মোটা হয়েছি আমি ?" স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দিকে রাজতরঙ্গিণী একবার দৃষ্টিপাত করিলেন।

চারুমুখী কহিলেন, "না, এমন কি বেশী মোটা ? তা বড় ঘরের গিন্নী মানুষ আপনি—"

"তাই বল বাছা! বুদ্ধিমানের মেয়ে তুমি—বিবেচনা মত কথাটা ত ব'ল্‌বেই। সত্যিই ত, গিন্নী বান্নী মানুষ আমি, আর ঘরও ত যেমন তেমন একটা ঘর নয়,—গায়ে একটু পোস্তাই না হ'লে মানাবে কেন ? কত লোকজন র'য়েছে, তারাই বা মানবে কেন ? ওই ত দত্তদের গিন্নী—ভাতার কিছু রোজগার কম করে না—তা ক'ল্লে কি হবে। রোগে রোগে যেন শুক্‌নো কাঠখানি হ'য়ে গেছে,—চাকর ঝি—কেউ গ্রাহ্যি করে না। ভাতার—নিজের ভাতার—যার বড় আর কেউ হ'তে পারে না—সেই ভাতারই কি তেমন আদর যত্ন করেগো ? আর আমাদের কত্তা—ব'লব কি বউমা—তুমি পেটের মেয়ের মত—বাড়ীর ভিতর যখন আসেন, চোকের আড়াল কি হ'তে পারি। একটু যদি এদিক ওদিক গেছি, অমনি চেঁচাতে থাকেন, 'হ্যাঁগো কোথা গেলে গো! বলি ও গিন্নী!'—বউ মা হাস্‌ছে। পাগলীর মেয়ে! তা দেখ্‌বে বাছা দেখ্‌বে। ভাতার এম্‌নি জিনিশ—বুড়ো হ'লেও সোহাগ কি তার কমে ? বরং বয়েসের কালে রক্ত গরম থাকে—হেলা তাচ্ছিল্যি কখনও বা ক'ত্তেও পারে। কিন্তু রক্ত যদি ঠাণ্ডা হ'ল, একেবারে মাগের আঁচল ধরা হ'য়ে থাক্‌বে। বয়েসে যেমন ভাটি প'ড়, মেগের সোহাগে যেন ভরা জোয়ারের বান ডেকে আসে!

চারুমুখী মুচকী হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন।

"তা হাস বাছা, হাস। এখন ত হাস্‌বেই। বুড়ো হও—তখন মনে ক'র্‌বে মাগী যা ব'লেছেল, ঠিক বটে! হাঁ, যা ব'ল্‌তে এলাম - তা, তোমার শাউড়ী নাকি খুব বুদ্ধি রাখে,—নিজের পেটের ছেলেকে সুবুদ্ধি দিতে পার্‌লে না ?"

চারুমুখী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সুর একটু নাকে তুলিয়া উত্তর করিলেন, "কি আর ব'লব মা, আমার শাশুড়ী—গুরুজন তিনি—লোকেও তাকে সুখ্যাৎ খুব করে—তবে আমাদের তিনি কোনও দিন ভাল চোকে দেখেন না।—ওদের টানই কেবল টানেন। এই ত একটি দিন মোটে বাড়ীতে ছিলাম—সারাদিন কেবল ঠেস্‌ দিয়েই কথা বলেছেন।"

"ওমা! কেমন কথা গো! যেদো ত তার সতীনের পেটের ছেলে নয়। নিজে তাকে পেটে ধ'রেছে,—খেতে

প'রুতেও ত সেই দিচ্চে। আবাগীর বিবেচনা কি? চোকেও কি একটা পরদা নেইকো? কেন এত বরদাস্ত ক'ত্তে কেন গেলে বাছা? উল্‌টে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে পাল্লে না?"

"ও বাবা! এম্‌নিই রক্ষে নেই। আবার কথা শোনাব! তা যা খুসী করুনগে,—বাড়ীতে কখনও থাকিওনা, থাকবও না। কালে ভদ্রে এক আধদিন যাই, কেন মিছে আর একটা ঝগড়াঝাটি বাধাব!"

"হুঁ—মাগীর তপিস্যে ভাল—তপিস্যে ভাল! নইলে রোজগেরে ছেলের মাগ—খেতে পরতে দেয়—তাকে খামোকা এত জ্বালা দিতে কেউ এমন পারে না, তাই ভরসা পায়? তা তুমি নাকি ভদ্দরের মেয়ে, তাই এত স'য়ে এলে। এই ত এত ক'চ্চি—কত্তা যে অমন বাবের মত মানুষ—তিনিও বৌমা ব'লতে অগ্‌গেয়ান হন। তবু কি আবাগের বেটীর মন পাই—হঁা, তা তোমার দাওর কি ব'ল্লে? ঘাট স্বীকের ত ক'ল্লে না। এই যে অপরাধ গুলো ক'রেছে—ঘোষালরা কিছু তোমাদের চাইতে ফ্যাল্‌না লোক নয়—তাদের যে এই অপমানগুলো ক'রে, এত ক্ষেতি ক'রবার ফিকির ক'চ্চে—তার জবাবটা কি দিলে হতভাগা?"

চারুমুখী নিবারণ যাহা বলিয়াছিল, সালঙ্কারে তাহা বর্ণনা করিলেন। শাশুড়ীও যে সব কথা বলিয়া তার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "হুঁ—কি বজ্জাত গো কি বজ্জাত! গাঁটা লক্ষীছাড়া জ্বালিয়ে খাবে দেখ্‌ছি। আর তোমার শাউড়ীও ত বাছা কম নয় বড়? মনে ক'রেছিলাম, একটু গুমোরটুমোর যাই থাক্ মাগী মানুষ ভাল। তা নয়—দেখ্‌ছি। ওই ছেলেকে উস্কে দিচ্চে,—মাথাটি একেবারে খাচ্ছে। নইলে নিবেটা ত একটা অকাট মুখ্যু—ষাড়ের মত গোঁয়ার। এই সব চাল কি সে চালতে পারে, না এত কথাই গুছিয়ে ব'লতে পারে? মাগীই আগে থেকে শিখিয়ে তাকে তৈরী ক'রে রেখেছিল? তা তোমরা কি ক'রে এলে? হতভাগাকে আলাদা ক'রে দিয়ে এসেছ ত?"

চারুমুখী কহিলেন, "আমাদের কিছু ব'লতে হয় নি। দুকথা হ'তে না হ'তেই আপনা থেকেই জিদ ক'রে ব'ল্লে, সে আলাদা হ'য়ে রোজগার ক'রে খাবে,—আমাদের কোনও সাহায্য নেবে না।"

"বটে! এত জোর কিসে হ'ল? রোজগার ক'রে খাবে! চুরী ডাকাতী ক'রে যদি পারে,—নইলে লেখাপড়ার ত 'ক অক্ষর গোমাংস'! কি চাকরী সে ক'রবে? মরুক গে! জেলে যাক্। ডেকেও তোমরা জিজ্ঞেস ক'রো না। একেবারে ত্যাজ্যি ক'রে রেখে দেবে।"

চারুমুখী উত্তর করিলেন, "আমরা আর তাকে কি ত্যাজ্যি ক'রব কাকীমা! সেই ত আমাদের ত্যাজ্যি ক'রেছে আগে।"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ!" রাজতরঙ্গিণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"মুখ্যু—মুখ্যু! একেবারে অকাট মুখ্যু! নইলে, ভাই না দিলে এক সন্ধ্যে যে মাগ ছেলেকে দুটো ভাত দিতে পারে না,—সে ক'রে ভাইকে ত্যাজ্যি! ও ত মুখ্যুর মুখের বড়াই। ভাতে যখন ম'রবে, কুকুরের মত কেঁদে এসে তোমাদের পায়ে লুটিয়ে প'ড়বে। ওই মা মাগীই এসে তোমাদের হাতে ধ'রে কত কাঁদবে। তখন যেন সহজে ভুলে যেওনা বাছা! কতখানি অপমান তোমাদের ক'রেছে, বুঝ্‌তে পাচ্চ না? ওই ঘোষালদের বাড়ী বুকে হেঁটে যাবে, সাতদিন সাতবার নাকে খত দেবে—তবে তাকে ছাড়বে। হাঁ।"

চারুমুখী কিছু বলিলেন না। রাজতরঙ্গিণী আবার কহিলেন, "তা তোমার শাউড়ীর কি ক'রবে—ঠাউরেছ? হাজার হ'ক্, মা, গর্ব্বে ধ'রেছে—ম'রে গেলেও জলপিণ্ডি দিয়ে তবে শুদ্ধ হ'তে হয়। জ্যান্ত ত আর পেটে দুটো না খেতে দিয়ে পারবে না? তা কি ঠাউরেছ?"

"কিছু ত বলেন নি এখনও। তবে তাঁকে খেতে পরতে দিতেই হবে। তা কত ক'রে মাসে দিলে তাঁর চ'লতে পারে?"

রাজতরঙ্গিণী কহিলেন, "গেঁয়ে একটা রাঁড়—মাসে টাকা পাঁচেক ক'রে দিলেই ঢের হ'বে। ওই ত, ঘোষালরা তাদের সরিক তারকের বউকে পাঁচ টাকা ক'রে মাসোয়ারা দেয়,—আরও তার দুটো ছেলেমেয়ে আছে। নিজের বুদ্ধিতে মাগী যতই বজ্জাতী এখন করুক, ম'রে ত যাইনি এখনও না খেয়ে। কত্তার ঠেঁয়েও আমি শুনেছি, পাড়াগাঁয়ে একটা রাঁড়ের পাঁচ টাকাতেই মাস বেশ চ'লে যায়। কাশীতে যে ঘর ভাড়া ক'রে থাকতে হয়, তার বনের শাকপাতাটাও

কিনে খেতে হয়, সেখানেও ত শুনেছি পাঁচ টাকায় ঢের মাঁড়ের মাস চ'লে যায়। সবার চলে, তার কেন চ'ল্‌বে না? অবিশ্যি দিলে কি খরচ হয় না? তা হয়,—সচ্ছন্দ দুধ'ঘিও খেতে পারে। তা ছেলের মুখের দিকে মাগী চাইল না, ষোড়শোপচারে তার ভোগ যোগাতে যাবে কেন? আর দিলেই কি সে নিজে তা খাবে? সব ধ'রে ওদের দেবে। হাঁ, ভাল কথা মনে প'ল। তোমার শাউড়ী কি দেশেই থাক্‌বে?"

"কোথায় আর যাবেন? এখানে আস্‌তে যে রাজি হবেন, এমন ত মনে হয় না।"

"তাই যাতে এনে রাখ্‌তে পার, সেই চেষ্টাই দেখো বাছা। নাই যদি আসে, কাশীতে পাঠিয়ে দিও। বুড়ো হ'য়েছে, দুটি ছেলে—দু 'হাঁড়ী হল,—কোন্ মুখে কোন সুখে বাড়ীতে এখন আর থাকতে চাইবে?' ভাগের মা গঙ্গা পায় না,—তা গঙ্গা যদি চায় ত কাশীতে যাক্ না?"

চারুমুখী কহিলেন, "তা যেতে যদি চান, বেশ ত, কাশীতে গিয়েই থাকুন না। খরচ বাড়ীতেও দিতে হবে, কাশীতেও দিতে হবে। আপনি ত ব'ল্লেন, সমান খরচাতেই চ'ল্‌তে পারে।"

"কাশীতে যদি যায়, বেশী ক'রেই না হয় কিছু দেবে। ভাল খেয়ে দেয়ে গতরের সুখে থাক্‌বে। নিজের গর্ভধারিণী—ম'লেও যাকে জলপিণ্ডী দিতে হয়—বেঁচে থাক্‌তে সুখে যদি কেউ রাখ্‌তে পারে, তা রাখ্‌তেই ত হয়। কি জান বাছা, কথাটা যদি মনে হ'ল, খুলেই বলি। নিবেটাকে জব্দ ক'ত্তে ত চাও? তোমাদের অপমান ক'রেছে, তোমরাও চাও, আবার আমরাও চাই।—ওই ঘোষালদের যখন অপমান ক'রেছে,—ব'ল্‌তে হবে আমাদেরই অপমান ক'রেছে। ওরা ত আমাদের নিজের লোক। বাড়ীতে ভুলে যদি পাঁচটি টাকাও পাঠাও, মাগী পেটে না খেয়ে ওদের খাওয়াবে। পেটের ছেলে উপোস ক'রে থাক্‌বে, কোনও আবাগী মা পারে অন্নের গেরাস মুখে তুল্‌তে? নিজে ক্ষুদকুড়ো খাবে, না হয় কারও বাড়ী গিয়ে রাঁধবে, তবু টাকাকটি ধ'রে ওই নিবের হাতে দেবে। আর যদি পাঁচ সাত টাকা খেটেপিটে হ'ক, কি মামলা মকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়েই হ'ক্—আনতে পারে, তবে ত এক রকম চলেই গেল। বাড়ীতেও গাছ পালাটা আছে,—লাউকুমড়োটাও হবে,—গরু ত পালেই,—দশজনের পুকুর আছে, কাজকর্ম নেই, বড়শী ফেলে মাছ ধ'রবে।—কেন চ'ল্‌বে না? বেশ চলে যাবে। এদ্দিন তোমরা খরচ পত্তর পাঠিয়েছ,—হাতেই কি কিছু জমায় নি? গাঁয়ে থাকে, টাকায় দু পয়সা চার পয়সা ক'রে সুদেও ত তা খাটাতে পার্‌বে। দেখো বাছা, আমি ব'লে রাখলাম, কিছু হবেনা তার। তোমাদের কলা দেখিয়ে তোমাদের টাকাতেই দিব্যি খেয়ে দেয়ে সে থাক্‌বে—"

"হুঁ——তা যা ব'ল্‌ছেন কাকীমা, হ'তে পারে বই কি?"

"পারে বই কি কেন, হবেই। তাই ব'ল্‌ছি, শাস্তি যদি ওকে দিতে চাও, বদ্দুর পার ওর খোরাকীর পথ বন্ধ কর। শাউড়ীকে কাশী পাঠিয়ে দেও।—যেতে না চায়, ধমকে পাঠাবে,—ব'লবে, নইলে খরচ পত্তর দেবে না। আরও এক কাজ ক'রো। বাড়ীখানি সব ওই ভাগার হাতে ছেড়ে দিয়ে রেখো না। যায়গা ত কম নয়? গতরে খেটেও বার মাসের কলতরকারী জন্মাতে পাল্লে কি কম আয় দেবে? চুল চিঁরে সব ভাগ ক'রে নেও। কিছু খরচ পাঠিয়ে দেও,—আর তোমাদের ভালবাসে আর ওকে দেখ্‌তে পারেনা, এমন কাউকে লিখে দেও, চুল চেঁরা ভাগ ক'রে তোমাদের যায়গা টায়গা সব আলাদা ক'রে ঘিরে রাখ্‌বে। গাছের একটি পাতা নিবেকে ছিঁড়্‌তে দেবে না। হাঁ—সব চেয়ে ভাল বুদ্ধি হবে, যদি ওই হরিঘোষালকে কাজটায় লাগিয়ে দিতে পার। যেমনি বজ্জাত ও—নাকে কাঁদিয়ে ওকে ছেড়ে দেবে! যেমন অপমান সবাইকে ক'রেছে,—উঠ্‌তে ব'স্‌তে তেম্‌নি অপমানী হবে। হাঁ—এই ঠিক হবে। ব'লো ব'লো—বাছা যেদোকে, ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো! আমিও কত্তাকে গিয়ে ব'লব। এটা ক'ত্তেই হবে বৌমা, তোমার ওই দস্যি দ্যাওরটাকে সত্যি যদি জব্দ ক'ত্তে চাও।"

কথাটা চারুমুখীর মন্দ লাগিল না। হাঁ, হরিঘোষালকে যদি তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপ বাড়ীর অর্দ্ধেক সরিকীতে বসান যায়, তবেই নিবারণ ঠিক জব্দ হয়, তার দাম্ভিকতার উপযুক্ত শাস্তি হয়।"

সন্ধ্যার পর স্বামীকে চারুমুখী সকল কথা জানাইলেন। যাদবের বড় রাগ হইল। আগুন হইয়া তিনি বলিয়া

উঠিলেন, "এ সব কি ব'লছ চারু? না, সে আমি কথনও পারব না। বোস গিন্নীর কাছে কি দাসখত লিখে দিয়েছি আমি, যে যা তিনি হুকুম ক'র্‌বেন, তাই ক'র্ত্তে হবে? না, ওসব কিছু হবে না—ব'লছি।"

চারুমুখী একটু চক্ষু টানিয়া কহিলেন, "ঘোস্ কর্ত্তা নিজে যদি বলেন?"

"না,—তিনি এমন সব কথা ব'ল্‌তেই পারেন না। মেয়েমানুষ ত নন তিনি।"

"বলি মেয়েমানুষ ব'লে এত ঘেন্না কবে হ'ল? মেয়ে-মানুষ নিয়ে তবে ঘর করা হয় কেন? না হ'লেও ত একদিন চলে না।"

যাদব ঠোঁটে কামড় দিয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চারুমুখী কেবল বাঙ্গলা নয়, ইংরেজিও কিছু শিখিয়াছিলেন। শিক্ষিতা বলিয়া অভিমানও বেশ ছিল। সুতরাং নারীমর্য্যাদাবোধে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক তীব্রতা তাঁহাতে দেখা যাইত। নারীবুদ্ধি কি নারী চরিত্রের প্রতি কোনও অবজ্ঞা প্রকাশ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। হঠাৎ মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িল। যাদব কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, চারুমুখীও উঠিয়া গেলেন। মানভঞ্জন পালার কোনও অভিনয় এ অবস্থায় চলে না। নারী যে মান করে, পুরুষের প্রেমাধিনী পুরুষের উপরে একান্ত নির্ভরশীলা বলিয়াই করে। প্রেমের দান সে যতটা চায়, ততটা না পাইলেই মান করে। মান যে করে, যে আদরে তার মান ভাঙ্গে সেই আদরও সে চায়। কিন্তু এই প্রেমাধীনতা বা নির্ভরশীলতাকে অভিভূত করিয়া নারীত্বের অভিমান যখন নারীচিত্তে প্রবল হইয়া উঠে, সেই অভিমান আহত হইলে নারী মান করে না, অবমানিতা হয়। সোহাগে মানিনীর মান ভাঙ্গে, অবমানিতার আরও অবমাননা হয়,—রোষে তা গর্জ্জিয়া উঠে। চারুমুখীও মান করেন নাই, অবমানিতাই হইয়াছিলেন। পত্নীর মানে অবমাননায় যাদবের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। তাই আপাততঃ তিনি নীরব একটা সাপরাধ ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিলেন।

(২১)

বাহিরে স্বামীর আদর ও আনুগত্যের যতই গর্ব্ব করুন, কাজের বেলায় স্বামী যে আদরিণী গৃহিণীর বুদ্ধি অপেক্ষা নিজের বুদ্ধির অনুসরণই অধিক করিতেন, একথা অতি গর্ব্বিতা রাজতরঙ্গিণীও বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেন। দুর্দ্ধর্ষ নিবারণকে দমন করিবার এমন দুইটি উপায় সহসা উদ্ভাবন করিয়া তিনি যারপরনাই হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরে কেহ যাইতে পারিলে, দেখিতে পাইত, সেখানে নিবারণকে একটু জব্দ করিবার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহার মস্তিষ্কোদ্ভাবিত উপায়গুলির সফলতায় স্বামী ও অন্যান্য লোকের নিকট তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বড় একটা তারিফ হয়, তার আগ্রহটাই অনেক বেশী হইয়াছিল। নিবারণ বড় বজ্জাত, কাউকে গ্রাহ্য করে না, সে বেশ একটু জব্দ হয়, ভাল কথা। নাই যদি হয়, তাঁহার কি এমন তাহাতে আসিয়া যাইবে? নিবারণ যতই দুর্ব্বৃত্ততা করুক, তাঁহার কি করিবে? গ্রাম যদি তাহার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে উৎসন্নও যায় (তাই বা এমন যাইবে কেন? সত্যই কি এত মুরোদ তার)—তবু তাঁহাদের ঘরবাড়ী বিষয়সম্পদ কিছুর একটু কোণও সে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। তবে অম্বিকা ঘোষাল অনুগত লোক, তাহার মানের দিকে চাহিতে হয়। আর ওই যেদোর বউটি হাঁ, তাঁকেও কোন সঙ্কটে সৎপরামর্শটা—দিতে হয় বই কি। নহিলে নিবারণ কি করে না করে, তাহাতে তাঁহার কি? কিন্তু তাহাকে জব্দ করিবার এমন ফন্দি কি কর্ত্তার মাথায়ও আসিত। তবে তিনি নাকি অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী, তাই তাঁহার মাথায় আসিয়াছে। যদি আসিয়াছে, তবে কেনবা তার তারিফ সকলে করিবে? কেননা সর্ব্বত্র তাঁহার বিচক্ষণতার জয়জয়কার হইবে? বুদ্ধিটা ভালই হইয়াছে,—কিন্তু কাজটায় কিছু বাড়াবাড়ি হয় বই কি? কে জানে, কর্ত্তা যারপরনাই সুবিবেচক লোক—(তিনিই কি অবিবেচিকা? তা নয়) তবু কে জানে—তিনি হয়ত অন্য রকম কিছু ভাবিয়া অতটা বাড়াবাড়িতে যাদবকে বাধ্য করিতে নাও চাহিতে পারেন। একবার না বলিয়া বসিলে, হাজার কাঁদিয়া বকিয়াও তাহাকে 'হাঁ' বলান যায় না। বুড়োকালে মিন্সে এত ছলাকলাও জানে! কেমন করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া ফেলে, তিনি ধরিতেও পারেন না। কিন্তু এটাতে ত ভুলিলে চলিবে না। না, কর্ত্তাকে আগে কিছু বলিয়া কাজ নাই। ঘোষালের কাছেই বুদ্ধিটা আগে ফাঁক করা যাউক। সে এটা কথনও অবহেলা করিবে না।

সন্ধ্যার পরেই অম্বিকাঘোষালকে ডাকিয়া তিনি কথাগুলি বলিলেন।

নিবারণ যে অবনতি স্বীকার করে নাই, তাঁহার অগ্রজের মান রাখে নাই, তারকের স্ত্রীর পক্ষ নিয়া তাঁহাদের শত্রুতাসাধনের সংকল্প পরিত্যাগ করে নাই,—ইহাতে অম্বিকাঘোষাল মনে মনে যারপরনাই রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিষয়বুদ্ধিতে তিনি যারপরনাই পরিপক্ক. অগ্রজ হরিঘোষাল তাঁহার গেঁয়ে বুদ্ধিতে যাই ভাবুন, যাদব ত্যাগ করিল বলিয়াই যে নিবারণের মত বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মক্ষম, তেজস্বী দৃঢ়চেতা ও উদ্যমশীল যুবক সত্যই নিরুপায় হইয়া মাথা হেঁট করিবে, এ ভরসা তিনি কমই করিয়াছেন। যাদবের নিবারণকে ত্যাগ করিতে হইল না, নিবারণই তেজে প্রতিপালক ভ্রাতার আশ্রয় ত্যাগ করিল। ত্যাগ করিল—এখন তার পথ একটা সে করিয়া নিবেই। দুদিন ক্লেশ হয়ত কিছু পাইবে,—কিন্তু তাহাতে মাথা হেঁট করিবার ছেলে সে নয়। বরং জিদ তার বাড়িবে। তাঁদের জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। এতদিন হয়ত মতলব করিয়া সে কিছু করে নাই,—যাহা হইয়াছে ঘটনাচক্রে হইয়া গিয়াছে। এখন মতলব করিয়াই তাঁদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। তিনি দূরে থাকেন। অগ্রজের রাগদ্বেষ যত আছে, বুদ্ধি তত নাই। সব কাজেই একেবারে গেঁয়ে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে চলেন। গ্রাম্য সমাজে তিনি সকলের অপ্রিয়, নিবারণ সকলের প্রিয়। এ অবস্থায় নিবারণকে জব্দ করা তাঁহার অগ্রজের সাধ্য নয়। বরং নিবারণই তাঁহাকে পদে পদে জব্দ করিবে। মানসম্ভ্রম ও স্বার্থ রক্ষা করিয়া গ্রামে বাস করাই তাঁহাদের দায় হইবে। এখন এত বড় শত্রুকে কিসে জব্দ করা যায়? কিসে তার লাঞ্ছনাও অন্ততঃ কিছু হইতে পারে? সমস্ত দিন অম্বিকাঘোষাল এই চিন্তাই করিতেছিলেন। কিন্তু কোনও উপায় এ পর্য্যন্ত ঠাওরাইতে পারেন নাই।

রাজতরঙ্গিণী যখন তাঁহার বুদ্ধির কথা জ্ঞাপন করিলেন, অম্বিকাঘোষাল আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। সহস্রমুখে প্রভুগৃহিণীর অসাধারণ বিচক্ষণতার প্রশংসা করিলেন।' বাবু যদি জটিল মামলামোকদ্দামায় তাঁহার বুদ্ধি একটু নেন, তবে যে বহু উপকৃত হইতে পারেন, একথাও শতবার উল্লেখ করিলেন। কর্ত্তাগৃহিণীর অক্ষয় স্বাস্থ্য আয়ু ও সম্পদ, অনন্ত বংশবিস্তার, পুত্রপৌত্রাদির অশেষ মঙ্গল ও অক্ষুণ্ণ ভাগ্য, শ্রীব্রাহ্মণতনয়ের বেদাধিক অলঙ্ঘনীয় বাক্যে তিনি বার বার কামনা করিলেন।

হাঁ! কর্ত্তা না বুঝুক, ঘোষাল তাঁর কদর বোঝে বটে! সগর্ব্ব হাস্যস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার সুপরিপুষ্ট প্রহৃষ্ট বদনমণ্ডল যেন ফাটিয়া বাহির হইবার মত হইল। হাস্যস্ফুরিত তাম্বূলদোক্তারঞ্জিত সূক্ষ্ম অধরাধরান্তরে তাম্বুলদোক্তারঞ্জিত বৃহৎ দন্ত পাটিদ্বয় তাঁহার পূর্ণ বিকশিত হইল! কহিলেন, "হাঁ! কর্ত্তা বুঝুন না বুঝুন, তুমি ত বুঝলে ঘোষালঠাকুরপো কত বুদ্ধি আমি ধরি। তা কর্ত্তাকে ধ'রে প'ড়ে—যে ক'রে পার, এটা করা চাই-ই। নইলে নিবারণ যে বজ্জাত—গায় তোমরা টিকৃতে পারবে ভেবেছ? আর কর্ত্তাকেও ব'লো—জানলে তিনি রাজি হ'লে পর ভাল ক'রে ব'লো—এ বুদ্ধি [illegible]!—হঁ! [illegible] মাথায় কি [illegible]? তোমাদের বিদ্যে যত কাগজ পত্তরে। [illegible] কখনও আসে? হঁ!—বল না?"

"এও কি ব'লতে হয় বৌঠাকরুণ? আমাদের কি আর মাথা? কেবল গোবরে ভরা। সারাদিন কত ভাবছি, এমন বুদ্ধিটা ত কই মাথায় এল না? তা কর্ত্তাকেও ব'লব বই কি। দুশোবার ক'রে ব'লব। আর তিনিই কি বোঝেন না বৌঠাকরুণ? নইলে এত বড় সংসারটা—আপনার হাতেই ত সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন? ফিরেও কি কোনও দিকে চান কখনও? আপনি যা দিয়ে করেন, কথাটিও নেই তাতে।"

"তা করেন বইকি ঘোষালঠাকুরপো। তা খুবই করেন বই কি? ভাগ্যি আর ব'লতে? কর্ত্তার মত সোয়ামী খুব বড় তপিস্যে না থাকলে কোনও মেয়ে মানুষে পায় গা? এখন এই তপিস্যে নিয়ে যেতে পারি, তবেই সে বলি ভাগ্যি। বলি ও ঝি! ঝি! কোথায় গো মলি আঁটকুঁড়ীর বেটী! এই যে! হুঁ—লুকিয়ে বুঝি শুনছিলি—আমরা কি বলি? আ সর্ব্বনাশী ঘরভাঙ্গানী? তা শুনলি ত। দ্যাখ্ কত খানি বুদ্ধি আমি রাখি। ঘোষালঠাকুরপো যে এমন ধড়িবাজ—অমন ইন্দির তাত্তুল্যি কর্ত্তার ডান হাত ব'লেও হয়—সেও ব'লছে, সারাদিন ভেবেও এই বুদ্ধি ওর মাথায় ঢোকেনি। আর—কর্ত্তা যদি আমার বুদ্ধি নিয়ে নিয়ে মামলা করেন, জজসাহেবের সাধ্যি কি যে খুঁৎ ধ'রে তাঁকে হারিয়ে দেয়।—তা যানা, ঐ যে সন্দেশ এনেছে, তারির গোটাকত, আর সরে দুধে খানিকটে এনে এইখেনে ঠাইপিঁড়ি করে ঘোষালঠাকুরপোকে খেতে দে।—একটু জল

খেয়ে যেতে হবে তাই। সেই কখন দুটি নাকেমুখে গুজে বেরিয়েছ—বলি ও ঝি! ওলো শোন্ শোন্—দাঁড়ানা মাগী একটু!—হাঁ, শুষনীর মাকে গিয়ে বল্, খোকার জন্তে যে পাণ সাজা হ'য়েছে, বৌমার ঘর থেকে তার গোটা কত এনে দিয়ে যায়। যা এখন খাবার নিয়ে আয়গে। যা না? আবার হা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন লো?"

জলযোগান্তে পরিতুষ্ট ঘোষাল গিয়া বৈঠকখানায় আপন কাজ নিয়া বসিলেন। ক্রমে লোকজন সব বিদায় হইল। বেণীবাবু ক্লান্তিহারিণী ও চিত্তবিনোদিনী একপাত্র সুরা পান করতঃ শিথিলনীবি হইয়া বড় একটি তাকিয়ার আরামে হেলিয়া দেহভঙ্গি রক্ষা করিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গিয়াছিল, গড়গড়ার নলটি তুলিয়া মুখে দিলেন। ঘোষাল আসিয়া তখন কাছে বসিলেন। প্রতিপক্ষ সহরবাসীগণের পরম উপভোগ্য গুপ্তনিন্দাবাদ সরসকণ্ঠে কিছু কীর্ত্তন করিয়া, নিজের কথা উপস্থিত করিলেন। ইহা যে স্বয়ং গৃহিণীরই উপদিষ্ট প্রস্তাব, সালঙ্কারে তাহা বর্ণনা করিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে চিরানুগ্রাহক, চিরপ্রতিপালক, তথা ইহসংসারে একমাত্র আশ্রয়দাতা, প্রভুকে বড় শক্ত করিয়াই ধরিয়া পড়িলেন।

তাই ত! স্বয়ং গৃহিণীও যে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এত সহজ মিত্রযোগ ঘটে নাই! এক্ষেত্রে গৃহিণীর হাস্তরঙ্গরোদনরোষাভিমানময়ী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি যে কিদৃশী হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া বেণীবাবু একটু হাসিলেনও বটে। একটু ভাবিয়া শেষে ঈষৎ স্মিত মুখে কহিলেন, "তাইত; বড় মুস্কিল হে ঘোষাল! এটা কি হ'তে পারে? যাদব এতে রাজি হবে কেন?"

"আপনি একটু জোর ক'রে ব'ল্লেই হবে বই কি? ভয়ে না করুক, চক্ষুলজ্জাতেও যাদব আপনার কথা ঠেল্‌তে পারবে না।"

"কিন্তু—তার মা—এটা কি ক'রে তাকে বলি যে জোর ক'রে তাকে কাশী পাঠিয়ে দেও। না গেলে খেতে দিও না।"

ঘোষাল উত্তর করিলেন, "ওটা হ'ল—কি জানেন—একটা অবান্তর কথার মত। ওতে এমন যায় আসেনা কিছু। পাঁচ টাকা ক'রে বাড়ীতে তার মাকে পাঠালেই যে নিবারণের সব দুঃখু ঘুচে গেল, তা হ'তেই পারে না। আর নিবারণ জুখোড় ছেলে, ক্ষমতাও আছে; ক'রে খেতে সে পারবে। আসল কথা হ'চ্চে শেষ কথাটা। যাদবকে তার বাড়ীর ভাগ দাদার হাতে এখন ছেড়ে দিতেই হবে। এমন জব্দ আর নিবারণ কিছুতেই হবে না। দাদার মত সরিকের পাল্লায় প'ড়লেই বাছাধনকে নাকের জলে চোকের জলে এক হ'তে হবে।"

"তবে কথা হ'ল এইটেই। ওটা ছেড়েই দেওগে না?"

"ওটা ছাড়্‌তেই অবিশ্যি হবে। তবে এক্ষুণি ছাড়্‌বেন না। দুটো কথা ব'লেই চাপ দিন,—শেষে তার অনুরোধেই যেন এইটে ছেড়ে দিলেন, এম্‌নি ধারা দেখাবে। তার কাছে ঐটেই কিনা হ'ল বেশী শক্ত। শেষের আসল ওই কথাটায় অগত্যে সে রাজি হবে, হ'য়ে বরং ভাগ্যিই মনে ক'র্‌বে। আর নিবারণের উপর সেও ত বড় খুসী হ'য়ে আসেনি। তাকে একটু শাস্তি দেওয়া—এতে তার এমন অমতই বা কেন হবে?"

"আচ্ছা, দেখা ত-যাক্। যাদবকে তবে—কাল এমনি সময় একবার আস্‌তে ব'লো।"

পরদিন রাত্রিকালে যাদব আসিয়া বেণীবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। বেণীবাবু ধীর সংযতভাবে, অথচ যথোচিত দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি উপস্থিত করিলেন। যাদব যেন বজ্রাহত হইল। নিবারণের আচরণ সম্বন্ধেই আলোচনা একটা হইবে যাদব তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং বেণীবাবু যে এরূপ একটা অনুরোধ বা আদেশ তাহাকে করিবেন, ইহা মনেও করিতে পারে নাই। তাহার মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভাবিল, তাহার নিজের শক্তিতে ওকালতীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে, কোনও ইস্কুলে মাষ্টারী নিয়া নাহয় দীনভাবে দিনযাপন করিবে, তবু প্রতিষ্ঠাবান্ ধনী মরুব্বির এমন হীন দাসত্ব সে করিবে না। কিন্তু—চারুমুখী—সে কি সেই দীনতার সহভাগিনী হইতে চাহিবে? মনটা তার বড় দমিয়া গেল। ওদিকে বেণীবাবুও সম্মুখে উপবিষ্ট। বরাবর গুরুর মত সশ্রদ্ধবিনয়ে তাঁহার সকল কথা সে পালন করিয়া আসিয়াছে। স্নেহ যথেষ্ট পাইয়াছে, উপকৃতও যথেষ্ট হইয়াছে। ভয় না করুক, সোজা কেমন করিয়া তাঁহার মুখের উপরে বলে, না, আপনার কথা আমি শুনিব না।

বেণীবাবুও নীরবে কতক ক্ষণ বসিয়া তামাকু সেবন করিলেন। মাটির মত মুখখানি করিয়া যাদব সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া বড় দুঃখও তাঁহার হইল। যাদবকে তিনি বাস্তবিকই স্নেহ করিতেন।

তাঁহার প্রস্তাবও যে অতি কঠোর ও অসঙ্গত এবং যাদবের পক্ষে অতি গ্লানিজনক হইয়াছে, তাহাও তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষালও যে তাঁর নিজের লোক, অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত, যারপরনাই কর্ম্মক্ষম, চতুর ও বুদ্ধিমান্। সকল কাজে অমন আর একটি দক্ষ পরিপক্ব লোক দুর্লভ। আবার গৃহিণীও তাঁর সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছেন। করাই বা যায় কি!

যাদবের মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া সস্নেহ স্বরে তিনি কহিলেন, "কি যাদব, কি ভাবছ? বড় অসঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে কথাগুলো, নয়? ভাবছ, উনি মুরুব্বি লোক, অবিচারে কি শক্ত মুস্কিলেই আমায় ফেল্লেন—"

যাদব বড় লজ্জা পাইয়া কহিল, "আজ্ঞে, তা—নয় কাকামশাই,—তবে নিজের মা, আপনি নিজেই ত বুঝতে পারেন—কি ক'রে এখন তাঁকে বলি—"

"হাঁ, তোমার মার উপর অতটা জবরদস্তী করা—সেটা বড় নিষ্ঠুরের মতই হয় বটে। মা মনে ব্যথা পাবেন, লোকেও বড় নিন্দা ক'রবে। আর নেহাৎ তিনি রাজি না হ'লে তাঁর খরচ বন্ধ ক'রে দেবে, সেটাও বড় অধর্ম্মের কথা হয়। তবে একবার প্রস্তাব ক'রে দেখতে পার,—যদি তিনি সহজে রাজি হন ভাল, না হন, আচ্ছা দিও, তবে বাড়ীতেই তাঁকে খরচ পাঠিয়ে দিও। পেড়াপীড়ি বেশী নাই ক'ল্লে। তবে খুব বেশী দেওয়াটাও ভাল হবে না। তাতে প্রকারান্তরে নিবারণের সাহায্য করাই হবে। এটা তুমি নিজেও অবশ্য বুঝতে পার।"

যাদবের মনের ভার যেন চৌদ্দ আনা হাল্কা হইয়া গেল। না, বেণীবাবু অবিবেচকও নন, আর তার প্রতি একেবারে স্নেহহীনও নন।

যাদব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "আর ওই কথাটা—ওর যে কোনও দরকার তেমন আছে, তা আমার মনে হয় না। নিবারণের আর যাই দোষ থাক, বড় তেজী সে, আর নিজের একটা অভিমানও তার বেশ আছে। আমি কিছু না ব'ল্লেও, বাড়ীতে আমার অংশ সে আলাদা ক'রেই রেখে দেবে। এই ত—দুচার বছর অন্তর আমি দেশে যাই—যে ঘরটায় গিয়ে আমরা থাকি, জিনিষপত্র সব যেমন সাজিয়ে রেখে আসি, তেমনি থাকে। সে ঘর সে ব্যবহার করে না। কেবল মাঝে মাঝে খুলে হাওয়া দিয়ে—পরিষ্কার করিয়ে রাখে।"

"তা হ'তে পারে। তবে—",

যাদব কহিল, "বরং আমি তাকে লিখে দেব, পাড়ার পাঁচজনকে ডাকিয়ে তার ভাগটা সে বুঝে নিক, আমার ভাগটা আলাদা ক'রে রাখুক। আমি বরং কারও কাছে টাকা পাঠিয়ে বেড়া টেড়া দিয়ে তা ঘিরিয়ে রাখাব যে—"

"তা ক'র্ত্তে পার। তবে—ব'লছিলাম কি, নিবারণ কি ওতে জব্দ হবে মনে কর? সে তেজী ছেলে,—লেখাপড়া বেশী না শিখলেও বুদ্ধি আছে, দেহেও শক্তি আছে,—যা হক্, একটা কিছু ক'রে নিতে সে পার্‌বে। কিন্তু তাতে তোমার মর্য্যাদা ত কিছুই থাকল না। এতদিন খাওয়ালে পরালে, এই যে কিছু গ্রাহ্যি না ক'রে তোমায় এমন অপমানটা ক'ল্লে—ঘোষালদের কথা কিছু ধ'র্‌লাম—তার ত কিছুই হ'লনা। একটু শাস্তি তাকে দেওয়া দরকার মনে কর না কি? এর পর ত সে তোমাকে আরও গ্রাহ্যি ক'র্‌বে না। গাঁয়ের সব লোকও তাকেই ধন্যি ধন্যি ক'র্‌বে, আর তোমাকে ধিক্কার দেবে। তাই ব'লছিলাম, তাকে একটু জব্দ ক'র্ত্তে হ'চ্চে, নইলে তোমার মান থাকবে না।—একথা আমি ব'লছি না যে, বরাবরই হরিঘোষালকে তোমাদের বাড়ীতে একটা দখল দিয়ে রাখবে, তার সঙ্গে সরিকী ঝগড়া ক'র্‌বার জন্যে। তবে আপাততঃ এইটে ক'রে দেখ না। আমি ব'লছি, দেখো, ছমাস যেতে না যেতে সে এসে তোমার পায়ে ধ'রে প'ড়্‌বে। তখন নিজের মান বজায় রেখে সব মিটিয়ে ফেলতে পার্‌বে। উকিল হ'য়েছ, পরের মামলায় এর চাইতেও শক্ত কত চালবাজি ক'র্ত্তে হয়,—আর নিজের মামলায় এইটুকুতেই ভ'ড়কে যাচ্ছ?"

যাদব দেখিল, বেণীবাবু যাহা বলিতেছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেবল অসঙ্গত নয়ই বা কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় অতি উত্তম উপযোগী নীতিও বটে এই। নিবারণ একটু জব্দ হইয়া তাহার বাধ্য যদি হয়, তবে—সে ত ভাল কথাই। একটু ভাবিয়া যাদব কহিল, "আচ্ছা দেখি,—আপনি যা ব'লছেন, সেটা দেখতে আপাততঃ একটু কেমন কেমন হলেও শেষে বোধ হয় ভালই হবে। তা দয়া ক'রে কিছু সময় যদি আমাকে দেন—সবদিকটা ভাল ক'রে একবার ভেবে দেখতে চাই।"

"তা বেশ, একটু ভেবে দেখ্‌বে বই কি? এত বড় কথাটা—ঝাঁ করে একটা সিদ্ধান্ত কেউ ক'রে ফেল্‌তে পারে? তবে এটা যেন মনে ক'রোনা বাবা, যে আমি জবরদস্তী কিছু ক'চ্চি। তোমার ভালর জন্যে পরামর্শ একটা দিলাম্‌। এখন নিজে বেশ ক'রে ভেবে দেখ। বউমাকে গিয়েও সব বল,—তিনিও ত বেশ বুদ্ধিমতী আছেন। তারপর নিজেরা বুঝে, যা ভাল হয় ক'র্‌বে।"

"যে আজ্ঞে।"

যাদব বিদায় হইল। বেণীবাবুও অন্তঃপুরে গিয়া সফল-গর্ব্বা প্রহৃষ্টমুখী বহুল রসবাগ্‌ভাগিনী গৃহিণীর সম্মুখে আহারে বসিলেন। (ক্রমশঃ)

পল্লী মঙ্গল।

মড়ক আজিকে হানা দিয়াছেরে পল্লীর অঙ্গিনায়
মৃত্যুসায়রে প্রভু ও ভৃত্য অবিরাম খাবি খায়॥
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া পরিবার পোষে যারা
কোমর বাঁধিয়া মরণের দূত তাদেরি দিতেছে তাড়া॥
মজুর খাটিয়া খাইত যাহারা রোগেতে পড়েছে নুয়ে
শয্যা বিহীন ঠাণ্ডা মেঝেতে কোঁকাইছে শুয়ে শুয়ে॥
বিচালি বিছায়ে শুয়েছে যাহারা ছেড়া কাঁথা দিয়ে মুড়ি
তাদেরো শিয়রে মরণ হাসিয়া উঁকি মারে গুঁড়ি গুঁড়ি॥
বার্লি কিনিয়া পথ্য করাতে সম্বল নাহি যার
ব্যথায় ব্যথিত মিলে কি তাহার বৈদ্য কি ডাক্তার॥
ভদ্রলোকেরা মান ধুয়ে খায় অন্ন নাহিক ঘরে,
ভিক্ষা করেনা সন্তান যদি চোখের উপরে মরে॥
পথ্য অভাবে, প্রাণপাখী উড়ে ভাঙ্গা খাঁচাখানা ফেলে
ঔষধ বিনা মায়ের কোলেতে দাপায়ে মরিছে ছেলে॥
পল্লীবধূরা রোগে দুঃখে সারা কষ্টে কলসী কক্ষে
পচা ডোবা হ'তে বিষজল আনে কম্পিত পদ বক্ষে॥
আবরণ বিনা শিশুসন্তান শিটকায়ে মরে শীতে
দেশ-মাতৃক হয়েছে ব্যস্ত কাপাসের চাষ দিতে॥
চুপ কর্‌, ওরে চুপ কর্‌ তোরা, চেপে রাখ হাহাকার
নেতার দলেরা সেরে নিক আগে স্বরাজের আবদার॥
ইবসেন আর ওয়াইল্ডের—কাহার থিওরি ভালো
আরাধনা করে আনা যায় কিনা ঘরে বাহিরের আলো॥
বৈষ্ণব কবি অথবা ঠাকুর, কাহার প্রতিভা বেশী
এ সকল কথা ঠিক হয়ে যাক্‌, যাতে এত রেষা রেষী॥
আর্টের পরে আছে কিনা আছে সুরুচির অধিকার
সকল দিকটা বুঝে নিই আগে, হয়ে যাক্‌ সুবিচার॥
রমণীর কাঁধে তুলে ধরি আগে পুরুষের রাজ ছাতি
বামুনে কায়েতে মিশাল করিয়া গড়ে নিই আগে জাতি॥
এরি মাঝে [illegible] অনাহারে চ'লে যাস্‌ যমালয়
অন্তরে মোরা দুঃখিত হব, নাহিক তাহে সংশয়॥
বাঁধা খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা তুলে চটাপট
বাস্তুভিটায় তুলে দেব ভাই স্মৃতিরক্ষার মঠ॥

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

যৎকিঞ্চিৎ।

মধু গোয়ালা দুধে জল মিশাইতেছিল। ছেলে বদু কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মধু কহিল, "হাঁ বাবা বদু, আমি কি ক'চ্চি বল ত?"

"দুধে জল দিচ্চ, আর কি ক'র্‌বে?"

"নারে পাগল! দুধে জল দিচ্চি না, জলে দুধ দিচ্চি। বুঝ্‌লি ত? খদ্দের যদি কেউ এসে শুধোয়, দুধে কি জল দিয়েছে? ব'লবি 'না।' জান্‌লি, এতে কোনও মিথ্যে তোর বলা হবে না। বুঝ্‌লি ত?"

——

"ওহে ছোক্‌রা! বেলা কটা বেজেছে ব'ল্‌তে পার?"

"বারটা মশাই।"

"বারটা! যোটে বারটা! না, আরও বেশী বেজেছে।

"বারটার বেশী ত আর বাজে না মশাই? তারপরেই ত একেবারে ক'মে আবার একটা দু'টা ক'রে সুরু হয় যে।"

"আপনি ত ভারী জোচ্চোর মশাই!' এই জমি যখন কিনি, আপনি বল্লেন উঠ্‌তি সহর বছর খানেক পরে হাজার টাকা পেয়েও এ জমি আপনি ছাড়বেন না। কই, সে রকম ত কিছু দেখছি না।"

"তা মশাই—তা মশাই—জমি আপনি হাজার টাকা পেয়ে ছাড়েন নি ত। কই, আমার কথাটা কি মিথ্যে হয়েছে?"

রূপগর্ব্বিতা। বল্ না ভাই, সত্যি কি? উনি বলেন, খুকী আমারই রূপ কেড়ে নিয়েছে।

সখী। খুকী নিয়েছে! তাই বল! আমি বলি, রূপ কোথায় গেল?

"ভাল কবিতা ত আপনি শুন্‌তে খুব ভালবাসেন।" তরুণ কবি ললিতমোহন কবিতার খাতা খুলিল।

আগন্তুক।—তা তার জন্যে কিছু এসে যায় না। ইচ্ছে হয়, তুমি যেমন লিখেছ একটা পড় না।

ভাবুক কবি।—(জ্যোৎস্না রাত্রে ছাদে বসিয়া) "আহা, শরৎশশী কি সুন্দর!—কি উজ্জ্বল তার শোভা!"

বন্ধু। হায়, হায়! এদ্দিন কেন মনের কথাটা খুলে বলনি? কাল যে গোপালের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেল!

"তাই ত! তে-মাথায় এসে প'ড়লাম। কোন্ পথে এখন যাই?"

"কেন ভাবনা কি? ওই যে মোটা লোকটি যাচ্চে, ওই পথেই চল না। শাস্ত্রে আছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।"

কবিরাজ। "বেলপাতার রস দিয়ে এই ওষুধটি খাবে।"

রোগী। "বেলপাতার রস? কি সর্ব্বনাশ! আমি যে বষ্টম! তুলসীপাতার রসে খেলে হয় না ক'বরেজ মশাই?"

সাধু প্রচারক। দরিদ্রনারায়ণের সেবা কর—দরিদ্রনারায়ণের সেবা কর! তার বড় ধর্ম্ম আর নাই।

গৃহস্থ। তাতে ফল কি হবে ঠাকুর? তিনি ত দিতে পারবেন না কিছু। তার চাইতে আমাদের যে লক্ষ্মীনারায়ণ—তাঁর সেবা করাই ত ভাল।

"লক্ষহীরার গল্প শুনেছিস্?"

"লক্ষ হীরা! আহা, বল্ বল্—কোন্ ভাগ্যিমানের ঘরে আছে ভাই?"

পণ্ডিত। ত্রিভুবন কিনা তিনটি ভুবন। আচ্ছা, কোথায় কোথায় বল ত?

ছাত্র। এক ভুবন ত ওই। আর দুটি কোথায় তা ত জানিনে পণ্ডিত মশাই?

গুরু মহাশয়। 'অবতার' কি না যিনি 'অবতরণ' করেন অর্থাৎ কিনা ধরায় নামেন। এই যেমন ভগবানের 'কল্কি অবতার'। বুঝ্‌লি ত রে ন্যাপ্‌লা?

নেপাল। হাঁ, বুঝেছি—বুঝেছি গুরু মশাই। এই যেমন আমার ভগা'দার কল্কি অবতার হ'তেই আছে।"

গুরু। সে কিরে হতভাগা!

নেপাল। যখনই তামাক খাবে - হুঁকো থেকে কল্কিটে নামিয়ে অমনি মাটিতে রাখে। তাই ত কল্কি অবতার হ'ল, না?"

ত্রুটি স্বীকার।

পর কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের যুগ্মসংখ্যা একত্রে অগ্রহায়ণের প্রথমেই বাহির হইবে এইরূপ আমরা আমাদের জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইল, তা ছাড়া আরও কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল। এবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের বড় প্রকোপ, ইহা সকলেই জানেন। সম্পাদক মহাশয় নিজে এই রোগে দিন অশক্ত ছিলেন। তাঁহার সহযোগী যাঁহারা, তাঁহারাও কেহ কেহ, এই কারণে সময় মত বিশেষ করেন নাই। ছাপাখানায়ও কতকগুলি বড় অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এবার আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫ম বর্ষ | পৌষ—১৩২৫। | ৯ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইয়োরোপের বিপ্লব।

এযুদ্ধ শেষ হইল,—স্থায়ী সন্ধিতে শান্তি স্থাপনার আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু সহজে এই শান্তি ইয়োরোপে ফিরিয়া আসিবে কি? বর্ত্তমান যুগে ইয়োরোপই সকল শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ,—প্রায় সমস্ত পৃথিবী এই কেন্দ্রের সঙ্গে বাঁধা। ইয়োরোপ সংক্ষুব্ধ হইলে সমস্ত পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাই আশু এই প্রত্যাশিত শান্তির পথে কোনও বিঘ্নের সূচনা দেখা গেলে পৃথিবীবাসী সকলের পক্ষেই তাহা আশঙ্কার কথা। জর্ম্মাণীর শক্তি চূর্ণ হইয়াছে,—নাগপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, হাতের সব অস্ত্র তার প্রতিপক্ষ কাড়িয়া নিয়াছে, সেদিক হইতে বিঘ্নের কোন আশঙ্কা নাই।

কিন্তু বড় প্রবল একটা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ইয়োরোপে দেখা যাইতেছে। এই বিপ্লবে রুষিয়া ছারখার হইয়াছে—বিকট এক দানবীয় অতি বিভৎস শোনিত ক্রীড়া সেখানে চলিতেছে। বিশাল সেই ভূখণ্ডে অন্ন নাই, ধন নাই, কৃষি নাই, ব্যবসায় বাণিজ্য নাই, রাজশাসন নাই—আছে শুধু দেশব্যাপী বুভুক্ষার হাহাকার, গৃহহীন আর্ত্তের কাতর চীৎকার, নৃশংস ঘাতকের অসিপ্রহার পথে ঘাটে মৃত গো অশ্ব মানবের গলিত শবের পূতিগন্ধ বিস্তার। দুইবৎসর পূর্ব্বেও ধনে জনে পূর্ণ অমিত বিক্রমে শাসিত বিশাল এক সাম্রাজ্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেখানে আজ এই দৃশ্য! পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কি আর কোনও দেশের কি কোনও জাতির ঠিক এমন দশা হইয়াছে? বাহিরের কোনও দুর্দ্দান্ত শত্রু আসিয়া ত এমন বিপর্য্যয় ঘটায় নাই।—দেশের লোক দেশের মধ্যে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে তার ফলে রুষিয়ার আজ এই দুর্গতি।

রুসিয়ায় যখন প্রথম এই বিপ্লব আরম্ভ হইল, একশক্তিধর রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া একেবারে চরম গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, চারিদিকে তখন জয় জয়কার উঠিয়াছিল, গণতন্ত্রের অমোঘ যুগমহিমার কত বড় প্রমাণ ও লক্ষণ কত জনে ইহাতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ! কোথায় সেই জয় জয়কার! কোথায় সেই মহিমা কির্ত্তন? সকলেই স্তম্ভিত ভীত! একি সর্ব্বনাশ। একি হইল! কি হইবে! উপায় কি! এ আগুণ কে এখন নিভাইবে? কোথায় গিয়া ইহার ধ্বংসশক্তির পরিসমাপ্তি হইবে? ইহার প্রসার কোথায় কি ভাবে বাধা দেওয়া যাইতে পারে! সর্ব্বত্র এই সভয় বিস্ময় ব্যক্ত হইতেছে। রাজনীতিবিৎগণ এখন এই সমস্যার চিন্তায় বিব্রত হইয়া উঠিতেছেন।

জর্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি মধ্য ইয়োরোপ অঞ্চলেও বিপ্লব দেখা দিয়াছে। এ বিপ্লব এখনও রুসিয়ার মত ভীষণ আকার ধরে নাই। রুষিয়াতেও প্রথমে ধরিয়াছিল না,—বিপ্লব ক্রমে এই পরিণতি লাভ করিয়াছে। মধ্য ইয়োরোপ অঞ্চলেও ক্রমে কি হইবে কে জানে? প্রথমে যতটা সংযমের ভাব দেখা গিয়াছিল, ক্রমেই যেন তাহা কমিয়া আসিতেছে। বিপ্লবের স্বাভাবিক ফলে দলে দলে উদ্দাম সংঘর্ষজাত উত্তেজনায় এবং ক্রমে তাহা হইতে উচ্ছৃঙ্খল হঠকারিতার কিছু কিছু লক্ষণ যেন প্রকাশ পাইতেছে।

প্রায় সকল দেশেই বহু অবস্থার সংযোগে আপনা হইতেই এক এক প্রকার রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতি গড়িয়া উঠে। ভালমন্দ সবই তার মধ্যে থাকে ইহাই স্বাভাবিক। বাগানের সকল গাছ সমান হয় না, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াও উঠে না,

উঠে না। তবু গাছগুলি জীবিত—ফল ফুল ধরে। যত্ন করিয়া তাকে জোরাল করান যায় তার শাখা পল্লব কিশলয়ের শ্রী ফিরান যায়, আরও ভাল ফুল তাহাতে জন্মান যায়। কিন্তু তাকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া কোনও কল্পিত আদর্শে মানুষের হাতে আবার তাকে গাছ করিয়া তোলা যায় না।

যেখানে গাছ নাই, কোনও আদর্শের কতক অনুরূপ নূতন গাছ সেখানে অশেষ যত্ন করিয়া জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন গাছ যাহা প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাকে আর নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না। বিভিন্ন দেশের পুরুষপরম্পরাগত রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজ পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে এই কথা খাটে। পুরুষ-পরম্পরাগত ভাব, চিন্তা, শিক্ষা দীক্ষা-আচার নীতি, আর অপরিহার্য্য বহু অবস্থা—সব মিলিয়া সকলের প্রভাব একত্র হইয়া এই সব পদ্ধতি নিজ নিজ বিশেষ এক এক আকার ধরিয়া জীবিত বস্তুর ন্যায় গড়িয়া বাড়িয়া উঠে। বহু সুধী ব্যক্তি তাই এই সব পদ্ধতিকে এক একটি (organism) অর্গ-নিজম বা জীবনীশক্তিতে স্বাভাবিক পরিণতিশীল বস্তু এই আখ্যা দিয়াছেন। রুগ্ন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইলে জীবিত বস্তুর স্বাস্থ্যের উন্নতি পুষ্টি ও বলাধান সম্ভব, সুস্থ জীবিত বস্তুর ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধিও সম্ভব। স্বাস্থ্যবলবৃদ্ধি-জাত পুষ্টি ও উন্নতির ক্রমপরিণতিতে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি পর্য্যন্তও অন্যরূপ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সহসা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ইহার বিচ্ছিন্ন মৃত উপাদানগুলি জুড়িয়া ইচ্ছামত নূতন ছাঁচে ইহাকে জীবন দিয়া কেহ গড়িতে পারে কি? এই সব উপাদানগুলি হইতে প্রকৃতিদেবী তাঁহার নিয়মে, তাঁহার সময়ে, আবার কোনও নূতন জীবিত বস্তু গড়িতে পারেন, গড়িয়াও থাকেন। কিন্তু এ গড়া মানুষের ইচ্ছায় মানুষের হাতে হয় না। মানুষ জীবিতকে মারিতে পারে, কিন্তু মৃতকে জীবিত করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপদ্ধতি ও সমাজপদ্ধতি চিরকাল একভাবে এক অবস্থায় কোথাও থাকে না। কালের গতিতে দেশের লোকের শিক্ষা দীক্ষা, চিত্তের গতি, চরিত্র, এবং কর্ম্মের লক্ষ্য ও রীতি প্রভৃতি, এবং বাহিরে বহু অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বহু নূতন নূতন বহু ঘটনার সংঘাতে, ইহাদের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অনেক সময় একেবারে ধাঁজ বদলাইয়াও যায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন ঘটে ধীরে ধীরে পরিণতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রভাবে। কখনও অতি ধীরে, কখনও অপেক্ষাকৃত দ্রুত—অবস্থার গতিকে যখনই যেভাবে এই পরিবর্ত্তন ঘটুক, লোক-সমাজ তাহাতে বিশেষ সংক্ষুব্ধ হয় না। পরিবর্ত্তনের অবস্থার সঙ্গে আপনা হইতেই বেশ আপনাকে মানাইয়া নেয়।

মূল যে শক্তি পদ্ধতিকে ধরিয়া রাখে, সেই শক্তি কোনও কারণে ক্ষীণ দুর্ব্বল ও অবশ হইয়া পড়িলে পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহাতেও একরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। দেশের লোকের চেষ্টায় সেই শক্তি পুনর্জ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হইলে অথবা বাহিরের নূতন কোনও শক্তি সেই শক্তির স্থান গ্রহণ করিলে, এই বিপ্লব এবং বিপ্লবজনিত সকল ক্লেশ দূর হয়। এরূপ বিপ্লব দেশের লোকে আপনারা ঘটায় না—বরং তাহার প্রশমনেরই সহায়তা করে।

কিন্তু দেশের জনসাধারণ যখন নূতন কোনও আদর্শের খেয়ালে ক্ষেপিয়া পুরাতনকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে তখন যে বিপ্লব ঘটে, সে বিপ্লব বড় ভয়াবহ হয়। নূতন প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়াই অবশ্য তাহারা পুরাতনকে ভাঙ্গে। কিন্তু ভাঙ্গা যত সহজ, নূতন কিছু গড়া তত সহজ হয় না।

ভাঙ্গিলেই গড়া যায় না, গেলেও তাহাতে বহু সময় অতীত হয়। তাই ভাঙ্গিলেই এমন বিপ্লব উপস্থিত হয়। অবশ্য পুরাতন পদ্ধতিতে বড় কোনও দোষত্রুটি থাকিলেই তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ একটা অভ্যুত্থান সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কখনও আবার এমনও দেখা যায় যে পুরাতনে দুঃসহ পীড়াদায়ক বড় দোষত্রুটি কিছু নাই, কিন্তু দেশের জন-সাধারণের মাথায় তাহার বিরোধী নূতন কোনও আদর্শের খেয়াল চাপিয়াছে, যাহার বশে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া পুরা-তনকে ভাঙ্গিয়া একটা বিপ্লব উপস্থিত করে। যে কারণে যে ভাবেই ঘটুক, এইরূপ বিপ্লবের চোট সামলাইতে সকল দেশকেই বড় বেশী বেগ পাইতে হয়। পুরাতনকে ভাঙ্গিবার সময় বিপ্লববাদীরা সাধারণতঃ এক মতাবলম্বী ও একতাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পুরাতন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, নূতন গড়ি-বার সময় আসিল, বহু মতবৈষম্য ও সংঘর্ষ তখন উপস্থিত হয়। বিপ্লববাদীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক দলই আপন মত ও আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবল ব্যতীত এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করিবার উপায়ন্তর নাই। পরস্পরের প্রতি উদ্যত এই অস্ত্র সম্বরণ

করাইতে পারে, উহারে এমন প্রভুশক্তিও নাই। আবার কেবল দলের সকলেই যে নিস্পৃহ ভাবে উন্নত আদর্শের প্রবর্ত্তনে দেশের হিতসাধনেই ব্রতী হন, তা নয়, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষার ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসূয়া বিদ্বেষ প্রভৃতি বহু অসৎপ্রবৃত্তির বশেও তাঁহারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। সংঘর্ষ যত বাড়িতে থাকে, স্বার্থনাশের আশঙ্কায় পরস্পরের প্রতি রোষ বিদ্বেষ জীঘাংসা প্রভৃতি বৃত্তি তত ভীষণ আকার ধারণ করে। ইহাতে যে দেশময় অতি বীভৎস একটা নৃশংস অরাজক ব্যাপার উপস্থিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় কোনওরূপ রাষ্ট্রপদ্ধতি গঠন একেবারেই তখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অসাধারণ প্রতিভাবান্ কোনও দলপতির অধীনে বড় কোনও একদলের সর্ব্বজয়ী সামরিক প্রভুত্ব, যে ভাবেই সম্ভব হউক পুরাতনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, অথবা কোনও বিদেশী শক্তির আধিপত্য, ইহার কোনও একটি ব্যতীত এই অসহনীয় উৎপাতের শান্তি কখনও হয় না। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ইহার সত্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন। পুরাতনকে, পুরাতন পদ্ধতিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবার পরে বিভিন্ন দলের নৃশংস সংঘর্ষে ফরাসী দেশ ভীষণ এক দানবীয় শোণিতলীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে। শেষে অমিত শক্তিধর নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানে কিছুকালের জন্য একটা শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নেপোলিয়ানের এই অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল, কারণ প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উদ্যতাস্ত্র হইয়া উঠে এবং আত্মরক্ষার জন্য বহির্যুদ্ধে অন্ততঃ একটা একতার নিতান্ত আবশ্যক তখন তাহার হয়। নতুবা নেপোলিয়নের পক্ষেও এই সামরিক প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হইত কিনা বলা যায় না। নেপোলিয়নের পতনের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী কোনও পদ্ধতি ফরাসী দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তারপর এই বিপ্লব আরম্ভের প্রায় এক শতাব্দী কাল পরে স্থায়ী এক নূতন পদ্ধতি ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—দেশের লোক সন্তুষ্টচিত্তে তাহার অনুগত হইয়াছে। পুরাতনের কোনও চিহ্ন আর নাই, ফরাসী রাষ্ট্র একেবারে নূতন হইয়াছে। কিন্তু এই নূতনত্ব লাভ করিতে যে কি পরিমাণ শোণিত বিসর্জ্জন ফরাসীকে করিতে হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডেও একবার একটি বিপ্লব ঘটিয়াছিল। রাজপ্রভুত্বের সহিত পার্লামেণ্টের অধিকারের বিরোধ উপস্থিত হয়। সহজে এ বিরোধের মীমাংসা না ঘটায়, দুই পক্ষে যুদ্ধ বটে। যুদ্ধের সময় পিউরিটান ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক চরম ধর্ম্মসংস্কারকদলপুষ্ট সেনা মহাবীর ক্রমোয়েলের নেতৃত্বাধীনে বড় প্রবল হইয়া উঠে। শেষে রাজার প্রাণদণ্ড করিয়া তারপর পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া এই সেনাবলের সাহায্যে ক্রমোয়েল শাসনভার গ্রহণ করেন। পুরাতন পদ্ধতি তখন লোপ পাইয়াছে। নূতন এক শাসনপদ্ধতি স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু সুবিধা কিছুই হইল না। তখন ক্রমোয়েল রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভুত্বের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, অধীনস্থ দুর্জ্জয় সেনাবলের সাহায্যে অতি কঠোর শাসনে দেশের শান্তিরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আবার একটা অরাজক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। শাসনপদ্ধতি গঠনের কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। তখন ক্রমোয়েলের সহকারীরা পর্য্যন্ত বুঝিলেন, পুরাতন পদ্ধতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশে শান্তির শৃঙ্খলা সহজে হইবার নয়। প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ফরাসী দেশে ফরাসীরাজের আশ্রিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে আবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল,—পুরাতন রাষ্ট্রপদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন হইল। ইংরেজ জাতির বরাবরই বড় একটা গুণ এই যে তাহারা কোনও নূতন আদর্শের খেয়ালে বড় ক্ষেপে না। সহজ কার্য্যকরী বিষয়বুদ্ধি তাহাদের বড় তীক্ষ্ণ। সূক্ষ্ম যুক্তিযুক্ত কোনও আদর্শের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক, অবস্থার অনুরূপ একটা সমীচীন ব্যবস্থা করিয়া তাহারা চলিতে পারে। তাই সহজেই ভীষণ সেই বিপ্লবের উৎপাত হইতে তারা তখন রক্ষা পাইয়াছিল। প্রথম চার্লসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত মাত্র একাদশ বৎসর কাল গত হইয়াছিল। এই সহজ কার্য্যকরী বিষয়বুদ্ধির পরিচয় এখনও ইংরেজ জাতির মধ্যে বেশ পাওয়া যায়। ইংরেজের রাষ্ট্রপদ্ধতি, ধর্ম্মপদ্ধতি, সমাজপদ্ধতি, ব্যবসাপদ্ধতি, কিছুর মধ্যেই কোনও একটা সুযুক্তি যুক্ত আদর্শের মাত্র অনুবর্ত্তিতার লক্ষণ দেখা যায় না। সবই অবস্থানুরূপ ব্যবস্থায়, তার বর্ত্তমান

পরিণতি লাভ করিয়াছে, করিয়া মোটের উপর বেশ চলি- [illegible] কারণে সোয়ালিজম্ এনার্কিজম্ প্রভৃতি সমাজ [illegible] কোনও উপদ্রব ইংলণ্ডে বড় দেখা যায় না। [illegible] প্রমাণ ইহার সম্প্রতিই দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের [illegible] নারী জাতির জন্য পার্লামেণ্টের ভোট পাইবার [illegible] সাফ্রাগেট দলভুক্তা নারীরা বড় একটা আন্দোলন উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ইংরেজসমাজ ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনায়কগণ সকলেই ইহাদের প্রতি একান্ত বিমুখ ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরেই বিনা আন্দোলনে কোনও হুজ্জৎ হাঙ্গাম ব্যতীত নারীরা ভোট পাইয়াছে। যুদ্ধকালে নারীরা পুরুষোচিত বহু কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিল, এখন এ অধিকার না দিলে চলিবে না, তাহাদের সামলাইয়া রাখা যাইবে না, তাই নির্ব্বিবাদে পার্লামেণ্টে আইন পাশ হইয়া গেল, কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় নারীরা পার্লামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনের সময় ভোট দিতে পারিবে। কোনও নীতি বা আদর্শ লইয়া কোনও বাগ্‌-বিতণ্ডা হইল না। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা আবশ্যক, সুতরাং এই ব্যবস্থা হইল।

রুষিয়ার বিপ্লব তার স্বাভাবিক গতিতে এখন প্রায় তার চরম ভীষণতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এই বিপ্লব-শান্তির কোনও সূচনা এখনও দেখা যাইতেছে না। বরং বিপ্লাবক বোলশেভিক বাদই ইয়োরোপের অন্যান্যদেশে প্রসারিত হইবার আশঙ্কাই দেখা যাইতেছে।

মধ্য ইউরোপেও বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন রাষ্ট্রপদ্ধতি সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রাজগণ আর শক্তিধর-রূপে রাজাসনে আসীন নাই। রাজাব্যতীত নূতন রাষ্ট্র-পদ্ধতি গড়িবার চেষ্টাই সর্ব্বত্র হইতেছে। জর্ম্মণীতে প্রারম্ভে এই বিপ্লবেও এরূপ একটা সংযত গোছাল ভাবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল যে ফরাসী দেশে অনেকে ইহা একটা ভাণ বলিয়াই সন্দেহ করিতেছিলেন। কিন্তু এখন যেরূপ সংবাদ একটু আধটু পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় সেই সংযত ভাব ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে, মতের সংঘর্ষ ক্রমেই প্রবল হইতেছে। প্রথম, বোলশেভিক দল, দ্বিতীয় তদনুরূপ স্পার্টাকাস নামক জর্ম্মাণীতেই উদ্ভূত চরম সোয়ালিষ্ট দল, তৃতীয় মধ্যপন্থী সোয়ালিষ্ট দল, চতুর্থ সাধারণ গণতন্ত্রীদল—পঞ্চম পুরাতনের পক্ষপাতী রাজতন্ত্রবাদীদল—মোটামুটি এই পাঁচরকম দলের আবির্ভাব জর্ম্মাণীতে হইয়াছে এবং পরস্পর একটা বিরোধের ভাবও এখন বেশ দেখা দিয়াছে। জর্ম্মাণসেনা এখনও শ্রেণীবদ্ধ ও বড় সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কোথাও কোথাও সৈনিকগণ সেনানায়কদের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বোলশেভিকদের শাসনপরিষৎ বা 'সোভিয়েট' গঠিত করিয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ সেনা এখনও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সকল দল হইতে আলগা হইয়া আছে, এইরূপ বোধ হয়। এখন এই সেনা একযোগে যে দলে যাইবে, সেই দলই প্রবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই দলের প্রাবল্য যদি প্রতিপক্ষ বিজয়ী মিত্রশক্তি সমূহের অনভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহারা তাহাতে বাধা হইতে পারেন। এই সেনা আবার ভাগ ভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে গিয়াও মিশিতে পারে। তাহার ফলে জর্ম্মাণী হয়ত দ্বিতীয় রুষিয়ায় পরিণত হইবে। মিত্রশক্তিসমূহ জর্ম্মাণীর শান্তি-রক্ষার উপলক্ষে তখন জর্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে পারেন। ইহার যে কোনও অবস্থাই ঘটুক, জর্ম্মাণীতে অধুনা যে বিপ্লব চলিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়াবহ এক ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে।

রুষিয়ার বোলশেভিকবাদ জর্ম্মাণীতে আসিয়াছে। অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লববাদ অল্পবিস্তর প্রবেশ করিয়া শ্রমজীবী ও সৈনিকশ্রেণী সমূহের মধ্যেও কিছু কিছু বিক্ষোভের ভাব দেখা দিয়াছে। এখন জর্ম্মাণসেনা যদি জর্ম্মাণীর বোলশেভিক্ কিম্বা চরম সোয়ালিষ্ট পার্টাকাস দলে গিয়া প্রধানতঃ যোগ দেয় এবং সেইদল তাহার ফলে যদি অতি প্রবল হইয়া উঠে, তবে এই বিপ্লবের প্রভাব অন্যান্য দেশের সমাজ পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপদ্ধতির উপরেও বেশ জোরে গিয়া আঘাত করিতে পারে। তাহার ফলে যে কি হইবে, কেহই তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না। মধ্যে মধ্যে এইরূপে আশঙ্কার কথা কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন, এবং রাষ্ট্রনায়কগণ জনসাধারণকে সতর্ক করিতেছেন। ইংলণ্ডের সচিবগণ শ্রমজীবী জনসাধারণকে আশ্বাস দিতেছেন তাহাদের সুখ সুবিধা অনেক বাড়ান হইবে, অসন্তোষের কারণ সব দূর করা হইবে, আরও অনেক অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

অবস্থা এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নূতন নূতন সব

অপ্রত্যাশিত ঘ.না এমন দ্রুত পর্য্যায়ে ঘটিতেছে, যে অদূর ভবিষ্যতেই কোথায় কি ভাবে কি ঘটিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠা বড় কঠিন।

তাই বলিতেছিলাম এই যুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই কি শান্তি আসিবে? ইউরোপমণ্ডলে নূতন এক বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়া এই পৃথিবীকে ত আবার বিক্ষুব্ধ করিবে না?

বিজয়ী মিত্রশক্তি সমূহ সজাগ ও সতর্ক আছেন, কিন্তু যে সরিষায় তাঁহারা ভূত ছাড়াইবেন, সেই সরিষাকেই যদি ভূতে পায়, তবে তাহারা কি করিতে পারেন? যে সৈনিক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের সাহায্যে নায়কগণ এই বিপ্লব দমন করিতে পারেন, তাহাদের ঘাড়েই যদি বিপ্লবের খেয়াল চাপে, নায়কগণের শাসনবিধি সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে, আপনাদের হাতেই সকল শক্তি গ্রহণ করিয়া দলে দলে যাহা খুসী তাই করিতে থাকে, তবে নায়কগণের সাধ্য কি যে তাঁহাদের কয়টি-জোড়া মাত্র হাতে এ আগুণ নিভাইতে পারেন?

মূল্য বৃদ্ধি—স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি।

গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নিত্য ব্যবহার্য্য বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য অনেক বাড়িয়াছে। এই মূল্য-বৃদ্ধি অপরিহার্য্য স্বাভাবিক ইকনমিক (Economic) বা ব্যবসায়িক ও আর্থিক কারণে ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিকার নাই। দেশে নানারূপ ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তারে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের বিনিময় প্রসারে, চলতি টাকা বাড়িয়াছে, আর্থিক আয় লোকের বেশী হইয়াছে,—ফলে টাকার মূল্য বাড়িয়াছে। ইহাই সেই ইকনমিক বা ব্যবসায়িক ও আর্থিক কারণ যাহাতে টাকার দাম কমিয়াছে, অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা কম এখন পাওয়া যায় সহজ কথায় দ্রব্যাদির দাম চড়িয়াছে। তা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে আরও একটি বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। লোকের জীবনযাত্রার রীতিও ক্রমে উঁচু মাত্রায় উঠিয়া জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া উঠিয়াছে। আগে যাহাতে লোকে সন্তুষ্ট থাকিত, এখন আর তা থাকে না। অনেক রকমের অনেক বেশী বস্তু এখন লোকের লাগে, যা আগে লাগিত না। এ সব কমাইবার যো আর নাই। লোকে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ছাড়িতে আর পারে না। এ সব অনেকে বিলাসব্যসন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু কালধর্ম্মে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সামাজিক মার্জ্জিত রুচির মাত্রার অনুরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে যাহা না হইলে কেহ সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, পদে পদে অভাব অনুভব করে তাহাকে বিলাসব্যসন বলা যায় না। আর্থিক আয় যাহাদের এখন মূল্যাদির সমান অনুপাতে বাড়িয়াছে তাহাদের ক্লেশ কিছুই হইতেছে না, কিন্তু যাহাদের তা বাড়ে নাই,—তাহাদের ক্লেশ অবশ্য কঠোর হইবারই কথা। সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায়, যে ব্যবসায়বাণিজ্যাদি বৃত্তিতে যাহারা আছে, তাহাদের আর্থিক আয় বেশী বাড়িতেছে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বেতনে যাহারা কাজ করিতেছে, বেতনের হার মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সহসা বাড়িয়া উঠে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ইহাদের ক্লেশই বড় বেশী হয়। কিন্তু ব্যয়ের প্রয়োজনানুরূপ আয়বৃদ্ধি ব্যতীত এই ক্লেশ নিবারণের আর উপায় নাই, কারণ ব্যয়-সঙ্কোচ সম্ভব নয়—যদি অতিরিক্ত বিলাসব্যসনের অভ্যাস কাহারও না হইয়া থাকে। সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে এমন এক একটা যুগ আসে যখন স্বাভাবিক ইকনমিক কারণে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয়—আরও অন্যান্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবনযাত্রা রীতিও উন্নত ও ব্যয়বহুল হইয়া উঠে। শ্রেণী বিশেষের পক্ষে ইহাতে সাময়িক ক্লেশ ও অসুবিধা যতই হউক, মোটের উপর ইহার ফল ভাল বই মন্দ হয় না। যাহারা ক্লেশ পায়, তাহাদের মধ্যে একটা অশান্তি ও অস্থিরতা উপস্থিত হয়। আগে হয়ত ব্যয় কমাইতে চেষ্টা সকলে করে, কিন্তু যখন বুঝিতে পারে তাহা সম্ভব নয়, তখন আয়-বৃদ্ধির দিকে মন দেয়, সমস্ত শ্রমশক্তি তাহাতে নিয়োগ করিতে চেষ্টিত হয়। কোথায় কি কাজে কি ভাবে খাটিলে ঘরে আরও দুপয়সা আসিবে, তার জন্য অস্থির হইয়া সকলে বেড়ায়। প্রচলিত বৃত্তির পথে ইহার সম্ভাবনা না দেখিলে নূতন পথ খোঁজে, এবং খুঁজিলেই নূতন পথ বাহির হয়। আজকাল দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ একটা অস্থিরতা ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে। আগে বহুলোক নিষ্কর্ম্মা বাড়ীতে বসিয়া থাকিত, খাইয়া ঘুমাইয়া আরামবিরামে দিন কাটাইত। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। অনেকেই এখন কাজের অনুসন্ধানে বাহির হইতেছে। গৃহীত্ব-প্রধান বৃত্তিতে আয় যেখানে কম, লোকে অবসর সময়ে অন্য কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। অনেকে দিনরাত্রি অক্লান্ত শ্রমে খাটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, অনেক আফিসের কেরাণী ও ইস্কুলের শিক্ষক সকালে সন্ধ্যায় টুইসন করিয়া থাকেন। আরও কত রকম কাজ করিতে লোককে দেখা যায়। চাকরী বাকরী প্রভৃতি প্রচলিত কাজকর্ম্মে সুবিধা মোটেই না হওয়ায় অনেকে ছোট বড় নানারকম ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলেরও অনেক বড় বড় সহরে কত শিক্ষিত ভদ্রসন্তান নানারকম ব্যবসায়বাণিজ্যে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে।

অবশ্য এখনও বহু দুর্গতি আছে, এবং দুই দিনেই এ দুর্গতি দূর হইবে না। এই যে কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ও দেশনায়কগণের সাহায্যে (যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যাদির বিস্তারের সহায়তা ও তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা) ব্যতীত এসংগ্রামে সিদ্ধিলাভও সহজে হইবার নহে। কিন্তু এই যে একটা অস্থিরতা, বৃত্তির অনুসন্ধান

ও কর্ম্মোদ্যম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতেও বড় একটা শুভসূচনাক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়েছে—এখন শক্তি যাঁহাদের হাতে; তাঁহারা সহায়তা করিলেই সুফল ফলিবে। যথোপযুক্ত সহায়তা না পাইলেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কঠোর প্রয়োজনের তাড়নায় লোকে আপনারাও যে উদ্যম ও শ্রম করিতেছে ও করিবে, তাহার ফলও নিতান্ত অল্প হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধির ও জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির এই যে স্বাভাবিক গতি, ইহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা আন্দোলন করা বৃথা। এই গতি যথা সময়ে ইহার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়া পৌছিবে। সেই ফল যাহাতে শুভ হয় ও সন্নিকট হয়, তদুদ্দেশ্যে নেতৃশক্তির যে সহায়তা প্রয়োজন—আন্দোলন কিছু করিতে হইলে, তার জন্যই করা আবশ্যক।

আকস্মিক ও অস্বাভাবিক দুর্ম্মূল্যতা।

স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক কারণে ক্রমে ধীরে ধীরে হয়,—যে সব কারণে মূল্যবৃদ্ধি হয়, সেই সব কারণ ক্রমে লোকের আর্থিক আয়ও বাড়ায়। সর্ব্বত্র সমানভাবে না বাড়িলেও ইহার সঙ্গে লোকে একরূপ মানাইয়া উঠিতে পারে। মূল্যাদি বৃদ্ধি হেতু ব্যয়ের তুলনায় যাহাদের আয় কম থাকে, তাহারাও কঠোর-সংগ্রাম করিয়া মানাইয়া চলিতে চেষ্টা করে,—যতদিন না পারে, ক্লেশ পায় বটে, কিন্তু সে ক্লেশ সাধারণতঃ একেবারে মারাত্মক হয় না। কিন্তু সহসা যদি অতি দ্রুতবেগে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া উঠে, বুঝিতে হইবে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কোন হেতু ইহার মূলে আছে। এই হেতু দূর করিয়া দর স্বাভাবিক সীমায় না নামাইতে পারিলে, লোকের ক্লেশের আর অবধি থাকে না। আকস্মিক এই সব অসঙ্গত দুর্ম্মূল্যতার ভার সাধারণ লোকে সহিতে পারে না। যুদ্ধের সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিতে বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় যে সব দ্রব্যের যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হইতেছিল, তাহার প্রতিকারের উপায় ছিল না। যুদ্ধসংক্রান্ত অন্যান্য ক্লেশের ন্যায় ইহাও সকলকে সহিতে হইয়াছে। এখন যুদ্ধ থামিয়াছে,—কিন্তু ব্যবসায়বাণিজ্যের বাজার একেবারে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে কিছু বিলম্ব অবশ্য হইবে। কিন্তু দর কতক নামিতে পারে, এবং নামিয়াছিলও বটে। যুদ্ধের শেষ বৎসরে বিশেষতঃ গত শ্রাবণভাদ্র মাসে কাপড়ের দর বড় বেশী চড়িয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইতেই দর অনেক কমিয়া আবার চড়িয়াছে। কেন চড়িল? চাউল এদেশের প্রধান খাদ্য—চাউলের দরও দিন দিন বড় দ্রুতবেগে বাড়িতেছে। দুর্ভিক্ষের হাহাকারে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। এই চাউলের দরই বা এত বাড়িল কেন?

এ বৎসর বন্যায় অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছিল, কার্ত্তিকেও বৃষ্টিপাত হয় নাই। ইহাতে শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। চাউলের দরবৃদ্ধির পক্ষে ইহাও একটি কারণ বটে। কিন্তু গত বৎসর প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল, যুদ্ধের বাধায় বিদেশে রপ্তানীও খুব কম হইয়াছে। সঞ্চিত সেই চাউল এ বৎসরের এই অপ্রাচুর্য্য অবশ্য অনেক পূরণ করিতে পারার কথা। তবে শুনিতে পাই, বহু চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, অথবা রপ্তানী করিবে বলিয়া মাড়োয়ারী বণিকেরা কিনিয়া গোলাজাত করিতেছে। অনেকে বলেন, বাজারেও এই কথা শুনা যায়, যে এই কারণে চাউলের আকস্মিক এই দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

কৃষিজাত বা শিল্পজাত যে কোন দ্রব্যই কোনও দেশে অধিক উৎপন্ন হয়, তাহা বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে, হওয়াও উচিত। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় এই ভাবেই হইয়া থাকে। অনেক সময় বিদেশে রপ্তানী করিয়া দেশে অর্থাগমের উদ্দেশ্যেও বহু কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কিন্তু যে দ্রব্যই হউক, দেশজাত দ্রব্যের উপরে দেশীয় লোকের দাবী বেশী। দেশীয় লোকের অভাব ঘটাইয়া কোনও দ্রব্যেরই বিদেশে রপ্তানী হওয়া উচিত নয়। বণিকগণ স্বার্থান্ধ হইয়া এরূপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু যখনই করে, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে বাধা হওয়া প্রয়োজন। রাজধর্ম্মের ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এবার অন্নজন্মা কিছু হইয়াছে, ইহার উপরে যাহা জন্মিয়াছে তাহাও যদি বেশীর ভাগ বিদেশে চলিয়া যায়, দেশের অসংখ্য দুঃস্থ লোক যে না খাইয়া মরিবে। চাউলের এরূপ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি যদি এই কারণেই হইয়া থাকে—এবং তাহাই হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়,—তবে অবিলম্বে গবর্মেণ্টকে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। যদি না করা হয়, তবে কর্ত্তব্যের বড় ত্রুটি হইবে এবং এই ত্রুটিতে প্রজাবর্গকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে।—এই প্রতিকারের দাবী কি প্রজার রাজার উপর নাই? রাজশক্তি ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই, এই অসঙ্গত দুর্ম্মূল্যতা নিবারণ করিয়া দুঃখী প্রজার জীবনোপায় রক্ষা করিতে পারে। ইহা সাময়িক দুর্গতি,—রাজবিধিতে ইহার প্রশমন দুঃসাধ্য নয়।

এদিকে কাপড়ের দরও নামিয়া আবার চড়িয়াছে। বাজারে শুনিতে পাওয়া যায়, কাপড়ের আমদানী কম হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলায় কাপড়ের বাজার একেবারে মাড়োয়ারী বণিকের হাতে। যুদ্ধের সময় বিশেষতঃ গত পূজার পূর্ব্বে কাপড়ের দর যে এত চড়িয়াছিল, তার কারণ কেবল যুদ্ধ হেতু আমদানীর নূনতা তা নয়, সুযোগ বুঝিয়া জোটবন্দী হইয়াও মাড়োয়ারী মহাজনেরা বাজার বড় চড়া করিয়া রাখিয়াছিল। অতি লাভে তাহারা যেন ফাঁপিয়া উঠিতে ছিল। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় এই লাভে তাহাদের বাধা পড়িল। কিন্তু এত লোভ ত সহজে সামলান যায় না। মাড়োয়ারী মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যও দেখা দিয়াছিল বলিয়া শুনি। কিছুদিন পূর্ব্বে মাড়োয়ারী বণিক সমিতি—Marwari Chamber of Commerce—এক সংকল্প

করেন যে শীঘ্র তাঁহারা নূতন কাপড় আমদানী করিবেন না। বাজারটা একেবারে নামিয়া না যায়, কিছু চড়া থাকে, ইহাই যে এই সংকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। এই যে আমদানী কম বলিয়া কাপড়ের দর আবার চড়িল, ইহার কারণ কি কাপড়ের বাজারের প্রভু, মাড়োয়ারী বণিক্ সম্প্রদায়ের এই সংকল্প নয়? দেশে আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক-সংহতি নাই, যাহারা প্রচুর কাপড় আমদানী করিয়া এই দুর্গতি দূর করিতে পারে। নূতন কোনও সংহতি গঠনও শীঘ্র সহজে হইতে পারে না।

কোনও ব্যবসায় যখন এইরূপ কোনও দলবদ্ধ ধনী বণিক্ সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, তখন অতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা সেই ব্যবসায়াধীন দ্রব্যের মূল্য এইরূপ অসঙ্গত ভাবে চড়াইয়া রাখিতে পারে। আমেরিকায় বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে বণিক্ সংহতি সমূহের এই অত্যাচার দেখা যায়। এই সব সংহতির নাম সেখানে ট্রাষ্ট Trust। বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের বাজার ভিন্ন ভিন্ন এই সব ট্রাষ্টের হাতে। কত পরিমাণে কি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে,—কি দরে বাজারে তাহা বিক্রয় হইবে, তাহা ট্রাষ্টের সদস্যগণই নির্দ্ধারণ করেন। দর কমিতে পারে, এত প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সাধ্য হইলেও তাঁহারা উৎপাদন করান না। নূতন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর সাধ্য নাই ইহাদের প্রতিযোগিতা করিয়া কোনও দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ তার দর নামাইতে পারে। কারণ ইহাদের ধনবলের ইয়ত্তা নাই। এরূপ চেষ্টা কেহ করিলে, সেই দ্রব্যের দর তার ট্রাষ্ট এত নামাইয়া দেয়, যে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দিনও ব্যবসায়ে টিকিতে পারে না, ফেল হইয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া তাকে দিতে হয়। ইহার জন্য মজুত ফণ্ড থাকায় এই লোকসান ট্রাষ্ট অনায়াসে সহিতে পারে, কিন্তু নূতন ব্যবসায়ী মারা পড়ে। এদেশের কাপড়ের বাজারে মাড়োয়ারী বণিকগণ প্রায় একটা ট্রাষ্টের মতই হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মূলধন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ও ইহারা এইরূপে দখল করিয়া ফেলিতে পারে। দেশের লোকের যে কত দুর্গতি তখন হইবে, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়।

এখন ইহার উপায় কি? স্থায়ীভাবে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে, তাহার প্রতিকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে করা দুঃসাধ্য। মাড়োয়ারী বণিকরা যদি বলে, ইহার বেশী কাপড় আমরা আমদানী করিতে পারি না, আর যদি কেহ পারে ত করুক,—গবর্ণমেণ্ট তখন কি করিতে পারেন?

সেই আর কাহারও সৃষ্টিও গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া করিতে পারেন না, নিজেও কাপড়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না।

গবর্ণমেণ্ট পারেন না, তবে দেশের খরিদ্দারগণ একদিনে না হউক, ক্রমে ইহার প্রতিকার নিজেরা অনেকটা করিতে পারে। কো-অপারেটিভ নীতিতে নিজেদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন ও কেনা বেচা নিজেরা আরম্ভ করিলে ক্রমে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। কো-অপারেটিভ নীতির সূক্ষ্ম বিশদ বিবৃতি দুই এক কথায় হইবার নহে। তবে এইস্থলে মোটামুটি ভাবে ইহার মূল প্রকৃতিটির একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, একশত কি দুইশত খরিদ্দার মিলিয়া কোনও কোনও দ্রব্যের একটি দোকান খুলিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নগদ মূল্যে সেই দোকান হইতেই সেই দ্রব্য খরিদ করিবেন, আর বাহিরের যারা কিনে কিনিবে। কালক্রমে এই ব্যবসায় এমন বড় হইয়া উঠিতে পারে, যে বিদেশ হইতে কোনও দ্রব্যের আমদানীর প্রয়োজন হইলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেরাই আমদানী করিতে পারে। অতি সামান্য ভাবে আরম্ভ করিয়া ক্রমে খুব বড় হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ কো-অপারেটিভ ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত ইয়োরোপে যথেষ্ট আছে। দুই একটি এইরূপ কো-অপারেটিভ দোকান চলিতে ও বড় হইতে আরম্ভ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন দলে বহু এমন কো-অপারেটিভ ব্যবসায় দেশে হইবে। এই সব ব্যবসায়ের পরিচালনা কার্য্যেও কো-অপারেটিভ দলভুক্ত বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হইবে। ট্রাষ্টের ন্যায় কোনও বণিক্ সম্প্রদায়কে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য করিতে পারেন না বটে, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যাহাতে দেশের লোক এই সব ব্যবসায়ের রীতি নীতি শিখিয়া প্রয়োজন মত সাহায্য পাইয়া ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। কুসীদজীবী মহাজনদের অত্যাচার হইতে কৃষক প্রজাদের রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থানে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দলবদ্ধ ধনী বণিক্ সম্প্রদায় সমূহের দারুণ অর্থ লিপ্সার পীড়ন হইতে দরিদ্র খরিদ্দারগণকে রক্ষা করিবার জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ন্যায় বহুবিধ কো-অপারেটিভ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়,—তবে এবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ প্রজাবর্গ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষাদি লাভে ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে ব্যবসায়ের বাজারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার পক্ষে অনেক উপায় গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারেন, এবং প্রজার মঙ্গলকামী হইলে সেদিকে মনোযোগী হওয়াও গবর্ণমেণ্টের উচিত।

গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিলে সহজে ও শীঘ্র হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সহায়তা তেমন না পাইলেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি বিশেষ অবহিত হন, নিজেরাও যথেষ্ট করিতে পারেন। এসব দিকে দৃষ্টি বড় কাহারও দেখিতে পাই না। হাহাকার আছে, কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির কোনও চেষ্টা নাই। দেশের সংবাদপত্র ও মাসিক সাহিত্য এই সব কথা লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন আলোচনা করিলে অনেক উপকার হয়। কিন্তু রাজনৈতিক চর্চ্চা আর সাহিত্য রসের বাগবিতণ্ডা লইয়াই পত্রিকাগুলি একেবারে ব্যাপৃত। দেশে বাস্তবিক যে সব বড় বড় দুঃখ রহিয়াছে আর বাড়িতেছে, যাহা দেশের

প্রাণ পিষিয়া বাহির করিতেছে, তার দিকে দৃষ্টি তার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা বা আলোচনা অতি কমই দেখা যায়।

বল্‌শেভিজিম্ (Bolshevism)

(ভেনিনিউস্ পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত।)

এনারকিজিম্ (anarchism) নিহিলিজিম্ (Nihillsm) প্রভৃতি যে সমস্ত নীতি প্রচলিত সমাজ পদ্ধতি বা রাষ্ট্রপদ্ধতির বিরুদ্ধে বহুদিন হইতে সংগ্রাম করিতেছে তাহার মধ্যে বল্‌শেভিজিম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। ইহার মাদকতা অসাধারণ এবং সাধারণ লোকের নিকট রমণীয় আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিয়া ইহা সবার অজ্ঞাতে জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজে প্রবেশ করে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া দেশে ভীষণ অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত করে। অন্যান্য বিদ্রোহ নীতির ন্যায় বল্‌শেভিজিম্ও বহুদিন হইতে প্রচলিত, কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের পর ইহা দুষ্ট ব্যাধির ন্যায় সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বল্‌শেভিকদিগের মতে বর্ত্তমান সমাজের ইকনমিক বা ব্যবসায়িক পদ্ধতিই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ। সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি সম্প্রদায় আছে। একটি ধনী প্রভু সম্প্রদায় (bourgeoisie) অন্যটি শ্রমজীবী সম্প্রদায়। সমস্ত দেশের ধনী প্রভু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের বরাবরই একটা চেষ্টা রহিয়াছে এবং কোন এক দেশের ধনী শাসক সম্প্রদায়ের অন্য দেশের এই সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা এবং সেই সম্প্রদায়ের ইহাতে বাধা প্রদানের জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র (পদ্ধতি State) ধনী প্রভু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতেছে এবং ইহারই জন্য শান্তির সময়ও সমস্ত দেশে ধনী শাসক সম্প্রদায় ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গোলযোগ চলিয়া থাকে। এই বিরোধে শ্রমজীবীগণ বরাবরই হারিতেছে। সৈন্য, পুলিশ ও আইন সর্ব্বদা তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়া তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিতেছে। ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দ্বারা তাহারা মধ্যে মধ্যে সামান্য লাভবান হইলেও তাহার ফল এত ক্ষণস্থায়ী যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। যুদ্ধের সময় সমস্ত দেশেই একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। শ্রমজীবীগণের সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া ধনী প্রভু সম্প্রদায়ের জন্য অস্ত্র ধরিতে হয়। বল্‌শেভিকদিগের নিজের সুবিধা বিধানের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। জয়ের আশা বুঝিলে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া কলকারখানা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি হস্তগত করাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

বলশেভিজিম্ সাম্যনীতি গ্রাহ্য করে না। তাহাদিগের মতে সামাজিক বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথই পৃথিবীর উন্নতির একমাত্র পথ। সাধারণ সৈনিক ও শ্রমজীবীগণ—যাহাদের শান্তির সময় কোন ক্ষমতাই নাই, এই বিদ্রোহের সময় তাহারা নিশ্চয়ই ক্ষমতা পাইবে। বল্‌শেভিকদিগের মতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা আনা উচিত। সমস্ত সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া 'ঘৃণিত' প্রভু সম্প্রদায়কে শ্রমজীবীগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য করাই বলশেভিজিমের শেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বলশেভিকদিগের মতে বর্ত্তমান রাষ্ট্র (পদ্ধতির State) সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের আইন কানুন এবং অন্যান্য শাসননীতিরও বিনাশ প্রয়োজন। কারণ তাহারা প্রভু সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারই জন্য প্রচলিত আছে। দেশের বর্ত্তমান শাসন বিভাগের স্থানে কয়েকজন বিদ্রোহী লইয়া একটি একটি সম্প্রদায় organisation সৃষ্টি করিতে হইবে। Capitalists (ধনী ব্যবসায়ী প্রভু) দিগকে সরাইয়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য, খনি, রেলওয়ে, ডাক ও তারবিভাগ প্রভৃতি হস্তগত করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ইহার ব্যবহার করাই, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইবে। জমিদারদিগের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া আনিয়া স্থানীয় চাষীদিগের মধ্যে বিনামূল্যে এবং নিষ্কর অবস্থায় তাহা ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কলকারখানা প্রভৃতি সমস্ত হস্তগত করিয়া যে লাভ হইবে তাহা সমস্ত Revolutionary Central Committeeর হাতে যাইবে। বিদ্রোহ মিটিয়া গেলে শ্রমজীবীগণের মধ্যে তাহা সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। খবরের কাগজের কথাও তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। যে সমস্ত কাগজ বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পক্ষে কথা বলিবে তাহা বন্ধ করিয়া তাহার সাজ সরঞ্জাম বল্‌শেভিকগণ হস্তগত করিবে, কেবল মাত্র যে সমস্ত কাগজ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবে তাহারাই চলিতে পারিবে। এই ভাবে বল্‌শেভিকগণ জগতে নূতন যুগের সৃষ্টি করিতে চায়। সাধারণ লোকের বুকে বল্‌শেভিজিম্ বড় আশার সৃষ্টি করে, তাঁহারা ভুলিয়া যায় যে তাহারা যে যুক্তি দেখাইতেছে তাহা পরস্পর বিরোধী। বল্‌শেভিজিম অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু রুষিয়ার বর্ত্তমানে যে বলশেভিজিম্ রহিয়াছে তাহা পুরাতন বল্‌শেভিজিম হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহা দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেম ভুলাইতেছে। রুষিয়ার বিখ্যাত বল্‌শিভিক Trotzkyর মতে—"Victory, therefore, is against the interests of the workers. In every nation they must work for the defeat of their own Army in the field. In so doing, in thus weakening the armed power of their nation, they hasten the advent of the hour when they will be able to overthrow the yoke of their own of national masters" যুদ্ধ না করিয়া, নিজেদের সৈন্যের সাহায্য না করিয়া নিজ দেশের প্রভুর অত্যাচারের হাত এড়ান যাইতে পারে বটে, কিন্তু বিপক্ষের অত্যাচারী রাজার হাত তাহাতে এড়ান যায় না। ইহার দৃষ্টান্ত কি কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে?

পল্লীর প্রাণ

(উপন্যাস)

(২২)

ভবানী ঠাকুরাণীর ন্যায় সুবুদ্ধিমতী ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী জননীর সাক্ষাতে যাদব ও নিবারণ পৃথক হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে! সত্যই তবে কলির অন্ত এবার হইল! বিস্মিতা কৌতূহলাবিষ্টা এবং ব্যথিতা প্রতিবেশিনী ও গ্রামবাসিনী প্রবীণারা পরদিন হইতেই সকলে বিকালে দলে দলে আসিয়া ভবানীর গৃহে সমবেত হইতে লাগিলেন। কত প্রশ্নজিজ্ঞাসা, কত সবিস্ময় দুঃখপ্রকাশ, কত সমালোচনা, কত রকম মন্তব্য প্রকাশ চলিতে লাগিল।—ভবানী যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! যে দুঃখ কেবল একটা দুঃখই নয়—বড় একটা লজ্জাও তার মধ্যে রহিয়াছে, তাই লইয়া এত কথা অতি প্রিয় অন্তরঙ্গ কাহারও মুখে ভাল লাগে না। কিন্তু নিস্তার ছিল না। দোষই বল গুণই বল - সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে, গৌরবে লজ্জায় এ নিস্তার গ্রাম্য সমাজে কেহ পায় না। দুইদিন পরে বৈকালে এইরূপ একদিন এক বহু কলরবসঙ্কুল বৈঠক ভবানীর গৃহবারান্দায় বসিয়াছিল।

অনৈকা স্থূলকায়া প্রৌঢ়া বলিতেছিলেন "তাই ত বলি, তোরা ত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়েই আছিস্, কেন তবে বাড়ীতে ধেয়ে এসে এই ঢলাঢলিটে ক'রে গেলি? বুড়ো মা—কটা দিন আর—কেন তার মুখে এই চুণ কালিটা দিলি!"

আর একজন বৃদ্ধা কহিলেন—"আহা, এমন পুণ্যির শরীর তোমার মা, তোমার কপালেও শেষে এই ছিল। সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, মোটে দুটি ছেলে পেটে ধরেছিলে—যেন রাম আর লক্ষ্মণ। কৌশল্যের মত মা তুমি—কোন্ আবাগী কৈকেয়ী এসে কুমন্তর দিয়ে তোমার সাম্‌নেই তাদের ছাড়াছাড়ী করে দিয়ে গেল গা!"

'কৈকেয়ী হবে কেন দিদি, সৎমা হ'লেও সে মা ত? সীতে গো সীতে! এ কলির সীতে, নইলে রাম লক্ষ্মণে ভেদ হয়?"

"কার বা দোষ দেবে খুড়ী? চন্দরদি ত বল্‌ছিল, নিবুই জেদ ক'রে বলেছে যাদুবের অন্ন সে আর খাবে না।"

চন্দ্রমণিও উপস্থিত ছিলেন,—তিনি ভীত হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, "ওমা তুই ত বড় সর্ব্বনাশী ক্ষেমী! তা আমি কখন গিয়ে কার কাণে কাণে বল্লাম!"

"কাণে কাণে কেন ব'লবে? সদরে সবার সাম্‌নেই ত ব'লেছ। তুমি কারও কাণে কাণে কথা কইবার মানুষ কিনা? ওই ত বিনীর মা, শ্যামা, রাঙ্গা বউ, গৌরীঠান্‌দি, শান্তপিসী বড়খুড়ী সবাইত শুনেছে, বাড়ী বাড়ী গিয়েই ত তুমি এই কথা ব'লে এসেছ, 'নিবের এম্‌নি তেজ যে বড় ভাই খেতে পর্‌তে দেয় মুখের উপর তাকে ব'ল্লে কিনা তোমার সঙ্গে আমি একত্তর থাক্‌ব না, তোমায় ত্যাগ ক'রব তবু ঘোষালদের বাড়ীর কুন্তীর মাকে ত্যাগ ক'রব না'। হাঁ, বল না পিসী, বলেনি চন্দরদি?"

কথিতা পিসীকে কোনওরূপ সাক্ষ্য দিবার অবসর না দিয়া চন্দ্রমণি বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া উচ্চারণ করিলেন, "ওমা! এম্‌নি ক'রে লোকের নামে এক কথাকে আঠার খানা ক'রে বাড়াতে হয় লো ক্ষেমী! আমি কি ওই রকম কথা বলেছিলাম? সবাই ত রয়েছে, বলুক না? আমি দুঃখী মানুষ কিনা, তাই মুখের উপর এম্‌নি মিছে কথাগুলো ব'লে পার পেয়ে গেলি। আর কেউ হ'লে পোড়া মুখ তোর নোড়া দিয়ে ভাঙ্গত!"

"কার মুখ নোড়া দিয়ে ভাঙ্গতে হয় তা সবাই বুঝছে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে মিছে কথা আমরা কারও নামে বলে বেড়াইনে। বলুক না, কে না জানে, আমি মিছে কথা বল্‌ছি না তুমিই এখুন কথা ওল্‌টাতে চাচ্ছ? আজ কুম্‌ড়োটুকু, কাল কাঁচকলাটা বেগুণটা, পরশু চালটা ডালটা, আবার হ'ল ত একদিন আমটা কলাটা কি এক সন্ধ্যে যোড়শোপচারে ভোগ, নিবুর মা দিচ্ছেই কিনা, কাজেই এখন ভয় পেয়েছ। তা যার পিত্যেশ রাথ দিদি, তার মন্দ লোকের বাড়ী বলে বেড়াতে হয় না।"

"ছেড়েদে ছেড়েদে, শ্যামা! কেন মিছে কথা বাড়াস্। আহা, এম্‌নিই মাগী মর্ম্মে মরে আছে, এই সব কোঁদল ক'চ [illegible] কি ওর এখন সয়।—তা চন্দ্রমণি কেবল কেন ব'ল্‌বে? ওই ত ঘাটে ওরা বল্‌ছিল শুনে এলাম, তা নিবুরও দোষ আছে বই কি? ঘোষালের কাছে মাপ চাইতে যাদব ব'লেছিল, আর ওই তারকের বউএর কথাও নাকি কি হ'য়েছিল, তা নিবু নাকি অম্‌নি ব'লে উঠল, তোমার ভাতে আমি আর থাক্‌ব না।—"

"তাই ত দিদি, সেইটেই কি তার ভাল হয়েছে? না হয় [illegible]ত, ভাই কি বলে ঠাণ্ডা হ'য়ে শুন্‌ত। কথা [illegible] উঠ্‌তেই অম্‌নি [illegible] বল্‌তে হয় [illegible] আমি থাক্‌ব না? থা[illegible] [illegible]বি কি তবে? ওই [illegible], কোলে ঘেটের [illegible] হ'য়েছে,— [illegible] তুই কিছু করিস্‌নে, কি [illegible]খন?"

"[illegible] হয়েছে যে, অন্নও দেবে [illegible] পরমেশ্বরের [illegible] উপোস করে মরে?"

"তা বই কি বোন্! বামুনের ছেলে—তবে ওদের নাকি শিষ্যি যজমান কিছু নেই—নইলে আর ভাবনা ছিল কি? তা গতরে বেশ খাটতে পারে, গাঁয়ে না পারুক—নিন্দে হয়—দূরে কোনও সহর টহরে গিয়ে বড়লোক কারও বাসা বাড়ীতে যদি ভাতও রাঁধে, পেটে খেয়ে মাসে ৮।১০ টাকা কি আন্‌তে পারবে না? ওই ত বিলেস মুখুয্যে কোথায় কোন্ [illegible] এক হোটেল খুলেছে, বেশ দুপয়সা আন্‌ছে। [illegible] তাগা গড়িয়ে দিয়েছে। তা নিবু যদি—"

শিবুর মা হাসিয়া কহিলেন, "পোড়া কপাল! নিবু গিয়ে রাঁধুনে বামুন হবে আর হোটেল খুল্‌বে? কি যে ব'ল্‌ছেন উনি—শুন্‌তেও ঘেন্না করে। বেশী লেখা পড়া না হয় নাই শিখেছে,—তাই বলে এমন অক্ষম সে কিসে হ'ল? আমার শিবু বলে—সে ত বি-এ পাশ দিয়েছে—তা সেও বলে, নিবুদার যা ক্ষ্যামতা আছে, আজ কালকার বি-এ এম-এ পাশ করা ছেলেদের তা নেই। হাঁ।"

পূর্ব্ববক্ত্রী একটু লজ্জা পাইয়া কহিলেন, "তা বটেই ত মা, তা বটেই ত। নিবুর কি ক্ষ্যামতা কম? এই ত আগে [illegible] পড়া কেউ [illegible] না শিখ্‌লে দারোগা হ'ত। নিবু যদি তাই পাত্ত, কেমন দারোগা হ'ত! দারোগারা কি কম রোজগার করে?"

"তা আর ব'ল্‌তে মা? এই ত আমার ভাসুরঝির দেওর দারোগা হ'য়েছে—তিন বছরে পাকা বাড়ী ক'রে ফেল্লে—বউএর গায়ে ত গয়না ধরে না। বাপের শ্রাদ্ধে গেল বছর দান সাগর ক'ল্লে। ধন্যি ধন্যি প'ড়ে গেল চারদিকে। হাকিমরা যে এতবড়, তারা আর কত রোজগার করে? ওই ত তমু বাড়ুয্যের ছেলে বিপিন—সে ত আজ এই ৭।৮ বছর হাকিমী ক'চ্চে—কই তেমন কিছু দেখ্‌তে পাও কেউ?"

"যাই হ'কগে দিদি, পিথিমীতে জন্মেছে যদি—খেতে পরতে দুটি পাবেই। রাজা বল, মজুর বল, ভিকিরী বল,—খেয়ে প'রে সবাই ত আছে।"

"তাই হ'লে বড় ভাই দুটো কটু কথা যদি ব'লেই থাকে, অম্‌নি কি তার অন্নত্যাগ ক'ত্তে হয়? কে কার অন্ন খায় বোন্? যে যা খায়, তার নিজের কপালে খায়। কপালে না থাকলে কেউ দিতে পারে? আর থাক্‌লে কেউ কেড়ে নিতে পারে? ওই বুড়ো মা মাগী র'য়েছে, ওর সাম্‌নে তোরা দুভাই দু হাঁড়ী ক'ল্লি, মাগী এখন কোথায় যায় বল! ওর দুদিকেই সমান টান।"

"তাই ত মা, কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। ও দেবে এর দিকে ঠেলা—এ দেবে ওর দিকে ঠেলা। দোটানায় প'ড়ে বুড়ো বয়সে মাগীর প্রাণান্ত হবে।"

"আহা! এক পেটে ধ'রেছে, এক কোলে মানুষ ক'রেছে, চোকের সাম্‌নে সেই ছেলেরা এখন আলাদা হ'য়ে খাবে—এও কি মার প্রাণে সয় বাছা?"

মনে মনে যারপর নাই ত্যক্ত বিরক্ত বোধ করিলেও ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। কিন্তু এই সব বিতর্ক ক্রমে তাঁহার সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এ নিয়ে আর এত কথায় কাজ কি মা? ওদের আলাদাই বা কি আর একত্রই বা কি! যাদব তার পরিবার নিয়ে ত বারমাস সহরেই থাকে। আর নিবু তার বৌ ছেলে নিয়ে দেশে আমার কাছে আছে। এদ্দিন যাদব খরচ পাঠাত, ঘরে বসে খেত। এখন নিজে রোজগার ক'রে যদি দুপয়সা আন্‌তে পারে, আনুক না? সত্যিই চিরকাল সে ছোট হ'য়ে ভেয়ের ভাত কেন খাবে? আজ কালকার দিনে কে তা ক'রে মা? সবাই রোজগার ক'রে, যে যার মাগ ছেলেকে খাওয়ায় পরায়, যে যেখানে থাকে, মাগ ছেলে নিয়ে কাছে রাখে। এক যখন বছর অন্তর দেশে

গাঁয়ে সবাই আসে, এক হাঁড়িতে কদিন খায়। তা যেদো যদি কখনও দেশে আসে, আমি ভাত বেড়ে দু ভাইকে ডাকলে সাধ্যি আছে তারা ব'লতে পারে খাব না!?"

"ওমা, তাকি আর কেউ পারে দিদি? হাজার ঝগড়া ঝাঁটি করুক না,—মা যখন ডাক দেবে, ওরে আয় তোরা ভাত খা এসে, ভাইদের এসে পাশাপাশি ব'সতেই হবে। মা শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালে সাধ্যি আছে ভাই ভাই একেবারে ঠাঁই ঠাঁই হ'তে পারে?"

ক্ষেমদা কহিলেন, "নিবুকে তোমরা যতই দোষ দিচ্ছ —আর চন্দর'দি যাই বলুক—"

"ওমা, আবার আমাকে নিয়ে কেন? দেখছ ত ভাই তোমরা। আচ্ছা বল ত, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি আমি ক্ষেমীর যে এমন জাত শত্তুরের মত আমার পেছনে লেগেছে? না ভাই, সত্যি ব'লছি বড়বউ—ধর্ম্ম আছেন—নিবুর নামে আমি কোনও নিন্দে যদি কারও কাছে করে থাকি—ধরতে কোনও লক্কি যেন আমার থাকেনা! আর ওযে এম্নি ক'রে মিছে কথা আমার নামে ব'লছে—হে ধর্ম্ম তুমি দেখো—তুমি দেখো—তুমি দেখো। ওরও যেন ধ'রতে কোনও লক্কি না থাকে।"

ক্ষেমদা একটু হাসিয়া কহিলেন, ধ'রতে লক্কি দিদি ইহসংসারে তোমারও কিছু নেই আমারও কিছু নেই। আছেন এক ধর্ম্ম—মিছে সাক্ষী ক'রে তাকে একেবারে বিমুখ ক'রো না। সেই লক্কি ধ'রে ত পরলোকে যেতে হবে একদিন? কলাটা বেগুণটা কুমড়োটুকু নিয়ে চিরকাল কিছু আর এই পৃথিবীতে থাকবে না।"

"ওলো ক্ষ্যামাদে ক্ষ্যামাদে ক্ষেমী! আর এমন কাটা কাটা কথাও তুই লোককে বলতে পারিস্, তা সব কথারই একটা সময় অসময় আছে ত? আজ কি এখানে একটা ঝগড়া বাধাতে হয়?

"তা উচিত কথাও ব'লতে হয় বইকি? অত অসৈরন খুড়ী সইতে পারিনে। এই যে বাড়ী বাড়ী নিবুর নিন্দে ক'রে এল নিবু কি সত্যি এম্নিই নিন্দের ছেলে? হাঁ একটু রোখাল না হয় আছেই,—নইলে মনটিতে তার আর কোন কালী নেই। মনে যাদের খল কুট কিছু নেই সোজা বুদ্ধিতে চলে,—যা বোঝে তাই বলে, কারও মুখচেয়ে মনে এক কথা রেখে বাইরে আর এক কথা যারা বলতে জানে না,—একটু রোকাল এমন তারা হয় বই কি? এ আমি ঠিক ব'লতে পারি—হয় ত নিবু আগেই বলেছে—ভেয়ের ভাতে সে আর থাকবে না—তা ঐ কথা ওরা তার মুখদিয়ে টেনে বের ক'রেছে। ওরা সহরে থাকে, উকিলী বুদ্ধি রাখে নিবুর মত সোজা ছেলেকে পাকে ফেলে তার মুখ দিয়ে একটা দোষের কথা বের ক'র্ত্তে ওদের লাগে কি? শুনলে বড় বউ দুঃখু পাবে আর সেও ত প [illegible] বটে! যাদব আর সেই যাদব নেই। সহরে ওকালতী ক'রে বজ্জাতী বুদ্ধি খুব শিখেছে। আর ওই বউ মাগো সেত উকিলের উকিল!

চোক টানানি মুখ নাকানি আর নাকি সুরে টানা টানা কি ঠমকের কথা—কবে আমি বলেছি ও-বউ এই পুণ্যির সংসার ছারে খারে দেবে, যেদোকে ভেড়া বানাবে! ওকি বউ—আদত সহরে ছেনাল! ছেনালের মেয়ে ছেনালী শিখেই এসেছে।"

ভবানী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "থাক্ ক্ষ্যামা ঠাকুরঝি আর এসব কথা কেন। প্রাতব্বাকিতে তারা সুখে থাক—তাদের ভাল ভালই থাক, গুড়ো কটি হ'য়েছে তারা বেঁচে থাক। দোষ কারও দিইনে বোন্—সব আমার কর্ম্মের দোষ! নইলে কেউ কারোকে দুঃখ দিতে পারে?"

"হুঁ—তাও ঠিকই মা, ঠিকই মা। ওই যে কে ব'লেছিল, দোষ কারও [illegible] মা, আমি সখাদ সলি[illegible]। কর্ম্মের দোষ [illegible] কে কাকে দুঃখ দিতে [illegible] আর কর্ম্মে যদি কারও সুখ শান্তি থাকে তাই বা কে কেড়ে নিতে পারে? বলে 'মারে কেষ্ট রাখে কে রাখে কেষ্ট মারে কে'?"

আরও কিছুকাল এইরূপ আলাপ তর্ক বিতর্ক হইল। বক্তৃগণ এখন কুবধূশাসিত যাদবের বিপক্ষে এবং মাতৃ-অনুগত ও সৎ-মানবী স্বরূপা অতুলনা গৃহলক্ষ্মীতুল্যা বধূ-সেবিত নিবারণের পক্ষেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

বেলা গিয়াছিল, একে একে দুইয়ে দুইয়ে তিনে তিনে সমবেদনায় সমাগতা প্রতিবেশিনীগণ ও গ্রামবাসিনীরা গৃহে চলিয়া গেলেন। শিবুর মা উঠিলেন না,—চন্দ্রমণি কিছুকাল উস্ খুস্ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ও মাগীরও ক্ষেমী পোড়া অমনই 'কাটা কাটা কথা'। এখন নিন্দাস্খালনের চেষ্টায় কোনও সুবিধা হইবে না। গতরখাকী ঝড়েও, মা,

সংসার যেন চুলায় দিয়া আসিয়া বসিয়াছে! মরুগ্‌গে কাল একবার আসা যাইবে, আঁটকুঁড়ীর বেটী নিত্য দিবারাত্রি এমন জুড়িয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না।

শিবুর মাও যেন মতলব করিয়াই চাপিয়া বসিয়া ছিলেন। চন্দ্রমণি উঠিয়া একটু দূরে যাইতেই পথের দিকে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিয়া তিনি কহিলেন, "আর এই চন্দর ঠাকুরঝিকেও তুমি চিন্‌লে না দিদি——"

ভবানী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "চিনেই বা কি ক'র্‌ব বোন্? এড়াবার যো আছে কারও? তোমরা ত চিনেছ, এড়াতে পার?"

"তা যাই বল দিদি, বড় সর্ব্বনেশে মানুষ। ঘরে লোকের কাছে কথা হয়,—তা চন্দর ঠাকুরঝি যদি এসে দাঁড়াল—অমনি গোনগে সেকথা সকল ঘরে ঘরে! এই ত যেদোতে নিবুতে কথান্তর হ'ল, কেউ ত তা শুন্‌তে আসে নি। কে জান্‌ত যে ওরা ভেন্ন হ'য়েছে? তা ব'লব কি দিদি সন্ধ্যে সন্ধ্যে সারাটি গাঁয়ে মাগী রটিয়ে এল, 'ওরা দুভাই আলাদা হয়েছে,—নিবু এই ক'রেছে,—তা ক'রেছে—না ব'লেছে এমন কথা নাই। কেন, যেদোর বউ কি তোকে কোচর ভরে টাকা দিয়ে গেছে? ব'ল্‌ব কি দিদি, শুনে তুমি আটাস হবে—(এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা স্বরে)—ওই কুন্তী আর কুন্তীর মাব কথা তুলে নিবুর নামে ভাবে সাবে এমন সব কথা ব'লেছে—যা মুখে আন্‌তে নেই। জাত মারা সব কথা!"

ভবানী শিহরিয়া গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, কি সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি সারদা?"

"আর বলিস্ কি! তোমায় কেউ এসে কিছু না বলুক, পাঁচ জনে কি কাণাকাণি ক'চ্চে না? অবিশ্যি এতবড় একটা জাতমারা কথা—আর নিবু এমন লক্ষ্মী ছেলে—সবাই কিছু কথাটা কাণে তোলেনি, তা কুচুটে লোকও ত ঢের আছে? মুখে মুখে শেষে বড় একটা কলঙ্কের কথা উঠবে না? শুনতে শুনতে শেষে মিথ্যে কথাটাও লোকে সত্যি বলে মনে করে। অবিশ্যি নিবু বেটা ছেলে—তার এমন কি এসে যাবে? কিন্তু এই রকম একটা কথা উঠ্‌লে ওই মেয়ের কি শেষে বিয়ে দিতে পার্‌বে?"

কাদম্বিনী ঘাটে গিয়াছিল। এক কলসী জল লইয়া তখন ঘরে ফিরিল। ভবানী ইসারা করিলেন, শিবুর মা বুঝিয়া ঘর-কথা ফিরাইয়া কহিলেন, "তা তোমার ব্যবস্থা কি করবে, যেদো কি বলে গেছে কিছু?"

ভবানী উত্তর করিলেন, "কিছুই বলে যায়নি বোন্। ভালমন্দ কোনও কথা না। সেই যে নিবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হ'ল, তারপর উঠে কোথায় গেল, ফিরে এসে আর এসব কথা কিছু তোলেনি। বড় বউমা বটে ঠেস দিয়ে দুই এক কথা ছোট বউমাকে বলেছে,—যাদব হাঁ হুঁ কোনও শব্দ আর করেনি। ওরা যে আলাদা হ'ল, একথা ত চন্দর ঠাকুরঝিই রটিয়েছে, নইলে যেদো ত বাড়ী ঘরে আসেই না—কে কি জানত, কেই বা কি বুঝত? আমারও যেমন কপাল, কোত্থেকে আবাগী এসে খুঁটি গেড়ে ব'সল! ওদের যদি তখন চুপ ক'ত্তে ব'ল্‌তাম! তা প্রাণটা সোস্তি ছিল না বোন্—"

"দেখ দিকি, কি সর্ব্বনাশটাই ক'রেছে! তুমি নাকি এমন ভালমানুষ—আমি হ'লে আর বাড়ীতে পা দিতে পাত্ত? ঝাঁটা মেরে দূর ক'রে দিতাম!"

ভবানী নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "এখন আর ঝাঁটা মেরে কি হবে বোন্! যা কর্‌বার তা ত ক'রেছেই! আরও কি সর্ব্বনাশ করবে তার ঠিক কি?" বলিতে বলিতে একটু চমকিয়া ঘরের দিকে চাহিলেন। কাদম্বিনী প্রদীপ গুছাইতেছিল। শিবুর মাও ঘরের দিকে একবার চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন, "তা—কিছু নাই বলুক, তোমাকে কি আর খরচ পত্তর কিছু না দিয়ে পার্‌বে?"

"কে জানে বোন্, সে তার খুসী। আর আমার জন্যে তার এমন ভাবনাই বা কি? ভাবনা যা নিবুর জন্যে। জেদ করে আলাদা হল,—কি যে ক'র্‌বে এখন ভেবে পাইনে, ওই একটা পরের মেয়ে ঘরে এনেছি,—কোলে বেটের একটু গুড়োও হ'য়েছে—কি ক'রে যে ভাত কাপড় দিয়ে ওদের পুষবে ভেবেও পাইনে দিদি। লেখা পড়া বেশী শেখেনি—মুরুব্বি কেউ নেই—একটু চাকরীবাকরীই বা কে ক'রে দেয়? এদ্দিন দায় কিছু ছিল না, আবাগে যদি কোথাও বেরিয়ে প'ড়ত, কিছু কি উপায় একটা হত না?"

"কিছু ভেবনা দিদি। মুখ দিয়েছেন যিনি, আহারও তিনি দেবেন।"

"আহার কি আর তিনি নিজে এসে কারও মুখে তুলে দেন বোন্? বনের পশুপক্ষীকেও আহার খুঁজে নিতে হয়।

কেবল ত মুখ তিনি দেন নি, হাতপাও দিয়েছেন। পশু পক্ষী পায় না, মানুষ কি সেই হাত পা না খাটিয়ে খেতে পায়? তাই যদি পেত দিদি, ভাতের দুঃখু আর এ পৃথিবীতে কারও থাক্‌ত না।"

"তা, হাত পা কি আর তোমার-নিবুর নেই?"

"কাজ পেলে ত হাত পা খাটাবে? না পেলে হাত পা যে থেকেও নেই। এদ্দিন কোনও চেষ্টা তার ক'ল্লে না, আজ মাথার ওপর এই সংসারের দায় পড়ল, বেরিয়ে যে দুদিন খুঁজবে, তারও ত যো নেই। হাতে যা ছিল, তাও ত ফুরিয়ে এল। মাস কাবারে ত যাদব আর কিছু পাঠাবে না। দুদিন বাদেই যে টাকা না-হলে দিন চল্‌বে না।"

"তা তোমায় ত খরচ কিছু পাঠাবে। তাই দিয়ে দুই এক মাস কোনও মতে চালিয়ে নিও, দুচার টাকা হাওলাতই কি পাবে না? ও বরং এর মধ্যে কোথাও বেরিয়ে পড়ুক।"

"মাসে যদি দশটি ক'রে টাকাও যেদো আমায় পাঠায়, তা হ'লে দুচার মাস চালিয়ে নিতে পারি বই কি? তবে কি বুদ্ধি তাদের হয়, কে জানে? দাবী দাওয়া যাই থাক, না দিলে ত আর জেলায় গিয়ে নালিশ ক'রে নিতে পারব না।"

"ও কপাল! নালিশ ক'ল্লেই কি পাবে দিদি? পোড়া কলিকালে খিষ্টেনি আইনও এমন হ'য়েছে, ছেলের রোজগার বিধবা মারও নাকি কোনও দাবী দাওয়া নেই। তোমার দ্যাওর ব'ল্‌ছিলেন, মাগ যে পরের মেয়ে—খেতে না দিলে নালিশ ক'রে ভাতারের কাণ ধ'রে খোরপোষ আদায় ক'রে নিতে পারে। আর মা পেটে ধ'রেছে, খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, তাকে নাকি ছেলের খেতে দিতে হয় না। খুসী হয়ে দেয় ভাল, না দেয় না খেয়ে ম'লেও দাবী কিছু নেই। এক ধর্ম্মের ভয়, তা কলিকালে কি আর ধর্ম্ম আছে দিদি?"

"হুঁ——! তা মাগ হ'ল পরের মেয়ে, তাকে ঘরে এনেছে, খেতে না দিলে সে ছাড়্‌বে কেন? আর তার ত রক্তের টান কিছু নেই, ভালবেসে দিলে থুলে তবে গে সে খুসী হ'য়ে থাক্‌বে। মমতা ক'ল্লে তবে মমতা একটা তার হবে। নইলে হবে কেন? না দিলে সে ছাড়বেই বা কেন? কাণে ধ'রে আদায় ক'রে ত নিতে চাইবেই। তবে মা কি তার পোড়া প্রাণের মমতা কখনও ভুল্‌তে পারে, না, খেতে না দিলে ছেলের নামে গিয়ে নালিশ ক'র্ত্তে পারে? পেটের ছেলে বোন্—মমতা ক'রে যদি না দিলে, তবে মা আদালতে যাবে নালিশ ক'র্ত্তে! রামঃ! তার চাইতে না খেয়ে মরাও ভাল?"

"তা যেন হ'ল। কিন্তু আইনের ত বিচের এই?"

"অবিচের কি? ঠিক বিচেরই হ'য়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে ছেলে মানুষ ক'রে, পেটের ভাতের জন্যে যে আবাগী মা সেই ছেলের নামে আদালতে নালিশ ক'র্ত্তে পারে, সে কি মা? রাক্ষুসী! তার জন্যে আবার আইনের বিচের কি?"

শিবুর মা কহিলেন, "তা আইনের বিচের না থাক্, ছেলের ত একটা ধর্ম্ম আছে?"

"তাই ত ভাবি দিদি! যাদব আমার সে ধর্ম্ম যেন পায় না ঠেলে! তা মা মঙ্গলচণ্ডী যেন তাকে মঙ্গলে রাখেন। যেটের দুটি গুড়ো তার হ'য়েছে, চোকে না দেখি বোন্—সে যেন তাদের নিয়ে চিরজীবী হ'য়ে সুখে থাকে।"

"হুঁ——! মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার কথা কাণে শুনুন! আর তোমার আর কি দিদি? এখন ভালভালাইতে ওদের রেখে যদি যেতে পার—তবেই গে সব মঙ্গল। তা আসি গে এখন দিদি। সন্ধ্যে হ'য়ে এল!—কি রাঁধ্‌বে গো এ বেলা বউমা?"

কাদম্বিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ওবেলার মাছ আছে, ঝোল রাঁধব! আর মার পাকের ডাল র'য়েছে এক বাটি।"

"হুঁ——তা যাও, বেলা গেল রান্নাটান্না এখন চড়িয়ে দেওগে। হঁ; কাল আমাদের ঘরে নিস্তারিণীর পূজো হবে। তোমাকে গিয়ে দুটি রেঁধে দিতে হবে বাছা। সকালে কিছু খেওনা যেন—আজই বলে গেলাম। আসি গে আজ তবে দিদি! শিবুরমা উঠিয়া গেলেন।

(২৩)

"অত ভ'ড়কে যাচ্চিস্ কেনরে শিবে? কাজ যা আরম্ভ করা গেছে, শেষ ক'রে ফেল্‌তেই হবে। দু তিনটে পুকুর আর বাকী আছে, হ'লেই ত হ'য়ে গেল।"

শিবু কহিল,—"এই নিয়ে এত বড় একটা কাণ্ড হ'য়ে

গেল, নিবুদা, তাই ত মনটা বড় দমে যাচ্ছে। কি বলিস্ ষ'তে, বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেল না? আর কি—"

যতীন কহিল, "তা নিবুদা নিজে যদি 'না দ'মে থাকে, আমাদের দ'মে যাবার ত কিছু এমন হয় নি। আর এখন যদি ছেড়ে দিই, লোকে ব'লবে, ওরা ভয় পেয়ে গেছে।

পুলিন কহিল, "ঠিক কথা! আমাদের আর মান তা হ'লে থাকবে না। কোনও ভাল কাজে হাত দিলেই সবাই টিটকারী দেবে,—কাউকে কিছু ব'ল্লেও কিছু গ্রাহ্য ক'রবে না। কেন, বেণীবাবু সহরে ব'সে কল টিপলেন, আর তাঁর হাতের পুতুল যাদববাবু গাঁয়ে ছুটে এলেন, নিবুকে তাঁর হাতের ভোঁতা অস্ত্রে একটা ঘা দিয়ে গেলেন,—আর আমরা সবাই অমনি জুজুর ভয়ে গিয়ে সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকব! তবে বল না কেন, বেণীবোস্ গাঁয়ের রাজা আর ঘোষালরা তার মন্ত্রী, তারা যা ব'লবে, যা ইচ্ছে ক'রবে তাই হবে।"

শিবু লজ্জা পাইয়া কহিল, "আমি কি আমাদের ভয়ের কথা ব'লছি! তবে নিবুদাদের ঘরে এই রকম একটা গোলমাল হ'য়ে গেল—তাই। 'নইলে আমাদের কি?"

শরৎ কহিল, "নিবুকে বেশ একটু মুস্কিলে ও ত প'ড়তে হ'ল। দিন কাল যা প'ড়েছে—এই ত কবার বি-এ ফেল ক'রে পনের টাকার মাষ্টারীতে ঢুকেছি—তাও কত খোসামোদ ক'রে কত জনের কত সুপারিস নিয়ে! ভাবছি—'ল' দিয়ে উকিল হব। তা যাদববাবু এই বছর দশেক ওকালতী ক'চ্ছেন—তাঁরই এই দুর্গতি—"

পুলিন বলিয়া উঠিল, "যাদববাবু ব'লেই এই দুর্গতি। নইলে এই নিবু—কোনও সম্বল তার নেই,—সেও ত অনায়াসে ভেয়ের আশ্রয় ছেড়ে দিল, ছোট হবে না বলে।"

"দিয়েছে একটা রোকের মুখে। অবিশ্যি তিনি যা ব'লেছিলেন, তাতে কিই বা বেচারী আর করে।' তবে এখনও কোনও দায় এসে পড়েনি, তাই তোমরাও বুঝছ না, সেও বুঝতে পাচ্ছে না—কতখানি বেগ ওর পেতে হবে।"

শিবু কহিল, "শরৎদা, ও সব ভাবনা এখন মিছে। এক একটা অবস্থা এমন এসে প'ড়ে যখন মানুষের এদিক ওদিক চাইবার অবসর থাকে না। সামনেই সোজা ভুকোনের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে প'ড়তে হয়, শেষে বরাতে যাই থাক্।"

বরদা কহিল, "তা ত প'ড়তেই হয়। তবে শরৎ যা ব'লছে, প'ড়লে যে ক্লেশ অনেক পেতে হয়, হয় ত কূল পাওয়াই দায় হয়, তাও ত ঠিক। এটা কি মান না নিবু?"

"তা মানি বই কি বরদা? ক্লেশ যে পেতে হবে, তাও যে না বুঝি তা নয়। এদ্দিন যে ব্যাকুবি ক'রেছি—কেবল ব্যাকুবি কেন, যার বড় হীনতা হ'তে পারে না—তাই ক'রেছি, স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘরে ব'সে পরের ভাত খেয়েছি,—তা হ'ক্ না সে ভাই—আমার মত কারও ঘরে ব'সে বাপের অন্ন ধ্বংস করাও অন্যায়। এই অকর্ম্ম কুকর্ম্ম যা ক'রেছি, কিছু প্রায়শ্চিত্ত তার ক'ত্তে হবে বই কি? তা সে কথা এখন থাক্। শিবু, তুই ভাবছিস্, এই ক'রে আমার এমন বিপদ হ'ল, আর এতে কাজ নেই——"

যতীন্ একটু হাসিয়া কহিল, "শিবু যেন একটি পিসিমা! আরে রামঃ! কথায় কথায় মেয়েমানুষের মত অত ভয় পেলে চলে? পুরুষ হ'য়ে জন্মেছিস্—দল বেঁধে একটা কাজে নেমেছিস্—এ আর কি হ'য়েছে? এতেই যদি 'হা হতোঽস্মি' ব'লে গা ছেড়ে প'ড়তে হয়, তবেই তোরা দেশ উদ্ধার ক'রবি বটে।"

পুলিন কহিল, "যার ব্যথা তার সাড়া নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই! শিবের হ'য়েছে তাই। শিবু যদি ভয় পেত, ত যা হ'ক্ একটা কথা ছিল। তা আমি ব'লছি নিবু-ভ'ড়কে যদি যেতে—কি এখনও যদি যাও শরৎদা যা ব'ল্লে তা ঠিক—ফ্যাসাদে কিছু প'ড়তে হবে বই কি? তা ভয় পেয়ে যদি গুড়িসুড়ি মেরে থাক—তোমাকে আর মানব না। ধর, এই গাঁয়ে তুমি আমাদের নেতা—যা ব'লছ তাই ক'চ্চি। ভয় পেয়ে যদি পিছিয়ে যাও, উল্টো সুর ধর, তবে আর সে নেতাগিরি তোমার থাকবে না। কারও ঘরে আগুণ লাগ্‌লেও তোমার ডাকে তোমার পেছনে যাব না। যাব, নিজে যাব—তোমার দল হ'য়ে কোথাও কোনও কাজে যাব না।"

অখিল কহিল, "ভয়ের কোনও কথা হ'চ্চে না। তবে নিবুকে মুস্কিলে কিছু প'ড়তে হবে—শিবু ওকে দেখে যেন আপন ভেয়ের মত—তাই তার মনটা একটু——"

শিবু কহিল, "না, ওরা যা পেয়ে যাই আমাকে বলুক, সে জন্যে আমি কিছু ভাবিনি। যত দুঃখেই পড়ুক,

নিবুদা মারা যাবে না, তাও বেশ জানি। তবে ভাই ভাই আলাদা হওয়া—ওই জ্যাঠাইমা র'য়েছেন,—কত বড় একটা দুঃখের আর লজ্জার কথা হ'ল—"

যতীন্ কহিল, "সে কার দোষ? নিবুদার না যাদব-বাবুর?"

নিবু কহিল, "আঃ! কেন, এত বাজে কথা নিয়ে তোরা এত গোলমাল ক'চ্ছিস্? যা হবার তা হ'য়েছে। উপায় ত আর কিছু নেই। এ সব কথা এখন থাক্। শিবু, মনটা একটু চাঙ্গা ক'রে তোল্. ও সব কিছু ভাবিস্ নি। ভাবিস্ ত মনে মনে খুসী ভাব—কাজের বেলায় কেন গা ছেড়ে দিবি?"

পুলিন কহিল "হাঁ, আমিও ত তাই বলি। দিনে রুগে কাজ কর্ তেতে যত খুসী মন খারাপ ক'রে বিছেনায় শুয়ে কাঁদ্! চোকের জলে বালিশ ভিজিয়ে জল একেবারে চুপ চুপে সপ্ (sop) ক'রে ফেল্—রোদে দিলেই শুকিয়ে যাবে। কেউ কিচ্ছু তোকে ব'লবে না।"

বিনয় কহিল, "আমি এক মজা দেখ্ ছি। কেউ নিজে তার পুকুর সাফ ক'র্বে না। বাড়ুয্যে মাশায়ও নোটিস্ দিচ্চেন, আমরাও ব'লছি না ক'রে আমরা জোর ক'রে সাফ ক'রে দেব। তবু সব চুপচাপ! হাত পাও কেউ নাড়ে না।"

বরদা কহিল, "তা কেন নাড়বে? বিনে পয়সায় বিনে খাটনিতে যে এক দিনেই পুকুর সাফ হ'য়ে যাচ্ছে! ভারি মজা পেয়ে ব'সেছে সবাই—হা—হা—হা!"

আরও কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। শরৎ কহিল "এরপর জঙ্গল ঘুরে দে, ভাল পাইখানা সব তৈরী করে দে, দুচারটে ভাল পুকুর কি কুয়ো কোদালি ধ'রে কেটে দে. বাড়ী ঘর নোংরা কেউ কল্লে—তাও গিয়ে মেথরদের মত সাফ ক'রে দে, আশে পাশে কোথাও জল জম্‌লে নালা কেটে তা ছাড়িয়ে দে,—কেউ কিছু আর করবে না। খাসা আরামে ঘরে বসে থেকে, কেবল তার মজাটাই ভোগ ক'রবে। কদিন তোরা ক'রবি, আর ক'ত্তে পারবি? তার চাইতে লোকেরা সব নিজেদের যা কাজ নিজেরাই উদ্যোগী হ'য়ে করে, তাই শেখাতে পাল্লে সে কায়েমী ভাল কাজ হ'ত। এ হচ্চে কেমন, যেন সমর্থ লোককে দান করার মত। এরকম দানে কারও উপকার হয় না। আসল উপকার লোকের হয়, কাজ ক'রে তারা পয়সা উপায় ক'ত্তে পারে তাই শেখান, তারি ব্যবস্থা করা।"

শরতের কথাগুলি অনেকেরই ভাল লাগিল। কিছু তর্কও ইহা লইয়া হইল। শেষে নিবারণ কহিল, "শরৎদা, তোমার কথাগুলি খুবই ঠিক। কিন্তু গোড়ায় যে তা হয় না। এই নোংরা আঁধার জঙ্গলে, আর চারদিকে পচাডোবা আর পানাপুকুর নিয়ে থেকে থেকে লোকের এটা এম্‌নিই অভ্যেস হ'য়ে গেছে, যে এর চাইতে ভাল অবস্থায় থাকা যে কেমন তা কেউ মনেও ক'ত্তে পারে না। রোগে ভুগে ভুগে রোগটাই এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে স্বাস্থ্যের স্ফুর্ত্তিটা যে কি, একদম সবাই ভুলে গেছে। আর এতে এম্‌নি একটা গাছাড়া জড়তার ভাব এসে প'ড়েছে, যে শুয়ে ব'সে থাকতে পাল্লে কেউ উঠ্‌তে চায় না। একপেটে দুটি খেতে হবে, খাট বাজার না ক'ল্লে নয়, তাই করে। দেখতে পাচ্চনা, ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে হু হু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ছে, চালে খড় নেই ঝুপ ঝুপ ক'রে জল প'ড়ছে, এ কোণ থেকে ও কোণে বিছানা সরিয়ে গুড়ি সুড়ি দিয়ে থাকে, তবু কিষেণের পয়সা হাতে না থাক্‌লে, নিজের হাতে ঘরখানাও কেউ মেরামত ক'রে নেয় না। ভাতে কত দুঃখু পাচ্ছে, বাড়ীতে খালি যায়গা জঙ্গলে ভ'রে আছে, গায়ে একটু খেটে সেখানে বাগান ক'রে দুটো তরীতরকারী রুয়ে খাবে, তাই কজনে করে? এই যাদের দশা, তাদের কি ক'রে ভাল থাকতে কি তার জন্যে কাজ ক'ত্তে শেখাবে?"

"যদি না শেখে, কতকাল এম্‌নি ক'রে তাদের কাজ ক'রে দেবে?"

"চিরকাল কেন ক'রে দিতে হবে শরৎদা?—খুব, খুব বেশী হ'লেও ৩।৪ বছর—না হয় পাঁচ সাত বছরই যদি আমরা এই রকম ক'রে খাটতে পারি, গ্রামটার শ্রী ফিরে যাবে। একটু সাফ সাফাই আর ঝর ঝ'রে হয়ে আলোতে থাকা, একটু ভাল জলে নাওয়া খাওয়া, এর যে কি আনন্দ তা লোকে একটু বুঝ বেই। রোগ পীড়ে ক'মে স্বাস্থ্যের স্ফুর্ত্তিটাও লোকে কিছু পাবে। আর এই যে সর্ব্বনেশে একটা গাছাড়া জড়তার ভাব—তাও গিয়ে লোকের শরীরটা আর মনটা বেশ চম্‌চমে হয়ে উঠবে। তখন তোমরা কিছু ক'রে দিওনা, দেখো, আপনারাই যা দরকার তা সবাই ক'রে

নেবে। একটু ভাল থাক্‌তে লোককে শেখাও, ভাল থাকার যে কি কি স্ফূর্ত্তি, সেইটে তাদের কিছু বোঝাও, তখন ভাল থাক্‌বার জন্যে লোকেরা নিজেই খাটবে। অলস অকেজো লোক যারা ন্যাক্‌ড়া প'রে পাতের ভাত কুড়িয়ে খেয়ে গাছতলায় নিশ্চিন্তি পড়ে থাক্‌তে চায় গোড়ায় দান ক'রেও তাদের একটু ভাল ভাবে ভাল ভাত কাপড়ে ঘরে থাক্‌তে অভ্যাস করিয়ে নিতে হয়। শেষে কাজ দেখিয়ে দিলে, সারা দিন খেটেও তারা সেই ভালটুকু বজায় রাখতে চাইবে।"

"ব্রাভো! ব্রাভো!" প্রায় সকলেই একবাক্যে এই ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ করতালি দিয়া উঠিল।

যতীন কহিল, "নিবুদা, 'ইকনমিক্‌স্' তুমি লুকিয়ে কিছু পড়েছ নাকি?"

"ইকনমিক্‌স্! সে কাকে বলেরে?"

"ও! তবে পড়নি। না প'ড়ে থাক, ইকনমিক্‌সের খাঁটি কথাগুলো তুমি বলেছ। ইকনমিক্‌স হ'চ্ছে যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অর্থ সম্পদ বাড়ে, লোকে খুব উন্নত হয়ে সুখে থাকে, এই সব কথা যে শাস্ত্রে আলোচনা ক'রেছে। বাঙ্গলায় তাকে অর্থনীতি কেউ কেউ বলে, তবে নামটা একেবারে ঠিক হয় না! যাই হক্‌, সেই ইকনমিক্‌সে ঠিক এই কথাই আছে। লোককে অবস্থায় উন্নত করবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে তাদের ষ্টাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিং অর্থাৎ কিনা জীবনযাত্রার ধরণটা উচু করে তোলা। উঁচুতে উঠ্‌লে লোকে আর নিচুতে নামতে চায় না, সুখের আস্বাদ পেলে আর দুঃখে মড়ার মত হ'য়ে পড়ে থাক্‌তে চায় না। তখন সে কাজ খোঁজে, কাজ পেলেই খাটে, খেটে যাতে তার সেই উঁচুর সুখটা বজায় থাকে, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।"

শরৎ কহিল, "যা ব'ল্লে নিবু, অনেকটা ঠিক বটে। কিন্তু আমাদের দেশের এই পাড়াগাঁয়ের লোকগুলো অতি নচ্ছার। জোর ক'রে ভাল ক'ত্তে গেলেও তারা সাম্‌নে এসে আড় হয়ে পড়ে। এই ধরনা, হরিঘোষালের মত সবাই এসে যদি বাদী হয়, কটা পুকুর তুমি সাফ ক'রে দিতে পার্‌বে। পদে পদে যে আইনে ঠেক্‌তে হবে।"

নিবারণ কহিল, "সবাই ত আর হরিঘোষালের মত কুচুটে লোক নয়? ভালর জন্যে নিজে না খাটুক, ভাল কেউ ক'রে দিলে, তার বাদী সবাই হয় না। এই ত কদিনে কতগুলি পুকুর সাফ হ'য়ে গেল। কই, আর কেউ ত আপত্তি করে নি।"

"পুকুরে করেনি বটে, কারণ কারও এমন ক্ষতি কিছু তাতে হয় না। তবে বাড়ীর জঙ্গল তুমি সাফ ক'ত্তে যাও, দেখ্‌বে চৌদ্দআনা লোক খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। ঐ সব গাছ বড় হ'য়ে তাদের লাক্‌ড়ি হবে, বেচেও দু পয়সা পাবে, বাড়ীর আবরু নষ্ট হবে—কত এমন আপত্তি কত জনে ক'র্‌বে।"

"সেটা হ'তে পারে বই কি? যদ্দুর পারা যায়, বুঝিয়ে রাজি করিয়ে নিতে হবে। আর কি জান শরৎদা, অনেকটা নির্ভর ক'চ্চে পঞ্চায়েত কর্ত্তার উপরে। আমার তারিণী মামা নেহাৎ নরম লোক, একটু শক্ত লোক হ'লে আর তার সহায়তা পেলে সব করা যায়। তবে এই টুকু ভাগ্যি যে কাজে যতই ভয় পান, মনে মনে তিনি আমাদের পক্ষে আছেন। অন্ততঃ তিনি নিজে এসে কখনও কিছুতে বাদী হবেন না। সেও মন্দের ভাল।"

শিবু কহিল, "নিবুদা! তুমি যদি প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হ'তে পাত্তে—"

"হাঃ—হাঃ হাঃ—শিবে! তুই ক্ষেপলি নাকি! আমি হব পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

শরৎ কহিল, "তা হাস আর যাই কর নিবু—আর তুমি যে শীগ্‌গির প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হ'তে পার্‌বে—তারও সম্ভাবনা কিছু দেখ্‌ছিনে—তবে যোগ্যতার কথা যদি ধর, আমি যে আমি—আমিও এ কথা ব'ল্‌ছি—তোমার চাইতে যোগ্য লোক আর এ গাঁয়ে কেউ নেই।"

পুলিন কহিল, "দুশোবার! তা হ'লে আজ আমাদের এই আশা করা যাক্‌ যে নিবু একদিন গাঁয়ের পঞ্চায়েত কর্ত্তা হবে! আর এই সংকল্প করা হ'ক্‌, আমরা যখন বড় হব, নিবুকেই পঞ্চায়েতীর আসনে বসাতে কোমর বেঁধে সবাই লাগ্‌ব।"

সকলে 'ইয়েস্‌' 'ইয়েস্‌' বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল।

পুলিন কহিল, "carried by acclamation! নিবু, তা হ'লে এই কেষ্টপুর গ্রামের ভাবী প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত তুমি!"

নিবু হাসিয়া কহিল, "ও সব বাজে কথা এখন রাখ

পুলিন, কাজের কথায় আয়। তা হ'লে—কি বল শরৎদা, বাকী পুকুর কটাও শেষ ক'রে ফেলা যাক্?"

"তা কাজেই। সবার মত ত সেই রকমই দেখ্ছি। তবে উদ্যোগ ট্যুাগ—তোরাই কিন্তু সব ক'র্বি। যা হ'ক্ কোনও মতে গড়িয়ে গড়িয়ে তোদের পেছনে যাবই। বেশী কাজ আমার কাছে কেউ বড় আশা করিস্ নে। আমাকেও কেমন গাছাড়া রোগে পেয়ে ব'স্ছে। জানিস ত 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,'—তবে চমৎকারিত্ব এর মধ্যে কিছু দেখ্তে পাইনে. 'অড়ৎকারা' ব'ল্লেই ঠিক হ'ত।"

যতীন্ কহিল. "শিবু কি বল্ছ হে?"

শিবু উত্তর করিল, "আমার আর ব'ল্বার কিছুই নেই। তোমাদের চাইতেও নিবুদার ফলোয়ার follower আমি অনেক বেশী।"

"এতক্ষণ ত ভয় দেখিয়ে তার আগে আগেই চ'ল্ছিলি।"

"এই কাণমলা খাচ্চি—নাকে খত দি'চ্চি? আর কেন ভাই!"

শরৎ কহিল, "এখন তবে সভাভঙ্গ করা যাক্! রাত হ'য়ে গেল, আকাশেও কিছু ঘনঘটা দেখা যাচ্চে। এই খোলা মাঠে আর বেশীক্ষণ থাকাটা সুবিধে হবে না।"

পুলিন কহিল, "তা দুই এক পশলা জল গায়ে প'ড়লে কি ম'রে যাব?"

"ম'রে ঠিক না যাও, সর্দ্দি কাশি জরজারি হ'য়ে দুচার দিন বিছানায় পড়ে থাক্তে পার। এই মাঠ কেটে ত একটা পুকুর ক'রে দিচ্চ না রাতারাতি, মিছেমিছি আর জলে ভিজে কাজ কি?"

সকলে হাসিয়া উঠিল,—তারপর কলরব করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিল।

(২৪)

দুই চারিদিনের মধ্যেই মাস কাবার হইল। যাদব সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলীর নিকটে মাতার মাসিক খরচ বাবদ পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

হায়! হায়! সত্যই স্বর্গীয় বড়দাদার সোনার সংসারটা তবে ভাঙ্গিল! ওরা পৃথকই হইল!—হতভাগা! গায়ের তেলে কিছু গ্রাহ্য করে না,—হিতাহিত বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে! এখন কি উপায় হইবে? কোথায় যাইবে? কি করিবে? তিনি একটা মুরুব্বি পাড়ায় আছেন, একবার না হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিত কি কর্ত্তব্য। মরুক! নিজের বুদ্ধির দোষে গায়ের তেলে নিজে মরিবে, তিনি কি করিবেন?

যাহা হউক, ভবানীকে ডাকিয়া তিনি এই সংবাদসহ সেই পাঁচটি টাকা তাঁহার হাতে দিতে গেলেন।

"মোটে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছে!" ভবানীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। "পাঁচটি টাকা মোটে পাঠিয়েছে! কেন, এ ভিক্ষে সে আমাকে নাই দিত। ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেও—এক্ষুণি ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেও ঠাকুরপো! নিবু না পারে, কারও বাড়ী আমি রেঁধে খাব। তার ও ভিক্ষে আমি চাইনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "রেঁধেই বা খাবে কেন, বৌঠাকুরুণ, রেঁধেই বা খাবে কেন? দুঃখে প'ড়লে আমরাই কি ফেলতে পারি? বড়দাদা ত আমাদের পর ছিলেন না? তার প্রপিতামহ আর আমার পিতামহ ছিলেন দুই সহোদর। এমন দূর রক্তওত নয়। আর বড়দাদা যত দিন ছিলেন, ছোটভাইটির মত আমাকে দেখতেন। ওরাও ত দুভাই মান্ত টান্ত আমাকে খুব,—পরের কথা নিয়ে ঝগড়া ক'রে আলাদা হ'য়ে প'ড়ল, একটিবার আমাকে ডাক্লে না, কিছু বল্লেনা—একটা মিটমাট ক'রে যে দেব, তাও পাল্লাম না। সকালে যখন গেলাম, দেখি যাদব রওনা হ'য়ে যাচ্চে। তখন আর কি ব'লব?"

"বল্লেও আর কিছু হত না ঠাকুরপো। আসল গোল র'য়েছে অনেক তলে। তবে নিবু যদি সে যা ব'লছিল, সব কথা মেনে নিত—তা ঠাকুরপো বল্তে কি, ওরা দুজনেই ত আমার সমান—আমিও নিবুকে বল্তে পাল্লাম না, যাদব যা ব'ল্ছে মাথা হেঁট ক'রে তাই কর্।"

"হুঁ—তবে ওরি মধ্যে এদিক ওদিক ক'রে একটা রফা ক'রে ফেল্তে পাল্লেই ভাল হ'ত। নিবু ছেলে মানুষ, এখনও বুঝতে পাচ্চে না,—কি যে এখন ক'রবে, ভেবেই ত কূল পাচ্চিনে। যাদব ত মোট পাঁচটি টাকা পাঠাল—"

"ও টাকা তুমি ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেও। আমি মা, পেটে ধরেছিলাম ব'লে পেট মেপে আমায় দুটি ভাত দেবে! না ঠাকুরপো, এ ঘেন্না আমি সইতে পারব না। ও টাকা তুমি ফেরত পাঠিয়ে দেও। তুমি আদর করে বল্ছ—তোমায় ভাতে বরং আমি এসে থাকব, তবু ছেলে তুচ্ছ করে.

পেটমাপা ছুটি ভিক্ষের অন্ন দেবে, হাতে ধ'রে কখনও নিতে পারব না ঠাকুরপো।—এক্ষুণি তুমি ওটাকা ফেরত পাঠিয়ে দেও!"

ভবানী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"হরিবোল—হরিবোল!" সর্ব্বানন্দ অতি গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কালে কালে কি যে হ'ল! কতটাকা রোজগার ক'রে, মাসে তোমাকে পঞ্চাশটে ক'রে টাকা দিলেই বা কি? বুড়ো মা বাপ কি কেবল ছেলের কাছে পেটে ছুটি খেতে চায়? কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা—সব মিছে বৌঠাকুরুন, সব মিছে! আজকাল পরিবারই হ'য়েছে সর্ব্বস্বি, বাপ মা ভাই বোন্ শুধুই পুষ্যি। তা কি ক'রবে? কালের ধর্ম্ম হ'ল এই—"

"তা হ'ক্ ঠাকুরপো। অমন ছেলে বউএর পুষ্যি আমি হতে চাইনে। একটিবার না হয় আমায় জিজ্ঞাসাই ক'ত্ত? বউ হিসাব করে দিল পাঁচ টাকাতে আমার পেট চল্‌বে, আর তাই সে বেদবাক্যি ব'লে ধরে নিল! - কেন, আমি কি কেউ নই? একবার কি আমাকে ব'ল্‌তে হয় না, মা, মাসে কত ক'রে খরচ দিলে তোমার চল্‌তে পারে? আমার কি সাধ আহ্লাদ কিছু থাক্‌তে নেই? ভিকিরীকে একমুঠা চাল দিতেও ত আমাকে ভাবতে হবে, মাসের চাল বুঝি আমার কম পড়বে? না ঠাকুরপো, তাকে লিখে দেও, চন্দর ঠাকুরঝির মত দোরে দোরে ঘুরে চেয়ে এনে খাব, তবু অমন ছেলের ভাতে আমার কাজ নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "তা লিখব—লিখব। এটা তার বড় অবিবেচনাই হ'য়েছে—লিখে দেব, মাসে অন্ততঃ দশটি করে টাকা তোমাকে পাঠায়। মাসে পাঁচ টাকায় কি পাড়াগাঁয়েও কারও আজকাল চলে? বাজারে কি কিছু ছোঁয়া যায়? সব ত অগ্নিমূল্যি হ'য়ে উঠেছে। তারপর তুমি কিছু যেমন তেমন একটা ফেল্‌না মানুষ নও, এটা ওটা খরচ ত আছে। পাঁচটাকায় কি ক'রে তোমার চল্‌তে পারে? অন্ততঃ দশটি ক'রে টাকা ত চাই-ই!"

ভাবানী কাঁদিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কহিলেন, "তাইত ভাবছিলাম ঠাকুরপো, নিবুকে ত থেতে ও আর দে[illegible]—তবু দশটি করে টাকাও যদি মাসে আমাকে পাঠা[illegible]

"তা পাঠাবে—পাঠাবে। আমি লিখে দেব, কেন পাঠাবে না? এত অবিবেচক ত যাদব নয়। তা যা পাঠিয়েছে, তা ফেরত দিও না। কি জান বৌঠাকরুণ, পাছে নিবুর কিছু সাহায্য হয়, তাই মোটে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছে, এর পর কি ক'রবে—তাও ত ঠিক বলা যায় না। তবু ধর—মাসের বাজার খরচটাওত চ'লে যাবে। তোমার নিজের জন্যে আর ভাবনা কি? তবে নিবারণ যদ্দিন রোজগার কিছু না ক'ত্তে পারে—কিছু সাহায্য ত ওকে হবে। ওই বউটি ছেলেটি র'য়েছে, তাদের মুখের দিকেও ত তোমাকে চাইতে হয়—"

"তার জন্যেও পাঁচটি টাকা হাতে ধরে নিতে পাচ্ছিনে ঠাকুরপো! এমন কুতপিণ্ডেও ক'রেছিলাম ঠাকুরপো, পেটের ছেলে—তার কাছেও আজ এত বড় অপমানটা আমার সইতে হ'ল—"

"কি ক'রবে—কি ক'রবে? নিবারণের ভারটা—কিছু খাদ লঘু ক'রতেও পার—"

"ও পাঁচটাকায় আর কত সুসোরই তার হবে? না ঠাকুরপো, ও আমি নেব না। তুমি ফেরত পাঠিয়ে দেও। লিখে দিও, তোমার মা এটাকা নিলেন না।"

"তা—নিবু এনে দিলেও ত খাবে। যাদবেরটা খাবে না, সে খরচ দিলে নেবে না, এটা কি ভাল দেখাবে বৌঠাকরুণ?"

"তা নেব না কেন? বিবেচনা মত দিক্, কেন নেব না? সে অত রোজগার করে, মোটে পাঁচটি ক'রে টাকা পেট মাপা ভিক্ষের মত আমাকে পাঠাবে, তা কেন নেব? আমায় একটি কথা [illegible]জ্ঞাসা ক'ল্লে না—যেন পুরোনো ধাইদাসী একটা ঘরে ছিলাম—বুড়োকালে ভাতের দুঃখু পাচ্ছি—দয়া ক'রে পাঁচ টাকা মাসোরা বরাদ্দ ক'রে দিল—"

বলিতে বলিতে ভবানী অঞ্চলে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সংযত করিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

"একি! কি হয়েছে মা?"

নিবারণ বাড়ীর মধ্যে দিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল।

ভবানী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। সর্ব্বানন্দও ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া নীরবে রহিলেন।

নিবারণ কহিল, "কি হ'য়েছে কাকা? মা কাঁদছেন—"

সর্ব্বানন্দ কিছু রুক্ষভাবে উত্তর করিলেন—"কাঁদবেন না কি ক'রবেন এখন? এখনকার ছেলেপিলে তোমরা

সব হ'য়েছ ঐ একরকম। যা খুশী তাই ক'রবে, না মুরুব্বি কারও কথা শুনবে—না কারও কাছে দুটো বুদ্ধি পরামর্শ নেবে। জেদ ক'রে ত ভেয়ের সঙ্গে পৃথক্ হ'লে, এখন সংসার কি ক'রে চল্‌বে ভাবছ কিছু? এইত যাদব মোটে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছে—এ দিয়ে উনি কি ক'রে মাস চালাবেন?"

নিবারণ একেবারে আগুণ হইয়া উঠিল।

"পাঁচ টাকা পাঠিয়েছেন! কেন, এ ভিক্ষে কে তার কাছে চেয়েছে?"

"থাম হে বাপু থাম! অত চটে উঠো না! এ ভিক্ষে সে তোমাকে দেয়নি—চাইলেও দেবে না। পাঠিয়েছে তার মার খরচ বরাদ্দ ক'রে।"

"মার খরচ!"

নিবারণের চক্ষুমুখ অগ্নিবর্ণ হইল, বক্ষ ফুলিয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল! একটু দম নিয়া সে কহিল, "মার খরচা পাঠিয়েছেন! কুল্লে মোটে পাঁচটি টাকা! মা, দাদার ওই ভিক্ষে তুমি নেবে? কেন, আমি কি তোমায় দুটি খেতে দিতে পার্‌ব না?"

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "আগে বাবা দেও, তার পরে ব'লো! কই, কোনও চেষ্টা ত তার এখনও দেখতে পাচ্চিনে। সেই থেকে ঐ এক হুজুগ নিয়েই ত আছ। কোন কাজ কর্ম্ম ক'ত্তে হবে—সংসার চালাতে হবে—এ সব ভাবনা চিন্তে যে তোমার কিছু আছে, তার ত কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্চে না। ভাবনা ত সব ওঁর; উনি কাঁদবেন না, ক'রবেন কি? কুল্লে ওই পাঁচটি টাকা, ওতে তিন চারটি লোকের চলে? তোমার ত মুখের দম্ফাই খুবই আছে। এখনই হয় ত ব'ল্‌বে—কি, ওই টাকার ভাত আমরা খাব! বলি, খাবে না কি কর্‌বে? কালই হয় ত চাল না কিন্‌লে উনুনে হাড়ী চড়্‌বে না। তার খোঁজ রাখ কিছু? টাকার যোগাড় ক'রেছ কিছু?"

নিবারণের মুখখানি যেন মাটির মত হইয়া গেল। উঁচু মাথাটি নিচু হইয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দের ভর্ৎসনার সত্য, আর সেই সত্যের গ্লানি, বড় তীব্রভাবে তার সমস্ত অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। আঘাতের তীক্ষ্ণ বেদনা স্তরে স্তরে অন্তর ভেদ করিয়া একেবারে তার তল পর্য্যন্ত গিয়া বিঁধিল। উত্তরে কি সে বলিবে? কি সে বলিতে পারে? নীরবে নতমুখে লজ্জায় দুঃখে আর অপমানে যেন এতটুকু হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট সর্ব্বানন্দেরও বড় দুঃখ হইল। ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন,—"তা ও টাকাও ত উনি রাখতে চাচ্চেন না—ফেরত দিতে ব'ল্‌ছেন। কত রোজগার করে সে,—উনি মা, মোটে পাঁচটি টাকা মাসোয়া বরাদ্দ ক'রে ওঁকে পাঠাল,—অভিমানী মানুষ উনি—এতে অপমানও ত বোধ ক'ত্তে পারেন।"

নিবারণ অতি কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "সে কথা আমি কিছুই এখন বল্‌তে পারিনে, নকাকা! দাদা তবু পাঁচ টাকা পাঠিয়েছেন, আমি যে কিছুই আজ দিতে পাচ্চিনে।"

এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল। ভবানী কিছু উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "নিবু বুঝি রাগ ক'রে গেল ঠাকুরপো।"

সর্ব্বানন্দ উত্তর করিলেন, "মনে কিছু লেগেছে বটে। তা লেগেছে বেশ হ'য়েছে। নইলে ওকি সহজে কোনও কাজ কর্ম্মের দিকে মন দেবে? রাতদিন কেবল হুজুগ নিয়েই থাক্‌বে। হতভাগা! এসব কারা পারে? যাদের সংসারের ভাবনা নেই—কাজকর্ম্মের তাড়া নেই—তারা। এই যেমন ছেলেরা ছুটিতে বাড়ী এসেছে, কেবল তাস পাশা খেলে আর গান বাজনা থিয়েটার নিয়ে দিনগুলো না কাটিয়ে, পারে এই সব কাজ করুক না? কারও সঙ্গে একটা ঝগড়াঝাটি দাঙ্গা ফ্যাসাদ না বাধিয়ে—পুকুর টুকুরগুলো সাফ ক'রে যদি দিয়ে যেতে পারে, তবে মন্দ কি? তা তোর বাপু এসব বাজে কাজ নিয়ে এত মাতামাতি পোষাবে কেন? আজ দু'পয়সা না আন্‌তে পাল্লে কাল পরিবার খেতে পাবে না—তোকে দেখতে হবে তার চেষ্টা। কোনও উদ্যোগ তার নেই। কেবল বাজে হুজুগেই নেচে বেড়াচ্চে।"

ভবানী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "ঐ ত মহৎ দোষ ঠাকুরপো! নইলে লেখাপড়া বেশী না শিখুক, বুদ্ধিসুদ্ধি ত আছে; সাহস হিম্মৎও কম নয়—হাঁটতে খাটতেও বেশ পারে। চেষ্টা ক'ল্লে কি কিছু এদ্দিন হ'ত না? না, আজ এই দুঃখে ওকে প'ড়তে হয়।"

"তা টাকা কটি কি ফেরত পাঠাতেই চাও? আমি বলি—"

"না ঠাকুরপো, তোমার কথা কখনও ফেলি না—কিন্তু আজ আর ওকথা আমায় ব'লো না। ভিক্ষের মত ওই

পাঁচটি টাকা প্রাণ থাকতে আমি হাতে ধ'রে নিতে পারব না। আজই তুমি ফেরত পাঠিয়ে দেও,—লিখে দেও, তোমার মা এ টাকা নিলেন না। তারপর তার যা ভাল বিবেচনা হয় ক'রবে। না কিছু ক'রে, এক বেলা একমুঠো আলো চাল—যা নিবু নিজে খায় ত আমাকেও দিতে পারবে।"

শিবুর মা স্বামীর দিকে একটি কপাট একটু আড়াল করিয়া দ্বারের কাছেই বসিয়া ইঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন। কিছু চাপা স্বরে তিনি কহিলেন,—"তা ও টাকা—দিদি এত ক'রে ব'লছেন—ফেরতই পাঠিয়ে দেওয়া হ'কনা! ফেরত গেলেই বুঝবে কত বড় একটা বেইমানী কাজ সে ক'রেছে। লজ্জা পেয়ে উচিত মত একটা ব্যবস্থা শেষে ক'রবেই। দিদি যদি সত্যি জোর ক'রে বলেন, ভিক্ষের মত পাঁচ টাকা আমি দেব না—ওতে আমার চলবে না—দশটি ক'রে টাকা সে না দিয়ে পারবে? বাপের সুপুত্তুর হয়ে দেবে।"

"সুপুত্তুর হ'লে ত দিতই। আচ্ছা, সবাই তোমরা ব'লছ—ফেরত পাঠিয়েই দি। আর চিঠি একটা লিখে দি। দেখা যাক্, সে কি ক'রে।"

ভবানী আর কিছু বলিলেন না। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। নিবারণ মনে বড় ব্যথা পাইয়া কোথায় গেল। প্রাণটার মধ্যে তার বড় পুড়িতে লাগিল,—কেমন একটা উৎকণ্ঠাও বোধ হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

"ওয়া গুরুজী কা ফতে!"

কৃষ্ণপক্ষ নিশিথিনী, নিখিল ভুবন
সুখ-সুপ্ত, মাতৃ অঙ্কে শিশুর মতন,
ঊর্দ্ধাকাশে তারাপুঞ্জ স্নেহ-দৃষ্টি প্রায়
জাগিছে ধরিত্রী-শিরে, বিজলী-লীলায়
তা'রি ছায়া বহে বুঝি বসুন্ধরা-বুকে
চঞ্চল খদ্যোত কুল!

নির্ভয়ে কৌতুকে
একাকী গোবিন্দসিংহ বনপথ ধরি'
অগ্রসিলা হেন কালে; দিতে ধৌত করি'
গুরুর চরণাম্বুজ পড়িতেছে ঝরি'
নবীন শিশির শষ্পে, শ্রম অপসরি'
বহিছে সমীর ধীরে, পত্র পুষ্পাঞ্জলি
অর্পিছে প্রকৃতিরাণী, বিহঙ্গ কাকলী
অতর্কিতে জাগি কভু গাহিয়া বন্দনা
থামিছে অজ্ঞাতে পুনঃ!

পুরাতে কামনা
আসিলা মহাত্মা কোন্ গহন কাননে
শুনেছেন শিখগুরু, হেরিতে গোপনে
চেয়েছেন তিনি তাঁরে তাই এ নিশীথে
চলেছেন গুরু একা!

ভ্রম হয় চিতে
দিব্য লোক হতে কোন্ পুরুষ প্রধান
আবির্ভূত বনভূমে! গাম্ভীর্য্য মহান্
শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্য সাথে ওতপ্রোত হয়ে
পেয়েছে আসন তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ে
শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিত করি!

অদূরে সহসা
হেরিলা গোবিন্দসিংহ বিদূরি তমসা
প্রজ্জ্বলিত ধুনি পাশে সৌম্য দরশন
সুকুমার সাধু এক ধ্যানে নিমগন
আত্মানন্দে ডুবি যেন! করুণ কোমল
তেজদৃপ্ত মুখ পানে বিস্ময় বিহ্বল
নিরখি ক্ষণেক গুরু সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়
নমিলেন যুক্ত করে!

ফুল্ল কলি প্রায়
মেলিয়া পঙ্কজ আঁখি সাধু কন ধীরে
সম্ভাষি গোবিন্দসিংহে (সারা চিত্ত ঘিরে
বাজিল মধুরে বীণ!)—"এস নরোত্তম!
বস এই কৃষ্ণাজিনে! নিত্য নিরুপম
কি তীব্র সাধনা-সাধ অন্তরে তোমার

সিন্ধুর তরঙ্গ হেন অদম্য অপার
জাগিছে জানি গো আমি! একদা তাঁহার
প্রবল প্লাবনে যত কলঙ্ক আঁধার
ঘুচিবে ভারত হতে! সোনার ভারত
হাসিবে গৌরবে পুনঃ উদ্ভাসি জগত
ধর্ম্মে কর্ম্মে মুক্ততায়! তুমি শক্তিধর
নব যুগ প্রবর্ত্তক! বিশ্বাস নির্ভর
কর এই বাক্যে মম. দিব্য দৃষ্টি বলে
হেরিতেছি ভবিষ্যৎ!"

গুরু কুতূহলে
কহিলেন মুগ্ধচিত্ত—"তুমি অন্তর্যামী
বুঝিলাম প্রভু আজ! বড় ভাগ্যে আমি
পেয়েছি দর্শন তব! চির নিশি দিন
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে হইয়া বিলীন
যে ধ্যানে রয়েছি ডুবি, সাফল্যের তার
শুনাইলে বার্ত্তা তুমি! এত অত্যাচার
জন্মভূমি বক্ষে মম নীরবে সহিতে
পারি না—পারি না আর! মরম শোণিতে
সঞ্চারিত হলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
জ্ঞান শক্তি হারাইয়ে দুস্তর পতনে
মূর্চ্ছাতুর দেশবাসী; জরাচ্ছন্ন প্রাণ
নাহি করে অন্ধকারে আলোক সন্ধান
দারুণ মরণে বরি'! হয় আশা মনে
তুমি শুধু মহাত্মন্! বিশাল ভুবনে
আছ জ্ঞাত প্রতিকার উপায় ইহার
শাশ্বত সহজ সাধ্য, তাই কৃপা করে
আজিকে আমারে কহ!"

সাধুর অধরে
ফুটিল মধুর হাসি, কন মৃদু ভাবে
"সে উপায় কহিবারে তোমারে যে পাশে
এনেছি গোপনে ডাকি'! তিষ্ঠ ক্ষণ কাল.
এখনি কহিবু আমি'!"

বন-অন্তরাল
পলকে পশিল সাধু, মাধুরী বিজলী
চকিতে খেলিয়া গেল! গুরু কুতূহলি
রহিলা একাকী বসি'! খুলিল অনল
নিরখিতে ভবিষ্যৎ হইল চঞ্চল
বিস্তারি' সহস্র শিখা!

ম্লান করি তার
বিশ্ব-চিত্ত উন্মাদক রূপের প্রভায়
তিলোত্তমা সমা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী
সহসা পশিল সেথা; সারা অঙ্গ ভরি
ঝলকিছে বহুমূল্য হীরক খচিত
সুবিচিত্র অলঙ্কার. যেন উলসিত
চাঁদে চুম্বি' তারাদল!

বিস্মিত গুরুর
পদতলে বসি বামা কহিল মধুর
আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে "শুন হে সুন্দর!
রূপে মুগ্ধ রমণীর তৃষিত অন্তর
উৎসৃষ্ট চরণে তব! ছদ্ম-সাধুবেশে
আহ্বানিয়া এ বিজন অরণ্য প্রদেশে
তোমারে এনেছি দেব! ফুলের মতন
বিকশিত উচ্ছ্বসিত প্রফুল্ল যৌবন
অতুল ঐশ্বর্য্য আর, সব সমর্পণ
করিতেছি তব করে! হে প্রাণ-অঞ্জন!
লহ তুমি কৃপা করে রাতুল চরণে
দাও স্থান এ দাসীরে!"

সুরেন্দ্র-ভবনে
বীরেন্দ্র পার্থের পাশে মুগ্ধা উর্ব্বসীর
প্রেম নিবেদন একি! কাল ভুজঙ্গীর
একি তপ্ত বিষশ্বাস! শিখগুরু ত্বরা
ঈষৎ পশ্চাতে সরি' দীপ্ত বহ্নি ভরা
কহিলেন বজ্র-কণ্ঠে—"কে তুই ডাকিনী
ছলিতে আসিলি মোরে?"

হাসিয়া কামিনী
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানি' অন্তর-অন্তরে
লালসার বহ্নি ঢাকি' সোহাগের স্বরে
উত্তরিল—"হে প্রশান্ত! শান্ত হও তুমি,
আমি ত পিশাচী নহি! সারা আর্য্যভূমি
একটু করুণা তরে আজিকে যাহার
রয়েছে উন্মুখ হয়ে 'অনুপ কৌয়ার'
আমি সেই, প্রাণেশ্বর! শৌর্য্য বীর্য্য তব

মোর বুদ্ধি অর্থ সনে মিলি' অভিনব
অদম্য শক্তির ধারা করিয়া সৃজন
জন্মভূমি বক্ষ হতে সকল বেদন
কলঙ্ক কালিমা দিবে প্রক্ষালিয়া
জাহ্নবী প্রবাহ সম ! গর্ব্বে উপেক্ষিয়া
যেওনা হৃদয় মোর ! পূজার থালায়
লহ তুলি তব নাথ ! ধন্য হয় হায়,
জীবন যৌবন মম, হইবে সফল
উদগ্র সাধনা তব !"
মুহূর্ত্তে অনল
স্পর্শিল স্ফুলিঙ্গ স্তূপে ! দৃপ্ত ক্রোধ ভরে
কহিলেন শিখগুরু (নিশিথ অম্বরে
গর্জ্জিল অশনি যেন !)—"অনুপ কোঁয়ার !
জানি তোরে দুশ্চারিণী ! ধিক্ শতবার
যৌবনে সম্পদে তোর ! তুই যদি আজ
না হ'তি অবধ্যা নারী, হানিতাম বাজ
তোর শিরে পদাঘাতে, সকল স্পর্দ্ধার
নিমেষে বিচূর্ণ করি ! অধর্ম্ম ছায়ায়
ধর্ম্মগুরু ভারতের উদ্ধার সাধন
চাহে না গোবিন্দসিংহ ! লইয়া জীবন
দূর হয়ে যারে তুই ! প্রগলভা তোর
ক্ষমিলাম সব আমি !
নিশি হ'ল ভোর
অকস্মাৎ অতর্কিতে ! মুখরি কানন
স্বভাব ঋত্বিক বৃন্দ বিহঙ্গমগণ
"জয় গুরুজীর জয় !" উঠিল গাহিয়া
মধুর ললিত কণ্ঠে, সে তানে মাতিয়া
বননির্ঝরিণী কূল গাহিল পুলকে
"জয় গুরুজীর জয় !" দ্যুলোকে ভূলোকে
দ্বারে দ্বারে প্রভঞ্জন ধাইল গাহিয়া
"জয় গুরুজীর জয় !" নয়ন মেলিয়া
সে তানে মিলায়ে তান পবিত্র স্পন্দন
জাগাইয়ে মহাব্যোমে গাহিল ভুবন
"জয় গুরুজীর জয় !"
কত বর্ষ পরে
বঙ্গের চারণ কবি নিভৃত অন্তরে
সে মহান্ জয়ধ্বনি করিছে শ্রবণ
আত্মহারা হয়ে আজ ! পুণ্যনিকেতন
হে প্রিয় স্বদেশ মোর ! গোপন আত্মায়
বরি' লহ হেন দৃঢ় চরিত্র নিষ্ঠায়
অপূর্ব্ব এ স্বার্থত্যাগে ! গাহ আরবার
নেহারি গোবিন্দসিংহে সম্মুখে তোমার
পরম আনন্দ ভরে নোয়াইয়ে শির
"জয় গুরুজীর জয় ! জয় গুরুজীর !"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ভ্রমণ।

(অবশিষ্টাংশ)

এ অঞ্চলটা পার্ব্বত্য প্রদেশ। কারাকোরম পর্ব্বত (The Karakoram Range) উত্তর দক্ষিণে লম্বা, কিন্তু এখানে প্রস্থেও প্রায় ১৫০ মাইল। এই পর্ব্বতের সানুদেশে টাঁক সহর অবস্থিত। এখান হইতে ফিরিবার পথে 'পাগলা ঝোরা'র ন্যায় অনেকগুলি ঝরণা আছে। একদিন বৃষ্টি হইলে ২।৩ দিন আর সে পথে গমনাগমন চলে না। ইদানিং কয়েকবার বৃষ্টি হওয়ায় এ অঞ্চলের অস্থায়ী রেল স্থানে স্থানে কয়েকবার ভাঙ্গিয়া যায়। এই সব কারণে অনেকবার দিন পিছাইয়া স্থির হইল, আমরা ১৮ই সেপ্টেম্বর তল্পী লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্য রওনা হইব। আমার সহকারী বন্ধুবর গিরীন্দ্র নাথ তাঁহার পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া হঠাৎ ১১ই তারিখে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লইয়া

একখানি, Ordnance Train এর ব্রেকভ্যানে অনেক উচ্চ সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত রওনা হইয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে আমরা সকলে বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ওরূপ কার্য্যক্ষম প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সদানন্দ বন্ধু পাইয়া এই দায়িত্বপূর্ণ কষ্টকর প্রবাস-জীবন বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইতেছিল।

১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আমাদের যথারীতি কাজ করার কথা। তাহার পরে ৪ দিন গুছাইয়া লইবার অবসর থাকিবে স্থির ছিল। কিন্তু ১৩ই সংবাদ পাইলাম যে, ১৪ই বেলা ১০টার মধ্যে সমস্ত জিনিষ গুছাইয়া মালগাড়ীতে তুলিয়া না দিলে ২।১ মাস মধ্যে তাহা যাইবে না। সৈনিক বিভাগে হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। উপায়ান্তর নাই জানিয়া একজন মিস্ত্রি ও আমার অন্যতম সহকারী অজিতনাথের সাহায্যে (অপর দুইজন তখন জ্বরে শয্যাগত) নিজেরাই হাতুড়ি ধরিয়া সমস্ত দিন ও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নানাবিধ জিনিষ গুছাইয়া ফেলিলাম। ভোরে কয়েকটা ছালা ভিক্ষা পাইয়া তবে সব প্যাক করা শেষ হয়। বেলা ৯টার সময় Asst. R. T. O. (Railway Transport Officer) আমাদের অবস্থা দেখিতে আসিয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ওয়াগান সাইডিংএ রাখার হুকুম দিয়া ১০ জন কুলির দ্বারায় মাল উঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সমস্ত শেষ হইতে প্রায় ১টা বাজিল। তখন অবসন্ন দেহে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করা গেল।

এখানে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। একজন কাপ্তেন সাহেব ক্যান্টন্‌মেন্টের মধ্যে নানাস্থানে কুলি —Fatigue party যোগাইবার মালিক ছিলেন। তিনিই উপরোক্ত Asst. R. T. O.। পূর্ব্বে আমরা এ ব্যবস্থার কথা জানিতাম না। একদিন আমাদের আফিসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছয় জন লোক না আসায় পূর্ব্বনির্দ্দেশমত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সে বিষয় জানাইতেছিলাম। কাপ্তেন সাহেব তাহা ঘটনাক্রমে জানিতে পারিয়া আমাদের ডিপোতে আসিয়া সে জন্য বড় অনুযোগ করেন। ইহা লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের বেশ একটু বচসাই হয়। তিনি আমাদের ধমকাইতে আসিয়া কালা আদমির নিকটে তাঁহার মাতৃভাষার এতটা স্পষ্ট কথা শুনিয়া বাইবেন আশা করেন নাই। ফিরিয়া যাইতে পথে একজন 2nd Lt. এর সাথে দেখা হইলে এ বিষয়ে কথা উঠে। তখন তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের সুবেদার মেজর (ভারতীয় সৈন্যের সর্ব্বোচ্চপদ) Subadar Major এর পদ), ও আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। এ ব্যাপার আমরা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে পারি, এবং তাহা হইলে কাপ্তেন সাহেবের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। পরদিন প্রত্যুষে দেখি ৬ জন কুলি পাঠাইয়া কাপ্তান সাহেব হাসি মুখে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। প্রথমেই অভিবাদন করিয়া (ইহা নূতন ব্যাপার) নানাবিধ গল্প করিতে করিতে বলিলেন যে, তিনিও কলিকাতায় কোনও আফিসে কাজ করিতেন। আমরা পদোচিত crown পরি না কেন, কোনও অভাব অসুবিধা হইলে তাঁহাকে যেন তৎক্ষণাৎ জানান হয়, এইরূপ নানা বিষয়ে বন্ধুভাবে অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিনকার কথাবার্ত্তায় আমাদের মনে কেমন একটা খট্‌কা থাকিয়া গেল। ক্রমে ইঁহার সহিত বেশ আলাপ হয়, এবং তাঁহার নিকটেই পরে শুনিয়াছিলাম যে, উপরোক্ত 2nd Lt. (ইনি একজন I. C. S.) সে দিন নাকি বলিয়াছিলেন যে, (Indian Officer) হইলেও সুবাদার মেজর (Subadar Major) বা (Rissaldar Major) এর পদ লেফ্‌টেনাণ্ট (Lieut.) বা কাপ্তেন (Capt.) অপেক্ষা কম নয় এবং সকল সময় তাঁদের সহিত সসম্মান ব্যবহার করাই নিয়ম। আর কলিকাতার লোকরা শিক্ষিত, তারা চট্‌ করিয়া সব কথা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিতে পারে। এই উক্তিই নাকি উপরোক্ত কাপ্তেন সাহেবের চৈতন্যোদয় করে। আমাদের পদ অস্থায়ী (Rank "relative" বা "temporary") হইলেও ক্যান্টন্‌মেন্টের মধ্যে সকলকেই আমাদের পদকে সম্মান করিতে হইত। কিন্তু আমরা ঐ পদের বিশেষ চিহ্ন কিছু ব্যবহার করিতাম না, সে জন্য একদিন জেনারেল গর্ডনও (General Gordon) হাসিতে হাসিতে একটু রসিকতা করিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ক্রাউন (crown) পাঠাইয়া দেন নাই, এবং আমাদের এ যাত্রার দলের রাজা সাজার ন্যায় পদ, দুদিনের জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া মুকুট পরা সমীচীন ও আবশ্যক বোধ করি নাই, এই স্পষ্ট উত্তর দেওয়ায় খুব হাসিয়াছিলেন। ইহাতে সর্ব্বদা সেলাম না পাওয়া ভিন্ন আর কোনও ক্ষতি ছিল না। সারা ও

কালার তফাৎ সর্ব্বত্রই খুব তীক্ষ্ণ। তবে উচ্চসৈনিক কর্ম্মচারীরা বেশ সহৃদয় ও অনেকটা সাম্যবাদী। অবশ্য সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। তবে ইহাও সত্য যে হঠকারী শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মুখের উপরে যদি সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, তবে অনেক সময়েই জোঁকের মুখে নুন পড়ে। মুখে খুব হম্বিতম্বি করিলেও মনে মনে তারা এই পরাধীন দাসত্ব-পীড়িত নির্জ্জীব ভারতবাসী অপেক্ষা কম ভীরু বলিয়া মনে হয় না।

এখানে সিয়ালকোট নিবাসী বাবু হংসরাজের সাথে আলাপ হয়। ইনি ২১ মাস ফ্রান্সে ছিলেন ও পরে ইংলণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইয়ুরোপে যুদ্ধশক্তির সমস্ত দেশ ঘুরিয়া ভারতে ফিরিয়াছেন। ইঁহার কমাণ্ডিং অফিসার (একটি Camel Corps এর) একজন মেজর, ইংরাজ হইলেও বড় সহৃদয় লোক। তিনি এক সময় কয়েক ঘণ্টা ঘোরতর কামান নির্ঘোষের মধ্যে থাকিয়া শ্রবণ শক্তি একেবারে হারাইয়াছেন। সর্ব্বদা লিখিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করেন। হংসরাজ বাবু বেশ বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। মার্সেলিজ হইতে প্যারী পর্য্যন্ত কয়েকজন জার্ম্মাণ গোয়েন্দার অনুসরণ করিয়া তাহাদের ধরাইয়া দেন, সেজন্য সার্ ডগলাস্ হেগ (Sir Douglas Haig) পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রশংসা পত্র লিখিয়াছেন দেখিলাম। সামান্য ভারতবাসীর দ্বারা এ স্পর্দ্ধার কাজ কম গৌরবের নয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যায় লেফ্‌টেনাণ্ট খান্না, (Lt. Khanna I. M. S.) দেশীয় 'অফিসার'দের একটী ভোজ দেন। তাহাতে বেস্ পোষ্ট আফিসের (Base Post-Office) পোষ্টমাষ্টার শ্রীবাসুদেব (Mr. Vasudeva—ইনি লাহোরের রায় বাহাদুর মজুমল মহাশয়ের পুত্র) ও আমরা ব্যতীত বাঙ্গালী লেফ্‌টেনাণ্ট কে, সি, চৌধুরী, পি, এন্ ঘোষ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কে, কে, ধারিওয়াল প্রভৃতি আই, এম্ এস্ ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সব I. M. S. অফিসারগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিলে মধ্যে মধ্যে পরস্পরে এই রকম ভোজ চলিতেছিল। আমরাও ভারতবাসী এবং এক একটা পদ (rank) থাকায় এ সব নিমন্ত্রণে আহুত হইতাম। এ দিনের ভোজের বিশেষত্ব ছিল যে, আহার্য্য সমস্তই খাঁটি লাহোরী প্রথায় আয়োজন (Dr. Khanna লাহোরবাসী) হওয়ায় সকলেরই বড় আনন্দ হইয়াছিল। শ্রীবাসুদেবের নিমন্ত্রণ ছাড়া অন্য সর্ব্বত্রই সাহেবী ধরণে আয়োজন হইত, যদিও কেহ কেহ দেশীয় ধরণেই আহার করিতেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন I. M. S. ডাক্তার ষ্টেশন হস্পিটাল (Station Hospital) এর নিকটেই তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। একদিন সকালে কোনও কার্য্যের জন্য আমরা সেখানে যাই। ডাক্তার সাহেব হাসপাতাল পরিদর্শনে যাইতেছিলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখি, শ্বেতাঙ্গ রোগী প্রায় নাই। গরমের জন্য তাহাদের প্রায় প্রত্যহই রাওলপিণ্ডি স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তাহাদের জন্য সুন্দর পাকা বাড়ী, তাহাতে বড় বড় দরজা, জানালা, সার্সি, খাট, বিছানা, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা সোডা, লেমনেড, বরফ, ঔষধ পথ্য, শুশ্রূষাকারিণী প্রভৃতি এখানেও কলিকাতার ন্যায় সহরের হাসপাতালের মতন কিছুরই অভাব নাই—সময় সময় রোগীর অভাবই হইয়া থাকে। লোকের জন্য followers) সৈনিক ও অন্যান্য হাসপাতালের ব্যবস্থা অনুরূপ।

আমরা এখানে থাকার সময় (Bombay Women's Association) বোম্বাই নারী-সমিতি কিছু ওয়ার-গিফ্‌ট্ (War Gifts) পাঠাইয়াছিলেন (সাবান, জামা, তোয়ালে, চুরুট ইত্যাদি)। তাহা সকল শ্রেণীর লোক (যোদ্ধা ও সঙ্গী অপরাপর লোক—Combatants and Non-Combatants) অনেকেই পাইয়াছিল, তবে এই অসাম্যময় পৃথিবীতে সাম্য যেন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। টাঁক পরিত্যাগ করিতে পারা সকলেই সৌভাগ্য মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ একে একে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। আমাদের ১৮ই রওনা হইবার হুকুম হইল, (যদি দৈবাৎ বৃষ্টি হইয়া লাইন ভাঙ্গিয়া না যায়!) কেবল বন্ধুবর লেফ্‌টনাণ্ট ঘোষ (Lt. P. N. Ghose,)—ইনি কলিকাতা নিবাসী স্বনামধন্য ডাক্তার সার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভাগিনেয়—বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোরে ডাক্তার হইয়া যান ও খুব কৃতীত্বের সহিত কাজ করেন—বিশেষ অমায়িক লোক—একটী এ্যাম্বুলেন্স কোর (Ambulance Corps) লইয়া ঐ দিন আমাদের সাথে একই ট্রেণে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাইবেন জানিয়া বিশেষ আহ্লাদ হইয়াছিল।

১৮ই সেপ্টেম্বর—সমস্ত আসবাবপত্রাদি বেলা ৯টার মধ্যে ষ্টেসনে পাঠাইয়া, লেফ্‌টেনাণ্ট ঘোষ ও বসু মহাশয়দ্বয়ের সাথে অর্ডনান্স বিভাগের একখানি সাম্পানে বেলা ২টার সময় ষ্টেসনে পৌছান গেল। আমাদের বন্ধু সুরেন বাবু আর একদিন পরে ভেরাব পথে ফিরোজপুর যাইবেন। আমরা চলিয়া আসিবার সময় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। ঘোর বিদেশে প্রায় ৩ মাস সর্ব্বদা একত্র বাসের পরে পরস্পরের পৃথক হইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। টাঁক হইতে রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত আমাদের জন্য স্পেসাল ট্রেণ ছিল (Troops special)। গাড়ীতে ব্রিটিশ অফিসারদের প্রথম শ্রেণীতে এবং অন্যান্য অফিসারদের জন্য (British W. O. N. C. O. & Indian Officers) দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে প্রত্যেক লোকের ২ দিনের মত আহার্য্য ও পানীয় সাথে লওয়ার হুকুম হয়, কি জানি পথে কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে গাড়ী যাইতে দেরী হইবে। আমাদের উপরে হুকুম ছিল অধীনস্থ লোক প্রত্যেকে উপরোক্ত আহার্য্য পানীয় লইয়াছে কিনা দেখিয়া তাহাদের যথাস্থানে গাড়ীতে বসাইয়া দিতে হইবে।

বেলা ৪-১৭ মিনিটের সময় যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। জুন মাসে টাঁকে যাওয়ার সময় যে পথে গিয়াছিলাম এখনও প্রায় সেই পথেই ফিরিলাম, তবে রেলপথ এখন সর্ব্বত্রই স্থায়ীভাবে সুদৃঢ় করা হইয়াছে। প্রথমে কিছুদূর উৎরাই, কেবলই পাহাড়ের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ ও পাশে গভীর খাদ—দেখিলে ভয় হয়, —মধ্যে মধ্যে লছমন ঝোলার পথের ন্যায় সুন্দর পুল হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। এক স্থানে কয়েকখানা মালগাড়ী লাইন হইতে পথে উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, এখনও সেইখানে শুইয়া আছে, তাহা উঠাইবার উপায় হয় নাই। সন্ধ্যা হইতে আমরা কতক সমতল মরুভূমির মধ্য দিয়া দৌড়িতে লাগিলাম। ঘনান্ধকার মাঠের মধ্যেই কখনও রেল থামে, আবার চলে। সন্ধ্যার অল্প পরেই সহযাত্রী একটী সাহেবের সহিত নানাবিধ গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষ রাত্রে ট্রেন্ কালাবাগ ষ্টেসনে আসিয়া সাইডিং-এ ছিল! ভোরে নিচেই কালাবাগ ঘাট ষ্টেসনে আসিল। এখানে একটি ছাউনি আছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর—গাড়ী হইতে নামিয়াই বামদিকে দুইপাশে অনাবৃত উচ্চ পাহাড়ের মধ্যে খরস্রোত সিন্ধুনদ প্রবাহিত। তাহার এ পারে দূরে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম, মধ্যে মধ্যে আম্রকুঞ্জ, এবং ও পারে বহুবিস্তৃত শ্যামল ভুট্টাক্ষেত্র. তাহার সম্মুখে নদীর ধারে ধারে শতাধিক শ্বেতবর্ণের বস্ত্রমণ্ডপের পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল আভায় ক্রমে গগনমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া হৃদয় মন পুলকে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ছাত্রাবস্থায় পড়িয়াছিলাম 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তখন সে কথার তাৎপর্য্য ঠিক উপলব্ধি হইত না। কিন্তু প্রায় তিনমাস মরুভূমির মধ্যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া, এই শরৎ-প্রভাতে চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে শস্যশ্যামলক্ষেত্র "নবমুখো" বাঙ্গালীর চিরপরিচিত বঙ্গ-মাতার হরিৎক্ষেত্র মনে করাইয়া দিয়া, কি এক অননুভূত-পূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব করিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যিনি হৃদয়ে এ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই কেবল আমাদের সে সময়কার মনের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন।

বেলা ৭টার সময় আমরা ওপারে যাইবার জন্য ষ্টীমারে রওনা হইলাম। ওপারে মারীঘাটে পৌছিতে প্রায় আধ-ঘণ্টা উজাইয়া যাইতে হয়। এখানকার দৃশ্য অতীব সুন্দর। ডানদিকে মারী-ইণ্ডাস; সেদিকে অর্দ্ধালোকিত আকাশ-তলে বহু উঁচুপাড় ও তাহার উপরে পটাবাসের শীর্ষভাগ দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু বামপাড় প্রখর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত। মহানদের তীরেই আম্রকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ ২।৩টী ছোট পাকা বাংলো ঘর, কোথাও বা তাঁবু শোভা পাইতেছে। এখানে উচ্চ ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীগণ বাস করেন। চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৃণাচ্ছাদিত, জলের উপরে ২।১ খানা জালিবোট বা মোটরলঞ্চ ভাসি-তেছে। গাছের পাতা হইতে শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাতে সূর্য্যের আভা চক্‌মক্‌ করিতেছে। তাহার একটু পরেই নদের জল হইতে পাহাড় ২।৩ শত ফুট খাড়া উঠি-য়াছে, মধ্যে মধ্যে ঘাট, সেখানে বহু নরনারী বালক বালিকা মুখ ধুইতেছে, কাপড় কাচিতেছে স্নান করিতেছে। তাহাদের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুঠাম অবয়ব ও সুন্দর মুখশ্রী; তাহারা দেবলোকের অধিবাসী বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া

দেয়। আবার এই পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে ছোট ছোট ঘর, একের ছাদ অন্যের উঠান বলিয়া মনে হয়। কোথাও বা তাহার কতক অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, কোথাও কতক ঝুলিতেছে, কোথাও কোন ঘরের অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, অপরার্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশতলে চারপাই বিছাইয়া লোক শুইয়া আছে। এ সব দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল। ওপারে ষ্টীমারে পৌছিবার পূর্ব্বেই একখানি মোটরলঞ্চে (Launch) কালাবাগ ঘাটের নন্দনকানন হইতে R. T. O সাহেব আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। ঘাটে পৌছিলে তাঁহার আদেশমত সকলে নামিয়া কুচ করিয়া প্রায় ২৫ মিনিটে আন্দাজ ১০০ ফুট উঁচু পাড়ের উপরে উঠা গেল। সেখানে পূর্ব্বদৃষ্ট তাঁবুতে সকলের বিশ্রামাবাস নির্দ্দিষ্ট ছিল, সমস্ত দিনের মত সেখানে বিশ্রাম করিতে হইবে। থিয়েটারের দৃশ্যপটে শিবির অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম মাত্র, আজ বাস্তব-জীবনে তাহা দেখিয়া বড়ই আমোদ অনুভব হইতেছিল। কলের জলে স্নান করিয়া স্বহস্তে পাককরা খেচরান্ন বড়ই উপাদেয় লাগিয়াছিল। বৈকালে পরোয়ানা পাইলাম যে লাহোরে কলেরা হইতেছে, সেজন্য সেখানে কেহ নামিতে পারিবে না, এমন কি ষ্টেশনে কোনও আহার্য্য বা পানীয় লওয়া নিষেধ। আমাদের যাঁহারা লাহোর যাইতেছিলেন, তাঁহারা এইখানেই আটক থাকিলেন। বেলা ৫টার সময় সমস্ত তাঁবু উৎপাটিত হইয়া গাড়ীতে বোঝাই হইল। সন্ধ্যার পরে লেফ্‌টেনাণ্ট বসু (ইঁহার নিবাস ফয়জাবাদ) আমাদের একটী ভোজ দিয়া অন্য সহযাত্রীর সহিত কোয়েটা রওনা হইয়া গেলেন। বাকি আমরা অপর গাড়ীতে রাত্র ১০৷৷০ টার সময় রাওলপিণ্ডি রওনা হইলাম।

২০শে সেপ্টেম্বর—বেলা ৯৷৷০টার সময় স্পেশাল ট্রেন রাওলপিণ্ডি পৌছিল। R. T. O. প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের অধীনে কতজন লোক আছে, কে কোথায় যাইবে, সবিশেষ সংবাদ লইয়া—ষ্টেসনের বাহিরেই বিশ্রামাগার (Rest Camp)—সমস্ত দিনের জন্য বিশ্রামের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সৈনিক পোষাকে আমাদের হাঁটু পর্য্যন্ত কাটা পেণ্টুলন (short) পরা ছিল। পায়ে ঘা থাকায় (frontier sore) সেখানে সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। R. T. O. মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা যুদ্ধে আহতজ্ঞানে পথে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত অবস্থা জানিয়া ও পথেই লেফ্‌টেনাণ্ট ঘোষ এ্যাম্বুলেন্স কোরের সর্দ্দার হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, গাড়ীতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া ঘা ধৌত করার ব্যবস্থা তিনি যেন করিয়া দেন। আমরা উভয়েই তাঁহার কথায় একটু হাসিলাম,—কারণ তাহা হইতেছিল। ইহা সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনা হইলেও সৈনিক-বিভাগের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সহৃদয় ব্যক্তির হাতে কেমন সুচারুরূপে পালিত হইতে পারে তাহার নিদর্শনস্বরূপ ইহা উল্লেখ করা গেল। Rest Camp একটি প্রকাণ্ড আমবাগান। মধ্যে ইতঃস্তত কয়েকটী জলের কল ও একটী জ্বালানি কাঠের গোলা। একপাশে গোটা কয়েক তাঁবু, তাহাতে অফিসারগণ আশ্রয় পান, আর সকলকেই গাছতলায় বিশ্রাম সুখলাভ করিতে হয়। সেখানে অনেক লোক বিশ্রাম করিতেছিল, আমরাও একস্থানে আড্ডা লইয়া মধ্যাহ্নিক আহারের জন্য সঙ্গের লোকদের কিছু কাঠ যোগাড় করিয়া দিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

এখানকার রাস্তাগুলি খুটিংএর, বেশ পরিষ্কার ও সুসংস্কৃত। মধ্যে মধ্যে টঙ্গার আড্ডা। এখানকার টঙ্গাগুলি বেশ সুন্দর, দুইজন আরোহী আরামে বসিয়া দ্রুত ভ্রমণ করিতে পারে। ভাড়াও অধিক নয়। উত্তর পশ্চিম-ভারতে, লাহোরের পশ্চিমে রাওলপিণ্ডি খুব বড় সহর এবং এখানকার ছাউনি এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এতদঞ্চলের সৈনিক-বিভাগের সমস্ত বড় অফিস এখানেই অবস্থিত। প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ক্যাণ্টনমেণ্টে ও পরে দক্ষিণ দিকে পুরাতন সহরে ঘুরিয়া ডাক্তার এন্. এন্. দত্ত রায় বাহাদুরের ডাক্তারখানায় তাঁর সহিত দেখা করিতে গেলাম। এখানে মুহুরীগিরির খাতিরে প্রায় ২০০ ঘর বাঙ্গালী আছেন, অনেকে এই দেশবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। রায় বাহাদুর খুব শান্ত প্রকৃতির সদানন্দ যুবক, তাঁহার প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট। সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া (লেফ্‌টেনাণ্ট ঘোষের সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল) ক্যাম্পে ফেরা গেল। এখানে বাজার অঞ্চলও বেশ পরিষ্কার। দেখিলেই মনে হয় যে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতির ন্যায় দেশীয় পল্লী—যেখান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর আদায় হয়—স্বাস্থ্যোন্নতি

ব্যাপারে উপেক্ষিত হয় না। বাজারে ফলের দোকানই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে। মেওয়া ফল এখানে সর্ব্বদা প্রচুর পাওয়া যায়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট এবং সস্তা। আমরা কলিকাতায় সেরূপ জিনিষ প্রায় দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দশ আনা দামের বেদানা, আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি ইত্যাদি খরিদ করিয়া বুভুক্ষু অবস্থায় বেলা ১টার সময় ক্যাম্পে ফিরিয়া ৩ জনে তাহার সমস্ত খাইতে পারি নাই।

বৈকালে ষ্টেসনের অনতিদূরে সহরের মধ্যেই রায় বাহাদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারি বাড়ীর ফটক ও তাহার দুই পাশের বেড়াতে আঙ্গুর লতা ছাইয়া আছে, চারিদিকে থলো থলো কাঁচা পাকা আঙ্গুর ঝুলিতেছে, দেখিতে কি সুন্দর! আমরা যাহাকে কাঠের কৌটায় তুলার ভিতরেই দেখিয়া থাকি অসুখের সময় বিপদে পড়িয়া বহুব্যয়ে যাহা আহরণ করি, তাহাই এরূপ অযত্নে প্রচুর ফলিতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কয়েকটা ছিঁড়িয়া আস্বাদে বুঝিলাম সেই পরিচিত জিনিসই বটে।

প্রায় তিনমাস (বন্ধুবর লেফ্‌টেনান্ট ঘোষ প্রায় ৬ মাস) পরে এখানে বাঙ্গালীর আহার্য্য আলু, পটল, মাছ, শাক ও পান খাইয়া বড়ই সুখী হওয়া গেল। রায়বাহাদুর ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের ষোড়শোপচারে সাদর অতিথি-সেবা জীবনে ভুলিবার নয়। আমরা বাঙ্গালী বহুদিন সৈনিক-জীবনে খাওয়ার কষ্ট পাইয়াছি মনে করিয়া বাঙ্গালী রমণীর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বারান্তরাল হইতে এটা ওটা খাওয়ার অনুরোধ ও রায় বাহাদুরের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে পারি নাই। আমাদের স্ত্রী জাতির এই মাতৃস্নেহ ও ভগিনী-প্রীতি যে জীবনে কখনও অনুভব না করিয়াছে, সে নিতান্তই দুঃখী।

এখান হইতে ডাক গাড়ীতে আমরা রওনা হইব। সন্ধ্যার পরেই ট্রেণ পৌঁছিলে দেখিলাম তাহাতে খুব ভিড়। সাথের লোকদের যথাস্থানে তুলিয়া দিয়া, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। তাহাতে লণ্ডন রেজিমেণ্টের (10th London Regiment) কয়েকজন সৈনিক (privates) ছিলেন। আমাদের সৈনিক কর্ম্মচারীর বেশে তরবারি হস্তে সে কামরায় ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহারা তিনজনে প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলেন। পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহারা টেরিটোরিয়াল (Territorials) সৈন্য। সকলেই ভদ্রলোকের সন্তান ও সুশিক্ষিত, এই যুদ্ধ উপলক্ষে সৈনিক হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিভাগীয় নিয়মানুসারে তাঁহারা 'অফিসারের' সহিত একত্র যাইতে চাহেন না। কাল অফিসারের (তাও আবার যাত্রা দলের রাজা!) প্রতি সাদা সৈনিকের এই সম্মান ব্যবহার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। ইঁহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতার জ্ঞান ও দ্বিধাশূন্যতা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করিলাম। এই গুণেই ইঁহারা এদেশের রাজা। শিক্ষিত হায়, ভারতবাসী ও ইংরাজে কত প্রভেদ! আমাদের জন্য তাহারা তিনজন কষ্ট পাইবে, কোথাও স্থান নাই দেখিয়া আসিয়াছি, কাজেই তাহাদের বসিতে বলিয়া আমরা R. T. O. কে অবস্থা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি একটী দলের সর্দ্দার হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারেন (As officer commanding an unit you can travel first class) এই বলিয়া নিজেই এদিক ওদিক দেখিয়া একখানি ছোট প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে একটী বার্থ রিজার্ভ করিয়া দিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, সেখানে অপর আরোহী বন্ধুবর লেফ্‌টেনান্ট ঘোষ।

২১শে সেপ্টেম্বর—বেলা ৯টার পরে লাহোর পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে R. T. O. আসেন না। ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিয়া গেলেন, এখানে (বা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে) কেহ নামিতে পারিবে না। আমাদের এখানে কয়েকদিন বন্ধুবর জিতেন্দ্রনাথের আতিথেয়তা গ্রহণের স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু নামিতে পাইলাম না, হয়ত আর কখনও লাহোর দেখার সুযোগ ঘটিবে না, কাজেই মনঃকষ্টে আবার সেই ট্রেণেই চলিতে হইল। পূর্ব্বের ব্যবস্থামত লাহোর হইতে পরের ষ্টেশন শিখগুরুর পুণ্যময় তীর্থস্থান অমৃতসহর দেখিয়া হরিদ্বার ও সিমলা শৈল ভ্রমণান্তর লক্ষ্ণৌ যাইব স্থির ছিল। কিন্তু লাহোর নামিতে না পারায় মনে এমনি একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল যে, অমৃতসহর ষ্টেশনে রেল যখন পৌঁছিল, তখনও তাহার ঘোর কাটে নাই। দূর হইতে স্বর্ণ-মন্দিরের উচ্চ চূড়ার উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সময় হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমাগত তিন দিন বৃষ্টি হইতে লাগিল। জলন্দর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে একটী ভদ্রলোক গল্পচ্ছলে বলিলেন, এ অঞ্চলের

লোক সাধারণতঃ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, কিন্তু এই যুদ্ধে এত লোক সৈনিক হইয়া গিয়াছে যে, কোনও কোনও গ্রামে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ নাই বলিলেও হয়। তাঁহার মুখে একটা মনঃপীড়ার ভাব সুস্পষ্ট বুঝা গেল। এটা যেন অভাবনীয় ঘটনা। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়াতে অনেক গ্রামের এরূপ দুরবস্থার কথা আমরা জানি, তবে যুদ্ধে কি রকম লোকক্ষয় হইতেছে, তাহা বাঙ্গলা দেশে আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না।

অম্বালায় সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখনও অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, কাজেই সিমলা যাওয়ার আশা ত্যাগ করিলাম। ৭টার পরে গাড়ী সাহারাণপুরে পৌছিল। এখানে লক্ষ্ণৌ গামী ট্রেণের জন্য আমাদের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সাথের প্রায় ১৫০ লোক একখানা রিজার্ভ গাড়ীতে ছিল, সে গাড়ীখানা সাইডিং-এ রাখিয়া ট্রেণ দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেল। রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করার পরে আর ভাল করিয়া আহার জুটে নাই। এখানেও ষ্টেশনে দেশীয় মতে কিছু খাবার পাওয়া গেল না। ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে সহরে যাওয়ারও সুযোগ নাই। তখন আমাদের সহকারীগণের আনীত খাদ্য গলাধঃকরণে রুচি না হওয়ায় ষ্টেশন রিফ্রেসমেণ্টরুমে ডিনার খাইয়া জীবন পাওয়া গেল। এ সব অঞ্চলে এরূপ দীর্ঘ রেল ভ্রমণে বাঙ্গালীর খাওয়ার বড় কষ্ট হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই দুইদিন গাড়ীতে ব্যাণ্ডেজ বদলান সত্ত্বেও স্নানের সুবিধা হয় নাই, বাহিরেও ক্রমাগত বৃষ্টি, কাজেই কেবলই গাড়ীর ভিতরে শুইয়া বসিয়া আছি, তবুও পায়ের ও হাতের ঘায়ে কেমন একটা বেদনা ও সমস্ত শরীর মন অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবের ইচ্ছায় হরিদ্বারে যাইবার সংকল্পও ত্যাগ করিলাম। পথে অসুস্থ হইয়া না পড়ি।

২২শে সেপ্টেম্বর—আজ তিন দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে। বেলা ১১টার সময় বেরিলি ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। এখানকার ভোজনাগারে আহার্য্য কিছু প্রস্তুত ছিল না—কারণ এই পেসেঞ্জার ট্রেণে সাহেবগণ বড় আসেন না। এখন আমরা এখানে কিছু খাইতে না পাইলে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হইবে, পথে আর কোথাও আহার্য্য পাইবার আশা নাই। কাজেই রিফ্রেশমেণ্ট রুমের অধ্যক্ষ গাঙ্গুলী মহাশয় আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শীঘ্র কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শেষে গাড়ী ৮।১০ মিনিট আমাদের জন্য দাঁড় করাইয়াও রাখিয়াছিলেন। এখানে প্রথমে যখন আমরা গাড়ী হইতে নামি, তখন দুইটি মেমসাহেব প্লাটফরমে বেড়াইতেছিলেন। আমাদের সৈনিক বেশ ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখিয়া তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা কোথায় কিরূপে আহত হইলাম। এই কৌতূহলাক্রান্তা স্ত্রীলোকদের সবিশেষ বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। ওদিকে বৃষ্টির দিনে গরম চা জুড়াইয়া যায়। স্ত্রী-হৃদয় যে বীরের ভক্ত, ও এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে স্ত্রীজাতি (যাহারা সকল বিষয়ের সন্ধান রাখে) পীড়িত সৈনিকদের জন্য যে কতদূর অনুভব করে এবং বিলাসিনী শ্বেতাঙ্গ রমণী হইলেও তাহাদের হৃদয়েও কোন নিভৃত-কন্দরে যে মাতৃ-স্নেহ ও সন্তান-বাৎসল্য সুপ্ত থাকে, তাহা এই স্ত্রীলোকদের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ পৌছিলাম। আমাদের জন্য জনৈক প্রবাসী যুবক বন্ধু ও R. T. O. ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের লোকজনসহ গাড়ীখানি খুলিয়া রাখিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। প্রথমে দিলকুসা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সকলের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া, ১৫ খানা মাল গাড়ীতে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব তাঁহার সাথের লোকদের জিনিষাদি রওনা করিয়া দিলে রাত্রে ১০টার সময় তাঁহাকে সিভিল ও মিলিটারী হোটেলে রাখিয়া আমরা মকবুলগঞ্জে বন্ধু সুশীলচন্দ্রের বাড়ীতে আশ্রয় পাইলাম।

২৩শে সেপ্টেম্বর—পূর্ব্বাহ্নে ক্রমাগত বৃষ্টি হইল। বেলা ৩টার সময় একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া সমস্ত সহর ঘুরিয়া নবাব ওয়াজেদ আলি সাহের প্রমোদ উদ্যান কৈশরবাগের মধ্য দিয়া বেলিগার্ড বাগানে বেড়াইতে গেলাম। মহামহিমান্বিত অযোধ্যার নবাবের বেগম মহলে এখন ক্লাব স্কুল ইত্যাদি হইয়াছে। কোন কোন অংশ বহুবার হস্তান্তরিত হইয়া কাহারও আবাস-ভবন, কাহারও বা দোকান ঘর হইয়াছে! এ ত সেদিনের কথা। কলিকাতায় এখন অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহারা ওয়াজেদ আলি সাহকে বন্দী অবস্থায় মেটিয়াবুরুজে বাস করিতে দেখিয়াছেন। কালের কি বিচিত্র গতি। বেলিগার্ড সিপাহী যুদ্ধের একটী

স্মৃতিচিহ্ন। বাগানের সম্মুখেই বিজ্ঞাপন দেওয়া দেখিলাম যে কমিশনার সাহেবের হুকুম ব্যতীত সৈনিক-বেশধারী ভিন্ন অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। শেষোক্তিতে আমাদের কিছু ভরসা হওয়ায় অগ্রসর হইলাম। প্রথমেই একজন অশীতিপর বৃদ্ধ সৈনিক (Mutiny veteran) বসিয়া আছেন। আমাদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি অভিবাদন করিলেন। তাঁহার নিকট জানাইলে সমস্ত স্থান দেখাইবার প্রদর্শক পাওয়া যায়। প্রথমে বাগানের চারিদিকে দেখিয়া রেসিডেন্সীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। ভিতরে ঢুকিতেই একটি ঘরে সমস্ত স্থানটীর একটি ছোট মডেল টেবিলের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় রেসিডেন্সীর (Residency) পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কেমন ছিল, বিদ্রোহী সৈন্য কোন দিক হইতে আক্রমণ ক'রে, লরেন্স সাহেব কি করিয়া মাটীর নীচের (তয়খানায়) ঘরে কিছুদিন আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝা যায়। পরে রেসিডেন্সীর উপরের ঘর এবং নীচের ঘর (তয়খানা—ভূগর্ভস্থ ছোট ঘর) দেখিলাম। এইখানে বহুদিন অনাহারে থাকিয়া লরেন্স সাহেব শেষে গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘরের ছাদ নাই, শত সহস্র ছোট বড় ছিদ্রবিশিষ্ট চারি পাশের দেওয়াল দেখিলাম। ইহাকে কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করার জন্য মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিচিহ্ন দণ্ডায়মান রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসায় "মচ্ছিভবন" দেখা হইল না। ইহাই এখনও অযোধ্যার নবাবগণের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির শেষ নিদর্শন বহন করিতেছে। বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ সহরে ইহাই একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান শুনিলাম।

যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার মধ্যে বলরামপুরের মহারাজাই প্রধান তালুকদার। তাঁহার রাজধানী দেখার ইচ্ছা ছিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়া লক্ষ্ণৌ সহর মধ্যে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম। ইহার সরু রেল পথ (metre gauge) দেখিয়া বলরামপুর দেখার আগ্রহ হইল। শ্রীমান্ অসিতনাথকে লক্ষ্ণৌতেই রাখিয়া একাকী রাত্র ৯৷৹ টার গাড়ীতে রওনা হইয়া পড়িলাম। মধ্যে গোঁডায় (Gonda) গাড়ী বদলাইয়া ভোরে বলরামপুর পৌছিলাম।

২৪শে সেপ্টেম্বর—প্রায় ২ মাইল দূরে সহর, সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করা গেল।

১৩৭৪ সালে সম্রাট্ ফেরোজসাহ তোগলকের রাজত্ব সময়ে দস্যুদমন করার জন্য মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ বরিয়ার সাহ এদেশে প্রেরিত হইয়া এখানে বাস আরম্ভ করেন। তাঁহা হইতে অষ্টম পুরুষ বলরাম দাস সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বলরামপুর সহর স্থাপন করেন। ১৭৭৭ খৃঃ অঃ নেওয়াল সিং অযোধ্যার নবাব সাদাৎ খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রথম স্বাধীনভাবে রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং নবাব ও পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তবর্গের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহারাজ দিগ্বিজয় সিং ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ১৮ বর্ষের বয়সে রাজত্ব লাভ করেন। তিনিও পিতামহের ন্যায় শালপ্রাংশু মহাভুজ বীরপুরুষ ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্দ্দিনে দিগ্বিজয় সিং বরাবর ইংরাজ রাজের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারীকে তাঁহার কেল্লামধ্যে আশ্রয় দিয়া পরে নিরাপদে গোরক্ষপুরে পাঠাইয়া দেন। নিজের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহীরা অনেক উৎপাত করিলেও দিগ্বিজয় সিং সসৈন্যে বরাবর ইংরাজদের সাথে থাকিয়া বিদ্রোহীদিগকে নেপালে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সরকার বাহাদুর এজন্য দিগ্বিজয় সিংকে কে, সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। এখন তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজা শ্রীভগবতী প্রসাদ সিং কে, সি, আই, ই কর্পূরতলা মহারাজার নীচেই এ প্রদেশে প্রধান সামন্ত।

এখানে ম্যাজিষ্টেট্, ট্রেজারি অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আছেন। সহরটী ছোট হইলেও বিস্তৃত এবং পরিষ্কার। মহারাজার ৫০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে। এই যুদ্ধের সময় তাহারা অন্যত্র গিয়াছে। এখানকার স্কুল ও নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় অতি সুন্দর। স্ত্রী শিক্ষা এদিকে আদৌ প্রচলিত ছিল না; কিছুদিন হইতে শ্রীযুত মণিমোহন বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে মহারাজা হইতে অন্যান্য বহু লোকের সাহায্যে হিন্দুমুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী একজন ইংরাজ মহিলা, কিন্তু আলাপে বুঝিলাম তিনি সহৃদয়া এবং আমাদের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা

করিতে কৃতযত্ন। রাজবাড়ী অবশ্য রাজোচিত; কিন্তু এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বাঙ্গালী স্থপতির কীর্ত্তিচিহ্ন সুদৃশ্য শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী মন্দির (ইহা প্রকৃতপক্ষে একটী স্মৃতিমন্দির (Memorial) এবং তাহার মধ্যে স্বর্গীয় মহারাজা দিগ্বিজয় সিংএর যোদ্ধৃবেশে এক প্রকাণ্ড ধাতুমূর্ত্তি। এই মন্দির ও মূর্ত্তি প্রজাসাধারণের স্বেচ্ছাদানে নির্ম্মিত। এখন এই মূর্ত্তি প্রতিদিন পুষ্পচন্দনে পূজিত হয়। বৈকালে সহর ভ্রমণ করিলে মহারাজার স্মৃতিমন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে উক্ত মন্দিরের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য-গৌরব এবং আপামর সাধারণ প্রজাবর্গের সে পথে চলিতে, স্বর্গীয় মহারাজের প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য প্রদানের রীতি দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। সেখানকার লোক এই মন্দিরকে তীর্থস্থানের ন্যায়ই ভক্তি করে। আমরা সন্ধ্যায় রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে লক্ষ্ণৌ ফিরিলাম।

২৫শে সেপ্টেম্বর—ষ্টেশন হইতেই এ প্রদেশের বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভাদোর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুক্ষণ সহর ঘুরিয়া লেফটেনাণ্ট ঘোষের হোটেলে গেলাম, আমাদের একত্র কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার কাজের জন্য কয়দিন দেরী হইবে জানিয়া আমরা বেলা ৯৷৷০টার গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিলাম। এই রেলপথে পদাতিক সৈন্যের একজন সুবাদার আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি ছুটীতে বাড়ী গিয়াছিলেন, হঠাৎ আজ টেলিগ্রাম পাইয়া কাশী ক্যাণ্টনমেণ্টে যাইতেছেন। সেখান হইতে সৈন্য সমভিব্যাহারে ২।১ দিন মধ্যেই এডেন যাওয়ার হুকুম পাইয়াছেন। ইনি ইংরাজি ভাষা জানেন না বটে, তবে বেশ সদানন্দ লোক। বেলা ২৷৷০টার সময় কাশী ষ্টেশনে বন্ধুবর যতীশচন্দ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানেও R. T. O. মহাশয়কে দু'কথায় বিদায় করিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম। ভরা গঙ্গার উপরেই নারদঘাটে বন্ধুবরের বাড়ীতে বিশ্রাম লাভ করিয়া সুখী হওয়া গেল। প্রথম বয়সেই প্রকৃত বন্ধুতা জন্মে। শেষ জীবনে বাল্যবন্ধুদের মিলন কি প্রীতিকর, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। পূর্ব্বে আমরা এখানে আসিয়া হিন্দুর তীর্থশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। শ্রীমান্ অসিতনাথকে দেখাইতে এবারেও অভাজনের কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া গেল।

আমাদের সাথে অন্যান্য লোকজন থাকায় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চলিতে হইতেছিল। কিন্তু যতই বঙ্গদেশের নিকট হইতেছিলাম, ততই 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর কলিকাতায় পৌঁছিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল।

২৭শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নের পরে কাশী হইতে রওনা হইয়া পথে ধানবাদে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ২৯শে বেলা ১০টার সময় হাবড়া ষ্টেশনে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম।

সুবাদার মেজর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

দুটীদিক।

অগাধ সলিল ভিতরে রোহিত একবার না নড়ে কভু।
গণ্ডুষ জলে সফরী সকল 'ছট্‌ফট্' করে তবু।

অতি বিদ্বান্ সাধু মহাশয় মার্জ্জিত ভাষা তার
'চ্যাংড়া' বাবুর বদনে 'খিচুড়ী' লেগে আছে অনিবার।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

গোঁড়ার বিপত্তি।

১

দার্জ্জিলিং যাইতেছিলাম ; সঙ্গে আমার সবে ধন নীলমণি শ্রীমান্ পচা। নামেই প্রকাশ বাবাজীবনের স্বাস্থ্যখানি কেমন। শৈশবে তাহার জীবনের আশা ছিল না ; মধ্যে কয়েকটা বৎসর কাটিয়াছিল ভাল ; আবার এক বৎসর হইল, ম্যালেরিয়া তাহাকে বড় কাহিল করিয়াছিল। এক ফাইল কুইনাইন উদরস্থ করিয়া জর গেলেও তাহার জের গিয়াছিল না। শ্রীমান্‌কে লইয়া তাই হাওয়া পরিবর্ত্তনে পাহাড়ে চলিয়াছিলাম।

মিক্সড্ ট্রেণে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়াছিলাম। শিলিগুড়িতে ই, বি, রেলের শেষ, দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলের আরম্ভ। এখানে গাড়ী বদলের স্থান। পাহাড়ে উঠিবার ছোট গাড়ী প্ল্যাটফর্মের পাশেই সজ্জিত ছিল। ছোট্ট ট্রেণ, মোটে ৮।৯ খানি গাড়ী। সর্ব্ব শেষ গাড়ীখানিতে ডাক ও গার্ডের স্থান সংকুলান করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য একটা ক্ষুদ্র কামরা,—তাহাতে সামনা সামনি করা মাত্র দুইখানি বেঞ্চ। নিরিবিলি যাইতে পারিব ভাবিয়া তাহাতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম।

শ্রীমানের প্রশ্নের অবধি ছিল না। এটা কি, ওটা কি, গাড়ী ছাড়িতে আর কত দেরী, ইত্যাদি। সবজান্তা পিতৃপদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদিগের ন্যায় প্রশ্নপত্রের দৈর্ঘ্যের দিকে খরদৃষ্টি থাকিলেও ধীরভাবে উত্তর শুনিবার আগ্রহ আদৌ ছিল না।

আমার খেয়াল হইবার পূর্ব্বেই খোকা জানাইয়াছিল, "বাবা, ডাক-গাড়ী এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড়, ছুটাছুটি—দেখিতে দেখিতে ট্রেণখানি পূর্ণ হইয়া গেল। 'প্রত্যেক বেঞ্চে চারিজন বসিবেক' স্থলে ছয়জন বসিয়াও পরিত্রাণ নাই। আমরা তখনও সংখ্যায় তিনজন থাকিলেও [illegible] হইয়াছিল তাহার দেড়গুণ। এক বিপুলকায় পাঞ্জাবী [illegible] পাগড় চাপা দিয়া [illegible] ; [illegible] বাবা [illegible] [illegible]

গাড়ী ছাড়ে, একটি ১৩।১৪ বৎসরের বালক, পশ্চাতে তাহার জনৈক মহিলা, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কামরার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ভাই রে দিদি, জায়গা যে কোথাও নেই—উপায় !"

মহিলাটি তাঁহার [illegible] করুণ দৃষ্টি একবার আমাদের কক্ষাভ্যন্তরে প্রেরণ করিলেন। [illegible] সুন্দর ! তাহাকে কি সতেজ, স্বাবলম্বনের ভাব ! আমি মুগ্ধ হইলাম পাঞ্জাবী প্রবরও বোধ হয়, অদ্রবীভূত ছিলেন না, কেন না, আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আসুন বাবু সাহেব, এই গাড়ীতেই উঠে পড়ুন ; আমি রেলের লোক, গার্ডের গাড়ীতে যেতে পারব,—শিগ্‌গির উঠে পড়ুন, গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই।"

পাঞ্জাবী নামিয়া গেল। রমণী তাহাকে ঈষৎ হাস্য সহযোগে যুক্তপাণি উত্তোলন করিয়া ক্ষুদ্র একটি 'নমস্কার' করিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চরম হইয়া গেল। পাঞ্জাবীর প্রতি আমার হিংসা হইতেছিল, নিজের স্বভাবকে ও ধিক্কার দিতেছিলাম। কোন অপরিচিতা মহিলার সম্মুখীন হইতে আমার কেমন বাধবাধ ঠেকিত। মহিলাটির মুখের ভাবে কিন্তু তেমন কিছু প্রকাশ পাইতেছিল না, তাঁহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে পাইলে, বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে প্রথামত লজ্জিতা হইতেই হইবে বা সে অবস্থায় পুরুষেরা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবিতে পারে—সে চিন্তা তাঁহার অজ্ঞাত। অত নিকটে দাঁড়াইয়া বঙ্গ মহিলার সে ভাবটা লক্ষ্য করিয়াছিলাম সেই প্রথম। পাতা-ঢাকা ফুলের সৌন্দর্য্য-গরিমা এতদিন জোর গলায় গাহিয়া আসিলেও, মহিলার সেই সরল স্বাধীন স্বাভাবিক আত্ম নির্ভরতাকে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া পারি নাই। ওটাকে অত মিষ্ট লাগিবার পক্ষে আর একটু কারণ ছিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে অসহায়া গৃহিণী মহাশয়ার মনোমত রক্ষক নিযুক্ত করিতে আমাকে যথেষ্ট বিব্রত, ত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। শর্ম্মার অভিভাবকত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও হেপাজতে মাত্র কয়টা দিন কাটাইবার সাহস তাঁহার যোটেই হইতেছিল না। অনেক [illegible]

কহিয়া, অতি কষ্টে আমাকে পলায়নের পথ পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল।

মহিলাকে দেখিয়া অনেক কথা আমার মনে জাগিল, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন মনে উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার সঙ্গী বালককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহসে কুলায় নাই।

গাড়ী চলিতেছিল। ক্রমেই চড়াই। দুইপার্শ্বে নিবিড় বন, বড় বড় গাছ। সম্মুখে সুনীল গগনপটে পর্ব্বত-মালার অস্পষ্ট আভাস। শৈলরাজ্যের নয়নাভিরাম নীলাভ শ্যামল-সৌন্দর্য্য-লেখা, বায়ুভরে কম্পমান গাঢ় ধূম্রবর্ণ মেঘ-মালার কমনীয় কান্তি,—আমার ন্যায় অকবির অন্তরেও এক অব্যক্ত আনন্দরাজ্যের আভাস দিয়া মুগ্ধনয়নকে পলকহীন করিয়াছিল। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেই আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। শৈল-সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিলাম,—আমি দাঁড়াইয়াই আছি। বালকটি আমাকে বলিল, "আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কতক্ষণ,—অনেক জায়গা আছে।"

চোখ ফিরাইয়া দেখি, আমার বসিবার সুবন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। পচা মহিলাটির ক্রোড়ের নিকটে, বালকটি তাহার পার্শ্বে সরিয়া বসিয়া আমার জন্য বেঞ্চের প্রায় তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বসিবার অনুরোধও বন্দোবস্ত কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না; কেমন সুন্দর গোছাল মেয়ে! তাঁহার প্রশংসা মুখে আসিলেও কিছু বলিতে পারিলাম না। পুরুষ হইয়া মেয়েকে লজ্জা, নিজের ভাবটা স্মরণ হইয়া নিজেরই একটু হাসি পাইল।

বেলা দ্বিপ্রহরে কার্শঙ্গ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। কিছু আহারীয় সংগ্রহের চেষ্টায় নামিয়া পড়িলাম। কয়েকটা ফল খান কয়েক বিস্কুট প্রভৃতি আনিয়া গাড়ীর অপর পার্শ্ব হইতে বলিলাম, "পচা, তোর কি খিদে পায় নি? কিছু খা, এই নে।" হাত বাড়াইলাম।

খোকা তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়াই উত্তর করিল, "কখন খেয়েছি, এতক্ষণ বুঝি না খেয়ে আছি! বড্ড খিদে পেয়েছিল। ঐ যে যখন গাড়ী থামল, এঞ্জিন বদল হ'ল, মাসীমা যে তখন খাবার দিলেন!"

মনে মনে বলিলাম; "বেটা বলে কি,—'মাসীমা'—এমন মধুর সম্পর্কটা ওকে কে পাতাতে শেখালে!" হাসিও পাইল; মনের ভাবটা মুখে চাপিতে না পারিয়া একটু হাসিয়াও ফেলিলাম যেন। নিজে নিজে অপ্রতিভ হইয়া অন্যের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে কিনা ধরিবার জন্য চকিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। সেখানেও যেন একটু লজ্জার কালিমা মাখান; প্রথমে ত সেটা চোখে পড়ে নাই!

তিনি এবারে স্পষ্ট অথচ মৃদু মধুর রহস্যের স্বরে বলিলেন, "খোকার বোধহয় তা'তে জাত যায় নি। খাবারগুলো ছিল কুলীন বামুনের তৈরী!"

সম্বন্ধ যে পাকিয়া উঠিল। অপরিচিতার বাক্যে তুষ্টও হইলাম, রুষ্টও হইলাম। মেয়েদের অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এ আবার কোন দেশী রুচিপ্রদ রহস্য! মুখে "না—না, খেয়েছে তাতে কি হয়েছে" বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে স্বস্থানে আশ্রয় লইলাম।

তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া খোকার সঙ্গে আবার গল্পে মন দিয়াছিলেন। শুনিলাম, ছোট্ট করিয়া বলা হইতেছে, "কি খোকা, তোমার নাম ত অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় নয়,—তোমার নাম 'পচা'। তোমার বাবাই ত তাই বল্‌লেন।"

খোকা ঘাড় বাঁকাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ইস্! বাবা বল্লেন বলেই হলো। দেখ্‌বেন ত আমার বইয়ে কি নাম লেখা আছে। ছেলে বেলায় আমার প্রায়ই অসুখ হতো কিনা, বাবা তাই 'পচা' বলেন।"

"ভাল, তোমার মা তোমায় কি বলে ডাকেন?"

খোকা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "তা' শুনে আপনার কাজ কি? তাঁর যা খুসী বলুন না কেন,—আপনি যদি আমায় ও নাম বলেন, আমি কখ্‌খনো উত্তর দেব না!"

তিনি হাসি হাসি মুখে বল্লেন, "না—না আমি কেন তা বল্‌তে যাব, তোমার নাম শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, তাই বল্‌বো। এখন খুসী হলে ত পচা?"

"ঐ ত আবার বল্লেন।"

"ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে,—অনিলকুমার!" উভয়ের মুখেই হাসি দেখা দিল।

দার্জ্জিলিংএ গাড়ী পৌছিল। অন্যবারে সে সময় মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত; এবারে প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে-ছিল যেন,—এত সত্বর আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে! তাঁহারা নামিলে পর গাড়ী হইতে নামিলাম। তিনি সঙ্গী বালকটিকে

বলিলেন "সুরেন, ব্রেকের মালগুলো দেখে নি গে যা,—ব্রেক টিকেট ঠিক আছে ত?"

'আছে' বলিয়া সুরেন চলিয়া গেল। খোকার হাত ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি বলিলাম, "পরা, এসো—বাসায় যাই।"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য মুক্তপাণি তুলিয়া নীরবে নমস্কার জানাইলেন। থতমত খাইয়া প্রতিনমস্কার করিলাম। সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি বক্র হইয়া খোকার মুখ চুম্বন করিলেন। তাঁহার চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন, "বাবা অনিলকুমার, তোর এ মাসীর কথা মনে থাকবে ত?" "খুব থাকবে,—কেন থাকবে না মাসী মা। সুরেন মামা বলেছেন, আমাকে নিয়ে নিয়ে আসবেন,—সেটা এর মধ্যেই ভুলে গেছেন বুঝি? আমরা থাকি সেনটবমে।"

তিনি হাসিলেন। আবার হস্ত সাহায্যে খোকার মুখ-চুম্বন করিলেন।

সেবার আসিয়া আমরা ছিলাম সুবিলী স্যানিট্যারিয়মে, এবার দেখি। অন্যত্র। বুঝিলাম, খোকা তাঁহাকে ভুল ঠিকানা দিতেছে,—সংশোধন করিলাম না। বলিয়াছি ত আমি মুখচোরা।

(২)

এক এক করিয়া কয়টা দিন কাটিয়া গেল। দার্জিলিংএর হাওয়া এত সত্বর কি ছেলেদের স্বাস্থ্য শুধরাইয়া দেয়! সেই কয়দিনেই খোকার শরীরে স্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল। স্ফূর্ত্তি তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা কষ্ট সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই—তাহার মাসীর সঙ্গে আজও দেখা হইল না। আমিও সেজন্য যে একটু বিমনা হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। কারণ খোকার, সম্ভবতঃ তাঁহারও, মন-কষ্টের কারণ হইয়াছি আমি। যথা সময়ে ঠিকানাটা সংশোধিত হইলে, কোনই গোল হইত না। আমি জানিতাম, তিনি খোকাকে তাঁহার ঠিকানা বলিয়া থাকেনও যদি, তাহার পক্ষে তাহা মনে রাখা অসম্ভব।

খোকাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। বাজার হইতে 'ম্যালের' দিক যাইব। 'ম্যাকেঞ্জি রোড' বাহিয়া উঠিতেছি,—বড় চড়াই। হাত ধরিলেও খোকার উঠিতে কষ্ট হইতেছে। ঘাড় নীচু করিয়া খোকার মুখ পানে চাহিয়া সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে করিতে উঠিতেছি। খোকা হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা ঐ যে সুরেন মামা!—দোরে দাঁড়িয়ে মাসীমা।"

চমকিয়া চাহিলাম। খোকা আমার হাত ছাড়াইয়া তাহার মাসীর নিকট গিয়াছে। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত, ভাবমগ্ন, মাতার ন্যায় সুন্দর। আমি কাছাকাছি হইতেই তিনি বলিলেন, "আসুন, এই আমাদের বাসা, আসুন। সে দিন চালাকি করতে গিয়ে কম ভুগিনি। ভুলো ছেলে সেদিন কি ঠিকানাই দিয়েছিল, সেখানে আপনার নামগন্ধও নেই। ভয় হচ্ছিল, আর বুঝি সহজে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন যা হ'ক।"

অবাক! কি উত্তর দিব?—কাহার বাড়ীতে যাইব আমি? সেদিন ত তাঁহাকে এমন মুখরা দেখি নাই। কেন এত আত্মীয়তা? বিষম সমস্যা।

তিনিও বোধহয় আমার মনোভাব কতক বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে একটুও দ্বিধা বোধ করিতে দেখিলাম না। হাসি মুখে তিনি খোকার হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল অনিলকুমার, উনি না আসুন, চল আমরাই যাই। মাসীর কথা মনে আছে কি মনি?"

নিমকহারাম ছেলে আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি নির্ব্বাক্,—তখনও দ্বারে দাঁড়াইয়া।

সুরেন্দ্র তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনাকে বাগচি মশায় ডাকছেন।"

মনে প্রশ্ন হইল,—'বাগচি মহাশয় কে? কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, আজ কালকার সভ্যতায় যদি অপরাধ হয়। সন্দেহ হইল, হয় ত তিনি এমন পরিচিত কেহ, যাঁহার এখানে অবস্থিতির সংবাদ আমার না জানা লজ্জার কথা।

নীরবে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, "কোথায় তিনি?" উত্তরের আবশ্যক হইল না,—সম্মুখেই আরাম চেয়ারে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় আমাদের প্রসন্ন! তাহার কি শরীর ছিল, কি হইয়া গিয়াছে,—হাড়ের ডালি! দৌড়িয়া গিয়া কঙ্কালসার হস্তখানি ধরিয়া বলিলাম, "তোর এমন অসুখ!"

প্রসন্নের রোগক্লিষ্ট রক্তহীন পাণ্ডুর বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; উৎসাহে তাহার জীর্ণশীর্ণ দেহযষ্টি ঊর্দ্ধ করিয়া

ক্ষীণবাহুতে আমাকে সে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। বলিল, "ভাল ভাই, এসেছিস্! আশা ছিল না, আশু তোদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। যেমন অসুখ হয়েছিল, তার তুলনায়, এখন যা' দেখ্‌ছিস্ এ কিছুই না। ১৫।১৬ দিন আগে পাহাড়ে উঠিবার সময় কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন করে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি দু'হাতে বুকটা চেপে বসে পড়্‌লাম। তারপর কি হয়েছিল জানিনে, —একটুও জ্ঞান ছিল না। হসপিটালে ছিলাম। এবা এলে বাসায় এসেছি। এখন আর কোন উপদ্রব নাই, কেবল দুর্ব্বলতা।"

এক সঙ্গে এত কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল যেন। আমি তাহার হস্ত হস্তে লইয়া বলিলাম, "কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে তোর,—থাম্ প্রসন্ন, একবারে অত কথা বলিস্‌নে। শরীরটা যা হয়েছে!"

সে তেম্‌নি ভাবে বলিল—"কষ্ট হচ্ছে? তুই কি ক'রে বুঝিবি আশু,—আজ আমার কি আনন্দ। কত ভাগ্যে না জানি, আজ তোর দেখা পেয়েছি। যাঁরা আমাকে ত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, আমি ত তাঁ'দের ভুল্‌তে পারি নি ভাই! এবারে মর্‌তে পড়ে, নিজের কাছেই যেটা গোপন ছিল, সেটা ধরা পড়ে গেছে। অসুখের মধ্যে কতবার তোর কথা মনে হয়েছে, দেখ্‌বার জন্যে প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ত। আজ পথ ভুলে এসে সে কথা কি বিশ্বাস কর্‌বি আশু?"

অভিমান-আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মনে আমার যাহাই থাক্, যাহাই হই না কেন আমি, বন্ধুর সে অবস্থা দেখিয়া, তাহার স্নেহের অনুযোগ শুনিয়া আমার প্রাণও কেমন করিয়া উঠিল। কেমন মনে হইতেছিল,—আমি তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের নিকট কত অপরাধী! সে আমার সমপাঠী, বাল্যবন্ধু, জীবনের প্রথম পঁচিশটা বৎসর সে আমার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী। তাহার স্নেহপ্রবণ উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইবার সুযোগ আমার যথেষ্ট ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি সে সুযোগ গ্রহণ করি নাই। বি এ পাশের পর তাহাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি। গ্রাজুয়েট হইয়া আমি, কলিকাতা বাসের জের টানিতে, যখন 'ল' ক্লাশে ভর্ত্তি হইলাম, তাহাকে তখন একটা হাই স্কুলের মাষ্টারী লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইয়াছিল। তাহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সে পিতৃমাতৃহীন, মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত। এফ, এ, পাশ হইবার পর হইতেই তিনি তাহার শিক্ষার জন্য যে টাকা দাদন করিয়াছিলেন, তাহা সুদে আসলে আদায় করিতে তাহাকে তাগিদ দিতেছিলেন। সুতরাং বি.এ. পাশের পর ছাত্র-জীবনের সুখভোগ করার উপায় তাহার আর ছিল না। মাষ্টারীর সঙ্গে সঙ্গে এম্ এ পড়ার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা হইতে সে বিদায় লইয়াছিল। ঘটনাটা অতি সাধারণ কিন্তু সে দিনের কথা আজও আমি ভুলিতে পারি নাই। প্রসন্নের প্রাণটা কি কোমল! বিদায়-বিষণ্ণ-আগত-অশ্রু হাস্য-আবরণে ঢাকিতে গিয়া সে যখন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, আমার নয়নও তখন অনার্দ্র ছিল না। প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র খুব ঘন ঘন চলিয়াছিল। ক্রমে, যেমন হয়, তাহাতে ভাটা পড়িল। ন' মাসে ছ' মাসে একখানা চিঠি,—শেষে পাঁচ বৎসর হইতে খবরাখবর একেবারে বন্ধ। কালে কস্মিনে যখন দেশে যাইতাম, প্রসন্নের মাতুলের নিকট তাহার গুণ অপেক্ষা দোষের কথাই দশগুণ শুনিতে পাইতাম। সে তাঁহাকে নিয়মিত খরচপত্র দেয় না,—যে দুই এক 'টেক্‌নি' দেয়, সেটা দিয়া নাম না কিনিলেই ভাল ছিল। এ বিষয়টা লইয়া আমি তাহার মাতুলের অনুরোধে, তাহাকে এক দীর্ঘ উপদেশপত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উত্তর পাইয়াছিলাম, দু' লাইন, অতি অস্পষ্ট।

"অনিয়মিত না হইলেও মাতুল মহাশয়কে ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য করিতে পারিতেছি না, তাহা সত্য—মূলে অভাব।" সে একা, এত অভাব কিসের? তাহার উত্তরে আমি সুখী হইতে পারিয়াছিলাম না। তারপর যখন বৎসরখানেক পরে শুনিলাম, সে বারেন্দ্র হইয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়াছে—তা'দের ব্রাহ্মের মত নাকি চালচলন; তখন সমস্তই স্পষ্ট হইয়া গেল! কি ভুল! পূর্ব্বে যেটাকে প্রসন্নের উদারতা মনে করিতাম, সেটা তাহার যথেচ্ছাচারিতা,—ছোঁড়াটা কিনা শেষে বিবাহের দায়ে জাতি খোয়াইল! মনের রাগে হতভাগাকে খুব এক চোট লইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। উত্তর আসিয়াছিল, সেই দু'লাইনে।—"তুইও আমাকে এ ভাবে দেখ্‌বি তাতো ভাব্‌তে পারিনি। তবু এইমাত্র জেনে রাখ্,—আমি এ বিয়েতে অন্যায় বলে কিছু ভাব্‌বার পাইনি,—সুখী হয়েছি।" ঘটনা যেমন

ঘটে ছিল, তাতে এ বিয়ে না করলেই অন্যায় হ'ত।"

নিলর্জ্জতা আর কাহাকে বলে? অন্যায়টা অন্যায় বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা।—অধঃপতনের একশেষ!

তাহার জন্য তাহার মাতুল বেচারীর 'নাস্তানাবুদ' 'হয়রান পারশানের' অবধি ছিল না। গ্রাম্য সামাজিক-দরবারে তাঁহাকে ভাগিনেয়ের দোষে একঘরে করা হইয়াছিল। অনেক সাধ্য সাধনা, অর্থদণ্ড ও মনস্তাপের পর, "প্রসন্নকে পরিত্যাগ করিলাম" প্রতিজ্ঞায় শেষে তিনি কূল পান। এই সকল কথা শুনিয়া আমার মন প্রসন্নের প্রতি একেবারে বিরূপ হইয়া গিয়াছিল। তারপর সেবারে কলিকাতা হ'তে বাড়ী যখন আসিলাম, গৃহিণীরও নিকট শুনিলাম, প্রসন্নের ব্রাহ্মিকা বধূ শ্রীমতী বিজনবালা, তাহার সহিত নিয়মিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন,—দেখিলাম, গিন্নীর মুখে আর তাহার প্রশংসা ধরে না। পত্র পড়িয়াও দেখিলাম, বিজনবালা দস্তুরমত সেয়ানা, লেফাফা দুরস্ত! এদের মধ্যে কত কালের পরিচয় যেন—কেমন একটা বন্ধুত্বের কথা! এমন মেয়ে না হলে কি প্রসন্ন অত সহজে ধরা পড়ে? ধন্য! গৃহিণীর উপর কড়া হুকুমজারি করিয়া দিলাম,—"স্পষ্ট বলছি —ও সব ব্রাহ্ম টাহ্মের খৃষ্টানী-প্রেমে পরকালের পথ পরিষ্কার করতে হবে না,—আর চিঠি লিখলে ভাল হবে না।'"

ব্রাহ্মণী-শর্ম্মা মুখে না হটিলেও মনে মনে সারটা ঠিক জানিতেন। সেই হইতে তাহাদের মধ্যে চিঠিপত্র বন্ধ হইল। বিষম চটিয়া আমিও প্রসন্নের সংবাদ লওয়া অনাবশ্যক মনে করিলাম। আর নিজের ওকালতীর পশার জমাইতেই হিম্‌শিম্—কার খবর কে রাখে? মধ্যে, একটা মক্কেল প্রসন্নের প্রশংসা করিয়া কত কি বলিতেছিল, প্রসন্ন নাকি প্রকৃত পরোপকারী, তার খুব দয়ার শরীর, তার বিবাহটার মূলেও নাকি ত্যাগ স্বীকার ছিল। বাল্য-বন্ধুর এই প্রশংসায় আমি অপ্রসন্ন না হইলেও, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। মক্কেলটা হয় ত কোন সূত্রে আমাদের বাল্যবন্ধুত্বের সংবাদ পাইয়াছে—সেইটা অবলম্বন করিয়া আমার মন ভিজাইয়া ফির পরিমাণ কমাইতে চায়—আমার এই ধারণা হইল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উকিল আমি পলা দূরে থাক্‌,

প্রসন্নকে যে আমি, তেমন ভাবে চিনি সেটাও তাহার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করি নাই।

আজ সেই বাল্যবন্ধুর বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া অতীতের আমার সেই সকল হৃদয়হীনতার কথা বার বার স্মরণে আসিতেছিল। নির্ম্মমভাবে সেই স্মৃতি মনকে পীড়া দিতেছিল। অনুতাপ হইতেছিল—বন্ধুত্বের অপমান করিয়াছি বলিয়া। জীবনের পথে সে যদি ভুলই করিয়াছিল, আমার কি উচিত ছিল না তাহাকে স্নেহ-সহানুভূতি সাহায্য ফিরাইয়া আনা? বন্ধুর উপদেশ ও সাহায্য তাহার জীবনে যে সময় অত্যাবশ্যকীয় ছিল, ঠিক সেই সময়ই আমি সরিয়া পড়িয়াছি!" খুব বন্ধু যা হোক্ আমি! মনে হইতেছিল তাহার নিকট অকপটে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করি। তাহার ন্যায্য অনুযোগ মাথা পাতিয়া না লইয়া আমার উপায় নাই। অনুতপ্তের স্বরেই বলিলাম, "ঠিক প্রসন্ন ঠিক—মিথ্যা বলিস্ নাই, আমি আজ পথ ভুলেই এসেছি। তা' না হয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের টানে আস্‌তাম যদি, অনেক আগেই দেখা হ'ত।" বন্ধুত্বের গৌরব হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার শক্তি আমার নাই। বিপদে বন্ধুত্বের পরীক্ষা—আমি সময় বুঝে সরে পড়েছিলাম,—তবে অন্যে আর আমাতে তফাৎ কি প্রসন্ন?"

সে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়াছিল। ঝটিতি তাহার ও আমার ব্যবধানের মধ্যের স্থানটুকুতে তাহার ক্ষীণ বাহু-অগ্র স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে এতটুকু!—ছেলেবেলার 'সেই গাধা ও তোতে তফাৎ কি'—গল্পটা মনে আছে ত?"

সে অবস্থাতেও আমার হাসি পাইল। গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "মিথ্যা কি? আমি কি মানুষ—সেই গা—।"

প্রসন্ন মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না—না—তুই গাধাও নস্—মানুষও নস্—গাধা হ'লে বোঝা শুদ্ধ পাহাড়ে আসিতিস্—মানুষ হ'লে গাধা হতে চাইতিস্ না। ঠিক তুই 'বারের বারো ভূতের সর্দ্দার।'

আমার মন তখনও পূর্ণ। বলিলাম, "ঠাট্টা নয় ভাই, আমি গাধাই, নৈলে এত কাছে থেকেও তোকে চিনতে পারি না?—এতটুকু বুদ্ধিও কি মানুষের মাথায় থাকতে নেই?"

প্রসন্ন পূর্ব্ববৎ বলিল, "সেই ব'লেই রক্ষা, তা' না হলে কি সিংহচর্ম্মে দেহাচ্ছাদন করিয়া—শ্রবণ কর আমার ভাষা—

[illegible]দের সামনে এমন অবাধ স্বাধীনভাবে সিংহরূপে বিচরণ ক[illegible] পিঠ [illegible]ইয় আহ[illegible] [illegible] সুখে[illegible] [illegible] [illegible] শুন[illegible] [illegible]ঘটারী বাড়ীতে চলে যান, ওসব সব শুনে বলবে কি—বুড়ো ছুটো খেপেছ,—সে নামটা আমার ত যথেষ্ট লাহিত হয়ে গেছে। তোর কপালের জোর ওরা খোকাকে নিয়ে ও ঘরে গেছেন।"

সহসা প্রসন্নের স্ত্রীর অস্তিত্ব মনে পড়ায় লজ্জা অনুভব করিলাম। সভ্যভব্যা মহিলা তিনি, আমার পাগলামী শুনিয়া থাকিলে না জানি কি মনে করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল—এত কম আপদ নয়—পরের স্ত্রী, তাহাকেও আবার ভয় করিয়া চলিতে হইবে? কথায় কথায় আদবকায়দা,—নব্যসভ্যতার নিয়ম কানুন! এত মানিয়া চলিতে হইলেই সংসারের সুখটা পুরা দস্তুর হয়! স্ত্রী নয়ত যেন আর এক মুনিব! আমরা আট পৌরে স্ত্রী লইয়াই অস্থির। আজকাল এঁদের আদর্শেই বোধ হয়—স্বাধীন মত চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে! ঘরে ঘরে এমন শিক্ষিতা হইলেই গরীব বাঙ্গালী ঘরকন্না ক'রে খেত!"

মনটা ক্রমেই অপ্রসন্ন, বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। ট্রেণে যে গুলিকে তাহার গুণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তিনি প্রসন্নের স্ত্রী জানিয়া সেগুলি কে তাঁহার দোষ হিন্দুর পরিবারের সুখ শান্তিনাশী বিবিয়ানা না ভাবিয়া পারিতেছিলাম না। ক্ষোভ করিয়া কত প্রকার যুক্তিতর্কে শিক্ষিতা মহিলার পারপাতা করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, সমস্তই বিফল! স্ত্রী স্বাধীনতায় যে বাধা দিতে চায়? এই যে বড় শত মেম হাটে-বাজারে দেই দেই করিয়া বেড়াইতেছে, কে তা'তে আপত্তি করে? তাই বলিয়াই কি বাঙ্গালীর স্ত্রী,—হরি হরি—মনে করিতেই লজ্জা হয়,—শ্বশুর ভাসুরের সাক্ষাতে স্বামীর হাত ধরিয়া বেড়াবে, স্বামীর বন্ধুর সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাক্যালাপ করিবে? এমন করিতেও মাথা হেঁট হয়! ছি!

কতক্ষণ চুপ করিয়া ছাই মাথামুণ্ড ভাবিতেছিলাম। প্রসন্নের স্বর কাণে গেল। বেচারী হয়ত ক্ষীণকণ্ঠে আরও কতবার ডাকিয়াছে। উত্তর করিলাম, "কি?"

"কি ভাব, একবারে যে তন্ময় হয়ে গেছিস্। বাড়ীর কথা মনে পড়েছে বুঝি?"

মনের ভাব চাপিয়া বলিলাম, "এটাই বা বাড়ীর কম কিসে? বন্ধুপত্নী এবাড়ি এরূপ'। তাঁর ভদ্রতার পরিচয় পেলেই গেয়েছি,—এখন ত........."

প্রসন্ন হাসিয়া বলিল, "ভদ্রতা পেলিনে কেবল আমার কাছে। না, ওটা তাঁকে সম্মুখে দেখে মহিলাস্তুতি!—সেটা শুভ লক্ষণ!"

পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, বন্ধুপত্নী টেবিলে এক পেয়ালা চা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি মুখ ফিরাইতেই তিনি বলিলেন, "চাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সুবুদ্ধির মত চট্‌পট্‌ পেয়ালাটা খালি করে ফেলুন—ঠাণ্ডাটা বে পড়েছে।"

প্রসন্নের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি ত এ বেলা চা পাচ্ছ না; ডাক্তার ছবেলা চা খেতে মানা করে গেছেন। এক পেয়ালা গরম দুধ, আর খান কয়েক ফুলকো লুচী এনে দিই কি বল?"

প্রসন্ন কহিল, "বলা কওয়া আর কি আছে? যা হুকুম তাতেই রাজি। ভুলে যাচ্ছ কেন, ডাক্তারগুলো পরের বেলায় যাই বলুন, নিজের বেলায় তাঁরা বেশ জানেন—চা-টাই ঠিক কলির অমৃত!—বিশেষতঃ এই শীতে—পাহাড়ে।"

"তা' হচ্ছে না" বলিয়া বন্ধুপত্নী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমার ভাগ্যে চায়ের সহিত পূর্ব্বেই বিস্কুট ও কটুকরা টোষ্ট করা রুটি মাখন পরিবেশিত হইয়াছিল। 'কলির অমৃতপানে আমার আপত্তি ছিল না, বরং ওটা আমার মৌতাতের মধ্যে,—লেমনেড, সোডাওয়াটারের মত যেখানে সেখানে চলে,—সেই কনকনে শীতে তাহার আবির্ভাব প্রার্থনাই করিতেছিলাম। কিন্তু ঐ বিস্কুট, আর পাঁওরুটি! বাবো আঁটা বিলাতী বিস্কুট খাই নাই শপথ করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু মুসলমানের তৈয়ারী রুটি এ পেটে কোনদিনই যায় নাই। মহা বিপদ। না খাইলেই বা প্রসন্নের স্ত্রী ভাবিবেন কি? এ সকল অহিন্দুর মধ্যে না আসিলেই ভাল ছিল!

প্রসন্ন আমার ভাবের সন্ধান বুঝিয়া বলিল, 'ও গুলো রেখে দিলি যে। না, এখনও তোর সেই গোঁড়ামী আছে? ঠিকই ত,—মাথায় যে দেখছি, তোর গরিপাটী একটা অতি সুক্ষ্ম টিকি!"

আমি একটু গর্ব্বের সহিতই বলিলাম, "হাঁ। ঠাকুর-দাদার দান ওটা,—ওর সম্মান রাখাই ঠিক। শুনে চমৎকার—আমি আমাদের ওখানকার ধর্ম্ম-সভার সম্পাদক!"

প্রসন্ন হাসিয়া কহিল, "তাতে আর চমৎকারের কি আছে,—ঠিকই হয়েছে সেটা! সভার চাঁদাটা ফাঁকি দেবার যাদের প্রবল ইচ্ছা, তারাই যে সম্পাদক হয়।—সে বিষয়টাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিস্—বিস্কুট ক'খানার সদ্ব্যবহার করতে আবার সে চিন্তাকে জাগিয়ে তুলে বেকুবী করছিস্ কেন?"

আমি প্রসন্নের সঙ্গে একটা তুমুল তর্ক-যুদ্ধের সূত্র করিতে যাইতেছি, এমন সময় বন্ধুপত্নী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কণ্ঠটা আমার কে চাপিয়া ধরিল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

প্রসন্ন তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, "ওগো, অতিথি-পরায়ণা! করেছ কি? বন্ধু যে তোমার গঙ্গা জল বিনে খান না।"

তিনি স্বামীর কথার সার উদ্ধার না করিতে পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি প্রসন্নকে বলিলাম,

"সকল তাতেই তোর ছেলেমানুষী প্রসন্ন! মিছে অত বকৃছিস্ কেন? খাওয়াতে কি আছেরে?"

"ভিন্ন অর্থে আমারও ত সেই মত।"

বন্ধু-পত্নী এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তাইত ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আশুবাবু, (অবাধে নামটা করে ফেল্লেন!) অত বুঝ্তে পারি নাই, মনে কিছু করবেন না। ফলমূল কিছু এনে দি। ছি! এত বড় ভুলটা করে ফেলেছি!"

স্বামীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমারও ত আগে ব'লে দিতে হয়!" স্বর ছোট করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কেবল অভ্রম করে খুসী হও!"

প্রসন্ন হাসিয়া বলিল, "ভুল বল্লে কে ওটা? ভুল—ওটা, আদবেই নয়, নিশ্চয়ই ওটা ওর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা!"

বন্ধুপত্নী একটু বিরক্তির স্বরেই ব'লিলেন "থাম গো থাম,—তোমাকে দিয়ে বা কোন কাজই হয়?"

"দু'দিক্ থেকেই দোষ আমাকে ওকে না দিয়ে আমাকে ওগুলো দিলে কোন গোলই ত হতো না!"

বন্ধুপত্নী মৃদু হাসিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রসন্নকে বলিলাম—"তবে আজ আসি ভাই, পচা কোথায়?"

"বলিস্ কি! এরই মধ্যে যাই যাই! বস্, যেতে দেবার আমি কে? আমার সম্পর্কে কি তুই আজ এসেছিস্? এসেছিস্ ত তোর রেলের বন্ধুটির খাতিরে!— "তা এখন বল দেখি, তোর বন্ধুপত্নীকে কেমন লাগ্‌লো!"

কি উত্তর দিব? বলিলাম, "Most charming, অতি মোলায়েম—সুন্দর! সে কথা আর আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্ কেন,...নিজে কি বুঝিস্‌নে?"

প্রসন্নের বদনে প্রকৃতই আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "তুই যদি সত্যিটা বলে থাকিস্ আশু, তবে কি আমি তোকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না?—এই 'চার্ম্মিং—অতি সুন্দর প্রাণীটিকে আমি জীবন-সঙ্গিনী ক'রে এমন কি অন্যায় করেছি, যাতে দেশসুদ্ধ লোক আমায় বিরুদ্ধে দাঁড়াল? —অপরাধটা কি এতই গুরুতর?"

আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিবার পথ না পাইয়া বলিতে বাধ্য হইলাম, "সমাজটাকে না মেনে উপায় কি? হিন্দুরা জাতটাকে মানে সব চাইতে,—সেই জাতটার পবিত্রতা যাতে—"

প্রসন্ন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "থাম, থাম্—পবিত্রতায় ভক্তি সবারই আছে। বলি, জাতটা গেল কিসে? জগৎ যেখানে নরনারীর ধর্ম্ম-মিলনকে বিবাহ বলে স্বীকার করে নিচ্ছে,—আমরা সেখানে সমাজের খাতিরে বাঙ্গালীতে ত দূরের কথা, ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলন পর্য্যন্ত বাদ দিয়েও রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলে খারিজ করছি!"

একটু ভয়ে ভয়ে, মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে যে শুনেছিলাম তোর শ্বশুর ব্রাহ্ম ছিলেন, সেটা কি সত্য নয়?"

প্রসন্ন কহিল, "সেটা আমার পক্ষে শপথ করে অস্বীকার করা শক্ত, কেননা তাঁকে দেখবার ভাগ্য আমার হয় নাই। অস্বীকার কর্‌বার আবশ্যকও দেখি না। তবে যতদূর শুনেছি, তাতে এখন যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা শাক্ত, বৈরাগী ইত্যাদি জাতের মত ব্রাহ্ম নামে আর একটি নূতন জাতের সৃষ্টি হয়েছে, তার তিনি কেহ ছিলেন না, সেটা নিশ্চিত। উদারপন্থী যে তিনি ছিলেন, তার আর ভুল নেই। আমার স্ত্রীই তাঁর সে মতের প্রমাণ। মেয়েকেও তিনি রীতি মত শিক্ষিতা করতে চেষ্টা করেছিলেন,—বাল্যে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতেও রাজি ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্ম হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ যে ছিলেন তাতে আর সন্দেহ কর্‌বার নাই। নতুবা কি—"

প্রসন্ন নীরব হইল। তাহার স্ত্রী আমার জন্য ফলমূল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখনি আবার ফিরিয়া গিয়া প্রসন্নের জন্য কয়েকখানি লুচি লইয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া প্রসন্ন আমাকে বলিল, "কিরে, গিন্নীর ভাজা দু'খানা লুচীতে তোর আপত্তি হবে কি?"

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলাম, "আর কেন,—এই যথেষ্ট হয়েছে! চা, আপেল, খেজুর, কেসুর,—এর উপরও আরো চাই!"

প্রসন্ন দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "চাই না চাই আমি খুব জানি, তোকে আজ আমি নতুন দেখ্‌ছি না। কেন যে চাই না তাও বুঝি! আচ্ছা, তোরা কি রাঢ়ীর রসুই খাস্ না,—বারেন্দ্রের হাতে কি চলে না? তবে কি উনি বারেন্দ্রকে বিবাহ করে রাঢ়ীসমাজে পতিত হয়েছেন?"

লজ্জায় আমার বদনমণ্ডলে রক্তপ্রবাহ অনুভব করিলাম। তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই কথা! শুনিয়া তিনি ভাবিতেছেন কি? গ্রাজুয়েট আমি, এতটা অনুদারতা আমার শোভা পায় না। আমার সে অবস্থাটা অসহ্য হইল। তাহার প্রতিবাদ কল্পেই যেন জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "অত অনুদার আমাকে ভাবিস্ না প্রসন্ন। অত অন্ধ গোঁড়া আমি নই। ওঁর হাতের লুচি কেন, ভাত খেতেও আমার কি আপত্তি হ'তে পারে!"

আমাকে এক দম উদারপন্থী দেখিয়াই বোধ হয় বন্ধুপত্নী আশান্বিতা হইয়া বলিলেন, "তা তো আপনাকে খেতেই হবে। এতদিন পরে আপনাদের দুজনে দেখা। এখানে ক'টা দিন এক সঙ্গে না কটালে মিলনের আনন্দ হ'ল কি আর? অনিলের কাছে শুনলাম যা—মেসে আপনাদের খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। আমরা এখানে থাকতে আপনি কষ্ট করবেন,—তা কিছুতেই হতে পারে না! আজ থেকেই আপনি এখানে আসুন। তাতে বোধহয় আপত্তি হবে না?"

উকিল মানুষ—মৌখিক উদারতা অনেক সময় অনেক দেখাইয়াছি কিন্তু নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা এমন কমই হইয়াছে। হ'ক, বহুকষ্টে অর্জ্জিত হিন্দু নামটা আমি কিছুতেই ডুবাইতে পারিব না। ও সুবাদে দু'চারিটা মক্কেলও যে না পাইয়াছি তা নয়। ধর্ম্ম অর্থ দুইটাকে নষ্ট করিয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে খাতির জমাইবে কোন মূর্খ।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ক'দিনই বা—ওখানে আমাদের আর কষ্ট কি? বেশ আছি। বাড়ীর কথা মনে পড়ে বুঝি পচার মন কেমন কেমন ক'রে,—আপনাকে পেয়ে সে অভাবটা ভুলেছে কিনা, তাই ওসব বলেছে। তা এখন আসা যাওয়া দু'বেলাই ত হবে।"

প্রসন্ন বলিল "সেই জন্যেই তোর আবও এখানে আসা, মেসে টেসে দরকার?" স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকাকে তুমি মেস্‌টেসে আর যেতে দিও না গো। নিজে ত—পতির পুণ্য সতীর পুণ্য—কলিসে খরচ বাড়ে'—এই নীতিসার মেনে পালিয়ে এসেছেন। ছেলেটাকেও কষ্ট দিতে পুরুষের আড্ডা হোটেলে রাখতে জেদ ধরেছেন।" আমাকে আবার বলিল, "যাই বলিস্ তোদের আর হোটেলে থাকা হচ্ছে না আশু,—এখনো ভদ্রভাবে বলছি।"

বন্ধুপত্নী কহিলেন, "উনি বলেন বলেই কি তোমায় ছেড়ে থাকবেন? তুমিই বা থাকতে দেবে কেন?—ওটা হ'ল একটা ভদ্রতা—"

প্রসন্ন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ভদ্রতা। ওর সঙ্গে এখন আমার ভদ্রতার সম্বন্ধই দাঁড়িয়েছে বটে। হ'তে পারে অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি—"

অভিমানে বন্ধুর স্বর কম্পিত। হাজার হ'ক বাল্যবন্ধু, আমারও প্রাণটার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল, চোকবান বুজিয়া তাহাদের সঙ্গেই অন্ন রাধের মানরক্ষা করি, ইহাদের একটা বামুনী বামুন থাকিলেও কোন মতে চলিত। আজকাল তেওয়াড়ী, পাহাড়ী মুচি যাহাই হ'ব না, তাসের সুতা গলায় ঝুলাইয়া উপস্থিত হইলেই অন্ন পরিচয়ের দরকার হয় না। ভাল হ'ক মন্দ হ'ক সমাজে যেটা চলিয়াছে তাহাতে তেমন দোষ আসে না। কিন্তু প্রসন্নের স্ত্রীর হাতে—দেশে যাহারা একঘরে তাহাদের হাতে খাইলে কি আর রক্ষা আছে? দেশে ফিরিয়া নাক কান বাঁচান দায় হইবে।"

জানাইলাম, "সেটা হতে পারে না। আমার আর আপত্তি ছিল কি? শুধু আনন্দের জন্যে নয়,—ছেলেটার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম, কিন্তু তা যে হবার উপায় নাই।"

প্রসন্ন সহসা মুখ গহ্বরে নিশ্বাস বায়ু সশব্দে টানিয়া লইল পরক্ষণেই উচ্চারণ করিল, "ও!"

ক্ষুদ্র সেই ও শব্দটির মধ্যে কি তীব্র বেদনা মুখরিত হইয়া উঠিল। সে আজ আমাকে লাভ করিয়া কতখানি বল, ভালবাসা, আমাতে নির্ভরযোগ্য উদারতা কল্পনা করিয়া পুষ্ট হইয়াছিল, আমার প্রতিকূল আচরণে তাহার আশাহত প্রসারিত প্রাণ কি গুরু আঘাত-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইল, তাহা ওই 'ও'তে উপলব্ধি করিয়া একবারে দমিয়া গেলাম। আমার নিজের অসারতা, বাক্যের ও ব্যবহারের অনৈক্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাকে বৃশ্চিক দংশন করিল। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "পচা কোথায়? তবে এখন আসি এস পচা।" অধিক কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। প্রসন্ন উদাসভাবে আমার মুখের উপর একটা বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া লইল। আমার ইচ্ছায় কোন প্রতিবাদ করিল না।

বন্ধুপত্নী পচাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, মুখে কিছু বলিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি আনত, যেন অশ্রুভয়াক্রান্ত। আমি বলিলাম, "এস পচা।"

"সে বলিল, এখন যাব না।"

বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার হস্তাকর্ষণ করিলাম। ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কেহ বাধা দিল না, কিছু বলিল না। পাহাড়ের রাস্তা দিয়া নীচে নামিতে নামিতে মনে হইল—এ কি অভিনয়! কি হইয়া গেল, নিজেই বুঝিলাম না।

(৩)

বাসায় ফিরিয়া দেখি স্মৃতিরত্ন মহাশয় আমার তক্তপোষে বসিয়া আছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অন্য দিনের ন্যায় আনন্দ পাইলাম না। মনটা নিতান্ত একা থাকিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "কতক্ষণ?"

স্মৃতিরত্ন একগাল হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আজ মহাশয়ের এত দেরী যে? এক প্রহরের বেশী আসিয়াছি। কোথায় গিয়াছিলেন বলুন ত।"

ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলি, "এক প্রহর বসিয়া থাকিতে কে বলিয়াছিল?" মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, কষ্ট করে, এমন একা বসে থেকে আমাকে লজ্জিত করছেন কেবল।"

"না—না—কষ্ট কিসে? আপনার দেখা না পেলে মনঃকষ্ট থাকত বটে, এখানে আপনি বিনে আর কথা বল্‌বার মত লোক কেই বা আছে?"

অন্য দিনের মিষ্ট কথা আজ তিক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। বলিলাম, "কেন, আমি এমন কি অঁহাবাদ,—আপনি কি আর সংসারে ভাল লোক পেলেন না—স্যানিটেরিয়াম ত এখন কত মহা মহা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে!"

পণ্ডিত মহাশয় মনে কি করিলেন জানিনা। মুখে হাসিয়াই বলিলেন, রাম! রাম! সে সকল কি লোক? তাঁরা ধনী হতে পারেন, বিদ্বান্ হতে পারেন, কিন্তু সব অনাহারী সাহেব!—তাঁদের চালচলন দেখে অবাক্। তাদের সঙ্গে কি আর আমাদের মত সেকেলে লোকের মত মেলে—না কথাবার্ত্তার সুখ হয়?"

"তবে আমিও বুঝি সেকেলে—সেটা সুখ্যাতি নয়, স্মৃতিরত্ন মশায়।"

তিনি ফাঁপরে পড়িলেন, বলিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! সেকেলে কেন? একেলে হলেও আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু—আমাদের গৌরবস্থল!"

গৌরবস্থল! হইয়াও সে গৌরবে আজ প্রাণে শান্তি ছিল না। পিত্তদুষ্ট রসযন্ত্রের ন্যায় সব সেই তিক্তে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সপক্ষ বা বিপক্ষের কিছুতেই স্বাদ পাইতেছিলাম না; কেবল বিরক্তিই উৎপন্ন করিতেছিল। বুঝিতেছিলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত আমার আচরণ ক্রমেই ভদ্রশিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। সেটা ভাবিয়াই বলিলাম, আজ বড় হাঁপিয়ে এসেছি—একটু বিশ্রাম না করে পারুছি না, কিছু মনে করবেন না।"

"বিলক্ষণ! কি মনে করব? বিশ্রাম করুন, বিশ্রাম করুন—আমি পচার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি! আজ বুঝি, জলাপাহাড়ের ওদিকে যাওয়া হয়েছিল! শরীর ভাল বোধ হচ্ছে ত?"

কি আপদ!

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পচা বলিয়া উঠিল, "আজ আমার মাসীমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম—স্মৃতিরত্ন মশাই!"

"মাসীমা! তিনি আবার কে?"

বালক বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু বুঝাইতে পারিল না এক বিন্দুও! আমার অসহ্য হইল,—তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "জ্যাঠা ছেলে চুপ কর—সকল তাতেই ফাজলেমি—না?"

জীবনে তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার সেই প্রথম! বালক একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। স্মৃতিরত্ন মহাশয়েরও সেই অবস্থা। তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আরও দুই একটা কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার অনুপস্থিতিটাও যেন ভাল লাগিল না। রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। পরদিন কতবার প্রসন্ন ও তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে হইয়াছিল—কি ভাবে চলিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত দিয়াছি! কিন্তু তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবার সাহস হইল না। কোন মুখে যাইব? তাহার উপর স্মৃতিরত্ন-ভীতি যে আমার না ছিল তাহা নহে। আমাকে তিনি মুখে 'সর্ব্বেসর্ব্বা' বলিলেও, আমি খুব জানি, সুযোগ পাইলে সে 'সর্ব্বেসর্ব্বাকে' সর্ব্ব নিয়ে নামাইতে কসুর করিবেন না।

দুই তিন দিন পরে একদিন সুরেন্দ্র আসিয়া পচাকে লইয়া গেল। আপত্তি করিলাম না, আনন্দই হইতেছিল। বন্ধু-দম্পতি তাহা হইলে আমাকে যাহাই ভাবুন, ছেলেটাকে স্নেহবঞ্চিত করেন নাই! সেই হইতে সুরেন্দ্র প্রতিদিনই তাহাকে লইয়া যাইত। সে সমস্ত দিনটা কাটাইয়া আসিত। আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। পচা নিজেই প্রসন্নদের কত কথা, কত খবর শুনাইয়া দিত। প্রসন্নের চেয়ে তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে জানিবার জন্য মনটা যেন বেশী আগ্রহান্বিত হইত।—পচার কথার মধ্যে বন্ধুপত্নীর যথেষ্ট স্নেহ নিদর্শন লুক্কাইত থাকিত—তাঁহার আচরণে আমার প্রাণে একটা আনন্দ আনিয়া দিত,—তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিতাম না!

স্মৃতিরত্নের নিকটে বিষয়টা সাবধানে গোপন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। গোপনে গোপনে সমস্ত তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পচাকে লইতে সুরেন্দ্র একদিন যখন উপস্থিত, স্মৃতিরত্ন আমার কক্ষে বসিয়া হিন্দুধর্ম্মের আচারব্যবহারের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। সুরেন গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি কথার মাঝখানে থামিয়া তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন। বলিলেন, "এই না প্রসন্নবাবুর শ্যালক? খোকাকে নিয়ে যেতে আসা হয়েছে বুঝি? কয়দিন থেকেই বলব বলব ভাবছি, মনে থাকে না—সে দিনে আমাদের নগেন বাবু—ঐ যে নূতন উকীলটি যিনি আমাদের সভার মাস কয়েক পূর্ব্বে সভ্য হইয়াছেন—তিনি এখানে এসেছিলেন কি না—কোত্থেকে শুনে জানিনে—বলছিলেন এই সব কথা? আমি উড়িয়ে দিতেও পেরে উঠলাম না!"

আমি আতঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন সব কথা!"

"না না প্রসন্ন বাবু দেশে একঘরে কি না—সেটা নিয়ে সবাই বলা কহা করে। আপনি সম্পাদক কিনা—আপনার উপর নজরটা বেশী—আমিও ভয়ে ভয়ে থাকি মশায়! আমরা সভার কর্ম্মকর্ত্তা—কর্ম্মকুক্তাও বটে।—লোকে নুনের থেকে চুণ খস্‌লেই—আমাদের কথা তোলপাড় করে।"

মিথ্যা নয়, দেশের লোকের কার্য্যই ঐ; দেশে ফিরিয়া পাছে একটা গোলমালে পড়িতে হয়, জুনিয়ার উকিল—কি বলিতে কি করিয়া বসিবে তাহার আর কি ঠিকঠাক আছে—ছেলেমানুষ বৈত নয়! বলিলাম "নগেনবাবু বলেন কি? আমি ত এমন কিছু করি নাই!"

স্মৃতি।—"দুর্গা, দুর্গা—আপনি আবার করবেন কি? তা কি আমি জানিনে—অন্যে বল্লেই বা বিশ্বাস করবে কেন—তবে কিনা জানেন দশের মুখ ঠেকিয়ে রাখা দায়—তারা বলেন—প্রসন্ন বাবুর কাছে আপনার ওঠা বসা—কেহ কেহ খাওয়া দাওয়ার কথাও বলতে ছাড়েন না—আমি জানি সব—কিন্তু প্রতিবাদ করতে জোর পাই কোথা—খোকা রোজ বাড়ী যাচ্ছে সেটা ত লোকে দেখে!"

মনে মনে বলিলাম ঠিকই ত! "খোকাকে বলিলাম পচা—তোর আর তোর মাসীর বাড়ী যাওয়া হবে না—লোকে নিন্দে করে—"

খোকা বলিয়া উঠিল, "নিন্দে করবে না বাবা—মাসীমাও তোমার নিন্দে করেন না, ভালই বলেন।

"বোকা ছেলে—তিনি নিন্দা করেন কে বলছে—অন্যে করে—সে কথায় তোর কাজ কি—তোর যাওয়া হবে না।"

খোকা যাইবার জন্য জিদ করিলেও ধমকাইয়া থামাইয়া দিলাম। সুরেন্দ্রের সম্মুখেই তাহাদের কথা—তাহার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না। আমার কার্য্য স্মৃতিরত্ন করিলেন; সুরেন্দ্রকে বলিলেন—"শুনলে ত সব—খোকার যাওয়া হয় কি করে—তোমরাই বল।"

সুরেন্দ্র বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল। আমার মনে হইতেছিল—তাহাকে ফিরাইয়া আনি—তাহা হইল না! স্মৃতিরত্ন প্রসন্নের ও তাহার স্ত্রীর অহিন্দু ব্যবহার—সাহেবী আচার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাধা দিলাম না। সম্পাদক, সভাপণ্ডিতের শাস্ত্রালোচনায় 'হুঁ' দিতে বাধ্য! হায় অনাহারীর সম্মান!

(৪)

পচা কিছুতেই তাহার মাসীকে ভুলিতে পারিল না। প্রথম প্রথম তাঁহার নিকট যাইবার জন্য বায়না ধরিত—শেষে কাঁদিত—মহা অশান্তি! সে যেন আবার শুকাইয়া চলিল। সর্ব্বদা বিমর্ষ!

আশ্চর্য্য! সুরেন্দ্রের আর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। এবারে নিশ্চয় বিষম চটিয়াছে। চটিবে না কেন—অভদ্রতা ও অত্যাচার, প্রাণের 'আঁতে' আঘাত তাঁহাদের কম দেওয়া হয় নাই।

ভাবিলাম—আর কেন, দেশে ফিরিয়া যাই—পচার শরীর ত সারিয়া গিয়াছে। এতদিন কাটাইয়া, যাই যাই করিয়া যে দুই একদিন তাহাই আর কাটাইতে পারিলাম না—একদিন প্রাতে প্রবলবেগে আমার জ্বর আসিল। গায়ে—অসহ্য বেদনা। চাঁদমারীতে সে সময় খুব বসন্ত হইতেছিল, গোয়ালাবেটা কোথা হইতে দুধ আনে কে জানে—ভয় হইল গায়ে বসন্ত না হয়! যে ভয় কার্য্যেও তাই, পরদিন প্রাতে দেখিলাম গায়ে গুটি দেখা দিয়াছে। সর্ব্বনাশ! ডাক্তার কবিরাজের অসাধ্য সংক্রামক ব্যাধি! বিদেশ! নিজের কি হইবে—খোকাকে কে দেখিবে—রাখিব কোথায়? এ অবস্থায় দেশে ফিরিবার উপায় নাই,—সঙ্গী কে হইবে—আইনের সামনে আসিবার আশঙ্কা আছে! নানা দুশ্চিন্তায় জীবন্মৃত হইলাম!

মেসের সকলে সে সংবাদে মহা আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্টই দাতব্য চিকিৎসালয়ে অচিরে আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন—'একের জন্য ত দশে মরিতে পারে না।' স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে ডাকাইলাম। তিনি ত তুল্য ব্যবস্থা করিলেন—পাহাড়ে ত তাঁহার আর বাড়ী ঘর নাই; স্যানিটরিয়মে আমাকে লওয়া অসম্ভব—আমার এখানে আসিলে তাঁহাকে পর্য্যন্ত নাকি তথা হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। হাঃ অদৃষ্ট! হাঁসপাতালে না যাইয়া আমার আর উপায় কি? কিন্তু পচা—সে এখন দাঁড়ায় কোথা? প্রসন্নের স্ত্রীর কথা মনে হইল। কিন্তু বন্ধু হইয়া যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে কি আবার তাঁহাদের দারস্থ হইবার পথ রাখিয়াছি! সত্যই মনে হইল গোঁড়ামীর দোষে সমস্ত হারাইলাম! রাত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—রজনীর অন্ধকারে মনের অন্ধকার মিশিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিল! উপায়! হাঁসপাতালেই বা যাই কি করিয়া!

প্রবল জ্বরে সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে দেখি—আমি প্রসন্নের বাসায়। প্রসন্নের স্ত্রী আমায় শুশ্রূষায় ব্যস্ত। আমার তৎকালের মনের ভাব বর্ণনা করিতে পারিব না। ঔষধে যত নয়—বন্ধুপত্নীর শুশ্রূষার গুণে আরোগ্যমুখী হইলাম। নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া যিনি আমার অক্লান্ত সেবায় আমাকে বিপদ মুক্ত করিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি, যতই পাষণ্ড হই না কেন আমি, আমার মনের কেমন হয়!

তখন প্রায় সারিয়া উঠিয়াছি—রোগশয্যা ত্যাগ করিবার শক্তি বোধ হয় আমার ফিরিয়া আসিয়াছিল, বন্ধুপত্নীর অত্যাচারে (?) তাহা হইতে বিরত! স্মৃতিরত্ন মহাশয় আমাকে ভুলেন নাই। সেই সময় একদিন তিনি দেখা করিতে আসিলেন। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া পথ্য ও ঔষধ তখনও চলিতেছিল। সেটা আহারের সময়—বন্ধুপত্নীর স্বহস্তে রাঁধা (অন্যের রাঁধা পথ্যে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না) অন্নে আমার জীর্ণ শীর্ণ অন্নময় দেহরক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজহস্তে করিতেছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া যেন অপ্রতিভ হইলেন,—সে সময়ে তাঁহার আসা যেন উচিত হয় নাই,—তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রেও আছে—আতুরে নিয়ম নাস্তি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"না না স্মৃতিরত্ন মহাশয়—এ যদি আতুর বলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করতে হয়—সে আতুরের আর উদ্ধার নাই—দেশময় আজ সেই আতুর।—বলুন এ অন্নদার অন্ন—সবল সুস্থ হইবার একমাত্র পথ্য—দেবীর দান!"

[illegible] ছোট্ট করিয়া বলিলেন—"অত জোরে কথা বল[illegible] দুর্ব্বল শরীর।"

স্মৃতিরত্ন তখন উঠিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম—"ঘোর কলি!"

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

[ষ্টেট্সম্যান হইতে সঙ্কলিত]

১৯১৪

২৮শে জুন—অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারির যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিণাণ্ড ও তাঁহার পত্নী বোস্‌নিয়ার অন্তর্গত "সেরাজেভো" নগরে দুইটি ছাত্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। সার্ভিয়ার গভর্ণমেণ্ট এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজক বলিয়া অষ্ট্রীয়া ঘোষণা করেন এবং ভিয়েনা নগরে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে থাকে।

২৩শে জুলাই—অষ্ট্রীয়াহাঙ্গারি জার্ম্মাণির সহযোগে সার্ভিয়ার গভর্ণমেণ্টকে জানান যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সার্ভিয়া অষ্ট্রীয়ার দাবী গ্রাহ্য করিয়া পত্র না দিলে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে।

২৮শে জুলাই—অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

২৯শে জুলাই—জার্ম্মাণি ইংলণ্ডের নিকট এই প্রস্তাব করে যে সত্বর সম্ভাবিত ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড যদি নিরপেক্ষ থাকে এবং জার্ম্মাণি যদি বিজয় লাভ করে তবে জার্ম্মাণিরা কেবলমাত্র ফরাসী উপনিবেশসমূহ অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে এবং ফরাসী দেশের কোনস্থান অধিকার করিবে না। জার্ম্মাণিরা আরও প্রার্থনা করে যে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া তাহাদের সৈন্যদল চলাচল করিলে ইংরাজেরা যেন আপত্তি না করে।

২৯শে জুলাই—বেলজিয়ামেরা এই প্রস্তাব—এডওয়ার্ড্ গ্রে 'অসম্মানকর লাভ' বলিয়া যাহার আখ্যা দিয়াছেন—অগ্রাহ্য করে। আস্‌কুইথ্ সাহেবও এই প্রস্তাব অপমান সূচক বলিয়া জানাইয়াছিলেন।

৩রা আগষ্ট—সার এডওয়ার্ড গ্রে ঘোষণা করেন যে জার্ম্মাণি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং বেলজিয়ামের রাজা ইংলণ্ডরাজ পঞ্চম জর্জ্জের নিকট এক বিশিষ্ট আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। জন্ রেড্‌মণ্ড্ আইরিস্ দিগের [illegible] প্রতি সহানুভূতি আছে বলিয়া জানান। কমন্স্ সভায় এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন হয়।

জার্ম্মাণি বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া স্বীয় সৈন্যদলের গমনাগমনের সাহায্য করিবার জন্য বেলজিয়ামকে ভয় দেখাইয়া পত্র প্রেরণ করে।

১৯১৪

৪ঠা আগষ্ট—ইংলণ্ডে সৈন্যদল সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হয়।

জার্ম্মাণি ইংলণ্ডের নিকট বেলজিয়াম নিরপেক্ষতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করায় রাত্রি ১১টার সময় ইংলণ্ডরাজ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণির সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

১১ই আগষ্ট—জার্ম্মাণির ক্রুইজার জাহাজ "গিবেন" এবং "ব্রেস্‌ল" ডার্ডানেল্ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৭ই আগষ্ট—কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে সেনাপতি সার জন্ ফ্রেঞ্চের অধীনে ইংরাজ সৈন্যদল নিরাপদে ফরাসী দেশে পদার্পণ করিয়াছে।

২৩শে আগষ্ট—জাপানের জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

২২শে হইতে ২৬শে আগষ্ট—মন্স্ হইতে পশ্চাদ্গমন। মন্স্ হইতে সার্লেরোয়ার ভিতর দিয়া নামুর পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া জার্ম্মাণ সৈন্য মিলিত সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। মন্সে ব্রিটিশ সৈন্যদল একেবারে বাম দিকে ছিল। ২৩শে রবিবার ব্রিটিশ সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া মিলিতশক্তির বামপার্শ্ব ভগ্ন করিবার জন্য ভীম উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুইটি ইংরাজ সৈন্যদল, ৪টি জার্ম্মাণ সৈন্যবিভাগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সমস্ত আক্রমণকারী শত্রুদলকে হঠাইয়া দিলে মিলিত শক্তিশ্রেণীর হঠিয়া যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই আক্রমণ কার্য্য অংশতঃ ২৪শে ও ২৫শে সম্পন্ন হয় এবং শত্রুসৈন্য ইংরাজ সৈন্যদলকে হঠাইয়া মবোগ দুর্গ পর্য্যন্ত নিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও ইংরেজ সৈন্যদলকে সেই রাত্রে ক্যাম্ব্রে, লি ক্যাটো ল্যাণ্ড-রেশিসের পশ্চাতে হঠাইতে পারে নাই। বুধবার ইংরাজসৈন্যদল জার্ম্মাণ সৈন্যের ৫টি বিভাগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত আত্মরক্ষা করে ও সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎপদ হইতে থাকে। ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যেও তাহারা যে কামানের অশ্বগুলি মরিয়া গিয়াছিল কিংবা যে কামানগুলি শত্রুর গোলায় চূর্ণীকৃত হইয়াছিল তাহা ছাড়া আর একটিও

১৯১৪

কামান ফেলিয়া যায় নাই। বৈকালে আক্রমণে জার্ম্মাণ সৈন্যদল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেলে ইংরাজসৈন্যদল সুশৃঙ্খল-ভাবে হঠিয়া গিয়া সোমনদী হইতে বেলজিয়াম সীমান্তস্থিত মেজিয়ার্ পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া শ্রেণী রচনা করে।

২৬শে আগষ্ট—জার্ম্মাণ উপনিবেশ টোগোল্যাণ্ড্ বিনা সর্ত্তে মিলিতশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে।

২৮শে আগষ্ট—জার্ম্মাণ সৈন্যদলের অবিশ্রাম নৃশংসতা জগদ্বিখ্যাত গির্জ্জা, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সহিত লুভেন নগরীর দাহন কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদিগকে বন্দী করা হয় অনেকগুলি বিখ্যাত লোক নিহত হয়েন এবং স্ত্রীলোকদিগকে রেলগাড়ীতে করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়।

ক্রুইজার রণপোতের হেলিগোল্যাণ্ডের নিকট যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কয়েকখানি ব্রিটিশ ক্রুইজার ও ডেস্ট্রয়ার জাহাজ কুয়াসার অন্তরালে থাকিয়া কয়েকখানি জার্ম্মাণ ক্রুইজার ও ডেস্ট্রয়ার জাহাজকে নোঙর কাটিয়া দলভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। মেনজ্, কোলন্ এবং আরিয়ার্ডনি নামীয় জার্ম্মাণ জাহাজত্রয় নিমজ্জিত ও আর কয়েকখানি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একখানিও ইংরাজ জাহাজ এই যুদ্ধে ডুবে নাই। নিহত ইংরাজসৈন্যের সংখ্যা ৬৯, জার্ম্মাণি নিহত ও ইংরাজ জাহাজ কর্ত্তৃক সমুদ্রগর্ভ হইতে রক্ষিত সৈন্যসংখ্যা মোট ১২০০।

২৯শে আগষ্ট—প্যাসিফিক্ সমুদ্রের সামোয়া নামীয় জার্ম্মাণ উপনিবেশের প্রধান নগরী এ্যাপিয়া নিউজিলাণ্ড্ হইতে প্রেরিত সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১লা সেপ্টেম্বর—সেণ্টপিটারস্বার্গ এখন হইতে পেট্রো-গ্র্যাড্ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্ব-প্রুষিয়ায় সোলডো অস্টারোডে সন্নিবিষ্ট রুষিয়ায় সৈন্যশ্রেণী বিপর্য্যস্ত হয়। সেনাপতি সামফেনফ্ নিহত হয়েন।

৯ই সেপ্টেম্বর—মারণে নদীতীরের যুদ্ধ। মিলিত শক্তির বামপার্শ্বে অবস্থিত ইংরাজসৈন্যদল জার্ম্মাণসৈন্যদলকে হঠাইয়া পুনরায় মারণে নদী পার হয়।

১৪ই নবেম্বর—লর্ড রবার্টস্ ফরাসীদেশে প্রাণত্যাগ করেন।

৮ই ডিসেম্বর—ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের নিকট জলযুদ্ধ। সহকারী নৌসেনাপতি ষ্টারডির দ্বারা পরিচালিত ও ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্, ইন্‌ফ্লেক্‌সিব্‌ল্, ক্যানোপাস্, কারণারভন্ কর্ণোয়াল, কেণ্ট্, ব্রিষ্টল্, এবং গ্লাসগোর দ্বারা সংগঠিত ইংরাজ নৌ-বহরের একটি বিভাগ সার্ণহার্ষ্ট, নিসেনো, লিপ্‌জিগ্, নুরণবার্গ্, এবং ড্রেসডেন জাহাজের দ্বারা সংগঠিত জার্ম্মাণ নৌবহরের একটি বিভাগকে আক্রমণ করে। ৫ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের ফলে ড্রেস্‌ডেন ব্যতীত আর সমস্ত জার্ম্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত হয়। একখানিও ইংরাজ জাহাজ ডুবে নাই।

১৭ই ডিসেম্বর—মিসরদেশ ইংরাজদিগের রক্ষাধীনে আসে।

১৮ই ডিসেম্বর—প্রিন্স হাসিন, ভূতপূর্ব্ব খেদিভ্ (মিসরের রাজা) অব্বাসের স্থলে সুলতান পদবী লইয়া অভিষিক্ত হন।

১৯১৫

২৪শে জানুয়ারী—ডগারব্যাঙ্কের যুদ্ধ। ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরসমূহ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাট্‌ল্ ক্রুইজার ডারফিন্‌গার, সিড্‌লিজ্ এবং মোণ্ট্‌কে, আরমারড্ ক্রুইজার ব্লুকার এবং ৬খানি ক্ষুদ্রতর ক্রুইজার জাহাজ ও কয়েকখানি ডেস্ট্রয়ার লইয়া গঠিত জার্ম্মাণ নৌবহরের একটী বিভাগ যাত্রা করে। ইংরাজদিগের ব্যাট্‌ল্ ক্রুইজার লায়ন, টাইগার, প্রিন্সেস্ রয়াল, নিউজিলাণ্ড এবং ইনডোমিটেব্‌ল্ আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্রতর ক্রুইজার জাহাজ ও ডেস্ট্রয়ারের সহযোগে জার্ম্মাণ নৌবহরের উক্ত বিভাগকে পথিমধ্যে বাধা প্রদান করে। শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এবং ইংরাজ জাহাজগুলি হেলি-গোল্যাণ্ডের ৭০ মাইল দূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। আর্মার্ড ক্রুইজার ব্লুকার নিমজ্জিত হয় এবং জার্ম্মাণির আর দুইখানি ব্যাট্‌ল্ ক্রুইজারও অত্যন্ত ক্ষতিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। দ্রুতগামী জাহাজ বলিয়া লায়ন এবং টাইগার এই দুইখানি ইংরাজ জাহাজই আক্রমণ কার্য্যে পারগ হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণ জাহাজ হইতে একটি যথেচ্ছনিক্ষিপ্ত গোলা দৈবাৎ আসিয়া লায়ন জাহাজের কল নষ্ট করিয়া না দিলে জয় আরও বেশী পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইত। একখানি ইংরাজ জাহাজও এই সংঘর্ষে নিমজ্জিত কিংবা যথেষ্ট ক্ষতিপ্রাপ্ত হয় নাই।

১৯১৫

৫ই ফেব্রুয়ারী—জার্ম্মাণী ইচ্ছা প্রকাশ করে যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে জার্ম্মাণ জাহাজ ইংরাজাধিকৃত সাগরে যে কোন শত্রুপক্ষীয় বাণিজ্যপোত ধ্বংস করিবে এবং তাহাতে নাবিক কিংবা আরোহীর প্রাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না। জার্ম্মাণী আরও জানায় যে নিরপেক্ষ জাতির জাহাজগুলিও উক্ত সাগরে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—ফরাসী ও ইংরাজদিগের একটি মিলিত নৌবহর ডার্ডানেলের উভয়পার্শ্বস্থিত দুর্গগুলি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১৮ই মার্চ্চ—ডার্ডানেলের পার্শ্বস্থিত দুর্গগুলি সাধারণ ভাবে আক্রমণকালে ভাসমান বিস্ফোরক কুম্ভ কর্ত্তৃক ফরাসীযুদ্ধ জাহাজ বুভেল এবং ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজ ইরিজিস্‌টিব্‌ল্‌ ও ওসন্‌ নিমজ্জিত হয়। বুভেলের নাবিকবৃন্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজের নাবিকগণ রক্ষা পায়। গোলাপতনের ফলে গাটয় এবং ইনফ্লেক্‌সিবল্‌ জাহাজ যুদ্ধে অপারগ হয়।

২২শে এপ্রেল—ইপ্রেসের উত্তরে জার্ম্মাণ সৈন্যদল অতর্কিত আক্রমণ করে। নিশ্বাসরোধকারী গ্যাসের সাহায্যে তাহারা ফরাসী সৈন্যদলকে ইজের ক্যানালে হঠাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার ফলে ইংরাজ সৈন্যদল মিলিত সৈন্যদলের সংস্পর্শে থাকিবার নিমিত্ত সেণ্টজুলিয়েন ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

২৬শে এপ্রেল—সারইয়ান হামিল্টনের অধীনে মিলিত সৈন্যের একটি শাখা ডার্ডানালের দুই তীরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

৭ই মে—আয়ারল্যাণ্ডের নিকট কুনার্ডলাইনার লুসিটানিয়া জার্ম্মাণ সাবমেরিণ হইতে চালিত টর্পেডোর দ্বারা আহত হয়। জাহাজখানি ঐ আঘাতের ফলে ১৮ মিনিটে ডুবিয়া যায়। ২১৬০ জন আরোহীর মধ্যে ১৪০০ জলে ডুবিয়া অথবা বোমায় আহত হইয়া মারা যায়; তাহার মধ্যে ১৩৯ জন আমেরিকাবাসী ছিল।

২৪শে মে—ইটালি অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

৩রা জুন—দুই সহস্র তুর্কি সৈন্য ১৭টি কামান ও অনেক পরিমাণ খাদ্য লইয়া সেনাপতি টাউন্‌স্‌ হেণ্ডের নিকট আমারায় আত্মসমর্পণ করে।

১৯১৫

২৩শে জুলাই—কলিকাতার 'ষ্টেট্‌স্ম্যান' আপিস কর্ত্তৃক পরিচালিত "যুদ্ধের সাহায্য-ভাণ্ডার" বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ৫,৩২,০০০, টাকার উপর চাঁদা উঠে।

২২শে আগষ্ট—ইটালি অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

১০ হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণির ক্রুইজার জাহাজ এম্‌ডেন বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্য তরী ইণ্ডাস্‌ লোভাট, কিলিন, ডিপ্লোমাট, ট্রাবক্‌ এবং ক্যাবিছা দখল করে। উহাদের মধ্যে প্রথম ৫ খানি নিমজ্জিত হয় এবং তাহাদের নাবিকগণকে ক্যাবিছা জাহাজে উঠাইয়া উহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে দেয়।

১১ই সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণিরা এখনও হঠিতে থাকে। ফরাসী সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের একটি বিভাগের অনেকগুলি সৈন্য এবং সমস্ত যুদ্ধোপকরণ হস্তগত করে। প্রভূত পরিমাণ খাদ্য, অনেকগুলি কামান ইংরাজেরা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে ছিনাইয়া লয় এবং অনেকগুলি বন্দী করে।

২২শে সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণ ক্রুইজার জাহাজ এম্‌ডেন মান্দ্রাজে তেলের গুদামে গোলা বর্ষণ করিয়া ২টিতে আগুন ধরাইয়া দেয়; সহরেরও সামান্য ক্ষতি হয়।

২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর—এম্‌ডেন লাক্ষাদ্বীপের নিকট হইতে কিংলাড, টিম্বেরিক, বিবেরিয়া এবং ফয়েণ নামীয় জাহাজত্রয় ডুবাইয়া দেয় এবং নৌবহরের ভারবাহী জাহাজ রুবেসক্‌ দখল করে। ডার্ডানেল বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। লণ্ডনে ঘোষিত হয় যে ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত সৈন্যদল মার্সেলে পৌছিয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর—মিলিত সৈন্যদলের একটি শাখা স্যালোনিকায় অবতরণ করে।

১৩ই অক্টোবর—বেলজিয়মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা (ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল্‌) মিস্‌ এডিথ্‌ ক্যাভেলল্‌ পলায়মান ইংরাজ ফরাসী ও বেলজিয়ান্‌ সৈন্যদিগকে আশ্রয় দিবার অপরাধে, জার্ম্মাণদিগের দ্বারা নিহত হন। জার্ম্মাণদিগের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সকল নৃশংসতার অপেক্ষা এই ঘৃণ্য আচরণ সমস্ত সভ্যজগতকে অধিকতর আক্রোশে ও ঘৃণায় পূর্ণ করে।

১৯শে অক্টোবর—সার ইয়ান হামিলটনকে ডার্ডানেল,

১৯১৫

হইতে ফিরাইয়া লওয়া হয়। তাহার স্থানে সার চার্লস্ মন্‌রো নিযুক্ত হন।

৯ই অক্টোবর—বেলজিয়াম্ ও ইংরাজ সৈন্যদল এ্যাণ্ট-ফর্প্ ত্যাগ করে। ইংরাজ নৌ-বহরের ২০০০ সৈন্য হলাণ্ডে আত্মসমর্পণ করে; ৬০০০ নিরাপদে অস্‌টেণ্ডে পৌছায়।

১৪ই অক্টোবর—জার্ম্মাণ সৈন্যদল ক্যালে যাত্রায় বিফল মনোরথ হয় এবং বেলজিয়ামের সীমান্তে দক্ষিণে লিজ্ পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

১৫ই হইতে ১৯শে অক্টোবর—এম্‌ডেন্ কর্তৃক ইংরাজদিগের বাণিজ্যপোত চিল্‌কানা, বেন্‌মোর, ট্রয়নাস্, ক্ল্যান্-গ্র্যাণ্ট্, এবং সেণ্ড্রাভেল নিমজ্জিত হয় এবং মিণিকয়ের ১২০ মাইল পূর্ব্বে উহা দ্বারা ভারবাহী জাহাজ অক্‌স্‌ফোর্ড অধিকৃত হয়।

২৮শে অক্টোবর—এমডেন্ পেনাঙ্গ্ পরিদর্শন করে এবং রুষিয়ার ক্রুইজার জাহাজ জেম্‌চ্যাঙ্গ্ এবং একখানি ফরাসী ডেস্‌ট্রয়ার জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

২৯শে অক্টোবর—তুর্কির রণপোত কৃষ্ণসাগরে বিনা কারণে রুষিয়ার জাহাজ এবং বন্দর অধিকার করে।

৩০শে অক্টোবর—ব্যাটেনবর্গের প্রিন্স্ লুইএর নৌ-বিভাগের প্রধান পদ ত্যাগ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। তাহার স্থানে লর্ড ফিসার নিযুক্ত হন।

১লা নভেম্বর—মিলিতশক্তি এবং তুর্কির ভিতর যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

১লা নভেম্বর—ভাল্‌পারাইসোর নিকট নৌ-যুদ্ধ। ইংরাজদিগের ক্রুইজার জাহাজ গুডহোপ্, মন্‌মুথ্, এবং গ্লাস্‌গো, জার্ম্মাণ নৌ বহরের একটি বিভাগকে (সার্ণহরস্ট্, নিসেনো এবং নুর্ণ্‌বার্গ্) আক্রমণ করে। ইংরাজ জাহাজের কামানের গোলা অপেক্ষা জার্ম্মাণ জাহাজের সার্ণহার্ষ্ট এবং নিসেনো নিক্ষিপ্ত গোলা অধিক দূরগামী হওয়ায় গুড্‌হোপ এবং মন্‌মুথ্ সমস্ত আরোহী লইয়া নিমজ্জিত হয়।

৬ই নভেম্বর—মিলিত শক্তির নিকট সিংটাও আত্মসমর্পণ করে। ফাও নামক স্থান অধিকারের সহিত সাট্-এল আরাবে ইংরাজদিগের আক্রমণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ছোট কামানবাহী নৌকা ও ওসন্ নামীয় জাহাজ এই যুদ্ধে ভারতীয় ফৌজকে সাহায্য করে।

৯ই নভেম্বর—জার্ম্মাণ ক্রুইজার জাহাজ এমডেন ইংরাজ রণতরী সিড্‌নির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কোকোজ্ দ্বীপের নিকট (কিলিং) চড়ে লাগিয়া দগ্ধ হইয়া যায়।

২৫শে নভেম্বর—কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের যুদ্ধ ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত ২৫ খানি মোটর এ্যাম্‌বুলেন্স বাকিংহাম প্রাসাদে রাজ্ঞী মেরী পরিদর্শন করেন।

৩রা ডিসেম্বর—সেনাপতি জফ্‌রে ফরাসী জাতীয়সৈন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি নিযুক্ত হন।

১৬ই ডিসেম্বর—সার জন্ ফ্রেঞ্চ্ ফ্রান্স এবং ফ্লাণ্ডার্সএর ইংরাজ সৈন্যদলের শাসনভার ত্যাগ করেন ও ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের ইংরাজ সৈন্যদলের প্রধান নিযুক্ত হন। পশ্চিম সীমান্ত স্থিত ইংরাজ সৈন্যদলের ভার সার ডগ্‌লাস্ হেগের উপর ন্যস্ত হয়।

২০শে ডিসেম্বর—সমর আপিস্ ঘোষণা করেন যে সুভিয়া বে এবং আন্‌জাক জোন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১৯১৬

৫ই জানুয়ারী—পার্লামেণ্ট মহাসভায় আস্‌কুইথ্ সাহেব কর্তৃক ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিবার নিমিত্ত বাধ্যতামূলক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হয়।

৯ই জানুয়ারী—গ্যালিপলি পরিত্যাগ কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—লর্ড কিচেনার ঘোষণা করেন যে মেসোপোটামিয়ার কার্য্য প্রণালী বিবেচনাধীন হইয়াছে।

২৯শে এপ্রেল—কুট্‌দুর্গস্থিত সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করে।

৩রা মে—আস্‌কুইথ্ সাহেবের দ্বারা উপস্থাপিত সৈনিক সংগ্রহ সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়স্ক সকল ব্যক্তির উপরই প্রযোজ্য হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় শুনানির সময় ৩২৮ জন উহার পক্ষে ও ৩৬ জন উহার বিরুদ্ধে ভোট্ দেয়।

৩১শে মে—জাট্‌ল্যাণ্ডের নিকট নৌযুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ নৌসৈন্যদল জার্ম্মাণ সমরপোতশ্রেণীর গতিরোধ করে ও উহা বন্দরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশদিগের ক্ষতি —"কুইন্ মেরী", "ইন্‌ডিফ্যাটিগেবল", "ইন্‌ভিন্‌সিবল্"

১৯১৭

নামীয় রণপোত, "ভিয়েন্দ", "ব্ল্যাক্‌প্রিন্স্", ও "ওয়ারিয়র" নামীয় অস্ত্রাদি সজ্জিত রণতরী এবং ৮ খানি জলতলচারী ধ্বংসকারী রণপোত। জার্ম্মাণদিগের ক্ষতি ১ খানি সুবৃহৎ রণপোত ("হিন্‌ডেন্‌বার্গ") ২ কিংবা ৩ খানি রণতরী ("লাটজো", "ডারফ্লিন্‌গার্", এবং "সিড্‌লিজ্"), ৪ খানি ছোট যুদ্ধজাহাজ ("এলবিঙ্গ্", "পমার্ণ্", "বষ্টক্" "ফ্রণেলব্") এবং ৬ খানি ধ্বংসকারী রণপোত।

৫ই জুন—রুষিয়া যাইবার পথে অর্কনির নিকট একটি বিস্ফোরক কুম্ভে আহত হইয়া "হ্যাম্পসায়ার" জাহাজ ইংলণ্ডের সেনাপতি প্রধান লর্ড কিচেনার ও তাহার অনুচর বৃন্দের সহিত জলমগ্ন হয়। আস্‌কুইথ্ সাহেব অস্থায়ী ভাবে সামরিক কার্য্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন।

৯ই জুন—মক্কার শাসনকর্ত্তা (সেরিফ্) হেদ্‌জাজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মক্কা জেদা ও তৈফার অধিকাব করেন।

১লা জুলাই—সোমেব উত্তরে ও দক্ষিণে ৩০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যদল আক্রমণ কার্য্য আরম্ভ করে।

১০ই জুলাই—গ্রেট্ ব্রিটেন্ এবং ফ্রান্স "লণ্ডন ডিক্লারেশনে'র (London Declaration) সাধারণ নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সর্ত্ত হইতে আপনাদিগকে অপসৃত করে।

১৪ই জুলাই—সেনাপতি হেগ্ ঘোষণা করেন যে ক্রমাগত ১০ দিন এবং ১০ রাত্রি যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদল ১৪০০০ গজ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া শত্রুপক্ষের সর্ব্বপ্রথম পরিখা সুব্যবস্থিতভাবে অধিকার করিবার কার্য্য সম্পূর্ণ করে।

২৭শে জুলাই—কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ঘোষিত হয় যে গ্রেট্ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানীর ব্রাসেলস্ নামীয় জাহাজের অধ্যক্ষ ফ্রায়াট্ সাহেব ১৯১৫ সালের মার্চ্চমাসে একখানি জলতলচারী রণপোত আক্রমণ করার অপরাধে জার্ম্মাণ দিগের দ্বারা নিহত হয়েন। এই নৃশংস হত্যা ও তৎসহিত স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ১৮০০০ নাগরিককে "রুবে" এবং "লাইল" হইতে নির্দ্দয় ভাবে নির্ব্বাসিত করায় সমস্ত সভ্যজগত আক্রোশে পরিপূর্ণ হয়।

২৮শে আগষ্ট—ইটালি জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৬

করে। রুমানিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইহার ফলে জার্ম্মণি এবং তুর্কির দ্বারা রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ফকেন্ হাইনের স্থানে হিন্‌ডেন্‌বার্গ জার্ম্মাণির সেনাপতিবৃন্দের প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সোমের সম্মুখে যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা "কুর্সেলেট্" "মার্টিন্‌হুইক্" এবং "ফ্লারস্" অধিকার করেন।

২৪শে অক্টোবর—ডুনামেন্টের দুর্গ এবং গ্রাম ফরাসীগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হয়। সেইস্থান অধিকার করিতে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের ৫ মাস সময় লাগিয়াছিল ফরাসীগণ ৭ দিনে তাহা দখল করে।

১৫ই নভেম্বর—খাদ্য বস্তু নিয়ন্ত্রিত করার নিমিত্ত গ্রেট্ ব্রিটেনে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং কলে ময়দা প্রস্তুত করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯শে নভেম্বর—মিলিতশক্তি মনাষ্টির অধিকাব করে।

২৩শে নভেম্বর—সম্রাট ফ্রান্সিস্ জোসেফ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৯শে নভেম্বর—বাল্‌ফুর সাহেব ঘোষণা করেন যে নৌসেনাপতি জেলিকো নৌবিভাগের প্রধান নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাহার স্থানে দ্বিতীয় নৌসেনাপতি বেটি সমরপোত শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক হইয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর—গ্রীসে সমাগত মিলিতশক্তির কয়েকদল সৈন্য গ্রীকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হয়। এই ঘটনার পর এথেন্সে অরাজকতা এবং রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

৫ই ডিসেম্বর—আস্‌কুইথ সাহেব পদত্যাগ করেন।

৬ই ডিসেম্বর—লয়েড্ জর্জ্জ্ মন্ত্রীদল গঠনের ভার গ্রহণ করেন।

১২ই ডিসেম্বর—জার্ম্মাণি মিলিতশক্তিপুঞ্জের প্রত্যেকের নিকট একই প্রকার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। ঐ প্রস্তাব প্রত্যেকেই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিহার করে।

২১শে ডিসেম্বর—প্রেসিডেণ্ট্ উইলসন সমস্ত যুদ্ধ্যমান এবং নিরপেক্ষ শক্তির নিকট জানান যে এই সুযোগ যুদ্ধ্যমান শক্তিপুঞ্জের মতামত আলোচনার পক্ষে অনুকূল।

১৯১৭

১১ই জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট্ উইলসনের সন্ধির প্রস্তাবে মিলিতশক্তিপুঞ্জের উত্তর প্রদত্ত হয়।

১০ই জানুয়ারী—ভারত গবর্ণমেণ্ট্ ঘোষণা করেন যে তাহারা একটি সমরঋণ সংগ্রহের সংকল্প করিয়াছেন। ঐ সমরঋণে আহৃত সমস্ত অর্থ গভর্ণমেণ্টকে দেওয়ার সংকল্প করা হয়।

২৫শে জানুয়ারী—গ্রীক গভর্ণমেণ্ট ১লা ও ২রা ডিসেম্বরের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

২৯শে জানুয়ারী গ্রীসের যুদ্ধ ঘোষণানুযায়ী এথেন্সে মিলিতশক্তির পতাকার নিম্নে সম্বর্দ্ধনা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

২রা ফেব্রুয়ারী—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় প্রজার ভিতর ১৬ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক সকল ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত ভারত সরকার এক আদেশ জারি করেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—ভারতের বড়লাট বাহাদুর বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি এ্যান্কার হইতে জার্ম্মান সেনার পলায়ন আরম্ভ হয়।—টাইগ্রিস নদীর তীরে ইংরাজ সৈন্যগণ যে যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহার ফলে কুটেল্-আমরা অধিকৃত হয় এবং তুর্কি সৈন্যদল সহস্র হতাহত ও বন্দী ও প্রভূত পরিমাণ যুদ্ধোপকরণাদি ফেলিয়া পালায়ন করে।

১১ই মার্চ্চ—ইংরাজেরা বাগদাদ্ অধিকার করেন।

১৩ই মার্চ্চ—রুষিয়ায় বিদ্রোহ। রুষিয়ার সম্রাট নিকোলাস্কে সিংহাসনচ্যুত করা হয়।

৬ই এপ্রেল—আমেরিকা জার্ম্মাণির সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন।

৯ই এপ্রেল—আরাসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা ভিমি ও রিজ্ অধিকার করেন।

১৫ই এপ্রেল—সোঁইস এবং রিম্স্ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফরাসী সৈন্যদল তাহাদের আক্রমণ ক্রিয়া আরম্ভ করে।

৯ই মে—ওয়াসিংটনে প্রতিনিধিবৃন্দের সভায় (House of Representatives) বালফুর সাহেব বক্তৃতা করেন।

১১ই মে—পার্লামেণ্টের গোপন অধিবেশন হয়। ১লা জুন হইতে ইংলণ্ডের ডাক সাপ্তাহিকের স্থলে পাক্ষিকভাবে চলিবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

৫ই জুন—সেনাপতি আলেক্সিফের স্থলে ব্রাসিলফ্ রুষিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হন।

৭ই জুন—ইংরাজ সৈন্যদল মেসিনস্ রিজ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন।

১২ই জুন—রাজা কন্স্টান্টাইন্ মিলিত শক্তিপুঞ্জের অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ আলেক্জাণ্ডারকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন।

২৬শে জুন—মেসোপেটোমিয়া কমিশনের রিপোর্ট (অনুসন্ধান ফল) প্রকাশিত হয়। তাহাতে সেনাপতি নিক্সন্, লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং সার বোসাম্প্ ডাফ্ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।

১৪ই জুলাই—ডাক্তার ভন্ ব্যেথম্যান্ হলওয়েগ্ জার্ম্মাণীর প্রধান মন্ত্রী পদ ত্যাগ করেন এবং তাহার স্থলে হার মাইকেলিস্ প্রধান মন্ত্রী হন।

১৭ই জুলাই—ইংরাজ রাজ তাহার পরিবার প্রাসাদের নাম উইণ্ডসর রাখেন। ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভা পরিবর্ত্তন হয়। সার এরিক্ গেডিস্ নৌবিভাগের প্রধান লর্ড (অধিনায়ক) এবং সার্ এডওয়ার্ড কারসন্ যুদ্ধসভার (war cabinet) সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

২১শে জুলাই—মিঃ কেরেন্সকি রুষিয়ার প্রধান মন্ত্রী হন। গ্যালিসিয়ার রুষিয়া সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়।

৩০শে জুলাই—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সমুদ্রপোত চালনার ভার গ্রহণ করেন।

২৬শে অক্টোবর—ইটালির প্রান্ত দেশে দুর্ঘটনা। জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রীয়ার প্রবল সৈন্যদল বলপূর্ব্বক "আইশেঞ্জে উপনীত হয় ও তাহার ফলে ইটালীয় সৈন্যদল প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া টাগ্লিয়া মেণ্টোতে পলায়ন করে।

১৬ই ডিসেম্বর—মিঃ ক্লেমেন্সো ফরাসীদেশের প্রধান মন্ত্রী হন।

৫ই ডিসেম্বর—রুষিয়া গবর্ণমেণ্ট মিলিত শক্তিপুঞ্জের অজ্ঞাতে জার্ম্মাণীর নিকট যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব ও তদনুযায়ী অধিবেশনাদি আরম্ভ করে না।

৭ই ডিসেম্বর—রুমানিয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সঙ্কল্প করেন।

১৯১৭

৮ই ডিসেম্বর—জেরুজালেম্ ইংরাজদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৯১৮

৭ই জানুয়ারী—কিয়েলে নৌবহরের বিদ্রোহ—

৩রা মার্চ্চ—বোলসেভিকেরা জার্ম্মাণির সহিত সন্ধি করে।

৫ই মার্চ্চ—রুমানিয়া জার্ম্মাণির সহিত সন্ধি করে।

৬ই মার্চ্চ—ডান রেডমণ্ড্ সাহেবের মৃত্যু।

২১শে মার্চ্চ—স্কার্পেওয়ার সম্মুখে জার্ম্মাণির দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ আরম্ভ হয়।

১৯শে মার্চ্চ—স্কার্পেওয়ার আক্রমণের ফলস্বরূপ জার্ম্মাণি ৭৫০০০ বন্দী ও ১৽০০ কামান দাবী করে।

৩০শে মার্চ্চ—সেনাপতি ফোচ্ পশ্চিম সীমান্তে একাধিক সংখ্যক সৈন্যদলের নায়ক নিযুক্ত হন।

৮ই এপ্রিল—দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য লয়েড্ জর্জ্জ বড়লাট বাহাদুরের নিকট সমাচার প্রেরণ করেন।

৯ই এপ্রিল—জার্ম্মাণ সৈন্যদল লোভে স্যাপেলের নিকট শত্রুব্যূহ ভেদ করে।

৯ই এপ্রিল—গিভেনচি এবং ইপ্রেসের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবিরাম যুদ্ধ। ইংরাজ সৈন্যদল Locon-Merville-Metren Wyatschaete এবং মেসিনস্ এর সীমান্তে হটিয়া যায় এবং স্বেচ্ছায় Pachendale salient ত্যাগ করে।

১০ই এপ্রিল—কমন্স্ সভায় নূতন সৈন্যসংগ্রহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রবর্ত্তিত হয়।

২৩শে এপ্রিল্—জিব্রোজি এবং আস্টেণ্ডে ইংরাজ সৈন্যদলের আক্রমণ।

১০ই মে—অস্টেণ্ড বন্দরে প্রবেশের পথরোধকারী জাহাজ "ভিনডিক্‌টিভ্" নিমজ্জিত হয়।

১৫ই মে—নর্থ সি (উত্তর সাগরে) ২২০৫০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ইংরাজদিগের যে বিস্ফোরক ভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার বিস্ফোরণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

২৭শে মে—Aisneএর সম্মুখে জার্ম্মাণদিগের আক্রমণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

২৯শে মে—ফরাসীগণ সোইস পরিত্যাগ করিয়া যায়।

১৫ই জুন—এ্যাস্টিকো হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ানেরা পরাজিত হয় এবং বাম তীরে সরিয়া যায়।

৩রা জুলাই—খাদ্য বস্তু নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা লর্ড রণ্ডা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৫ই জুলাই—স্যাটো থিয়েরী হইতে মেন্‌লে মাসিজেস্ পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদল দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৬ই জুলাই—রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব জার নিকোলাস্ একটিন বার্গে নিহত হন।

১৮ই—'মারণের দ্বিতীয় যুদ্ধে সোঁইস্ হইতে স্যাটো থেরি পর্য্যন্ত ২৭ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ফরাসী ও আমেরিকান সৈন্যদলের মিলিত আক্রমণ আরম্ভ হয়।

২রা আগষ্ট—ফরাসী সৈন্যদল সোঁইস পুনরধিকার করে।

৮ই আগষ্ট—সার ডগলাস্ হেগের অধীনে ইংরাজ এবং ফরাসী সৈন্য সোম নদীর সম্মুখে অগ্রগামী হইতে আরম্ভ করে।

১লা সেপ্টেম্বর—সুইজারল্যাণ্ডের ডারকোর্ট কোয়েন্টে সন্নিবিষ্ট সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর—ফরাসী এবং আমেরিকান সৈন্যদল সেণ্ট মিহিয়েল স্যালিয়েণ্ট সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর—সম্রাট কার্ল বাধ্যবাধকতা হীন সন্ধিসূত্র সঙ্কলনের আভাস দেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—প্যালেষ্টাইনে সেনাপতি এলেনবির আক্রমণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে তিনটি তুর্কি সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে জাফা, ডামাস্কাস বিরুট এলেপ্পো অধিকৃত হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়া বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে।

৫ই অক্টোবর—রাজা কার্ডিনাণ্ড সিংহাসন ত্যাগ করেন।

৬ই অক্টোবর—জার্ম্মাণী সন্ধির প্রস্তাব করে।

১৪ই অক্টোবর—ফ্লাণ্ডার্সে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যদলের মিলিত আক্রমণ আরম্ভ হয়।

১৭ই অক্টোবর—অষ্টেণ্ড পুনরধিকৃত হয়।

২৭শে অক্টোবর—সেনাপতি লাডেনডরফ্ পদত্যাগ করেন।

২৮শে অক্টোবর—ইটালীয় সীমান্তে মিলিতশক্তির বিজয়-কার্য্য আরম্ভ হয়।

৩১শে অক্টোবর—তুর্কির আত্মসমর্পণ।

২রা নভেম্বর—অষ্ট্রীয়ার আত্মসমর্পণ।

১১ই নভেম্বর—জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণ।

মানসী

গল্প।

(১)

নূতন বসন্ত আসিলে প্রকৃতি যেমন গোপন হৃদয়ের এক একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস পুষ্পরূপে ফুটাইয়া তোলে, নূতন যৌবন সমাগমে আমার হৃদয় মধ্যেও একটী মানসী মূর্ত্তি ঠিক তেমনিরূপে ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পরিধানে পাতলা সবুজ রংয়ের একখানি শাড়ী; বর্ণ বসন্ত কৌমুদীর স্থায় উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ; মুখশ্রী চপল অথচ সলজ্জ; অনাভরণ দেহসৌন্দর্য্যে নবাগত যৌবন-লাবণ্য অপেক্ষা বাল্যভাবই অধিক প্রস্ফুট। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে ফুলটী যেমন স্বভাবের কোল হইতে ফুটিয়া উঠিয়া স্বভাবেরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে আমার মানসী প্রতিমাও যেন ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি হইতেই ফুটিয়া উঠিয়া স্থির স্নিগ্ধ নেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া যেন আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রীক্ পুরাণে আছে কোন শিল্পী (Pygmalion) নিজের হাতের তৈরী মূর্ত্তির ভালবাসায় পড়িয়াছিলেন; চীন দেশের এক ভাস্কর তাহার মানসী প্রতিমার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন; আমিও আমার সেই মানসী মূর্ত্তির প্রণয়ে আত্মবিস্মৃত হইলাম।

দুপুর বেলা কলেজ কামাই করিয়া ঘরে বসিয়া তাহার উদ্দেশে কবিতা লিখিতাম; সন্ধ্যার পর গোলদীঘির ধারে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়া আকাশের গায়ে তাহারই অসংখ্য ছবি দেখিতে পাইতাম। সহসা কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলি অত্যন্ত নীরস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—অঙ্ক কসিতে গেলে কেবলই ভুল হয়; ইতিহাসের পড়া কিছুতেই মুখস্থ হইতে চায় না; সংস্কৃত শব্দগুলা অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া মনে হয়।

সহপাঠী বন্ধুরা সকলেই আমার এই মানসিক পরিবর্ত্তন হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল। রক্তমাংসে গঠিতা কোন্ তরুণীর সৌন্দর্য্য অথবা কোন্ যায়গার ভাবী স্ত্রীর ফটোচিত্র আমার এই মনোবিকারের হেতু—জানিবার জন্ত তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ফটোচিত্র, প্রণয়লিপি অথবা মেহাৎপক্ষে বিবাহ সম্বন্ধীয় দুই একখানা চিঠি পত্রের খোঁজে আমার বাক্স বিছানা ওলট্ পালট্ করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমার প্রণয়পাত্রীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। আমি তখন বিজয়গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিলাম,—

তাহারে খুঁজিয়া পায় হেন জন আছে কে,
মনের নিভৃতকক্ষে লুকাইয়া থাকে সে!

(২)

তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। পরীক্ষার গুরু চিন্তায় নাকি মানুষ আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, আমার কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। চিত্তপটে আমি যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম পরীক্ষার চাপে তাহার একটী রেখাও অস্পষ্ট হয় নাই, একটী বর্ণও মলিন হইয়া যায় নাই। সেই উজ্জ্বল ছবি মনে করিয়াই আমি পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিলাম এবং একে একে সকলগুলি বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।

পরীক্ষার পর কিছুদিন ধরিয়া প্রত্যেক ছাত্র প্রশ্ন পত্রগুলি লইয়া কেবল নাড়াচাড়া করে ও কোনখানে নিজের কি ভুল হইয়া গিয়াছে দিনে দশবার করিয়া তাহার আলোচনা করে; আবার ফল বাহির হইবার দিন পনর আগ হইতে সর্ব্বদাই মনটা ছট্‌ফট করিতে থাকে—কখন কি সংবাদ আসিয়া হাজির হয়! এ সকল উদ্‌বেগ কিন্তু আমায় একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। পাশ ফেল সম্বন্ধে আমার পরম নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া অনেকেই মনে করিল পরীক্ষায় পাশ হওয়া সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই বলিয়া আমি এমন নিরুদ্বেগে দিন কাটাইতেছি। আমার সেই ভাব দেখিয়া দুই একটী বন্ধুর মনে ঈর্ষাও জন্মিল।

ফল বাহির হইলে অনেকেই পাশের সংবাদ পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। কাগজ খুজিয়া তৃতীয় বিভাগের একেবারে শেষটায়ও আমি নিজের নাম বাহির করিতে পারিলাম না।

তখন আমার চোখ ফুটিল। ভাবিলাম ব্যাপারটা নিতান্তই খারাপ হইয়া গিয়াছে- নিজে ইচ্ছা করিয়াই আমি কুফল ডাকিয়া আনিয়াছি। পূর্ব্বে আমি যতখানি নিশ্চিন্ত

ছিলাম, এখন আমার মানসিক অবস্থা অন্য অন্য ছাত্র অপেক্ষা সেই পরিমাণে অধিক শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শুনিয়াছিলাম পরীক্ষায় ফেল হওয়াটা পুত্রশোক অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার, এখন আমি তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিলাম।

(৩)

ঘরে বিমাতা ছিলেন। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—আমার অকৃতকার্য্যতার জন্য নহে; এই জন্য যে আমার পিতার উপার্জ্জিত অর্থের কোন সারবত্তা নাই, যে কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয় তাহাতেই জলে যায়, কোন ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

পিতাও তখন বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমার আর লেখা পড়া করিবার প্রয়োজন নাই, যে অর্থ আমার জন্য খরচ করা হইবে তাঁহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে উপকারে আসিবে, কোন প্রকার চাকুরীর চেষ্টা করাই এখন আমার পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য, বাড়ীতে বসিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট করিয়া কোন লাভ নাই।

কালাপাহাড়ের ভীষণ তরবারির আঘাতে তীর্থস্থানের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি যেমন ধূলিসাৎ হইয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ বজ্রাঘাতে আমার মানসী মূর্ত্তিও সেইরূপ চুরমার হইয়া গেল। পিতার কঠোর আদেশ শুনিয়া ও বিমাতার অশ্রুজল দেখিয়া আমার মনে সংসারের প্রতি একটা বিদ্বেষ-ভাবও জন্মিল। একবার মনে করিলাম সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড় জঙ্গলে পলায়ন করি। এমন সময়ে—

"কুমারী কন্যার পিতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া
উপনীত হ'ল এসে গলে বস্ত্র দিয়া।"

পিতা হাঁকিলেন পাঁচহাজার, কন্যার পিতা বলিলেন, তিন হাজার। এক পক্ষের কড়াকড়ি, অন্য পক্ষের কাতর বিনয় এবং সম্রান্ত তৃতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যস্থতায় সাব্যস্ত হইল চার হাজার। পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে না জানি, আমার দর কত হইত!

টাকার কথা আগে, মেয়ে দেখার কথা পরে। আমার যাওয়া হইল না। পিতৃদেব একদিন ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিলেন। সঙ্গে প্রৌঢ় দুই জন ছিলেন, আর ছিল আমার এক বন্ধু, কাঁচা চোখের দেখাটা নির্ভুল হইবে এই জন্য। সে এবার আই, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল। মেয়ে দেখিয়া আসিয়াই আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "জোর কপাল ভাই, তোর! আমরা পাশ ক'রে যা' করতে পারলুম না, তুই তা' করলি। মেয়েটা আস্ত পরী!" "দূর হো'ক পরী! আমি তোর কথা শুনতে চাইনে" বলিয়া আমি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলাম। সে আমাকে আটকাইয়া ধরিয়া বলিল, "নামটাও বড় সুন্দর রে ভাই, কুসুমলতা।" হাত মোচড়াইয়া তাহার হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "আমি কি তোর কাছে নাম শুনতে চেয়েছি?" সে হাসিয়া বলিল, "কখন চাইবে? আমি ত নিজে থেকেই আগে ব'লে দিয়েছি। পরম সৌভাগ্য তোর, হাজার লোকের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও এমন হয় না রে stupid। বিয়ে হ'য়ে গেলে কি খাওয়াবি বল্।" "ঘোড়ার ডিম। যা তুই এখন এখান থেকে বের হ', আর জ্বালাতন করতে হবে না।" খুব রাগের সহিত বলিলাম।

আমার রাগের কারণ বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেছি। ভাবিয়া সে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল; দুই জনে হাতাহাতির যোগাড়, এমন সময় সে রণে ভঙ্গ দিয়া গেল। যাবার কালে বলিয়া গেল, "তুই আমার কাছে মনের ভাব লুকোবি? আচ্ছা, দেখিস কি শাস্তি পেতে হয় তোকে।"

তাহার শাস্তির ভয়ে আমার মন একটুও বিচলিত হইল না। এই ভাবিয়া মনে উদ্বেগ হইল—এখন কোন্‌দিকে পলায়ন করি? একবার মনে হইল, বিবাহের পূর্ব্বে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সরিয়া পড়ি। আবার ভাবিলাম, সেটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ; লুকোচুরিতে আবশ্যক কি, সকলের নিকট মনের ভাবটা খোলসা করিয়া বলিয়া হয় হিমাচল না হয় বিন্ধ্যাগিরির দিকে রওনা হওয়াই উচিত। শেষে আর ভাবিতে হইল না।

(৪)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া প্রলয় নির্ঘোষে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সে ভৈরব নিনাদে যে জড় অপেক্ষাও নিশ্চেষ্ট, তাহার হৃদয়েও একটা উৎসাহের স্ফুলিঙ্গ প্রদীপ্ত

হইয়া উঠে। অসংখ্য লোক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অদম্য উৎসাহে সেই সমর তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমিও সংসার ত্যাগ করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলাম।

বিকট আনন্দের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আমি সকল চিন্তা ও অবসাদ হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর যেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ভগবানের চরম নির্দ্দেশের ন্যায় সেনানায়কের ইঙ্গিতেই যেখানে আপনার সকল চেষ্টা নিয়োজিত করিতে হয়, রণচণ্ডীর সেই ভীষণ লীলাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূকুটির ছায়া কি কখনও প্রবেশ করিতে পারে? কামানের সম্মুখে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সামান্য বেতনের সৈনিকের মূল্য যেখানে এক, আই, এ পরীক্ষায় ফেলের কষ্ট সেখানে মানুষকে পীড়িত করিবে, ইহা একান্তই অসম্ভব। ক্যান্ট হিগেলের মত, উপনিষদ সাংখ্যতত্ব, গ্রীস রোম মিশরের ইতিহাস মুখস্ত করা নামজাদা অধ্যাপকের মাথা যেখানে একটা সামান্য গুলির আঘাতে চুরমার হইয়া যাইতে পারে, সেখানে আসিয়া অতীতের স্মৃতি আমার মন হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

সে এক ভীষণ আনন্দ। বাজনা বাজাইয়া, বন্দুকের শব্দ করিয়া দলে দলে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হওয়া; কখনও পাহাড়ের গায়ে গাছের পাতার আড়ালে শত্রুসৈন্যের অগোচরে গুঁড়ি মারিয়া চলা; তারপর সকল ভুলিয়া জীবন লইয়া খেলা; কত যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আবার শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া হাসি, তামাসা, বায়স্কোপ দেখার আনন্দে বিভোর হইয়া সময় কাটান, এ সমস্ত যে উপভোগ না করিয়াছে তাহার নিকট এ আনন্দের কথা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা।

মাঝে মাঝে উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া এক একটা বিমানপোত চলিয়া যাইতেছে, আবার সকল আগের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ, খাঁতের মধ্যে অসংখ্য সৈন্য নিষ্ক্রিয় অথচ সদাশঙ্কিতভাবে অবস্থান করিতেছে; কখনও একটা বিমানপোত কড়াৎ কড়াৎ শব্দে দুই একটা বোমা নিক্ষেপ করিয়া অনুসরণকারীর ভয়ে দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে; কুঁয়াসার অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আবৃত, দশ হাত দূরের মানুষটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন সময়ে প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় গোলাকার রক্তবর্ণ এক একটা পদার্থ আকাশ-মণ্ডল ভেদ করিয়া আসিয়া পড়িতেছে। মরণানন্দের এই ভীষণ লীলাক্ষেত্রে যদি আমার জীবন লীলার অবসান হইত, তাহা হইলে কোন দুঃখই ছিল না; কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিয়া উঠিল না। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া আমি হাসপাতালে নীত হইলাম।

করুণারূপিণী শুশ্রূষাকারিণীদের যত্নে আরোগ্য লাভ করিলাম বটে; কিন্তু আমার শরীরে এমন জখম হইয়াছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইবার অবস্থা আর আমার রহিল না। অগত্যা একান্ত নিরাশমনে আবার আমাকে দেশে ফিরিতে হইল।

(৫)

আলোড়িত সলিলমধ্যে ছায়ামূর্ত্তি মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়া খানিকক্ষণ বাদে আবার যেমন প্রকাশিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাড়নায় বিলীন পাৎলা সবুজ রংয়ের শাড়ী-পরা, জ্যোৎস্নারূপিণী, স্বভাবানুরক্তা আমার সেই মানসী-মূর্ত্তি ঠিক সেইরূপ আবার আমার চক্ষুর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসপাতালে রোগীর শয্যায় শুইয়া গত জীবনের সকল কথা চিন্তা করিবার সময়ে প্রথম সেই প্রতিমা আমার মনে পড়িল।

দেশে ফিরিয়া বরাবর আমি বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম না—কারণ সেখানে সান্ত্বনা প্রদানের উপযুক্ত লোক আমার পক্ষে তেমন কেহই ছিল না। সহরে এক বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেশে থাকাকালে এই বন্ধুটীই আমার বিবাহের কন্যা দেখিতে গিয়াছিল।

একদিন নাচের ঘরে বসিয়া আছি। মনটা কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না; ব্যর্থ জীবনের একটা নৈরাশ্য ভিতর হইতে গুমড়িয়া উঠিয়া সময় সময় কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া বলিল, "কুসুমলতার সঙ্গে পাশের বাড়ীর খগেনের বিয়ে হ'য়ে গেল।" কুসুমলতার রূপের প্রশংসা শুনিয়া বন্ধুর সহিত একদিন আমি হাতাহাতি করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম; তখনকার ঠিক সেই মনের অবস্থা এখন আমার ছিল না, তথাপি কথাটার মধ্যে শুনিবার মত কি আছে আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "তা' বেশ ত; আমার [illegible]ণ আছে

নাকি ?" "না" বলিয়া একটু বিষাদের ভাব দেখাইয়া যেন বন্ধু চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে পাশের বাড়ীর শানাইয়ের বাজনা, যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেদিকের আকাশটা ছাইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আমি ছাদে গিয়া বসিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে বাতাস কোন অচেনা দেশের কোন্ দুঃখের কাহিনী বহিয়া আনিতেছিল, খণ্ড খণ্ড পাৎলা মেঘ সময়ে সময়ে আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, আবার বাতাসে উত্তর দিকে চলিয়া যাইতেছিল। আমি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিয়াছিলাম। এক সময়ে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখি, বেশীদূরে নয় আর একজন লোক আমারই মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বোধ হয় আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া এক ধ্যানে সেই খণ্ডমেঘের আড়াল হইতে চন্দ্রের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। প্রকৃতির উপাসিকা নবোঢ়া তরুণীর পরিধানে পাৎলা সবুজ রংয়ের শাড়ী, অঙ্গ হইতে যেন জ্যোৎস্না কিরণ উছলিয়া পড়িতেছে; মুখশ্রী শান্ত, সুকোমল, ভক্তিরসে, আপ্লুত—সে আমারই সেই মানসী প্রতিমা, সমগ্র প্রাণ মনের সহিত একদিন আমি যাহার পূজা করিয়াছিলাম, যাহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবন স্মৃতি

(১)

মনে পড়ে সেই ধুলা মাটি নিয়ে
জীবনের ভোর বেলা,
মাটি দিয়ে গড়া পুতুলের বিয়ে
সেই আমোদের খেলা।
সে দিনও সে ছিল খেলিবার সাথী
সে দিনও ছিল স্বামী,
কুমারী ধরম তার পায়ে ঢেলে—
বধূ সাজিতাম আমি।
মোর অভিমানে সাধিত আমায়
কভু সে করিত মান,
সে মান সাধিতে দিয়েছি তাহায়
সব হিয়া সব প্রাণ।
এমনি করিয়া খেলিবার ছলে—
নিয়েছে হৃদয় জিতে,
আজিও সে কথা ভুলিতে পারিনি
লেখা আছে পোড়া চিতে।

(২)

যৌবনে পরে তারি সনে পুন
বাঁধিলাম খেলা গেহ,
আপনার যাহা দিনু তারি করে
সঁপে দিনু এই দেহ।
কত জনমের সাধনার ফলে
তাহারে পাইনু বর
আপন করিয়া লইল তুলিয়া
আমার যা— ছিল পর।

(৩)

মনে পড়ে সেই মধু যামিনীতে—
গলা ধরা কত সাধা।
বিরহের পরে মধুর মিলনে—
প্রাণ ফেলে দিয়ে কাঁদা।
সে যে সুখ সেথা তুচ্ছ স্বরগ—
তুচ্ছ সে সুধা রাশি,
বুক ভরা প্রেম আদর সোহাগ—
অধরে মধুর হাসি।
এই নদীকূলে বেতস কুঞ্জে
তার সনে 'অভিসার'
কণ্ঠে তাহার পরায়েছি মোর—
সঞ্চিত ফুলহার।

(৪)

একদিন এই মধু যামিনীতে—
তটিনীর এই কূলে।
চরি ফুল নিয়ে মালা—
গাঁথিতেছি মন খুলে।

জানি না কখন এসেছে সে মোর
পরাণের প্রিয় বঁধু।
দূর নীপ মূলে অনিমেষে আছে
মোর পানে চেয়ে শুধু।
কাননে কাননে জেগে উঠে' পাখী—
গেয়ে গেল মুখে গান।
সে সুর লহরী এনে দিল মোর
হারানো হৃদয় খান।
সহসা তাহারে হেরিয়া চকিতে
উঠিতে চাহিনু ত্বরা।
ছিঁড়ে গেল মোর সাধের মালাটি
প্রাণ দিয়ে ছিল গড়া।
অভিমানে মালা দূর করে দিনু
নদী জলে যাক্ ভাসি।
দেখিনু তাহার চরণে পড়েছে
ছিন্ন সে ফুল রাশি।

(৫)

দূর হয়ে গেল সরম কুণ্ঠা
হৃদয়ের অভিমান।
মরমে মরমে জাগিয়া উঠিল
কি এক সুখের তান।
সে সুখ আবেশে তখনও দাঁড়ায়ে
আমি এই নদী কূলে।
দেখিনু সে সেথা দুহাতে হিয়ায়
ফুলগুলি নিল তুলে।

পরে চলে গেল ধীরে ধীরে ধীরে
মুখে নাহি কোনও ভাষ।
প্রেমে ঢল ঢল পদ চঞ্চল
অধরে অমিয় হাস
চাহিয়া রহিনু তার পথ পানে
যতদূর যায় দেখা।
এখন সে ছবি স্মরণে অতুল
মরমে রয়েছে লেখা।
ছুটে গেনু পরে ওই নীপ মূলে
ওই তার পদ ধূলি।
আপন বক্ষে ধরিনু কুড়ায়ে
ছিন্ন কুসুম গুলি।
অঞ্চলে বাঁধি লয়ে আসি ঘরে
রাখি দিনু সযতনে।
এখনও তাহার পূজি প্রতিদিন
আপনার এক মনে।
আজি সেই মধু রজনীর চাঁদ
এই সেই নীপ মূল।
সেই আছে তার পূত পদরজ
তার নেয়া ছেঁড়া ফুল।
সংসারে দুঃখ বহিতে কেবলি
সেই ত রয়েছি আমি।
নাহি শুধু মোর ইহপরকাল
হিয়ার দেবতা স্বামী—

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ

যুদ্ধশেষে ভারতের আর্থিক অবস্থা

যে মহাসমরাগ্নি পৃথিবীতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহাতে যে কেবল অসংখ্য মনুষ্যজীবনই আহুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে। ইহাতে পৃথিবীর বহু সম্পদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধারায় এক মহা বিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। ফলস্বরূপ ইহাতে সমস্ত পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব্ব অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে ব্যাপৃত দেশকে যুদ্ধের খরচের জন্য প্রভূত অর্থ যোগাইতে হইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সুবিধার জন্য এই অর্থ উৎপাদনের উপায়ের অনেক স্থলে আইন দ্বারাও সঙ্কোচ সাধন করিতে হইয়াছে। এই সুবিধার

জন্ম আরও নানা প্রকারের ব্যবস্থার দরকার হইয়াছে যাহাতে পৃথিবীর যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ অনেক দরিদ্র শ্রেণীর লোক ধনবান হইয়া উঠিতেছেন এবং অনেক ধনবান দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় অবলম্বী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় কমিয়া গিয়াছে, আবার বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আর এক শ্রেণীর আয় অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতেও এই প্রকার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রকার এবং ফলাফলের বিষয় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক হইয়াছে।

সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সাধারণকে সমরঋণ, ট্রেজারি বিল, যুদ্ধফণ্ডে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি নানাপ্রকারে এই অর্থ সরবরাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এ সময় সকলেরই সাধ্যানুসারে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা দরকার, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা কিরূপ এবং যে অর্থ দেশে আছে তাহা কোন শ্রেণীর নিকট কিভাবে আছে তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে না পারিলে কোথা হইতে কিভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার সফলতা হইতে পারে তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ এবং আরও কেহ কেহ বলিতেছেন ভারত বর্ত্তমানে অতিশয় ধনশালী। ভারতের এরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা আর কোনদিন হয় নাই। সুতরাং চেষ্টা করিলে প্রভূত অর্থ এখানে সংগ্রহ করা যাইবে। অনেক ভারতবাসী বলিতেছেন ভারতের আর্থিক অবস্থা যুদ্ধের জন্য এরূপ সঙ্কটময় হইয়া পড়িয়াছে যে যুদ্ধের জন্য বর্দ্ধিত মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিয়া তাহার অধিবাসীগণের জীবনধারণই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর সমরঋণ একটা বিশেষ গুরুতর সমস্যা। বাস্তবিক আমরা দেখিতেছি কৃষকের ঘরে টাকা নাই। আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, জমীদার, কারবারী, মহাজন প্রভৃতি সকলেরই আয় কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির মূল্য এরূপভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাঁহাদের আর কোনক্রমেই চলিতেছে না। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের ন্যায় বিপরীতমুখীন এই দুই মতের পরিপোষণকারিগণের মধ্যে কাহারই কথা একবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। দুই মতের ভিতরই সত্য আছে, সুতরাং কিপ্রকারে ইহার সামঞ্জস্য বিধান হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে এই দুই মতেরই মূল তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হয়।

দেশের অর্থ ব্যবসা বাণিজ্যে খাটে। বহির্বাণিজ্যের উপর দেশের আর্থিক অবস্থা অনেক পরিমাণ নির্ভর করে। ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বুঝিতে হইলে উহার আমদানি রপ্তানির অবস্থা প্রথমে বুঝিতে হয়। এই আমদানি রপ্তানির কথা বলিবার পূর্ব্বে এবিষয়ে আমাদের অর্থের আদান প্রদানের ব্যবস্থার কথা কিছু বলিয়া লইতে হয়। বিদেশে আমরা যে জিনিস পাঠাই এবং আমরা বিদেশ হইতে যে জিনিসের আমদানি করি বিদেশী ক্রেতা কিম্বা বিক্রেতার সহিত হাতে হাতে যে উহার মূল্যের আদান প্রদান চলে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এজন্য ব্যবস্থা আছে আমাদের সমস্ত বিদেশী বাণিজ্যেরই হিসাবপত্র লণ্ডন নগরে মিটমাট হইবে। অর্থাৎ সমস্ত বিলের টাকা আমরা ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ের হারে পাইয়া থাকি। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্ত বিল ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয়ের হাত দিয়া আদায় হইয়া থাকে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বিদেশী খরিদ্দারগণ ইচ্ছা করিলে এজন্য ইংলণ্ডীয় মুদ্রা 'সভারেন' জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া তাঁহাদের যাবতীয় দেনা শোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই ইংলণ্ড আইন করিয়া ঐ দেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রা বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের বিদেশী খরিদ্দারের নিকট হইতে টাকা আদায়ের একমাত্র উপায় ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয়ের হাত দিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর হুণ্ডি। এই হুণ্ডিকেই কাউন্সিল ড্রাফ্ট (Council draft) বলে।

বিদেশ হইতেও ভারতবর্ষে দ্রব্যের আমদানি হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতের নিকটেও বিদেশী ক্রেতার দ্রব্যের মূল্য পাওনা হইয়া থাকে। এই পাওনার বিল হইতে আমাদের অনেক বিল মিটিয়া যায়। কিন্তু আমাদের আমদানির মূল্য হইতে রপ্তানির মূল্য বরাবরই বেশী। সুতরাং এরূপ কাটাকাটি হইয়াও ইংলণ্ডের নিকট আমাদের টাকা পাওনা থাকে।

ঐ পাংলা কাউন্সিলড্রাফট্ দ্বারা আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আদায় করিয়া থাকি। এইরূপ ভারতগবর্ণমেণ্ট যে টাকা দেন উহা তাহাদের ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পাওনা দাড়ায়। ঐ পাওনায় অনেক অংশ "এক্সচেঞ্জ" প্রভৃতি নানা কারণে কাটা যায় এবং কতক অংশ দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটারি মহাশয় ভারতগবর্ণমেণ্টের জন্য রৌপ্য খরিদ করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন আইন মতে ইংলণ্ডে আমাদের নানা কারণে—"স্বর্ণ রিজার্ভ" রাখিতে হয়। ঐ সকল টাকা এবং এই সকল দেনা পাওনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিবার সুবিধা হইবে না।

কিন্তু বরাবরই আমাদের বিদেশী বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাহা পাওনা হয় তাহাতে আমাদের নানা প্রকারের সমস্ত বিদেশী দেনা পরিশোধ হয় না। এজন্য ভারত বরাবরই অধমর্ণ দেশ বলিয়া পরিগণিত। এ বিষয়ে ইংলণ্ডই আমাদের উত্তমর্ণ ছিল কিন্তু যুদ্ধ উপলক্ষে আমরা হঠাৎ উত্তমর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতেই দেখা যাইতেছে আমাদের রপ্তানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং আমদানি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ১০ কোটী টাকার বিদেশী মাল এদেশে আসিয়াছিল, কিন্তু ঐ মাসে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ১৯ কোটী টাকায় উঠিয়াছিল। উহার পূর্ব্ব মাসের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে জুন মাসে মে মাস হইতে শতকরা ৮ ভাগ আমদানি কমিয়া গেলেও শতকরা ২ ভাগ রপ্তানি বাড়িয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সহিত তুলনায় দেখা যায় ঐ বৎসরের জুন হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমদানি শতকরা ১১ভাগ কমিয়াছিল, কিন্তু রপ্তানি শতকরা ১১ ভাগ বাড়িয়াছিল। ১৯১৬ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসের আমদানি ও রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমদানি হইতে রপ্তানি মালের মূল্য ১৫ কোটী টাকার অধিক ছিল, কিন্তু ১৯১৭তে উহা ২৬ কোটীতে উঠিয়াছিল! সুতরাং দেখা যাইতেছে যুদ্ধের জন্য আমদানি কমিয়া যাইতেছে ও রপ্তানি বাড়িতেছে। পূর্ব্বে আমরা যাহা রপ্তানি করিতাম তাহাতে আমাদের বিদেশী দেনা শোধ না হওয়ায় আমরা দেনদার ছিলাম কিন্তু আমদানি কমিয়া রপ্তানি বাড়ায় আমরা এখন পাওনাদার হইয়া পড়িয়াছি। মোটামুটী ব্যাপারটা এই দাঁড়াইয়াছে যে আমরা বিদেশ হইতে যে টাকা পাইতেছি বিদেশ সে পরিমাণ টাকা আমাদের নিকট লইতে পারিতেছেনা বলিয়া দেশে টাকা জমিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই টাকা কাউন্সিল ড্রাফট্ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা পাইতেছি। কিন্তু আমদানি রপ্তানি কতক পরিমাণ সমান থাকিয়া অনেক দেনা পাওনা কাটাকাটি না হইলে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া এত টাকার হুণ্ডি পরিশোধ করিবেন। ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা পাইবার উপায় নাই। রূপার বাজার পৃথিবীতে অতিশয় চড়া। এ বাজারে বর্দ্ধিত মূল্যে রূপা কিনিয়া পাঠাইলে টাকায় দাম ভয়ানক চড়িয়া বিদেশী একস্‌চেঞ্জে অতিশয় গোলমাল উপস্থিত হইবে। আবার গবর্ণমেণ্টের তহবিলও সীমাহীন নহে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এত টাকা কোথা হইতে দিবেন? ফলতঃ ষ্টেট্ সেক্রেটারি মহাশয়ও যত ইচ্ছা কাউন্সিল ড্রাফ্‌ট (council draft) বাহির করিতে পারেন না। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে পরিমাণ কাউন্সিল ড্রাফ্‌ট্ ভারত গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে পরিশোধ করিতে পারিতেছেন সেই পরিমাণ ড্রাফ্‌টই তিনি বাহির করিতেছেন। এই ড্রাফ্‌ট পরিশোধ ভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডের তরফ হইতে ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, মেসপোটামিয়া প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধের খরচ যোগাইতে হইতেছিল। ইংলণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং মিত্ররাজ্য সমূহে পাট, গম, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য এদেশ হইতে পাঠাইবার জন্য অর্থ সরবরাহ করিতে হইতেছে। পূর্ব্ব আফ্রিকা ও পারস্যে টাকার কাজ চালাইতে হইতেছে। সিলন এবং মরিসসে টাকা পাঠাইতে হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের সৈনিক বিভাগের খরচও খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইংলণ্ডের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে খরচ করিতেছেন, তাহা ইংলণ্ডের নামে খরচ লেখা হইতেছে, কিন্তু পরস্পর খরচ লেখা লেখি হইয়া আমাদের অনেক টাকা ইংলণ্ডের নিকট পাওনা দাঁড়াইতেছে। এই টাকা নানা কারণে আমাদের ইংলণ্ডস্থিত রিজার্ভ ফণ্ডে জমিতেছে। ভারতের এই টাকা স্বর্ণে রিজার্ভ থাকার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ষ্টেট্ সেক্রেটারি মহাশয় উহার অধিকাংশ ইংলণ্ডের ট্রেজারি বিলে (Treasury Bills) শতকরা বার্ষিক ২টাকা সুদে খাটাইতেছেন। আমরা শুনিতে পাইতেছি ইংলণ্ডের

ট্রেজারি বিল স্বর্ণ হইতে কম মূল্যবান নহে, সুতরাং রিজার্ভ স্বর্ণে না রাখিয়া ট্রেজারি বিলে রাখায় ভারতের কোন চিন্তার কারণ নাই। কার্য্যতঃ আমাদের যে পাওনা টাকা ইংলণ্ডে পড়িয়া আছে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শতকরা ২৲ হিসাবে সুদ দিয়া ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের উহা এখন পাইবার উপায় নাই, কারণ ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রা কিম্বা স্বর্ণ ঐ দেশ হইতে এখন বাহিরে যাইতে পারে না ভারতগবর্ণমেণ্টেরও এত টাকা নাই যে ষ্টেট্ সেক্রেটারি মহাশয় হুণ্ডি দ্বারা উহা পরিশোধ করিতে পারেন। এখন ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে ভারতের খরচ চালাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক নূতন ধাতুর এবং কাগজের মুদ্রা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং রূপার আমদানির সুবিধার জন্য আমেরিকার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের মুদ্রার অবস্থা স্বচ্ছল করিয়া দিবার নিমিত্ত ২৫ কোটি রৌপ্য ডলার (প্রায় ১০০ শত কোটী টাকা) এ দেশে পাঠাইয়াছেন। (বলা বাহুল্য ভারতীয় রপ্তানি মালে এ দেনা শোধ হইবে)। এই রৌপ্যের রিজার্ভ পশ্চাতে রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট আরও অনেক কাগজের মুদ্রা বাহির করিতে পারিবেন। এদেশে যে পরিমাণ ধাতব মুদ্রার রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা ছিল, আইন দ্বারা সে ব্যবস্থারও কিছু শিথিল করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর করিবার উপায় করিয়াছেন। ফলতঃ নানা উপায়ে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা বাড়াইয়া খরচ চালাইতেছেন। আমদানির পরিমাণ কম থাকায় এই টাকা বিদেশী বাণিজ্যের দেনা পাওনার হিসাবের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আর গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিতেছে না। রপ্তানির মূল্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইতেছে অনেক, কিন্তু আমদানির মূল্যের জন্য উহার সামান্যই ফিরিয়া আসিতেছে। সুতরাং বাকি টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে না আসিয়া দেশে দেশে আটক রহিয়াছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইবে। ব্যাপারটা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে গবর্ণমেণ্ট যেন কোন রেলওয়ে লাইনের সর্ব্বপ্রধান ষ্টেসন। লাইনের গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা এবং আফিস প্রভৃতি সমস্তই এই ষ্টেসনেই অবস্থিত এবং এখান হইতেই সমস্ত গাড়ী ছাড়িতেছে ও যথানিয়মে উহা ফিরিয়া আসিতেছে। আবার ঐ সকল গাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে ও ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ষ্টেসন হইতে যে সকল গাড়ী একবার ছাড়িতেছে তাহাদের অনেকাংশ আর ফিরিয়া আসিতেছে না। সুতরাং কারখানায় নূতন গাড়ী প্রস্তুত করিয়া তবে যাত্রী ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। এইরূপ ব্যাপার বরাবর চলা সম্ভবপর নয়। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে এই সকল গাড়ী গুলিকে আবার ফিরাইয়া আনিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে সমর ঋণই এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এবং সাধারণকে এই ঋণ প্রচুর পরিমাণে দিতে আহ্বান করিতেছেন। যাহারা বলিতেছেন ভারতের আর্থিক অবস্থা এখন অতিশয় ভাল, এবং সমর ঋণ দিতে ভারতবাসী বর্ত্তমানে যেরূপ সক্ষম এরূপ সক্ষমতা তাঁহাদের কোন দিনই ছিল না, তাঁহাদের যুক্তির ভিত্তি কি, আশা করি এতক্ষণে পাঠক তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

একটু অবান্তর হইলেও যুদ্ধঋণের বিষয়ে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। যুদ্ধের জন্য অনেক খরচ ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের তরফে করিতে হইতেছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি কিন্তু ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে ইংলণ্ডকে ১৫০ শত কোটী টাকা নগদ সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। সমর ঋণের টাকা হইতেই এই টাকার সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার কতক টাকা গত বৎসরের সমর ঋণের টাকা হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিশোধ করা হইয়াছে। বাকি টাকা এখনও আমরা দিতে পারি নাই। ঐ টাকা ইংলণ্ডকে অন্যত্র ধার করিয়া লইতে বলা হইয়াছে এবং ভারত শতকরা ৫৲ হারে উহার উপর সুদ দিতেছেন, টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বাকি টাকার উপর ঐ হারে সুদ চলিবে। সুতরাং এই সুদ না টানিয়া তাড়াতাড়ি টাকাটা পরিশোধ করিয়া দেওয়াই আমাদের পক্ষে সুবিধা জনক। এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা হাস্যজনক এবং একটু রহস্যজনক বলিয়াও বোধ হয়। ভারতের যে টাকা ইংলণ্ডে পড়িয়া আছে তাহা ব্রিটিশ-ট্রেজারি বিলে খাটাইয়া আমরা শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হিসাবে সুদ পাইতেছি, কিন্তু পাওনাদার হইয়াও আমরা দেনার জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ হিসাবে সুদ দিতেছি।

ইহাতে ভারতের যথেষ্ট লোকসান হইতেছে। এরূপ ব্যবস্থার রহস্য বুঝিতে পারা যায় না।

এইত গেল এক পক্ষের কথা। আর এক পক্ষ বলিতেছেন কাঁচা মালই আমাদের প্রধান সম্পদ। উহার মূল্যের উপরই আমাদের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় নানা কারণে আমাদের পাট, ধান, চামড়া এবং অন্যান্য শস্য ও আরও নানা প্রকারের কাঁচা মালের দাম কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার প্রজা এক পাটেই গত এক বৎসর ২০ কোটী টাকার উপর লোকসান দিয়াছে। ব্রহ্ম দেশের প্রজা ধানে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রজাই অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অতিশয় আর্থিক ক্ষতি এবং কষ্ট অনুভব করিতেছে। প্রজার হাতে এজন্য টাকা নাই। অনেক স্থলে প্রজা-বর্গের অতিশয় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কাঁচা মালের দাম অতিশয় কমিয়া যাওয়ার ফলে প্রজার যে অর্থাভাব ঘটিয়াছে তাহা হইতে মহাজনের আদায় বন্ধ হইয়াছে, আইন ব্যব-সায়ীর অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছে,—জমীদারের খাজনা আদায় হইতেছে না, চিকিৎসকের আয় কমিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব-শ্রেণীর মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের অর্থাভাব হইয়াছে। যাহাদের পল্লিগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে কিম্বা যাহারা ২।১ বৎসরের মধ্যে কিছুদিন পল্লিগ্রামে বাস করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা পল্লিবাসীর অর্থকষ্টের কথা অবগত আছেন। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় কৃষক শ্রেণীর অবস্থা বেশ ভাল হইয়া উঠিতেছিল। বর্ত্তমানে তাহাদের বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের যদি এরূপ অবস্থা তবে ভারতের আর্থিক অবস্থা কিসে অতিশয় ভাল হইল? আর এ অবস্থায় লোক সমর ঋণ দিবে কি করিয়া? সুতরাং যাহারা ভারতের আর্থিক অবস্থা যুদ্ধের জন্য খারাপ হইয়াছে বলিতেছেন, তাঁহাদের কথাও উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কারণ যাহা সকলেই চক্ষে দেখিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় কিরূপে?

তবে ভারতে যে অতিরিক্ত অর্থ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে জমিবার কথা তাহা গেল কোথায়? এই অর্থত দেশ ছাড়িয়া যায় নাই! একথা বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে এই আমদানি রপ্তানি সম্পর্কে কয়েকটী বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমত আমরা দেখিতে পাইতেছি, কাঁচা মালের রপ্তানি খুব বেশী বাড়ে নাই। যুদ্ধের জন্য যে সব কাঁচা মালের বিশেষ দরকার এবং গম প্রভৃতি শস্যের রপ্তানিই বাড়িয়াছে। আর বাড়িয়াছে যুদ্ধ ঘটিত—কিম্বা যুদ্ধে আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জামের রপ্তানি। কেবল গম ভিন্ন সাধারণ কৃষি উৎপন্ন কোন দ্রব্যের রপ্তানি বিশেষভাবে বাড়ে নাই। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যবহার জন্য গমের রপ্তানি-জনিত অতিরিক্ত মূল্যের সুবিধা কৃষক পায় নাই। সুতরাং যুদ্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যই রপ্তানির তালিকার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল দ্রব্যের রপ্তানির সহিত সাধারণ প্রজার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। পাটের কলগুলি প্রভূত পরিমাণে চট অতিশয় উচ্চমূল্যে বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। 'চা'করগণ চড়াদামে বিদেশী বাজারে 'চা' বিক্রয় করিতেছে। যুদ্ধঘটিত অন্যান্য অশেষ প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অনেকে গভর্ণমেণ্টের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। এই সকল কার্য্যগুলিই বিশেষ কয়েকটী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে এবং প্রভূত অর্থ ঐ যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারিগণের হাতে যাইয়া পড়িতেছে। অবশ্য পারিশ্রমিক এবং শিল্পির বেতনের আকারে এই অর্থের কিয়ৎপরিমাণ দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উহা সর্ব্বসাধারণের হাত পর্য্যন্ত পৌছিতেছে না। বড় বড় সহরের বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই উহা এখনও সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ফলতঃ যাহারা যুদ্ধঘটিত যে কোন প্রকারের অর্ডার যোগাইতেছে তাহাদের প্রচুর লাভ হইতেছে এবং তাহাদের হাতে ঐ লাভের টাকা জমিয়া যাইতেছে। দেশের এই অতিরিক্ত অর্থ এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের হাতে থাকিয়া যাইতেছে, সাধারণ প্রজার হাতে যাইতেছে না। পরন্তু প্রজা সাধারণ তাহাদের কাঁচা মালের উপর যে ভয়ানক লোকসান দিতেছে তাহা হইতেই অপর শ্রেণীর অতিশয় লাভের কারণ দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের পাটের লোকসান হইতে পাটের কল ওয়ালাগণ চট বেচিয়া কি প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছে তাহা গবর্ণমেণ্টের রিটার্ণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল কলিকাতার পাটের কল গুলিই গত ৩ বৎসর প্রায় ২৩ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে। দেশীয় এবং বিদেশীয় অংশীদারগণের হাতে এই টাকা এখন জমা রহিয়াছে। এ বৎসরও এই হিসাবে লাভ হইবে আশা করা যাইতেছে।

অনেক দ্রব্যের বেলায়ই এইরূপ ঘটিতেছে। কার্য্যত যুদ্ধের জন্য এক শ্রেণীর কতকগুলি লোক অতিশয় ধনী হইয়া উঠিতেছে এবং সাধারণ প্রজা ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে অতিরিক্ত টাকা জমিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা সাধারণের হাতে আসে নাই। এজন্য এখনও মুদ্রা বাহুল্য (Inflation of Currency) ঘটিয়া দেশে সাধারণ খাদ্য ও অনেক ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ এই অর্থ দেশে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন যদি এই অর্থে শিল্প ও কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে না বাড়ান যায় তাহা হইলে দেশে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় যাহাদের হাতে এই অর্থ জমিয়াছে সমরঋণ দ্বারা তাহাদের হাত হইতে উহা বাহির করিয়া গবর্ণমেন্টের হাতে আনা দরকার। যুদ্ধের জন্য যখন অনেক অর্থের দরকার তখন এই টাকা গবর্ণমেন্টের হাতে খরচ হইয়া আবার ইহাদের হাতেই আসিবে এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত এইভাবেই এই অর্থের সঞ্চালন (circulation) চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত রেলগাড়ী গুলি এইরূপে প্রধান ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া আবার যাত্রি ও মাল লইয়া রওনা হইতে থাকিবে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমরঋণের যোগাড় করিতে হইবে। সাধারণে যে বেশী টাকা দিতে পারিবে উপরোক্ত কারণে তাহা মনে হয় না। এই যুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় অনেক ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন এবং অনেক দরিদ্র ধনী হইয়াছেন। যুদ্ধের সুবিধা পাইয়া যাহারা ধনী হইয়া উঠিয়াছেন যুদ্ধের নিকটই তাহারা তাহাদের এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য ঋণী, সুতরাং সমরঋণও তাহাদিগেরই দিতে হইবে ইহাতে তাহাদের লোকসানেরও কারণ নাই, বরং ইহাতে অন্য প্রকারে তাহাদের বিশেষ লাভই হইবে। ঠিক নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিতে গেলে যুদ্ধের সমস্ত খরচ ইহাদেরই বহন করা কর্ত্তব্য। কারণ যুদ্ধ দ্বারা ইহারাই উপকৃত হইতেছেন। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য ইহাদের উপর বিশেষ কর বসা উচিত। কিন্তু দেশে সুপার ট্যাক্স বসিলেও যুদ্ধ-কর বসে নাই *। কাজেই এই শ্রেণীর লোককে তাহাদের যুদ্ধের লাভের জন্য কোন বিশেষ ট্যাক্স দিতে হইতেছে না। সুপার ট্যাক্স সকলেরই জন্য, উহা বিশেষভাবে যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত লাভের ট্যাক্স নহে। ইহারা যখন এই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তখন তাহাদের অতিরিক্ত অর্থ সমরঋণে প্রয়োগ করিতে তাহারা ন্যায়ত বাধ্য আর গবর্ণমেণ্টকেও এই ঋণের জন্য এই শ্রেণীর উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এরূপ অর্থাভাব ঘটিয়াছে যে তাহাদের নিকট বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

আর একটি কথা বলিলেই এই বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ হয়। পূর্ব্বে যে আমদানি রপ্তানির কথা বলিয়াছি অর্থাৎ আমদানী হইতে আমাদের রপ্তানি ক্রমেই বাড়িতেছে দেখাইয়াছি, উহা যুদ্ধ আরম্ভ হইতে গত বৎসর পর্য্যন্তের কথা। এ বৎসর আবার আমরা পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছি অর্থাৎ আমরা অধমর্ণ রাজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। গত এপ্রিল মাসের ভারতীয় বাণিজ্যের রিটার্ণে দেখা যাইতেছে যে ঐ মাসে চৌদ্দ কোটি টাকার বিদেশী মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল এবং ষোল কোটী টাকার ভারতীয় মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের আমদানী রপ্তানীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে আমদানী শতকরা ২৪ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু রপ্তানী শতকরা ৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের সহিত তুলনা করিলেও দেখা যায়—মার্চ্চ হইতে এপ্রিলে আমদানী শতকরা সাতাইশ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু রপ্তানী শতকরা তেইশ ভাগ কমিয়া গিয়াছে সুতরাং ভারত রপ্তানীর বৃদ্ধির জন্য যে ধন সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং এই হিসাবে চলিলে সত্বরই আমদানী রপ্তানী পূর্ব্বাবস্থায় আসিবে ও ভারতবর্ষ আবার পূর্ব্বের ন্যায় অধমর্ণ দেশ হইয়া পড়িবে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে শ্রেণীর নিকট রপ্তানী বাহুল্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ জমিয়াছে তাহাদের সাম্রাজ্যের আবশ্যকতার সময় ঐ অর্থের যথেষ্ট অংশ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংলণ্ডকে ভারত যে দেড় শত কোটী টাকা সাহায্য করিয়াছে উহার সমস্ত দিতে না পারায় বাকী টাকার জন্য

* বর্ত্তমানে এই প্রকারের কর (Excess profit tax) চাহিবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত করিয়াছেন।

ভারতকে বার্ষিক পাঁচ টাকা হারে সুদ দিতে হইতেছে। এই দেড় শত কোটীর মধ্যে প্রায় ৫২ কোটী আন্দাজে গত বৎসরের সমর ঋণে উঠিয়াছিল ; বাকী ৯৮ কোটী টাকা কোনরূপে এই বৎসর সংগ্রহ করিয়া দিয়া সুদের জন্য ভারতের লোক্‌সানটা নিবারণ করা উচিত। এদেশে ঋণের টাকাটা সংগ্রহ হইয়া গেলে এদেশেই সুদের টাকাটা থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সুদের জন্য প্রভূত টাকা ইংলণ্ডকে দিতে হইতেছে। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমান সমরঋণও যাহাতে এদেশেই সত্বর সংগৃহীত হইয়া যায় সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা ইংলণ্ডের কি অপর দেশের লোকে যদি এই ঋণের কাগজ ক্রয় করে তবে উহার সুদ ঐ সকল দেশে চলিয়া যাইয়া দেশের ক্ষতি করিবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশের সর্ব্বসাধারণের হাতে টাকা নাই। সুতরাং যথেষ্ট ইচ্ছা থাকিলেও সাধারণে প্রচুর পরিমাণে এই ঋণ দিতে পারিবে না। ইহাও দেখাইয়াছি যে অপর এক শ্রেণীর লোকের নিকট প্রচুর অর্থ সংগৃহিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্যই এই শ্রেণীর লোক এরূপ হঠাৎ ধনবান হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং যুদ্ধের খরচ ন্যায়ত তাহাদেরই বহন করা উচিত।—পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে ইহাদের উপর কর বসাইয়া এই টাকা সংগৃহিত হইতে পারিত এবং সেই করেও না কুলাইলে সমরঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইত। কিন্তু তাহা যখন করা হয় নাই, তখন সমরঋণের অধিকাংশ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণেরই প্রদান করা কর্ত্তব্য। একথা গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত এবং ইহাদের দায়িত্ব জ্ঞান জাগ্রত করিবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা দরকার। এই শ্রেণীর লোক কিরূপ অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় কেবল পাটের কল গুলিরই গত তিন বৎসরের লাভের কথা বলিয়াছি। ইচ্ছা করিলে এই পাটের কল গুলির অংশীদারগণই প্রচুর পরিমাণে সমরঋণ গবর্ণমেণ্টকে দিতে পারেন। সাধারণ প্রজা এবং যুদ্ধের জন্য রিক্তহস্ত ভদ্র লোকের নিকট সমরঋণ সংগ্রহে যে চেষ্টা এবং পরিশ্রমের দরকার হইবে তদনুপাতে ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। এ চেষ্টা এবং পরিশ্রম উপযুক্ত স্থলে প্রযুক্ত হইলে অনেক অধিক পরিমাণে ফল পাওয়া যাইবে। ভারত বর্ত্তমানে ধনী বটে, কিন্তু এ ধন সাধারণের মধ্যে ছড়াইতে পারে নাই। বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের হাতে জমা আছে। যুদ্ধই ভারতের এই অসমান অর্থ বিভাগের কারণ। সুতরাং "এক ডিম্বে শত হংস জনমের প্রায়। যুদ্ধ ঋণে অর্থ দাও বাড়িবে নিশ্চয়"—প্রভৃতি কেরাণী কবিগণের কবিতা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করিলেও যাহাদের উদ্দেশ্যে উহা লিখিত হইতেছে তাহারা ইচ্ছা সত্বেও কতদূর এই উপদেশ মানিয়া চলিতে পারিবে জানি না।

নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটী এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(১) গত যুদ্ধে আমদানী কমিয়া ও রপ্তানী বাড়িয়া ভারতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২) বিদেশী দেনা পাওনা সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট পরিমাণ নূতন মুদ্রার সৃষ্টিই বর্ত্তমানে ইহার প্রধান কারণ।

(৩) কিন্তু ভারতের কাঁচা মালের দাম কমিয়া যাওয়ায় সাধারণ প্রজা এবং আইন ব্যবসায়ী প্রভৃতি ভদ্র শ্রেণীর অর্থাভাব ঘটিয়াছে।

(৪) ভারতের এই বর্দ্ধিত অর্থ বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়াছে।

(৫) সমর ঋণের টাকা যত সত্বর সম্ভব সংগৃহীত হওয়া উচিত। বিলম্বে ভারতবর্ষের লোকসান।

(৬) উপরোক্ত লাভবান শ্রেণীর নিকট সমরঋণ সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষভাবে করা উচিত।

(৭) এই শ্রেণীর ন্যায়ত যুদ্ধের খরচ সরবরাহ করিতে বাধ্য, কারণ যুদ্ধই ইহাদের এই প্রভূত ধনাগমের কারণ।

(৮) সর্ব্বসাধারণে ইচ্ছাসত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে সমরঋণ দিতে পারিবে না।

(৯) আমদানীর হ্রাস এবং রপ্তানীর বৃদ্ধিতে ভারতের আর্থিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ভারত অধমর্ণের স্থলে উত্তমর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে অবস্থার আবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এখন ক্রমশঃ পূর্ব্বাবস্থা আসিয়া পড়িতেছে।

(১০) দেশের এই অতিরিক্ত অর্থ এখনও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে নাই। এইজন্য মুদ্রা বাহুল্য (Inflation) ঘটিয়া খাদ্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ে নাই। কিন্তু ক্রমশঃ এই অর্থ অধিকতর পরিমাণে শিল্প ও কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনে প্রযুক্ত না হইলে দেশে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

অচিন প্রিয়

কে ওগো আমার প্রাণে
রঞ্জন রাগে
নানারূপে জাগে ?
কে নিতি আমার পাশে
সঙ্গীতে ভেসে আসে—
হিল্লোলে মধুমাসে
পরশন মাগে ?

কোনজন ফলফুলে
অমিয় বদন তুলে
মঞ্জুল-বঞ্জুলে
প্রাণ দিয়া চাহে ?
কে মোরে আকাশ-বুকে
আহ্বানে মধু মুখে
বিলা'তে বিরাম-সুখে
সুধা অবগাহে ?

কার যাদু মৃদু বোলে
ঘুমাই স্বপন-দোলে ?—
পরশনে আঁখি খোলে
নব অনুরাগে !

কে সেই অচিন-প্রিয়
অস্ফুট বরণীয়
ইহ-পর আত্মীয়
মোরে ল'য়ে জাগে
অহেতু সোহাগে ?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কোন্ পথে

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৬)

পর দিন বৈকালে ঝি একটু সকাল করিয়া আসিল।—সে দিনকার কাজকর্ম্ম সব তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া উপরে গেল।

স্বর্ণময়ী স্চ সুতা লইয়া ছোট ছেলেমেয়েদের কতকগুলি পুরাণ জামা মেরামত করিতেছিলেন। বিজলী ঘরের এক ধারে দেওয়ালের কাছে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একখানা খাতায় কি আকিবুকি কাটিতেছিল। ঝি বলিল, "চল না দিদিমণি, বেলা পড়েছে, ছাদে বেশ হাওয়াতে বসে তোমার চুলটা বেঁধে দিইগে"।

বিজলী খাতা পেন্সিল ফেলিয়া রাখিয়া মার মুখের দিকে চাহিল। মা কহিলেন, "তা বেশ 'ত, যা না, চুল বাঁধা হ'লে অমনি কাপড়গুলো দুজনে তুলে নিয়ে আসিস"।

ছাদে গিয়াই বিজলী রাস্তার ওপারে সেই বাড়ীর ছাদের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, চোক ফিরাইয়া নিল। মুখখানি ভরিয়া লজ্জায় ঈষৎ কালিমা ফুটিয়া উঠিল।

ঝি একটু হাসিল; কহিল,—"ছাদে ত কেহ নেই; শুধুই এত লজ্জা! ভাল বাসলে এমনিই হয় বটে!"

'যা! আমি বুঝি তাই দেখছিলুম ?' 'তবে কি দেখছিলে ?'

"কি দেখবো, এমনিই চোক প'ল ওদিকে"—বলিতে বলিতে বিজলী আর একবার ছাদের দিকে চাহিল। ঝি কহিল, 'চোক বুঝি কেবল ওই দিকেই যায় ?'

'যাও তুমি ভারি দুষ্টু ঝি, এখন চুল বেঁধে দেবে ত দাও না হয়, আমি চ'লে যাই।'

"তা দাঁড়িয়ে ত চুল বাঁধা যায় না। তোমার যে বসতেই মোটে মন নেই।"

"না মন নেই। কি যে বল, মন থাকবে না কেন ?"

"এখন থাক্‌তে পারে, তবে বেলাটা আর একটু গেলে, কে জানে হয়ত থাক্‌বে না।" ঝি আবার তেমনই চটুল চোকে হাসিয়া ওপারের ছাদের দিকে একবার চাহিল।

"যাও আমি চুল বাঁধব না, নীচে যাই চলে।"

বিজলীর হাত টানিয়া ধরিয়া ঝি কহিল, "না দিদিমণি, বসো বসো, দিচ্ছি চুল বেঁধে, ছি মা কি মনে করবেন।"

একধারে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, বিজলী সেই ছায়ায় গিয়া বসিল। ঝি তার চুল খুলিয়া তাহাতে চিরুনী দিতে দিতে বলিল, "সত্যি দিদিমণি বড় চমৎকার চুলগুলি তোমার, পিঠভরা যখন এলিয়ে পড়ে, কি যে সুন্দর দেখায়। চুলের গোছা এমনি এলিয়ে দিয়ে যদি মাথায় একটা রাঙা ফিতে সোজা বেঁধে রাখ, তবে যে চেহারাখানি খোলে, দেখ্‌লে লোকের তাক্‌ লেগে যায়। তাই ক'রে দেব দিদিমণি ?"

"না, মা যদি গাল দেন ?"

"তা মাকে সুধিয়ে আসি না ? রাগ কেন ক'রবেন ?"

"লাল ফিতে যে নেই।"

"তা হ'লে আজ মাকে বল্‌ব, দাদাবাবুকে ব'লে বেশ চওড়া এক গজ লাল রেশমী ফিতে কিনে আনিয়ে দেন। ঐ যে হগ সাহেবের বাজার আছে, কত মেয়েরা ত সেখানে বেড়াতে যায়, তোমায় যদি এক দিন যেতে দেন নিজে দেখে পছন্দ ক'রে কিনে আন্‌তে পার। কেমন সব চওড়া ফিতে আর কত যে খাসা খাসা জিনিষ সেখানে পাওয়া যায়। আর সে কি বাজার, যেন ইন্দ্রপুরী! সন্ধ্যে হলে যখন সব ইলেক্‌ট্রি আলো জেলে দেয়, আর সায়েবদের মেয়েরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে, মনে হয়, সে যেন এ পৃথিবীর যায়গা নয়, একেবারে অপ্সরাদের নন্দন কানন। যাওনি কখনও দিদিমণি ?"

"ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একদিন গিয়েছিলুম—সে বিকালে একটু একটু মনে আছে। বেশ সুন্দর সাজান,—বাজার বলে মনে হয় না।"

"কত বড় বড় মেয়েরাও বেড়াতে যায়। তা বাবু ত তোমাদের কোথাও বেরোতে বড় দেন না ? তা দাদাবাবুরা এক দিন সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে নিয়ে গেলেও পারেন। বল্লে ত আমিও টেরামে করে তোমায় নিয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারি।"

"ওমা! একা তোমার সঙ্গে কি ক'রে যাব ? আমি যে বড় হয়েছি এখন।"

"তা গেলে এমন দোষই বা কি ? আমি ত তোমাদের ঘরের লোকের মতই। কেন আমায় কি পর মনে কর দিদিমণি ?"

"না পর ব'লে নয়। তবে তুমি মেয়ে মানুষ কি না—"

'তা হলুমই বা মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ বলে কি আমরা এমনিই অপদার্থ যে ইচ্ছেমত একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেশুনেও আন্‌তে পারব না! আমাদের এই পোড়া দেশেই মেয়ে মানুষ ব'লে যত ঘেন্না—যেন তাদের মানুষের আত্মা নেই! এই ত মেম সাহেবরা তারাও ত মেয়ে মানুষ বটে কেমন ইচ্ছেমত বেড়ায়, যেখানে খুসী যায়—কেউ কি তাদের কেড়ে নেয় ?"

"তা তাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয় ?"

ঝি উত্তর করিল,—"হয় না সেই ত দুঃখ, কিন্তু কেন হবে না ? তারাও ত মেয়ে মানুষ। আমরাও মেয়ে মানুষ তবে আমাদের নাকি সব খাঁচার পাখীর মত আট্‌কে রেখেছে, তাই সকল সুখে বঞ্চিত হ'য়ে আছি। তবু আমরা ছোট ঘরের মেয়ে চাকরী ক'রে খাই—ইচ্ছে মত চ'লতে ফিরতে পারি,—অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু তোমাদের যে দুর্গতি তা আর বল্‌তে নেই কো। এই যে জীবনের সব চেয়ে বড় সুখ ভালবাসা তাতেও তোমাদের কত বাধা! যতই না একজনকে ভালবাস তার দিকে চোক তুলে চাইবার যো নাই। নিজের মনে মনেই কত লজ্জা পাবে, যেন কত বড় অপরাধই একটা হ'চ্ছে। ঐত মেম সাহেবদের কথা শুনেছি, যার সঙ্গে ভালবাসা হয়, কত তাদের সঙ্গে মেলে মেশে, কত নাচ গান করে কত বেড়ায় কত চিঠি লেখে, কেউ তাতে কিছু বলেনা, আর ব'ল্লেই কি তা শোনে! কারও সঙ্গে ভালবাসা হ'য়েছে, বাপ মা হয় ত অপছন্দ করে বিয়ে দিতে চায় না,—পালিয়ে তার সঙ্গে দূরে কোথাও চলে যায়,—গিয়ে শেষে বিয়ে করে।"

"ওমা, কি সর্ব্বনাশ ? বাপ মা কিছু বলে না ?"

"কি ব'ল্‌বে ? আর ব'ল্‌বেই বা কি ক'রে ? পালিয়ে যখন যায়, টের পেলে ত ব'ল্‌বে।"

"কে বিয়ে দেয় ?"

"কে দেবে ? নিজেরাই ক'রে।

"সে দেশে তাও হয়। শুনেছি, আমাদের দেশেও নাকি বর কনে আপনারা আপনারাই বিয়ে ক'র্ত্তে পারে। আজ কালই দেশের কপাল পুড়েছে,—নইলে সেকালে ছিল বয়েসের কালে ভালবাসাবাসি হলে নিজেরা লুকিয়েও বিয়ে ক'র্ত্ত। এই রকম বিয়েকে নাকি গন্ধর্ব্ব বিয়ে বলে। শকুন্তলার গল্প পড়নি দিদিমণি!"

'হাঁ' পড়েছি, পড়েছি,—তার—"

"তারও ত রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে হয়ে ছিল। বাপ জান্‌ত না, পিশী জান্‌ত না, কেউ আর জান্‌ত না। কেবল দুটি সই ছিল তারাই জান্‌ত। তা এসব মিলন সইয়াই ঘটায় কিনা! আরও কত এমন গল্প আছে। তোমরা ত থিয়েটার দেখ্‌তে যাওনা,—আমি মাঝে মাঝে যাই। নাটকে কত ভাল বাসাবাসির কথা—লুকিয়ে দেখা শুনার কথা, কুঞ্জবনে নায়ক নায়িকার কত মিলনের কথা, নায়িকাকে নিয়ে নায়কের পালিয়ে যাবার কথা কি সুন্দর ক'রেই লিখেছে—আর কি সুন্দর ক'রে দেখায় যেন হুবাহুব সব চোকের সাম্‌নে হ'চ্ছে। যদি দেখ, তাহ'লে বুঝ্‌তে পার। আর সেই যে নায়ক নায়িকা—তারা কি যে সে লোক! সব রাজপুত্তু আর রাজকন্যে—আর না হয় তেম্‌নিধারা বড় বড় ঘরের সব ছেলে মেয়ে! কেবল কি তাই,—গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়েও কত নাটকের নায়িকা আছে, রাজপুত্তুর কি বড় বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গে তাদের কত ভালবাসাবাসি হ'চ্চে। মেয়ে মানুষের খুব রূপ থাক্‌লেই সে নাটকের নায়িকা হ'তে পারে। শকুন্তলা যে বনে মুণির ঘরে বাকল পরে থাক্‌ত, তবু রাজা দুষ্মন্ত তাকে দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠল, কত চোকে চোকে চাউনি—কত লুকিয়ে দেখা শুনা, শেষে ত কাউকে না জানিয়ে বিয়ে ক'রেই ফেল্লে।"

বিজলী কহিল "হাঁ, রাজা তখন তপোবনে ছিলনা,—তবে পিশী ছিল, আরও কত মুনি ঋষিরা ছিল,—তা সত্যি কাউকেও ত কিছু জানালেনা? কেবল সখীরা দুইজনে জান্‌ত,—নিজেরাই গন্ধর্ব্ব বিয়ে ক'ল্লে।"

"তাইত। জানাবে কেন? ভাল বাসাবাসি হলে তখন গন্ধর্ব্ব বিয়েই নায়ক নায়িকারা ক'র্ত্ত। আর জানাতে গেলে ওই বুড়ো পিসী, ওই সব বুড়ো বুড়ো মুনি ঋষি—ওরা কি ভালবাসার মর্ম্ম কেউ বুঝত! হয় ত একটা বাধা বিপত্তি ঘটাত, তাই লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেল্লে। বিয়ে হ'য়ে গেলেত আর কেউ কিছু ব'লতে পারবে না। ওই ত! বাপ এসে যখন শুনিল, অমনি শকুন্তলাকে তারা বরের ঘরে পাঠিয়ে দিল। তবে দুর্ব্বাসা মুনির শাপ ছিল, প্রথমটা কিছু দুঃখ পেতে হয়। তা শেষে ত আবার মিলন হ'ল, কত সুখে দুজনে রইল! শকুন্তলা নাটকখানি বড় খাসা নাটক?"

বিজলী কহিল, "থিয়েটারে বুঝি শকুন্তলা নাটক খুব হয়।"

ঝি উত্তর করিল—"শকুন্তলা হয় আরও কত অমন খাসা খাসা নাটক হয়। তোমরা ত বড় একটা যাওনা,—দেখ্‌বে কি?"

"বাবা পছন্দ করেন না—মারও ওসব বাতিক নেই। অনেক দিন হ'ল একবার প্রতাপাদিত্য দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। আর কোনও নাটক দেখিনি।"

"ওটা ভাল নাটক নয়। নাটকের আসল রস যে ভালবাসাবাসির কথা তা ওর মধ্যে কিছু নাই। কেবল মারামারি কাটাকাটি, কেমন তাই নয়?"

"তা লেগেছিল ত বেশ তখন।"

"সে তখন ভালবাসার মর্ম্ম ত' বোঝ নি—তাই ঐ মারামারি কাটাকাটিই ভাল লেগেছিল?"

"তুমি বুঝি খুব থিয়েটার দেখ ঝি!"

ঝি উত্তর করিল "খুব আর কই দেখি,—এই মাঝে মাঝে যাই। গরীব লোক আমরা পয়সা অত কোথায় পাব? তবে বড্ড ভাল লাগে। এক দিন—বলছি ত তোমায়—ভালবেসেছিলুম, মনের মানুষও পেয়েছিলুম তা সে সুখ পোড়া কপালে ত টিঁকল না। তবু পরের সুখ দেখ্‌লেও মনটায় একটু শান্তি পাই। থিয়েটার ছাড়া কোথায় আর তা দেখ্‌ব দিদিমণি? তাই যখন পারি যাই। কত যে ভাল লাগে ইচ্ছে ক'রে রাতদিন ব'সে দেখি"

ঝি বড় গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িল। বিজলিও একটি নিশ্বাস ছাড়িল। ঝির জন্য তার বড় দুঃখ হইতেছিল। একটু পরেই ঝি আবার কহিল "তা—একদিন থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে দিদিমণি?"

"বাবা কি আর যেতে দেবেন? কার সাথেই বা যাব?"

ঝি কহিল, "যেতে ত আমার সঙ্গেও পার। আমি কত যাই, সব জানি শুনি, বেশ তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারি।"

"তা বাবা যেতে দেবেন না। তবে বল্লে দাদারা কেউ নিয়ে যেতে পারে।"

ঝি কহিল, "আগে আমি ওই শ্যামবাজারে এক বাড়ীতে বাস কত্তুম, সে বাড়ীতে মেয়েদের খুব থিয়েটারের বাঁই ছিল। কত দিন লুকিয়ে তারা আমার সঙ্গে থিয়েটারে গেছে।"

"ওমা! বাড়ীর পুরুষরা গাল দেয় নি?"

"সে এমন একটা চালাকী টালাকী করে যেত যে কেও টের পায় নি। টের যেদিন পেত, গাল দিত বই কি? তা তখন আর গাল দিয়ে কর্‌বে কি?"

ঝি একটু হাসিয়া উঠিল। আবার কহিল, "ইচ্ছে যদি তেমন হয়, কেনা কি কত্তে পারে? এই ধরনা, তুমিই যদি যেতে চাও, একটা ফন্দি সন্দি ক'রে কি তোমাকেই আমি নিয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারি না? খুব পারি।"

বিজলী একটু শিহরিয়া কহিল "ও বাবা? সে আমি পার্‌বনা। বড্ড ভয় করে।"

"ওমা, তা ত কর্‌বেই। কখনও ত এমন বেরোওনি কোথাও? তবে ভরসা ক'রে দুই একদিন গেলে শেষে আর ভয় করে না। তা ওঠ এখন, চুল বাঁধা হ'ল কাপড় টাপর গুলো তুলে নিয়ে নীচে যাই।"

আঁচলে ঝি বিজলীর মুখখানি বেশ করিয়া মুছিয়া দিল। দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ও বাড়ীর ছাদেও তখন বেশ ছায়া পড়িয়াছে। বাবুটি খালি গায়ে ছাদের উপরে একখানি চেয়ারে কি একখানা বই পড়িতেছিলেন।

ঝি আস্তে আস্তে কহিল, বাঃ? ঐ যে! দেখ দিদি-মণি,—কি সুন্দর চেহারাখানি,—সত্যিই যেন নাটকের রাজপুত্তুর নায়কটি!"

বিজলীও চাহিয়া দেখিল. আজ আর ঝির কাছে অতটা লজ্জা তার করিল না। ঝি কহিল, "চল না কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসি।" বিজলীর হাত ধরিয়া ঝি রাস্তার দিকে রেলিংএর কাছে গেল। তাদের সাড়া পাইয়াই যেন বাবুটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, চোকে চোকে পড়িল। বিজলী আর পারিল না। ঝির হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আড়ালে গিয়া সিড়ির পাশে দাঁড়াইল।

ঝি বাবুটিরদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বিজলীকে ডাকিল, "বাঃ! পালালে কেন দিদিমণি, সরে এস না, আমি একা এত কাপড় কি করে' নেবগো?"

বিজলী তার সলজ্জ হাসিমাখা রাঙ্গা মুখখানি একটু বাহির করিয়া, মৃদুস্বরে কহিল, "কাপড়গুলো তুমি তুলে নিয়ে এসনা! আমি ত আছি এইখানে।"

একবার ওবাড়ীর ছাদের দিকে চকিতে চাহিয়াই বিজলী মুখ সরাইয়া নিল! বাবুটি এই দিকেই চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছিলেন,—হাসিভরা সেই ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি তার দিকে চাহিয়া কি মধুর হাসিটুকু তায় ফুটিয়া ছিল। বিজলীর প্রাণটা ভরিয়া সেই হাসিটুকু যেন হিল্লোল খেলিয়া গেল। সমস্ত প্রাণ সেই হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল, কিন্তু কি পোড়া লজ্জা! একটিবারও সে আর মুখ বাহির করিয়া চাহিতে পারিল না।

(৭)

সে দিন রবিবার, দুপুরে মহীন্দ্র বাবু আহারে বসিয়াছেন, বৃদ্ধা পিসী শ্যামাশশী নিজের নিরামিষ পাকের কয়েকপদ তরকারী লইয়া আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। অন্য দিন ৯৷১০টার মধ্যেই মহীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আফিসে চলিয়া যান, শ্যামাশশী তখন পূজা আহ্নিকই সারিয়া উঠিতে পারেন না। রবিবারে মহীন্দ্রবাবু বেলায় আরাম বিরামে খাইতেন। পিসীমাও দুই তিন পদ তরকারী রাঁধিয়া আনিয়া নিজ হাতে তাহার পাতে দিতেন, সম্মুখে বসিয়াও বহুবিধ স্নেহব্যঞ্জনা করিতেন।

"হাঁ বাবা মহীন্, বিজলীর বে থার কিছু ক'ল্লি?"

"কেন!" মহীন্দ্র বাবু একটু চমকিয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বিজলীর দিকে চাহিলেন! পিসীমাও কি তবে এই সব কিছু টের পাইয়াছেন?

কেন! ওমা বলে কি! মেয়ের কি বে' দিবিনে? কত বড় খুবড়ো হ'য়ে উঠেছে, ওই মেয়ে আইবড় আর রাখতে আছে? ওতে পাপের ভাগী হ'তে হয়। গাঁ ঘর ছেড়ে দিয়ে কল্‌কাতায় বাসা করে আছিস, নইলে যে জাত যেত।"

বিজলী কাছে দাঁড়াইয়াছিল, শ্যামাশশী তার দিকে চাহিয়া আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। মহীন্দ্র বাবু ও স্বর্ণময়ীও যুগপৎ কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বিজলী বড় লজ্জা পাইল, আনতমুখে বাহির হইয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেল।

মহীন্দ্র বাবু কহিলেন, "দেব বই কি দেব বই কি পিসীমা, মেয়ের বিয়ে কি আর না দিয়ে চলে। তবে পাচ্চিনে খুঁজে সুবিধেমত, মেলা টাকাও লাগে—কি করি বল ?"

স্বর্ণময়ী কহিলেন "তেমন গরজই দেখি না কিছু। ভাল করে একটু খুঁজে দেখ্‌লেও হয়। একেবারে রাজপুত্তুর নেই বা হ'ল—চলন সই একটি ছেলে খুঁজলে কি সত্যি মেলে না ? ব'লছি ত—আমার গয়না গাটি যা আছে, তাই বেচেই না হয় দেও।"

"গয়না বেচ্‌লেই ত মেয়ে বিয়ে হয় না। পাত্রও ত একটি চাই। আব সেটিও কিছু মানুষের মত হওয়াও আবশ্যক বটে।"

শ্যামাশশী কহিলেন, "আর কি পোড়ার দশাই হ'য়েছে! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা না হ'লে নাকি মেয়ের বিয়ে হ'বে না। আবার গা-ভরা সোণাও দিতে হ'বে। সবাই ত চাকরী চাকরী ক'রে পয়সা রোজগার ক'চ্ছে—আগে আর কজনেইবা চাকরী কত্ত ? তবু এত টাকার খাঁই কেন বাপু ?"

মহীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "টাকা এমন জিনিষ পিসীমা—যত লোকে পায়, ততই আরও চায়।"

"এত টাকা নিয়ে কি ক'রে ? এই যে রোজগার ক'চ্চে, তবুত কারও কুলোয় না। হা হা—টা টা লেগেই আছে। সেজ ঠাকুরদাদা শুনেছি মাসে মোটে ১০টি ক'রে টাকা উপায় কত্তেন, তবু পাচটা দোল পাব্বণ বাড়ীতে হ'ত, দশ জন লোক খেত দেত। আর তুই মাসে দুশো টাকা ক'রে পাচ্চিস, যা বলিস্ —বাসা খরচ ক'রেই ত আর কুলোয় না কিছু।"

"সে দিনকাল যে আর নেই পিসীমা। মাগ্‌গি সব হয়েছে কত, খরচ বেড়েছে কত।"

শ্যামাশশী বলিতে লাগিলেন "আমার যে বিয়ে হ'ল—মোটে নয় বচ্ছর বয়স তখন আমার—একটি পয়সা তাদের দিতে হ'ল না। সোণাদানা ত বেশী লাগে নি, হাতে রূপোর বালা, তাবিজ ; একটু পাত বাজু কেবল দিয়েছিলেন সোণার। পায়ে মল বেকো, কোমরে গোট—চের গয়না হয়েছিল। আর মার গলায় মটরদানা ছিল—তিনি ব'ল্লেন, গলাটা খালি থাক্‌বে, ঐটেও ওকে দিই। আর যে নথ একটা দিতে হ'য়েছিল, এই ছোট্ট এতটুকু—নয় বছুরে মেয়ে ত কত বড় নথ আর লাগ্‌বে ? আমার পিসীমা ছিলেন—এক এক কাণে একেবারে চার পাঁচটা ক'রে ছেঁদা ক'রে দেন—সে ছেঁদাগুলোর মুখ খোলা রয়েছে! তা কাণ ভরে অত গয়না কে দেবে ? তবে কাণে নাকি একটু সোণা দিতে হয়, দুটি আংটি গড়িয়ে বাবা আন্‌লেন। শ্বশুরবাড়ী যখন গেলাম, গয়না দেখে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল! খুং যা ছিল ওই কাণে কেবল ওই দুইটুকু আংটি ;—তা আমার শ্বশুর শেষে ঝুলো গড়িয়ে দিলেন। কোথাও যখন বেরোতাম, লোকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ত, সমান-বয়সী বউ কত হিংসে ক'ত্ত। আর এখন কত যে লাগে! মাগো এত সোণা চক্ষেও ত তখন আমরা দেখিনি!"

'তাই ত : পিসী মা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া এত শক্ত হয়ে উঠেছে এখন।''

পিসী মা কহিলেন "তা টাকাও ত বেশী রোজগার করিস্ তোরা। বাবা মোটে দশটি ক'রে টাকা মাসে আন্‌তেন, আর তুই আনছিস্ দুশো কত বেশী হ'ল,—হিসেব ক'রে দেখ্ দিকিন্! বেশী গয়না যদি লাগে, কেন দিতে পারবিনি ?''

মহীন্দ্র বাবু একটু হাসিলেন।—এইসব অর্থ নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বৃদ্ধ পিসীমাতার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা বৃথা।

শ্যামাশশী কহিলেন, "আসল কথা কি জানিস্ ? মহীন্, বিয়ে যে হয় না—কেন হবে ? তোদের যে ধর্ম্মে মোটে মতি নেই। টাকায় ও তাই কুলোয় না কিছু। ধর্ম্ম যে ঘরে নেই, সে ঘরে কি লক্ষ্মী থাকেন ? আর কুমারী মেয়ে ওদের ব্রত নিয়ম ক'ত্তে হয়, দেবতাকে ডাক্‌তে হয়, তবে ত ফুল ফুট্‌বে, প্রজাপতির দয়া হবে ? বর না মেয়েমানুষের শিব, আরাধনা না ক'ল্লে কেউ সেই শিবকে পায় ? তা বৌমাকে কত ব'ল্লুম, বলি মা, মেয়েকে ব্রত নিয়ম করাও ত শীগ্‌গির বিয়ে হবে। তা অবাগীর মেয়ে যদি আমার কথা একদিন কাণে তুল্লে! তোদের সব একেলে খিষ্টেনী মত, বেম্মজ্ঞানী হয়েছিস্ দেবতা ধর্ম্ম কিছু মানিস্ নে। তা মেয়ের মতি ভাল ছিল, ওই ত সেদিন সন্ধ্যে বেলায় আমি জপ ক'চ্ছিলুম ব'সে, আমার পূজোর ঘরে ঢুকে—মহাদেবের ছবি ছিল দেয়ালে—কত ভক্তি ক'রে

প্রণাম ক'রে। তা মহাদেব ভোলানাথ হ'লেও একদিন দৈবি একটা প্রণাম ক'ল্লেই কি অমনি ভুলে যাবেন ”

মহীন্দ্রবাবু একটু হাসিলেন। স্বর্ণময়ী কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কহিলেন 'তা বেশ ত ব্রতনিয়ম যদি কিছু পারে ত করুকনা। আমি ত জানিনা কিছু, আপনিই ব্রত পূজা কিছু করান না?'

মহীন্দ্র বাবু যে বাস্তবিক ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন তা নয়। তবে এখন ইংরেজিশিক্ষিত বাবুসমাজে যেমন সচরাচর দেখা যায় হিন্দুসমাজভুক্তই আছেন, কিন্তু ধর্ম্মে বিশেষ কোনও আস্থা নাই, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদিও গৃহে কিছু হয় না কখনও। চাকরী বাকরী করা, খাওয়া দাওয়া, ছেলেপিলেদের ইস্কুলকলেজে পড়ান, পরিবারের জন্য যথাসাধ্য বা যথা প্রয়োজন বস্ত্রালঙ্কারাদির আহরণ, আর অর্থ ও অবসর হইলে তদনুরূপ কখনও কিছু আমোদ প্রমোদ,—ইহা ব্যতীত মানবজীবনে আর কোনও কর্ম্ম চিন্তা কি সাধনার আর কোনও লক্ষ্য আছে বা থাকিতে পারে এ কথা যে কখনও ইঁহাদের মনে হয়,—এরূপ লক্ষণ কচিৎ দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধেয় কোনও তত্ত্ব আছে কি না, অনুষ্ঠানে কোনও সার্থকতা আছে কি না, তাহা শিখিবার কি বুঝিবার কোনও সুযোগও বড় কাহারও হয় না। এরূপ কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা এ দেশে নাই, যাহা আছে তাহাতে ইহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে শ্রদ্ধা বড় জন্মে না। ইঁহারা দেখেন অজ্ঞান প্রাচীনরাই ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়া গৃহে একটা উপদ্রবের সৃষ্টি করেন, যাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝা যায় না,—অনর্থক কেবল কতকগুলি অর্থব্যয়ই তাহাতে হয়। এই সব ব্রত সম্পাদনে অথবা কোনও পালপার্ব্বণ বা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোহিত যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও কোনরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক কাহারও চিত্তে করিতে পারেন না। উদ্রেক যদি কিছু করেন, তবে তাহা শ্রদ্ধা ত নয়ই বরং তাহার বিপরীত অন্য কিছু ভাব বাবু যাই করুন আহারে বিহারে যতই ব্যভিচারী হউন, গৃহে মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের কিঞ্চিৎ কদলী-তণ্ডুল-প্রণামী দক্ষিণাদি প্রাপ্তির পক্ষে উদাসীন থাকিলেই ইঁহারা যথেষ্ট ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আর বাবু যদি কখনও কোনও অনুষ্ঠানের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করে, তবে ইঁহাদের ত কথাই নাই ইঁহাদের সম্পূজিত দেবদেবীরাও যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রসন্নবদনে ধন্য ধন্য করিতে থাকেন।

এ অবস্থায় যাহা হইতে পারে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। মহীন্দ্র বাবুর ঠিক এইরূপেই একজন নাগরিক চাকুরে বাবু তাঁহার স্ত্রীও তাঁহারই মত আবার একজন নাগরিক চাকুরে বাবুর কন্যা। সুতরাং অহিন্দু বা ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান না হইলেও গৃহে দেবার্চ্চনাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম কখনও হয় নাই। পিসী মা যাহা করিতেন, তাহা এই গৃহের বা পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানের মত কেহ মনে করিতেন না। পিসী শাশুড়ীর সঙ্গে কচিৎ কখনও গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, কোনও দেবালয়ে কখনও গেলে প্রণাম করিতেন, কিছু প্রণামী দিয়া আসিতেন। ইহা ব্যতীত আর কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্ণময়ীর কোনও রূপে আসক্তি বা আগ্রহ কখনও দেখা যায় নাই। শ্যামাশশী বিজলীকে ব্রত করাইবার কথা মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন, ইহাতে যে স্বর্ণময়ীর বাস্তবিক কোনও আপত্তি ছিল তা নয়, কারণ বিপরীত কোনও ধর্ম্মমত তিনি বা তাঁহার স্বামী কখনও পোষণ করিতেন না, তবে এ সব নিজে কখনও করেন নাই, কাহাকেও করিতেও বড় দেখেন নাই, তাই কোনও শ্রদ্ধা বা আগ্রহ তাঁহার এদিকে ছিল না। পিসী মা নিজে যদি উদ্যোগী হইয়া করাইতেন, তাহাতে বাধী তিনি হইতেন না। হয়ত বা একটু হাসিতেন, নিষেধ করিতেন না। কিন্তু শ্যামাশশী ততদূর উদ্যোগী কখনও হন নাই। মনে মনে তাঁহার একটা ধারণা হইয়াছিল, ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, দেবতাধর্ম্ম কিছু মানে না।

কয়েক দিন যাবৎ কন্যার জন্য স্বর্ণময়ীর মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। শ্যামাশশীর কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল সত্যই যদি ব্রতনিয়ম কিছু করে, দেবতাধর্ম্মে ভক্তি হয়, হয়ত তার সুমতি তাহাতে হইবে। তাই তিনি বলিলেন ব্রতনিয়ম যদি বিজলী কিছু পারে ত করুক না তিনি নিজে ত জানেন না কিছু, পিসীমাই উদ্যোগী হইয়া করান না?

শ্যামাশশী কহিলেন, "তাই মা, কি ব্রতই বা এখন করাব? বৈশেখ মাস ত গেল, চাঁপাচন্দনের ব্রত আর এ বছর হ'ল না। ফলদানও ত মাসের প্রথম থেকেই আরম্ভ ক'ত্তে হয়, পঞ্চমীর ব্রত মিলে হয় শ্রীপঞ্চমীতে

মাঘমণ্ডল ত' মাঘমাসে করে। যম পুকুর হবে কার্ত্তিকে সেও ত অনেক দেরী আছে। জষ্টিতে করে সাবিত্রী ব্রত, আর ষষ্ঠ সে ত বারমাসই আছে—তবে নিতে হয় আগোণে। ওমা কি ব'লছি হি—হি—হি? বিয়ে হয়নি সাবিত্রী ব্রত কি ক'রে কর্‌বে? আরে ছেলে হ'লে ত ষষ্ঠী। হি—হি—হি—হি!"

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁসিয়া উঠিলেন! মহীন্দ্রবাবুর ইতিমধ্যে আহার হইয়াছিল, তিনি উঠিয়া আঁচাইতে গেলেন।

স্বর্ণময়ী কহিলেন "তা হ'লে আর কি ব্রত করাবেন এখন? কার্ত্তিকের আগে কি বিয়ে হবে না?"

"ওমা, তা না হ'লে আর হবে কবে গো?"

স্বর্ণময়ী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "শুনেছি ত মহাকালী পাঠশালার মেয়েরা শিবপূজো করে—"

কোন্ মেয়েরা ব'লে মা? মহাকালীর মন্দির কোথায় আছে? কই কখনও ত যাই নি সেখানে?"

"মন্দির নয় পিসীমা, মেয়েদের একটা ইস্কুল আছে, তার নাম মহাকালী পাঠশালা, সেই ইস্কুলে মেয়েদের শিবপূজো করায়।"

"ইস্কুলে শিবপূজো করায়? ওমা, এমন কথাত কোথাও শুনি নি!"

"সেই ইস্কুলে তাই শেখায়। তা মেয়েরা যদি শিবপূজো ক'ত্তে পারে, তাই বরং ওকে করান না?"

শ্যামাশশী কহিলেন, 'বিয়ের আগে ত শিবপূজো ক'ত্তে কাউকে দেখিনি। ইস্কুলে যা খুসী তাই করুক গে, ঘরে—কে জানে, যদি কিছু মন্দ টন্দ হয়—কাউকে ত ক'ত্তে কখনও দেখিনি মা তাই ভাব্‌ছি। তা বরং কোনও বামুনকে সুধোব। তা শিবপূজো না করুক—ব্রতই বা কি করবে এখন দেখ্‌তে পাই নে—তবে দেবালয়ে টেবালয়ে মাঝে মাঝে যদি যায়, প্রণাম করে, ভক্তি টক্তি যদি হয়! তাহ'লে দেবতা দয়া কর্‌বেন বই কি? এই ত কালীঘাটে মাকালী আছেন, তিনিই ত মহাকালী, ইস্কুলে কি আর প্রতিষ্ঠা হ'তে তিনি আসেন? আবার পাশেই বাবা নকুলেশ্বর আছেন—মহাকালীর মহাশিব হ'লেন তিনি। তা চল না মা, এই শনি কি মঙ্গলবারে একদিন ওকে নিয়ে যাই, পূজো দিয়ে প্রণাম ক'রে আসিগে। কি বল?"

"তা—মন্দ কি? গেলেই হ'ল। ওঁকে বলি, যেদিন সুবিধে হয় পাঠিয়ে দেবেন।"

মহীন্দ্র বাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্বর্ণময়ীও আহারাদি সারিয়া দুটি পাণ মুখে দিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিলেন।

"হাঁ, খোঁজ কিছু ক'রলে?"

মহীন্দ্র বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "ও সব তোমার মিছে আশা। বর্দ্ধমানের ওদিকে ওদের বাড়ী।

বাবা জমিদার,—বড় লোক, খোস্‌খেয়ালী ছেলে—কল্‌কেতায় থাকে, আমোদ আহ্লাদ ক'রে বেড়ায়।"

"তা—"

"তা টা আর এর মধ্যে কিছু নেই। ও সব বনেদি জমিদারের ঘরে আমাদের মত লোকের মেয়ে নেয় না।"

"তা ছেলের যদি মেয়ে তেমন পছন্দ হয়—"

"বাপে ছেলেতে লড়াই বেধে যায়। আর তা হ'লেও ঐ সব ছেলের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ের কখনও সুখ হয়?"

"তা তেমন কিছু বদখেয়াল যদি অভ্যেস না হ'য়ে থাকে, বিশ্রী মাতাল টাতাল ত বোধ হয় না দেখেছি প'ড়ে শোনেও খুব, সন্ধ্যে পর নিজে গান বাজনা করে, দুই একটি ভদ্রলোক কখনও আসে, কোনও হৈ চৈ গোলমাল আড্ডাও কখনও দেখি নি।"

"হুঁ—তুমিও ত দেখ্‌ছি—তা এই বুড়োকালে শেষে বলি হ্যাগা, আমায় একেবারে অনাথ ক'রে পালিয়ে যাবে না ত?"

মহীন্দ্র বাবু মুচ্‌কি হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

"যাও—কি যে ব'ল্‌ছ! একেবারে কাণ্ডজ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে। মেয়ের বিয়ের কথা হচ্চে—"

বাজে কথাই ত কেবল হচ্চে—কাজে কিছুই হবে না; হতে পারে না।"

"তা যদি ওকে পছন্দ ক'রে খুব ভালবেসে বিয়ে করে, তেমন মন্দ ত কিছু নয়, শুধ্‌রে যাবে।

"শোধবায় ত নি এখনও। ঘরে নাকি বৌ আছে—অবশ্য সুন্দরই হবে—"

"ওমা বিয়ে হয়েছে! তা ব'ল্‌তেছ কই?"

"তা ছাড়া,—ওরা জেতে বামুন, সন্তানের ঘরে দিতে চাইলেও কায়েতের মেয়ে নেবে না!"

"আ, কপাল! তবে আর মিছে এত কথা কেন? কিন্তু—লোক তবে ভাল নয়।"

"এতক্ষণ ত নেহাৎ মন্দ ছিল না। এখন মেয়ের বিয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে লোকটা একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেল!"

স্বর্ণময়ী উত্তর করিলেন, "তা যা খুসী হ'ক্‌গে। এখানে এসে কেন বাসা করেছে?"

"বাড়ীটা খালি ছিল, পছন্দ হ'ল, করেছে। ক'ল্‌কেতাতে কত রকম লোক পাশাপাশি মুখোমুখি হয়ে বাস করে। তাতে আপত্তি কল্লে ত আর চলে না।"

"তা ত চলেই না।—তা তুমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখ।"

"তা ত দেখ্‌ছিই। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে এখন দিতে পাল্লেই অবশ্য ভাল। তবে এইজন্যে এত ব্যস্ত হবারই বা কি এমন দরকার হয়েছে, তা দেখ্‌তে পাইনে।"

"দেখ্‌তে পাওনা? ব'লেছি ত সব।"

"হাঁ, বলেছ, শুনে আমারও মনটা একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব মিছে ভাবনা। দোষের কি এতে হ'তে পারে? ও লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কি কত্তে পারে ও? আমার বাড়ীতে যদি আস্‌ত যেত, তবু বা ভাবনার কথা ছিল কিছু। তা তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, পড়শী ব'লে আলাপ কখনও ক'ত্তে এলেও আমি আমল দেব না।"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "কেবলই এই দিকে চেয়ে থাকে আর সন্ধ্যে হলেই যত সব ভালবাসার গান গায়। দেখ্‌তেও ঠিক ফুলবাবুটির মত চেহারা। বয়েসের মেয়ে ওর মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে পারে বৈকি, সেটাও ত ভাল কথা নয়। বিয়ে হয়ে গেলে আর কোন বালাই থাকে না।"

মহীন্দ্রবাবু কহিলেন "তা বিয়ে যাতে হয় শীগ্‌গীর সে চেষ্টা ত ক'চ্ছিই। ও সব চঞ্চলতা বয়েসের কালে একটু আধটু সকলেরই হতে পারে। তা তাতে এমন সর্ব্বনাশ কিছু হয় না। একটু সাবধানে ওকে রেখো, ও দিকে যেন যায় আসে না বেশী। কিছু ভয় নেই। এর জন্যে দুশ্চিন্তায় একেবারে দেহপাত ক'রবার দরকার কিছু দেখিনে। তবে বড় হয়েছে—বিয়েটা যাতে শীগ্‌গীরই দিতে পারি তার চেষ্টাও আমি ক'চ্ছি।"

(৮)

"আজ এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে দিদিমণি!"

সে দিন ও ছাদে বসিয়া ঝি বিজলীর চুল বাঁধিতেছিল। ঝি তাহাকে সদুপদেশ দেয়, সাবধানে রাখে,—তাই স্বর্ণময়ী ইহাতে সন্তুষ্ট বই শঙ্কিত কখনও হইতেন না। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কিছু মৃদু স্বরে ঝি কহিল, "আজ এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে দিদিমণি।"

"কি?"

কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে বিজলী কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি হাসিয়া কহিল "অমন চ'ম্‌কে উঠ্‌লে কেন? ভয় পাবার কিছু হয় নি, তবে—"

"কি তবে?"

"তা ভয়ের এমন কিছু না থাক্‌, শুন্‌লে চমক লাগ্‌তে পারে বই কি?—আমারই লেগে গেছে?—কেবল হাসি মস্করার কথা আর নেই,—সতি সত্যি বড় গুরুতর একটা কাণ্ড বেধেই উঠল দেখ্‌ছি!—তাইত ভাব্‌ছি, কি হ'ল, আর কিই বা হবে এখন।"

কিছু ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে বিজলী জিজ্ঞাসিল, "কেন কি হ'য়েছে ঝি?"

ঝিও অতি কুণ্ঠিত ভাব দেখাইয়া উত্তর করিল, "তাইত—কি ক'রেই বা সে কথা তোমাকে এখন বলি? হাসিখেলা ক'ত্তে ক'ত্তে যে এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌বে তা যদি বুঝতে পাত্তুম, তবে কি আর এই সব রঙ্গ করি! এখন তোমারই বা সত্যি কি দশা হ'য়েছে, তাই বা কে জানে? তাহ'লে ত বড় বিষম কথাই হ'ল দেখ্‌ছি।"

বিজলীর বুকটার মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। মুখে কোনও কথা বাহির হইল না। ঝি কহিল, আচ্ছা বেশ ভাল ক'রে নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখ দিকিন দিদিমণি,—বেশ করে বুঝে দেখ দিকিন্‌,—ঠিক সত্যিই ওই বাবুটিকে ভাল ক'রে বেসেছ নাকি।"

বিজলী দুই হাতে ঢাকিয়া মুখখানি হাঁটুর উপরে রাখিল।

"হুঁ! বুঝেছি, ম'রেছ। আর উনি ত ম'য়েছেনই।" ঝি বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিজলীর কাণে তাহা প্রবেশ করিল। অধরপ্রান্তে ও নয়নকোণে একটু হাসিও ফুটিয়া ছিল,—মুখ ঢাকা ছিল, ঝি তাহা দেখিল না।

বুকটার মধ্যে তার বড়ই কেমন করিতেছিল। প্রবল একটা হর্ষের উচ্ছ্বাস নাচিয়া উঠিতে উঠিতেই কেমন একটা ভয়ে যেন সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা দুব্ দুব্ কাঁপিতে লাগিল। হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া দুই হাতে সে বুকটা চাপিয়া ধরিল।

ঝি বলিতে লাগিল, "আজ দুপুরে যখন যাই, দেখি বাবুটি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে চেয়ে রইলেন—চোকে যেন আর পলক পড়ে না, কেমন ভয় হ'ল আমার, আমি আর চাইলুম না, মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। কতদূর গিয়েই পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে কেমন সন্দ হ'ল। ফিরে একেবার চাইলুম—ওমা! দেখি যে বাবুটি আমার পেছনে পেছনে আস্‌ছেন! আমার গা এমন কাঁপতে লাগ্‌ল পা আর যেন চলে না। আরও কতদূর গেলুম,—দেখি বাবু ঠিক আমার পেছন পেছন আস্‌ছেন। বাসার দোরে গিয়ে পৌঁছুলুম—তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুক্‌ব,—বাবু আমায় ডাক দিলেন, "ঝি, একটা কথা শোন!" ব'লব কি দিদিমণি, মনে হ'ল আমি যেন আর নেই!"

ঝি চুপ করিল,—এই ঘটনার স্মৃতি সত্যই যেন আবার তখন তাহার অস্তিত্ব লোপ করিল, এমনই ভাবে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিজলীর কৌতূহল তখন তার লজ্জা ভয় সব ছাড়াইয়া উঠিতেছিল, মৃদু ও কম্পিত স্বরে সে জিজ্ঞাসিল, "তার পর—তুমি কি ব'ল্লে?"

ঝি কহিল,—"আমি আর কি ব'লব দিদিমণি! মুখে কি রা সরে? থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! তিনি ত কত কথা সুধোতে লাগ্‌লেন,—কত কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি কি আর জবাব কিছু দিতে পারি? দেখ্‌লুম, একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন, তোমার জন্যে। অবিশ্যি আগেও আমার সন্দ হয়েছে,—তবে ভেবেছি ও সব হয়, উপর উপর কেবল চোকে চোকে একটু হাসি খেলা—ফ'চ্‌কে লোকেরা যেমন ক'রে থাকে,—আসলে কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সত্যিই উনি একেবারে ভাল বেসেছেন তোমায়। এম্‌নি করে তাঁর ভালবাসার কথা সব বল্লেন যেমন নাকি কোনও থিয়েটারেও কখনও শুনিনি। আমি ত অবাক্! লজ্জায় মরে যাই,—কে কোত্থেকে এসে শুন্‌বে! রাস্তার ওপর—দুপুর বেলা—এই যে মাথাফাটা রোদ তাও একটু হঁস নেই!"

বিজলীর সমস্ত দেহ ভরিয়া যেন একটা হর্ষোচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল বেগে বহিতে লাগিল। বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইল। উজ্জ্বল ছলছল চোখদুটি রক্তফোটা মুখখানি কোন দিকে নিবে, কোথায় লুকাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

ঝি কহিল, "শেষে বল্লেন, আমারও মনে হয়—হয়ত দুরাশাই হবে—কিন্তু তবু মনে হয় সেও আমাকে ভালবাসে। তবে তার নিজের কাছ থেকে সেই কথাটি আমি শুন্‌তে চাই। আর কিছু চাইনে, শুধু এই কথাটি শুন্‌তে পেলেই আমি কৃতার্থ হব। হয় ত এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। নাও যদি তা হয়, শুধু ঐ কথাটি ধ্যান ক'রেই সারাটি জীবন আমি কাটাতে পারব।'

বিজলী দুই হাতে তার মুখখানি আবার ঢাকিল। ঝি কহিল,—"এই ব'লে একখানি চিঠি আমার হাতে দিলেন। বল্লেন, 'এই চিঠিখানি তাকে দিও আর এর উত্তর—বেশী কিছু চাইনে—শুধু একটুখানি উত্তর—একটি মোটা কথা—সে আমাকে ভালবাসে কেবল এই কথাটি তার হাত থেকে যদি পাই,—তাতেই আমি ধন্য হব। আমার জীবন সার্থক হবে। তা চিঠিখানা আমার আঁচলেই বাঁধা আছে, দেখ্‌বে?"

"না—না। ছি—বড় লজ্জা করে! চিঠি কেন আবার?"

"তা লিখেছেন, পড়েই একটু দেখনা? না হয় জবাব কিছু নাই দেবে। চিঠিটা একটু পড়বে তাতে আর দোষ কি?" আঁচল হইতে চিঠিখানি খুলিয়া ঝি বিজলীর হাতে গুজিয়া দিল। বিজলী চিঠিখানা খুঁটিতে লাগিল—খুলিতে পারিল না। ঝি কহিল, "খুলে একটু পড়না দিদিমণি! জিজ্ঞেস কল্লে আমি কি ব'লব বল্‌দিকি? খুলে তুমি পড়নি শুন্‌লে, তিনি বড় দুঃখ পাবেন। হিতাহিত জ্ঞান কি তার এখন আছে? মনের দুঃখে হয় ত একটা অত্যেহিত্যই ক'রে ফেল্‌বেন। আহা, যদি কথাগুলো তাঁর শুন্‌তে দিদিমণি! ব'ল্‌তে বল্‌তে একেবারেই কেঁদেই ফেল্লেন।"

বিজলী পত্রখানি খুলিয়া পড়িল। আহা, কি সুন্দর লেখা! আর কি সব কথাই লিখিয়াছেন! আহা, ওই

কথাগুলি তাঁর মুখে যদি সে শুনিতে পাইত! পড়িতে পড়িতে কি যে এক মধুময়ভাবে বিজলী বিভোর হইয়া পড়িল! নীচে নাম দস্তখত ছিল—তোমারই নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন! আহা কি সুন্দর—কি মিষ্ট নামটি। এমন নাম কি আর কারও হয়?

ঝি কহিল,—"হ'য়েছে পড়া? দেও এখন আমার কাছে, কেউ দেখ্‌লে বড় লজ্জার কথা হবে।"

পত্রখানি বিজলী ঝির হাতে দিল।

"তা উত্তর একটু লিখে দেবে?"

"ছি—বড় লজ্জা করে যে।"

'ওমা, লজ্জা ত করবেই। তা বেশী ত কিছু লিখতে হবে না, শুধু একটি কথা; তুমি যে তাকে ভালবাস—শুধু তাই একটু লিখে দিলেই ঢের হবে।"

"না—না, তা পারব না, ছি! বড় লজ্জা করে।"

"আচ্ছা, তবে থাক বরং এখন। আমি মুখে সব বল্‌ব। এর পর আর একটু জানা শুনো হলে তখন বরং লিখ্‌বে, কেমন।"

বিজলী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

(৯)

শ্যামাশশী কহিলেন, "কালিঘাটে যাবে বলিয়াছিলে বউমা,—কাল মঙ্গলবার, আমাবস্তের যোগ আছে, এমন দিন আর কবে পাবে? কালই চলনা যাই।"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "কে নিয়ে যাবে? ছেলেরা ত পরশু তাদের বন্ধুর বিয়েতে গেল। উনি কি আর আপিস কামাই ক'রে যেতে পারবেন? ওরা আসুক ফিরে, শনিবারে না হয় যাব।"

"মঙ্গলবার আমাবস্তের যোগ ছিল, শনিবারে ত আর তা পাওয়া যাবে না। ঝি বলছিল, গাড়ী ক'রে যাব—সেই নিয়ে যেতে পারে। ওরা সর্ব্বদা যায়—সব জানে শোনে। আর কালীঘাটে কি মেয়েমানুষের লজ্জা কিছু আছে? কত মেয়েমানুষ দেখেছি নিজেরাই দেখে শুনে বেড়ায়। তা মা তুমি বল না মহীনকে, সে যদি না পারে, ঝির সঙ্গেই আমাদের পাঠিয়ে দিক না।"

"আচ্ছা বলব।"

মহীন্দ্রবাবু একটু আপত্তি করিয়া স্ত্রী ও পিসীমার পীড়াপীড়িতে শেষে সম্মতি দিলেন। নয়টার সময়ই তিনি আহার করিয়া আফিসে গিয়া একজন বেহারাকে পাঠাইয়া দিবেন। সে বাসায় পাহারা থাকিবে। চেনা একজন গাড়োয়ান ঠিক করিয়া দিবেন। ঝির সঙ্গেই সেই গাড়ীতে সকলে কালীঘাটে যাইবেন।

পরদিন যথা সময়ে সব বন্দোবস্ত হইল। মহীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি খাইয়া আফিসে গেলেন। বেহারা আসিল, গাড়ীও আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। বেলা হইয়াছে, ঝি বড় তাড়া দিতেছিল। স্বর্ণময়ী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের রকে পা দিতেই আছাড় খাইয়া পড়িলেন। স্থানটায় জল ঢালা ছিল আর তরকারির খোসা কিছু ছড়ান ছিল। তাড়াতাড়িতে স্বর্ণময়ী ইহা লক্ষ্য করেন নাই, পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন।

আঘাত অতি গুরুতর না হইলেও কোমরে ও পায়ে এমন চোট লাগিয়াছিল যে হাঁটা দূরে থাক্‌, সোজা হইয়া দাঁড়ানও তখন স্বর্ণময়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ঝি কহিল, "তাইত মা, কি হবে এখন? কি ক'রে যাবে?"

"না, আজ আর যেতে পারব না।"

শ্যামাশশী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অদৃষ্টে তীর্থে গমন দেব দর্শনাদি ত ঘটেই না। আজ এমন পুণ্য যোগটায় যদিও সুযোগ জুটিয়াছিল তাও বৃথা হইল। এমন দুরদৃষ্ট কি এ পৃথিবীতে কাহারও আছে? আর কি কখনও এমন পুণ্য যোগ ঘটিবে? ঘটিলেও তাঁহার মত দুর্ভাগিনীর কি আর যাওয়া হইবে? তাই যদি হইবে তবে আজ এমন সময় এমন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে কেন? কাহাকে তিনি কি বলিবেন? কোনও আশা তাঁহার পূর্ণ হইবে না, স্বয়ং বিধাতাই তাঁহার ললাটফলকে লিপিবদ্ধ ইহা করিয়া রাখিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সেই ললাটফলকে করাঘাত করিলেন।

স্বর্ণময়ীর বড় দুঃখ হইল। তিনি কহিলেন, "তা আমি নাই গেলাম, গাড়ীটাড়ী এসেছে আপনারাই যান না?"

শ্যামাশশীর যেন পরমার্থ লাভ হইল, শতমুখে তিনি বধূমাতার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার জন্য রাজার ঐশ্বর্য্য আর স্বয়ং কৈলাসনাথ তুল্য জামাতা কামনা করিলেন।

বিজলী কহিল "তা'হ'লে আমিও থাকি মা। বড্ড লেগেছে তোমার, মালিশ টালিশ কে ক'রে দেবে?"

"তাই ত! তুই ও যাবিনি, সেই বা কেমন হয়? ওর থাক্‌লেই বোধ হয় হবে।—উঃ!"

ঝি কহিল "তা এক কাজ করি না মা। আমাদের বাসায় একটা ঝি খালি আছে। তাকে এনে তোমার কাছে রেখে যাই, এই ত কাছেই যাব আর আসব, কতক্ষণ আর হবে?

"আচ্ছা—দেখ্ তাই।"

ঝি ছুটিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরেই আর একটি ঝিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। এক ঝি সব সামলাইতে পারিবে না। ভিড়ে যদি কেহ হারাইয়া যায়, ছোট ছেলেমেয়েদের কাহাকেও স্বর্ণময়ী যাইতে দিলেন না। কেবল শ্যামাশশী ও বিজলীকে লইয়াই ঝি সেই গাড়ীতে কালীঘাটে গেল।

গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন হইল।

ঝি কহিল, "চলনা দিদিমা, নাটমন্দিরে যাই। সেখানে ব'সে ইচ্ছে হয় ত জপ টপ একটু ক'রবে।"

তিন জনে গিয়া নাট মন্দিরে উঠিলেন। একধারে এক বৃদ্ধা বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তাঁহার দিকে চোখ পড়িতেই শ্যামাশশী উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

এই বৃদ্ধা তাঁহারই পৈতৃক গ্রামবাসিনী ও কুটুম্বিনী। বহুদিন পরে বিদেশে তীর্থ স্থানে দৈবাৎ পরস্পর সুপরিচিতা দুই বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইল, দুই জনেই যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মুখামুখি বসিয়া দুইজনে কত সুখদুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঝি কহিল, "তা দিদিমা, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল—তোমরা বসে আলাপ কর, তার পর জপ টপ সার, আমি এর মধ্যে দিদিমণিকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসিগে। শ্যামাশশী ও অপরা বৃদ্ধা সানন্দ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। ঝি বিজলীকে লইয়া বাহির হইল। এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া এটা ওটা দেখিয়া মন্দিরের পিছনের দিকে একটা মণিহারী দোকানের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পিছনের দিকে অতি স্নিগ্ধ গম্ভীর উদারা স্বরে কে কহিল; "কি, কিছু কিনবে নাকি ঝি?"

"ওমা, নিরঞ্জন বাবু যে, তাই ত!" ঝি একটু সলজ্জ-ভাবে হাসিয়া নিরঞ্জনের দিকে ফিরিল। বিজলীও ফিরিয়া চাহিল,—ওমা! তাইত! তিনিই যে! এখানে—এত কাছে। কম্পিত রোমাঞ্চিত দেহে বিজলী ঝির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসিয়া বিজলীর একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজলী যে কোথায় যাইবে, কি করিবে, তার রক্তরাঙ্গা লজ্জানত মুখখানি কোথায় লুকাইবে, ভাবিয়া কুল পাইল না।

ঝি কহিল, "আপনি আবার কখন এলেন কালীঘাটে?"

"এইত কতক্ষণ এসেছি। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি যে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে।"

"হুঁ—আমরা যে কালীঘাটে এসেছি, তা দেখেছিলেন বুঝি?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বিজলীর দিকে চাহিয়া কহিল, হাঁ, দেখেছিলাম বই কি?"

"হুঁ—তাই বুঝি অমনি ছুটে এসেছেন?"

"তা—এসেই যদি থাকি ত এমন দোষ কি? এসেছিলাম তাই না তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা হ'ল। তা—কি কিনতে যাচ্ছিলে তোমরা?"

ঝি কহিল, "ভাবছিলাম, দিদিমণির জন্যে একযোড়া ভাল চুড়ী, লাল ফিতে, আর দুই এক শিশি তেল আর এসেন্ কিনব।

"তা বেশ ত; আমি দেখে দিচ্ছি; এস।"

বিজলী মৃদু স্বরে কহিল, "না ঝি, চল কিছু কিন্‌তে হবে না। দিদি মা অনেকক্ষণ ব'সে আছেন যে।"

নিরঞ্জন কহিল, "কেন বিজলী, পালিয়ে যেতে চাচ্চ কেন?—এত লজ্জা কি, আমি ত একেবারে অচেনা লোক নই—এস না।"

বিজলী মুখ ফিরাইয়াই অতি মৃদু স্বরে কহিল,—"দিদি মা ব'সে আছেন যে, আমি কিন্‌বনা কিছু—"

"দিদি মা বোধ হয় পূজো টুজো ক'র্‌বেন, এক্ষুণি কি হ'য়ে যাবে? এত ব্যস্ত হচ্চ কেন?"

"আমার কিন্‌বার কিছু দরকার নেই।"

ঝি কহিল, "ওমা, দরকার নেই, বল কি দিদিমণি? এইত ব'লছিলে চুড়ী আর ফিতে কিন্‌বে। আমি ভাবছিলাম একশিশি ভাল তেল আর একশিশি এসেন্ তোমায় কিনে দেব—"

নিরঞ্জন হাসিয়া কহিল, "ওহো, আমি এসে পড়েছি ব'লেই বুঝি পালিয়ে যেতে চাচ্চ? ছি! এত পর মনে কর

আমাকে?—সে হবে না বিজলী। যা কিনতে এসেছিলে না কিনে যেতে পারবে না, আর আমিই সব কিনে দেব। এত পরের মত মনে ক'চ্ছিলে আমায়, ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলে যেন আমি একটা বাঘ কি ভাল্লুক। তা তার শাস্তি এইটুকু নিতে হবে। তোমার যা দরকার তা আমিই কেনে দেব—"

নিরঞ্জন এমন জোরের সঙ্গে কথাগুলি বলিল,—যেন বিজলীকে কিছু উপহার দেওয়ার বড় একটা দাবী তার আছে। যতই লজ্জা করুক, বিজলী স্পষ্ট না বলিতে পারিল না।

নিরঞ্জন দোকানের সম্মুখে গিয়া যতদূর ভাল পাওয়া যায়, একজোড়া চুড়ী ও চ্যাওড়া লাল ফিতে, কয়েকখানি সাবান, কয়েক শিশি তেল ও এসেন্স কিনিয়া আনিল।

"নেওনা দিদিমণি? উনি কিনে এনেছেন, আদর করে দিচ্চেন, হাত পেতে নেও।"

বিজলী নড়িল না,—মুখ ফিরাইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন কহিল, আমি দিচ্চি, "নেবে না বিজলী? আমার কি এইটুকু দাবী নেই?"

বিজলী কহিল, "অত জিনিস দিয়ে কি হবে?—মা দেখলে রাগ ক'র্‌বেন।"

নিরঞ্জন ঝির দিকে চাহিল, ঝি কহিল, "তা রাগ কর্‌বেন কেন? বলব আমি কিনে দিয়েছি। কত ভালবাসি তোমাদের—আদর ক'রে দুটো ভাল জিনিস কিনে দিতে পারি নে?"

নিরঞ্জন কহিল "তবে আর কি? এখন নেও।"

"ঝির কাছে দিন।"

"না তোমাকেই হাত পেতে নিতে হবে। নইলে দেব না। সব নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেব।"

বিজলী অগত্যা হাত বাড়াইল। নিরঞ্জন এক একটি করিয়া জিনিষগুলি বিজলীর হাতে দিল।

"বেশ! এইত লক্ষ্মীটির মত! তা চলনা ঝি, তোমাদের একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেখিয়ে আনি। দিদিমার পূজা এখনও হয়নি। এস বিজলী, জিনিসগুলো বরং ঝির হাতে এখন দেও।"

ঝি হাত বাড়াইয়া জিনিষগুলি নিয়া আঁচলে বাঁধিল।

"তা চলই না দিদিমণি। আর একটু ঘুরে টুরে দেখে আসি।"

বিজলী কহিল,—"এখন যাই বরং, এই ত কত দেখ্‌লাম।"

নিরঞ্জন কহিল,—"কি আর দেখেছ, কতক্ষণই বা বেরিয়েছ? তুমি পালাতে চাচ্চ। না, তা হবে না। একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে চল দেখি, তারপর যাবে। যত আপত্তি ক'র্‌বে তত বেশী কিন্তু ধ'রে রাখব, যেতে দেব না। দিদিমা শেষে খুঁজ্‌তে বেরোবেন,—পথ হারিয়ে যাবেন। এস!"

ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া নিয়া নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনজনে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটের দিকে গেল,—এদিক ও দিক অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা স্থানে অনেকক্ষণ ঘুরিল। নিরঞ্জন বেশ প্রফুল্ল স্মিতমুখে সহজ সপ্রতিভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল—যেন সে ইহাদের বহুদিনের পরিচিত অতি নিকট আত্মীয় কেহ! ক্রমে বিজলীরও সঙ্কোচ অনেকটা দূর হইল'—কিছু সলজ্জ ও সংযত হইলেও সহজ ভাবেই সে সব কথার উত্তর দিতে লাগিল,—দুই একটা কথা নিজেও জিজ্ঞাসা করিল। বড় ভাল তার লাগিতেছিল, মনে হইতে ছিল, এমন সরল ভাল লোক বুঝি আর এ পৃথিবীতে কেহ নাই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল, শেষে ঝি কহিল, "বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্চে নিরঞ্জন বাবু। দিদিমা সত্যিই বেরিয়ে না পড়েন,—কালীঘাটের এক বুড়ীও তাঁর সঙ্গে আছে—তাঁর পুরোণ চেনা লোক।"

নিরঞ্জন ঘড়ী খুলিয়া দেখিল,—সত্যই অনেক দেরী হইয়াছে। সকলে তখন ফিরিল, মন্দিরের পথের মোড়ে আসিয়া নিরঞ্জন বিদায় নিল। কহিল,—"তা হলে আমি আসি—বিজলী!—একেবারে ভুলে যেও না যেন। চিঠি লিখ্‌লে উত্তর দিও কিন্তু। কেমন দেবে ত?"

বিজলী একটু হাসিয়া লালিম মুখখানি ফিরাইয়া নিল। কিছু বলিল না।

নিরঞ্জন আবার কহিল,—"সে হবে না বিজলী, ফাঁকি দিয়ে এড়াতে পারবে না। ব'ল উত্তর দেবে। না ব'ল্লে কিন্তু আমি ছেড়ে দেব না। দিদিমা যদি এসে পড়েন, আসুন।"

বিজলী অগত্যা কহিল,—"আচ্ছা।"

"বেশ! লক্ষ্মীটি! তা—কথা দিলে মনে থাকে যেন। ভুলো না। তাহলে পাপ হবে কিন্তু। কালীঘাটে আসা মিথ্যে হবে। আচ্ছা, এস এখন।"

বিজলী ও ঝি মন্দিরের দিকে চলিল। নিরঞ্জন কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বিজলী দুই একবার ফিরিয়া চাহিল—মোড় ঘুরিবার সময় শেষ আর একবার চাহিল। দেখিল নিরঞ্জন সেই এক বিভোরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে! বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস তার উঠিল।

(ক্রমশঃ)

নাই শুধু প্রাণ

তেমনি ত ফুল ফুটে,
তেমনি ত বায়ু ছুটে,
সুরভি মধুর বাসে ভুবন ভুলান,
সকলি ত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

বসন্ত মলয় সঙ্গে,
হাসে খেলে কত রঙ্গে,
কোকিল আকুলে গাহে শ্রবণ-জুড়ান,
সকলি ত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

প্রভাতের কলতান,
মুখরিত বিভু গান,
গোধুলি ধুসর রবি নিতি অস্তমান,
সকলি ত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

আকাশ নীলিম কায়,
শত হীরা ঝলে তায়,
যমুনা জাহ্নবী বহি তুলি' কলতান,
সকলি ত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ

সেই প্রেম সেই হিয়া,
সেই মর্ম্ম আলোড়িয়া,
কি লইয়া এলে প্রিয় কোথা দিব স্থান,
আজি মোর সবি আছে নাই শুধু প্রাণ।

নাই প্রাণ নাই প্রাণ,
যন্ত্রে চলে দেহখান,
এমনি কি খেলা প্রভু হ'বে অবসান;
কলের পুতুল মাঝে ফিরিবেনা প্রাণ?

শ্রীমতী বনলতা দেবী।

স্ত্রী কি সহধর্ম্মিণী?

এই অভাবনীয় প্রশ্নটি আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে উঠিয়াছে। এটি কেমন প্রশ্ন, যেমন "মা কি জননী?" এই শেষোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে যেমন কোন হিন্দুর হৃদয়ে কোন সন্দেহ উঠে না, কেননা পিতার পত্নী, সুতরাং তাঁহার সন্তানের পোষয়িত্রী বলিয়া বিমাতাও 'জননী' পদবাচ্য।* সেইরূপ এতাবৎকাল "স্ত্রী" ও "সহধর্ম্মিণী" দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ একাত্মক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতে-

* "মাতা, জনয়িত্রী, প্রসূঃ, জননী" ইত্যমরঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কার্ত্তিকের সংবাদে মাতার যে ষোড়শপর্য্যায় দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সাতটি আছে:—"স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, ভক্ষদাত্রী, গুরুপ্রিয়া অভীষ্টদেবপত্নী, পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা"।

ছিল। একটিকে অন্যের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিলে হিন্দুর মনে ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইত না। আর যিনি পতির "অর্দ্ধাঙ্গী" তাঁহাকে যে আবার দুইভাগে ও ভাবে বিভক্ত করা যায়, একথা পূর্ব্বে কোন হিন্দুর মনে কখনও উঠে নাই। বার বৎসর হইল "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত "ঘরে বাইরে" নামক প্রহেলিকায় যখন নিখিলেশ বাবু বলিলেন যে "আমরা সহধর্ম্মিণী গড়িতে গিয়া স্ত্রীকে বিকৃত করি", তখন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে একটি নূতন কূটসমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে ও হয়ত বা ইহার ফলে গরীব বাঙ্গালীর একমাত্র সুখের আস্পদ গার্হস্থ্য জীবনটি অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ভাবে ক্রমে বিকৃত হইতেও পারে।

সখের তাত্ত্বিক নিখিলেশ বাবু বলিয়াছেন বলিয়া যে এই কথাটির এত ওজন হইয়াছে ও [illegible] এত আন্দোলন হইতেছে, তাহা নহে। যাঁহারা "ঘরে বাইরে" পুস্তকখানি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিবেন যে নিখিলেশ বাবু একটি অপ্রকৃতিস্থ, বিকৃত বুদ্ধি, ধর্ম্মকর্ম্মহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বড় মানুষের ছেলে। "হিতোপদেশ" পাঠকের অবশ্য এই বচনটী স্মরণ আছে "যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্"—অর্থাৎ যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চারিটির এক একটিই অনর্থের কারণ, সুতরাং যে ব্যক্তিতে একত্র এই চারিটি বিদ্যমান তাহার কথা আর কি বলিব? এই অবস্থায় যেরূপ বুদ্ধি শুদ্ধি চাল চলন হওয়া সম্ভব তাহা নিখিলেশ বাবুর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার কথার কোন মূল্য নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে নিখিলেশ বাবুর আর তিনটি অনর্থের কারণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি অবিবেকী ছিলেন না। কেননা অনেক জ্ঞানের কথা, সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তত্ত্বকথা তাঁহার আওড়ান অভ্যাস ছিল। ইহার উত্তর এই যে লোকের বুদ্ধির পরিচয় বাক্যের দ্বারা পাওয়া যায় না, কার্য্য ও চরিত্রের দ্বারা পাওয়া যায়—"বাক্যবাগীশ" একটি উপহাসের সংজ্ঞা, সম্মানের নহে। যিনি একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বংশের বসতবাটীতে একটি জানাশুনা চরিত্রহীন ওস্তাকে বন্ধুভাবে বাসা দিয়া তাহাকে নিজের স্ত্রীর প্রণয়পরীক্ষার জন্য তাহার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছিলেন, ও তাঁহার দুই ভাজের চাকর বাকর ও প্রতিবেশীদের চক্ষের সাম্‌নে "স্ত্রী"-তত্ত্ব আবিষ্কারের ভাণে রঙ্গ দেখিতেছিলেন, তিনি যে কেবল বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তি তাহা নহে, উপরন্তু সামান্য ভদ্রতা জ্ঞান ও লোকলজ্জা-ভয়শূন্য। তাঁহার এইমাত্র জ্ঞান ছিল যে তিনি একজন অগাধ টাকার মালিক, তার উপর আবার এম এ পাস, সুতরাং যথেচ্ছাচারে তাঁহার পূর্ণ অধিকার, কোন রকম সমাজবন্ধন মানিবার আবশ্যক নাই। যদি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কোন পরীক্ষা (experiment) করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, সেটা বাড়ীর বাহিরে করিলে অন্ততঃ সামান্য ভদ্রতা ও শিষ্টাচার রক্ষা হইত।

যাহাকে হিন্দুরা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলেন তাহা রাজাবাবু নিখিলেশের সংসারে আদৌ ছিল না। সেখানে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল কেবল খামখেয়ালি, স্বেচ্ছাচার, বিলাসের ব্যাপার, অবৈধ ও অবিশ্রান্ত প্রেমচর্চ্চা, আর তার উপর নিখিলেশ বাবুর হাড় জ্বলানি টিপ্পনি ও সকল বিষয়ে ডেঁপোমি ও তাঁহার স্ত্রী ছোটরাণীর জ্যাঠামি ও দুই বিধবা যায়ের উপর কুটুস্ কুটুস্ কামড়ানি। এত বড় রাজ সংসারে একটা দানধ্যানের, অতিথিসেবার বা কাঙ্গালী-ভোজনের কথা পাড়িলাম না। যা কিছু আতিথ্য ছিল, সে কেবল ছোট রাণী সেজে গুজে সন্দীপ বাবুকে খাওয়ান। সহৃদয় পাঠক মাত্রেই বইখানি পড়িয়া বুঝিবেন যে যদি জগতে কেহ দয়ার পাত্র থাকে, তাহা হইলে পঞ্চু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু গরীব পঞ্চুর উপর যদিও দুই একবার নিখিলেশ বাবুর হৃদয়ে একটু দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, তাঁহার ওস্তাদ চন্দ্রনাথবাবু ও রাণীঠাকুরুণের পোলিটিক্যাল ইকনমির চোটে সে দয়া উপিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না। মাষ্টারবাবু বলিলেন, "তুমি দানের দ্বারা মানুষকেই নষ্ট করিতে পার দুঃখকে নষ্ট করতে পার না। আর বিমলা বলিলেন, "তুমি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চ'লে যেও না।"

এই ভীষণ তামসিক ব্যাপার পাঠ করিয়া যে প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেশের নূতন ধরণের কাব্য ও উপন্যাস হইতে দূরে আছেন তাঁহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে! কিন্তু যেখানে সংসার ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ আদৌ নাই, সেখানে "স্ত্রী"কে কেন "সহধর্ম্মিণী" বলে তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা কোথায়? মাতালের পানদোষের উপর, লম্পটের ইন্দ্রিয়সংযমের

উপর, ও চোরের সাধুর উপর মতামতের যেরূপ মূল্য, নিখিলেশ বাবুর হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামতের সেইরূপ মূল্য। কেবল খ্যাতনামা লেখক, দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও পুত্র স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ স্ত্রী ও সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধীয় কথাটি নিখিলেশের মুখ দিয়া তাঁহার Art এর অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া একথাটি লইয়া এত তোলপাড় হইয়াছে ও হইতেছে। এই মেরুদণ্ডহীন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নিখিলেশের ও তাহার স্ত্রীর কাহিনীর দ্বারা কবি কি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে সংশোধন করিতে চান?

এ কথাটি আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকের ও তাহাতে সন্নিবেশিত মতামতের হিন্দুর পক্ষে মূল্য কি? বিমলার কাহিনীতে সন্ধ্যাপূজার বারব্রতাদির কোন কথাই পাওয়া যায় না। এজন্য তিনি তাঁহার বড় যার পূজা অর্চনা দেখিয়া জ্বলিয়া মরিতেন। তাঁহার "আত্মকথায়" লিখিয়াছেন যে "আমার বড় যা জপে তপে, ব্রত উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য তাঁর মুখে এত খরচ যে মনের জন্য সিকি পয়সারও বাকি থাকিত না।" মেজ যার কথা লিখিয়াছেন—"তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করিতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথা বার্ত্তায়, হাঁসি ঠাট্টায়, কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী-দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভাল নয়। তা নিয়ে আপত্তি করার লোক ছিল না—কেন না এ বাড়ির ঐ রকম দস্তুর।" আর নিজের বিষয়ে বলিয়াছেন—"আমার স্বামী আমাকে হাল-ফ্যাসানের সাজে সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই সমস্ত রং বেরঙের জ্যাকেট সাড়ী সেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে আমার যায়েরা জ্বলতে থাকতেন!" যাঁহারা পুস্তকখানি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন তাঁহারা অবশ্য দেখিয়াছেন যে এই ঘোর তামসিক সংসারে যা কিছু মানসম্ভ্রম জ্ঞান, চরিত্রসংযম, শিষ্টাচার ও পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায় তা ঐ মেজ যায়ের কাছ থেকে; আর স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও কেলেঙ্কারির একশেষ দেখাইয়াছেন এই জ্যাঠামশাই ছোটরাণী—যার পরে নাম হইয়াছিল "মক্ষিরাণী"—একদিকে স্বামীর সুখ্যাতি মুখে ধরে না, আর একদিকে সুখৈশ্বর্য্যের হাঁড়ি উথলিয়া উঠিতেছিল, তথাপি স্বামী খ্যামী বামী পর্য্যন্ত যাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় তাহা তিনি অবাধে করিয়াছিলেন।*

সুতরাং এক্ষেত্রে "সহধর্ম্মিণী গড়িতে গিয়া স্ত্রীকে বিকৃত করা হয়," কি ধর্ম্মের ভাব আদৌ নাই বলিয়া এইরূপ বিকৃত স্ত্রী হয়, সেইটিই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন। বিমলা স্বয়ং ও তাঁহার জড়ভরত স্বামী যদি তাঁহাকে একেবারে প্রবৃত্তির মুখে না ছাড়িয়া দিয়া, অন্ততঃ যদি দেখান-ভদ্রতা ও লোক-লজ্জারূপ বন্ধনের (যাহাকে বলে convention) খাতিরে একটুও নিবৃত্তির রাশ টানিয়া রাখিতেন তাহা হইলে এতটা কেলেঙ্কারি হইত না। পুস্তকখানির দ্বারা স্পষ্ট ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে প্রবৃত্তি মানুষের রাস্তা নয়, খেয়াল মানুষের ধর্ম্ম নয়, আর কোন না কোন রকম বন্ধন না থাকিলে সমাজ ও কোন সামাজিক সম্বন্ধ টেঁকে না।' যাহাকে কেহ কেহ আজকাল দাম্পত্য প্রণয়ে স্বাধীনতা (freedom) বলিয়া আহ্বান ক'রতে চাহিতেছেন, তাহা কেবল স্বেচ্ছাচার, কখন কখন পশ্বাচার। উক্ত বন্ধন, সকলের মধ্যে সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞানের বন্ধন বলিয়া উৎকৃষ্ট, তাহার উপর ধর্ম্মের বন্ধন থাকিলে আরও উৎকৃষ্ট। এজন্য মানুষের গূঢ়তম ও দৃঢ়তম যে দাম্পত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন থাকা আবশ্যক। সুতরাং প্রকৃত "স্ত্রী" যোল আনারূপে "সহধর্ম্মিণী" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। খ্যাতনামা নীতিতত্ত্ববিৎ

---

* "ঘরে বাইরে" পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ Modern Review পত্রিকায় ছাপা হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোকের পাঠের জন্য অবাধে প্রচারিত হইতেছে। অবশ্য ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। তাহারা বাঙ্গালার এই একটি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী পরিবারের গার্হস্থ্য চিত্র দেখিয়া নিশ্চয় বলিবেন—How unreal, how false, how heartless, how vulgar, the domestic and social life of the high-caste Hindus is—how wholly made up of follies and vanities!—যেমন প্রকৃতিস্থ হিন্দুরা বলিতেছেন "কি জঘন্য, কি অপদার্থ, কি অসার।" সন্দীপ বাবুর চিত্র দেখিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার পাঠকগণ বলিবেন যে বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা সব ঐ গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। আরও বলিবেন যে স্বাশনাল কবি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলনের সহিত anarchist এর পিস্তল ও বোমার এবং political dacoityর সম্বন্ধ দেখাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং Rowlatt Committee's Repot সব ঠিক কথা লিখিয়াছেন। এই পুস্তক প্রচারের ফল ক্রমে বুঝা যাইবে। আর মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুও তাহার শিষ্য নিখিলেশ বাবুর Political Economy যে ভারতবর্ষের প্রজা সংক্রান্ত অনেক bureaucrat এর মনোমত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

Professor James Seth তাঁহার "Ethical principles" নামক ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক ইউনিভার্সিটিতে প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তকে লিখিয়াছেন (Chapter on "The Moral Life," 5th edition) :—

"The chief forms into which the good life differentiates itself are called by the ancients the "cardinal virtues," by the moderns the "table of duties." These two terms, "virtue" and "duty," are two modes of describing the same thing (Page 232).

"Temperance or self-discipline is the first necessity of the moral life, it is essential to the constitution of virtue. The very essence of morality is the establishment of the order of reason in the chaos of natural impulse (প্রবৃত্তি) and the reign of reason means the subjection and obedience of sensiblity (ইন্দ্রিয়বিকার)। Out of our natural individuality we have each to form a moral personality. The original or natural self is non-moral, and must be moralised. To be moralised, it must be disciplined, regulated, subdued. If the sphere of sensibility is to be finally annexed by reason, it must first be conquered; and the conquest of the self of natural sensibility by the rational self is temperance (সংযম)। For the heedless, partial, self is apt to rebel against the regulation of reason, it wants to rule; and the right of reason has to become the might of a rational sensibility......Intemperance (অসংযম বা স্বেচ্ছাচার) is disintegration, disorganisation; its watchword is self gratification, self-indulgence. The temperate life, on the contrary, is a whole in its every part. This harmony and strength are the reward of a resolute self-denial and self-sacrifice (Pages 241-42 .

"Man has social or other-regarding, as well as individual or self-regarding, impulses and instincts. By nature, and even in his remoralised condition, he is a social being. But this sypathetic or altruistic nature must, equally with the selfish and egoistic, be formed and moulded into the 'virtuous character; the primary feeling for others, like the primary feeling for self, is only the raw material of the moral lifes.....ince men are not mere individuals, but the bearers of a common (social) personality, the development in the individual of his true self-hood means his emancipation from the limitations of individuality, and the path to self-realisation is through the service of others —পরস্পরের সেবা (Page 269-70).

And often friend must be willing to make sacrifice for friend, and parent for child, and teacher for scholar, and neighbour for neighbour. The willingness to make such sacrifices, *without the certainty or even the likelihood of compensation, is of the very essence of the highest goodness we know* (Pages 280).

উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া পাঠক বুঝিবেন যে পাশ্চাত্য পাণ্ডতেরা স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে বা অন্য কোন মনুষ্য সম্বন্ধে অবাধ প্রবৃত্তিমার্গের অনুগামী হওয়ার পক্ষপাতী নহেন। হিন্দুশাস্ত্রকারদের ন্যায় তাঁহাদেরও মত যে সকল মনুষ্য সম্বন্ধেই সংযম ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির আবশ্যক, ও সেবার ভাব মনুষ্য চরিত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব। এই সেবার মূল—ত্যাগ, এবং ইহা হইতেই অনুরাগ ও ভালবাসা উৎপন্ন হয়, খেয়াল হইতে নহে। কেন না খেয়ালের শেষ নাই, একটা ছাড়িয়া আর একটা চায়, এ কথার প্রভুত পরিমাণে প্রমাণ সেকালের বাদসা নবাবেরা দিয়া গিয়াছেন। বিমলা যদি প্রবৃত্তিমুখী হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইত, তাহা হইলে কত কত সন্দীপ বাবু পদে পদে জুটিত ও অবশেষে পারত্রাণের আর উপায় থাকিত না। এই সেবার দ্বারা পশুজাতিকেও বশীভূত করা যায়, ও পরস্পরের সেবায় মনুষ্য ও গো-কুক্কুরাদি পশুজাতির মধ্যেও প্রণয় স্থাপিত হয়। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী "প্রবাসী" পত্রিকায় যে "শ্যামলী" গল্প লিখিতেছেন তাহাতে বোধ হয় দেখাইতে চান যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সেবার দ্বারা একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সৌখীন যুবক একটি হাবা-গোবা স্ত্রী নিয়াও সুখী হইতে পারেন, ও ইহার ভাবী ফলস্বরূপ ঐ হাবা-গোবা মেয়েরও অন্ধকার হৃদয়ে জ্ঞান ও সুখের আলোক ফুটিতে পারে। এ সম্বন্ধে স্ত্রী জাতি যে পুরুষাপেক্ষা অধিকতর ত্যাগশক্তি দেখাইয়া সুন্দরতম ফুল ও ফল ফুটাইতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত এই কলিযুগেও ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান পাশ্চত্য জাতিরা রজস্তমো গুণের প্রাধান্য বশতঃ প্রবৃত্তিমুখী হইলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা নিবৃত্তির গুণ বুঝেন ও তাঁহাদের ধর্ম্মেও নিবৃত্তির শিক্ষা দেখা যায়! অবশ্য ভারতবর্ষে যেমন প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির সূক্ষ্ম বিচার হইয়া গিয়াছে, ও মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে যেরূপ নিবৃত্তিমুলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এরূপ কোন দেশে বা কোন শাস্ত্রে হয় নাই। কিন্তু তথাপি অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতি জার্ম্মাণির ত্রিজ্‌কে ও নিটজে বাদ গ্রহণ করে নাই, ও নিবৃত্তির রাশ একেবারে ফেলিয়া দেয় নাই। অবাধে প্রবৃত্তির মুখে ধাবিত হইয়া জার্ম্মাণি কিরূপে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন! যাঁহারা দাম্পত্য প্রণয়ে ইবসেন-বাদ ঢুকাইতে পারেন তাঁহাদেরও এইরূপ দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা। প্রবৃত্তিপ্রধান পাশ্চত্য জাতিদের মধ্যেও এই বাদ স্থায়ী স্থান পায় নাই। তবে সকল দেশেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক আছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ উদ্ভট উদ্ভট খেয়াল উৎপন্ন হয় ও সাময়িক আদর পায়। স্বামী স্ত্রী উভয়পক্ষে প্রবৃত্তির প্রাধান্য হইলে উভয়ের মধ্যে সতত সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রবৃত্তিই মনুষ্যের চিরকেলে শত্রু সয়তান, হৃদয়ের কর্ম্মসংস্কার-রূপ সর্প, বাহিরে—তাঁর বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, ভোগ বিলাসের মোহ প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত। আর এই প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির চিরন্তন যুদ্ধ শাস্ত্রে গড সয়তানের লড়াই ও দেবাসুরের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিবৃত্তি সংসারকে ধ্বংস করিতে চাহে না, পারেও না; কেননা সংসার প্রবৃত্তিমূলক, প্রবৃত্তি ইহাতে সর্ব্বদাই প্রবল থাকিবে। যতই ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দাও, মানুষ বিবাহ ও সন্তান উৎপান করিবে! যতই সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দাও, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সংসারে চলিবে। যতই বৈরাগ্য প্রচার কর, ভোগবিলাসের স্রোত বহিবে। সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইলেও ম্যামন্ পূজা ও নরপূজা চলিবে। তবে নিবৃত্তি ধ্বংসমুখী প্রবৃত্তিরূপ অশ্বের মুখে লাগামের কাজ করে, ইহা এঞ্জিনের ব্রেক ও নদীর বাঁধ স্বরূপ। নৈশ জগতে ইহা মার্ধ্যাকর্ষণ শক্তি (gravitation or centripetal force), যাহা গ্রহ নক্ষত্রাদিকে টানিয়া স্ব স্ব স্থানে রাখিয়াছে, বিচলিত হইতে দিতেছে না; প্রকৃতিতে ইহা সত্ত্বগুণ (conservation of energy), যাহার শক্তিতে পুনঃ পুনঃ ধ্বংস হইয়াও পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি উৎপন্ন হইতেছে। প্রবৃত্তি বিহনে যেমন সংসার চলে না, সেইরূপ নিবৃত্তি বিহনে সংসার টেঁকে না। কেবল যাঁহারা সংসারের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব বুঝিয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহেন, ও মৃত্যুতে ইহা ত্যাগ হইলে পুনরায় ইহাতে ফিরিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদের পক্ষেই নিবৃত্তিই একমাত্র মার্গ, সাধারণের পক্ষে নহে।

এই নিবৃত্তির গুণ ও প্রবৃত্তির দোষ বুঝিলেই দাম্পত্য-সম্বন্ধের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যাইবে। মনুষ্যজীবনের ইহা গূঢ়তম ও ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ, সুতরাং ইহার সবটাই পরস্পরের সেবা, উভয়পক্ষে পদে পদে স্বার্থত্যাগ। এই সেবাই উৎকৃষ্টতম প্রেমরূপে প্রস্ফুটিত হয়, যাহার আর একটি নাম আত্মবিসর্জ্জন। দাম্পত্যসম্বন্ধ না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না; ইহা সৃষ্টির মূলে, এজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় বলুন বা প্রাকৃতিক নিয়মে বলুন, ইহা মাতাপুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা গাঢ়! মাতা সন্তানকে পোষণ ও পালন না করিলে সংসার থাকে না, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ না হইলে সন্তানের উৎপত্তিই হয় না। পুনশ্চ সেই সন্তানই দাম্পত্য প্রণয়ের নূতন বন্ধনস্বরূপ হইয়া ইহাকে দৃঢ়তর ও গাঢ়তর করে। এজন্য সকল ধর্ম্মমতেই "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ভোগ-বিলাসার্থে নহে। যদি বিমলার একটি সন্তান হইত তাহা হইলে উহার ওরূপ মতি গতি হইত না, তত্ত্বদর্শী নিখিলেশ বাবু সেটা বুঝেন নাই। সকল শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মোপদেষ্টারাই স্ত্রীকে মাতা করিয়া তাহার সহধর্ম্মিণীর ভাব দৃঢ় করিবার জন্য ব্যস্ত, সহধর্ম্মিণীর ভাব ছাড়াইয়া কেবল বিলাসের ভাব রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। আর স্ত্রী যে মুখ্যত (হিন্দুমতে সর্ব্বতোভাবে) সহধর্ম্মিণী কেন, তাহা একটু বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসার রক্ষাকারী দুইটি মুখ্য বন্ধন মাতা-পুত্র ও পুং-স্ত্রীর সম্বন্ধ, এই দুইটিতেই স্ত্রীজাতির ত্যাগ স্বীকার অধিকতর। কেনমা স্ত্রীজাতি পোষণকর্ত্রী ও পালনকর্ত্রী বলিয়া তাঁহাতে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের আধিক্য, পুরুষে রজোগুণের আধিক্য। স্ত্রীতে পোষণ ও স্থিতি (passive গুণ), পুরুষে কার্য্য ও গতি (active গুণ)। ত্যাগ ও সেবা passive গুণের বিকাশ, আর মনুষ্যজাতির দৃঢ়তম দাম্পত্য সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির ত্যাগ স্বীকার পরাকাষ্ঠা পায় বলিয়া ইহা এত মধুর হয়, এবং

সকল সভ্যজাতির মধ্যে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যকে মনুষ্য ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এমন কি ইহার উপমা জগতে অন্য কোন সম্বন্ধে পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাকে ভগবৎ-প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীগণ মোক্ষপ্রদায়িনী স্বরস্বতীদেবীর পর্য্যায়ের লোক, ইঁহারা বিদ্যা "শ্রেণী" ভুক্ত ও দেবী পদবাচ্য। পতি পুত্রবতী হইলেও ইঁহারা ব্রহ্মচারিণী, যেমন ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী হইয়াও আদ্যাশক্তি ভগবতী "কুমারী" নামে খ্যাত। কেনন, সাধ্বীস্ত্রীর ভোগও পরার্থে, স্বার্থে নয়—পতিপুত্রের প্রীত্যর্থে। যে সকল স্ত্রীলোকেরা এইভাব ত্যাগ করিয়া বিপরীত মার্গ গ্রহণ করেন ও ভোগ বিলাসকে শ্রেষ্ঠ করেন, ও যে পুরুষেরা স্ত্রী নিয়া ভোগ বিলাসে রত থাকা পরম পুরুষার্থ বিবেচনা করিয়া এইরূপ স্ত্রীভাবের পোষকতা করেন, তাঁহারা উভয়েই নিরয়গামী হন। এইজন্য এই সকল স্ত্রীলোক অবিদ্যা শ্রেণীভুক্ত। হিন্দুশাস্ত্রে যে স্ত্রীনিন্দা করা হইয়াছে সে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে। সাধ্বী স্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব দেওয়া হইয়াছে। সকল ধর্ম্মের সার যে ত্যাগ ধর্ম্ম (service), তাহাতে স্ত্রীলোকই মানুষের গুরু। মাতার স্নেহ ও স্ত্রীর প্রেম হইতে এই ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া মানুষ উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে যাইতে পারে। ত্যাগই তপস্বীর তেজ, বীরত্ব, সতীর সতীত্ব, জ্ঞানীর জ্ঞান, কর্ম্মীর নিষ্কাম কর্ম্ম (বা ধর্ম্ম) ও মোক্ষ প্রার্থীর নির্ব্বাণ মুক্তি। পরমাত্মাতে সর্ব্ব দ্রব্যের, সর্ব্বভাবের, এমন কি সর্ব্বগুণের ত্যাগ হইয়া নিবৃত্তি পরাকাষ্ঠা পায়। অপরদিকে ভোগের ফলের পর্য্যায় ঠিক বিপরীত—ভীরুত্ব, কাপুরুষত্ব, লাম্পট্য, অজ্ঞান ও মোহ, অবশেষে নিরয়প্রাপ্তি।

কিন্তু ঈশ্বরের বা প্রাকৃতিক নিয়মে শোধবোধ (law of compensation) আছে। এজন্য যেখানে পরম ত্যাগ, সেখানেই পরম আনন্দ। দাম্পত্য প্রণয়ে ভোগের ভাবকে শ্রেষ্ঠ না করিয়া নিম্নে রাখিলে, ইন্দ্রিয় ভোগজনিত বিষাদশূন্য পরম সুখ আছে, যাহা হইতে আত্মানন্দ লাভের স্বাদ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে যেখানে স্বার্থ ও অহং জ্ঞানের (Egoism) ত্যাগ, সেইখানেই পরম আনন্দের সূত্রপাত। আনন্দ পাইবার এই পন্থা। আত্ম-বিস্মৃতিতেই সুখের মূল, সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীর সুখের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, ধর্ম্মিষ্ট স্বামীও সেই স্ত্রী ও তাহার সন্তানদের জন্য সব কিছু সহ্য করেন। হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীকে স্বামীর ছায়া ও দাসীরূপে অনুগামিনী হইতে বলা হইয়াছে বলিয়া নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে যে স্ত্রী ঘরে দাসী তাহার জন্য স্বামী বাইরে সকলের দাসানুদাস? আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে যে স্ত্রীজাতি সকল অবস্থায় পাল-নীয়া, ও রক্ষণীয়া ও দুর্ব্বল স্বামীও স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য। স্ত্রীর দাসীত্ব মায়ের পুত্রের প্রতি দাসীত্ব স্বীকারের ন্যায় স্বাঙ্গীকৃত। ইহা service, slavery নহে। এইরূপ ঘরে স্ত্রীর ত্যাগ, বাইরে স্বামীর ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার কোন "ঘরে বাইরে" নামক পুস্তকের প্রকৃত বিষয় হইলেই এই নামের সার্থকতা হইত।

এই সব কারণেই দাম্পত্য সম্বন্ধকে ঈশ্বরের ও জীবের সম্বন্ধের নিম্নেই স্থান দিয়া, ও তাহাকে ভগবৎ প্রেমের সহিত তুলনা করিয়া, সকল ধর্ম্মোপদেষ্টারা ইহাকে ধর্ম্মের বন্ধনে দৃঢ়ীকৃত করিতে ও ভোগের ভাবকে ঢাকিয়া সেবা ও ধর্ম্মের ভাবকে শ্রেষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মই মানুষের পশু হইতে বিশেষত্ব, আর পত্নী পতির অৰ্দ্ধাঙ্গী, এজন্য তিনি সহধর্ম্মিণী না হইয়া কি "সহ ইন্দ্রিয়চারিণী" বা "সহ-বিলাসিনী" হইবেন? সকল শাস্ত্রেই স্ত্রীকে গৃহস্থের ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছে, আর হিন্দুশাস্ত্র সংসার ও ধর্ম্মকে পৃথক না করিয়া উভয়কে সংসারধর্ম্ম নাম দিয়া নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে স্বামীর ধর্ম্মসাধনের সহায় করি-য়াছে। ইন্দ্রিয়ভোগের ভাবকে একেবারে ঢাকিবার জন্য তাহাকে প্রথম হইতেই সহধর্ম্মিণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী মুখ্যত ধর্ম্মসাধনের উপায়, কিন্তু কোন রকম সুখ না থাকিলে মানুষ সংসারের ভার বহিবে না বলিয়া ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে একটি ভোগেরও উপায় হইয়াছে। হিন্দুর পুরাণে কথিত আছে যে ব্রহ্মা মনুকে সঙ্কল্পদ্বারা জন্ম দিয়া তাহাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলিলেন। মনু পিতার দেখাদেখি কতকগুলিন মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতে আদেশ দেন, কিন্তু ঐ মানসপুত্রেরা বেগার খাটিতে রাজি না হইয়া বনে গিয়া তপস্যা দ্বারা মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিলেন। এজন্য ব্রহ্মা স্ত্রীজাতি সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীকে কেন সহধর্ম্মিণী বলে, ও

সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য ও অধিকার কি তাহা পাঠকেরা অবশ্য মোটামুটি জানেন। উপরে তাহার কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে, বিস্তৃত আলোচনার এখন স্থান ও সময় নাই। যিনি পুরুষকে ইহজগতে পাপ হইতে রক্ষা করেন, তাহার ধর্ম্মসাধনে সহায়তা করিয়া ইহজগত হইতে ত্রাণের উপায় বিধান করেন ও পুত্র উৎপাদন করিয়া পরলোকেও উদ্ধারের পন্থা করিয়া দেন, তিনিই হিন্দুমতে প্রকৃত স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী। অন্যান্য ধর্ম্মেও সামাজিক পদ্ধতিতে এই ভাবের ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকাশ আছে, ও সমস্ত সভ্য জগতে বিবাহ মনুষ্যজীবনের প্রধান ধর্ম্মসংস্কার।—ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

যীশুখৃষ্টকে যখন স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে ফারিসিরা প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—He which made them at the beginning made them male and female .. They are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. (Mathew XIX—4, 6.) ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে বিবাহ একটি ঈশ্বরানুমোদিত ধর্ম্মসম্বন্ধ; কেননা ঈশ্বর যদি স্ত্রী-পুরুষকে অর্দ্ধাঙ্গী (one flesh) করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ধর্ম্মসাধনের জন্য,—ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য নয়। মুসলমান ধর্ম্মে হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ;—

Of matrimony it should be the the *original design and entire object* to preserve the soul from falling into sin, to *procure issue*, and to preserve posterity ; *not to gratify corrupt desires*, whether of lechery or any other sort.—(The *Akhlak-i-Jalaly*. or the Practical Philosophy of the Muhammadan People, the most esteemed Ethical work of middle Asia" ; translated by W. F. Thompson, Esq, of the Bengal Civil service).

উক্ত পুস্তকে Affection অধ্যায়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে : —

Love is the most limited form (of affection), for the love of two persons cannot find place within a single heart. The cause of love is excessive eagerness either for pleasure or for good [service] ; the first, which species is culpable and has been designated by the term animal love ; the second species is praiseworthy and has been designated by the term spiritual love. It is a maxim with Philosophers that into love *interest* cannot enter.

খৃষ্টানদের বিবাহ সংস্কারে ধর্ম্ম ও সেবার ভাবটি আরও প্রস্ফুটিত আছে। Protastant English Churchএর বিবাহ পদ্ধতিতে (marrriage service) নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিন গির্জ্জায় সমবেত ব্যক্তিদিগকে পুরোহিতের মুখ দিয়া বলান হয় :—

Dearly beloved, we are gathered together here in the sight of God, and in the face of this congregation to join together this Man and this Woman in holy Matrimony; which is an honourable estate instituted of God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is betwixt Christ and his Church, which holy estate Christ adorned and beautified with his presence, and first miracle that he wrought, Cana of Galilee ; and is commended of saint Paul to be honourable among all men : and therefore is not by any to be enterprised, nor taken in hand, unadvisedly, lightly, or wantonly, *to satisfy men's carnal lusts and appetites*, like brute beasts that have no understanding : but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, only considering the causes for which Matrimony was ordained.

First, It was ordained *for the procreation of children*, to be brought up in the fear and nurture of the Lord, and to the praise of his holy Name.

Secondly, It was ordained for a remedy against sin and to avoid fornication ; that such persons as have not the gift of continuency might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.

Thirdly, It was ordained for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity. Into which holy estate these two persons now present come to be joined.

পরিশেষে আমাদের দেশের নূতন বাদব্রাহ্ম ধর্ম্মে যদিও কোন বিশেষ শাস্ত্রের শাসন বা পুরাতন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি মানা হয় না, কিন্তু এই বাদের জ্ঞানী পুরুষেরা বিবাহ সম্বন্ধে কি মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যাউক। স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গীয় পিতা, ভারতবর্ষের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য ও পূজ্য পুরুষ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সারদা দেবীকে "ধর্ম্মপত্নী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কদাচ স্ত্রী শব্দ ব্যবহার করিতেন, ইহা শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত জীবন-চরিত পড়িয়া বুঝা যায়। আর তাঁহার "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে, অনুশাসন অধ্যায়ে, স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উক্ত জীবন চরিত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। (পৃষ্ঠা ১৯ ২০):—

"অন্যোন্যস্যা ব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রী পুংসয়োঃপরঃ॥"

অর্থাৎ, স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না, সংক্ষেপেতে তাহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে "

"টীকা:—পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে কি ভোগে, পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে ধর্ম্মবিষয়ক ব্যভিচার কহে, ইহা স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থ বিষয়ক ব্যভিচার কহে, তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগ বিষয়ক ব্যভিচারী হইলেন, ভোগ বিষয়ক ব্যভিচারই অধিকতর মন্দ, কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে।"

ইহাতে ধর্ম্মে বা কর্ম্মে বা ভোগে স্ত্রীর স্বামী হইতে স্বতন্ত্রতা (freedom) কোথায় দেখা যায়, ও স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ যে মুখ্যত ধর্ম্মের বন্ধন, কর্ম্ম ও ভোগের একত্রতা তাহার আনুসঙ্গিক অবস্থা মাত্র, তাহা ছাড়া আর কি বুঝায়? ইহা পুরাতন আর্য্য ঋষিদেরই আদর্শ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বজ্ঞানী লোক ছিলেন, সুতরাং ওজন করিয়া কথা বলিতেন। তিনি বৈরাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, ধনে বা ভোগে তাহার লিপ্সা ছিল না, ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনেক সৎকার্য্যে ও সদুদ্দেশে নিয়োজিত হইত। অতএব "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়," অথবা "আমরা সহধর্ম্মিণী গড়িতে গিয়া স্ত্রীকে বিকৃত করি," এরূপ ছুঁচোবাজি সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না— যে জ্বলে মরে মরুক, কেউ না কেউ তো বলবে "বাহবা, কেয়া সাবাস।" অজিত বাবুর জীবন চরিতখানি বাঙ্গলা সাহিত্যে একখানি বিশিষ্ট পুস্তক, ও স্যার রবীন্দ্র ঠাকুর এই পুস্তকের প্রকাশে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ও 'ঘরে বাইরে' বোধ হয় এক সময়েই লিখিত ও প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহাতে লিখিত সকল কথাই সেই সময় তাঁহার জ্ঞাত থাকাই সম্ভব। অতএব ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য যে স্যার রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, যে এমন একটি গুরুতর ও সর্ব্ববাদী সম্মত মীমাংসা সম্বন্ধে এমন একটি উদ্ভট প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। সন্দেহটি যদি তাঁহার নিজের নয়, যদি ইহা ইবসেন, মেটেরলিঙ্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্য অদূরদর্শী জড়ো পাসী তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদিগের নিকট হইতে ধার করা, তাহা হইলে সেই কথাটি প্রকাশ করিয়া তাহার উপর নিজের মতামত দিলে বা গল্পটি আরও ফুটাইয়া নূতন বাদের ফলাফল দেখাইলে, বাঙ্গালী পাঠক এরূপ গোলে পড়িত না, বুঝিতে পারিত যে এটি যথার্থ art কিনা, ধাঁধা নয়, অথবা আর্টের ভানে কতকগুলি সমাজনীতি অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে নূতন মতের প্রচার নয়। তিনি গুরু গম্ভীরভাবে জানাইতেছেন যে পুস্তকখানি লোকে যাহা ভাবিতেছে তাহা নয়, ইহার গূঢ় মর্ম্ম সাধারণের চক্ষে প্রতীয়মান নয়, কিন্তু তাঁহার পেটেলেরা যে ইহাকে একটি নূতন তন্ত্রের বেদ বলিয়া স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা কি তিনি দেখিতেছেন না? আর ইহাতে কি আর্টের সৌন্দর্য্য আছে যে বিলাত আমেরিকা পর্য্যন্ত ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছে?

শ্রীঅমৃতলাল বসু।
(লাহোর)

ভ্রান্তি

কস্তুরী ধরি নিজ নাভি মাঝে মৃগ সে সুবাস অন্ধ
বন্ধুরভূমি, পর্ব্বত বন, মর্ত্ত আবেগে করি অন্বেষণ
কঙ্কর ভূমে উপেক্ষি' মরণ ঢুঁড়িয়া বেড়ায় গন্ধ।

সপ্ত নৃপতির ধন সমতুল মণি শিরে ধরি সর্প
আপনাকে গণি' হীনাদপিহীন, যোগীসম থাকে গুহামাঝে লীন
জানেনা যে তার কাছে নত, দীন কোটী কোটিপতি-দর্প।

তুচ্ছ লৌহ যার, স্পর্শে স্বর্ণ হয়, অমূল্য সে অয়স্কান্ত
সমুদ্রের তীরে কঙ্কর সাজে, মৃত শুক্তি আর শম্বুকের মাঝে
লুকাইয়া মুখ পড়ি'থাকে লাজে, এমনি সে মহাভ্রান্ত।

সুরভি চন্দন বাস হেতু যেই নন্দন উপযুক্ত—
আরণ্যপাদপ ভাবি আপনায়, লোকালয় ত্যজি বনেতে
লুকায়
সেও নহে এই জ্ঞান অন্ধতায় হেন ভ্রম হতে মুক্ত।

অনন্ত সাগর আপনার স্নেহে নদ নদী করি সৃষ্টি—
অতৃপ্ত পিয়াসে ভিখারীর প্রায়, পাষাণেরও কাছে স্নেহ
ভিক্ষা চায়
নিজ স্নেহ নিজে পিয়ে পিপাসায়, ভ্রান্ত নাহি তার দৃষ্টি।

জগতে কেন গো এ আত্মবিস্মৃতি, কেন এই মহাভ্রান্তি,
আপনাকে কেন কেহ নাহি জানে, ঘুরে মরে কেন
তৃপ্তিহীন প্রাণে
শান্তি করতলে, তবু নাহি জানে, খুঁজে মরে কেন শান্তি ?

ভাণ্ডার ভরা অনন্ত, অক্ষয়, কুবেরের ধনরত্ন,
তবু কেহ তাহা ফিরিয়া না চায়, ভ্রান্ত বাসনায় ঘুরিয়া বেড়ায়,
তুচ্ছ ধন লোভে উন্মত্তের প্রায় কেন করে মিছা যত্ন।

কবে দূর হবে এই মহাভ্রম, বাসনার হবে অস্ত,—
চিনিব প্রকৃত ঐশ্বর্য্য আমার, ঘুচে যাবে এই বৃথা হাহাকার
শান্তি সাগরে দিবহে সাঁতার, হেরিব কমলাকান্ত।

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভারতের মুক্তিবাদ।"

(লেখকের নিবেদন)

গত মাসের "মালঞ্চ"তে যে "ভারতের মুক্তিবাদ" নামক প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল, তাহার প্রুফটি তাড়াতাড়ির জন্য ও কোন দুর্ঘটনাবশতঃ দেখিতে না পারায় কতকগুলিন ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপার ভুলের জন্য তত ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রুফে কয়েকটি শব্দের পরিবর্ত্তন ও যোগ করিতে না পারায় কিছু অর্থের দোষ কেহ কেহ ধরিতে পারেন। তাহার মধ্যে বিশেষগুলিন সংক্ষেপে সংশোধন করিয়া দিতেছি।

(১) পৃষ্ঠা ৫৮০, কলম ২, লাইন ৭, "intuition বা যোগদৃষ্টি"তে শেষের শব্দটি "অন্তর্দৃষ্টি" হওয়া উচিত। যোগ-দৃষ্টি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা লাভ হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি স্বভাবতই হইয়া থাকে; যদিও হিন্দুমতে বলা যাইতে পারে যে ইহা পূর্ব্বজন্মের যোগসাধনের ফল। কেননা সকল মনুষ্যের সমান তীক্ষ্ণ ও বিশুদ্ধ intuition হয় না। এই শব্দের সংস্কৃত পারিভাষিক অর্থ নাই, "অনুভব" শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। হিন্দু-দার্শনিকেরা তিন প্রকার মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আপ্ত (revealed)। তাঁহাদের মতে অনুভব "মানস প্রত্যক্ষ।"

(২) পৃষ্ঠা ৫৮২, কলম ২, শেষ হইতে লাইন ২, বৌদ্ধ-দার্শনিক শব্দের "শূন্য" বাদ nothing বুঝায় না। শূন্য তাঁহাদের চরম সত্ত্বা (absolute existence)। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকেরা পরমাত্মা বা পুরুষের যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, জ্ঞানময় প্রভৃতি লক্ষণ দেন, শূন্য-বাদে সে সব লক্ষণ দেওয়া হয় না।

(৩) পৃষ্ঠা ৫৮৪, কলম ২, লাইন ৮ "ঈশ্বর ও দেবতাদি না মানিসে" স্থানে "ঈশ্বর ও দেবতাদির পূজা না করিলে" বলিলে আরও স্পষ্ট হয়। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ-দার্শনিকেরা ঈশ্বর ও দেবতাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু সাংখ্য-বাদীদের ন্যায় তাঁহাদেরও ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তিনি সর্ব্বপ্রধান পুরুষমাত্র, তাঁহার জীবের উপর অধীশ্বরতা অস্বীকার করা হয়। বৌদ্ধমতে কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, ঈশ্বর ও দেবতাদির পূজা কোন কাজে আসে না। হিন্দুরা কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য মানিয়াও ঈশ্বর দেবতাদির পূজা সৎকর্ম্ম ও চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া গণনা করেন, ও তাঁহাদের কৃপা-করুণারও প্রত্যাশা রাখেন।

(৪) পৃষ্ঠা ৫৮৯, কলম ২, লাইন ১, বাঙ্গালীর রাজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার প্রমাণ সংগ্রহের উপায় লাহোরে পাই নাই। তবে এ কথা জানি যে Asiatic Societyতে তাম্রলিপি ও প্রস্তরলিপি আছে যাহাতে প্রকাশ যে নাগবংশীয় বাঙ্গালা রাজাগণ নাগা পর্ব্বত হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ঠিক ঠিক দেশের নাম মনে নাই, ও তাহারা কি সমুদ্র পারে সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিত জানি না। তবে চাম্বা, সুকেট, মণ্ডি প্রভৃতি পার্ব্বত্য দেশের রাজারা যে বাঙ্গালী জাতিসম্ভূত তাহা তাঁহাদের আচার ব্যবহার, চালচলন দেখিলেই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে কিছু সামান্য ভুল হইলেও আমার যুক্তির শিথিলতা হয় না। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর রাজপুত প্রভৃতি অনেক বীরবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন ও শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষের হিন্দু শেষবীর পৃথ্বীরাজের কাহিনী সকলেই জানেন।

(৫) পৃষ্ঠা ৫৮৯, কলম, শেষ হইতে লাইন ৫, "জগৎ-মিথ্যা"-বাদ সম্বন্ধে আরও একটু খুলিয়া বুঝান আবশ্যক। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এরূপ বাক্য বা সূত্র কোন দর্শন বা অন্য প্রামাণিক হিন্দু শাস্ত্রে নাই; কেবল বোধ হয় "শিব-সংহিতা"তে একটি শ্লোক পাওয়া যায়—"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব কেবলম্॥" কিন্তু ইহা দার্শনিক হিসাবে প্রামাণিক নয়। অদ্বৈতবাদীরা জগতকে মিথ্যা বা "নাই" বলেন না। সাধারণ মনুষ্যের যে জগত জ্ঞান তাহাকেই মিথ্যা, বা ভ্রম, বা উল্টা বলেন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম বলিতে রজ্জুর অস্তিত্ব, অস্বীকার করা হয় না, অন্ধকারের (অবিদ্যার) জন্য যে সর্পজ্ঞান সেইটাই মিথ্যা বা ভ্রম বলা হয়। জগৎটা unreal নহে, কিন্তু illusion; যেমন ভোজবাজিতে এক জিনিষকে আর একরূপ বোধ হয়। অর্থাৎ সাধারণ লোকে যেভাবে জগৎকেই আসল সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার কারণতত্ত্বের খোজ খবর রাখে না, কার্য্যত উহাকে অগ্রাহ্যই করে, অদ্বৈতবাদী বেদান্তীদের ইহার ঠিক উল্টা ভাব। তাঁহারা ব্রহ্মকেই নিত্য সত্য ধরিয়া জগৎকে একটা ব্রহ্মের অনিত্যভাব (phase) মাত্র ধরেন, যাহা চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্ম চিরকাল আছে ও থাকিবে, কিন্তু জগত যায় আসে, আর ব্রহ্ম হইতেই আসে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌছিয়াছেন, যাঁহাদের জগতের সহিত দেনা পাওনা ফুরাইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে জগৎ একটি অতীত রাত্রের স্বপ্ন মাত্র, সকলের পক্ষে নয়। জ্যামিতিতে the line is length without breadth বলিলে ছোট ছেলেরা বলে "সে আবার কি, এই লাইনটা যে এত মোটা।" মাষ্টার বলেন "ওটা একটু ভেবে বুঝতে হয়।" সেইরূপ যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবিয়া বুঝেন, তাঁহারা বলেন যে যেমন লাইনের দৈর্ঘ্যটাই ভাবিতে হইবে, প্রস্থটা নহে, অথচ লাইন টানিতে গেলেই প্রস্থ আসিয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া জগত নাই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মই আসল জিনিস, জগত লাইনের প্রস্থের ন্যায় একটি-ভাব বা কল্পনা মাত্র। ইহাকেই বলে "মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" লাইন কাগজে টানিতে গেলেই মোটা হয়, কিন্তু তাহার সূক্ষ্মভাব দৈর্ঘ্যমাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মভাব ব্রহ্মমাত্র, লাইনের প্রস্থের ন্যায় জগৎ নাই। কিন্তু জগতের সহিত সম্পর্ক বা ব্যবহার রাখিতে গেলেই কাগজে লাইন টানার ন্যায় তাহা মোটা বোধ হয়। একথাটা আর এক রকমে বুঝান যাইতে পারে। কাহারও যদি trance হয় তাহার পক্ষে তখন বাহ্যজগৎ নাই; ধ্যানস্থ যোগীদিগের এই অবস্থা হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সদাই ব্রহ্মধ্যানে স্থিত, সুতরাং তাঁহার কাছে জগৎ থাকে কোথায়? এই তত্ত্বটি অতি উচ্চ সাধকের জন্য, যাহারা জগতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাহাদের জন্য নয়। শেষোক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে গেলে নাস্তিক সমাজদ্রোহী অথবা 'ফক্কড়' হয়। এজন্য হিন্দুজ্ঞানীরা যাকে তাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাদের জন্য অন্য বিধান আছে।

শ্রীঅমৃতলাল রায়।

লাহোর, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৫ম বর্ষ { মাঘ—১৩২৫ } ১০ম সংখ্যা

কোন্ পথে

(১০)

কালীঘাট দর্শনের পরদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই ঝি নিরঞ্জনের একখানি চিঠি লইয়া আসিত, বিজলীও প্রথম দুই একদিন লজ্জায় ও ভয়ে আপত্তি করিয়া, শেষে যা পারিত, একটু উত্তর লিখিয়া দিত। এদিকে স্বর্ণময়ীর নিয়ত তাগিদে মহেন্দ্রবাবুও তার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বর যেমনই হউক, খুঁজিলে বর মিলে —যদি কন্যাপক্ষ বরের রূপগুণ যোগ্যতাদির বাছাই বড় বেশী না করেন। মহীন্দ্রবাবুরও কন্যার জন্য বর প্রাপ্তির অতি নিকট সম্ভাবনা ঘটিল। বরটি অতি সরস না হইলেও নীরস নহে। অবস্থা চলন সই, দেখিতেও চলন সই, সাধারণ ভাবে বি, এ, পাশ করিয়া কোনও সরকারী আফিসে কাজে ঢুকিয়াছে। বেতন আপাততঃ ৩০৲ কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। পণযৌতুকাদি সম্বন্ধেও দাবী একেবারে মহীন্দ্রবাবুর সাধ্যাতীত নহে। বর-পক্ষীয়েরাও মেয়ে দেখিয়া গেল, মেয়ে পছন্দও করিল, দেনা পাওনার খুঁটিনাটি লইয়া কথা চলিতে লাগিল। শীঘ্রই একটা মীমাংসা অবশ্য হইবে এবং হইলেই পাকা দেখার পর খুব শীঘ্রই—সম্ভব হইলে এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই একটা দিন স্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে।

স্বর্ণময়ী একদিন স্বামীকে কহিলেন, "সম্বন্ধ ত ক'চ্ছ, কিন্তু—মেয়ের যেন এ বিয়েতে তেমন মন নেই।"

"কেন, কিসে বুঝ্লে?—কিছু বলেছে নাকি সে?"

"না, ব'লেনি কিছু, তাইকি কেও ব'লতে পারে? তবে ভাবে সাবে বুঝি। বিয়ে হবে, একটু হাসি খুসী কখনও দেখি না। সর্ব্বদাই যেন কেমন আনমনা, ভার ভার, মনমরা মতই দেখ্তে পাই।"

মহীন্দ্রবাবু একটু ভ্রূকুটি করিলেন। কহিলেন, "ওসব কিছু না। বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে। আর এর চাইতে ভাল কোথায় পাব? আমার ত মেয়ে, রাজপুত্তুর বর চাইলে মিলবে কেন? মেয়ে যে ঘরের, যেমন বাপের— তার বিয়েও তেম্নি ঘরে, তেম্নি বরের সঙ্গেই হ'তে পারে। আমিও গেরস্ত লোক—ছেলেও গেরস্ত ঘরের। আমি যা রোজগার কচ্ছি, কালে ছেলেও তা রোজগার ক'ত্তে পারবে। মেয়ের এই অবস্থায় এর চাইতে বড়ঘর আর খুব ভালবর পাওয়া—সেটা বড় বেশী ভাগ্যের কথা। সে ভাগ্য সকলের হয় না।"

"তা ত বটেই! যার যেমন অবস্থা তার তেমনই সব ঘটে, তাতেই তার সুখী হ'য়ে থাক্তে হয়। বেশী ভাল চাইলে, তা ঘটবে কেন? এইত ছেলেরাও বড় হ'য়ে

উঠ্‌ল, তাদেরই কি খুব বড় লোক ক'রে তুমি দিতে পারবে ?"

"কোত্থেকে পারব ? তারা যেমন কলেজে প'ড়্‌ছে, অমন হাজার হাজার ছেলে প'ড়্‌ছে। হদ্দ আমাদের আফিসে কোনও কেরাণীগিরিতে যদি ঢুকিয়ে দিতে পারি। তার বেশী কিছুই ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই। গরীবের ছেলে যদি খুব বড় হ'তে পারে, খুব বড় প্রতিভা আর ভাগ্যের জোরেই পারে। তা সেরকম কোনও লক্ষণ ওদের মধ্যে দেখ্‌তে পাইনে। ওরা যদি বায়না ধরে রাজা নবকেষ্ট হ'তেই হবে, তা হ'লে চল্‌বে কেন ?"

"সেত ছশোবার। আর বিজলীরই কি এই রকম কিছু হ'ত! তবে—ঐ এক পাপ এসে সাম্‌নে ব'সেছে—ছেলে মানুষ—অত ত বোঝে না, হ'য়ত মনটা—"

"ওসব কিছু নয়। প্রথম বয়েসে সংসারটা যে বাস্তবিক কি—কে সেখানে কতটুকু প্রত্যাশা ক'ত্তে পারে—এ সব বিবেচনা কারও বড় হয় না—মনটা ভাবের ঘোরেই থাকে, চোকের নেশাও অমন এক আধটু লাগে। ও ছেলেদেরও লাগে, মেয়েদেরও লাগে। সত্যিকার অবস্থার মধ্যে যখন এসে দাঁড়ায়, তার পক্ষে সংসারটা যে বাস্তবিক কি, তা যখন দেখ্‌তে পায়, ও সব ভাবের ঘোর, আর চোকের নেশা স্বপ্নের মত ভেঙ্গে যায়। ও ত একেবারে ছেলে মানুষ। ওর চাইতে বড় বড় ছেলে মেয়ে কত এমন ভাবের ঘোরে পড়ে, আবার বেশ কাটিয়ে ওঠে। নেহাৎ বাতিকগ্রস্ত না হ'লে এই ঘোরে সারাটা জীবন কেউ কাটায় না।"

স্বর্ণময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "এর চাইতে আগেই ভাল ছিল। ছেলে বেলায় বিয়ে হ'য়ে যেত, এসব বালাই কিছু ঘট্‌ত না।"

"সে আর ভেবে কি হ'বে ?—তা যে আর হবার যো নেই। দিন কাল ব'দ্‌লে যাচ্ছে। ছেলেবয়সে আর ছেলেদেরও বিয়ে হয় না, মেয়েদেরও হয় না। এসব বালাই নিয়েই এখন চ'ল্‌তে হবে। তবে যতটা কম ঘটে, সেটা সবারই দেখা উচিত। সে যাই হ'ক, ওতে ঘাব্‌ড়ে যেও না। বেশ বিয়ে হ'চ্চে, বেশ ফুর্ত্তি ক'রে চল্‌বে, ফুর্ত্তিতে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌বে—কাজ কর্ম্ম সব ক'রবে। ওরও ফুর্ত্তি হবে দেখো। এক একবার মনে হয় ছোঁড়াটাকে ডেকে দুকথা বলি। কিন্তু—সেটা বড় লজ্জার কথা। নিজের ঘর সামলাতে না পেরে যেন পরকে নিয়ে পড়া। বদলোক—মুখের উপরেই বা এই রকম অপমানের দুটো কথা ব'লে ফেল্ল। মেয়ের নামেই হয়ত দুটো কুৎসার কথা এখানে ওখানে ব'লে বেড়াল।"

"ওমা, সর্ব্বনাশ! তাতে কাজ নেই। তা খুঁটিনাটি নিয়ে আর গোলমাল না ক'রে তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে সব মিটিয়ে ফেল—এই জষ্টিমাসেই বিয়েটা যাতে-হ'য়ে যায়, তাই কর।"

বিজলী সত্য সত্যই বড় বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। কেনই বা না হইবে ? সে যে কেবল মনে নয়, বাক্যে এবং কর্ম্মেও নিরঞ্জনের সঙ্গে বড় একটা ভালবাসার খেলা খেলিতেছিল।—ঝিও বুঝাইতেছিল, সেও মনে মনে ধরিয়া নিয়াছিল, নিরঞ্জন ব্যতীত আর কেহ তার বর হইতে পারে না। এখন পিতামাতা অন্য কার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেমন করিয়া সে এখন সেই বরকে ভালবাসিবে, তার বউ হইয়া গিয়া তার ঘরে থাকিবে ? আর ওই নিরঞ্জন—আহা! তাকে কি সে আর ভুলিতে পারিবে ? সেও যে মনের দুঃখে আত্মঘাতী হইবে! সর্ব্বনাশ! তা যদি হয় কেমন করিয়া সে দেহে প্রাণ ধরিয়া এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে ?

ছাদে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে নিজেই সে একদিন মুখ ফুটিয়া কহিল, "এখন কি হবে ঝি ?"

ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিল, "তাইত দিদিমণি, ভেবে যে ত'ার কুল পাচ্চিনে। কি আর ক'রবে, এ ভালবাসা এখন ভুল্‌তেই চেষ্টা কর।"

"তা যে আর পারিনে ঝি! সেদিন দেখাও যদি না হ'ত—"

বিজলী আজ বড় মুখরা হইয়া উঠিতেছিল। আগে লজ্জার বাধা লঙ্ঘন করিয়া মুখে সে হাঁ, হুঁ, না—ছাড়া বেশী কোনও কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে আর তার উদ্বেল হৃদয়কে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

"হুঁ। "সশব্দে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঝি কহিল, কপালে বিড়ম্বনা থাক্‌লে এমনিই সব ঘটনা এসে

ঘটে। নইলে কোথাকার কে, কোনও জন্মে যার সঙ্গে কোনও পরিচয় হবার কথা নেই, সেই কিনা হঠাৎ এসে চোকের সাম্‌নে দাঁড়াল—আর এম্‌নি ক'রে মনটা প্রাণটা কেড়ে নিল! "হুঁ— !"

বিজলী একটু কি ভাবিয়া কহিল, "উনি কি এসব কথা কিছু শুনেছেন?"

"না—বলিনি ত আমি কিছু এখনও। বলি বলি ক'রেও বল্‌তে দিদিমণি ভরসা পাইনি। কে জানে এই সর্ব্বনেশে খবর শুনে তিনি কি ক'রে ব'স্‌বেন! তুমি আর কতটুকু পাগল হয়েছ,—তিনি যে আহার নিদ্রেই ত্যাগ ক'রেছেন।"

"আচ্ছা—ওঁর সঙ্গে কি বিয়ে হ'তে পারে না?"

"তাইত হওয়া উচিত ছিল।"

"বাবা ওঁকে চেনেন না—তা উনি যদি এসে বাবাকে বলেন—হাঁ, উনি কে? বাড়ী কোথায়?"

"নাম ত নিরঞ্জনবাবু—বাড়ী শুনেছি বর্দ্ধমানের ওদিকে—জমিদারের ছেলে।"

"বাবা মা সব আছেন?

"হাঁ, আছেন ত শুনেছি।"

"তা বাবা কেন তাঁদের কাছে বলে পাঠান না?"

"জানা শুনো নেই কিছু, আর তোমাদের যে এত ভালবাসাবাসি হ'য়েছে,—তাও ত বাবু জানেন না?

"তাহ'লে মাকে কেন তুমি বুঝিয়ে সব বল না?"

ঝি শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "সর্ব্বনাশ! তাই কি বল্‌তে আছে? হিতে শেষে বিপরীত হবে। বাবু ভাব্‌বেন কচি মেয়ের মন ভুলিয়ে নিয়েছে,—ও লোকটা অতি বদ। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কখনও দেওয়া যেতে পারে না। আর কি জান, ওঁরা এখন বুড়ো হয়েছেন, ভালবাসার মর্ম্ম যে কি তা বোঝেনই না। হয় ত ভাব্‌বেন—এসব বাজে খেয়াল—বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে। আরও তাড়াতাড়ি ক'রে বিয়ে দিয়ে ফেলবেন।"

বিজলী একটু ভাবিল,—কহিল, "তবে—এসব কথা ব'লে ফল নেই। তা উনি কেন—ওঁর বাপ মাকে ব'লে কাউকে পাঠিয়ে বাবাকে জানান না যে আমাকে বিয়ে করবেন? তাহ'লে হয়ত বাবা আপত্তি করবেন না। এ সম্বন্ধ ত একেবারে ঠিক হয়নি এখনও। তুমি তাহ'লে ওঁকে গিয়ে সব বুঝিয়ে ব'লো ঝি। আজই ব'লো—বেশী দেরী যেন করেন না। মা আর বাবা যেরকম তাড়াতাড়ি কচ্ছেন—হয়ত খুব শীগগির এদের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে যাবে। তখন ত আর পথ থাকবে না কিছুই।"

"আচ্ছা, তাই আজ ব'লব—"

"হাঁ, তাই ব'লো, ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো। একটা পথ যেন তিনি শীগগির করেন। এই বিয়ে যদি হয়—তাহ'লে—তাহ'লে যে আমি মরে যাব।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল। ঝি কহিল, "চুপ কর চুপ কর দিদিমণি, কেঁদনা। ছি! হঠাৎ কেউ এসে প'ড়লে কি ব'ল্‌বে?—ভয় কি?—তিনি তোমায় ভালবাসেন, বড়লোকের ছেলে, যা হয় একটা উপায় তিনি ক'রবেনই। তোমায় এত ভালবেসেছেন, এখন আর কেউ তোমায় নিয়ে যাবে এটা কি প্রাণ থাক্‌তে তিনি হ'তে দেবেন?"

বিজলী একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাইত! কেন সে এত ভাবিতেছে? অমন তিনি—সেদিন, আহা, কিসব কথাই বলিতেছিলেন—কেমন জোর করিয়া তাকে সব জিনিস দিলেন, সঙ্গে নিয়া বেড়াইলেন—যেন সত্যই কত বড় দাবী তার উপরে তাঁর আছে। কত চিঠি লিখিতেছেন,—তাতেও কত ভালবাসার কথা কেমন জোরে লিখিতেছেন। আহা, অমন তিনি—অমন ভালবাসা, অমন জোর, অমন তেজ—সব জানিতে পারিলে, যেভাবেই হউক, তিনিই তাকে বিবাহ করিবেন। ভয় কি তার? তিনি আছেন, কেন সে এত ভাবিতেছে, এত ভয় করিতেছে?

(১২.)

পরদিন দুপুরে যাইবার সময় ঝি বিজলীর হাতে নিরঞ্জনের পত্র দিয়া গেল। লম্বা পত্র, বিজলী লুকাইয়া রাখিল। মা ঘুমাইলে নিভৃতে গিয়া সেই পত্র সে পড়িল। নিরঞ্জন যাহা লিখিয়াছিল, তার সার মর্ম্ম এই:—

কিছুদিন আগেই সে তার পিতাকে একথা জানাইয়াছে। এইজন্য ইতিমধ্যে একদিন সে বাড়ীতেও গিয়াছিল। কিন্তু পিতার সম্মতি পায় নাই। এমন কতকগুলি বাধা আছে, যাহাতে প্রচলিত সামাজিক নিয়মে সহসা তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না। তার পিতা কাজেই অনুমোদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিজলীর পিতাও অনুমোদন করিবেন না, তাই সে তাঁহার কাছে কোনও প্রস্তাব লইয়া আসিতে পারে

নাই। নতুবা এতদিন সে কখনও অপেক্ষা করিত না। যাহাই হউক, দুজনে তারা দুজনকে যখন এত ভালবাসিয়াছে, মিলনে' এসব কাজে বাধা' কেন তারা মানিবে? কেন পরস্পরকে ছাড়িয়া জীবনে মরার অধিক দুঃখ তারা ভোগ করিবে? বিজলী অন্যের স্ত্রী হইবে, তার আগে গঙ্গায় সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। পিতারা তাহাদের সুখের দিকে প্রাণের দিকে যদি নাই চান, তাহাদের বিবাহে অনুমোদন নাই করেন, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সে নিজে বিজলীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু বিজলী কি তাহাতে প্রস্তুত আছে? তার স্ত্রী হইয়া তার সঙ্গে সুখে থাকিবে, এজন্য বিজলী কি তার পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে? বিজলীর জন্য সে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বাহির হইতে যতই লাঞ্ছনা অত্যাচার তার উপরে হউক, আপন ঘরে তার বুকের মধ্যে বিজলীকে পাইলে, কিছুই সে গায় তুলিবে না। বিজলীকে ভালবাসিয়া বিজলীর ভালবাসা পাইয়া—বিজলীকে নিয়া বিজন বনে পাতার কুটীরেও সে রাজাধিরাজ অপেক্ষা অধিক সুখে থাকিবে। কিন্তু বিজলী তা পারিবে কি? সে যেমন সরল প্রাণে বিজলীকে ভালবাসিয়াছে, বিজলী তাকে তেমন বাসিয়াছে কি? বিজলী তার প্রাণের প্রাণ—বুকের রক্ত—চোকের মণি বিজলীকে ভালবাসিয়া এই পৃথিবী তার স্বর্গের নন্দন কানন হইয়াছে—থরে থরে সেখানে পারিজাত ফুটিয়া উঠিয়াছে,—লহরে লহরে সুধার তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই বিজলী যদি আজ তাকে ছাড়িয়া পরের ঘরে যায়—সমস্ত পৃথিবী তার শ্মশান হইবে,—শ্মশান ভরিয়া কেবল তার চিতাই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে! বিজলী কি তাহাতে সুখী হইবে? বিজলীর পায়ে ছোট একটি কাঁটা ফুটিলেও, বুক চিরিয়া তার প্রাণ সে হাসিতে হাসিতে বাহির করিয়া দিতে পারে, যদি তা দিয়া সে কাঁটা তুলিয়া নেওয়া যায়! আর বিজলী—সে কি তার জীবন শ্মশান করিয়া চিতানলে তাকে বিসর্জ্জন দিয়া অনায়াসে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে?—

এই রকম আরও কথা ছিল।

পত্রখানির প্রতি শব্দে প্রতি পঙ্ক্তিতে প্রেমের এমনই একটা আকুল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছিল যাহার স্পর্শে বিজলীর প্রাণ ভরিয়া তেমনই একটা আকুল উচ্ছ্বাস উঠিল, সমস্ত দেহ ভরিয়া ঘন ঘন যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল। অতি আনন্দময় একটু উদ্বেলিত ভাবের আবেশে সে বিভোর হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে আবার পত্রখানি পড়িল—আবার পড়িল! ক্রমে ভাবের বিভোরতা একটু কাটিয়া পত্রের মর্ম্মার্থের দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। তিনি কি চান?—তাঁর বা তার কাহারও পিতামাতার অনুমোদনে বিবাহ হইবে না, তবে—কেমন করিয়া তাঁর সঙ্গে মিলন হইবে? তিনি কি লিখিয়াছেন?—পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে!—কেমন করিয়া? একা—পলাইয়া! সর্ব্বনাশ! ওকি কথা তিনি লিখিয়াছেন!

বিজলী শিহরিয়া উঠিল। তার মুখ শুকাইয়া গেল। বুক দুক্ দুক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।—ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে হইবে! সর্ব্বনাশ? তাও কি কেউ পারে? চিঠিখানি সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িল—তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া নিকটে কেউ নাই দেখিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু মনটা তার একেবারে ভাঙ্গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মনে হইল সমস্ত পৃথিবী তার পক্ষেই এক মহা অন্ধকার শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—সেই শ্মশানে তারই চিতা জ্বলিতেছে!

মার ঘুম ভাঙ্গিল,—কি কাজে তিনি বিজলীকে ডাকিলেন। বিজলী ধীরে ধীরে উঠিয়া মার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তার মুখের দিকে চাহিয়া মা চমকিয়া উঠিলেন।

"কিলো! কি হয়েছে তোর? মুখ যে তোর একেবারে শুকিয়ে পাংশে হ'য়ে গেছে?"

বিজলী একটু থতমত খাইয়া বলিল, "কিছু না মা,—খেয়ে উঠে বড্ড মাথা ধ'রেছিল—তাই—"

স্বর্ণময়ী একটু ভ্রূকুটি করিলেন,—বিজলী মার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। এক পাশে একটা টেবিলে বই ও কাগজপত্র ছিল তাই নিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। মা একটু তীব্র স্বরে কহিলেন, "কদ্দিন অবধিই দেখ্‌ছি,—কেমন আনমনা কেমন ভার ভার হ'য়ে থাকিস্—কি ভাবিস্। কি ভাবিস্ তুই? কি হ'য়েছে?"

বিজলী উত্তর করিল, "কি ভাব্‌ব? এই মাঝে মাঝে মাথা ধরে—আর বুকটার মধ্যে কেমন দুক্ দুক্ করে—"

"তা ব'লতে হয় না? অসুখ হ'য়ে থাকে—ব'ল্‌বি,

উনি কাউকে দেখিয়ে ওষুধ বিষুধ একটা ব্যবস্থা করবেন।"

বিজলী কোনও কথা বলিল না। তার বুক ফাটিয়া রোদন বেশ উঠিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মার বুকে ক্লিষ্ট মুখখানি রাখিয়া সব কথা তাঁকে বলে—বলিয়া বুকের ভার একটু হাল্কা করে,—মার কাছে সান্ত্বনা চায়—উপদেশ চায়। কিন্তু তা পারিল না। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আহা, অভাগী! যদি তা সে পারিত! স্বর্ণময়ী শুব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।—"না! আর দেরী করা মোটেই উচিত হইতেছে না। উনিও যেমন কিছু ত বোঝেন না। বলিতে গেলেও উড়াইয়া দেন। খুঁটিনাটি নিয়া গোলমাল করিতেছেন। দুই একশ টাকা বেশী এমন লাগে, লাগিবে। যা তারা বলিতেছে, তাতে সম্মত হইয়া কেন বিবাহটা দিয়া ফেলুন না।"

রোজই ঝি বেলা পড়িলে চুল বাঁধার উপলক্ষ করিয়া বিজলীকে লইয়া ছাদে যাইত। কিন্তু আজ বিজলীর নিভৃতে ঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল, কে জানে ঝি কি বলিবে, না না, আর ওতে কাজ নাই। আর সে ঝির সঙ্গে ওসব কথা কিছু বলাবলি করিবে না। তার কোনও কথাই শুনিবে না। মা নীচে রন্ধনের আয়োজন করিতেছিলেন, বিজলী গিয়া তাঁর কাছেই বসিল, ঝি ডাকিল,—"চুল বাঁধবে না দিদিমণি?"

বিজলী উত্তর করিল, "না বড্ড মাথা ধ'রেছে—আজ আর চুল বাঁধব না।"

ঝি একটু চমকিত ভাবে বিজলীর মুখের দিকে চাহিল, বিজলীও ঝির মুখের দিকে চাহিল। ঝি একটু থমকিয়া শেষে কহিল, "তা না চুল বাঁধ—মাথা ধ'রেছে, ছাদে গিয়ে একটু বেড়াও না? এই গুমটের মধ্যে ব'সে থাকলে যে আরও বাড়বে।"

স্বর্ণময়ীও বিজলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা মাথাই যদি ধ'রে থাকে—ছাদে গিয়ে হাওয়ায় একটু বেড়া না? এখানে হাওয়া বাতাস নেই—এই গরম আর ধোঁয়া—এর মধ্যে কেন এসে ব'সে আছিস্। মেয়ের যে দিন দিন কি হ'চ্চে! সবই অনাছিষ্টি। যা ছাদে যা একটু বেড়াগে।"

ঝি কহিল, "তাই যাও। দিদিমণি, এখানে ব'সে থাকলে, মাথা তুলতেই শেষে পারবে না। আর ওই এক রাশ চুল—সারা রাত লুটুয়া পুটুয়া হবে—সইতে পারবে কেন? তার চাইতে চলনা আলগা একটা বেণী ক'রে চুলটা জড়িয়ে দিগে। কি বল মা? তাই ভাল হবে না?"

"তাই যা,—বেশ ঢিলে ক'রে চুল জড়িয়ে দিগে যা। এলো চুল চোকে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, রেতে কি ঘুমুতে পারবে?"

অগত্যা বিজলী উঠিয়া ছাদে গেল, ঝিও চিরুণী ও চুলের ফিতা লইয়া পিছনে পিছনে গিয়া উঠিল।

ঝি চুলে চিরুণী দিতে আরম্ভ করিল, বিজলী চুপ করিয়াই রহিল। একটু পরে ঝি কহিল, "চিঠি পড়েছ দিদিমণি?"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। চুলে আর কয়েকটা চিরুণীর আঁচড় দিয়া ঝি আবার জিজ্ঞাসিল, "কি লিখেছেন?"

বিজলী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "থাক্ আর ওসব কথায় কাজ নেই ঝি।"

"কেন, কি হ'য়েছে দিদিমণি? কি লিখেছেন তিনি? বিয়ের কোনও ব্যবস্থা কি হবে না?"

"না।"

"ওমা, সে কি? এ কেমন কথা? এত ভাল বেসেছেন, তুমি এত ভালবেসেছ তাও জানেন, তবে ক'ত্তে চান না কেন?"

"বিয়ে তাঁর বাবাও দেবেন না, আর আমার বাবাও দেবেন না। তিনি পালিয়ে যেতে বল্লেন।"

"ওমা কি সর্ব্বনাশের কথা! লোক ত তা হ'লে ভাল নয় দিদিমণি! একেবারে ডাকাত যে।"

এই নিন্দাটাও বিজলীর প্রাণে গিয়া একটু আঘাত করিল। বুঝাইয়া সে বলিল, "তিনি লিখেছেন, এঁরা যখন বিয়ে দেবেনই না, ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে তিনি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে নিজে বিয়ে ক'রবেন।"

"তবু রক্ষে! তা হ'লে কি করবে?"

"না, তা পারব না।"

"তা হ'লে—কি ক'রে বিয়ে হবে?"

"হবে না।" রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বিজলী এই ছোট 'হবে না' কথাটি উচ্চারণ করিল। ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া

কহিল, "তার পর? কি হবে তাহ'লে? প্রাণধরে কি বেঁচে থাক্‌তে পারবে?"

"না পারি, মরব! তবু ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারব না। সর্ব্বনাশ! তাই কি কেউ পারে?"

"ভালবাসার টান তেমন হ'লে লোকে সবই পারে। যমুনার কূলে কদম তলায় যখন শ্যামের বাঁশী বাজত, রাত দুপুরে যে রাধা ঘর ছেড়ে পাগল হয়ে ছুটত।"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। ঝি আবার কহিল "সেকালে বেশ ছিল, ভালবাসাবাসি হলেই লোকে গন্ধর্ব্ব বিয়ে ক'ত্ত। এইত দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা—"

"তোমার পায়ে পড়ি ঝি, ও সব কথা আর তুলো না, আমার ভাল লাগে না।"

একটু কাল নীরবে থাকিয়া ঝি আবার কহিল, "কিন্তু আর এক যায়গায় যে তোমার বিয়ে ওঁরা দিচ্চেন। শুনলাম ত এই মাসেই বিয়ে হবে।"

বিজলীর বুকের মধ্যে বড় তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিল, বড় গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সে ত্যাগ করিল। ঝি কহিল, "একজনকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে, কি ক'রে আর একজনের বউ হয়ে তার ঘরে যাবে?"

বিজলী উত্তর করিল "দেখি—শেষে না হয় মাকে সব ব'লব।"

"তাতে কি হবে?"

"মন যখন আমার এই রকম হ'য়ে গেছে, আর কোথাও বিয়ে হ'লে ভাল হবে না, তাই বুঝিয়ে ব'লব, বিয়ে তাঁর, দেবেন না।"

ঝি একটু হাসিয়া বলিল "তাই কি হয় দিদিমণি! হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিয়ে না হ'লে যে জাত যাবে। তা ওঁরা শুনবেন কেন? ধম্‌কে চম্‌কে জোর ক'রে বিয়ে দেবেন।"

বিজলীর চোক মুখ যেন আগুণ হইয়া উঠিল—একটু কি ভাবিয়া সে বলিল, "তা যদি দেনই, নাই যদি শোনেন তবে—"

"তবে—কি ক'র্‌বে।"

"মর্‌ব—বিষ খেয়ে পারি, গলায় দড়ি দিয়ে পারি, বা আগুণ পুড়ে পারি,—মরব।"

ঝি শিহরিয়া উঠিল।

"কি সর্ব্বনাশ! বল কি দিদিমণি! অমন কথা মুখে আন্‌তেও আছে? ওতে যে মহাপাপ হয়। এর চাইতে এই প্রথম বয়স—কত সুখ ক'র্‌বে—ভালবেসে ভালবাসা পেয়েছ—সেই ভালবাসার জনের কাছে পালিয়ে যাওয়াও কি ভাল নয়? সে যে মাথায় করে তোমায় রাখ্‌বে, পৃথিবীতে স্বর্গের সুখে থাকবে।"

"না—না—না—তা পারব না। পারব না বল্‌ছি! চুপ কর তুমি।"

যারপরনাই উত্তেজিত ভাবে চুল ছাড়াইয়া নিয়া, বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ওমা, রাগ ক'ল্লে দিদিমণি! তা রাগ কর, আর বল'ব না। তোমায় দুঃখু দেখে প্রাণ নাকি কাঁদে, তাই যা বলি! নইলে আমার আর কি? আমার সুখ দুঃখ সব কবেই গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করেছি। তা ব'স, চুলটা বেঁধে দিই। আধা চুল বাঁধা নিয়ে ছুটে যদি নীচে যাও, মা কি ব'লবেন।"

"ও কথা আর বল'বে না বল!"

"না। তোমার দিব্বি দিদিমণি, আর বল'ব না।"

বিজলী বসিল। ঝি তাড়াতাড়ি করিয়া বেণী বিনাইয়া সহজে একটা ঢিলা খোপায় তা জড়াইয়া দিল।

বিজলী উঠিয়া নীচের দিকে চলিল। ঝি কহিল, মাথা ধ'রেছে, একটু বেড়াবেনা ছাদে?

"না, ভাল লাগ্‌ছে না। শুয়ে থাকিগে।"

"হাঁ, রাগ ক'রো না—একটা কথা শুধু সুধোব।"

"কি?"

"চিঠির একটু উত্তর—"

"না,—দরকার নেই।"

"সুধোলে কি ব'লব?"

"ব'লো—তা হবে না। পালিয়ে যেতে আমি পারব না।"

নিরঞ্জন ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—হঠাৎ বিজলীর দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল, দুপদাপ করিয়া ছুটিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। গিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল।"

(১৩)

পরদিন দেখা গেল, বাড়ী তালাবন্ধ, নিরঞ্জনও নাই, লোকজনও কেহ নাই। দিন দুই পরে দারোবান আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া অনেক আসবাব পত্র লইয়া বাড়ী আবার তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

ঝিও কিছু বলিল না,—বিজলীও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আরও দিনদুই গেল। বিজলী মনে মনে বড় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি কোথায় গেলেন? মনের দুঃখে কোনও অত্যাহিত কাণ্ড করেন নাই। কেন সে অমন নির্ম্মম ভাবে এক কথায় 'না' জবাবটা তাঁকে পাঠাইয়াছিল? কেন সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া তাঁকে একটা চিঠি লিখিল না?—যদি তিনি কিছু করিয়া থাকেন! সর্ব্বনাশ! কি হইবে তবে? কেমন করিয়া বিজলী তা সহিবে? মরিলেও যে এত বড় একটা দুঃখের বোঝা—পাপের বোঝা নিয়া সে মরিবে। তাঁর ছার প্রাণ থাকিলেই বা কি আর গেলেই বা কি? কিন্তু তিনি যদি তার জন্যে—না—না, সে যে আর সহ্য করিতে পারে না ঝি কি একটা খবর তাকে আনিয়া দিতে পারে না? পোড়ার মুখী কথাটিও যদি আর বলে! কেন বলিবে? সে যে তাকে ধমকাইয়া দিয়াছে। তার কি? প্রাণে এই অসহ্য যাতনা ত সে ভোগ করিতেছে না।

বিজলী আর পারিল না, নিজেই ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল।

ঝি কহিল, "এখন আর ওকথায় কাজ কি দিদিমণি?" কোথায় তিনি চলে গেছেন, কে জানে? অমন ভাবে জবাবটা পাঠালে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল, "তাঁকে কি ব'লেছিলে?"

"না ব'লে আর করি কি বল? এখান থেকে ত এড়িয়ে গেলাম, রাত্তিরে একেবারে আমাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত।"

"তারপর?"

"বল্লাম—ও সব কথা আপনি কেন লিখেছেন? দিদিমণি কি ঘরছেড়ে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে?"

"শুনে কি ব'ল্লেন?"

"শুনে ত একেবারে মাথায় হাতদিয়ে ব'সে প'ড়্লেন্। দেখি যে মূর্চ্ছা যান আর কি! পাখাখানা নিয়ে, হাওয়া ক'র্ত্তে লাগ্লাম। একটু সোস্তি হ'য়ে শেষে জিজ্ঞাসা ক'র্ল্লেন, চিঠি আছে কিছু? আমি বল্লাম, না, চিঠি আর দিদিমণি লিখ্বে না, আপনিও লিখ্বেন না।—এসব কথাই এখন ভুলি যান্—ব'ল্ব কি দিদিমণি! সর্ব্বনেশে কথা ব'ল্তে না ব'ল্তে একেবারে মূর্চ্ছো হ'য়েই পড়্লেন। ভয়ে আর আমি বাঁচিনে। চোকে মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া ক'র্ত্তে লাগ্লাম। শেষে কতক্ষণ পরে, দেখি চোকমেলে চাইলেন। ধড়ে আমার প্রাণ এল। তারপর কতক্ষণ শুয়ে থেকে একটু সুস্থ হ'য়ে উঠে চ'লে গেলেন।"

"কিছু ব'ল্লেন না আর?"

"না: আর ভাল মন্দ কোনও কথাই ব'ল্লেন না। যতক্ষণ ছিলেন, একেবারে চুপ ক'রেই ছিলেন,—যাবার সময় কেবল ব'ল্লেন, আসি তবে এখন ঝি। আমারও আর কোনও কথা মুখে সরল না। পরদিন সকালে এসে দেখি, বাড়ীতে তালা বন্ধ। আর কোনও খবর জানি না।"

বিজলীর মুখ একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছিল। ঝির মনে হইল, সেও যেন মূর্চ্ছা যায়। কহিল, "তোমার বোধ হয় খুব অসুখ বোধ হ'চ্চে দিদিমণি। যাও একটু শুয়ে থাকগে।"

ছাদেই কথা হইতেছিল, বিজলী কম্পিত চরণে নীচে নামিয়া আসিল,—আসিয়াই শুইয়া পড়িল। সারারাত্রি—সেদিন বিজলী ঘুমাইতে পারিলনা। দারুণ দুঃসহ অন্তর্দ্দাহ অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই। নিঃশব্দে একবার শুইয়া একবার বসিয়া যেন বিষাক্ত কণ্টকশয্যায় সে রাত্রি কাটাইল।

(১৩)

পরদিন গেল, সে রাত্রিও বিজলী তেমনই কণ্টক-শয্যায় কাটাইল। তার পরদিন বৈকালে ঝি তাকে ছাদে ডাকিয়া নিয়া কহিল, "আজ নিরঞ্জন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল দিদিমণি।"

"দেখা হ'য়েছিল! কোথায়? ভাল আছেন ত?"

"বেঁচে আছেন এই পর্য্যন্ত। নইলে ভাল আর কি? একেবারে পাগলের মত, উস্কো খুস্কো চুল, চোক দুটো লাল, আহা অমন যে সুন্দর মহাদেবের মত চোক্ দুটি—একেবারে রক্তজবা হ'য়ে ফুলে উঠেছে! অমন যে রাজপুত্তুরের মত শ্রী—একেবারে যেন শুকিয়ে কালী হ'য়ে গেছে!"

"আহা! কিছু ব'ল্লেন?

"হাঁ—একটা চিঠি দিয়েছেন। ব'ল্লেন, এখানে

টি'কৃতে পাচ্ছি না, আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। যাবার আগে একটিবার তার সঙ্গে দেখা যদি হয়—শেষ দুটো কথা যদি ব'লে যেতে পারি, এই চিঠিখানা তাকে দিও, যদি না প'ড়ে, তুমি একটু বুঝিয়ে ব'লো। আর কিছু চাইনে শেষ একটিবার তাকে দেখব—শেষ দুটো কথা তাকে বলে যাব।—তা—চিঠিটাকি দেব ?"

"হাঁ দেও।" বিজলী হাত বাড়াইল। ঝি আঁচলের খুঁট হইতে চিঠিখানা খুলিয়া বিজলীর হাতে দিল। বিজলী পড়িল। ঝি যাহা বলিয়াছিল, চিঠিতে আকুল উচ্ছ্বাসে সেই কথাই লেখা ছিল? চিঠিখানি পড়িয়া বিজলী একটু কাল চুপ করিয়া রহিল,—মুখখানি একবার লাল হইয়া, আবার পাংশু হইয়া গেল, আবার লাল হইয়া উঠিল। চোক তুলিয়া বিজলী ঝির মুখপানে চাহিল। চক্ষু দুটি ছলছল—অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল!

ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কি ব'লব দিদিমণি ?"

"কি ক'রে দেখা হ'তে পারে ?"

"তা'ত কিছু বলেননি। সন্ধ্যের আগে আবার আস্‌বেন ব'লেছেন। তুমি যদি বল, তা হ'লে ব'লেছেন একটা ফিকির যা হয় বুঝে ক'র্‌বেন।"

"আচ্ছা—জিজ্ঞাসা ত ক'রে এস। যদি সুবিধে হয়—তা হ'লে—আচ্ছা—দেখাই না হয় ক'রব। কিন্তু কি ক'রে হবে বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।"

"আচ্ছা শুনিত—দেখি তিনি কি বলেন। ফিকির কিছু ক'ত্তে পারেন দেখা হবে, না পারেন নেই। উপায় আর কি আছে ?"

সন্ধার আগেই ঝি একটা ছুঁতা করিয়া বাসায় গেল। কতক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বিজলী ছাদেই বেড়াইতেছিল। বালাই দূর হইয়াছে, এখন যতক্ষণ ইচ্ছা একা ছাদে বেড়াক না! ভয় কি ?—মা কিছু বলিলেন না। সত্যই যদি মাথা-ধরার ব্যারাম হইয়া থাকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়াইলে ভালই হইবে।

ঝি ছাদে গিয়ে বিজলীকে নিরঞ্জনের ফিকিরের কথা সব বুঝাইয়া বলিল। ওই বাড়ীটা সে ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়া দেয় নাই। গভীর রাত্রিতে পিছনের দরজা দিয়া সে ওই বাড়ীতে আসিবে। বিজলী যদি তখন ঝির সঙ্গে কোনও মতে একেবার বাহির হইয়া যাইতে পারে, তবে দেখা হয়। বেশীক্ষণ দেরী হইবে না। একটু পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। সে দিন কালীঘাটে যেরূপ সুযোগ ঘটিয়াছিল,—সেরূপ দ্বিতীয় সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম। ঘটিলেও কতদিনে ঘটিবে, কেজানে? অতদিন কি নিরঞ্জন অপেক্ষা করিতে পারে? তাহা হইলে যে সে একেবারে পাগল হইয়া যাইবে। বিজলীর কোনও ভয় নাই। একটুকাল মাত্র, শেষে বিদায় নিয়া - শেষ দুটি কথা বলিয়াই সে চলিয়া যাইবে। বিজলী আবার ঝির সঙ্গে গৃহে ফিরিবে। কেহই টের পাইবে না।

বিজলীর তখন হিতাহিত বুদ্ধি ছিল না। সে ভয় পাইল, মনটার মধ্যে যেন কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু একেবারে না বলিতে পারিল না। এযে শেষ দেখা—শেষ বিদায়! কোন প্রাণে সে 'না' করিবে। একবার সেই নির্ম্মম ব্যবহারে সে যে তাকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিল। আজ যদি শেষ এই অনুরোধ উপেক্ষা করে, তবে যে একেবারেই তিনি মরিয়া যাইবেন, আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবে—কেহ যদি টের পায়। কি সর্ব্বনাশ তখন হইবে! না না টের পাইবে কেন? খুব সাবধানে নিঃশব্দে যাইবে। আবার সাবধানে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে। আর টের যদি পায়ই, সে ত মরিতেই প্রস্তুত। না হয় মরিয়াই লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু তাঁকেত সে একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে না। কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বিজলী শেষে সম্মত হইল। কিন্তু ঝির সঙ্গে কেমন করিয়া যাইবে? ঝি দশটায় বাসায় যায়, তখন ত কেহ ঘুমায় না?

ঝি কহিল, রাত্তির বারটা বাজিলেই আমি ফিরে আসব।' ওই বাড়ীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। তুমি বেরোলেই তোমাকে নিয়ে আমি ভিতরে ঢুক্‌ব। দরজা খোলাই থাক্‌বে।

বিজলীর সমস্ত প্রাণ—সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ঝি যা বলিল তাতেই শেষে রাজি হইল।

ক্রমশঃ

আমার মক্কেল।

একে একে তিনটা পাশ করিবার পর যখন পুস্তক-নিবিষ্ট দৃষ্টি সংসারের দিকে ফিরাইলাম, তখন মনে প্রথম চিন্তা উঠিল এইবার কি করি, কোন দিকে যাই।

বাল্যকাল হইতেই আমি পিতৃমাতৃহীন। পিতৃবন্ধুগণ সকলেই উপদেশ দিলেন, বি, এল্ পাশ দিয়া উকীল হইতে, কারণ তাহাতে কাঁচা পয়সা বিস্তর। আর আমিও একটু চোখ মেলিয়া দেখিলাম বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্রোত 'ল' কলেজের দিকে প্রবহমান, সুতরাং আর অন্য উপায় না দেখিয়া সেই স্রোতেই গা ভাসাইলাম। কয়েক বৎসর পরে যখন বি, এল হইয়া বাহির হইলাম তখন অল্প পৈতৃক সম্পত্তি যাহা পাইয়াছিলাম তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সংসারে দূর সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা পিসিমা ব্যতীত আমার আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না। কিন্তু এই দুইজনের উদরান্নের সংস্থান করিতে আমার মাথা বেশ একটু গোলমাল হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক আমি বিস্তর কাঁচা পয়সার আশায় দেশের ভদ্রাসন খালি রাখিয়া অপর সমস্ত জমি জমা বিক্রয় করিয়া কালীঘাট অঞ্চলে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিলাম। প্রতিদিন নিয়মিত কোর্টে যাইতে লাগিলাম কিন্তু নব্য উকীলদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটে আমার অদৃষ্টেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই অর্থাৎ সমস্তদিন কোর্টের উঠান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘর ঘুরিয়া কখনও বা প্রচণ্ড রোদের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া উঠানের গাছতলায় দাঁড়াইয়া, বৈকালবেলা শূন্যহস্তে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। প্রকৃত কথা বলিতে কি আমি প্রত্যহ আদালতের নীচ উচ্চ অনেক লোকের খোসামোদ করিতাম কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার প্রতি অবজ্ঞাভরে চলিয়া যাইত। এই প্রকারে 'ঘরের খাইয়া বনের মো'ষ তাড়াইয়া' আমার ওকালতী চলিতে লাগিল।

একদিন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল। সেইদিন দ্বিপ্রহর বেলায় আহারাদি শেষ করিয়া আমি আমার উপরের ঘরে বসিয়া আমার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা ক'রবার জন্য নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিবার জন্য বলিলাম। মনে মনে ভাবিলাম ভগবান বোধ হয় এতদিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটু পরে মুহুরী একজন ভদ্রলোককে আমার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার নিজের বাড়ীতে খাইতে চলিয়া গেল।

আমি লোকটিকে একখানি চেয়ারে বসিতে দিলাম। লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। তাঁহার বেশ ভূষা একটু সেকেলে ধরণের কিন্তু মূল্যবান।

একটু পরে ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি আপনার কাছে কোন কাজের জন্য এসেছি, আপনি কি দয়া ক'রে আমার কাজ হাতে ক'রবেন্?"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম আপনার বক্তব্য কি বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার উপকার করতে চেষ্টা করব।"

"তা ত করবেনই—আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি অতি সজ্জন ব্যক্তি, আর আপনাদের মত সদাশয় ব্যক্তির দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি আপনারা না থাক্‌লে কত বড়লোক যে রসাতলে যে'ত তার সংখ্যাই হয় না, আপনারাই—

আমি দেখিলাম লোকটির একটু ছিট আছে সুতরাং তাঁহাকে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিলাম, "আপনি অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন, আপনার বক্তব্যটাই আগে আমাকে শুনতে দিন না।"

তিনি যোড়হাত করিয়া বলিলেন "মহাশয় মাপ করুবেন কথায় কথায় আমার মনে ছিল না। আমি জানি উকীল-দিগের সময়ই টাকা, আমি সেই দামী সময় অনেকটা নষ্ট ক'রে দিলাম। দয়া ক'রে এই নিন্ আপনার সময়ের দাম।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজের কৌটা বাহির করিয়া বলিলেন "ইহার ভিতর পাঁচ টাকা আছে, এই নিন্ আপনার সময়ের দাম।"

আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আপনি কি বলছেন, টাকা এখন কেন? আপনার কাজ কি তা'

"ও কথা ব'লে আমার মহাপাতক ক'রবেন না। আমি আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করেছি, আমি কি মহা——"

"না মহাশয় মাপ ক'রবেন, আমি এখন টাকা নিতে পারব না।"

"আমার চৌদ্দপুরুষের অনুরোধ।"

আমি দেখিলাম এরূপ লোকের সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া কোন ফল হইবে না, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। লোকটি কৌটাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন "এইবার আপনাকে আমার প্রার্থনা বল্‌ছি শুনুন—ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যান। তিনি একজন বড় জমিদার ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র সন্তান, সুতরাং তাঁহার কাল হইবার পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমিই পাই। সেই সমস্ত সম্পত্তি একলা দেখ্‌তে পারতাম না বলে আমি একজন উকীলকে তাহার সলিসিটার নিযুক্ত করেছিলাম। আমি তাঁহার উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম কিন্তু এখন দেখছি তাঁ'র দ্বারা আমার সম্পত্তি রক্ষে হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন অনিষ্ট হচ্ছে। সেইজন্য আমার ইচ্ছে যে আপনাকে সেই কাজে নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হই। আপনি মহৎ ব্যক্তি আপনি কথনই দয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত কর্‌তে পারবেন না। আমি লোক—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার কথায় আমি খুবই সম্মত আছি, কিন্তু কাজ হাতে নেবার আগে আমার অনেক বিষয় জানা দরকার। প্রথমতঃ—"

"মহাশয় আবার আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট ক'রে দিলাম। এই নিন্ আপনার সময়ের দাম।" এই বলিয়া পকেট হইতে পুনরায় একটি কৌটা বাহির করিলেন।

"আঃ আপনি কি করছেন?"

"তা'কি হয়? আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির স্বার্থের হানি কথনই কর্‌তে পারব না।"

"যাই বলুন মহাশয় আমি কথনই ও টাকা নিতে পারব না।"

"আমার চৌদ্দপুরুষের অনুরোধ।" এই বলিয়া তিনি সেই কৌটাটি পূর্ব্বোক্ত কৌটার নিকট রাখিলেন।

আমি আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিলাম "প্রথমতঃ আমি আপনার সমস্ত সম্পত্তির একখানা তালিকা দেখ্‌তে চাই।"

তিনি পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন "এই যে, এইখানি প'ড়ে দেখুন ইহাতে সমস্তই পাবেন।"

আমি কাগজখানি লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাঁহার লেখা এরূপ কদর্য্য যে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি সেইখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম "মহাশয় যদি দয়া ক'রে পড়েন তাঁহ'লে বড় ভাল হয়।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার লেখা বড়ই বিশ্রী। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছলেন, পড়াশুনার তত—"

"আজ্ঞে না, লেখা বেশ, তবে কতকগুলো দেশের নাম যা ওতে লেখা আছে, সেগুলো আমার ভাল জানা নেই কিনা তাই একটু বাধ বাধ ঠেক্‌চে।

ভদ্রলোকটি কাগজ লইয়া সমস্ত পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পড়া শেষ হইলে আমি বলিলাম "দেখুন যে সমস্ত দেশের নাম আপনি পড়লেন ঐ সমস্ত দেশের জমিদারী আমার ভাল ক'রে দেখা দরকার।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! ওকথা বলাই বাহুল্য মাত্র, আমি নিজে আপনাকে সমস্ত দেখিয়ে আন্‌ব। মহাশয় মাপ ক'রবেন, কথায় কথায় ভুলে গেছলাম।" এই বলিয়া পুনরায় পকেট হইতে একটি কৌটা বাহির করিলেন।"

এবারে আমি একটু রাগত ভাব দেখাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম "মহাশয় মাপ ক'রবেন, আমি আপনার কাজ হাতে কর্‌তে অক্ষম।"

তিনি তাড়াতাড়ি আমার দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন "দেখুন আমি আপনার হাত ধ'রে বল্‌ছি এ কাজে আমায় বাধা দেবেন না, এই আমার চৌদ্দপুরুষের অনুরোধ।" এই বলিয়া কৌটাটি টেবিলের উপর রাখিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আদালতে অনেক প্রকার লোকের সহিত আমাকে মিশিতে হইত কিন্তু এরূপ অদ্ভুত লোকের সঙ্গে কথনও কথাবার্ত্তা কহিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি মনে মনে তাঁহার এই খেয়ালের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম কিন্তু মনে বেশ আনন্দও যে না হইতেছিল তাহা নহে। হইবারই কথা! আজ দুই মাস প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছি কিন্তু কথনও যে দুই টাকা এক সঙ্গে উপায় করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; আর আজ কিনা এক ঘণ্টার মধ্যে একেবারে পনের টাকা

উপায়! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছি এমন সময় নীচে কে ডাকিল, "উকিল বাবু বাড়ী আছেন?"

আমার মুহুরী তখন বাড়ী গিয়াছিল সুতরাং আমি ভদ্রলোকটিকে একটু বসিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বয়স অনুমান সতের আঠার হইবে। বেশভূষা ব্রাহ্মধরণের, দেখিতেও বেশ সুশ্রী।

আমাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "আপনিই কি প্লিডার?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনার কি দরকার বলুন।" "আপনার এখানে কি একজন ভদ্রলোক এসেছেন?"

"আজ্ঞা হাঁ, কেন বলুন দেখি?"

"তিনি কি আপনাকে তাঁর সম্পত্তির সলিসিটার করবেন বলেছেন, আর সেই সমস্ত সম্পত্তির একখানি তালিকা আপনাকে দেখিয়েছেন? আর আপনাকে কৌটা করে কতকগুলি টাকা দেখিয়েছেন?"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "আমাকে যাহা বলছেন সবই ঠিক কিন্তু আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।"

"ম'শায় তিনি আমার বাবা। আপনি বোধ হয় তাঁ'র সঙ্গে কথা ক'য়ে বুঝতে পেরেছেন যে তিনি খামখেয়ালী লোক। তাঁ'র অনেক জমি জমা আছে। আজ তিনি তাঁর সম্পত্তির যে সলিসিটার, তাঁ'র সঙ্গে রাগারাগি ক'রে আপনার এখানে চ'লে এসেছেন। তিনি এখন পর্যান্ত কিছুই খান নাই, সেই জন্য আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনি যদি দয়া ক'রে তাঁ'কে বলে ক'য়ে আমার সঙ্গে বাড়ীতে আহারাদি করতে পাঠিয়ে দেন তা'হলে বড় ভাল হয়। আর দেখুন এ সমস্ত কথা ধীরে সুস্থে হওয়াই ঠিক, আমরা বিকালে এসে সমস্ত কথাবার্ত্তা কইব।"

"এ সমস্ত কথা ত আমি কিছুই জানি না, তা'হ'লে কখনই এখন তাঁ'র সঙ্গে আমি কথা কইতাম না! যা'হ'ক আপনি উপরে চলুন আমি তাঁ'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে লইয়া গেলাম।

ঘরে ঢুকিয়াই স্ত্রীলোকটি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা আপনি 'এই আসছি' ব'লে চ'লে এলেন আমি কত খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি। দেখুন দেকি কত বেলা হ'য়েছে—আপনি বাড়ী চলুন, এখনও পর্য্যন্ত কিছু খান নি, শরীরের উপর আপনার একটুও নজর নাই।

"ছি মা এখন কাযের সময় কি বিরক্ত করতে আছে! তুমি চল আমি একটু পরে যাচ্ছি।" এই বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

আমি বলিলাম "না ম'শায় আপনি আহারাদি ক'রে না এ'লে আমি আপনার সঙ্গে কোন কথা কইব না।"

"আপনি যখন বলছেন তখন আর অস্বীকার করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন।

স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একটু যা'ন তাহ'লে বড় ভাল হয়। দেখছেনত বাবা একঝোঁকা লোক, হয়ত আবার রাস্তায় কা'র সঙ্গে চ'লে যাবেন।"

"বেশত চলুন আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।" এই বলিয়া আমি আমার মুহুরীর ঘর হইতে দুইটী তালা লইয়া একটি আমার ঘরে লাগাইয়া ও অপরটি সদরের দরজায় লাগাইয়া তাঁহাদের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে লোকটি আমার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইবার পর স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিলেন "আর আপনাকে যেতে হ'বে না, আপনি বাড়ী যান। আপনার উপকার জীবনে ভুলব না।"

"না, এ আর উপকার কি, চলুন না আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ভদ্রলোকটি কিন্তু কিছুতেই আমাকে আর যাইতে দিলেন না। তিনি আমাকে ফিরিবার জন্য নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমি তাঁহাদের অভিবাদন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সদরের চাবি খুলিয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম আমার মক্কেল প্রদত্ত কৌটা তিনটি টেবিলের উপর রহিয়াছে। মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সেইগুলিকে ড্রয়ারে রাখিবার জন্য আমি আমার চাপকানের পকেট হইতে চাবি লইয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া

গেলাম। দেখিলাম আমার ড্রয়ার শূন্য। আমার টাকার ব্যাগ, আমার স্বর্ণের ঘড়ি ও চেন ও পেন্সিল কেস্ সমস্তই আমার মক্কেলের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। টেবিলের উপর হইতে কৌটা কয়টি লইয়া খুলিয়া দেখিলাম তাহাদে ভিতর কাগজে মোড়া কয়েকখানি করিয়া পিতলের চাকতি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেব।

সুরম্য মর্ম্মর হর্ম্ম্য হেলাভরে করি পরিহার,
জীবমুক্তি মহাযজ্ঞে আত্মসুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
রাজার দুলাল আজি বনপথে করেন বিহার,
তেয়াগিয়া পত্নী-পুত্র লভিবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।

বসন্তসমীরস্পর্শে হৃদি-তন্ত্রী উঠেনা শিহরি,
প্রচণ্ড রবির কর স্পর্শে তাঁর শিশির শীতল,
অপূর্ব্ব জ্যোতির বর্ম্ম বরবপু রেখেছে আবার,
শ্রাবণের বারি ঝরে পরিহরি' তনু অচঞ্চল।

বিজনে কাননরাণী দুর্ব্বাদলে গড়েছে আস
বিশাল বিটপিছত্র ছায়াখানি দিয়াছে প্রসা
পাখীগুলি নির্নিমেষ পশুগণ তৃষিত নয়ন,
মেলিয়া কুসুম আঁখি তরুলতা চাহে সারি স

শ্রীচরণ রজোলাভে বনভূমি সফল জীবন,
পুলকে রোমাঞ্চ তার দুর্ব্বাঙ্কুরে পায় পরকা
তপঃশীর্ণ দেহবাসে সুরভিত মুগ্ধ সমীরণ
লুটে পদে,—কৃতজ্ঞ অন্তরে চাপি উদ্দাম উচ্ছ্বাস।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন

আমার যুদ্ধযাত্রা।

সেপ্টেম্বর মাসে সবেমাত্র তুর্কী হইতে বন্ধন মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। এখনও যেন নিশাবসান না হইতেই আরবগণের সেই বিকট চীৎকার আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া দেয়। কি যেন, একটা অব্যক্ত বেদনা, একটা গভীর আর্ত্তনাদ এখনও থাকিয়া থাকিয়া মনটাকে ভীতির শিহরণে স্পন্দিত করিয়া তুলে। কত দেশ দেশান্তর, কত মরু প্রান্তর, কত সাগর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া "আমার সোণার বাংলায়" প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি—"বহুদিন পরে আবার আপন কুটীরবাসী" হইয়াছি। তবুও যেন সব আমার কাছে স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হইতেছে। এখনও যেন নিজের মনের সঙ্গে ও কাজের সঙ্গে [illegible] সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিতেছি না।

যাক্, আবার [illegible]শে ত ফিরিয়া আসিয়াছি। অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগের পর যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু পরের দেশে ঘুরিয়া, বলদৃপ্ত যোদ্ধাদের সহিত মিশিয়া, সমরাঙ্গনের সেই ভীম-ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের মতি গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সামরিক জীবনে এখন আমরা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত—সাংসারিক শান্তিময় জীবন এখন আর ভাল লাগে না। কাজেই দু' চারিদিনের মধ্যে যখন শুনিলাম যে আমরা Parole এ মুক্ত নহি—তখনই প্রাণটা আমোদে নৃত্য করিয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্রের সেই চিত্র মনে করিয়া, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দৃশ্য মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া পূজ্যপাদ ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর কৃপায় নবনিয়ন্ত্রিত "Bengal Double Company" তে নাম লিখাইয়া লইলাম। নবোৎসাহে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কেল্লা হইতে সদলবলে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া নৌসেরা যাত্রা করিলাম।

কিন্তু সত্য, কথা, বলিতে কি প্রথম প্রথম বেশ একটা

মুক্তমনা এবং কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু গাড়ী যখন হাওড়া ত্যাগ করিল তখন প্রাণের মধ্যে কেমন একটা হু হু ছটফটানি ভাব আসিয়া আমাকে কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত করিয়া তুলিল।

যাত্রার পূর্ব্বদিন সেনহাটীবাসী যাবতীয় ভদ্রমণ্ডলী আমাকে বিদায় দিবার জন্য একটী সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদ—'মৃত্যুমাঝে মৃত্যুঞ্জয় হও'—'জগদীশ করুন কল্যাণ—' মস্তকে ধারণ করিয়া আমি সত্যই ধন্য হইয়াছি—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রকৃতই জীবনের কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

দেশের লোকের নিকট হইতে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা লাভ করিলাম তাহার সহিত আমাদের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া মনে বড়ই লজ্জিত হইলাম। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষতঃ জননী সম্প্রদায় (মহিলা সমিতি) আমাদের জন্য নিজেদের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কত আগ্রহ সহকারে আমাদের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত—কত কষ্ট করিয়া আমাদিগকে নানাভাবে আশীর্ব্বাদ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে সকলেরই একটা অনবদ্য গর্ব্ব ও আহ্লাদে বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠে।

দেশের অযোগ্য সন্তান আমরা, বিশেষতঃ মূর্খ—তাই সামান্য মাত্র শরীর সম্বল লইয়া দেশ সেবা করিতে যাইতেছি। আমাদের এমন ধীশক্তি নাই—এমন কার্য্যক্ষমতা নাই যাহাতে অন্যভাবে আমরা কিছু পারি। কাজেই এই সহজ সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। দেখি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও বাঙ্গালীর—কবির ভাষায় 'স্বপ্নে দেখে গোলা গুলি, চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি' জাতির কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালন করিতে সক্ষম হই কিনা। 'মরণ-শয়ন' লভিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিব—বাঙ্গালী যে বীর আখ্যা লাভ করিতে সমর্থ জগতবাসীকে তাহা দেখাইতে চাই।

বন্ধু বান্ধবগণের নিকট হইতে যেরূপ সমাদর ও সাদর সম্ভাষণ পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। তারপর ষ্টেশনে ষ্টেশনে দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ নানাবিধ বাদ্যে এবং সাদর সম্ভাষণে আমাদিগকে অশেষ আপ্যায়িত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন—তাঁদের আশীর্ব্বাণীতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

যেদিন আমরা যাত্রা করি সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে খুব সমারোহ এবং লোকের ভীড় হইয়াছিল। মহিলাবৃন্দের উৎসাহবাণী এবং আশীর্ব্বাদ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক সৈনিককে একটী পেটিকায় (Comfort bag) নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্য এবং শয্যা-দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহারা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রমণীগণ বাঙ্গালীবৃন্দের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন সে সমস্ত বস্তুতঃই অবর্ণনীয়, ইহাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য—ইহাঁদের স্নেহদৃষ্টি সততই আমাদিগের বহুবিধ সুখ বিধানে নিপতিত রহিয়াছে।

ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে "বন্দে মাতরম" ধ্বনিতে সমস্ত ট্রেণ এবং প্লাট্‌ফরমটি বিকম্পিত হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়গুলি আনন্দে এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমরা রাজা ও দেশের কার্য্যে দূর দূরান্তর চলিলাম। কিন্তু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং জন্মস্থান পরিত্যাগ জন্য কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া প্রতিভাত হইতেছিল না ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। তন্ময়চিত্তে সেই প্রসিদ্ধ মধুর সঙ্গীত 'আবার তোরা মানুষ হ' গাহিতে গাহিতে গাড়ী অনেকদূর আসিয়া পড়িল।

গাড়ী যতই দূর পশ্চিমে অগ্রসর হইতে লাগিল আমাদের আদর অভ্যর্থনায় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেখানে বাঙ্গালী যত কম সেখানেই যেন তাহারা নিজেদের মুষ্টিমেয় সংখ্যা লুক্কায়িত রাখিবার জন্যই অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। সব ষ্টেশনের কথা বলিতে গেলে কাহিনী বড় হইয়া পড়ে। সুতরাং দু'চার জায়গার কথা বলিয়া এই অযাচিত অভ্যর্থনার পরিচয় প্রদান করিব। বাঁকীপুর, মোগলসরাই প্রভৃতি ষ্টেশনে আমাদের বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের মহানুভবতা ও আন্তরিক প্রণয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। চা, বিস্কুট, নানা মিষ্টান্নের অপ্রতুল হয় নাই। প্রায় ৫৷৷০টার সময় গাড়ী এলাহাবাদে পৌছিল। এখানে প্রায় ২০৷২৫ মিনিট গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক গাড়ীর দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আমাদের রওনা হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কোনও সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রত্যেকেই অনুযোগ করেন। কোন প্রকারে তাঁহাদের উদারচিত্তকে শান্ত করিয়া আমরা তাঁহার সমস্ত প্রদত্ত আহার্য্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করি। আমরা কাহাকে

কোনও কষ্টদায়ক কথা বলি নাই। এ বিষয়ে যদিও ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও পূর্ব্বে জানান হয় নাই, কিন্তু সেটা যে আমাদের মস্ত একটা ভুল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলাম। তাঁহাদের প্রাণের টান, আদর ও একাগ্রতা দেখিয়া আমরা মনে মনে কতই আক্ষেপ প্রকাশ করিলাম।

এখান হইতে একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী (S. N. Sen Gupta) সরলাদেবীকে এক টেলিগ্রাম করেন। ইনি সর্ব্ব প্রকারে আমাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী উদ্দীপনাময়ী উৎসাহবাণী আমাদের প্রাণে অসীম সাহস আনয়ন করিয়াছিল। মাংস, লুচি, তরকারী, চা, বিস্কুট, পান, সিগারেট পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিতোষ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। নানাবিধ বাক্যালাপে ক্ষীণ সময়টুকু অতিবাহিত হইল—গাড়ীও সশব্দে গন্তব্য পথাভিমুখে ধাবিত হইল। আর সশব্দে দিগন্তমুখরিত সেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একে একে যথাস্থানে উপবেশন করিলাম। ট্রেণে যাতায়াতে অশেষ কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু পথিমধ্যে ভ্রাতৃগণের সাদর অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের প্রদত্ত আহার্য্য প্রদানে আমাদের কোনও কষ্ট অনুভূত হয় নাই।

লাহোরে শ্রদ্ধাস্পদা মাতৃস্থানীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর আতিথ্য গ্রহণে আমরা পবিত্র ও ধন্য হই। সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য ষ্টেশনে ধাবিত হইয়াছিলেন। আমাদের এই "লক্ষ্মীছাড়া দলের" জন্য—এই মূল্যহীন নগণ্য ক্ষুদ্র জীব গুলির জন্য—তাঁহার অসীম অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন পাইয়া পরম আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইলাম—আমাদের জীবনগুলিকে সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তিনি আমাদের জন্য স্বহস্তে নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—আমাদের পরিতোষ ও উৎসাহের নিমিত্ত রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় স্বীয় পুত্রের সহিত নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত সুললিত সঙ্গীতটি সুমধুর কণ্ঠে গান করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করেন—

"বেঙ্গালী ডবল কোম্পানী।"

খাম্বাজ—একতালা।

(১)

কোন্, রূপসাগরে ডুব দিলিরে,
বাঙ্গালী সেপাইরা!
তোদের দেখে চক্ষু জুড়ায়,
ওরে মাণিক ভাইরা।
বাঙ্গালী সেপাইরা, আমার মাণিক ভাইরা!

(২)

দেখেছি সুন্দর শিখ, মরাঠা, গুরখা বীর,
এমন মোহন মূর্ত্তি যে নহি সে কোনটীর,
যোদ্ধৃ সাজে রাজার কাজে আনন্দে অধীর!
বাঙ্গালী সেপাইরা, আমার মাণিক ভাইরা!

(৩)

তোরা, কোন্ জননীর কোলের ধন রে,
কা'দের বুকের ভাতি!
আহা, সবার মাথা উচ্চ হ'ল,
তোরা পাহুলি ছাতি!
রাজার শত্রু নিপাত তরে,
যুদ্ধ তৃষায় মাতি!

(৪)

এ যে, বেতন কাঙাল ভাবখানি নয়,
ত্যাগের বাঁকা ঠাম।
মৃত্যুঞ্জাপা অমৃতলোফা
কান্তি অভিরাম!
পূর্ণ হ'ল তোদের দেখে
জাতির মনস্কাম!
বাঙ্গালী সেপাইরা আমার মাণিক ভাইরা!

(৫)

তোদের, দেশের মানের মেরুদণ্ডে
খাড়া সিধা পীঠ।
তার, লজ্জা মোচন পণের ডোরে
কসা মনের গীঁঠ।
তারে, মরণ ছেঁচা রতন দিয়ে
পরাবি কিরীট।

(৬)

আহা, ভারতলক্ষ্মীর আশীষ ভরা,
তোদের মুখের আলোক।
বঙ্গলক্ষ্মীর আশায় গড়া
তোদের রূপের ঝলক।
দেখে দেখে সাধ না মিটে
পড়্‌তে না চায় পলক।
বাঙ্গালী সেপাইরা আমার মাণিক ভাইরা।
শ্রীমতী সরলা দেবী।

সেখানে আরও অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাণী জীবনে কখনই ভুলিব না। তাঁহার বাণীগুলি প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় আমাদিগকে সতত সত্যের আলোকে ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে। তাঁহার উপদেশ, কর্ত্তব্য শিক্ষা এবং বিপথগামী হইলে তাঁহারই আশীস্, সুদৃঢ় বর্ম্মের মত আমাদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবে। হায়! বড়ই ভয় হয়, যাবতীয় বাঙ্গালীর আশাস্থল আমরা মুষ্টিমেয় অজ্ঞ বাঙ্গালী সৈন্য অনভ্যস্ত নূতন ব্রতে ব্রতী হইয়া আশাপূর্ণ করিতে পারিব কি? জগতে আবার কি সেই বাঙ্গালীজাতি বীর আখ্যায় ভূষিত হইতে পারিবে কি?

আজ আমাদের উপর কি গুরুতর ভার কি কঠোর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইল! বাঙ্গালী সমাজের গৌরব, বাঙ্গালীর মান সম্ভ্রম—বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচনের ভার—সমস্তই আজ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। হে ভগবন্, এই অধম যুবকসমষ্টিদ্বারা তাহা যেন সম্পন্ন হয়—এই বলিয়া আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে চলিলাম। আর চতুর্দ্দিক হইতে অবিরাম ধ্বনিতে "বন্দে মাতরম্", "হিপ্ হিপ্ হুররে" রবে কম্পিত হইতে লাগিল। উপস্থিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় কেহ রুমাল উড়াইয়া, কেহ টুপী তুলিয়া, কেহ বা হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাদের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। গাড়ী যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছিলনা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা তদবস্থায় একদৃষ্টিতে আমাদিগের দিকে তাকাইয়া [illegible] বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আমরাও সাশ্রুনয়নে প্রত্যাভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক—'বিদায় করেছি যারে নয়নের জলে, বল সখা তারে ভুলিব কেমনে" গান করিতে করিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, বোধ হয় শ্রদ্ধাস্পদা সরলাদেবী মহাশয়া নিজে 'বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী'র কল্যাণার্থে তিনবার আনন্দধ্বনি করেন। আমরাও অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনে ধন্য হই!

এইরূপে নানাপ্রকার স্ফূর্ত্তিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছি। অভ্যর্থনার প্রকোপে আমাদের হৃদয়ে একটা প্রবল গর্ব্বের ভাব আসিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিলে প্রকৃত সত্যের অপলাপ করা হয়।

২৫শে নবেম্বর দ্বিপ্রহর বেলা দু'টার সময় নৌসেরা আসিলাম। ষ্টেশনে আমাদের 'এম্বুলান্স কোরে'র পুরাতন বন্ধুবর্গ ও অন্যান্য বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। উঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া রাখায়, একটু সুস্থ হইয়া সেনানিবাস হইতে দলবদ্ধভাবে কাবুলনদে স্নান করিতে যাই। ওঃ, সে কি ভয়ানক শীতল জল যেন দ্রবীভূত বরফস্রোত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা জমাট হইয়া যাইবার মত দেহ অসাড় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে স্নানসমাপন পূর্ব্বক আহার করিতে বসি। এখানেই অনেকের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। অনভ্যস্ত বঙ্গযুবকগণকে সেই খাদ্য দেখিয়া বিমর্ষ হইতে হইয়াছিল। যে বাঙ্গালী, মায়ের নিকট বসিয়া 'আরো খাও বাবা' ইত্যাদি অনুরোধবশতঃ ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ রসনা পরিতৃপ্তিকর আহার্য্যে নিজ লোলুপ রসনা সতত পরিতৃপ্ত করিয়াছে,—আজ তাহার এই কদন্নে স্পৃহা হইবে কেন? এ জীবনটাই যে তারপক্ষে সম্পূর্ণ নূতন! শৈশবে পিতৃমাতৃহীন আমি বাল্য হইতেই নানাপ্রকার দুঃখ-দারিদ্র্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি,—তারপর বন্দী অবস্থায় যে সমস্ত খাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছি সে সমস্ত দ্রব্যাদির তুলনায় ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। আহারাদির কষ্ট, শরীরের প্রতি অত্যাচার এ সমস্ত এখন আমার সম্পূর্ণরূপে সহ্য হইয়া গিয়াছে। তুর্কী হস্তে যখন বন্দী ছিলাম তখন জল দিয়া সামান্য আটা ও ঘাস মিশ্রিত রুটী খাইতে হইয়াছে। যে দিন তুর্কী হইতে কলিকাতা পৌঁছি সেদিন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেন্সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে তদীয় বাটীতে ও ঋষিকল্প স্বনামধন্য পুরুষ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সেই মনোহর (?) খাদ্য পরীক্ষা করতঃ আমাদের কষ্ট কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নিজ স্বহস্তে সেই রুটী পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। যাক্, এই ত' গেল খাদ্যের প্রশংসা। তৎপরে আমাদের ইতরজনোচিত কুলী ও মেথরের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, খাদ্যাদির অনিয়মে ও দৈন্যে আমার অধুনা কোনও কষ্ট হয় না। মনের বলই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। মনে খুব স্ফূর্ত্তি ছিল, কাজেই এসমস্ত আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে নাই। দেশের জন্য, রাজার নিমিত্ত আমরা জীবন বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি সুতরাং এই সামান্য কষ্টকে আদরে বরণ করিয়া লইয়া আগামী কঠিনতম কষ্টসাধ্য ব্রতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

নৌসেরা জায়গাটী বড়ই নয়নাভিরাম,—চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা—উত্তরে বিশালকায় হিন্দুকুশ পর্ব্বত, প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কাবুলনদী অবস্থিত কুল কুল স্বরে সে অবিরাম গান গাহিয়া চলিতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে নদীর জল বরফের ন্যায় শীতল, সুতরাং সন্তরণে আমাদের তত আমোদ লাগিত না। এখানে ভয়ানক ধূলা,—এত বেশী ইহার অত্যাচার যে রাজপথে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিলে সমস্ত পরিচ্ছদ ও সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত ও গভীর লাল আভাযুক্ত হইয়া পড়ে। রাস্তা ঘাট তত সুন্দর নহে। সৈন্যাবাস (Barrack) হইতে প্রায় দু' মাইল দূরে বাজার অবস্থিত। এখানে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদিই পাওয়া যায়, তবে দাম খুব বেশী নয়। সৈন্যগণের আবাসস্থল বলিয়াই ইহার এত প্রসিদ্ধি,—নচেৎ আর কোনও বিশিষ্টতা নাই। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানজাতি এখানকার এক রকম বাসিন্দা বলিলেই চলে। এদের বস্তি সব পাহাড়ের উপরে। দলে দলে প্রায়ই সহরে কাঠ বিক্রয় করিতে আইসে। মেয়ে পুরুষ সবারই চেহারাতে একটা লাবণ্য ও কর্ম্মপটুতার চিহ্ন বিরাজমান। কি সুন্দর ও বলিষ্ঠ এদের শরীর! এখানকার মেয়েগুলির সহিত আমাদের মেয়েদের তুলনা করিলে, বঙ্গনারীর সেই কোমল ও পেলব ভুজাবলীকে আর ভাল লাগে না। বঙ্গরমণীরা যেন শুধু ননীর পুত্তলিকা,—আলমারিতে সজ্জিত করিয়া রাখিবার মত সামগ্রী। আর, এরা কর্ম্মিষ্ঠা, সবলা ও দৃঢ় মাংসপেশী সংযুক্তা। বেশ বেশ পরিষ্কার,—প্রায় কেহই খর্ব্বাকৃতি নহে। মেয়ে পুরুষ সকলেই আলখেল্লা পরে। বাড়ীগুলির দেওয়াল কাঁচা ইটের গাঁথুনী দিয়া তৈয়ারী,- বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিশেষতঃ পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান বলিয়া খুব সুন্দর দেখায়।

শৈলমালার মধ্য দিয়া গাড়ীর লাইন আসিয়াছে। দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়, যেন লাইনটী কিছু দূরে গিয়াই পাহাড়ের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছে। গাড়ীগুলি যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখনকার দৃশ্য সত্যই বড় নয়নানন্দদায়ক। যেন সহসা শূন্য হইতে একটা বিরাটাকার দৈত্য হুস, হুস' শব্দে আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

এখান হইতে ষ্টেসন বেশী দূরে নয়,—প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। 'টাঙ্গা' সব সময়ে ভাড়া পাওয়া যায়,—কাজেই যাওয়া আসার সুবিধা আছে। স্থানটা আমার কিন্তু বড়ই ভাল লাগিত। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ আমি অনেক সময় ছুটী লইয়া নানাস্থানে বেড়াইতে যাইতাম। পাহাড়ের দেশে এই আমার প্রথম প্রবাস। শৈলশিখরে সময়ে সময়ে তুষারকনিকা জমাট হইয়া থাকে। যখন প্রাতঃকালে ঊষার কনককিরণ ফুটিয়া উঠিত, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেন তখনকার দৃশ্য পাহাড়ের উপর হইতে যে কি সুন্দর দেখায় তাহা বর্ণনা করা আমার ন্যায় অকবির কার্য্য নয়। নিসর্গ-সুন্দর দৃশ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত, কালিদাসের মনোহর শ্লোকগুলি খুব মনে পড়িত তারপর পাহাড় হইতে সূর্য্যাস্তের দৃশ্যও ততোধিক আঁখির পরিতৃপ্তিকর। কবি কাউপারের কথায়,—"A splendid feast to the eyes!"

আমরা যেখানে থাকিতাম তথা হইতে চাব্বিশ মাইল দূরে একটী দুর্গ (fort) আছে। ইহাই ইংরাজ রাজত্বের শেষ সীমার চিহ্ন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এস্থান হইতে পেশওয়ারে যাইতে আসিতে মাত্র একটাকা তের আনা ভাড়া লাগে। আমি একদিন তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম,

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশেষ কোনও কারণে সহর দেখিবার অবসর হয় নাই। তত্রস্থ জনৈক বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সি, সি, ঘোষ এল্, এম্, এস্ আমাদের অনেক সময় তত্ত্বাবধান লইতেন। কয়েকবার তিনি নানাবিধ মস্ত ও কফি ইত্যাদি দুর্লভ দ্রব্য আমাদের খাওয়াইয়া গিয়াছেন।

সিপাহীরা মাসিক এগার টাকা মাহিয়ানা পায়, কিন্তু এই সামান্য বৃত্তিতে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যয় সংকুলন হওয়া কষ্টকর। প্রায় প্রত্যেককেই বাড়ী হইতে কিছু কিছু টাকা আনাইতে হয়। "এ যে বেতন-কাঙাল ভাবখানি নয় ত্যাগের বাঁকা ঠাম,—" নহিলে এতগুলি শিক্ষিত ভদ্র যুবক কেন এরূপভাবে মরণকে বরণ করিয়া লইতে যাইবে? ইহার মধ্যে এমন বহুলোক আছেন যাঁহার বাড়ীতে এগার টাকার অনেক ভৃত্য নিযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের অল্পমূল্যে খাদ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন এবং তজ্জন্য মাসিক চারিটাকা এগার আনা কাটিয়া লইবেন, কিন্তু এখানে Supply ও Transport এর কোনও শাখা না থাকায় তাহা প্রথমতঃ হইয়া উঠে নাই। আমাদিগকে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্টের দোকান হইতে ধারে সমস্ত দ্রব্যাদি দেওয়া হইত এবং মাসের শেষভাগে অথবা পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে হিসাব করিয়া বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা দিয়া দিত। প্রায়সঃ আয় হইতে ব্যয়ের দিকটাই আমাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিত, কাজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ধোপা, নাপিত ইত্যাদি যাঁহা কিছু আবশ্যক হইত তাহাই সংবাদ দিলে এখানে পাওয়া যাইত। আমি নিজে খুব সাবধানে ও সংযতভাবে থাকিতাম বলিয়া বাড়ী হইতে কিছুই আনাইতে হইত না। নিজেদের রাঁধিয়া খাইতে হয় বলিয়া অনেকে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সুখী হইব। কিন্তু এতেই বা এত অনুযোগ কেন? স্বার্থত্যাগ করিতে আসিয়াছি, জীবনটাকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছি—তবে আর বিলাসবাসনা কেন? বাড়ীর লোককে কষ্ট দিয়া খরচ আনয়ন করা আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ কার্য্য। যাহাদের কখনও এক পয়সা মাত্র দিয়া সাহায্য করিতে পারির না, তাহাদের নিকট হইতে টাকা আনাইব কোন হিসাবে?

বাঙ্গালী সৈনিকগণের (ডবল কোম্পানী) পরস্পরের মধ্যে খুব সখ্যতা ছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম। সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যগণ যেন ভাইয়ের মতন ব্যবহার করিত। কাহারও কোন অসুখ বা অসুবিধা হইলে অপরে তাহার প্রতিকার সাধনে যত্নবান হইত। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বসু সুবেদার মহাশয়কে এক্ষেত্রে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করে এবং হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। ইনি ছেলেদের খুব যত্ন করেন। ইঁহারই চেষ্টায় খেলা, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা হয়। এরূপ সুচতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়াই তিনি আজ সমগ্র বাঙ্গালী পল্টনের নেতৃস্থানীয় পদ লাভ করিয়াছেন।

46th Punjabi দের সহিত 'বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী' সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। এদের সঙ্গে শিক্ষা করিতে ও নিরক্ষর লোকের সহিত বাসে প্রথম প্রথম আমাদের বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হইত,—কিন্তু ক্রমে ইহাও অভ্যস্ত হইয়া গেল। পাঞ্জাবীগণ,—শুধু পাঞ্জাবীগণ কেন, প্রায় দেশীয় ও দু' একটা বৈদেশিক সৈনিকবর্গ আমাদের একটু স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। আমরা যে 'বেতন কাঙাল' হইয়া আসি নাই,—প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পবিস্তর শিক্ষিত তাহা জানিয়া ইহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত!

আমি যদি এখানে আরও একটু পূর্ব্বে আসিতে পারিতাম তবে বোধ হয় শীঘ্রই উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারিতাম,—কারণ এই 'ডবল কোম্পানী'র জন্য যে সামান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন তাহা প্রায়ই অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। 'এম্বুলান্স কোরে'র লোকগণ একটু সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত বলিয়া বিশেষতঃ আমাদের চারিজন তুর্কীবন্দীকে সকলেই একটু সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

রংরুটদের সম্বন্ধে এবার দু' চারিটী কথা বলিব। Recruit সংগ্রহ করিবার সময় বোধ হয় মিথ্যা প্রলোভন না দিয়া সত্যের আলোকে কর্ম্মময় জীবনের আভাস প্রদানে লোক সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। উহার যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য অগ্রসর হইতেছে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। যে কার্য্য লইয়া আসিয়াছি বা আসিতেছি, তাহাতে যদি বিফল মনোরথ হই তবে ক্ষোভের ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমার ও S. K. Ray এর প্রায়ই Double Company সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ ও চিন্তা হইত। ইনিও তুর্কীতে শত্রুহস্তে বন্দী ছিলেন,—বর্ত্তমানে দমদমে বাঙ্গালা সৈন্যগণের তত্বাবধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন 'হুজুগে মাতিয়া' এবং নানাপ্রকার অযথা প্রলোভনবাণীতে আশ্বাসিত হইয়া সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। রঙীন চোখের—রঙীন দৃশ্যাবলী অপসৃত হইয়া গিয়া কঠিন কর্ম্মময় জীবন আসিয়া পড়িয়াছে। তাই তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছেন কিন্তু সহজে পলাইতে পারিতেছেন না; কাজেই তীব্র অনুশোচনায় পূর্ব্বকৃত হঠকারিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন! অনেকে আবার পিতা মাতার সাহায্যে নিজেদের বয়সের অযোগ্যতা (minority) প্রমাণিত করিয়া দেশে ফিরিতেছেন! হায়, কি লজ্জার কথা! !! !!! যারা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন তাহাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বড়ই ভাবনা হয় যে এরূপ "যেন তেন প্রকারেণ" লোক থাকিলে বাঙ্গালীরা যুদ্ধস্থলে সম্যক্ প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ পরীক্ষা করিবার জন্য লোক চাহিয়াছেন! সুতরাং বাছাই করা উৎকৃষ্ট সৈনিক দেওয়া দরকার যাহাতে আমাদের একটা Battalion ক্রমে মঞ্জুর হয়। বাঙ্গালী ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগে অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে পারে এখন হইতে তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমরা যদি অনেকে খারাপ হই, তবে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। হায়, এ উদ্যোগ,—এ উদ্দীপনা যদি পূর্ণ সফলতা লাভ না করে তবে কি আমাদের সমগ্র জাতির উপর আরোপিত ভীষণ কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যাইবে? ইহা নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং বাঙ্গালীবিদ্বেষী ভারতস্থ ইংরাজ পত্রিকাগণের প্রতিকূল তীব্র সমালোচনায় আমরা লোক-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না। এই মহা দায়িত্বের কথা সকলকে যথাপ্রকারে বুঝাইয়া দিয়া সৈনিক জীবনের কঠোর ও কর্ম্মসাধ্য নিয়মাবলীর সহিত পরিচিত করতঃ নির্ভীক সাহসী যুবকবৃন্দকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়—জাতির গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ঠিক এরূপ ভাবেই কয়েকজনকে পাঠাইয়াছেন, আর তাহারা সকলেই বিশেষ প্রশংসা পাইতেছে। এরা খুব কর্ম্মদক্ষ এবং কষ্ট সহিষ্ণু, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংগ্রহকারী বিশেষতঃ দেশের একজন মান্য গণ্য ব্যক্তি ছেলেদের নিকট হইতে খুব গালি ও অভিসম্পাত কুড়াইতেছেন। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না, কারণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র জাতির সম্মান ও গৌরব ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

এবার আমাদের দৈনিক কার্য্যাবলী ও সৈনিক জীবনের কিঞ্চিৎ কথা বলিব। প্রাতে নয়টা হইতে এগারটা এবং অপরাহ্নে আড়াইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত parade অথবা কুচকাওয়াজ শিক্ষা করিতে হইত। কাজেই স্নান ও তৃপ্তির সহিত আহার করিবার সময় পাওয়া যাইত না। এক বৃহস্পতি ও রবিবার ছুটী পাইতাম। রাত্রি ১০টার পর আলো জ্বালিতে দেওয়া হয় না, কারণ পাঠানদের বড় অত্যাচারের ভয়।

খাদ্যাদি (ration) যাহা বরাদ্দ ছিল তাহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইত। তবে 'ডালরুটি' খাইয়া থাকা যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবেন না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে নৌসেরাতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। প্রভাতে ৮টার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করা অসম্ভব। ড্রিলের সময় বন্দুক পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না।

পর্য্যায়ক্রমে নিজেদের রন্ধন করিতে হইত। দু'-চারিজন এবিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন তাই আমাদের বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। রান্না প্রথম প্রথম এত বিশ্রী ও বিস্বাদ হইত যে অশ্রুজলের দ্বারা পানীয়ের কার্য্য চলিত,—তবে পরিমিত পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া সেই সুস্বাদু আহার্য্যও নির্ব্বিবাদে উদরস্থ করিতাম এবং জল হাওয়ার গুণে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে জঠরানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। আবার বলিতেছি এই বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীর ভাইদের সাহচর্য্যে দিনগুলি বেশ অতিবাহিত হইয়া

যাইতেছিল। কাহাকেও একটু চিন্তান্বিত বা বিমর্ষভাবাপন্ন দেখিলে এস্‌রাজ বাজনায় সিদ্ধহস্ত সুবেদার অধিক্রম মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক নিপুণতার সহিত সুমধুর বাদ্যের অবতারণা করিতেন। আমাদের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্হিত হইত। অধুনা infantry হইয়া নানা রকমের বহুপ্রকার লোকের আগমনে অসুবিধা হইয়াছে সত্য, এবং আমরাও নির্দ্দিষ্ট কয়েকজনের সহিত ভিন্ন মন প্রাণ খুলিয়া আর কাহারও সহিত মিশিতে সাহস পাই না।

শীতকষ্টে এবং নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটায় আমাদের 10th Rajput সৈন্যের সহিত সংলগ্ন করিয়া "করাচিতে" স্থানান্তরিত করা হয়। রাজপুতজাতি স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য চিরকাল বিখ্যাত, আমরাও তাহাদের মত হইতে পারিব এই আশায় উৎসাহিত হইলাম। এই জায়গাটা আমাদের বেশ সহ্য হইত। এখানে সুবিধামত বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র নৌসেরা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। মস্ত বড় সহর,—রাজপথে বাহির হইলে নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত হরেক রকমের লোক দৃষ্টিপথের পথিক হইত। নৌসেরাতে অনেক বিষয়ে কষ্টভোগ করিয়াছি, বিশেষতঃ বাহিরের বাঙ্গালীর মুখ অল্পই দেখিতে পাইতাম। এখানকার জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রায়ই আসিয়া গল্প করিতেন ও নানাপ্রকার সুখবিধানে যত্নপরায়ণ থাকিতেন। "সাজাহান" থিয়াটারের সময় ইনিই আমাদিগকে হারমোনিয়ম দিয়াছিলেন।

করাচীর সৈন্য-হাঁসপাতালে আমি প্রায়ই যাইতাম এবং অবসর সময়ে আবশ্যক মত রোগীগণের শুশ্রূষায় নিরত থাকিতাম। এদের কষ্টের যদি কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারি,—ইহাই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিছুদিন পরে হাঁসপাতালে নানাপ্রকার গোলমাল হইতে আরম্ভ হওয়ায় আমাকে তথাকার বিশৃঙ্খলা মোচনার্থে নিয়োগ করা হয়। এখান হইতে আমার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। এই শুশ্রূষায় সকলেই নাকি অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কাজেই আমি 'প্রাইভেট্' হইতে 'ল্যানস্‌নায়েক' এবং তৎপরে যথাক্রমে 'নায়েক' ও 'হাবিলদারের' পদে উন্নীত হই।

সহসা একদিন সুপ্রভাতে শুনিলাম যে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কার্য্যাবলী সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া আপাততঃ একটা Battalion গঠন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। সেদিন আমাদের যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় অনবদ্য ও অপরিসীম আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালী আজ প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ও বরণীয় হইবে ইহাতেই আমাদের আনন্দ,—ইহাতেই আমাদের প্রকৃত সুখ,—ইহাতেই আমাদের পরম গৌরব। দিনে দিনে বাঙ্গালী সৈন্য কর্ত্তৃক একটী সমগ্র infantry হইল। বাঙ্গালী যোদ্ধাগণ জগতের নিকট সমাদর পাইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে হাঁসপাতালে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত করতঃ পুনরায় Battalionএ যোগদান করিলাম। তখন আমি একজন উচ্চপদস্থ N. C. O. অর্থাৎ Quarter Master Habildar.

এখানকার 'Barrack life' ক্রমেই সকলের বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। প্রথমে কয়েকজন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিন চারিজন 'নিউমোনিয়া' রোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। আর কোনও প্রবল ব্যাধির বিশেষ প্রকোপ ছিল না। মঙ্গলময় মহেশ্বর এই মৃতাত্মাদের কল্যাণসাধন করুন।

করাচীতে একটা নূতন ব্যাপার দেখিলাম। একজন ইংরাজের Court martial হইয়া মৃত্যুদণ্ড হয়। ইনি নাকি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জনৈক সাহেবের হত্যাপরাধে অপরাধী। লোকটার জন্য আমাদের খুব দুঃখ হইয়াছিল। সবেমাত্র অল্প কয়েকদিন বিলাত হইতে আসিয়াছে,—বেচারা একেবারে ছেলেমানুষ। যৌবনের উন্মেষ হইবামাত্রই মৃত্যু ক্রোড়ে ঝাপাইয়া পড়িল।

নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন সৈনিক কর্ম্মচারীর দ্বারা ইহার যথাসময়ে বিচার হয়। পরে একদিন প্রাতঃকালে সকলের সম্মুখে অপরাধ ও তজ্জনিত কঠোর শাস্তির কথা পাঠ করা হয়। সাহেব তখনও একটুও বিমর্ষ হয় নাই বরং তাহাকে হাস্যময় দেখাইতেছিল। প্রার্থনার পর একজন সৈনিককে গুলি করিতে আদেশ দেওয়া হয়। সমবেত সৈন্যসংঘ তাহার সম্মানার্থে Bayonet নীচু করিয়া মস্তক ঈষৎ অবনত করিল। মুহূর্ত্তে হতভাগ্যের জীবন শেষ হইল,—সে ধরাশয্যায় পরম শান্তি পাইল। হায়! জীবন

এমনই ক্ষণভঙ্গুর বটে! একটু পূর্ব্বে যাহার হাস্যমুখরবাণীতে —যাহার উজ্জ্বল বদনমণ্ডলে এমন একটা অটল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগরিত দেখিয়াছিলাম—এখন সে কোথায়? ক্ষিতিপৃষ্ঠ হইতে তাহার নাম মুছিয়া গেল। ইহার বক্ষ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে পাপের স্পষ্ট প্রায়শ্চিত্ত শিক্ষা দিতেছে। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। জীবন একটা প্রহেলিকা মাত্র,—এই জীবনের মত সমস্যা কে পূরণ করিবে বল? নৌসেরা থাকিতে আমাদের মধ্যে সামান্য অপরাধের নিমিত্ত কয়েকজনের কষ্টকর শাস্তি হইয়া গিয়াছে সত্য,—কিন্তু অস্তকার ভয়ানক ভীষণ শাস্তির নিদর্শন এই প্রথম আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিল।

সমর বাদ্যের সঙ্গে সৈনিকবৃন্দ মৃতদেহের পশ্চাতে ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে ইহার নশ্বর দেহকে সমাহিত করিবার জন্য চলিল। সমস্ত শরীর একখানি কার্পাসবস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল।

এই দেহের জন্য, এই ইন্দ্রিয়গুলির পরিতৃপ্তির নিমিত্ত মানব প্রতিনিয়ত কত দুষ্কর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে! পার্থিব ক্ষমতালাভের জন্য,—অন্য জাতিকে পদদলিত ও নিপীড়িত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার কল্পে আজ এই বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। কত প্রাণী ইহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে, কত অর্থবৃষ্টি হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটা মহা প্রলয় হইয়া যাইবে। ইউরোপের বীর পুরুষগণ দলে দলে বীরগতি লাভ করিতেছেন, তত্তৎস্থলে তাঁহাদের উপযুক্ত পুত্রগণ অভিষিক্ত হইতেছে আর অকালে কালের করাল-কবলে ধ্বংস হইতেছে। এ মরণের শান্তি কবে হইবে, বলিয়া দাও ভগবান্!

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজী কাগজে হাস্যকর (চিত্রদর্শনে) বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। দেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের যাবতীয় বলিষ্ঠ যুবকগণ সমরাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, রমণীগণ কঠোর—কষ্টসাধ্য কার্য্যে ব্যস্ত। পাশ্চাত্যদেশের রেলওয়ে, ট্রাম প্রভৃতি রমণী-কর্ম্মচারীর দ্বারা অধুনা পরিচালিত ও পরিপুষ্ট। আর গৃহে রহিয়াছে অযোগ্য অক্ষম বৃদ্ধ ও শিশুগণ; সুতরাং এরূপভাবে লোক ক্ষয় হইলে তদ্দেশের ভবিষ্যৎ মহান্ধকার পরিপূর্ণ। মাত্র দুর্ব্বলের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইবে। এই সূত্র অবলম্বনে ছবিটি আমেরিকার কাগজে বাহির হইয়াছিল। রক্ষণশীল Socialistদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত,—কেহ কেহ উপহাস করিয়া ইহা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে ইউরোপের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য অন্যান্য দেশ হইতে বাছাই করা বলিষ্ঠ লোক আনাইয়া সন্তান উৎপাদন করাইতে হইবে। দু' এক যায়গায় বহু বিবাহ প্রচলন করিবার বিধি ব্যবস্থা প্রবলভাবে চলিতেছে। দেশের এবং দশের কথা ভাবিয়া মনীষিগণের সুনিদ্রা না হওয়াই সম্ভবপর। আসল কথা ইউরোপ ও এসিয়া ব্যাপী একটা খণ্ড প্রলয় সমুপস্থিত।

আমাদের দলের মধ্যে জমাদার রণদাপ্রসাদ সাহা বিশেষ উৎসাহী ও কর্ম্মপটু ছিল। এই যুবক প্রথমতঃ রাজনৈতিক অপরাধী দলভুক্ত সন্দেহে পুলিশ কর্ত্তৃক নির্য্যাতীত ও নব আইন বলে 'আটক' ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর একাগ্র চেষ্টায় সে মুক্তি পায় এবং স্বেচ্ছা সৈনিকরূপে আর্ত্তের সেবায় (Bengal Ambulance Crops) নিয়োজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করে। ইনি "কুট" অবরোধের সময় জেনারেল টাউনসেণ্ডের সহিত আমাদের সঙ্গে তুর্কী হস্তে বন্দী হয়েন। ইহার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশংসা বাক্য আরোপিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে এবং service Book এর মন্তব্য দেখিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। নির্ভীক যুবক অম্লান বদনে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও রোগীদিগকে অশেষ প্রকারে সুখী করিয়াছেন। মৃত্যুসম অগ্নিময় গোলককে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ সুদূর প্রান্তস্থিত ক্ষেত্র হইতে নানাপ্রকার ফল মূলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সেবা করিয়াছেন। আমাদের অফিসার উহাকে খুব ভাল বাসিতেন এবং দুই শত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর রণদার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুকূল সুদীর্ঘ সমালোচনা বেঙ্গলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে।

রণদার পরম সৌভাগ্য তাই সে ভারতবর্ষীয় পূতিগন্ধময় কারাগারে ও দুশ্চরিত্র লোকগণের সংস্রবে না আসিয়া তাপিত ও ব্যথিতের সেবার জন্য নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে

পারিয়াছিল। আর, স্বীয় অসীম অধ্যবসায় গুণে ও দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গের প্রশংসা ও আর্ত্তের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কে জানিত, এই তেজস্বীযুবকের জীবন নবীন সংস্পর্শে আসিয়া পুণ্যময় হইয়া দাঁড়াইবে। ইনি যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে—যাহারা তথাকথিত ভারত রক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছেন—মুক্তি প্রদান করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে সম্মতি দিলে আজ বৃটিশ বাহিনীকে নিশ্চয়ই পরিপুষ্ট দেখিতে পাইতাম। অনেক যুবক নিশ্চিতই নিরপরাধী, আবার কেহ কেহ হয়ত নিজ হঠকারিতার জন্য কুপথে প্রধাবিত হইয়াছে, তাই বলিয়া কি তাহাদের এরূপ নিষ্ঠুরভাবে আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে লইয়া গিয়া আটক রাখা উচিত! তারাত মানুষ, মানুষের অধিকারে মানুষকে বঞ্চিত রাখা বৃটিশ-সিংহের অনভিপ্রেত বলিয়া জানিতাম। সামান্য কয়েকটী মুষ্টিমেয় ভারত যুবকের ভয়ে যে বৃটিশ রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এরূপ হাস্যাস্পদ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। পরন্তু এই পথভ্রষ্ট যুবকবৃন্দকে প্রাণের সহিত ক্ষমা করিয়া ইহাদের অসামান্য কার্য্যকরী শক্তিকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করিলে দেশের এবং সাম্রাজ্যের মহোপকার সাধিত হইত। সংবাদপত্রে ইহাদিগের অবস্থা পাঠ করিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, অশ্রু অজ্ঞাতসারে আপন হইতেই ঝরিয়া পড়ে।

'রাওলাট' কমিটীর রিপোর্ট সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ভয়ের প্রকৃত কারণ নাই ; কারণ মানুষ চাহে স্বাধীনতা। দীর্ঘ শতাব্দীর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াও ইংরাজরাজত্বে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ইহাদের দৃষ্টিশক্তি উন্মেষিত হইয়াছে। তাই, সমগ্র ভারত স্বায়ত্ত শাসন চাহে। ইংরাজই আমাদের চক্ষুদান করিয়াছেন সুতরাং এখন সে অধিকার প্রদানে অস্বীকার করিলে চলিবে কেন ? এই বিশ্বব্যাপী সমরে ইংরাজ রাজ আসরে নামিয়াছেন শুধু অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্য, ক্ষুদ্র শক্তিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। তাহারা Democratic Govt.এর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নিজেরাই আবার উহাকে প্রশ্রয় দিলে জগতের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। দারুণ অত্যাচারের ফলে আমেরিকা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাগ্মীপ্রবর বার্কের (Burke) তর্ক যুক্তি সত্ত্বেও তৎকালে উহাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। তাহারা নিজ কঠোর অধ্যবসায় বলে আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত ও পূজ্য। সাধু উইলশনের কথা ও পরামর্শ সকলকে নতশিরে গ্রহণ করিতে হইতেছে। একি কম গৌরবের বিষয়!

আয়ারলাণ্ড প্রকৃতরূপে পরাধীন হইলেও সে আজ মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। পার্লামেণ্ট মহাসভা এখনও উহাদের স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই কিন্তু যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই ইহারা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক জাতির ন্যায় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইবেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা রাজনৈতিক অপরাধী ছিলেন (Sinfinners) তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিয়া দিয়া বৃটিশ রাজ দেখিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় নাই। রণদাকে আটক না রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে বাঙ্গালী পল্টনের—না, না, সমগ্র ভারতীয় সৈন্যমধ্যে অশেষ উপকার হইয়াছে। এইরূপ সকলকে মুক্তি করিলে দেশের এই নিদারুণ দুঃসময়ে নিশ্চয়ই সুবিধা হইত। অনেক সাধারণ শ্রেণীর কয়েদীকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ কার্য্যে স্বাধীনভাবে লিপ্ত করা হইয়াছে। আর তাহারা সকলেই বিশ্বাসের সহিত সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনে যত্নবান, সুতরাং নানাশ্রেণীর বিশেষতঃ শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীগণকে গভর্ণমেণ্ট মুক্তি দিলে ভারতব্যাপী অশান্তি ও অরাজকতা অনেক প্রশমিত হইবে।

বহুচেষ্টায় কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে King's Commission দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা আরও উদার ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। সাধারণ সিপাহীগণের সামান্য এগারোটাকায় ব্যয় সঙ্কুলন হওয়া কষ্টসাধ্য। যদি ইহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করাইয়া দেওয়া যায় তবে এদিকে অনেকের নিঃসন্দেহ দৃষ্টি পড়িবে। এই প্রলয়ের সূচক যুদ্ধব্যাপারে ভারতবাসীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সৈন্যগণই ফ্রান্সদেশে প্রথম শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে, তাহার পর ভারতীয় সৈন্য-সাহায্যে তুর্কসাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন হইতে চলিতেছে। বৃটিশ-রাজত্বের উপর আমাদের একটা দাবী হইয়াছে। এই সমগ্র সাম্রাজ্য যেমন ইংরাজের তেমনই আমাদের। আমরা যে স্বায়ত্ব শাসনে উপযুক্ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যুদ্ধশিক্ষা শেষ করিয়া

কার্য্যগতিকে কিছুদিন ডিপোতে (Depot) থাকিতে হইয়াছিল। এরূপ জীবন ক্রমে একঘেয়ে বোধ হইতে লাগিল। রণস্থলের জন্য,—যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাইবার জন্য প্রাণে একটা দারুণ পিপাসা জন্মিয়াছিল। কবে সেই শুভদিন, সেই মাহেন্দ্রসুযোগ আসিবে এই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিলাম। সহসা একদিন মৃত্যুসভার ডাক আসিয়া পৌছিল,—

"সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে—"

গাহিয়া আমরা পরম আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। সে কি অনির্ব্বচনীয় ঔৎসুক্য,তার আস্বাদ যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। হৃদয়ে শঙ্কার কোনও স্থল খুঁজিয়া পাই নাই, ইহা স্পষ্ট বলিতেছি। বরং দৃঢ়ভাবে ও বিশ্বস্তচিত্তে কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর গৌরব লাভ করিতে পারিব, দেশের কলঙ্ক নিবারণ হইবে এই ভরসায় উৎসাহিত হইতে লাগিলাম। উত্তেজনা ও উদ্দীপনা পূর্ণ সঙ্গীত ব্যারাকের প্রত্যেক গৃহের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত ও প্রতিধ্বনিত হইল! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমাদের মধ্যে অধিক্রম বাবু archery ধনুর্ব্বিদ্যা, হাবিলদার শিবপ্রসাদ প্রভৃতি কোয়েটাতে Machine Gun শিক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তারের পরীক্ষায় এবার যাহারা অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন তাঁহাদের তথাকার নানাপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়,। বলিতে লজ্জা হয়, কয়েকজন প্রাণভয়ে কোনও রকমে ওখানে থাকেন। হায়, কি দুর্ভাগ্য ইঁহাদের! সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যদি শান্তিপূর্ণ জীবন (Civil life) যাপন করিতে হইল, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচয় না দিতে পারিলাম তবে আর লাভ কি? যোগ্যতম ব্যক্তিবৃন্দ সহাস্যে ও সানন্দে আপনাদিগকে মৃত্যু-গহ্বরে নিপাতিত করিতে রণবাদ্যের গম্ভীর সঙ্গীতের তালে তালে পদবিক্ষেপ করতঃ অগ্রসর হইলেন! তাঁহাদের প্রাণে অসীম সাহস, মুখে সারল্যের জ্যোতি ও হৃদয়ে প্রবলীভূত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা!

প্রথমেই আমরা দুর্গরক্ষার (Garrison duty) ভার পাই। তাঁবুতে বাস। মশা ও Sandfly এত বিরক্ত করিত যে ইহাদের অত্যাচার হইতে কামানের গোলক তুচ্ছ। সিপাহীরা গোলাগুলির চেয়ে মশার কামড়কে বেশী ভয় করে। Sandfly দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইতে চলিয়াছে।

আমার ঠিক মনে প'ড়ে ছেলে বেলায় মানচিত্রে টাইগ্রীস নদীর উৎপত্তিস্থান না দেখাইতে পারায় পূজাপাদ যজ্ঞেশ্বর বাবুর (তৎকালীন সেনহাটীর শিক্ষক) নিকট বেত্রাঘাত খাইতে হইয়াছিল। আমি লেখাপড়ায়, বিশেষতঃ ভূগোলে প্রায়ই গোলাকার নম্বর পাইতাম। তখন মনে হইত, হায়! ভুগোলখানি কে লিখিয়াছিল? এর নীরস টাইগ্রীসের সন্ধানে আমাদের পরিশ্রম করিবার কি প্রয়োজন? কে জানিত সেই টাইগ্রীস নদীর তীরে আমাদিগকে একদিন এভাবে অবস্থান করিতে হইবে? কে জানিত, সেই টাইগ্রীস বক্ষে আমরা আনন্দে সন্তরণ করিব,—তার তীরে দলবদ্ধ হইয়া সন্ধ্যায় 'বঙ্গ আমার' 'আমার দেশ' সঙ্গীতের প্রাণ মাতোয়ারা সুরে এদেশবাসীদের কর্ণকুহর পবিত্র করিব! যাক্ টাইগ্রীস তীরে আজকাল আমাদের আসর। সহরটী প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ এবং ১ মাইল প্রস্থ। দেখিতে নয়নাভিরাম,—অতি সুন্দর,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হয় যেন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট দেখিতেছি। তবেঁ মাঝে মাঝে ধুলায় বড় কষ্ট দেয়। অনেক পুরাতন কীর্ত্তির চিহ্ন এখানে এখনও বর্ত্তমান। নদীর জলটা একটু ময়লা। সে যেন অবিশ্রান্তভাবে হেসে হেসে গান গাহিয়া যাইতেছে। সে দিন আমাদের মধ্যে একজন গাহিতেছিলেন—

"কুলু কুলু রবে নদী বয়ে যায়রে ভাই—
তীরে বসে ভাবছ বুঝি কি বলে কি ছাই?"

তখন সত্যিই যেন মনে হইল নদী আমাদের দিকে তার উন্মুক্ত চক্ষু দিয়ে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। নদীর ওপারে পুরাতন সহর ও রেলওয়ে ষ্টেসন অবস্থিত। আলোতে বড় সুন্দর দেখায়। এপারে নদীর তীর হইতেই শ্রেণীবদ্ধ গৃহ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যেন বলিতেছে,—'খবরদার, প্রবেশ নিষেধ।' সাদা কাকের মত কি যেন এক রকম পাখী, ঘুঘু ও চড়াই এখানে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর, এই নিসর্গ সুন্দর দেশের দৃশ্যাবলীর মধ্যে যখন 'বাসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপগুলি' রাস্তা দিয়া ওড়নি

গায়ে; চলিয়া যায়, তখন প্রকৃতপক্ষে মনে হয় যেন এ একটা পরীরাজ্য। স্বপ্নের মধ্যে যেন আমরা পরীর দেশে আসিয়াছি। এ দেশের মেয়েরা খুব সুন্দর, কর্ম্মঠ এবং সাহসী। এমন অনবদ্য রূপ আর কোথাও দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না।

গতবার আমি যাদের সঙ্গে সখ্যতা করেছিলাম, যাঁরা আমাকে সেই ফুলকাটা রুমাল ও মণিব্যাগ উপহার দিয়াছিলেন তাঁহাদের সবার সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে এখনও তাঁরা খুব ভালবাসেন এবং যত্ন করেন। আমার বর্ত্তমান পদোন্নতিতে এরা আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার হইয়া আমাকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। কলের মত প্রভাতে উঠিয়াই বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিয়া ছেলেদিগকে আহ্বান করা,—তাদের খাদ্যাদি বিতরণ ও হিসাব রাখা এ সমস্ত কার্য্য আমার মোটেই ভাল লাগিত না তার পর, একার্য্যে সবাইকে সন্তুষ্টকরা [illegible] কাজেই তিরস্কার লাভ অনিবার্য্য। সামান্য সিপাহীরা কিন্তু বেশ আছে। নির্দ্দিষ্ট নিজ কার্য্য করিলেই হইল,—আর কোনও ভাবনা চিন্তা নাই।

যেদিন আমি ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত হইয়া 'জমাদার' হই,—সেদিনটি আমার চিরকাল স্মরণ রহিবে। সমগ্র বাঙ্গালা প্লটনের সম্মুখে আমাকে এই বাজার প্রদত্ত গৌরবে বিভূষিত করা হয়। আজ যাহা পাইলাম তাহা বড় গৌরবের জিনিষ। প্রাণপণ পরিশ্রম করিলেও খুব কম লোকে পাইয়া থাকে। অবনত মস্তকে বিশ্বনাথ সমীপে প্রার্থনা করি, যেন এ মহা গৌরবময় পদের উপযুক্ত সম্মান আমাদ্বারা রক্ষিত হয়।

তুর্কিদের অনেক স্থল অধুনা ইংরাজ রাজ অধিকার করিয়াছেন। আমরা যেখানে এখন থাকি ইহা পূর্ব্বে তুর্করাজের রাজ্যভুক্ত ছিল। স্থানটি দেখিলে ঠাকুরের সেই 'তেপান্তরের মাঠের' গল্প মনে পড়ে। চতুর্দ্দিকে মরিচীকা বা মরুভূমি খাঁ খাঁ করিতেছে। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তি যায় সবই জনমানব ও পশুপক্ষী বিহীন নিস্তব্ধ ময়দান, কুত্রাপি মাঝে মাঝে দু'একটী পথভ্রান্ত আরব অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিদিন প্রবলবেগে ধূলিময়, উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এটা যদিও সেই খরস্রোতা টাইগ্রীস নদীতীরে অবস্থিত, তবুও পূর্ব্বকথিত মনোমুগ্ধকর সহর বা পল্লীবাসীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত নাই। যতদূর যাও সুদূর অনন্ত আকাশ আর মাঠ। তবে প্রাতঃকালে নেহাৎ মন্দ লাগে না। এখান থেকে Persian border বা খুরদিবস্থান মাট মাইল ব্যবধান। তত্রত্য শৈলমালার উচ্চ শৃঙ্গে যখন প্রভাতের 'অরুণ নব কিরণ' প্রথম নিপাতিত হয়—আবার যখন 'সান্ধ্যরবির কিরণে' সেগুলি লাল আভাযুক্ত হইয়া পড়ে। তখনকার দৃশ্য অব্যক্ত মনোহর। কিন্তু এত নির্জ্জন স্থান কি কখনও ভাল লাগে। এ যেন কেমন এক ঘেয়ে ভাব। সন্ধ্যাসমাবে—নীরস টাইগ্রীসবক্ষে 'বাজামে' নোকা ? সুসজ্জিত পরিভ্রম্যমান প্রস্ফুটিত "বসোরার গোলাপের' সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট। দলে দলে গোলাপের ঝাঁক আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না আর আমাদের মত অনেক নবীন যুবকও তাহাদের সেই সদ্যজাত সৌরভ উপভোগ করিবার জন্য তাহাদের মুখের দিকে চাহে না। সে যায়গা ছাড়িয়া আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি। কোথা। তেজস্বী মরিয়ম জোমেন ও মেরী যাহারা সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া নানাবিধ সুখাদ্যে আমার রসনা পরিতৃপ্ত করাইত। সবচেয়ে জোমেনের জন্য আমার বেশী কষ্ট হয়, কারণ আমি যখন যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলাম তখন হইতে সে আমাকে স্নেহের নিগড় আবদ্ধ করিয়াছিল। তৎপ্রদত্ত টেবিলের আচ্ছাদন ও মোজা এখনও আমাকে সতত তাহার অনবদ্য ভালবাসার কথা মনে করাইয়া দেয়।

ওঃ, আলিবাবার কি সাংঘাতিক দেশ। সে কাঠুরিয়া ও সোণার মোহরের জায়গা আজ রক্তনদীতে পরিপ্লাবিত, আদামের (Adam.) স্বর্গ নরকে পরিণত।

প্রায় দশসপ্তাহ পরে আমি 'Quarter Master Jamadar' পদে উন্নীত হই এ কার্য্যটা দায়িত্বজনক হইলেও ইহাতে তত আনন্দ নাই। সমগ্র বাঙ্গালীসৈন্যগণের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তৎপ্রতি আমাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইত। তাঁবু, নানাপ্রকার অসবাব পত্র, সৈন্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির আমারই হিসাব রাখিতে হইত। কাহারও সামান্য কোন অসুখ হইলেও তজ্জন্য উর্দ্ধতম ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট আমাকে জবাবদিহী করিতে হইত। অমৃতবাজারের ভাষায় –

"His present business is to look to the

general comforts of the men of the battalion and to inspect their food and drink. In fact he is now what we call a sanitary inspector.'

প্রভাতকালে বড়ই মজা হয়। ভেরী (Bugle) বাজিবার পর জলপাত্র লইয়া সৈনিকগণ পায়খানায় যায়। দুঃখের বিষয় পায়খানার সংখ্যা কম। কাজেই latrine fall in বলিয়াই বেশ একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হয়। কাহারও দেরী সহ্য হয় না, সুতরাং একে অপরকে কোন প্রকারে দূরীভূত করিয়া তৎস্থল অধিকার করিয়া লয়। অল্পকালের মধ্যেই কুচকাওয়াজ করিবার সময়। দেরী হইলে, তজ্জন্য শাস্তি পাইতে হয়। অসুস্থব্যক্তিদের জন্য অল্প পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যের ব্যবস্থা আছে।

একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ এতদিনে সকলেই অবগত আছেন। সিপাহী সুকুমার সিদ্ধান্ত প্রমুখ কয়েকজন সৈনিকের গুলিতে সুবেদার অশ্বিনীকুমার মিত্র বীরগতি লাভ করেন এবং সুবেদার শৈলেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আহত হয়েন। জানি না কোন দুর্ম্মতিবশে উত্তেজিত হইয়া এ নিদারুণ কার্য্য করা হইয়াছিল। পরে ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত Communique পাঠে জানা যায় এ সম্বন্ধে বিচার তথা নির্দ্ধারণ শেষ হইয়াছে। সুকুমার নিজ অপরাধ স্বীকার করায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ইহার পরই আর একজন ভারতীয় সৈনিকের শ্রেষ্ঠতমপদ লাভ করি। তখন 'নায়ক' ছিলেন বাঙ্গালী পল্টনের আর একজন শ্রেষ্ঠ সুবেদার পদ পাইয়াছেন। ইহার নাম ফণিভূষণ দত্ত। ইনি প্রথমে বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরে কাজ করিয়া তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। যুদ্ধের বন্দী সৈন্যদের বদলের সময় তুরস্ক হইতে যে সাতজন সৈন্য মুক্তি পাইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ফণিভূষণ দত্ত একজন ছিলেন। তাহারা গত বৎসর অক্টোবরের মধ্যভাগে কলিকাতা পৌঁছিয়াছিলেন। সৈনিক জীবনের কষ্ট ও সহিষ্ণুতা কত বেশী তাহা ফণিভূষণের অজানিত বাকী ছিল না। তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও এই যুবক বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীতে প্রবেশ করিতে কালাবলম্ব করেন নাই। যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন তখন বিশ্রামের সময় আলস্যে কাটান নাই। সেই অবকাশে তিনি হাসপাতালে গিয়া রোগী ও আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষায় লিপ্ত হইতেন এবং তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। বাঙ্গালী সৈন্যগণ সকলেই তাঁহাকে খুব ভালবাসে এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুরাগ ও পূর্ণ আসক্তি দেখিয়া উপরস্থ অফিসারগণও তাঁহার খুব আদর করেন"।

আমাদের বর্ত্তমানজীবনটা বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটিতেছে। কাজকর্ম্ম খুব বেশী কষ্টদায়ক নহে। অফিসারগণ সব এক সঙ্গে মেস করিয়া আছি। খাদ্যদ্রব্যাদি সুবিধা মত পাওয়া যায় না। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কলিকাতা বা বম্বে হইতে আনাইতে হয়। ছেলেরা যাহাতে কোন প্রকারে কষ্ট না পায় এবং নূতন কোন রকম গোলমাল না বাধাইতে পারে সেদিকে সকলেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেছেন। আমরা মোটা মাহিনের মজুর না হইলেও এখন সেইরূপই অনেকটা দাঁড়াইয়াছে, কারণ অসিজীবি হইতে আমরা দিনে দিনে মসীজীবি হইয়া পড়িয়াছি। ভারতীয় বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বহুকাল আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া আসিয়া নেহাৎ দূরদেশে আছি। যুদ্ধের অবিশ্রান্ত কোলাহল ও নানা প্রকার পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বন্ধুবর্গের স্মৃতি বেশ ব্যথিত করিয়া তোলে। জানিনা, কোন মাহেন্দ্র ক্ষণে, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে সেই হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি আবার দেখিতে পাইব, আবার তাহাদের মধুমাখা কথা শুনিব — আবার দেশের সেই 'পাখীর ডাকা ছায়ায় ঢাকা' পল্লী বনিতনায় জড়াইয়া পড়িয়া প্রাণ ভরিব।

দিনগুলি আমাদের বেশ কাটিয়া যাইতেছে। সবারই মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। এই নবীন উদ্যমে, এই নবীন কার্য্যে আমাদের সকলেই প্রাণ দিয়া লাগিয়াছে। জীবন হয়ত দেশের দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে কালের কবলগত হইত, তারচেয়ে এই মহৎ কার্য্যে উৎসর্গে অনেক আনন্দ আছে। দেশের জন্য রাজার কার্য্যে আমরা জীবনদান করিতে যাইতেছি। লর্ড মেকলের সেই ভীষণ কুরপনেয় (?) কলঙ্ক এখনও আমাদের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিয়া মর্ম্মন্তুদ যাতনা প্রদান করিতেছে—তাই সে লজ্জা—সে দৈন্য,—সে কলঙ্ককালিমা অপনোদন করিবার নিমিত্ত আজ আমরা মৃত্যুর সাথে যুঝিতে নামিয়াছি। "দেখুক সকলে নয়ন মেলিয়ে – বাঙ্গালী দিতে জানে প্রাণ—"

কবির এই বাক্য আমাদিগকে কর্ম্মপথে সদা উদ্দীপিত করিতেছে। কারও মনে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দূরে থেকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অসবন্ধ অপ্রমেয় আনন্দের কিছু আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

সুবেদার ফণিভূষণ দত্ত।

নির্ব্বাণ

শরতের শুভ্র মেঘগুলি
অসীমের গায়,
ওই হের ধীরে ধীরে
মিলাইয়া যায়!
পাপ ভার যাহা-কিছু ছিল
ঝরে গেছে সবি,
কি সুন্দর শুভ্র-শুচি
নিরমল ছবি!

সে উন্মত্ত আলু-থালু বেশ
ভীষণ হুঙ্কার,
ঘন ঘোর মূর্ত্তি সেই
অনল উদ্গার,—
কিছু নাহি; সব গেছে থেমে,
ধ্যানময় প্রাণ।
কৈবল্য ব্যাকুল বুদ্ধ যেন
লভিছে নির্ব্বাণ।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেষ্টলালের বক্তৃতা

কাল ঠিক এমনি সময়ে আমার প্রতি আদেশ প্রচার হইল যে, আজ এই সাহিত্যিক বৈঠকে আমাকে যৎকিঞ্চিৎ পাঠ করিতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করিতে সাহস হইল না। বলিলাম, এ আদেশ শিরোধার্য্য।

বাড়ী আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বসিয়া গেলাম। অনেক যত্ন করিয়া প্রবন্ধের নাম লিখিলাম "যৎকিঞ্চিৎ"। তারপর—তারপর আর কি লিখিব? কিছুই ত ভাবিয়া পাই না। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। গামছা দিয়া মুখ মুছিয়া একবার চারিদিকে চাহিলাম। আশা—লিখিবার মত কিছু দেখিতে পাই কিনা; দেখিলাম—দিগন্ত বিস্তৃত সর্ষপ ক্ষেত্র, তাহাতে অসংখ্য সর্ষপ-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ণযুগলকে 'দণ্ডায়মান' করাইলাম, শুনিলাম প্রলয়ের ঝঞ্ঝা-গর্জ্জন। বিরক্ত হইয়া কলমটা ছুঁড়িয়া ফেলিলাম, দোয়াতে লাগিল হাতের ধাক্কা। তাহার বড় অভিমান হইল, সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া বমন করিয়া দিল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। হৃদয় ফাটিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস আগল-হারা বাতাসের মত হু হু করিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা মনে পড়িল। মনে হইল—আমি বড় একা। আজ যদি আমার কেহ থাকিত তবে তাহার সেই প্রিয়জনের অন্ততঃ একটি তিরস্কার বাক্যও আমায় শুনিতে হইত। কিন্তু হায়, আজ যে আমার কেহ নাই। কবে কোন্ অতীত যুগে তাহাদিগকে জীবন নদের কিনারায় সমাধি দিয়া আসিয়াছি—অহা আজ কে জানে! আজ আবার বহুদিনের ঘুমানো স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠিল। আজ এই সান্ধ্য সম্মিলনে সেই পুরাণো স্মৃতির দুই একটি কথা আপনাদিগকে শুনাইব। আমি জানি এই সকল কথা আপনাদের ভাল লাগিবে না, ভাল লাগিতে পারে না। তথাপি তাহাই বলিব। কেন? তাহা আমার মত দুঃখী যাহারা তাহারাই কেবল বলিতে পারে,—কেন।

সে আজ বহুদিনের, কতদিনের কথা তাহা আমার মনে নাই; তবে তাহা যে বহুদিনের কথা ইহা আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। তখন আমার বয়স ১১ কি ১২ হইবে, কাজেই দেখা যাইতেছে তখন আমার বাল্য-কাল। এই অল্প বয়সেই 'পড়ার' প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ ছিল। গাছ হইতে পড়িতে, কাপড় পরিতে, পুল হইতে লাফাইয়া জলে পড়িতে—সকল রকম পড়িতেই শিখিলাম; যত গোল বাধিত কেবল ঐ বই পড়িতে। দাদা কিন্তু

এটাই পছন্দ করিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন "হতভাগা, লেখা পড়া যে করিস্‌নে. খাবি কি করে?" দাদার এই কথার অর্থ আমি বুঝিতাম না। আমি দেখিতাম বৌদিদিও প্রত্যহই পাক করেন,—আমিও রোজই স্নান করিয়া আহার করি। তথাপি দাদা কেন যে এই কথা বলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। দাদার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হইলাম। ক্রমে আর একটা বিদ্যা আমার অধিগত হইল। (চৌকষ ছেলে কিনা!) দাদা বোধ হয় তামাকের ডিবা দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া ফেলিলেন। একদিন তিনি ডাক দিয়া বলিলেন—"কেষ্টলাল!" আর কেষ্টলাল—সাজা তামাকটা খাইতে দিল না দেখিতেছি—ভাবিয়া বিরক্ত হইলাম। যাহা হউক এক 'মার' টান দিয়া দাদার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন, "হতভাগা, লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা, যতরকম বদখেয়াল হচ্ছে—তামাক খেতে আরম্ভ করেছ।" আমি বলিলাম, "মিথ্যে কথা। কক্ষনো না।" "ফের মিথ্যেকথা, এখনো মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—" বলিয়া তিনি জুতা খুলিলেন। তারপর—তারপর আর কি? দাদার জুতার সহিত আমার পৃষ্ঠের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গেল। পৃষ্ঠাঘাতে পাদুকার শ্রীঅঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। দাদার দেহ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম দাদা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। দাদার যে যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া অনেকটা শান্তি বোধ করিলাম। বোধ হয় ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করিবেন না। ইহার মধ্যে কখন যে বৌদিদি আসিয়া দাদাকে তিরস্কার করিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন, তাহা টের পাই নাই। আমি ইতিমধ্যে ধূলা ঝাড়িয়া পেটে কাছা জড়াইয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইলাম। বৌদিদি আসিয়া সস্নেহে হাত ধরিতেই আমার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! আমি তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ভোঁ দৌড় দিলাম। একদৌড়ে একেবারে গ্রামের বাহিরে—মাঠে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কোথায় যাইব ভাবিয়া পাইলাম না, তথাপি হাটিতে লাগিলাম। মাঠ পার হইয়া দেখিলাম, সম্মুখেই একখানা বাড়ী। তাহাতে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাকে দেখিয়া একটা কুকুর বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। দুনিয়ার মধ্যে এই জীবটাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করি। আমি একলম্ফে দাওয়ায় উঠিয়া একেবারে ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেখানে দুইটী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটী বৃদ্ধা। অনুমানে বুঝিলাম, সে অপর দুইটী প্রাণীর জননী। তাহারা আমায় দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এক সঙ্গে মহোৎসবের ধ্বনির মত বলিল, "তুমি কে হে?" আমি ছোট খাট্ট রকমের একটা গল্প তৈয়ার করিয়া বলিলাম এবং রাত্রের জন্য একটু আশ্রয় চাহিলাম। তাহারা বলিল, "ওহোঁ, নাহে না, তা হবে না, তুমি কে না কে, কে জানে। যে দিনকাল পড়েছে—তুমি উঠ।" আমি অনেক বলিলাম, তাহারা কেবল একই কথা বলে—'উঠ'। অবশেষে এক ছিলিম তামাক প্রার্থনা করিলাম। ভাবিলাম শরীরটাকে ত 'চাঙ্গা' করিয়া লই, তারপর যা'থাকে অদৃষ্টে। আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। অনেকক্ষণ পরে হুকা পাইয়া কসিয়া একটান মারিলাম—উঃ বাবা, এযে একেবারে মানুষ জখম করা তামাক। মাথা ভন্ ভন্ করিতে লাগিল। তারপর অনেকগুলি কথা Gap থাকুক। কারণ, তখন কি ঘটিয়াছিল তাহা আমারই স্মরণ নাই।

প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখি, সেই বাড়ীতেই একটা ছেঁড়া মাদুরে পড়িয়া আছি। পাশ ফিরিতেই পৃষ্ঠদেশে কিসের একটু বেদনা অনুভব করিলাম। চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে শুনিলাম বৃদ্ধা তাহার পুত্রদ্বয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাহাদের নাম কি ছিল আজ এতদিন পরে তাহা আর মনে নাই। আচ্ছা ধরুন, বড়টীর নাম রমণ ছোটটীর নাম পরাণ। পরাণকে বৃদ্ধা বলিল, "যাও বাবা, তোর দাদার শ্বশুর বাড়ী। কতদিন হ'ল বউর কোন সংবাদ পাইনে, কি যে করে তারাই জানে। একখানি চিঠি লিখিবারও কি সময় হয় না? তারাত সেখানে মজায়ই আছে, ভেবে মরি আমি মাগী।" পরাণ মহা উৎসাহে চাদর গায়ে দিয়া বাহিরে আসিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। বৃদ্ধা পরাণকে একটি টাকা দিয়া বলিল, "দ্যাখ পরাণ, এই টাকাটা দিয়ে যা পাস্ যৎকিঞ্চিৎ কিনে নিয়ে যাস্। কুটুম্বের বাড়ী শুধু হাতে যেতে নাই।"

পরাণ টাকাটি টেঁকে রাখিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাই?" সে বলিল, "বেশত চলনা।" দেখিলাম ছেলেটি বেশ

সবল। দুই জনে হাটিতে লাগিলাম। পথে কত ফেরিওয়ালার সহিত দেখা হইল, পরাণ কিন্তু কিছুই কিনিল না। সকলকেই জিজ্ঞাসা করে, "কি নিয়ে যাচ্ছ হে?" যে যার জিনিসের নাম করে। কিন্তু পরাণ কেবল হাটে আর হাটে। কতক্ষণ পরে দেখিলাম একটি ব্রাহ্মণ একখানা ধামায় করিয়া কতকগুলি শ্রাদ্ধের উপকরণ—এই মনে করুণ কলাগাছের ঠোঙ্গা, চাউল, কলা ইত্যাদি—লইয়া যাইতেছেন। পরাণ তাঁহাকে বলিল, "প্রণাম হই, ঠাকুর মশায়—কি নিয়ে যাচ্ছেন?" প্রণাম পাইয়া দেবতা তুষ্ট হইয়াছিলেন, হাসিমুখে বলিলেন, "এই যৎকিঞ্চিৎ জিনিস বাপু।" "এইত হয়েছে, এই জিনিসগুলিত আমাকে দিতে হচ্ছে। আপনাকে আমি একটি টাকা দিচ্ছি।" ব্রাহ্মণ সহজেই স্বীকৃত হইলেন। পরাণ তাঁহাকে টাকা দিয়া, ধামা মাথায় করিয়া চলিল।

প্রায় এগারটার সময় আমরা রমণের শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলাম। একটি স্ত্রীলোক পরাণকে দেখিয়া হাসিয়া বাহির হইল। পরাণের মাথায় ঐ সকল জিনিস দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো তোমরা দেখে যাওগো, ক্ষেন্তির বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে।" সকলে ছুটিয়া আসিল। একে একে সকলেই এই ক্রন্দনে যোগদান করিতে লাগিল। পরাণও মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিলাম একটি বালিকাকে—বালিকাই বা বলি কেন, একটি যুবতীকে ঘাটে লইয়া যাইয়া তাহার শাঁখা ও নোয়া ভাঙ্গিল, সিঁথির সিঁদুর মুছিল, শাদা কাপড় পরাইল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। একি বিপত্তি।

কিয়ৎক্ষণ পরে পরাণ উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে চলিল। শেষ কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য আমিও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া গিয়াছে, তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার পাছে পাছে ছুটিয়া চলিলাম। যখন পরাণদের বাড়ী পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পরাণ ঘরের আঙ্গিনায় যাইয়া ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "মাগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে।" বৃদ্ধা ও রমণ ছুটিয়া আসিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, শীগ্‌গির বল্।" পরাণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে, মাগো, একেবারে সর্ব্বনাশ—বৌদিদি বিধবা হয়েছে।" "দূর্ পোড়ামুখো, কি বল্‌ছিস্ হতভাগা, ষাট্, ষাট্, আমার ষেটের বাছা, 'ষষ্ঠীর দাস"—বলিয়া বৃদ্ধা রমণের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এই তিরস্কারে পরাণ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, বলিল, "হাঁ, তুমি বল্লেই হ'ল—তারা সবাই কাঁদ্‌লে, আমিও তাঁদের সাথে কাঁদ্‌লুম—বৌদিদি শাঁখা নোয়া ভাঙ্‌লে আর উনি বলছেন 'কি বল্‌ছিস্ হতভাগা।'—আচ্ছা, ওকে না হয় জিজ্ঞেস কর।" এই কথায় বৃদ্ধা যেন কেমন হইয়া গেল। বুঝিলাম তাহার মনেও একটা সন্দেহ ঘনাইয়া আসিতেছে। সে বলিল, "আচ্ছা চল্‌ত বিদ্যালঙ্কার মশায়ের বাড়ী। তিনি কি বলেন শাস্ত্রে আছে কিনা?" সকলে মিলিয়া বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী চলিল। আমিও তাহাদের পাছে পাছে চলিলাম।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দাওয়ায় বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন, আর একব্যক্তিকে ধম্‌কাইতেছিলেন (বোধ হয় টাকার জন্য)। বৃদ্ধা তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিল, "দেবতা, পরাণকে আজ বেয়াই বাড়ী পাঠিয়ে ছিলুম, সে বলে বৌ আমার বিধবা হয়েছে। আমার রমণ—এই কোথায় গেলি আবার? আয় এখানে এই যে—ভালই আছে। এ কি রকম হ'ল—আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।" এই কথা শুনিয়া বিদ্যালঙ্কার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "মাগী, আমার বাড়ীর পাশে থাকিস্, আর এইটুকু জানিসনে? বেরো আমার বাড়ী থেকে।" বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেবতা, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আপনি ত সবই জানেন।" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "দেখতেই ত পাচ্ছিস্ মাগী, আমি বর্ত্তমানে আমার সাত সাতটা মেয়ে বিধবা, আর তোর ছেলে এমন কি নবাবপুত্তুর হয়েছে, যে সে বর্ত্তমানে একটা বৌ বিধবা হ'তে পারবে না?—যা' মাগী, যা' এখন। কাল এসে শ্রাদ্ধের বিধি নিয়ে যাস্।"

এমনি সময়ে শুনিলাম "এই যে খোকাবাবু।" ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের ভৃত্য রামধন। তাহার সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এইত গেল আমার জীবন গ্রন্থের একটা অধ্যায়। যদি ভগবান্ দিন দেন তবে আর একবার আপনাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

অভিশাপ।

(I Wilmot হইতে)

যাহার পরাণ চরণে ঠেলিলে
তাহার জীবনে কি আর রাখিলে বাকি ?
নিরাশা আগুনে দহিয়া দহিয়া
পলে পলে সে যে মৃত্যু আনিবে ডাকি।
মেদিনীর স্নেহক্রোড়ের ছায়ায়
তাহার বেদনা চির শেষ হবে যবে

সেদিন হইতে তোমার বেদনা
ধীরে ধীরে তব পরাণ দহিতে র'বে।
তাহার পরাণ যেমন করিছে
তোমারো পরাণ তেমন করিবে জেনো,
এমন অটল প্রণয়ীর হৃদি
বৃথায় ভাঙেনা বৃথায় ভাঙিবে কেন ?

শ্রীকালিদাস রায়।

এটা কি স্বপ্ন ?

ছোট্ট ঘরখানি। দুটো তিনটে আলমারিতে বই ঠাসা—তার মাঝখানে একটা ক্যাম্পখাটের উপর শুয়ে শুয়ে আমি তখন বাংলা দেশেরই একটা খবরের কাগজ পড়ছিলুম আর মনের মধ্যে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের এই সব মহারথীগণ, যাঁরা দেশপূজ্য, এঁরাও কি মান, অভিমান, হিংসা, ক্রোধের অধীন ? এঁরাও কি দেশমাতার পূজার মন্দিরে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ছোটখাটো দল বেঁধে প্রবেশ ক'রে দিন দিন এমনি ভাবে জগতের সাম্নে আমাদের হতভাগ্য দেশকে অপমানিত করবেন ?

এমন সময় আমার ঘরে প্রভাস প্রায় ২।৩ দিন পরে হঠাৎ এসে হাজির। প্রভাস বিনা দরকারে কখনও আমার কাছে আসে না সে এসেই আমার হাতখানা ধরে জোরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বল্লে—ও ছাই খবরের কাগজ না পড়ে আমার কাছে কংগ্রেসের একটা নূতন খবর শোন।

আমি হেসে বল্লাম—কংগ্রেসের নূতন খবরটা কি তোমার কাছেই সব থেকে আগে এসেছে নাকি ?

প্রভাস গম্ভীর হয়ে বল্লে, "হাঁ, চুপ ক'রে শোন।

ছোট্ট একটা নদী গ্রামটির পাশ দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে—প্রায় ১০০ বছর আগে এই নদী দিয়ে নাকি বাণিজ্যের জাহাজও আস্ত। গ্রামটির নাম 'ধরমপুর।' ধরমপুর আগে তাঁতের ভাল কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আজ ধরমপুরের নাম বাংলাদেশের ভূগোল থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছিল। নদীটা প্রায় বুজে আসচে—বড় বড় পুকুর ডোবা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চৌধুরীদের সেই সব বিখ্যাত বনিয়াদী বংশ অনেকদিন হ'ল ধরমপুর ছেড়ে সহরে গিয়ে বাস করচে—তাদের পুরানো ভগ্ন অট্টালিকা দেশের পূর্ব্বগৌরবের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির আজও তার শীর্ণ জীর্ণ ভগ্ন ইষ্টকের আকাশস্পর্শী স্তূপ নিয়ে মনের মধ্যে একটা বিষাদের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। বড় বড় বট, অশ্বত্থ, দেবদারু—ছোট ছোট কাঁটাগাছ, লতা, ঝোপ-ঝাড়—তার মাঝখানে মাঝখানে এক একটা ভগ্ন অট্টালিকা ইষ্টকের স্তূপ মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল সে গ্রামে আর বাজে না, কেবল সন্ধ্যায় সেখানে শোনা যায় শৃগালের ভীতিপ্রদ ধ্বনি এবং মশকের অবিরাম গুঞ্জন।

তাঁতিপাড়া যেখানে ছিল সেখানে এখন একঘরও তাঁতী নেই। দু' তিন ঘর বাগ্দী আছে, তারা সব ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে প্রায় কাবু হ'য়ে এল। দিনের বেলায় জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের রাস্তায় কদাচিৎ দুই একটি লোক দেখা যায়।

ম্যালেরিয়ায় প্রায় সমস্ত গ্রামের লোক শেষ হ'য়ে এসেছে, তবু দুই এক ঘর এখনও 'বাপের ভিটে' ছেড়ে পালায় নি।

ধরমপুরের বাংলা স্কুল বোধ হয় বাংলা দেশের আদিম স্কুল—সে স্কুলে আজ পাঁচটি ছয়টি ছাত্র। চারিদিকে একটা বিষাদের ছায়া, গ্রামের রাস্তায় দিনের বেলাও একা চলতে ভয় করে।

যে ধরমপুরের সঙ্গে একদিন সমস্ত বাংলাদেশের ধনী মহলের আদান প্রদান চলত সেই ধরমপুর আজ 'Deserted village'—অথচ ইতিহাস ভূগোল তার সাক্ষ্য রাখেনি। শোনা যায়, এই ধরমপুরের লোক লাঠি খেলায় একদিন এত ওস্তাদ ছিল যে বাংলাদেশের নানাদিক থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এখানে শুধু লাঠি খেলাই দেখ্তে আস্ত। কিন্তু আজ সেই ধরমপুরের লোক প্লীহা যকৃতপূর্ণ উদর নিয়ে রাস্তায় যখন ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে কাঁপতে কাপড় মাথায় ঢাকা দিয়ে বেরোয় তখন উপরের নীল আকাশটা পর্য্যন্ত লজ্জায় ম্লান হ'য়ে যায়। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন এই সমস্ত গ্রামের ধ্বংসাবশেষ মূর্ত্তি নিয়ে একটা ছদ্মবেশধারী কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় সেই নিরানন্দ, পরিত্যক্ত গ্রামের নির্জ্জন পথ-ঘাট আবার সজন হ'য়ে উঠ্ল। কংগ্রেসের সুর বদ্‌লে গেছে— সহরের বাইরের আড়ম্বর থেকে এখন বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষের হতভাগ্য দীন গ্রামগুলির নির্জ্জন ক্রোড়ে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কংগ্রেস লালায়িত হ'য়ে উঠেছে। এবার বাংলাদেশের এক কোণে ধরমপুরে কংগ্রেস হবে।

সমস্ত গ্রামের বন জঙ্গল পরিষ্কার হচ্চে, বড় বড় পুকুর গুলিকে তা'দের ডোবা-জীবন থেকে অব্যাহতি দিয়ে ব্যবহার যোগ্য করা হ'তে লাগল। সমস্ত গ্রামের চেহারা বদ্‌লে গেছে—ভলাণ্টিয়ারেরা এসে অবধি গ্রামটি যেন নূতন জীবন পেয়েছে।

কংগ্রেসের সময়েই আবার সেই গ্রামে স্বদেশী মেলা ব'স্‌বে, তার জন্য চারিদিক থেকে বড় বড় দোকানদার এসে ঘর তৈরী করতে লেগে গেছে। নদীটা কাটানো হয়ে গেল, অনেক লোক এসে আবার ধরমপুরেই বাড়ী ঘর বেঁধে বাস করতে লাগ্‌ল। পুরাণো দালানগুলির সংস্কার হ'য়েছে।

কংগ্রেস ওয়ালাদের উপরেই কংগ্রেস শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এই গ্রামটার সম্পূর্ণ ভার। বিচার, আচার, শাসন, পাহারা সমস্তই দেশের উৎসাহী কর্ম্মীরা করচেন—ধরমপুরে স্বদেশী রাজ্য বসে গেছে—একটা চমৎকার শৃঙ্খলা চারিদিকে অখণ্ডভাবে বিরাজমান।

স্বদেশী মেলায় চারিদিক থেকে দেশের তৈরী নানারকম জিনিষ পত্রের দোকান এসেছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য নরনারী অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রেও এই গণ্ডগ্রামে এসে মিলিত হয়েছে—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পারিয়া—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আজ এক প্রাণ হ'য়ে দেশের মঙ্গল চিন্তায় রত।

এ কংগ্রেসে সভাপতি হচ্চেন মান্দ্রাজের এক প্রান্তস্থিত গ্রামের একজন নীরব কর্ম্মবীর। তিনি তাঁর জীবনের প্রায় ৩৫ বৎসরকাল ধ'রে সেই গ্রামে জেল থেকে মুক্ত পিতৃমাতৃ হীন অনাথ বালকদের নিয়ে একটি আশ্রম খুলেছেন—তারাই তাঁর জীবন, তারাই তাঁর সাধনা। সেই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আজ দেশের কাজে সমস্ত জীবন মন বিসর্জ্জন করেছেন। এবার তাঁর শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকেই সভাপতি বলে মেনেছেন। নাই তাঁর প্রখর বাক্‌শক্তি, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী ত্যাগের জ্বলন্ত শিখা আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে নব দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রবে। Moderate Extremest এসব দলাদলি আর কংগ্রেসে নাই, তবে নূতন রকমের দল হয়েছে। একদল দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে, একদল শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে আর একদল স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন। সমস্ত বছর এক একদল কি রকম কাজ করেছেন ও আগামী বছরই বা কিরকম কাজ করবেন—কংগ্রেসে তারই হিসাবনিকাশ। কংগ্রেস আর শুধু বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চ না, এখানে কর্ম্মী ও চিন্তাশীল ভাবুকের আদানপ্রদানের স্থান।

কংগ্রেসের আরম্ভেই—'তোমারি পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি' এই গানটি এবং শেষদিন কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আবার তোরা মানুষ হ' এই গানটি গাওয়া হ'ল।

Resolution প্রভৃতি কিছুই পেশ করা হ'ল না—কর্ম্মীরা কাজের দীক্ষা নিলেন, জ্ঞানীরা জ্ঞানের আলো দেশে

জ্বালাবার জন্য সমস্ত দেশবাসীর মনকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। কংগ্রেস শেষ হ'য়ে গেল, আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল।

বুঝ্‌লে, কাল রাত্তিরে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি।

আমি অবাক্ হ'য়ে প্রভাসকে বল্লুম, "প্রভাস, এটা কি স্বপ্ন?"

প্রভাস দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌ল,'এ নহে কাহিনী,এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে'।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রেমে প্রার্থক্য।

পুরুষের ভালবাসা
অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়;
সহজে তা' ভরে উঠে,
সহজে তা' হয়ে যায় লয়!
রমণীর ভালবাসা
অসীম অতল পারাবার;
পূর্ণ নহে অনায়াসে,
শুষ্ক নহে পূর্ণ হলে আর!
পুরুষের প্রেম তাই
ধরা মাঝে একান্ত সুলভ;
নারীর হৃদয় জয়
তপস্যায় কভুবা সম্ভব!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

৺ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি সর্ব্বজনপ্রিয় সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই বিনম্র শ্রদ্ধার পাত্র মহাভাগাধর মহাপুরুষ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সতত সদালাপী সুস্মিতমুখ সুমিষ্টভাষী, প্রতিভায় উজ্জ্বল, বার্দ্ধক্যেও অক্লান্ত উদ্যম, সর্ব্বত্র সকল সদনুষ্ঠানে পরিদৃশ্যমান সার গুরুদাসের সেই মূর্ত্তি আর কেহ চক্ষে দেখিবে না। একথা মনে হইলে এই কলিকাতায় বোধ হয় এমন কেহই নাই, যাহার ব্যথিত ক্ষুব্ধ অন্তর হইতে অতি গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস না উঠিবে, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত না হইবে।

অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইয়া তিনি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,— কিন্তু তাহার পুরস্কার ও ভোগেও ভাগ্যবান সার গুরুদাসের এই পার্থিবজীবন ধন্য হইয়াছিল। ধনীর সন্তান না হইয়াও কেবল আত্মপ্রতিভা ও আত্ম-শক্তির বলে দেশে তিনি এদেশবাসীর লভ্য অতি উচ্চপদ ও উচ্চ সম্মান লাভও করিয়াছিলেন। এরূপ উচ্চ-প্রতিভা ও কর্ম্ম-শক্তি, এবং ভগবৎ কৃপায় তাহার বলে সাধারণ অবস্থা হইতে অসাধারণ সম্মানার্হ পদে অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত দেশে আরও অনেক আছে। কিন্তু এরূপ প্রতিভাশক্তির অধিকার ও পদ-গৌরবের সঙ্গে যে প্রশান্ত ধীরতা, যে বিনয় ও সৌজন্য, যে সুপরিমার্জ্জিত সুমধুর শিষ্টাচার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় সার গুরুদাসের চরিত্রে দেখা যাইত, তাহা বাস্তবিকই অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। গুরুদাসের চরিত্রের বড় একটি বিশেষত্ব এইখানেই তাঁহার এই প্রশান্তধীরতায় এবং সুমধুর সৌজন্যে কোনও ক্ষুণ্ণতা বোধহয় কোনও অবস্থায় কেহ কোথাও লক্ষ্য করেন নাই। এরূপ বিনয় ও সৌজন্যে পূর্ণ শান্ত মধুর স্বভাব যাঁহাদের, প্রায়ই দেখা যায়, ন্যায় ধর্ম্মের কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহারা পালন করিতে পারেন না, চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতাও তাঁহাদের বড় থাকে না।

কিন্তু স্যার গুরুদাসের এই দুইটি পুরুষোচিত গুণের অভাব ছিল না।

বিবেক বুদ্ধিতে তিনি যাহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বোধ করিতেন অটলসংকল্পে তাহা পালন করিতেন, ন্যায়বিরোধী বলিয়া যাহা বুঝিতেন, দৃঢ় অথচ ধীর তেজস্বীতার সঙ্গে নির্ভিকভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। কিছুটা একবার 'হাঁ' কি 'না' বলিলে সেই 'হাঁ' কে 'না' করান, কি 'না' কে 'হাঁ' করান কাহারও পক্ষে বড় সহজসাধ্য হইত না। বহু যুক্তিদ্বারা বিষয়ের অবস্থা বিশেষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেই অযৌক্তিক বোধে অনভিপ্রেত হইলেও ক্বচিৎ কখনও তাঁহার অনুমোদন পাওয়া যাইত, যদি তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধ তাহাতে কিছু না থাকিত। বিনয়, ধীরতা ও প্রশান্ত মধুর স্বভাবের মধ্যেই এই দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা গুরুদাস চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব।

লোকের একটা সাধারণ ধারণা আছে, সার গুরুদাস দুর্ব্বলচিত্ত লোক ছিলেন,—সাধারণ লোকে যাহাকে 'মাটির মানুষ' বলে—একেবারে শান্ত নিরীহ ভালমানুষটি, লোককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত, কোনও গোলমাল হাঙ্গামায় যাইতে চায় না, সর্ব্বদা আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, চরিত্রে দৃঢ়তা কি তেজস্বিতা একেবারেই যাহার নাই—সার গুরুদাস সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। দূর হইতে তাহার চির অক্ষুণ্ণ প্রশান্ত ধীরতা, চিরপ্রফুল্ল হাসিভরা মুখখানি তুষ্টিকর মধুর ব্যবহার ও মধুরতর কথা— এই সবই যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, কর্ম্মীরূপে তাঁহার সঙ্গে নিকট পরিচয় যাঁহাদের কখনও হয় নাই, কোনও সাধারণের ভিতরের কর্ম্ম সম্পাদন বা জটিল বিষয়ের মীমাংসাদি উপলক্ষে তাঁহার কাছে যাহারা বেশী যান নাই, তাহাদেরই মাত্র এইরূপ ধারণা হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সব কর্ম্ম বা আলোচনা উপলক্ষে যাঁহারা তাঁহার নিকট পরিচয়ে আসিয়াছেন তাঁহার বিবেক বুদ্ধির সূক্ষ্ম বিচারশীলতা এবং সেই বিচারে উপলব্ধ ন্যায় ধর্ম্ম পালনে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার বহু পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছেন।

সাধারণ হিতকর কর্ম্মাদির সঙ্গে দেশের শিক্ষা ব্যাপারেই তাঁহার চিত্তের সমধিক আকর্ষণ ছিল। এই বার্দ্ধক্যকাল পর্য্যন্ত শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোনও কর্ম্মে বা আলোচনায় তাঁহাকে কখনও ক্লান্ত বিরক্ত দেখা যাইত না, বরং অতি সাগ্রহ আনন্দেই সর্ব্বদা তাহাতে যোগ দিতেন। নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, অক্লান্ত উদ্যোগে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন অগ্রণী সদস্য ছিলেন। বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষাপরিষদেরও অন্যতম প্রধান নায়ক তিনি ছিলেন। দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাজ সরকারের করায়ত্ত থাকে, এটা তিনি সুব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেন না। লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভার্সিটী আইন যখন হয়, তখন সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি কমিশন বসিয়াছিল। সার গুরুদাস তাহার একজন সদস্য ছিলেন। সেই কমিসনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই সেই আইন পাশ হয়, এবং আইনে ইউনিভার্সিটিগুলি গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সদস্যগণ সকলেই রিপোর্ট সহি করেন, কেবল একা সার গুরুদাস তাহার প্রতিবাদ করত সুদীর্ঘ একনোট বা মন্তব্যে তাঁহার সেই বক্তব্য ব্যক্ত করেন। তাহাতে রিপোর্টের সকল যুক্তি অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি আলোচনা করিয়া, তাহার অসমীচীনতা ও ভাবী অনিষ্টকারিতা তিনি প্রতিপাদন করতঃ কি করিলে ভাল হয়, তাহা নির্দ্দেশ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলেই জানেন ঘোর এক রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা তখন দেশে চলিতেছিল এবং শিক্ষাপরিষদের উদ্ভবও তাহারই ফল। কিন্তু রাজসরকারের আয়ত্তের বাহিরে দেশীয় লোকের স্বতন্ত্র পরিচালনাধীনে নূতন একটা শিক্ষা প্রণালী দেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, প্রভূত মঙ্গল ইহাতে হইবে—এই আশার জ্বলন্ত উৎসাহে সার গুরুদাস শিক্ষাপরিষদে যোগদান করেন। শিক্ষাপ্রণালী গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইলেও গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কোন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকা ভাল নয়, ইহা বুঝিয়া তিনি ইহার লক্ষ্য ও নীতি এইভাবে নির্দ্দেশ করেন যে—শিক্ষাপরিষদ গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অথচ বিরোধ না করিয়া সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পরিচালনাধীনে জাতীয় ভাবে দেশে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বিস্তারকল্পে চেষ্টা করিবে।

প্রারম্ভে বহু খ্যাতনামা দেশনায়ক এই শিক্ষাপরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন,—দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। দুর্গতির দিনে অনেকেই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন,—দানের

প্রতিশ্রুতিও পালন করেন নাই। কিন্তু স্যর গুরুদাস ইহাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। জীবৎকালপর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা চাঁদা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন,—ডিসেম্বরের প্রথমেই তাঁহার মৃত্যু হয়,—সেই ডিসেম্বর মাসের চাঁদাও যথাসময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পৌঁছিয়াছে। যতদিন জীবিত ছিলেন, সাধ্যমত ইহার উন্নতিকল্পে তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যম কখনও শিথিল হয় নাই।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা গুরুদাসচরিত্রের আর একটি বড় বিশেষত্ব। তিনি যে সময়ে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বধর্ম্মে কোনও আস্থা বড় দেখা যাইত না। প্রায় সকলেই হিন্দু গৃহস্থের নিষ্ঠা ও আচার অবজ্ঞায় ত্যাগ করিয়া জীবনযাত্রার ফিরিঙ্গিয়ানার স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিতেন। কিন্তু স্যর গুরুদাসের স্বাভাবিক স্বধর্ম্মানুরাগ স্বধর্ম্মশ্রদ্ধা এতই প্রবল যে বাল্যাবধি শেষজীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে হিন্দুগৃহস্থের নিষ্ঠা ও আচার তিনি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সেই শিক্ষাবশতঃ গুণাবলীর সঙ্গে স্বধর্ম্মানুরাগ হিন্দুজীবনের নিষ্ঠা ও আচার পালনের সামঞ্জস্য গুরুদাসের জীবনে যেমন দেখা গিয়াছে এমন আর কাহারও জীবনে বড় দেখা যায় না।—একথা বাস্তবিকই বড় ঠিক। বস্তুতঃ এই সামঞ্জস্যের এক প্রথম কীর্ত্তির স্বরূপ তিনি ছিলেন। পাশ্চাত্য আদর্শের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য, বার্দ্ধক্যেও অশিথিল উদ্যম, সময় নিয়মের কঠোর অনুসরণ সর্ব্বদা সকল কর্ম্মে তাঁহার দেখা যাইত। কোনওরূপ বিশৃঙ্খলা অপরিপাট্য—কখনও একটু কোনও আগোছাল আলুথালু ভাব—তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। কোথাও একটু ত্রুটি কাহারও দেখিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা দেখাইয়া দিতেন, কিন্তু এমনই মিষ্ট হাসিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া সেই ত্রুটির কথা উল্লেখ করিতেন যে অতি লজ্জা পাইলেও কেহ অসন্তুষ্ট তাহাতে হইতে পারিত না। তাঁহার গৃহে পাশ্চাত্য গৃহের নিখুঁত সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইত কিন্তু হিন্দুর গৃহ ভিন্ন কোনও সাহেবের কুঠী বলিয়া কখনও কাহারও মনে হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পাণ্ডিত্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রশান্ত নম্রতা বিনয়, সদাচার, সৌজন্য, সাধুতা এবং তার সঙ্গে ন্যায় বুদ্ধির ও ন্যায় বিচারের সূক্ষ্মতা—ন্যায়ানুগত কর্ত্তব্যপালনে ও ন্যায়বিরোধী কোনও কার্য্যের প্রতিবাদে অটল দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা এই সকল গুণের কথা স্মরণ করিলে, সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণসন্তান গুরুদাস দেশের এই দারুণ তামসযুগে প্রকৃত সাত্ত্বিক ব্রহ্মণ্যের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই ব্রহ্মণ্যই তাঁহার জীবনে পালন করিয়া এখন ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

ভালবাসার আত্মনিবেদন।

আমি একজনকে ভালবাসিতাম। সে জানিত কিনা জানিনা, তাহাকে একথা কখনও বলিবার অবসর হয় নাই। কি তাহার সম্মুখে, কি তাহার বাহিরে, তাহার চিন্তায় আমাকে এমনই তন্ময় করিয়া রাখিত যে এ প্রশ্ন মনে করিবার সুযোগ পাই নাই। যখনই তাহার কাছে যাইতাম—তাহার মুখখানির পানেই তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার বৃহদায়তন উজ্জ্বল চক্ষু দুটি আমার ক্ষুদ্র ক্ষীণ দৃষ্টিকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিত,—আমি কেবলি চাহিয়া থাকিতাম, কেবলি প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম,—আমার বাক্ মূক হইয়া যাইত, কর্ণ বধির হইয়া থাকিত, সমস্ত জীবনীশক্তি চক্ষু যাইয়া যেন তাহার দৃষ্টির অন্তরালে মরণ লাভ করিত। মানুষের চোখে যে এতখানি প্রাণ আছে,—উহার সামান্য পরিবর্ত্তনে যে জগতের এতটা তোলপাড় হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করিবার সুযোগ হয় নাই। চক্ষু ত সকলেরই থাকে, কৈ অপরের দিকে চাহিয়া ত এমনটি হয় না? প্রিয়জনের চোখে কি কিছু বিশেষত্ব থাকে? উহার মধ্যে কি এমন কোন বস্তুর উদ্ভব হয় যাহা সকল বস্তুকে অনাদৃত করিয়া শুধু উহারই দিকে আকর্ষণ করে? হয়ত এমন হইয়াছে যখন তাহার একটী চাহনীতে দেহে বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছে, সহসা চক্ষু কর্ণ আরক্ত হইয়া

উঠিয়াছে, গণ্ডস্থল পাংশুবর্ণ গাঢ় লাল হইয়াছে ; শিরাগুলি রক্তের বেগে ফুলিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে ; হৃদয়ের মধ্যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—হায়, সে ঝড় লুকাইবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছি ! দুই হাতে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়াছি, মস্তক সহসা নত করিয়াছি ;—কি লজ্জার কথা—সে যদি দেখিয়া ফেলে, তবে কি মনে করিবে ?

সে হাসিলে, তাহার সুন্দর চক্ষু দুইটি কিরূপ দেখাইত, সে চিন্তা করিতে থাকিলে তাহার ডাগর প্রশান্ত চক্ষু দুইটি কোন ভাব ধরিত, সে বিষণ্ণ হইলে, রাগ করিলে, কাঁদিলে, কাঁদিবার ভাণ করিলে, বিদ্রূপ করিলে, ভীত বা লজ্জিত হইলে । আমি কোন অবস্থার কথা বলিব—প্রত্যেক অবস্থার প্রতিকৃতিই যে আমার অন্তরে গাঁথিয়া রহিয়াছে ।

সে কখন কখন পুঁথি পড়িত । যেরূপ একাগ্রচিত্তে উহার মধ্যে ডুবিয়া যাইত, ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম জড় অক্ষররূপেই এ জীবন কাটাইয়া দিতে ইচ্ছা হইত । একবার হয়ত চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিত, সে যে কি প্রসন্ন দৃষ্টি,—আমি তথাপি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম ।

সে সেলাই করিতে ভালবাসিত, যখন নিবিষ্ট চিত্তে উহাতে রত থাকিত আমি একবার তাহার সহজ অথচ দ্রুত অঙ্গুলী সঞ্চালন ও একবার তাহার নিমগ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিতাম । ভাবিতাম,—হে ভগবান্, তুমি যাহাকে সৌন্দর্য্য দিয়াছ, তাহাঁর নখের আগা হইতে চক্ষুর মণিটি পর্য্যন্ত সুন্দর করিয়া দিয়াছ ।

সে একদিন হার্ম্মোনিয়াম সংযোগে গান গাহিতেছিল । সঙ্গীতে এমনই তন্ময় ছিল যে আমার প্রবেশ অনুভব করিতে পারে নাই । তাঁহার কোমল করপরশে হার্ম্মোনিয়ামে যে মধুর সুর উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাতে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া ছিলাম । চম্পক কলিকার মত তার সুন্দর, সুঠাম অঙ্গুলিগুলি একবার এদিক্ একবার ওদিক্, একবার ধীরে, একবার বেগে ধাবমান হইতেছিল । কি সুন্দর সে অঙ্গুলী সঞ্চালন—দেখিবার বিষয়ই বটে,—এমন একটা স্বাভাবিক কমনীয়তা ছিল যাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই । যদি কেহ বর্ষায় বাদ্লার দিনে, নদী যখন পূর্ণযৌবনা হইয়া দুইকুল ছাপাইয়া উঠে, তাহার তরঙ্গরাশির লীলাভঙ্গ দেখিয়া থাক তবেই বুঝিতে পারিবে । ঐ তরঙ্গ উঠিতেছে, এই নামিতেছে, ঢেউএর পর ঢেউ অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে—এ সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি যাহার আছে সেই এই অঙ্গুলীর অবিরাম গতির বাস্তবতা ও মাধুর্য্য ধারণা করিতে পারিবে । তাহার পর কি বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠ, কি স্বর্গীয় সুর লহরী ! সে একটা অতি পরিচিত পুরাতন গান গাহিতেছিল তাহার কণ্ঠে উহা একেবারে নূতন লাগিল । উহাতে যে শুধু নূতনের নবীনতা ও সরসত্ব, আনন্দ ও উল্লাস ছিল তাহা নহে,—উহা চির পুরাতনের ভিতর হইতেও একটা নবীন তান, একটা সজীবতা, একটা সার্থকতা—পুরাতনের সহিত নবীনের সম্বন্ধ যে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না এই যে একটা ভাব, ইহাকে যেন জাগ্রত ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল । মানুষের কণ্ঠে যে এত অমৃত, গান যে স্বর্গকে একেবারে ধরায় নামাইয়া আনে, আজ তাহা এই প্রথম বুঝিলাম ।

সে সমস্ত প্রাণ দিয়া গানটি গাহিতেছিল, চারিদিকের বিষয়ে তার কোনই খেয়াল ছিল না । আমি পুলকে ও বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইতে ছিলাম, আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ভাবিলাম জগতে আজ আর কিছুই নাই, আছে শুধু একটা সঙ্গীত, একটা সুর, একটা আনন্দ । কখন যে গান থামিয়া গিয়াছিল জানি নাই, তখনও আমার হৃদয়ে গান ধ্বনিত হইতেছিল । শুধু কি হৃদয়ে, আমার মনে হইতেছিল সে ঘরের প্রত্যেক স্থান হইতে গানের সুর ঝঙ্কার দিতেছিল । উহা যেন একবার বাতাসে একবার আকাশে, এইরূপে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল । অন্যদিন হইলে সে আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিত কিন্তু আজ সে গানে এমনই তন্ময় ছিল যে তাহা করিল না, স্বপ্নাবিষ্টের মত আমার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল এবং ইঙ্গিতে জানাইল বোস । আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম । এইরূপে কত দিনই গিয়াছে । কত দিন গান শুনিতে শুনিতে ভাবিয়াছি, "হে ভগবান্, তুমি পাখীর সুরে যে আনন্দ, যে মাধুর্য্য যে অমৃত, দিয়াছ, মানুষের কণ্ঠেও যে তাহার শতগুণ দিয়াছ তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই । তোমার দয়ার ত শেষ নাই প্রভু, তুমি মানুষের সুখের জন্য, প্রীতির জন্য তৃপ্তির জন্য কি না দিয়াছ ? তাহার গান শুনিলে আমি সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম, ইহজগতের পঙ্কিলতার কত ঊর্দ্ধে

যাইতাম তাহা বলিতে পারি না। আমার সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দুঃখ, সকল অশান্তি দূর হইয়া যাইত, শুধু একটী নীরব শান্তিতে প্রাণ পরিপূর্ণ থাকিত।

কি দারুণ এই সংশয়। কোন দিন যাইয়া হয় ত দেখিয়াছি তাহার এক সখী দেখা করিতে আসিয়াছে,—তাহাকে একা রাখিয়া কোন ক্রমেই আসিবার সুযোগ হয় নাই; হয় ত বা তাহার মাতা অসময়ে চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন—এরূপ কত ঘটনায়ই যে না আইসা সম্ভব হইতে পারে তাহার পরিচয় অনেকদিন পাইয়াছি, তবুও তাহাকে গৃহদ্বারে না দেখিলে এ সংশয় তেমনি নূতন করিয়া তেমনি সবেগে হইত। এ কথা মনে করিয়া, কতদিন হাসিয়াছি—কিন্তু তাহাকে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে না দেখিলে মন কিছুতেই নিরুদ্বেগ হইত না অজানিত ভয়ে সদাই শঙ্কিত ও বিব্রত হইত।

একদিন যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মুখখানি একেবারে চুণ হইয়া গেল। হৃদপিণ্ডের ক্রীড়া মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে লাগিল, তবুও উহারই শব্দ আজ আমার কাণে বজ্রনিনাদের মত ধ্বনিত হইতেছিল। আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম, কথা কহিবার শক্তি ছিল না। একটি যুবক একখানি ছবির পুস্তক হইতে উহাকে ছবি দেখাইতেছিল—উভয়ে একখানা সোফায় বসিয়াছিল ছবির আলোচনায় উভয়েই হাস্যকৌতুকে রত ছিল। আমাকে ঐভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া উভয়ের উৎসুক দৃষ্টিই আমার উপর পড়িল। একজনের চাহনীতে যেন মনে হইল—"এ আবার কে? একি চায়?" আর অন্যজন যেন আমার দিকে তাকাইয়া নিমেষেই সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল—যুবকের পানে তাকাইয়া বলিল, "দাদা এঁকে বুঝি তুমি জান না ইনি আমাদের প্রতিবেশী ও একান্ত বান্ধব"—আমার দিকে চাহিয়া বলিল "বসুন না, ইনি আমার সুশীল দা ইঁহার কথা আপনার নিকট কতদিন গল্প করিয়াছি,—ইনি আজ ২টার ট্রেণে বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন।" এই সব বলিতেছিল আর আমার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছিল। হায় মুহূর্ত্তে প্রলয়ের মেঘ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—আমি হাসিয়া উঠিলাম ও অচিরে সুশীল বাবুর সহিত ভয়ানক ভাবে গল্প জুড়িয়া দিলাম। কোনদিন যাইয়া হয় ত দেখা হইত না—কোন নিমন্ত্রণে বা অপর কোথাও যাইয়া থাকিবে ইহা যে অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত তাহা বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কিন্তু মন তবুও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, হৃদয় নিরাশায় একান্ত ব্যথিত হইত;—কেবলি মনে হইত—আজিকার দিনটা বৃথায় গেল—তাহাকে একবার চক্ষেও দেখিলাম না—একবার তাহার কথাও শুনিলাম না। হায় সে যে আমার কতখানি তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব, এ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি অণু পরমাণুর সহিত সে যে মিশিয়া আছে—সে আমার রক্তের জ্যোতি হৃদয়ের আলো, মানসের দেবতা—দিবা রাত্রির স্বপ্ন—সত্যেরও অধিক! যদি কোনদিন কোন কারণে না যাইতে পারিতাম তবে যে কি কষ্ট ভোগ করিতাম তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না; সে যে কি অব্যক্ত বেদনা কি অসহ্য পীড়ন তাহা বলিতে পারি না—কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিতাম—হায় তাহার ত আসিবার উপায় ছিল না—সে যদি আসিতে পারিত! কত অসম্ভব কথাই যে ভাবিতাম তাহা বলিতে পারি না—সময় কিছুতেই যাইতে চাহিত না কি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতাম বলিতে পারি না—নরক যন্ত্রণাও বোধ হয় এত কঠোর নহে—মৃত্যু ইহার নিকট আশীর্ব্বাদ তুল্য।

যাহাকে ভালবাসা যায় সে সুন্দর কি কুৎসিৎ সে তর্ক বৃথা। ভালবাসার সামগ্রী চির সুন্দর, তাহাকে দেখিয়া দেখার সাধ মিটে না, তার আঁখি, তার দন্ত, তার ওষ্ঠ, তার ভ্রূ, তার নাসা, তার মুখ, তার হস্তপদ, কেশ, বেশ সকলই সুন্দর। সৌন্দর্য্যের কখনও তুলনা চলিতে পারে না। আমার চোখে যে সুন্দর, সে যদি তোমার চোখে সুন্দর না হয় তাহাতে ক্ষতি কি? আমি ত আর তোমার চক্ষু ধার করিয়া দেখিব না? সকলে বলিত তাহার রূপ ছিল। রূপের সঙ্গে যদি গুণ না থাকে তবে সে রূপের মূল্য কি? দর্পণের কাচের নীচে পারা না থাকিলে কাচের রূপ যেমন বৃথা সেইরূপ যাহার অন্তরে সৌন্দর্য্য নাই তাহার বহিঃসৌন্দর্য্যও বৃথা! আবার কয়লার গর্ব্ভে হীরক যেমন উহাকে আলোকিত করে, অমূল্য করিয়া তোলে, কুরূপার হৃদয়ও যদি সুন্দর হয়, উজ্জ্বল হয়, মধুর হয় তবে তাহার তুলনা নাই। তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দিন যতই যাইতেছিল ততই তাহার গুণের পরিচয় পাইতেছিলাম। তাহার মধ্যে

এমন একটা স্নিগ্ধতা এমন একটা পবিত্রতা, এমন একটা দেবীত্ব ছিল যে আমি মুগ্ধ হইয়া থাকিতাম। শিশুর মত তাহার সরল হাসি ছিল। ফুল বিকশিত হইলে যেমন শোভা বৃদ্ধি পায়, সে হাসিলেও তাহার সৌন্দর্য্য তেমনি শতগুণ বৃদ্ধি পাইত। সে হাসিতে হৃদয়ের ক্ষত জুড়াইত, জ্বালা নিবিয়া যাইত। তাহাকে হাসিতে দেখিলে আমার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম, জগৎ তখন কেবল হাসিময় মধুময়, আনন্দময় চারিদিকে কেবলি অমৃত। সে যে আমার কতখানি ছিল, কি শক্তিতে সে যে আমায় চালিত করিত তাহা বলিতে পারি না। সে আমার নিরাশার আশা, কার্য্যে উৎসাহ, রোগে ঔষধি, বিপদে সম্পদ, সম্পদে সুখ, শোকে শান্তি, আনন্দে তৃপ্তি ছিল। আমার এ জীবনের যত কিছু তাহাকে লইয়াই। সে ভালবাসিবে তাই প্রাণপণে ভাল হইবার চেষ্টা করিতাম। বিদ্বান হইলে সে সুখী হইবে তাই অত মনোযোগ দিয়া লেখা পড়া করিতাম। আমার সুযশ শুনিলে সুখী হইত তাই কার্য্যে আপনাকে একেবারে বিলাইয়া দিতাম। আমাকে সে দিন দিন কেবল উন্নতির দিকে টানিয়া তুলিতেছিল। হায় প্রেম, তুমি মানুষের হৃদয়কে কত উচ্চ করিয়া দাও, তুমি তাহাকে জগতের স্বার্থের, নীচাশয়তার কত উর্দ্ধে উঠাইয়া দাও, যতক্ষণ তুমি থাক ততক্ষণ কোন ভয় নাই তাহাকে উর্দ্ধে রাখিবেই রাখিবে, স্বর্গের সুবাস তাহার চারিদিকে বহাইবেই বহাইবে—হায়, জগতে প্রেম কি মহান্।

সে আমাকে ভালবাসিত কিনা জানিনা, কখনও জিজ্ঞাসা করিবার কৌতূহল হয় নাই। আমি যখন তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম তখন আমার কোনই জ্ঞান থাকিত না—কেবলই চক্ষু ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম কিন্তু সে চাহিলেই চক্ষু নত করিতাম, তাহার চোখে চোখ মিলাইতে সাহস হইত না; ভাবিতাম সে কি মনে করিবে? অমন করিয়া যে কাহারও দিকে চাওয়া উচিত নহে, সে জ্ঞান তখনও লোপ হইয়াছিল না, কিন্তু থাকিতে পারিতাম না,—তার কি যে আকর্ষণ ছিল জানিনা। সুচতুর আরোহী যেমন রশ্মির বল্গা ধরিয়া অশ্বকে ইচ্ছামত যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে ধাবিত করে—সেও আমাকে সেইরূপ ইচ্ছামত আকর্ষণ করিত। কখনও কখনও চোখে চোখে মিলিয়াও যাইত, আমি যে কতদূর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না—আবার চাহিতাম—তাহার চক্ষে একবারও বিরক্তি বা ভ্রুকুটী দেখি নাই, বরং একটা ঔৎসুক্য, একটী উজ্জ্বলতা, একটী আশার বারতা দেখিয়াছি।

তাহাকে মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য উপহার দিতাম, কিছুই মূল্যবান্ নহে, হয় ত কয়েকটী ফুল নয় ত একখানা বই,—এইরূপ। সে কিছুতেই লইতে রাজী হইত না—বলিত 'এ সবের কি প্রয়োজন? আর কখনও কিন্তু আনিও না, পুনরায় আনিলে আমি কখনও লইব না'—ইত্যাদি। আমি কিন্তু আবার লইয়া যাইতাম—আবার ঐ একই কথা। আমি কি তাহাকে জানিতাম না? তাহার কোন কথার কোন অর্থ, তাহা আমার মত কে অনুভব করিতে পারিত? সে কখন যে না বলিয়া হ্যাঁ বুঝাইত, আর হ্যাঁ বলিয়া না বুঝাইত, তাহা আমি অক্লেশে বুঝিতাম। সে বাহিরে যাহাই বলুক না কেন, তার অন্তর যে কি বলিত, আমার অন্তর তাহা নিমেষেই বুঝিয়া ফেলিত। তাহার চক্ষের সামান্য পরিবর্ত্তনে দর্পণের ন্যায় তাহার হৃদয় ধরা দিত। আমার কোন্ জিনিসটি পাইলে সে সন্তুষ্ট হইত, কি পাইলে সে অসন্তুষ্ট হইত, তাহা আমি নিমেষে ধরিয়া ফেলিতাম। তাহার মৌখিক শত নিষেধ সত্বেও যে জিনিসে তার সন্তুষ্টি হইত, তাহাতে তাহার নয়নপ্রান্তে হাসির রেখা দেখিতে পাইতাম, সে যত গম্ভীর হইতে চেষ্টা করুক না কেন, যত রাগের ভাণই করুক না কেন, তাহার অন্তর হইতে যে আনন্দের নির্ম্মল উৎস উঠিত, তাহা তাহার অধর কোণে ধরা দিতই দিত। আমি ধরিতে পারিতাম বলিয়াই যাহাতে সে প্রীত হইত, তাহার সহস্র নিষেধ সত্বেও তাহা লইয়া যাইতে সাহস করিতাম।

রোজ সন্ধ্যায়ই একবার করিয়া সেখানে যাইতাম। কি উৎকণ্ঠার সহিত যে আমার সমস্ত দিন কাটিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—শুনিতাম, প্রার্থিত জিনিসের জন্য ধ্যান করিতে হয়। সমস্ত দিন যেন আমার ধ্যানে যাইত। অনবরত ঘড়ীর কাটার পানে তাকাইতাম, ক্রমে এমন হইয়াছিল যে, ঘড়ি না দেখিয়াও সময় বুঝিতে পারিতাম। কখন ময়লার গাড়ীগুলি ম্যার ম্যার করিয়া রাস্তা দিয়া যাইত,—

কোন ফেরীওয়ালা নয়টার সময় কোন. সুরে হাকিত, মেয়েদের স্কুলের গাড়ীগুলি গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে কখন ফিরিয়া আসিত,—ভিস্তীওয়ালা কখন রৌদ্রতপ্ত পিপাসিত রাস্তা গুলিকে জলদান করিয়া শীতল করিত, আমাদের পাশের বাটীতে একটা পোষা কোকিল ছিল, সে বিকেলে কোন সময়ে ডাকিয়া উঠিত, এইরূপ কোন ঘটনাই আমার চক্ষু কর্ণকে অতিক্রম করিতে পারিত না। বার বার দেখিতে দেখিতে আমাদের গৃহের ছায়া রাস্তার উপর কখন কোন স্থানে পড়িত, তাহা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। হায়, এইরূপে যত ঘটনা, যাহা পূর্ব্বে কখন লক্ষ্যও করিতাম না, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। লোকে বলে প্রেমে মানুষকে সমস্ত ভুলাইয়া দেয়, একেবারে অন্যমনস্ক করিয়া ফেলে। আমি ত দেখিতেছি, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার জন্য কত খুটীনাটিই না লক্ষ্য করিয়াছি। আমি বলি প্রেমে সামান্য জিনিসকেও দেখিয়া লইবার সুযোগ দেয়—হৃদয়কে নিয়তই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করে।

তাহার নিকট যাইতে যে আনন্দ, যে উচ্ছাস হইত, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া অনন্ত সাগরের বিপুল যে উচ্ছ্বাস তাহাও বোধ হয় ইহার সমতুল্য নহে। আনন্দের আতিশয্যে প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত। তাহার দর্শনাশঙ্কায় মাতালের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিতাম, সত্যই আমার পা টলিত, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকিত। বসন্ত সমীরণ সংস্পর্শে ফুলদল যেমন করিয়া নাচিয়া উঠে, তাহাকে দেখার চিন্তাও আমার হৃদয়-শতদলকে তেমনি করিয়া দোলাইয়া দিত। কি অবস্থায় যে সেখানে পৌছিতাম জানি না, কতক জ্ঞানে, কতক মোহে, কতক স্বপ্নে, আবিষ্টের মত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। সে কখনও আমারই মত ব্যাকুল হইত কি না, জানি না। সেও আমার অপেক্ষায় উৎকন্ঠিত হইত কি না, বলিতে পারি না, তবে মাঝে মাঝে তাহাকে গৃহদ্বারে, উৎসুক নয়নে পথের পানে তাকাইয়া থাকিতে দেখিতাম। দূর হইতে তাহাকে ঠিক যেন একখানা ছবির মত দেখাইত। স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপথে সে যেন আশারূপিণী দেবীর মত সর্ব্বমঙ্গলা—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মোহিনীরূপে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমার হৃদয় তখন কোন বাধা, কোন শাসন মানিত না। প্রচণ্ড সে ঝড়ের বেগ আমার সামলান দায় হইত,আমার মন বলিত, "ওরে ছুটিয়া চল্, ছুটিয়া চল্, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তোর সম্মুখে, ঝাপাইয়া পর, গ্রহণ কর, লুট কর, আপনাকে বিলাইয়া দে, সব ভুলিয়া যা"—কিন্তু পা ত চলিত না। পঙ্গুর মত গতি একেবারে মন্থর হইয়া পড়িত। হায়, দেহে ও মনে আজি একি বিষম দায়, চিরকাল জানিতাম, দেহ ও মন উভয়ই আমার—উভয়ই আমার হুকুমে চলে, কিন্তু আজ একি বিদ্রোহ, আজ একি বিপরীত ব্যবহার! অতি ধীর গতিরও অগ্রসরে ক্ষমতা আছে তাই আমিও তাহার নিকটে পৌছিতে পারিতাম। দূর হইতে আমাকে দেখিয়া তাহার চক্ষে ও তাহার ওষ্ঠে যে হাসির বিদ্যুৎ খেলিত, তাহা আমার হৃদয়ের এই ঝটিকার অবস্থায়ও আমার চক্ষুকে এড়াইতে পারিত না। ঐ হাসিও আমাকে নববল প্রদান করিত, কণ্ঠে আশার গান গাহিত, হৃদয়কে বলিত অগ্রসর হও! আর যে দিন তাহাকে ঐ দ্বারপ্রান্তে না দেখিতাম, কি শোচনীয়ই আমার অবস্থা হইত। আজ প্রাণে ঝড় বহিত না সত্য, কিন্তু তবুও ত পা উঠিত না, একি অসারতা, একি জড়তা! এ জড়তা শুধু দেহের নহে, মনকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। আমি একেবারে অন্ধকার দেখিতাম, আমার সকল আলোক নিভিয়া যাইত, আমার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকিত না। হয়ত সে ভাল নাই, হয় ত বা বেশী অসুখ করিয়াছে, যেহেতু অল্প অসুখ করিলে সে কখনই না আসিয়া থাকিত না। আহা,আজ না জানি তাহার মুখখানি কতই মলিন, না জানি কতই দুঃখ কষ্টে সে ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে। এক একদিন মনে হইত,সে যদি আমাকে ভাল নাই বাসে,যদিস্যাৎ অপর কাহাকেও—ওঃ এ যে একেবারে অসহ্য—হে ভগবান, আমাকে বল দাও—আমার আশাটুকু একেবারে কাড়িয়া নিও না। সত্যকে মুক্ত করিয়া দেখাইও না—আমার প্রাণে অশনি নিক্ষেপ করিও না। ওরে কুহকিনী আশা, যখন সব যায়—তখনও মানব তোর আশ্রয়ে বঞ্চিত হয় না, সঞ্জিবনী সুধার মত তুই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিস্,—কারণ তুমি ত্যাগ করিলে ত জীবনে আর প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ তুমি আছই আছ। তবে এস, হে দয়িত, হে বাঞ্ছিত, আমাকে একেবারে ত্যাগ করিও না। আমাকে তোমার অতি ক্ষীণ একগাছি সূত্র দাও দেখি,উহার অবলম্বনে কোথায় যাইতে পারি। এই আশারজ্জুই আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাইত, তখনকার অবস্থা বোধ হয় যূপকাষ্ঠধৃত

ছাগবংসের অপেক্ষাও শোচনীয়। আমি যেন জীবন মরণ লইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইতাম। মানুষের সামান্য একটী চাহনীতে যে জীবন মরণ লাভ হইতে পারে তাহা আজ যেমন করিয়া জানিলাম এরূপ আর পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই।

এ জগতে প্রিয়জনের বিরহ অসহ্য। সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র সন্ধ্যাটিই আমার মিলনের অবসর সময়। অন্য সময় ত যাইবার সুবিধা হইত না সারাদিন স্বপ্নে ও ধ্যানে কাটাইয়া সন্ধ্যায় দেবীদর্শনে যাইতাম। তাহাতে যদি বঞ্চিত হওয়া যায় তবে কি দুঃখ হয় না, বুক ফাটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না? জানি, তাহার উপর কোন দাবী নাই, দাওয়া নাই; আমি ভালবাসি বলিয়াই ত সে অপরাধী নহে; আপনার মন লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার অধিকার তাহার আছে; বুঝি সব, কিন্তু মন ত মানে না; জানি তাহার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তথাপি মনে হয়—কেন গেল? এ কেনর উত্তর নাই। প্রিয়জনের জন্য প্রাণ সদাই শঙ্কিত থাকে, তাহাকে নিমেষের তরেও নয়নের অন্তরাল করিতে ভয় করে। হারাই হারাই শঙ্কা যেন লাগিয়া থাকে। তাহাকে হারাইলে এ জীবনে থাকিবে কি? সব চেয়ে কষ্ট যে তাহাকে কিছুই বলিতে পারি না, সাহসে কুলায় না। কতদিন এই হৃদয় খানি তাহার পদতলে রাখিয়া আসিতে গিয়াছি; কিন্তু পারি নাই। তাহাকে কি আমায় বলিয়া দিতে হইবে যে আমি তাহাকে ভালবাসি? আমার চক্ষু আমার কণ্ঠ আমার ভাষা আমার চিন্তা, আমার যা কিছু সকলই কি এ কথার আভাস দিতেছে না? আমি যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাঁচিয়া আছি; আমার জীবনের ত আর কোন প্রয়োজন নাই! হায়, আমার নীরব হৃদয়ের কি এমন কোন ভাষা নাই, যাহা তাহার হৃদয়কে সচকিত করিতে পারে? আমার প্রাণে কি এমন কোন স্পন্দন নাই, যাহা তাহার প্রাণকে স্পন্দিত করিতে পারে ও নিমিষে প্রাণময় করিয়া দিতে পারে?

তাহাকে দেখিলে কিন্তু এ সব চিন্তার স্থান হইত না; প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইত সে যে কি শান্তি, কি সুখ জগতে যেন আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই। মৃত্যু যদি তখন আসিয়া আমায় দাবী করিত তবে হাসিমুখে তাহার সঙ্গে যাইতে পারিতাম। আকাঙ্ক্ষার কি সত্যই শেষ হইয়াছিল? আর কি কোন আশা, কোন প্রার্থিত বিষয় ছিল না? তাহাকে যে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। চিরদিন মনে করিয়াছি—এ হৃদয়ের গোপন কথা কখনও কহিব না; যতই কেন দুঃখ হউক না, মুখ ফুটিয়া তাহাকে ভালবাসা জানাইব না; কিন্তু আজ দেখিতেছি আমার সকল সংকল্প ভাসিয়া যায়, তাহাকে না বলিলে যেন সবই মিথ্যা, আমার এত যে ভালবাসা, এত যে নীরব রোদন, এত যে হৃদয় পীড়ন, সবই যেন ব্যর্থ।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও ত আজ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই, সংসারে বলা কহা করিতে গেলেই যে শুনিবার পালা আইসে। ওরে দুরাশা, তুই কি সত্যই বিশ্বাস করিস্ সে কখনও তোকে বলিবে—"আমি তোমায় ভালবাসি"—ওই কথা শুনিবার জন্য শ্রবণ তোর চির বুভুক্ষিত, শ্রবণ তোর চির জাগ্রত ও সচকিত রহিয়াছে। ঐ একটী কথায় যে ধরায় নন্দন সৃজন করিতে পারে, মরুভূমিতে ফুল ফুটাইতে পারে। এক একবার মনে হয় যাহা হয় হইবে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখিব—না হয় সব আশা নির্ব্বাণ হইবে, না হয় জীবন মরুভূমি হইবে, তাহাতে কাহার কি? যদি তাহার ভালবাসাই না পাইলাম তবে সে জীবনে প্রয়োজন কি? কিন্তু কখনও কি পাইব না। হায়, জন্ম জন্মান্তর যে আমি তাহারই অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ কি সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিব? আজ কি পীড়িতের ন্যায় বলিয়া উঠিব ওগো আর পারি না! না, তাহা হইবে না, অনন্ত—অনন্ত কাল আমার এই সাধনায় যাইবে, আশা রাখিব—একদিন সে দিন আসিবেই,—একদিন সে ফিরিয়া চাহিবেই,—একদিন সে বলিবেই, "ওগো মৌন, ওগো যুগযুগান্তরের সাথী তোমার মৌন সাধনা সফল হইয়াছে। আমিও যে তোমারি মতন নির্ব্বাক হইয়াছিলাম তোমার চিন্তা যে আমাকেও মূক করিয়া রাখিয়াছিল,—আজি বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে এস, এস হৃদয়ে এস, আজ নূতন করিয়া এস, তুমি ত সব স্থানই জুড়িয়া আছ। দেখ, আজিকার প্রভাত সমীরণ কি মধুর বার্ত্তা আনিয়াছে, প্রভাত কিরণ কি সোণার আলোক ঢালিয়াছে, পৃথিবীতে আজি কি আনন্দ কলরব, আজ কোথাও কোন দুঃখ নাই, কোন দৈন্য নাই, আজ শুধু আনন্দ। দেখ, আনন্দাশ্রু চোখের কোনে কেমন ভাসিতেছে, আনন্দের স্রোতে হৃদয়

কেমন ডুবিতেছে; আজ তুমি ধরিয়া আছ—আজ ত কোনই ভয় নাই কোন দ্বিধা নাই—দুজনে দুজনার আশ্রয়ে আজ আমরা পূর্ণ। আকাশে দুখানা মেঘ দুদিক হইতে আসিয়া যেমন এক হইয়া যায়, আজ আমাদেরও তাই আজি শুধু একটা হৃদয় একটা প্রাণ। এমন না হইলে কি পাওয়া যায়, এমন না হইলে কি আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়? হে ভগবান্ আজি বুঝিলাম লোকে তোমাকে কেন প্রেমময় আনন্দময় বলে, আজি তোমার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি—আজি আনন্দে আত্মহারা আজ তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত।

আমাদের প্রেম তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ করুক আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম তোমার মহান্ প্রেমে মগ্ন হউক। যে প্রেম তোমার দিকে টানিয়া না লয় তোমার প্রেমে বঞ্চিত হয়, তাহা কি প্রেম? আমাদের ভালবাসা যেন নিত্য তোমার দিকেই অগ্রসর হয়, আমাদের প্রেম যেন তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

বন্ধু।

১

সাত বৎসর বয়সে প্রকাশের পিতৃবিয়োগ হয়—সে আজ দশ বৎসরের কথা। প্রকাশের পিতা রামহরি মজুমদার প্রথমাবস্থায় বড়ই গরীব ছিলেন। পরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক পাটব্যবসায়ীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৎসর দশ কার্য্য করিয়া রামহরি যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রকাণ্ড দোতালা ইমারত ফাঁদা দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বিনা পণে বর, সুবিধামত চাকরী ও মনোমত পত্নী লাভ করা শক্ত। হঠাৎ রামহরির এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণটা অনেকেরই অনুসন্ধানের একটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। এ সকল কার্য্যে কখনই লোকের অভাব ঘটে না—হারাধন নাগ সম্প্রতি পুলিশের জমাদারী হইতে বিতাড়িত হইয়া বেকার অবস্থায় গৃহে বসিয়া আছেন, তিনি স্বেচ্ছায় এই তদন্তের ভার লইলেন। যোগ্য ব্যক্তির হাতে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া লোকে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কোন রকমে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে হারাধন স্বাধীন গবেষণার ফল প্রকাশ করিলেন। তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত রামহরি মজুমদার জনৈক পাটব্যবসায়ী বাঙ্গালী ভদ্র-সন্তানকে দুর্দ্দশার গভীর তলে নিমজ্জিত করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি চৌর্য্যযোগে এই বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন। রামহরির বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ বা অলৌকিক রকমের কিছু একটা বলিয়া গ্রামবাসীদের কোন কালেই ধারণা ছিল না। সেই জন্যই হউক, বা হঠাৎ বড় লোক হইবার পক্ষে উক্ত কারণই বিশেষ প্রযুজ্য বলিয়া বিশ্বাস বশতই হউক—কিম্বা নাগ মহাশয়ের গবেষণাটি অত্যন্ত মুখরোচক এবং সহজ বোধগম্য বলিয়াই হউক-লোকে বিনাদ্বিধায় একেবাক্যে নাগ মহাশয়ের কথাই বিশ্বাস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রামহরি গরীব ছিলেন তিনি যে হঠাৎ সবাইকে ডিঙাইয়া এত বড়লোক হইবেন, ইহা সহ্য করা যায় না। এইটিই রাম-হরির ভারি অন্যায়। যেখানে ক্ষত সেইখানেই হাত ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মনের এই ক্ষতটি অতর্কিত হস্তার্পণে পীড়িত হইতে থাকিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল কিসে রামহরিকে ধরাইয়া দেওয়া যায়।

রামহরি কোন কালেই মিশুক ছিলেন না—এখনও নয়ই। ইহাতে লোকে তাঁহার টাকার গরমই দেখিত। কিন্তু রামহরি প্রায় সবই খবর পাইতেন,—লোক অনেক রকমেরই হয় কিনা? অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া রামহরি আপনার নগদ বৃদ্ধিরও যেমন সুবিধা করিলেন—তেমনি দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়েরকেও হাত করিলেন। আশ পাশের ছোট ছোট গ্রাম কয়েকখানি এবং স্বীয় গ্রামেরও খানিকটা রাম হরি যখন নীলামে ডাকিয়া একটি ছোটখাট "জমিদার" পর্য্যন্ত হইয়া পড়িলেন, লোকের জল্পনা কল্পনাও তখন বর্ষা

অস্তে পয়োনালীর জলের মত শুকাইতে লাগিল। তবুও অনেক দিন পর্য্যন্ত কতকগুলি লোক ভাবিয়াছিল; যে এক দিন তাহারা রামহরিকে নবগ্রাম থানার লালপাগড়ী মাথায় খোট্টা কনেষ্টবল কর্তৃক গ্রেপ্তার হইতে কিম্বা জেলা আদালতের চাপরাসীদের আনিয়া বাড়ী ঘর ক্রোক করিতে দেখিবে। সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু কেহই আসিল না! রামহরি মরিয়া গেল, তবুও না।

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, কনেষ্টবল ও পেয়াদার আশা অনেকে ত্যাগ করিয়াছে; যাঁহাদের দূরদর্শিতা ও ঔদার্য্যগুণে ঐ দুরাশা পরিত্যাগের দুর্ভাগ্যটুকু হয় নাই—তাঁহারা অধর্ম্মের ঈদৃশ প্রাদুর্ভাবে কলিযুগের মানবজাতির জন্য নিতান্ত চিন্তিত এবং ম্রিয়মান হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কোনওরূপে বাঁচিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে প্রকাশ যখন পিতৃসঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডারে আগ্রহলোলুপ দৃষ্টিপাত করিল, এবং লোকে যখন বুঝিল যে এ অর্থস্তূপ প্রকাশচন্দ্র কর্তৃকই অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা—তখন সকলেই একটু আশ্বস্ত হইল। গ্রামে অনেক যোগ্য ব্যক্তির অস্তিত্ব সত্ত্বেও রামহরির হঠাৎ অর্থশালী হইবার যে উক্ত সুযোগ ঘটিয়াছে, ইহাতে ভগবানের যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইতেছে—সুতরাং যাহাতে এই অর্থ অচিরে পক্ষ বিস্তার করিয়া ভগবানের মুখে চুণ কালি প্রদান করে—তাহার জন্য লোকে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের গরীব বেহারী চক্রবর্ত্তীর দুইটি পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া পড়ে দেখিয়া প্রকাশের জননী সুখদাসুন্দরীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, তাঁহার পুত্রও কলিকাতায় গিয়া পড়ে, কারণ তাঁহার বিশ্বাস পাড়াগাঁ হইতে সহরে পড়াশুনা অনেক ভাল হয়। সুখদাসুন্দরীর নারীজীবন সার্থক করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে যে বংশের দুলাল তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহার সুশিক্ষা, সদাচার, সুখসমৃদ্ধির যথোচিত বিধান করিবার জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ মনে মনে বিষম বিপদ গণিল। কারণ গ্রামে সে অপ্রতিহত উচ্ছৃঙ্খলতায় যে আনন্দ অর্জ্জন করে, কলিকাতা সহরে অপরিচিতদের মধ্যে সে সুখ ত' পাইবে না। প্রকাশ কলিকাতা যাইতে একবারে বাঁকিয়া বসিল। পরে বেহারী চক্রবর্ত্তীর ছেলেদের মুখে কলিকাতার সাহেব বাড়ী, গড়ের মাঠে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার প্রভৃতির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই কলিকাতায় শুভযাত্রা করিল।

প্রকাশ কলিকাতা আসিয়া গ্রামের পাঁচু ও ভোলার সহিত তাহাদের মেসেই প্রবেশ করিল—এবং এণ্ট্রান্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। এই মেসে তিন বৎসর থাকিতে থাকিতেই প্রকাশচন্দ্র অনেক বাহ্যজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

এবার ছুটিতে বাড়ী হইতে ফিরিয়া মায়ের সম্মতি লইয়া প্রকাশচন্দ্র এক স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিল, কারণ তাহার মত বড়লোকের ছেলের মেসে থাকিয়া পড়া কলিকাতায় অতি নিন্দনীয়। ধনী বলিয়া একটা অহঙ্কার সুখদারও ছিল সুতরাং তিনিও তেমন আপত্তি করিলেন না। প্রকাশের জন্য মাসিক দুই শত টাকা করিয়া খরচ দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন; কেন না প্রকাশ জমিদারের ছেলে, একমাত্র বংশধর,—তাহার বেহারী চক্রবর্ত্তীর ছেলেদের সঙ্গে গরীবানা ভাবে থাকা সাজে না। তাহার অভাব কিসের?

বৎসর খানেকের মধ্যেই প্রকাশের বিস্তর বন্ধু জুটিয়া গেল। এখন সে মত রাত্রি পর্য্যন্ত ইচ্ছা বাহিরে থাকিতে পারে, ইচ্ছামত স্কুলে যায়, সপ্তাহে তিন দিনই থিয়েটারে যায়, যাহা ইচ্ছা অনায়াসে অসংকোচে করিতে পারে—হৃষ্টপুষ্ট পাঁচু ভোলার তোয়াক্কা আর রাখে না। উহাদের অভিভাবকতা ও নির্দ্দেশের গণ্ডী এড়াইয়া প্রকাশ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল।

বিদ্যালয়ে যাওয়া যখন একান্ত ইচ্ছাধীন তখন না গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। কার্য্যতঃ ঘটিলও তাই। স্কুলে না গেলেও প্রকাশের জ্ঞানার্জ্জনে কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কোন্ থিয়েটারে কি কি অভিনয় হইয়াছে—কোন্ ব্যক্তি কিসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, কোন নটী সুকণ্ঠা, কে সুবক্তৃী, কে সুনর্ত্তকী, কে সুরূপা, কোন্ গলি কোন্ ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে, কোন্ রাস্তায় কোন্ কোন্ ধনীর গৃহ, কলিকাতার বিখ্যাত গুণ্ডাদের নাম, পুলিশ আদালতে কয়টা পাঁচ আইনের মোকদ্দমা হইয়াছে, কোন্ হাকিমের কাছে পাচ আইনের বিচার হইলে সুবিধা হয়, কোন্ কোন্ তারিখে কয়টি লোককে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ

অসদাচরণ হেতু রঙ্গালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ শৌণ্ডিকালয়ে রাত্রি নয়টার পরেও গোপনে মদ্য বিক্রয় হয়—প্রভৃতি কলিকাতার অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি প্রকাশচন্দ্রের একবারে কণ্ঠস্থ। কেশ বেশ ভাষা ভঙ্গী যতটা পারিয়াছে—প্রকাশ কলিকাতার ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে।

এবার ছুটিতে প্রকাশ যখন বাড়ি আসিল, তখন করুণাময়ী জননী পুত্রের কথাবার্ত্তায় হাবেভাবে শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অতীব প্রশংসমান কৌতূহলের সহিত সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে গৌরবে আহ্লাদে ও আত্মপ্রসাদে একবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। গ্রামের অন্যান্য বালকগণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন—যে প্রকাশ সেই বর্ব্বরের দল হইতে কত উচ্চে! সুখদা ভাবিলেন—এতদিনে অর্থব্যয় সার্থক হইল। প্রকাশের ব্যয় যতই বাড়ে, অকুণ্ঠিত চিত্তে সুখদা তাহা বহন করেন, আর ভাবেন—কত ভাগ্যে হলো না হলো না করে ত' ঐ এক ছেলে! সবই ত' ওর! পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া মায়ের হৃদয় পুলকে স্নেহে বাৎসল্যে ভাদ্রের গঙ্গার মত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২)

প্রথম প্রথম প্রকাশচন্দ্র পঞ্চাননের ও ভোলানাথের সঙ্গে গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে নিয়মিত বাটি আসিত, আবার তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইত। গত পূর্ব্ব বৎসরও একবার আসিয়াছিল কিন্তু। গত বৎসর হইতে আর একেবারেই আসে নাই। মা খুব পাড়াপাড়ি করিলে, প্রকাশ সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিল যে—পরীক্ষা নিকট, পড়ার বড়ই চাপ, সুতরাং বাড়ী গিয়া সে এখন আর মূল্যবান্ সময়ের অপব্যবহার করিবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হইয়া গেল। যথাসময়ে ফলও বাহির হইল। গ্রামে চৌধুরী মহাশয় হিতবাদী লইতেন—পরীক্ষার ফল তিনি দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুষ্ঠব্যাধির পাঁচন, সিংহবদায়ন সালসা, সাতটাকা বেতনের নায়েবী কর্ম্মখালি প্রভৃতি পড়িয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে বহুকষ্টে প্রকাশচন্দ্র মজুমদার নাম বাহির করিয়া সুখদা দেবীকে খবর পাঠাইয়া দিলেন, যে প্রকাশ দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রামের যে জন ছাত্র যাহারা কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত তাহারা জানিত যে প্রকাশ সম্প্রতি অন্য বিদ্যালয়ে যায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন স্কুল কলেজে তাহার নাম পর্য্যন্ত নাই। এ প্রকাশচন্দ্র রামহরি মজুমদারের একমাত্র বংশধর প্রকাশচন্দ্র যে নহে—এ কথা বালকেরা প্রতিবাদ করিবামাত্রই মুরুব্বীর দল অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তাহারা যতই হোক্, বালক—কে তাহাদের কথা শোনে? গ্রামের বয়স্ক এবং তাহাদের পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ চশমা চোখে দিয়া প্রত্যেক হরফ বানান করিয়া যাহা পড়িয়াছেন—তাহাতে আর ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর কলিকাতায় যে একাধিক প্রকাশচন্দ্র মজুমদারের অস্তিত্ব সম্ভব—একথা সে জ্ঞান-বৃদ্ধদিগকে বুঝানো খুবই শক্ত ব্যাপার; কারণ যুক্তি তর্কে তাহাদিগের মত খণ্ডনের প্রয়াসনা তাঁহাদের মতে কলিকালোচিত বাচালতা, এবং গুরুভক্তির অভাবব্যঞ্জক। সুতরাং কোন সুবোধ বালকই বনিয়াদী সুনাম খোয়াইয়া, কর্ত্তাদের নিন্দার্হ হওয়া উচিত বিবেচনা না করিয়া মজুমদারদের বাড়ীতে হরিলুট কুড়াইতে চলিয়া গেল। মোহন ময়রা তাহার বহুদিনের অবিক্রীত পাঁচসের রসগোল্লা একবারে বিক্রয়ের আনন্দাতিশয্যে হাটে বাজারে তখনই রাষ্ট্র করিয়া দিল যে তাহাদের প্রকাশ বাবু পাশ হয়েছেন।

(৩)

অভাব হইলে আবিষ্ক্রিয়া হয় না। মাসিক দুইশত টাকাতেও প্রকাশের কলিকাতায় পড়ার খরচ যখন কুলাইল না, তখন সে ভাবিতে লাগিল, কি কৌশলে অবলম্বন করিলে জননী তাহাকে বেশী টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। উপায় অনেকগুলি ঠাওরাইল কিন্তু একটিও পছন্দসই বা তর্কসই হইল না বলিয়া সব গুলিকে নামঞ্জুর করিয়া প্রকাশচন্দ্র তাহার অকৃত্রিম সুহৃৎ মাখনলালের পরামর্শ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি প্রকাশের যতগুলি বন্ধুলাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে মাখনকেই প্রকাশ সমধিক স্নেহযত্ন ও সম্মান করিত। মাখনের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইত। সত্যকথা বলিতে কি, একটু ভয়ও তাকে করিত। এ ছাড়া আরও অনেক নিগূঢ় কারণের জন্য প্রকাশ মাখনের নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। তাই মাখনকে সে প্রাণ খুলিয়া

সব কথা বলিত, তার পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজই করিত না।

মাখনের বয়স ২৫।২৬, বেশ দোহারা ফর্সা ছেলেটি। মাখনের একটু গাম্ভীর্য্য ছিল, সে বেশী কথা বলিত না, হাসিত কম। যে কথা বলিত সব ওজন করিয়া, কেবল কাজের কথা ছাড়া বাজে অত্যন্ত কম বকিত। সে প্রকাশের কাছে প্রত্যহই একবার করিয়া আসিত কখনও দুইবারও আসিত, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিত না। তাহার নিত্য আসার এ পর্য্যন্ত কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। মাখনকে দেখিলেই তাহার বন্ধুরা যেন একটু কেমন কেমন হইয়া যাইত, তাহার কারণ তাহার গম্ভীর মুখমণ্ডল এবং প্রশান্ত চিন্তাশীলতার ছায়া—যাহা বন্ধুবর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে মাখনের প্রতি তাহাদের একটা ভীতি কিম্বা একটা অকারণ সম্মানের দাবী করিত। সে দাবী কেহ উপেক্ষাও করিতে পারিত না।

মাখনের বাড়ী বৰ্দ্ধমান্ জেলায়। অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে বলিয়া কলিকাতার এক হৌসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের একটা কর্ম্ম সে করিত। কেরাণীগিরি করিলে কি হয়, প্রকাশ বলে ওরকম চৌকষ ইয়ার ছোক্‌রা মেলা দুষ্কর। তাহার এত সন্ধান, এত খবর, এত মাথা, যে প্রকাশের মত ধনী ব্যক্তিও তাহাকে "গুরু" বলিতে গৌরব বোধ করিত। প্রকাশ বলে "আমার টাকা আর মাখনের বুদ্ধি এ যেন হুইস্কির উপর বর্ম্মা চুরুট।" সুতরাং মায়ের কাছে টাকা আদায় করিবার অকাট্য ফিকির একমাত্র মাখনই বাৎলাইতে সক্ষম। সুতরাং প্রকাশ মাখনকে স্মরণ করিল।

দুপুরের পর মাখন আসিল। প্রকাশ মাখনের মুখে একটা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ বিমর্ষ ভাবে বলিল—"এ দু'শো টাকায় তো আর কুলুচ্ছে না। যাতে টাকাশো পাঁচেক করে মাসে পাই—অথচ মা কোনও সন্দেহ না করে—এর একটা বিহিত তোমায় করে' দিতেই হবে।"

মাখন সহজ স্বরেই বলিল—"একথা তুমি তোমার মাকে লেখ' না কেন? তা'হলেই ত' তিনি দেবেন্।"

প্রকাশ বলিল—"তার একটা কিছু কারণতো দর্শাতে হবে—কি বলে চাই? আর একটা কেমন ভয় হয়, লজ্জাও ঠেকৃছে—অথচ আমার টাকা চাই, তাই ত তোমায় একটা উপায় ঠাওরাতে ডেকেছিলুম।"

মাখন চক্ষু বুজিয়া কিয়ৎকাল ভাবিল। শেষে প্রহাস্য বদনে বলিল—"এর জন্যে আর ভাবনা কি?"

ভাবনার কোনই হেতু নাই শুনিয়াই প্রকাশ একবারে এক লম্ফে উঠিয়া মাখনকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মাখন একে প্রাকৃতিক উষ্ণতাতেই বিলক্ষণ উত্যক্ত, সুতরাং সে সময়ে বন্ধুবরের মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবন্ধন উক্ত মানবেতর জীব বিশেষের মত বাহুবেষ্টন সহ্য করিতে একবারেই প্রস্তুত না হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিল। কারণ বন্ধুর আলিঙ্গন অপেক্ষা পাথার বাতাসে সে বিশেষ আরাম বোধ করিতেছিল। প্রকাশ ছাড়িয়া দিলে মাখন বলিল—"আমাকে একটু ভালকরে' গুছিয়ে ভাবতে দাও।"

প্রকাশ অদূরে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—"ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। তুমি যে করে' আমার মুখ রক্ষা করেচ'! তুমি যদি না বল্‌তে তবে আমি মা'কে নিশ্চয় লিখতুম 'পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি' কিন্তু আবার কেমন মজা! আমার লিখবার আগেই দেখি—গাঁয়ের সবাই ওটা পড়ে আমাকেই ঠিক করেচে! একেই বলে ভগবানের দয়া! কিন্তু সব ফস্‌কে যেত যদি তুমি অই পরামর্শটা না দিতে! অই মাথার জোরেই যখন এন্ট্রান্স পাশ হয়েচি—তখন অই মাথার জোরেই আবার এফ, এ, পড়্‌ব।"

মাখন একটু হাসিল। বলিল—"শোন', কি বলে তোমার মাকে টাকা চাইবে! বল্‌বে যে—আমি যে পাশ করেছি, সে জন্য আমার এখানকার বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমোদ করে খেতে চাচ্ছেন। তাঁরা সবাই কোলকাতা সহরের বড় বড় লোকের ছেলে, রাজা মহারাজার বংশ—তাঁদের বাড়ী আমি অনেকদিন খেয়েছি, কিন্তু কখনও খাওয়াতে পারি নি। কখনও খেতে চাইলেই যা' তা' একটা ওজর করে সেরে দিয়েছি—কিন্তু এখন ও' আর ওজর করা চলে না, খাওয়াতেই হবে; নইলে আমাদের আর মুখ রক্ষা হয় না! তারপর, আপনি গাঁয়ে জোড়া পাঁটা দিয়ে সর্ব্বমঙ্গলার পূজো দিয়েছেন—কিন্তু এখানে একটা মস্ত পীঠ কালীঘাটের কালী—সেখানেও একটা পূজো দেওয়া উচিত। আর

স্কুলে পড়া নয়, এখন হ'তে কলেজে পড়া। বই-ই তো প্রায় হাজার টাকার লাগ্‌বে। তা ছাড়া কলেজের মাহিনেও মাসিক ২৫ টাকা। সুতরাং এ অবস্থায় এখন হ'তে বুঝ্‌তেই পারচেন খরচ অনেক বেশী পড়্‌বে। অন্ততঃ প্রথমকার এ ধাক্কাটাতেই প্রায় দুই হাজার। কারণ বন্ধু-বান্ধবদিগকে খাওয়ান আর কালীঘাটে পূজো দেওয়াতে প্রায় সাত আটশো টাকা। আর সব বই এখন কিন্‌বো না মনে করেছি, যে ক'খানা খুব দরকারী সেই ক'খানাই নেব', তাতেও ৭০০ টাকা; বাকী বই যেমন যেমন দরকার পড়বে—তেমনি তেমনি এক আধখানা করে কিনে নিলেও চল্‌বে। অতএব আপাততঃ দেড় হাজার টাকা আমার চাই-ই। আর মাসিক ২০০তে কুলাবে না, ৩০০ করে লাগ্‌বে। এই বলে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

প্রকাশ "ব্রেভো, ব্রেভো" বলিয়া মাখনের পিট চাপড়াইয়া দিল।

"হাঁ,—এও লিখে দাও যে ঐ টাকার অভাবে এখনও ভর্ত্তি হতে পারি নাই—পড়া শুনা কামাই হচ্ছে।" বলিয়াই মাখন গাত্রোত্থান করিল; প্রকাশ হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল "যাও কোথা? আমায় গুছিয়ে বলে যাও, আমি লিখে ফেলি।"

মাখন বসিল। প্রকাশ ভৃত্যকে দুই বোতল 'পিল্‌-সেনিয়ার বিয়ার' হুকুম করিয়া জননীকে পত্র লিখিতে বসিল। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই মাখন গুছাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

মানুষের যখন শক্তি থাকে, তখন সে কি বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কিছুই ভাবে না। বর্ত্তমানের উত্তেজনা ও মোহ এত প্রবল যে সে শুধু বাহিরের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—ভিতরকার চক্ষুটিকেও সজোরে টিপিয়া একবারে অন্ধ করিয়া তবে ছাড়ে। ক্রমশঃ শক্তি যেমন ক্ষীণ হয়, তার কঠিন মুষ্টিটিও তেমনি শিথিল হইতে থাকে। তখন সেই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া জগতের আলো-ছায়ার কম্পলীলা গোচর হয়। সুতরাং সুখদাদেবীর যতদিন পর্য্যন্ত টাকার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, ততদিন নিজে বুঝেন নাই, কেহ বুঝাইলেও বুঝেন নাই—দেখিয়া বুঝা তো দূরের কথা। রামহরি যে উপায়েই হউক ধন সঞ্চয় করিয়া জমিদারী পর্য্যন্ত কিনিয়া দিয়া গিয়াছেন, তেজা-রতীতেও কিছু বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিত্ত এত বেশী নয় যে প্রকাশচন্দ্রের কলিকাতার এই অপরিমিত ব্যয়-বাহুল্য এতদিন ধরিয়া বহন করে। মাসিক দুই শত টাকা তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কাপড় চোপড় পুস্তকাদিও বাৎসরিক গড়ে হাজার টাকা করিয়া যোগাইয়াই ভাণ্ডারের নগদ টাকায় পূর্ণ বাক্স গুলি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুবৎসরে যে অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড একদিন দৈবের অকস্মাৎ জলধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া তাহার সকল ফসলকে সার্থক, সকল দৈন্যকে বিলোপ এবং সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল—সে যে চিরদিনই তেমনি প্রচুর শস্য উৎপাদন করিবে, তাহার শক্তি অক্ষয় থাকিবে, তাহার ভাণ্ডার অনন্ত রহিবে—এ আশা করা অন্যায়। কিন্তু এ অন্যায্য দুর্ব্বলতা সুখদার ছিল, তিনি এটাকে গৌরবই ভাবিতেন। তাই এখন প্রকাশ যখন মাসিক তিন শো টাকা করিয়া চাহিয়া বসিল এবং সেই সঙ্গে একবারে দেড়হাজার টাকার এক ফর্দ্দ পেশ করিল, তখন সুখদাদেবী খুবই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। ঘরে যে এত টাকা নাই, এটা বড়ই অসঙ্গত ঠেকিল। অথচ পিতৃহীন পুত্রের কলেজে পড়ার ব্যয় বহন করিতেই হইবে। এখনও সমস্ত জমিদারি মজুত। প্রবুদ্ধ মাতৃশক্তির এ প্রেরণা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন গ্রামে, আশ-পাশ গ্রামে জমিদার বলিয়া একটা খ্যাতি আছে, সেটা তাঁহার স্বামীর—তাহাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ছেলে মনে দুঃখ করিবে যে পিতা নাই বলিয়া তাহার পড়া হইল না। গ্রামের হিংসুক লোকেরা টিট্‌কারি দিবে যে এত টাকার জমিদারি থাকিতেও ছেলেকে পড়াইতে পারিল না। কিন্তু এত সব সমস্যার সমাধান করিবে যে অর্থ, তাহার রাশিতেই রিক্তা দোষ ঘটিয়াছে। একথা কিছু লোককে বলিবার নয়। সুতরাং লোকেও জানে না। আর প্রকাশ তো কাল্‌কের ছেলে—শিশু—সে কি খোঁজ রাখে? এ ছাড়া কর্ত্তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলেকে ভাল করে পড়িয়ে জেলায় উকিল করিয়া বসাইবেন। স্বামীর এই আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবেন, পতিপ্রাণা পুত্র-স্নেহময়ী সরলা সুখদাদেবীর ইহাই এক গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইঞ্জিনে যতক্ষণ ষ্টিম থাকে ততক্ষণ না থামাইলে থামে না, আবার ষ্টীম নিঃশেষ হইলে চালাইলেও চলে না। সুখদাদেবীর এতদিন ষ্টীম ছিল, ঘাটে পথে ষষ্ঠীতলায় ঠাকুর বাড়ীতে যাইতেন, পরিচিতদের মধ্যেই ঘুরিতেন, কিন্তু কোথাও দাঁড়াইতেন না। মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কথা, কোন আলাপই হইত না। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার পতিপুত্রের নিন্দাবাদ, সুখদার চতুর্দ্দিকে একটা দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা করিয়াছিল; সেটিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য লোকেও যেমন সুখদার নিকটে আসিতে পারিত না, সুখদাও তেমনি কাহারও নিকটে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। যাইতে গেলেই এই বেষ্টনীর লৌহ গরাদে মাথা ঠুকিয়া যাইত।

এখন টাকাও যত ফাঁক হইয়াছে, সে গরাদেও তত ফাক হইয়া গিয়াছে। এখন আর সুখদার নিজেকে তেমন স্বতন্ত্র এবং ধনী বলিয়া সম্মানের দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইতেছে না। সেই গরীব উপেক্ষিত নিন্দুকের দলকে তাঁহার ব্যাকুলচিত্ত দু'খানি সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া একটু সমবেদনা একটা সদয় পরামর্শের জন্য অতি কুণ্ঠিত সঙ্কোচে আজ আহ্বান করিতেছে।

কিন্তু চিন্তা গৈরিক স্রাবের মত ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। সে পথ খুঁজে। সুখদার আকস্মিক এই মুস্কিল পাঁচটি সহৃদয় হৃদয় খুঁজিতেছে। ঘাটে পথে যখন সকলে পরস্পর নিঃশঙ্ক সরলতায় নিজের নিজের দুঃখ সুখের গল্প করে, অথচ কেহই তাঁহার যে কি দুঃখ শোনে না—বা তাহাদের কথা শুনিতেও তাঁহাকে ডাকে না, তখন সুখদা আপনার একক দৈন্যে আপনি পীড়িত হইয়া স্বকৃত ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের কাছে কাছে পাশে পাশে অনাবশ্যক বিলম্বে একাজ সেকাজে ব্যস্ত থাকেন—যদি কেউ একবার ডাকে!

কিন্তু তাঁহার সহিত মর্ম্মকথার বিনিময় করিতে কেহই যখন অগ্রসর হইল না, তখন তিনি নিজেই একটা বৈচিত্র্যের মত তাহাদের প্রসঙ্গে অল্পঅল্প করিয়া যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও আছে—পাছে কেউ বিদ্রূপ করে। দুঃখ নিরাশায় ঔদাসীন্য বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু পরিহাস বড়ই মর্ম্মান্তিক ঠেকে।

তৃষিতই জলের ধারে যায়—জলকে নড়িতে বড় একটা দেখা যায় না। কাযেই সুখদা একথা সেকথা করিয়া নানা অবান্তর প্রসঙ্গে প্রতিবেশিনীদিগের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। এরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার আরও একটা গোপন কারণ ছিল। কিছুদিন হইতেই সুখদা পুত্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ কানাঘুষা কথা শুনিতেছিলেন। তার পর বেহারী চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয় পাঁচু ও ভোলা যখন কেহ তিনটি কেহ তিনটির পর ওকালতীও পাশ করিয়া ফেলিল, তখন সন্দেহটা কিছু বদ্ধমূল হইল।

লোকের কথায় প্রথম প্রথম সুখদা কর্ণপাত করেন নাই, কারণ তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যে গ্রামের কর্ম্মহীন ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ প্রকাশের পাঠোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উক্তরূপ উপন্যাস রচনা করিয়াছে; কিন্তু এখন আর তাঁহার সে বিশ্বাস রাখিবার শক্তি নাই। বিশেষ বেহারী চক্রবর্ত্তীর মত আজ খাইয়া কাল কি খাইবে তাহার ঠিক নাই এমন গরীব যখন দুই দুইটি ছেলেকে কলিকাতায় রাখিয়া, পড়াইয়া পাশ করাইয়া উকীল করাইয়া ছাড়িল। তবে প্রকাশ একটা পাশ করিতেই এত টাকা ব্যয় করিল, দ্বিতীয় পাশের ব্যয়েরও আভাস পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে খরচ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উকিল হওয়া পর্য্যন্ত তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। কিন্তু অই যে পাঁচু উকীল হইল—ভোলা তিনটি পাশ করিল, কয় কোটি টাকা খরচ হইয়াছে? তবেই প্রকাশ যে অতিমাত্রায় অপব্যয় করিতেছে—সে তথ্য বুঝিতে আর সুখদার বাকী থাকিল না। তেমন বিশ্বাস যোগ্য কোনও প্রমাণ না পাইলেও সুখদার বিশ্বাস যে প্রকাশের চরিত্রেও কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমাইবার সুখদার প্রবল ইচ্ছা। সে ইচ্ছা ফলবতীও হইল। সুখদা চক্রবর্ত্তী গৃহিণীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহাদিকে পাঁচু ও ভোলার কলিকাতায় কত টাকা করিয়া খরচ দিতে হইত।

পাঁচুর মা যথাযথ উত্তর দিলেন। সুখদা শুনিয়াই গালে হাত দিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর তেমন বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও বিস্মিত হইয়া সুখদা প্রশ্ন করিলেন, "মাসিক চল্লিশ টাকাতে পাঁচু ভোলার দুই ভা'য়েরই খরচ কুলাতো?" পাঁচুর মা বিনীতভাবেই উত্তর দিলেন—"তা ভাই, আমরা গরীব মানুষ—এই চল্লিশ টাকা ক'রে দিতেই জিব বেরিয়ে গেছে। যে কষ্টে ছেলে দু'টিকে

মানুষ করলাম—তা এক ভগবানই জানেন। এরই মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার উপর দেনা হয়ে গেছে। এ ধার শোধ দেওয়া তো আমাদের সাধ্যি নেই—বুঝ্‌তেই পারচো ত' দিদি, ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে যাদের জন্যে ধার, তারাই শোধ করবে। আশীর্ব্বাদ কর বোন্,·ওরা বেঁচে থাকুক্।" বলিয়াই স্নেহে ও পুত্রগৌরবে চক্রবর্ত্তিগৃহিণীর দরদরধারায় আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িল।

অনেক একথা-সেকথার পর পাঁচুর মা পুত্রদের নিকট প্রকাশের বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহাও শুনাইয়া দিয়া সুখদার কৌতূহল নিবারণ করিলেন। সুখদা শুনিলেন, প্রকাশ পাশ হয় নাই; প্রকাশ অন্য ব্যক্তির নাম নিজের বলিয়া জানাইয়া তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। প্রকাশের কলিকাতার বাসা একটা মদের মস্ত আড্ডা—সেথায় প্রকাশের অনেক নূতন নূতন বন্ধু জুটিয়াছে এবং মৃত রামহরির অর্জ্জিত ও যত্নসঞ্চিত অর্থ মদের একটি সদাব্রত স্থাপনে এবং জনৈকা অসহায়া পতিতা রমণীর ভোগ-বিলাসে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে! সুখদা একটা বর্ণও অবিশ্বাস করিলেন না, একটি কথারও প্রতিবাদ করিলেন না।

দুঃখে অপমানে রাগে ঘৃণায় তাঁহার প্রবঞ্চিত মাতৃস্নেহ আহত উরগের মত সেই দণ্ডেই দংশন করিতে উদ্যত হইল। পুত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র·মাতৃহৃদয় আজ প্রবল বিদ্রোহে গর্জ্জিয়া উঠিল।

দুই তিনখানি চিঠি লিখিয়া প্রকাশ যখন উত্তরও পাইল না, টাকাও পাইল না, তখন দিল্‌জানের নিকট হইতে মাত্র তিন দিনের ও দুই রাত্রের ছুটি লইয়া স্বয়ং একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৫)

প্রকাশকে নিকটে পাইয়া সুখদার একরকম ভালই হইল,—বোঝাপড়ার একটা কিনারা হইল। প্রকাশ যেন খুব দুঃখিত হইয়া বাড়ী আসিয়াছে, এবং সেই দরুণ পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে. তজ্জন্য বিশেষ কুপিত—এইরূপ ভাণ করিবে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সুখদার মুখভাব দেখিয়া খুব শঙ্কিত হইয়া পড়িল। কাযেই গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াই জননীকে একচোট কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার যে সংকল্প ছিল—সেগুলি তাহার মনের কোটরেই আবার ফিরিয়া গেল, বাহিরে আসিতে সাহসী হইল না। অথচ ব্যাপারটা কি—তাহা জানিবার জন্যও প্রকাশের মন অধীর হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে কি জানি কি কথা বাহির হইয়া পড়ে! অতএব যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভাল। এক একবার প্রকাশের মনে হইল যে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শান্তিলাভ করে—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। এই অসহ প্রতীক্ষার ভিতর একটা শঙ্কা—একটা লজ্জা ও একটা সঙ্কোচ আসিয়া—এই উন্মুখ অধৈর্য্যকে প্রতি পদে আঘাতপীড়িত করিতে লাগিল।

আজ দুই বৎসর পরে তাঁর আদরের প্রকাশ বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে তিনি প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছেন না, সেজন্য সুখদা যেন উত্তরোত্তর বিমর্ষতর হইয়া পড়িতে ছিলেন। মাতৃহৃদয়ে স্নেহের উৎসমুখে যে একখানা পাথর আসিয়া পড়িয়াছে, সেটিকে ঠেলিয়া সরাইয়া সে বিশ্বপ্লাবী স্রোত উৎসারিত হইতে পারিতেছে না। স্তন্যাধিক্য হেতু স্তনপীড়ার ন্যায় বেদনায় তাঁর হৃদয়খানি টন্‌টন্ করিতে লাগিল। ·পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দুই মাস ছয় মাস অন্তর প্রকাশ যখন বাড়ী আসিয়াছে, তখন যে জননী আনন্দের অশ্রুতে স্নেহের চুম্বনে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবার কেন পারিতেছেন না,—এ কথা ভাবিয়া তিনিও যেমন লজ্জিত, পুত্রও তাই ভাবিয়া একটা দুরন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কায় জর্জ্জরিত। দুইজনের হৃদয়ই অভিমানে ক্ষোভে শঙ্কায় লজ্জায় বাক্যে পরিপূর্ণ।

মাতা ও পুত্রে দুইজনে নিজ নিজ মনের মত নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া শ্রাবণের মেঘমন্দ্রিত জলসিক্ত আঁধার আকাশকে নিবিড়তর করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। প্রভাতেও বর্ষণ থামিল না। পল্লীপথের ধূলিবহুল পথখানি, ঘন সন্নিবিষ্ট আম্র পনসাদির বাগান, সমতল পতিত ভূখণ্ড, খাল খাত প্রভৃতি সব ধূসর জলে ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে। প্রকাশ আপনার কক্ষে সম্মুখে কয়েকখানি মোটা মোটা বই খুলিয়া রাখিয়া দিয়া বাতায়ন পথে বর্ষা দেখিতেছিল, সুখদা প্রকাশের প্রাতরাশের থালা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রকাশ প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া মার হাত হইতে

খাবারের থালাটি লইয়া নিঃশব্দেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু তাহার মন অন্যত্র। যা' হয় একটা কথা, যে বিষয়েরই হউক না কেন, একটা কথা সে খুজিতে লাগিল, যাহা বলিয়া মাকে অভিনন্দিত করে; কিন্তু একটি কথাও তাহার যোগাইল না। মাথার ভিতরে কথাগুলা সব বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা মস্ত তাল পাকাইতে লাগিল; বলিবার কথা অনেকই আছে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। যখন অখণ্ড অবসর, অনেক বক্তব্য থাকে, তখন লোকে কিছুই বলিতে পারে না। সুযোগকে সারা সংসারটি ঘুরিতে ফিরিতে হয়, সুতরাং বেশীক্ষণ এক জায়গায় সে থাকিতে পারে না, চলিয়া যায়। সবাই যদি ঠিক সময়েই গান ধরিতে পারিত, তাহা হইলে কি আনাড়ীর সঙ্গীত বেতালা হইত?

ছেলে ভয়ে ও সঙ্কোচে নির্ব্বাক্! কিন্তু সুখদা গত রাত্রে আবার একটা মহা সমস্যা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ভাবনা—ছেলেত' আর কচি দুগ্ধপোষ্য বালকটি নয়, সে এখন বড় হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, বিশেষরূপে জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে, এখন যদি বলার মত বলা না হয়—তাহা হইলে হয়ত হিতে বিপরীত ঘটিয়া পুত্রটি পর্য্যন্ত হাতছাড়া হইয়া যাইবে। হয়, সন্ন্যাসী হইবে, নয় খ্রীষ্টান হইবে। কাযেই তাঁহার মুখভাব কাল সন্ধ্যা অপেক্ষা আজ প্রাতে অনেক ভাল। ঠিক করিয়াছেন, যাহা বক্তব্য তাহা খুব সংযম এবং সতর্কতার সহিত বলিতে হইবে। আঘাত করিবার সে প্রলোভন সংবৃত হইয়া মাতৃ হৃদয় আবার সেবায় মন দিল। স্নেহ কি কখন ব্যথা দিতে পারে?

মা দেখিলেন, ছেলের মন খারাপ—তাই কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। ছেলে ভাবিল অন্যরূপ, কিন্তু সুযোগ হারাইয়াছে ভাবিয়া সে বেশী পস্তাইতে লাগিল। যৌবনের মত যুবা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মোহান্ধ যুবক আর এ আশঙ্কা ও সঙ্কোচ বহন করিতে পারিল না। শিরায় শিরায় নূতন তেজে তাহার মত্ততার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। পানোন্মত্ত ব্যক্তি অবস্থা বিশেষে যেমন তাহার গৃহের সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে—প্রকাশও তেমনি তাহার মাতৃহৃদয়ের সৌধ সজ্জা গুলি আজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রকাশ জননীর নিকট যাইবার জন্য জুতা পরিতেছে—ফিরিয়া দেখে যে, তাহারই দুয়ারে মা স্বয়ং আসিয়া হাজির। প্রকাশ জুতা পরিতেছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও বেরুচ্ছ পেকাশ?" প্রকাশ উগ্রভাবে উত্তর দিল—"অন্য কোথাও নয়, তোমারি কাছে যাচ্ছিলুম।" মা শান্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বলিলেন—"কেন? এই যে আমি এসেছি, বল?"

প্রকাশ জুতা খুলিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মা নীচে মেজেতেই বসিলেন। মিনিট দুই উভয়েই নীরব। কিন্তু প্রকাশ এবার আর সুযোগ হারাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—তাই নিজেই সুরু করিল—"এবার তোমায় এত অন্যমনস্ক কেন দেখ্‌চি, মা? আমিও কি শেষে তোমার চক্ষুশূল হলুম?" পাথর নড়িল। সুখদার দু'টি চক্ষু ভাসাইয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মাকে বিগলিত এবং নীরব দেখিয়া প্রকাশের একটু ভরসা হইল, অন্তরে একটা আনন্দ শিহরিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—"টাকার জন্যে চার পাঁচখানা পত্র দিলুম, টাকা তো দূরের কথা, একটা উত্তরও কি দিতে নাই? একে তোমার এই শরীর—ভাবনা হয় না? আচ্ছা, কলকাতায় যে আমায় পড়্‌তে পাঠিয়েছ, সেখানে কি আমার জমিদারী আছে যে মাসে মাসে টাকা আস্‌বে—তাই খরচ ক'রে থাক্‌বো? যদি টাকা খরচ কর্‌তে মায়া হয়, বল আমি ফিরে আস্‌চি! সারা জীবনটা তার পরে অই তোমার কেলো বাগ্‌দী, শ্যামা ডোম, হরিশ মোড়ল, ভুষণ দৈবক'দের সঙ্গে মিশি আর পরনিন্দা পরকুৎসা ক'রে কাল কাটাই?"

প্রকাশের মুখ খুলিয়া গিয়াছে বিশেষ সুখদা যখন এখনও নীরব, প্রকাশ ভাবিল তবে সে যে সব সন্দেহ করিয়াছিল, সে সমস্ত অমূলক, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে লাগিল—"তিন চার মাস সময় বাজে কেটে গেল, কিছু পড়া শুনো হ'ল না, কেবল টাকার অভাবে। এবার কলেজের পড়া—সাহেব সুবোদের কাছে পড়্‌তে হবে—"

"বাবা, আমি কি তোমায় টাকা দিতে, পড়াতে, চেষ্টার কোন কসুর করেচি? তুমি যে না পড়ে' না শুনে' কেবল টাকা ওড়াবে, তা' কি আমি জানি, না জান্‌তাম? আমি মেয়ে মানুষ হয়ে যা করেছি ক'টা পুরুষে তেমন পারে?" সুখদা আর থাকিতে পারিলেন না তাই উত্তেজিত

হইয়া কথা কয়টি প্রকাশের কথায় বাধা দিয়াই বলিয়া ফেলিলেন।

প্রকাশের মুখমণ্ডল অপরাধীর লজ্জারাগে আরক্তিম হইয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। হঠাৎ উন্নত মস্তক অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। সুখদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"কর্ত্তা তো কুবেরের ভাণ্ডার রেখে যান নাই। এই ছয় বছরে তুমি প্রায় পনের' হাজার উড়িয়েছ, অথচ ইস্কুলেই যাও নাই! আমি বোকা, তাই আমায় অন্য একজনের নাম নিজের নাম বলে', বোঝালে—আমিও তাই বুঝলাম্। ওমা! কেবল তুমি আমায় ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছ, আর উড়িয়েছ। প্রথমটা আমি লোকের কথা বিশ্বাসই কর্তাম্ না। বরং যারা বল্তো তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম! হাঁ, বাবা, তোমার পেটে এত গুণ? এই যে বেহারী চক্রবর্ত্তীর সোণার চাঁদ দুই ছেলে চার্‌টে পাঁচটা করে' পাশ কর্‌লো—ক' লাখ টাকা তাদের বাপ খরচ করেছে? আমার ত' আর শুন্‌তে কিছু বাকী নেই, বাবা—আর মিছে কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করোনা, সে চালাকী সব আর খাটবে না। তোমাকে আর পড়্‌তে হবে না, তুমি ফিরে এসো, বিয়ে থা' কর'। গয়না গাটি সোনারূপো জিনিষ পত্তর সব মিলিয়ে আর হাজার দুই টাকা হবে কিনা সন্দ। কেবল ঐ চার খানা গ্রাম বাকী, এখনো বাড়ী এসো ভাল করে এই গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে খাটিয়ে খুটিয়ে খাও। আমার কি? ষাঠ বছর তো হ'লো—আর ক'দিন? কিছু রাখ্‌তে পারো—তোমারি থাক্‌বে, না থাকে পথে পথে 'হাভাত হাভাত' করে বেড়াতে হবে।"

প্রকাশ দেখিল আর তর্ক বৃথা। সুতরাং কাজ হাসিল করিবার মত দৃঢ় স্বরে বলিল—"তুমি টাকা দেবে কিনা?"

"একটি পয়সাও না।" বলিয়া সুখদা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

(৬)

জলস্রোত বাধা পায়—আবার দ্বিগুণ বেগে ছুটে। জননী ভাবিয়াছিলেন অর্থ সাহায্য না করিলেই অর্থ সাপেক্ষ কুকর্ম্ম হইতে সন্তান তাঁহার অনুতপ্ত অভিভূত জননীর অঞ্চল তলে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সুখদা যখন শুনিলেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া এই দারুণ বর্ষা মাথায় পদব্রজে হতাশে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আর তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

যে উন্মুখ স্নেহের বেগবাহুল্য সুখদা অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন এই অবসরে তাহা শত শত গোমুখী পথে আত্মপ্রকাশ করিল। দুই বৎসর পরে ছেলে বাটী আসিল তাহাকে যে অনাদৃত অচুম্বিত অনভিনন্দিত ফিরাইয়া দেওয়া—ঐ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। প্রকাশের শত দোষ, সহস্র অপরাধ, সব মার্জ্জনীয় কারণ সে ছেলে, একমাত্র পুত্র। লোকে মকদ্দমায় ও কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়, চোরে ডাকাতে লুটে নিয়েও কত লোককে নিঃসম্বল করে—এতো যার টাকা সেই খরচ করিবে! এমনি করিয়া সুখদার সমস্ত প্রাণ প্রকাশের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল—কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না।

গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাজনগর ষ্টেশন। তৎক্ষণাৎ নোটে গিনিতে টাকায় নগদ একহাজার টাকা দিয়া বাড়ীর গোমস্তা বটুক চট্টোপাধ্যায়কে সুখদা কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন প্রকাশ হঠাৎ রাগের মাথায় বিবাগী হইয়া না চলিয়া যায়, সেটা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে ফিরিয়া আসেন।

প্রকাশ আহত ভুজঙ্গের মত একবার প্রাণপণ শক্তিতে তাহার সমস্ত বিষ নিঃশেষে ঢালিয়া জননীকে দংশন করিতে কৃত সংকল্প হইল। তাহার বিশ্বাস—তাহার পিতা কেবল নগদ টাকায় অগাধ অফুরন্ত ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন ভূসম্পত্তির তো কথাই নাই। সে যে পনের হাজার মাত্র খরচ করিয়াছে তাহা সে লক্ষ লক্ষ সঞ্চিত সম্পত্তির একটা অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বৈ ত নয়। ব্যয়কাতরা মাই কেবল যক্ষের মত সেই ভাণ্ডার আগুলিয়া বসিয়া আছে। অতএব এ প্রতিবন্ধক অপসৃত করিতেই হইবে। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার, কার্য্যেও তাহা পূর্ণ হউক। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশের মস্তিষ্ক উষ্ণতর হইতে লাগিল। তপ্ত বালির খোলায় খৈ ভাজার মত কত লক্ষ লক্ষ কল্পনা ফুটিয়া ফুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ ভাবনার কূল নাই, সীমা নাই লক্ষ্য নাই—কেবল আবর্ত্ত। এই আবর্ত্তিত চিন্তা প্রবাহ একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ একটা কঠোর প্রতি হিংসার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া কেবল ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অবিরাম

ঘূর্ণনে ও অভিঘাতে চিন্তা-তরঙ্গ উল্কাপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু দগ্ধ করিবার অথবা নিঃশেষ হইবার কোনও উপায় নাই।

স্থূলবুদ্ধি মর্য্যাদা-জ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তি তোষামোদকে সম্মান এবং স্নেহকে অপমান ভাবে। প্রকাশ তাই জননী কৃত এই অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ লজ্জিত এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাখন সমস্ত শুনিল; শুনিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রকাশ বলিল—"ভাই এখন তোমাকে আমার একটা কায কর্‌তে হবে। অবিশ্যি আপাততঃ দু'এক মাসের খরচ এই হাজার টাকাতেই চল্‌বে, কিন্তু তার পর?"

মাখন একটু উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি? কি কায কর্‌তে হবে?"

প্রকাশ একটু নরম হইয়া বলিল—"উকীল যখন বল্‌ছে যে ও বিষয় আমার, মায়ের নয়,—তখন আর ভাবনা কি? আমি এখানে ধার করে চালাবো, তারপর তাকে দিয়ে মকদ্দমা করিয়ে, তার খরচা শুদ্ধ আদায় করিয়ে দেব।"

মাখন—"তা'ত' হলো, এখন তোমায় শুধু হাতে তো আর কেউ টাকা দেবে না? কিছু মর্টগেজ চাইবে।"

প্রকাশ একমুখ হাসিয়া বলিল—"সে চা'লও আমি চেলে রেখেচি। বটুক চাটুয্যে যখন ঐ হাজার টাকা নিয়ে আমায় বোঝাতে আসে, তখনি আমাদের জমিদারী সংক্রান্ত সব দলিল ফলিল কাগজ টাগজ গুলো হস্তগত করে' ফেলেচি।"

মাখন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম, কি রকম?"

প্রকাশ প্রসন্ন গম্ভীর মুখে উত্তর দিল—"প্রথমতঃ গোমস্তাকে নানান্ রকম চাল দিলাম—তাতে সে ভিড়্‌লোনা। বল্লে কাগজ পত্র সিন্দুকে বন্ধ—তার চাবীও মার কাছে। তার পরে তাকে ভয় দেখালাম ভরসাও দিলাম—যে আমি শীঘ্র বাড়ী গিয়ে নিজেই বিষয় দেখ্‌বো অতএব কাগজ পত্র গুলো একবার দেখার দরকার। দ্বিতীয়তঃ তাকে এক হাজার টাকা বকশিসের আশাও দিয়েছি। মা জানেনা—সে কাল আমায় কাগজ পত্র দিয়ে গেছে।"

মাখন আশ্বাসের স্বরে বলিল "তবে আর ভাবনা কি?"

কলিকাতা মহানগরী যেখানে মূল্যদিলে ব্যাঘ্রীর দুগ্ধ পাওয়া যায়, মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া যায়, সেখানে সুদদিলে আর টাকা মিলিবে না? রাজেন্দ্র বাগ্‌চী প্রকাশের অন্যতম বন্ধু ফণিভূষণের পিতা—প্রকাশকে পুত্রের বন্ধু বলিয়া কিছু উচ্চহার সুদেই পাঁচটি হাজার টাকা কর্জ্জ প্রদান করিলেন। প্রকাশচন্দ্রের তাবৎ জমিদারীও বন্ধক পড়িল।

(৭)

সব কাযেই পশার আছে। ওকালতী, ডাক্তারী ব্যারিষ্টারী হইতে মায় কেরাণীগিরিতে পর্য্যন্ত পশার আছে। প্রকাশের বড়লোক বলিয়া একটা খ্যাতি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পয়সার বড়ই টানাটানি। প্রথম প্রথম ধার করিয়া একরকম চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু মহাজনেরা যখন ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ কড়া তাগাদা আরম্ভ করিল, তখন যেন প্রকাশ বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিল। যে ধনবত্তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রকাশকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেই খ্যাতিটাই এখন তাহাকে খুব পীড়িত করিয়া তুলিল। এ একটা সয়তানের মত তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অভিহত করিয়াই যেন উৎকট আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

একবৎসর কাটিয়া গেল। মহাজনেরা তখন ইংরাজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য উকীলের চিঠিতে প্রকাশকে অভিনন্দন দিতে লগিল। খাতক মহাশয় কলিকাতায় একজন নিষ্কর্ম্মা বাবু, ধার করিয়া কেবল অর্থের অপব্যয় করিতেছেন শুনিয়া মহাজন সম্প্রদায় একটু চঞ্চল হইয়াই নিজ নিজ হ্যাণ্ডনোট দলিল তমসুকের পানে বিষম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন—সে চাহনি আসন্ন-পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীর মত স্নেহ-করুণ। অর্থ নষ্ট করিতে পৃথিবীতে কেবল দুই জন বাধা দেয়। এক সহৃদয় আত্মীয় বন্ধু ও মহাজন। মাতো বাধা পূর্ব্বেই দিয়াছেন এক্ষণে কোন কোন মহাজনও আসিয়া তদ্রূপ অযাচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন যে এখন আর টাকা না উড়াইয়া সুদ সমেত তাঁহাদের সমস্ত টাকার ঋণ পরিশোধ প্রকাশের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রকাশ যে কি করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে যে মাকড়সার মত জাল বিস্তার করিয়া শীকারের প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহাতে সে যেন নিজেই জড়াইয়া যাইতে লাগিল। টাকা চাই, টাকা পাইবার পথ প্রশস্ত হওয়া চাই—আর সেই সঙ্গে মাকেও একটা শিক্ষা দিতে হইবে—কিন্তু কি করিয়া যে এতগুলি কায উদ্‌যাপিত হইবে, তাহার কোনই উপায় করিতে পারিতেছে না। তাই ধার করে, মদ খায় নাচে, গায়, চিৎকার করে আর সময় কাটায় অথচ সে পূর্ব্বের মত একাগ্র আনন্দ আর পায় না। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কলিকাতার উপকণ্ঠে কাহারও বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়া দুই একদিন কাটাইয়া আসে তবুও সে যেন সুস্থ হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বেকার মত এখনও বাগান পার্টি, সান্ধ্য-সম্মিলন, সবন্ধুদলবলে থিয়েটার গমন ভোজ সমস্তই আছে—তবুও প্রকাশ যে কেন শান্তি পাইতেছিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

বিগত একবৎসরের মধ্যে বাড়িতে সে একখানি পত্রও দেয় নাই—তাহাতে সুখদা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পত্রের পর পত্র, রেজেষ্ট্রীপত্র, টেলিগ্রাম—কিছুতেই প্রকাশ টলিল না, তখন স্বয়ং সশরীরে বটুক চাটুয্যে একদিন কলিকাতায় আসিয়া হাজির। সুখদা বটুককে প্রকাশের তত্ত্ব লইতে এবং প্রকাশকে বুঝাইতে কলিকাতা পাঠাইলেন। বটুক আসিয়া আপনার পুরস্কারের অঙ্গীকৃত অর্থের তাগাদা করিয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন। সুখদাকে গিয়া জানাইল যে প্রকাশ শারীরিক ভাল আছে তবে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার অভিমান ভাঙ্গাইতে বা বাটী আনিতে সে পারিল না।

পুত্রের অভিমানে সুখদা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেহারী চক্রবর্ত্তীর পত্নীর উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার পরামর্শ শুনিয়াই এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। যে সমস্ত যুক্তি তর্ক প্রমাণে সুখদা একদিন পুত্রকে সৎপথে ফিরাইতে বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়াছিলেন, আজ দেখেন সেগুলি কত অকিঞ্চিৎকর, কত তুচ্ছ, কত খাটো। আত্মগ্লানি এবং ধিক্কারে তিনি নিজের অল্পবুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা এবং নিশ্বাস প্রবণতাকে নিয়ত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অভিমানে ঠেকাইয়া আপনার দৈন্যকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে নিজেকে এমন উত্তেজিত করিয়া ফেলিলেন যে এই অল্পদিনেই তাঁহার বার্দ্ধক্য-নমিত কৃশদুর্ব্বল তনুখানি শয্যার উপরে পড়িয়া গেল। তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই কত লোক কত বুঝায়, পুত্রের দোষ তিনি কিছুতেই আর স্বীকার করিলেন না। বটুক চাটুয্যে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে তাঁহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। মাথা ধরা, ঘুষঘুষে জ্বর, দৃষ্টিহীনতা, মন্দাগ্নি, অরুচি হইতে হইতে তিনি একবারে হঠাৎ মৃত্যুর তোরণদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বটুক চাটুয্যে রাজনগর ষ্টেশন হইতে প্রকাশকে তার পাঠাইলেন যে—তোমার জননীকে শেষ দেখা যদি দেখিতে চাও, তবে কালবিলম্ব না করিয়া চলিয়া আইস।

প্রকাশ প্রথম ভাবিল, যাইবে না। শেষে দেখিল—যদি সে এসময় উপস্থিত না থাকে তবে তো তাহার পিতার সঞ্চিত এবং জননীর যত্ন রক্ষিত যে অসীম ধন ভাণ্ডার আছে তাহা সকলে মিলিয়া লুটিয়া লইবে—তাই বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার আরও একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। মহাজনেরা তাহার কলিকাতার সমস্ত সুখ একবারে বিস্বাদতিক্ত করিয়া দিয়াছে। নিজের বাসায় অথবা অন্যত্রে, যেখানেই সে থাকে সেই খানেই টাকার তাগাদা গিয়া হাজির। ইহাতে সে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে—কলিকাতা হইতে পলাইলে বাঁচে।

ভাদ্রের সন্ধ্যা। সেদিন খুব গরম বলিয়া ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেঝেতে কঙ্কাল সার সুখদা জীবনের জন্য মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; বটুকের সঙ্গে প্রকাশ ঘরে ঢুকিল—আস্তে আস্তে নীরবে জননীর পদতলে গিয়া বসিল।

প্রকাশকে দেখিয়া সুখদা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—তাঁহার কোটরনিলীন চক্ষু দুইটি এক প্রদীপ্ত আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। আর বড় বড় অশ্রুবিন্দু অনর্গল বহিতে লাগিল। আজ দুইদিন হইতে সুখদার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে তিনি প্রকাশের গলবেষ্টন করিয়া তাহার মাথাটিকে আপনার অস্থিসার বুকে স্থাপন করিলেন—ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত হইল রুদ্ধ কণ্ঠের তীব্র যন্ত্রণা সেই মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কথা বাহির

হইল না।" প্রকাশও মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া জননীর শেষ শয্যাকে পবিত্র এবং সুকোমল করিয়া দিল।

(৮)

শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল, তবুও প্রকাশ কলিকাতা যাইবার নাম করে না দেখিয়া গ্রামের কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া গেল। কিন্তু যে যাবে, সে কি লইয়া যাইবে? সমস্ত বাক্স সিন্ধুক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যাত্রার সিঁদুর মাখানো টাকা পর্য্যন্ত গণিয়া নগদ এক হাজারও উঠিল না। আর কয়েক খানি সোণা রূপার অলঙ্কার বেশীর ভাগ থাকিল। অথচ তাহার কলিকাতার ঋণ এদিকে সুদে আসলে প্রায় দশ হাজারে উঠিয়াছে!

প্রকাশের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। সে যে মাকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য একায করিয়াছে—ভাবিতে গেলে তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া যাইতেছে কলিকাতার সমস্ত সুখ, সৌন্দর্য্য, পৃথিবীর যাবতীয় মোহ এবার সে সত্য সত্যই এক বিরাট চক্রান্তের মত দেখিল। সকলেই যেন তাহার বিরুদ্ধে নির্ম্মম জল্লাদের মত দণ্ডায়মান্। আপনার বলিতে জনমানব নাই—মাথাটি রাখিবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। সে আজ এত দরিদ্র! প্রকাশের চক্ষে দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল—কোন মতেই সে স্রোতকে সে বাধা দিতে পারিল না। নিঃস্ব, নিতান্ত নিরুপায়। আপনার মদোদ্ধত অহঙ্কার ও প্রবঞ্চনায় সে শেষে এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে ঠিক করিল আত্মহত্যা করিবে; কিন্তু পরিল না। কোনও দিকে পলাইয়া যাইবে? সেও ত বড় বিষম বিড়ম্বনা। তবে কি পাওনাদারদের হাতে পায়ে ধরিবে? অগত্যা পাওনাদারদের হাতে পায়েই ধরিতে হইবে—তাহা ভিন্ন আর উপায় কি? এবিষয়ে পাকাপাকি একটা পরামর্শ করিতে সে মাখনকে তার করিল, যেন একদিনের জন্যও আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যায়!

মাখন আসিল। কর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত। এইজন্য বার'টার গাড়ীতে আসিয়া, তিনটার সময় ফেরতা ট্রেনে তাহাকে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাই প্রকাশ ষ্টেশনেই মাখনের সঙ্গে পরামর্শাদি করিবে বলিয়া ষ্টেশনে আসিল।

প্রকাশ মাখনকে পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া ষ্টেশনের বাহিরে একটা অশ্বথতলে বসিয়াই প্রকাশ আপনার বক্তব্য বলিয়া মাখনের অভিমত চাহিল। কারণ সময় খুব অল্প, এরই মধ্যে কায শেষ করিতে হইবে।

প্রকাশ যে পথের ভিখারী হইয়াছে একথা শুনিয়া মাখন পাগলের মত খুব জোরে একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে প্রতিধ্বনিতে নিস্তব্ধ মাঠ চমকিয়া উঠিল,—বৃক্ষশাখার পাখীগুলি চকিত কলরবে বৃক্ষত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। ষ্টেশন-পথের লোকগুলি বিস্মিত হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রকাশ অবাক্!

মাখনের চক্ষুদিয়া একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মাখন বলিল—"বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আর যে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হবে সে সম্ভাবনাও নাই। কেন যে নাই, আমার কথা শুন্‌লেই তুমি তা' বুঝ্‌তে পার্‌বে। স্থির হয়ে শোন'—অমন উত্তেজিত হ'য়ো না।

"মাখনলাল আমার ছদ্মনাম—আমি যতীন্দ্রনাথ রায় স্বর্গগত সতীনাথ রায়ের পুত্র—নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে শ্যামবাজার। এইবার বোধ হয় কতকটা বুঝ্‌তে পেরেছ'। শোন', তবে আরও পরিষ্কার করে বল্‌চি। তোমার পিতা রামহরি মজুমদার আমার পিতার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর হাতে ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত কায কর্ম্ম টাকা কড়ি সঁপিয়া দিয়া আমার পিতাঠাকুর নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তোমার বাবা শেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করে পথে বসিয়ে, তহবিলের সমস্ত টাকা পয়সা চুরি করে এনে, গ্রামে একজন মস্ত বড় লোক হ'য়ে উঠলেন। সেই শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন তিন বৎসর। এরূপ নিরুপায় নিরাশ্রয় অবস্থায় আমার দুঃখিনী মা আমাকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ীতে এসে তবে প্রাণরক্ষা করলেন। আমার মামারা সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিবার জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু মা' তা কর্‌তে দিলেন না। মা কেবল ভগবানের হাতেই বিচারভার দিয়ে সান্ত্বনা লাভ ক'রলেন। কিন্তু বাল্যকাল হ'তেই মায়ের সেই বিষণ্ণ মুখমণ্ডল আমার সমস্ত অন্তর ও সমস্ত শক্তিকে একটা

প্রচণ্ড তেজে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল। যার প্রেরণা আমি অবহেলা ক'রতে পারি নাই বা করিও নাই। তোমার পিতার বিশ্বাসঘাতকতার উচ্চসৌধকে আমি ধ্বংস করে' ভিখারীর মত তোমায় রাজপথে বের করবো--এই আমার পণ ছিল। তা' হয়েছে।

"অনেক খোঁজ তল্লাস করে' আমি তোমায় আবিষ্কার করেচি। সে কথা বিস্তারিত করে' বল্‌বার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই।

"তোমাকে ধ্বংসপথের যাত্রী করতে আমি যে যে উপায় ঠিক করে ছিলাম, দেখ্‌লাম তার মধ্যে তুমি সহজটাই গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্ত। ক্ষেত্রকে উপযুক্ত করে' তুল্‌বার ভারটা আমিই নিয়েছিলাম। তোমাকে মদ ধরালাম, দিলজান্‌কে জুটিয়ে দিলাম, কলিকাতার বিখ্যাত বদ্‌মায়েস ছোক্‌রার দলকে তোমার বন্ধু জুটিয়ে দিলাম। দেখ্‌লাম নৌকা যখন পালে চলে, তখন গুন্ টান্‌বার দরকার হয় না—তাই আমি নিপুণ কর্ণধারের মত হা'ল ধরে' বসে' রইলাম। তুমি অনুকূল পবনে তর্ তর্ করে' ঘুর্ণি পাথারের মুখে চল্‌তে লাগলে।

"তোমার সঙ্গে অনেক প্রতারণা প্রবঞ্চনা, অনেক কুকর্ম্ম করেছি। ইহকালেই হোক্ আর পরকালেই হোক তার শাস্তি আমি নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সে যতই কঠোর হোক্—আমার পিতার শেষ ইচ্ছা প্রতিপালনের আনন্দে ও পুত্রের গৌরবে আমি তা বরণ করে নেব'।"

ট্রেন কখন আসিয়াছে, কাহারও সেদিকে লক্ষ্য নাই। এমন সময়ে গার্ডের ছাড়িবার বাঁশি শুনিয়া যতীন্দ্রের হুঁস্ হইল। সে ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল! দেবতার ফুৎকারের মত অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া কয়লা ও ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গাড়ী চলিয়া গেল। প্রকাশ বজ্রাহতের ন্যায় সেই অশত্থতলে আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল।

তিন চারিদিন পরেই গ্রামে ক্রোকের ঢোল বাজিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ও পুরাতন।

বর্ষ গিয়ে বর্ষ এল, পুরাণ গিয়ে নূতন এল ভবে ;
তারি মাঝে উঠল মেতে দেশের যত ছেলে বুড়ো সবে।
নূতন নিয়ে ব্যস্ত সবাই, দেশটা ব্যাপি নূতনেরি খেলা ;
পুরাণ তরে কেউ্ কাঁদে না, —লাগল আনন্দেরি মেলা।

এই নূতনের জন্ম কোথা জানবে কেগো বুঝবে কেগো মনে?
নূতন যে গো উঠ্‌লো ফুটে পুরাতনের স্নেহ আবেষ্টনে।
কোলের ছেলে চাইলে পরে মায়েরে তা'র চাইতে হবে সাথে;
নূতনেরে পেতে হ'লে পুরাতনে রাখতে হবে মাথে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন গুপ্ত

সম্প্রদায় ভেদে আপ্যায়ন ভেদ।

প্রণাম, নমস্কার অভিবাদন, অভ্যর্থনা, আদর, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি প্রীতিসাধক আচরণ নিচয়ের সাধারণ নাম আপ্যায়ন। পৃথিবীর সভ্য অসভ্য নির্ব্বিশেষে সমস্ত জাতির মধ্যেই এই আপ্যায়ন প্রথা প্রচলিত। কিন্তু ইহার প্রদর্শন রীতি সর্ব্বত্র একরূপ নহে, অপিতু, সম্প্রদায় ভেদে পরস্পর পৃথক ভাবাপন্ন ও অভিনব। আমরা এই প্রবন্ধে কতকগুলি বিভিন্ন মানব শ্রেণীর বিভিন্ন আপ্যায়ন কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

উড়িষ্যায় কন্ধ নামে এক জাতীয় অসভ্য লোক বাস করে। তাহাদের আপ্যায়ন হস্তোত্তলন। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর ন্যায় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেই বুঝিতে হয়, তাহারা গুরুজনের নিকটে প্রণত হইতেছে। কন্ধেরা

ভ্রমণকালে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখিলেই—'আমি যাইতেছি' বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করে এবং সেই ব্যক্তি—'যাও' বলিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ত নামা হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোহিতের নাম জঙ্গম। তাহারা যজমান লিঙ্গায়ত দিগের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শিষ্য লিঙ্গায়তেরা প্রত্যহ দুইবার তাহাদের পদদ্বয় ধৌত করিয়া দেয় ও সেই ধৌত জলে স্নান করে। কোনও জঙ্গম সাধুর সহিত দেখা করিতে হইলে, লিঙ্গায়ত ভক্তকে সর্ব্বাগ্রে তাহার পাদোদক গ্রহণ ও পান করিতে হয়। অন্যথা তাহার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শিত হয় না।

হায়দরাবাদ মুসলমান রাজ্য, কিন্তু এখানে সমস্ত অধিবাসীর দশভাগের এক ভাগ মুসলমান আর নয় ভাগ হিন্দু। এই হিন্দু মুসলমানের আপ্যায়ন প্রধানতঃ আতর, ছোট এলাইচ ও চিকি শুপারীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। কাহারও সহিত সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হইলে এই তিন দ্রব্য দিয়া তাহারা তাহার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। এখানকার তৈলঙ্গীরা, 'নান্ পোতান্নু' (আমি যাই) বলিয়া বিদায় গ্রহণ এবং 'নু পোন্নতারু' (তুমি যাও) বলিয়া বিদায় দান করে। পরস্পর স্বাগত বা কুশল প্রশ্ন স্থলে, 'অন্দর বাগুন্ত।' শব্দ উচ্চারিত হয়।

মোল্লারপুর জেলার মুন্নাদাস স্বর্ণকার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম 'আকাপন্থী'। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা, 'বন্দেগি সাহেব' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন ও মস্তক অবনত করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুদিগের সাধারণ আপ্যায়ন শব্দ 'রাম রাম'। তাহারা আত্মীয় বন্ধুর সমাগম ও বিদায় গ্রহণ কালে রাম রাম শব্দ উচ্চারণ করে।

কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবর প্রদেশের নর নারীগণ উন্মুক্ত গাত্রে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। গ্রীবা, বক্ষ আবৃত রাখিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইলে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করা হয়। মালাবর অঞ্চলে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণের নিয়ম নাই, ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম কেহ করে না। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইলে, লোকে উভয় হস্ত উত্তোলন করে মাত্র।

পঞ্জাবের সুখেত, কোহিস্থান, মন্দীনগর ও উপত্যকার নিকটস্থ গ্রামগুলিতে যদি কোনও বৈদেশীক উপস্থিত হন তবে গ্রামবাসিনী নারীরাই গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করে। সম্মাননা সূচক সঙ্গীতালাপই সেই অভ্যর্থনার প্রধান অঙ্গ। তাহারা নানারূপ দৃষ্টিরমা বসনভূষণে, সজ্জিত হইয়া দলে দলে তাঁহার সমীপস্থ হয় এবং সুস্বরে গান করিতে থাকে।

বঙ্গীয় মুসলমান জাতি স্বশ্রেণীর কোনও লোককে দেখিলেই 'সলাম আলেকাম্', বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে আর সেই ব্যক্তি 'আলেকম্ সলাম' শব্দে প্রতি নমস্কার করিয়া থাকে। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকদিগকে নমস্কার জানাইতে হইলে তাহারা কেবল 'সলাম' শব্দ প্রয়োগ করে।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতি বিশেষের নাম খিয়ংথা। তাহারা পরস্পর কপোল আঘ্রাণ করিয়া সম্মান ও আদর দেখাইয়া থাকে। মুখ ও নাসার সাহায্যে প্রবলভাবে গণ্ডদেশ চুম্বনই তাহাদের আঘ্রাণ। খিয়ংথা-যুবক ফুলের সহিত পানের খিলি পাঠাইয়া যুবতীর নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করে। যুবতী যদি তাহার অনুরাগিনী হয়, তবে বিশেষ ভাবে রচিত ও বহু মশলাপূর্ণ পানের খিলি দিয়া তাঁহাকে আসিতে বলে। অন্যথা খিলির মধ্যে অঙ্গার চূর্ণ বা ভস্ম দিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে।

সিংহল-কলম্বোর হিন্দুরা আলোকমালায় ও ফল রাশিতে গৃহদ্বার সজ্জিত করিয়া সাধু বা পূজ্য ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করে এবং তাঁহার দর্শন মাত্রেই—'জয় মহাদেব' বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। কান্দীর অধিবাসীরা পূর্ব্বে পান দিয়া লোকের সম্মান রক্ষা করিত। বিচারপতি প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর ভোজ্য পানীয়ের সহিত চল্লিশটি করিয়া পান দিত। বাঙ্গালীরা পান তামাক, উড়িয়ারা পান ও চূর্ণ মিশ্রিত তামাকু চূর্ণ এবং মগেরা পান, চুরুট ও চা দিয়া অতিথি সৎকার করিয়া থাকে।

শ্যামের শান জাতীয় বৌদ্ধদিগের আপ্যায়ন-ক্রিয়া সাধারণতঃ চা, শুপারী এবং খদির শুপারী যুক্ত পানের উপরেই নির্ভর করে। তাহারা অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রথমে এক পেয়ালা দুগ্ধ-চিনিহীন চা পান করাইয়া শেষে শুপারী অথবা পান চর্ব্বণ করিতে দেয়। কিন্তু শ্যাম-সীমন্তিনীরা উহাতে তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে, বারবার 'নবীন' শব্দের প্রয়োগ...

করিতে হয়, 'নবীন হীরক', 'নবীন কাঞ্চন', 'নবীন কুসুম' প্রভৃতি নবীনত্ব-জ্ঞাপক শব্দাবলীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ সম্বোধন না করিলে তাহাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। অধিক কি—পলিত-কেশা, লোলচর্ম্মা বৃদ্ধাকেও 'নবীন' শব্দের দ্বারা সম্ভাষণ না করিলে, তিনি বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে শ্যামবাসীরা রাজভক্তি দেখাইতে, রাজার সম্মুখ দিয়া পশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ মহামান্য সোমদেৎ ফ্রি পরমিন্দ্য মহাচুলালঙ্করণ মহোদয় সেই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

যবদ্বীপ প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ হইলেও এখন সেখানে হিন্দু হইতে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু সকলেই প্রায় প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুসারে আপ্যায়ন করিয়া থাকে। তাহারা কোনও পূজ্য বা ভদ্রলোককে যাইতে দেখিলে, তাহার সম্মানার্থ মৃত্তিকায় উপবেশন করে এবং যতক্ষণ তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত না হন, ততক্ষণ বসিয়া থাকে। সভায় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হইলে তাবল্লোকই আসন ত্যাগ করিয়া নিম্নে উপবিষ্ট হয় এবং তিনি সভাগৃহ ত্যাগ না করিলে পুনরায় আসন গ্রহণ করে না। যবদ্বীপে পূজ্য ব্যক্তির সম্ভ্রম এত অধিক যে, তিনি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলেও সকলকে তাহা নতমুখে সহ্য করিতে হয়।

লম্বকদ্বীপের লোকেরা পদোপরি উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ উবু হইয়া বসিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করে। রাজাকে পথে যাইতে দেখিলে, পাদচারীর ত কথাই নাই, যাহারা গাড়ী, ঘোড়া ও পাল্কীতে থাকে, তাহারাও নামিয়া আইসে এবং মাটিতে উবু হইয়া বসিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখায়। তাহারা সভাস্থলে সমবেত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পান দিয়া অভ্যর্থনা করে। যব ও বলী প্রভৃতি দ্বীপের ন্যায় লম্বকও প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ। এখনও এখানে অনেক হিন্দু বাস করিয়া থাকে।

ফিলিপাইন দ্বীপের অধিবাসীরা অবনত হইয়া উভয় হস্ত ও সাহায্যে অভিবাদন সমাধা করে। স্বজাতীয় কোনও লোকের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলে, তাহারা সম্মুখভাগে নত হয়, উভয় হস্তে উভয়গণ্ড স্পর্শ করে এবং বামচরণ উত্তোলন ও পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এক শ্রেণীর উলঙ্গ মানব দৃষ্ট হয়। তাহাদের অভিবাদন-প্রথা হাস্যোদ্দীপক। কোনও আত্মীয় কুটুম্ব বা প্রবীণ ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হয় এবং যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম চরণ তাহার দিকে উত্তোলন করিয়া দুই হস্তে আপন আপন উরুদেশে আঘাত করিতে থাকে!

মালয় উপদ্বীপের আপ্যায়ন নাসিকামর্দ্দন। সেখানকার জাতীয় লোকেরা হস্তের দ্বারা পরস্পর নাসাগ্রভাগ মর্দ্দন করিয়া সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। উত্তর আমেরিকার এস্কিমো জাতির আপ্যায়নও অনেকটা এইরূপ। তবে তাহারা হস্তে নাসিকাগ্র মর্দ্দন না করিয়া, একে অন্যের নাসিকায় নিজ নাসিকা ঘর্ষণ করে। নিউজিলাণ্ডের মাওরী জাতিও পরস্পর নাসা ঘর্ষণে, নাকে নাক ঘষিয়া, অভিবাদন করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা নাসা ঘর্ষণের পূর্ব্বে একে অন্যের কণ্ঠে গিয়া পতিত হয়। মাওরী জাতির মধ্যে নাপুহী নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে পরস্পর চুম্বনই তাহাদের আপ্যায়নের প্রধান অবলম্বন। পরিচিত অপরিচিত সকল লোককেই তাহারা চুম্বনে অভিনন্দিত করে। এমন কি, যুবতীরাও অপরিচিত বিদেশী যুবকের, কণ্ঠদেশ বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া, উভয় গণ্ডে চুম্বন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

জাপানের লোকেরা অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীত। তাহারা স্বদেশী বিদেশী সকলের প্রতিই সমান সমাদর দেখায় এবং ভূমিষ্ঠপ্রণামে গুরুজনের সম্মান রক্ষা করে। পুত্রকন্যা ও দাসদাসীগণ বহির্গমনের পূর্ব্বে ও প্রত্যাগমনের সময়ে মাতা পিতা এবং গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীর চরণে প্রণত হয়। জাপানীর পূজ্য ব্যক্তিকে গৃহে আসিতে দেখিলে, আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং দ্বারদেশে গিয়া মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করে। কাহারও সহিত দেখা হইলে, তাহারা প্রাতে 'ওহায়ো গোজাইমাস্' (সুপ্রভাত), মধ্যাহ্নে 'কন্নিচিউয়া' (শুভদিন), সায়ংকালে 'কম্বাংয়োয়া' এবং রাত্রিতে 'ওইয় 'সুমিনাসাই মাসে' (আপনার সুনিদ্রা হউক) বলিয়া সাদর সম্ভাষণ ও বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। জাপানী আগন্তুক সাধারণতঃ 'আরিংগাতো গোজাইমাস' বাক্যে গৃহপ্রবেশ ও 'সায়োনারা' বাক্যে গৃহত্যাগ বা বিদায় গ্রহণ করে। কোনও আত্মীয়বন্ধু বাটীতে উপনীত হইলে, গৃহকর্ত্রী পুনঃ পুনঃ 'আসিতে আজ্ঞা হউক', 'বসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া আসন প্রদান ও তাহা দেখাইয়া দেন। আত্মীয় ব্যক্তি আসন গ্রহণ

করিলে, তিনি তাঁহার জুতা জোড়াটি স্বহস্তে একপার্শ্বে সরাইয়া রাখেন এবং শীতকাল হইলে অগ্নি ও গ্রীষ্মকাল হইলে পাখা ও চা, বিস্কুট প্রদান করেন। অতঃপর কথা-বার্ত্তার পর তিনি গমনোদ্যত হইলে গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে জামা পরাইয়া দিয়া জুতা ঝাড়িয়া সম্মুখে স্থাপন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হন বা বহির্দ্বারে জানুপরি উপবেশন করেন। এখানকার অতিথিরা জামা জুতা খুলিয়া আসনে উপবিষ্ট হয় ও আসন ভাঁজ করিয়া রাখিয়া চলিয়া যায় 'আর আপনাকে মনে প্রাণে ধন্যবাদ দিতেছি' 'আপনার কার্য্যে বাধা দিলাম, কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বার বার গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রীর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকে। জাপানীরা রাজাকে পবিত্র পুরুষ বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ভক্তির ন্যূনতা ঘটিবে বলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না; রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে, মুখ নত করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। উহাতে এইভাব সূচিত হয় যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার যোগ্যতাও তাহাদের নাই।

চীনের পিতৃপুরুষ পূজক বৌদ্ধগণ ও জাপানীদিগের ন্যায়, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী কিন্তু বিনয়ের আবরণে মনের গর্ব্ব বা বৈরভাব গোপন রাখিতে তাহারা যেমন নিপুণ তেমন আর কোনও জাতিই নহে। তাহারা 'আমি অতি দীন', 'আমার মত অভাজন আর নাই'—ইত্যাকার দীনতা ব্যঞ্জক বাক্যে লোকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হয় এবং 'আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করিতেছি' বলিয়া আবশুক কথার উত্থাপন করে। সামান্য শ্রমজীবি বা ভিক্ষুককে পর্য্যন্ত তাহারা, 'মহাশয়কে দেখিয়া আপ্যায়িত হইলাম' বলিয়া ভদ্রতা জানায় এবং জাপানীদিগের ন্যায় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। দুঃখ দৈন্যাদি পীড়িত কোনও ব্যক্তিকে সহানুভূতি দেখাইতে হইলে, তাহারা তাহার উভয় হস্ত নিজ নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কোরিয়া দেশের আপ্যায়ন উপবেশনের রীতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। অভ্যাগত ব্যক্তি যদি নিম্নপদস্থ হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ তাহাকে পশ্চিম মুখে বসাইয়া, নিজে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করে। কিন্তু অতিথি সাধারণ লোক হইলে তাহাকে উত্তরাস্যে উপবেশন করানই ভদ্রতাসঙ্গত। এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিলে গৃহস্থ ও অতিথি উভয়েরই সম্ভ্রম বা পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটে কাফরীস্থান নামে একটা দেশ আছে। এই দেশের অধিবাসীকে কাফির কহে। কাফিরেরা চুম্বনের দ্বারা সাদর সম্ভাষণ ও বিবাদ মিমাংসা করিয়া থাকে। সর্ব্ব সমক্ষে বাদী বিবাদীর স্তন ও বিবাদি বাদীর মস্তক চুম্বন করিলেই তাহাদের বিবাদ মিটিয়া যায় এবং পরস্পর প্রীতিভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

প্রাচীন আরব জাতি পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া আপ্যায়ন জানাইত। যে যত অধিক শিষ্টাচার প্রকাশ করিত, সে তত অধিকক্ষণ হস্ত ধরিয়া থাকিত। মহাপুরুষ মহম্মদ এই প্রণালী অনুসারে প্রচার-বন্ধুদিগের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। মহাত্মা মুসার সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া পূজা বা প্রবীণ ব্যক্তির অভ্যর্থনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান আরব জাতীয় মুসলমানেরা অভ্যাগত ব্যক্তিকে, 'অস্ সলাম অলয়ক' (আপনাকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিতেছি) বলিয়া অভিবাদন এবং 'অলয়কম অস্‌লাম' বা 'অলয়ক মস্‌লাম রহম তোল্লা' (আপনাদের নিকটে মস্তক নত করিতেছি, ভগবান মঙ্গল করুন) বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া থাকে। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতীয়ের অভিবাদনে, অভিবাদন-বাক্যের পুনরুক্তি করাই সেখানকার রীতি। আরবে 'বে অত' বা শিষ্যত্ব স্বীকার-স্থলে, 'আমি আপনার হইলাম' বাক্যে গুরুর করতলে নিজের করতল স্থাপন করিতে হয়। অতিথি সৎকারে আরব জাতি সিদ্ধহস্ত।

আরব দেশের কজেরুন ও বুসহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক শ্রেণীর আরব জাতি দৃষ্ট হয়। এই জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা 'তহলিল' দ্বারা অপরিচিত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করে। 'তহলিল' এক প্রকার প্রীতিজ্ঞাপক কঠোর শব্দ। মুখের উপরে পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্রভাবে হস্ত সঞ্চালন করিলে এই শব্দ সমুৎপন্ন হয়। 'লেল' শব্দ বারবার দ্রুত উচ্চারিত যেরূপ শুনায়, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

মিসর দেশীয় প্রধান লোকেরা রাজভক্তি প্রদর্শন স্থলে রাজার সম্মুখে নতমুখে মৃত্তিকায় পতিত হইতেন এবং তাঁহার সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বন বা আঘ্রাণ করিতেন। কালক্রমে সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হইলে, তাঁহারা রাজাকে গভীরভাবে প্রণাম করিতেন এবং যতক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বাক্যালাপ

না করিতেন ততক্ষণ, যেন ভজনা করিতেছেন এরূপভাবে, নীরব সম্মানে বাহুদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতেন। বর্ত্তমান মিসরীয়গণ অতিথিকে কাফি দিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করে। সেকালে তাহারা মাতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিত এবং বয়ঃবৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলে নিজেরাও দাঁড়াইয়া থাকিত।

আফ্রিকার নিগ্রোজাতি, স্ত্রীপুরুষ সকলেই, মধ্য ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে তিনবার শব্দ করিয়া অর্থাৎ 'তুড়ি' দিয়া আত্মীয় বন্ধুর সম্ভ্রম রক্ষা করে। কিন্তু গিনি প্রদেশের নিগ্রোরা ভব্যতা দেখাইতে, স্ত্রীজাতির দক্ষিণ হস্ত ধারণ ও উহার আঘ্রাণ লইয়া থাকে।

তুরস্কে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের প্রধান নিদর্শন শ্মশ্রু চুম্বন। সেখানে পত্নী পতির পুত্রকন্যা পিতার, কনিষ্ঠ সহোদর সহোদরা জ্যেষ্ঠ সহোদরের শ্মশ্রু চুম্বন করিয়া থাকে।

রুষজাতির চুম্বনই আপ্যায়নের প্রধান সহায়। তাহারা মাতাপিতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সকলেই পরস্পর চুম্বনের দ্বারা ভক্তি, প্রীতি ও প্রণয় জানাইয়া থাকে। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বালবৃদ্ধ, সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার লোকের মধ্যেই চুম্বনের অবাধ প্রচলন। রুষিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থ ও গৃহিণীকে প্রত্যহ প্রত্যেক সাক্ষাৎকারে, বিদায় দান ও গমন কালে, নিজ নিজ পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, অনুগত বাধ্য ও দাস দাসী প্রভৃতিকে চুম্বন করিতে ও প্রতি চুম্বন গ্রহণ করিতে হয়। উৎসব কালে আবার ইহার অসাধারণ আধিক্য ঘটিয়া থাকে। তখন চুম্বনের আদান প্রদানে গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। রাজানুগ্রহে বঞ্চিত রাজকর্ম্মচারীরা রাজ চুম্বনে বঞ্চিত হন এবং অনুগ্রহ লাভ করিলে, আবার তাহা পাইয়া থাকেন। এক সময়ে স্বনামধন্য রুস সম্রাট পিটার দি গ্রেট এক সেতুর উপরে কোনও সেনাপতিকে অকারণ তিরস্কার করেন কিন্তু শেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আবার তাঁহাকে সেই সেতুর উপরে আনিয়া চুম্বনে আপ্যায়িত করেন। সম্রাটের সেই প্রসন্ন-চুম্বনের জন্য এখনও সেই সেতু 'চুম্বন সেতু' নামে অভিহিত হইতেছে।

প্রাচীন রোমক জাতিও মুখ চুম্বনে আপ্যায়ন জ্ঞাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা চুম্বনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত রাখিয়া প্রয়োগ করিতেন। যে চুম্বনে স্নেহভাজন পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে আদর করা হইত, তাহার নাম ছিল 'বাসিয়ম্'। সমশ্রেণী, পদ ও ব্যবসায়ের লোক দিগের প্রতি যে চুম্বনে সম্মান বা প্রীতিভাব দেখান হইত, তাহাকে 'অস্কোলম্' বলা হইত। আর 'সোয়াভিয়ম্' নামা যে তৃতীয় প্রকার চুম্বন প্রচলিত ছিল, তাহা কেবল স্বামী স্ত্রী বা প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত—পরস্পর অধরওষ্ঠ চুম্বনেই তাহার ব্যবহার চলিত। পূর্ব্বে রোমকজাতি রাজা ও উচ্চ রাজপুরুষ দিগের হস্ত চুম্বন করিয়া ভক্তি দেখাইত। সেই করচুম্বন শেষে পরিচ্ছদ চুম্বনে পর্য্যবসিত হয়। এখন নিজের হস্ত নিজে চুম্বন করিয়াই, সকলে রাজা ও প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি প্রধান পুরুষ দিগের সম্মাননা করিয়া থাকে। সেকালের গ্রীকজাতিও চুম্বনের দ্বারা ভক্তি প্রদর্শন করিত। তবে সে চুম্বন প্রার্থনা জ্ঞাপনার্থেই অধিক ব্যবহৃত হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা পরিপূরণের আদেশ পাওয়া না যাইত ততক্ষণ অবধি প্রার্থী বার বার সম্ভ্রান্ত বা ধনী ব্যক্তিকে চুম্বন করিত।

ইথিওপিয়া প্রদেশের সম্ভাষণ-প্রথা বিচিত্র। সেখানকার অধিবাসীরা একে অন্যের পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ ও তাহার একাংশ নিজ নিজ কটিদেশে বন্ধন করিয়া নমস্কার জানায়। এই অভিনব নমস্কারে সহসা বিবস্ত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকিলেও তাহারা ইহাকে ভব্যতা প্রকাশের প্রধান অঙ্গ বলিয়াই মনে করে। প্রাচীন ফ্রাঙ্কো জাতির আপ্যায়ন ছিল আরও অদ্ভুত। তাহারা দূর হইতে কোনও পরিচিত ব্যক্তি বা আত্মীয় বন্ধুকে আসিতে দেখিলে, আপন আপন মস্তক হইতে কতকগুলি কেশ উৎপাটন করিয়া হস্তে লইত এবং উভয়ে নিকটস্থ হইলে পরস্পর সেই কেশের বিনিময় বা আদান প্রদান করিত।

হলন্দের ও কেরো নগরের লোকেরা যথাক্রমে 'আজ যেন ভাল ক্ষুধা হয়' এবং 'ভাল ঘর্ম্ম হউক' বলিয়া পরস্পর কুশল প্রশ্ন ও শুভ কামনা করিয়া থাকে। এক সময়ে কেরো নগরে ঘর্ম্মাবরোধ রোগে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর তজ্জন্য সেই সময় হইতে উক্ত বাক্য তাহাদের মধ্যে আপ্যায়নরূপে পরিণত ও প্রচলিত হইয়া

গিয়াছে। আমাদের এই বঙ্গদেশেও নাকি এক সময়ে হাঁচি রোগে অনেক বালক বালিকা মারা পড়িয়াছিল। রোগ নাই, উপসর্গ নাই, দু'শবার হাঁচিত, আর তাহারা মরিয়া যাইত! শুনা যায়, এই কারণে বালক বালিকা হাঁচিলে, এখনও এ দেশের মাতাপিতা 'জীব' বলিয়া তাহাদের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন।

উত্তর মেরুবাসী এস্কিমো জাতি অতিথিকে তামাকের কাঁচা পাতা চিবাইতে দেয়, অথচ শুষ্ক তামাকের চুরুট ধরাইয়া প্রদান করে। নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল অতিথিকেই এইরূপে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই জাতি, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই, তামাকুর রস ও ধূম পান করিয়া থাকে।

লাপলণ্ড দেশের অধিবাসীরা গৃহাগত আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতিকে গীতবাদ্য সহকারে সম্বর্দ্ধনা করে এবং চর্ম্মাসনে বসাইয়া পশু পক্ষী ও মৎস্যাদি ধৃত ও বধ করার সম্বন্ধে গল্প করিতে থাকে। এদিকে স্ত্রীলোকেরা বাটীর মধ্যে একত্র হইয়া, কোনও প্রিয় পরিজনের বিয়োগ-দুঃখের উদ্দীপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে এবং অল্পক্ষণ পরে রোদনে বিরত হইয়া, প্রীতিদায়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের অবতারণা সহকারে নস্য গ্রহণ ও কৌতুক করিতে থাকে। লাপলণ্ডের লোকেরা স্থান বিশেষে একে অন্যের অঙ্গে নাসিকা ঘর্ষণ করিয়াও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপের লোকেরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাহারা সাধারণতঃ 'সিলভারটু' (সুখী হও) বলিয়া পরস্পর নমস্কার জানায়। কেহ গৃহের নিকটে আসিলে, গৃহস্বামী দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার সম্মুখীন হয় এবং তাহাকে আদর পূর্ব্বক রন্ধন গৃহে লইয়া গিয়া আসন প্রদান করে। আগন্তুক উপবিষ্ট হইলে, গৃহস্থ ও গৃহিণী যথাক্রমে 'সিলভারটু' বলিয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করে, আর উভয়ে নিজ নিজ হস্তদ্বয় নিজ নিজ বক্ষে রক্ষা করিয়া, গভীরভাবে তাহার সম্মুখে অবনত হয়। আগন্তুকও উভয়কে ও তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে ক্রমে ক্রমে চুম্বন করে এবং 'সুখী হও' বাক্যে সকলের শুভ কামনা করিয়া থাকে। আগন্তুক রাত্রিতে শয়ন করিতে গেলে, গৃহিণী সেই ঘরে গিয়া, তাহার পরিচ্ছদ উন্মোচনে সহায়তা করে।

দক্ষিণ আমেরিকার টেরাদেল ফিউগা দ্বীপে ফুজিয় নামে এক শ্রেণীর অসভ্য মানবজাতির বাস আছে। নেঙটাইয়া হাঁটে বলিয়া তাহাদের পদদ্বয় ধনুকের ন্যায় বক্র। তাহারা পশুচর্ম্ম সঞ্চালন করিতে করিতে অভ্যাগত বিদেশীর সম্মুখবর্ত্তী হয় এবং উদরে চপেটাঘাত ও তদুপরি হস্তমর্দ্দন সহকারে উচ্চ আনন্দ ধ্বনি করিতে থাকে। বৈদেশিক অতিথির অভ্যর্থনা ক্রিয়া এইরূপেই তাহারা সম্পন্ন করে।

য়ুরোপ আমেরিকার সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পর করমর্দ্দনই বিশিষ্ট আপ্যায়নরূপে পরিগণিত। তাহারা 'আপনাকে ধন্যবাদ,' 'সুপ্রভাত,' 'শুভদিন', 'শুভরাত্রি' প্রভৃতি বাক্যে পরস্পর সম্বর্দ্ধনা এবং বিদায় দান ও গ্রহণ করেন। চা, সিগারেট, বিস্কুট, প্রভৃতি দিয়া অতিথি সৎকারের রীতিও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ভারতীয় হিন্দুজাতির আপ্যায়ন নানাবিধ। তাহারা প্রধানতঃ পঞ্চাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ ও দণ্ডবৎ প্রণতি, পদধূলি গ্রহণ, পদচুম্বন, পদে মস্তকস্থাপন, যুক্তকরে ও নতমস্তকে শাস্ত্রোক্ত শ্লোক বা স্বরচিত স্তোত্রপাঠ প্রভৃতির দ্বারা ইষ্টদেব, মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের, শিরে উভয় হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক নমস্কার, আলিঙ্গন ও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন দ্বারা সমপদস্থ ব্যক্তি বা বন্ধুদিগের এবং মস্তকাঘ্রাণ বা চুম্বন, মস্তক বা পৃষ্ঠে হস্তার্পণ, গণ্ডে চুম্বন বা গণ্ডে হস্তস্পর্শন ও সেই হস্ত চুম্বন অথবা 'দীর্ঘায়ুরস্তু' প্রভৃতি আশীর্ব্বাদ বাক্যে পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহভাজনদিগের আপ্যায়ন করিয়া থাকে। তাহারা 'বালোঽপি নাব মন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥' এই মনুবচন শিরোধার্য্য করিয়া, রাজাকে নানা উপহারে পূজা করে, ব্রাহ্মণেরা ধান, দূর্ব্বা, চন্দন ও নারিকেল প্রভৃতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। হিন্দুদিগের মতে, রাত্রিতে নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ উভয়ই নিষিদ্ধ এবং দূরবর্ত্তী, জলমধ্যস্থ, দ্রুতগামী মদগর্ব্বিত, ক্রুদ্ধ, জল ও পুষ্পহস্ত অভ্যঙ্গকারী এই আট ব্যক্তিকে নমস্কার করাও অবিধেয়। হিন্দুরা এই বিধিনিষেধ গুলি বিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে (৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক হুয়েন্সাঙ যখন এদেশে আগমন করেন, তখনও তিনি হিন্দুদিগকে বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে আপ্যায়ন ও তাহার বিধি নিষেধ পালন করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'তা তা-সি ইউ-কি' নামক বিখ্যাত ভারত ভ্রমণকাহিনীতে হিন্দুজাতির যে নয় প্রকার আপ্যায়নের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত পঞ্চাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ প্রভৃতি প্রণামের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। ইত্যলমিতি।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

মানসী।

ও গো আমার চিত্ত বনের
বেতস্ লতার মঞ্জরী,
কল্প লোকের সুন্দরী,
নয়ন-পথের স্বপ্ন-রথের উর্ব্বশী
পাগল-করা পুরশশী
অবন্ধনে বাঁধ' মোরে
খুলে লাজের উত্তরী !

বেণী তোমার এলিয়ে পড়ুক্
সু-ত্রিবেণীর সঙ্গমে
আমার স্বপ্নের জঙ্গমে—
চরণ রাখ চিরদিনের বাঞ্ছনে
সেঁউতি অলুক্ কাঞ্চনে
দিন শেষের স্বর্ণ শোভায়
বর্ণ লোভায় সঞ্চরি ;

চারু তোমার চুম্বনেতে
করিয়া রস সঞ্চিত
আর রেখ'না বঞ্চিত

নবীন আলোর উদয় সাথে ঘুম মোর
দিক্ ভেঙে আজি চুম তোর
এ ফাল্গুনে কর্ মোরে তোর
ফুলের মধুর চঞ্চরী !

মন সায়রের স্বর্ণ-হংসী
আয় নেমে তোর মস্রোতে
আছি আমি বুক্ পেতে—
আয়রে আমার বর্ষা ধারার সঙ্গিনী
নীরের ক্ষীরের রঙ্গিনী !
নয়ন-নীরের গাহন জলে
আর খেলিস্‌নে সন্তরি !

থাকুক্ পরা' আলোর বসন,
চুলের আঁধার পশ্চাতে
আয় লো বাসক-সজ্জাতে
আলিঙ্গনে ঝরুক্ ফুলের ফুল-ঝুরি—
আমার পাতা বুক জুড়ি'—
চিরন্তনী মোর মোহিনী
মোহপুরের অপ্সরী।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীর প্রাণ।

(উপন্যাস)

(২৫)

"কিরে নিবু, হন্ হন্ ক'রে ছুটে এমন কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

সর্ব্বানন্দের কথায় মনে বড় তীব্র আঘাত পাইয়া নিবারণ ছুটিয়া চলিতেছিল—গতির যে কোনও লক্ষ্য ছিল তা নয়। কোথায় কারও কাছে যাইবে, কোনও পরামর্শ কাহারও নিবে, অথবা নিজেই কিছু করিবে, এরূপ কোনও কথাই তখন তাহার মনে ছিল না। শুধুই সে দ্রুত চলিতেছিল,—তীব্র অঙ্কুশাঘাতে হস্তী বা কশাঘাতে অশ্ব যেমন স্থির থাকিতে পারে না, সম্মুখের পথে ছুটিয়া চলে নিবারণও তার এই বেদনার তীব্র আঘাতে সম্মুখে যেমন্ পাইল, সেই পথেই ছুটিয়া চলিতেছিল।

সহসা শরতের সঙ্গে সাক্ষাতেও শরতের এই প্রশ্নে নিবারণ থমকিয়া দাঁড়াইল!

"কিরে, কি হ'য়েছে; চোক্ মুখ যে আগুণ! কারও সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলি না ঝগড়া ক'ত্তে কোথাও যাচ্চিস্!"

নিবারণ একটু হাসিল। বড় শুষ্ক কাষ্ঠ হাসি। কিন্তু তবু একটু হাসি তার পাইল, কহিল, "না না, শরৎ দা—ঝগড়া! না শরৎ দা, ঝগড়ার মত মন এখন নাই।"

"তবে কি হ'য়েছে রে? বাড়ীতে কারও—"

"না না সে সব কিছু নয়। তবে—হাঁ,—শরৎ দা, তোমাকে গোটাকত কথা ব'লব। তোমাকেই ব'লব, কারণ তুমি বোধ হয় সবার চেয়ে ভাল বুঝবে,—ভাল উপদেশ আমায় দিতে পার্বে।"

"কিরে?"

"চল, তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসি। তুমি কি কোনও কাজে বেরুচ্ছ?"

"না! কাজ এমন কিছু নয়, যখন হয় গেলেই চল্‌বে। তোর কাজ বোধ হ'চ্চে বেজায় জরুরী। তা আয় বসি গে।"

সেই রাস্তার পাশেই শরৎদের বাড়ী। উভয়ে গিয়া চণ্ডামণ্ডপের দাওয়ায় বসিল,—সেখানে একখানি খালি চৌকি ছিল।

"ওরে বসন্ত! নিবু এসেছে, এক ক'ল্‌কে তামাক সেজে দিয়ে যা ত!"

নিবারণ কহিল, "না, থাক এখন শরৎ দা তামাক আর দরকার নেই।"

"দরকার নেই কেন রে? জানিস না তামাকবাহিকা ধুমাবতী হুক্কা হ'চ্চে যে সর্ব্বদুঃখহারিকা। খা—খা—মনের ভার‌টা হাল্কা হ'য়ে যাবে এখন। নইলে মনের কথা গুছিয়ে ব'লতে পার্‌বি কেন? দুটো সদুপদেশ যদি দিতেই পারি, তাইবা ধারণ ক'রে নিতে পার্‌বি কেন?"

বসন্ত তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকা নিবারণের কাছে ধরিল। নিবারণ কহিল, "দূর বেয়াদব! আগে শরৎদাকে দিতে হয়, উনি যে বড়।"

শরৎ কহিল, "গুরজ যে তোর বড়। তুইই খানা আগে।"

"না-না, তুমি দাদা প্রসাদ নিতেই হয়, দিতে হয় না। আগে টেনে দেও তুমি।"

শরৎ হুঁকা নিয়া গোটা দুই টান দিয়া নিবারণের হাতে দিল। নিবারণ তামাক খাইতে আরম্ভ করিল—শরৎ বলিতে লাগিল, "সাধে কি তামাক ধ'রেছি, বহু ক্লেশ দুঃখ দুশ্চিন্তা খুব র'য়েছে—তবু বেশ একটু ফুর্ত্তি ওতে পাই। পাঁচজন নিন্দে করে—বলে একেবারে হুঁকোটাই ধর্‌লে, সিগারেট খেলে ত পারত? সভ্যতার কায়দায় ওটা ভাল বটে, তবে আসল কাজে হুঁকোর কাছে কিছু নয়। আর খরচও বিস্তর। অত পয়সা কোথায়?"

নিবারণের হইলে শরৎ হুকাটি নিয়া একটান দিয়া বলিল "হাঁ কি হ'য়েছে, এখন ব'ল্‌ত শুনি,—যা বসন্ত, তুই এখন ওদিকে যা।"

বসন্ত চলিয়া গেল।

নিবারণ বড় গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কহিল "আজ মনে বড় শক্ত একটা আঘাত পেয়েছি শরৎ দা। আস্ত আহাম্মক আমি, আগে ভাবিনি, চেষ্টাও কিছু করিনি, করব এমন ভাবও কিছু দেখাইনি, এ আঘাত আমার সেই আহম্মুকীর শাস্তি। কিন্তু—তবু মনে বড় শক্ত ব্যথাই পেয়েছি।"

"হুঁ—তা কি হ'য়েছিল। খরচপত্তর নেই, মা বুঝি গাল দিয়েছেন?"

নিবারণের চক্ষে জল আসিল কহিল, "না শরৎ দা,—তা হ'লে এত দুঃখ পেতাম না। দাদা আজ মাকে পাঁচ টাকা মোটে খরচ পাঠিয়েছেন—শুন্‌লাম ঐ টাকা ছাড়া আমার আর আমার স্ত্রীপুত্রের আশু উদরান্নের আর উপায় নাই—"

নিবারণের কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষের অশ্রু সে সম্বরণ করিতে পারিল না।

শরৎ কহিল, "ও কিরে পাগল হ'লি নাকি নিবু? কাঁদ্‌ছিস্! ব্যাটাছেলে হাজার দুঃখ হ'লেও কাঁদ্‌তে আছে? ওরে আমি যে এতবড় একটা হতভাগা আমিও ত কখনও চোখের জল ফেলিনি রে!"

নিবারণ কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "ক্লেশ দুঃখ অনেক পেয়েছ, কিন্তু এত অপমানী কি কখনও হ'য়েছ শরৎ দা।"

"আরে রামঃ রামঃ। অপমান! বলিস্ কি নিবু?—নিজের ঘরে এই একটু খানি অপমান,—এটা আর বেশী

কি? ওরে পনের টাকার মাইনের মাষ্টারীর জন্যে কত উমেদারী ক'রেছি—বাড়ী বাড়ী ঘুরে কত খোসামোদ ক'রে একটু সুপারিস পাইনি, চোক্‌তুলেও কতজনে চায়নি—দাঁড়িয়ে রয়েছি বস্‌তেও বলেনি, টুইসনী চাইতে গিয়েছি, ছেলে পড়িয়ে পরীক্ষে দিতে হ'য়েছে, আমার বিদ্যে কতটুকু-ছোট ছেলেদের ইংরেজি শেখাতে যোগ বিয়োগ করাতে জানি কিনা—ওরে কত ব'লব বল। তারপর সেই চাকরী—আরে ছ্যা-ছ্যা চাকরী ক'রে, যা খেটে যা স'য়ে যা পাই, ওরে কুলী মুজুর কিষেণরাও যে কম খেটে কম অপমানে তার চেয়ে বেশী রোজগার করে।"

নিবারণ ধীরে ধীরে কহিল, "ন'কাকার কাছে পাঁচটাকা খরচ মার জন্যে এসেছে; মা বড় কাঁদছিলেন। আমারও শুনে বড় লজ্জা হয়েছিল। তা ন'কাকা বড় গাল দিলেন, বল্লেন ঐ টাকা ছাড়া আর যে সম্বল নাই, যা দিয়ে মা আমাদের খাওয়াতে পারেন!" বড় গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস নিবারণ ত্যাগ করিল।

শরৎ কহিল "হুঁ! তাই বুঝি মনে বড্ড লেগেছে, আর অম্‌নি পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছিস্! তা মন্দ হয় নি, মনে ঘা লেগেছে—কাজকর্ম্মে একটু গা এখন হবে। আগেথেকে হিসেব ক'রে বুঝে ত তুই চল্‌বিনি—এই রকম দুই একটা ঘা-ই তোর দরকার। তা বেশ হয়েছে, এখন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা একটা দেখ্। নইলে সত্যিই চ'ল্‌বে কি করে? গাঙ্গুলী মশাই ঠিকই ত বলেছেন।"

নিবারণ কহিল "কিন্তু কি ক'রব শরৎ দা বল্‌তে পার? এসব দিকে তুমি ভুগেছও অনেক শিখেছও অনেক। তাই তোমায় দেখে হঠাৎ মনে হ'ল, তোমার সঙ্গেই পরামর্শ ক'রে যাহয় 'একটা পথ স্থির ক'রব।"

শরৎ উত্তর করিল, "ভুগে যা শিখেছি তাতে এক পরামর্শ এই যে কোনও সহরে যদি চাকরী খুঁজতে যাও,তবে পথ মস্ত—কিন্তু একটা গোলাকার শূন্যি ছাড়া আর কিছু মিলবে না। সেকি যেমন তেমন শূন্যি—একেবারে 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'।"

নিবারণ একটু হাসিল,—কহিল, "তা ত হবেই। ভদ্রলোকের মত চাকরী ক'ত্তে পারি, এমন লেখা পড়া যে কিছু শিখি নি।"

"আমরা ত সামান্য কিছু শিখেছি,—তা চাক্‌রীটা যা ক'চ্ছি—নামে ভদ্দর হ'লেও অর্থে আর মানে অতি অভদ্দর! অভদ্দরাদপি অভদ্দর—তস্মাদপি অভদ্দর! নিবু, তুই কি সত্যিই ভেবেছিস চাকরী ক'ত্তে বাইরে কোথাও যাবি?"

"ক'ত্তে ত কিছু হবে। বাড়ীতে ব'সে থাক্‌লে কি চ'ল্‌বে?"

"না, তাও চ'ল্‌বে না। কিন্তু বাইরে গিয়েও কি চাক্‌রী মিল্‌বে? উকিল মোক্তারের মুহুরী কি দোকানদারের চাকরী, হদ্দ এই। তা বেণা বোসের মত উকিল পেলে ত আম্বকে ঘোষালের মত মহুরী কেউ হ'তে পারে? আম্বকে ঘোষাল, কেউ কোথাও ম'রে যদি পদ খালিও করে তবে মুহুরী গিন্নের পাকা আর কেউ, আম্বকে ঘোষাল ছাড়া সে খালি যায়গা কি দখল ক'ত্তে পারে? তা কাঁচা কি পাকা যেমনই হ'ক, মুহুরী বিদ্যে মা সরস্বতী তোকে দেবেন না।"

"কোন্ বিদ্যেই বা দিয়েছেন তিনি। আর ওটা চাইও না শরৎ দা।—তবে দোকানে টোকানে কোনও কাজ যদি পাওয়া যায়—খাটতে খাটতেও খুব পারি'—

"বিস্তর ঘোরাঘুরি ক'রে—জামিন যদি না চায়—পেতেও হয়ত পার। কিন্তু তাতে কি পোষাবে? সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত খাটিয়ে হয়ত মাসে মোটে পনেরটি টাকা মাইনে দেবে।—তা নিজে পেটে খাবে না বাড়াতে পাঠাবে?"

নিবারণ নীরবে একটি নিশ্বাস. ছাড়িল। শরৎ কহিল, "লেখা পড়া বেশী না শিখ্‌লে চাকরীতে কিছু সুবিধে কারও হয় না। নিজের পেটটা কোনও রকমে চ'ল্লেও পরিবার তার আয়ে কেউ প্রতিপালন ক'ত্তে পারে না। তাদের পক্ষে কোনও ব্যবসা ট্যাবসার মধ্যে ঢোকাই সব চেয়ে সুবিধে।"

"মূলধন কোথায় পাব দাদা যে ব্যবসা ক'র্‌ব?—ঘরে যে আমার আজকার খাবারটা পর্য্যন্ত নেই। ঘাড়ে আবার স্ত্রী পুত্রের ভার র'য়েছে।"

"ঐটিই, হ'চ্চে সবচেয়ে শক্ত কথা নিবু।—বিয়ে হ'য়ে যখন বৌটি ঘরে আসে, মনে হয় বাঃ! কেয়া মজা! ক্যায়সা ফূর্ত্তি! কিন্তু 'প্রবল বন্যের মত যখন পুত্তুর কন্যে' আস্‌তে

থাকে, আর তাদের মুখে অন্নের গ্রাস জুটিয়ে দিতে হয়, তখনই রক্তটা বিষে গাঁজিয়ে ওঠে। ফ্যাসাদেও প'ড়েছি তাই নিয়েই। নইলে কেবল নিজের ভাবনায় কে ম'ত্ত। মাবাপ যারা এইগুলো হিসেব না ক'রে ছেলের বিয়ে দেয়, ছেলের উচিত হ'চ্চে তাদের নামে শেষে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করা।"

"দাবীর টাকা আদায় হবে ত ?"

"চুলোয় যাক্ ! আমাদের যা হবার তা হ'য়েছে।—এখন ছেলেপিলে গুলো যা হ'চ্চে—তাদের বেলায় এইটুকু হিসেব ক'রে চ'ল্‌তে পারিত ঢের।"

"সে সব ভাবনার ঢের দেরী আছে এখন শরৎ দা। আপাততঃ এই ভাবনাই যে ভাব্‌তে হচ্চে।"

"ভেবে যে কুল পাওয়া যায় না। নিবু! ব্যবসা মূলধনছাড়া হয় না—কিন্তু মূলধন নেই। যার মূলধন নেই, তাকে পরের কাজে খাট্‌তে হয়। সেই পরের কাজই বা কোথায় ? সামান্য কিছু টাকা হ'লে কল্‌কেতায় আজকাল অনেক ছোটখাট ব্যবসা লোকে ক'ত্তে পারে, ক'চ্চেও বটে। কিন্তু অন্ততঃ দুচার বছর কষ্টে সৃষ্টে কোনও মতে নিজের দুটি পেটেখেয়ে তা চালাতে হয়। তবে সে শেষে সুবিধে হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আজই যার পরিবারকে খাওয়াতে হবে সে তা পারে না।—"

"তাহ'লে—বল কি শরৎ দা, আমার কি কোনও উপায়ই নাই ?—কিছুই কি আম কত্তে পারি না ?"

"পার এক কুলি মজুরী—যাতে মূলধন লাগে না,—গতরে খাট্‌তে পাল্লেই রোজ দশ আনা বার আনা—এমন কি পাঁচসিকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত রোজগার হ'তে পারে।"

নিবারণ একটি নিশ্বাস ছাড়িল। শরৎ কহিল "মনে কি ব্যথা পেলি নিবু। তোকে তুচ্ছ ক'রে ও কথা বলি নি, তবে দিনকাল বড় শক্তই পড়েছে; চাকরী মেলাইত দায়। আর মিল্লেও আমাদের মত ভদ্রলোকের ছেলেরা চাকরীতে যা রোজগার করে কুলীমজুররাও তার চাইতে বেশীছাড়া কম রোজগার করে না আরও তারা স্বাধীন তেজী। নোংরা নেংটি পরা হলেও মানষের মত তারা চ'লে ফেরে, বুকে কথা বলে, আর আমরা দাসানুদাস—অতি হীন একেবারে মাটির কেঁচো! এক একবার মনে হয়—ধুত্তোর! এ হতভাগা চাকরী ছেড়ে দিয়ে কোথাও কুলি মজুরীই করি গে। মাথায়ই খাট আর হাতে পায়ই খাট, মান যাতে যার বেশী সেইটেই তার পক্ষে ভাল।"

নিবারণ কহিল "বুঝেছি শরৎ দা—বাইরে গিয়ে সুবিধে আমার কিছু হবে না,—সত্যিই যা ব'ল্লে এক কুলি মজুরী ছাড়া। যদি জমাজমি কিছু থাক্‌ত—কি জোগাড় কত্তেও পাত্তাম, তবে দেশে থেকেই চাষবাস ক'ত্তাম।"

"তা যদি পারিস্ নিবু সবচেয়ে ভাল হয়। সুবিধে ত কিছু হবেই না, হ'লেও তুই যে গাঁ ছেড়ে দূরে কোথাও চ'লে যাবি, এটা—মোটেই সুবিধের কথা হবে না। এ গাঁয়ের প্রাণ তুই, গাঁয়ে তুই থাকলে মড়া গাঁও হয়ত আবার তাজা হ'য়ে উঠ্‌বে। তবে গাঁয়ে থাক্‌তে হ'লে গাঁয়ে থেকেই খাওয়া পরাটা জোটে এমন একটা কাজ কর্ম্ম কিছু চাই। এক চাষবাস ছাড়া সত্যি আর কোনও কাজকর্ম্ম নেই, গাঁয়ে থেকে যা লোকে ক'ত্তে পারে। এই যে আজ কাল এক ধুয়ো উঠেছে—সব কাগজে লেখা লেখি হচ্চে পল্লীগ্রাম ছারে খারে গেল, বাঙ্গালী সব সহর ছেড়ে পল্লীমুখো হও, পল্লীগ্রাম রক্ষা কর, নইলে জাতীয় জীবন—জাতীয় সমাজ কিছু থাক্‌বে না। এই রকম কত কথাই পড়ি। কিন্তু সহর ছেড়ে পল্লীমুখো কি ক'রে যে লোকে হবে তার পথ কোনও ব্যাটা বলে না। আরে পল্লীমুখো যে হবে মুখের অন্ন সেখানে কোথায় ? জমাজমি ক্ষেত খামার বাগবাগিচে ক'রে দশটা গৃহস্থ যেখানে মোটাভাত কাপড়েও থাক্‌তে পারে সেইখেনেই পল্লীমুখো লোকে হ'তে পারে। নইলে কাজ ক'ত্তে গাঁ ছেড়ে সহর বাজারে যে যেতেই হবে। দিনকাল যে বদ্‌লেগেছে। আগে যে লোক গাঁয়ে থাক্‌ত, কাজকর্ম্ম না ক'রেও অনেকের চ'লত, কাজেই থাক্‌ত। এখন যে চলে না। কি ক'রে থাক্‌বে ?"

নিবারণ কহিল, "গাঁয়ে থাকতে পাল্লে কি আর বাইরে যেতে চাই শরৎ দা, আমি গাঁয়ের প্রাণ এটা বড় বাড়াবাড়ী কথা তবে আমার প্রাণ যে এই গাঁ এটা ঠিক। এত দিন পারিনি, মা কত বলেছেন, তবু বেরোত্তে পারিনি, গাঁ ছেড়ে কোথাও যাবার কথা মনে হলেই প্রাণটা একেবারে কেঁদে উঠত।"

শরৎ কহিল, "সে কান্নাটা তবে এখনও চেপে দিস্ নে নিবু, বাইরে গিয়ে সুবিধে কিছু হবে না। গাঁয়ে থেকেই যাতে চাষ-

বাস করে খেতে পারিস, তারি চেষ্টা দেখ। তোরও ভাল হবে, গাঁয়েরও ভাল হবে।"

নিবারণ কহিল, "বাড়ীতে যে জমি আমার ভাগে আছে, তাতে খেটেপিটে বাগান কল্লে সামান্য কিছু সুবিধে হ'তে পারে। কিন্তু আর জমি কোথায় পাই? কিনব এমন টাকাও ত নেই।"

শরৎ কহিল, "এক কাজ করা যেতে পারে। আমাদের কিছু প'ড়ো জমি আছে—গাঁয়ের বাইরে—নদীর বাগটার ওধারেই। সাধুমণ্ডলের কাছে জমা ছিল—সে ত আজ এই দশ বার বচ্ছর হ'ল সব ছেড়েছুড়ে ভেক নিয়ে নবদ্বীপে গেছে। আর নতুন বন্দোবস্ত কিছু হয়ে ওঠেনি। ৮।১০ বিঘের কম হবে না। ওর লগ্গই তারিণী চাটুর্য্যের আরও ১০।১২ বিঘে জমি আছে।

এই ত কমাস হ'ল নিলেমে তিনি কিনেছেন। বন্দোবস্ত কিছু হয় নি—সেটাও পাওয়া যেতে পারে। খাজনা যা নেন নেবেন, ধ'রে পড়া যাবে—সেলামী কিছু পাবেন না—না হয় জমির উপসত্ত্ব থেকে পরেই দেওয়া যাবে।"

নিবারণ বলিয়া উঠিল, "আরে তা যদি পাওয়া যায় শরৎ দা, তবে ত বেশ হয়।"

"কেন পাওয়া যাবে না! পেতেই যে হবে। নইলে চ'লবে কেন? হাঁ, জানিস ত আমার কিছু পাগলাধাত, মাথায় যদি খেয়াল চাপল তবে একেবারে তা আমাকে পেয়ে বসে। এক কাজ করা যাক। আমারও চাকরীতে আর মন নেই, যাই ভাবি, ভবিষ্যতে ওকালতীতে সুবিধে কিছু হবে না। এই জমি নিয়ে দুজনে ফল তরকারীর বাগান আরম্ভ করে দিই। আঁধা খাদা ডোবা ডাবি যা আছে, ক্রমে তা জুড়ে টুড়ে গোটা দুই পুকুর ক'ত্তে পারলে মাছও বেশ হবে। শ্যামগঞ্জের বাজারে বড় হাট বসে—ষ্টীমারের একটা ষ্টেসনও আছে। মাল যা জন্মাতে পারি, আর কিনে যোগাড় কত্তে পারি, বড় বড় বাজারে চালান দেবার বন্দোবস্ত করব। বস! এই বেশ হবে। আয় তবে লেগে যাই দুজনে, কি বলিস্?"

নিবারণ উত্তর করিল, তুমিও যদি লাগ শরৎদা, দু'জনে মিলে খেটে খুটে কিছু ক'ত্তে পারা যায় কি? কিন্তু তাতেও ত গোড়াতে টাকা লাগবে। সে টাকা কোথায়? আর আমার যে আজ থেকেই সংসারের খরচ চালাতে হবে।"

"হুঁ", বেড়ালের গলায় ঘণ্টা না বাঁধতে পাল্লে—ইন্দুরের সব পরামর্শই মিথ্যে। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধতে হবে। কিছু টাকার যোগাড়—না হয় বসত বাড়ী আর সেই জমি বাঁধা রেখেই করা যাবে। তুইও তাই কর না, ছমাসে কিছু উৎপত্তি হবে, এর মধ্যে কিছু কিছু কাঁচা মালও যোগাড় ক'রে শ্যামগঞ্জের হাটে পাঠানের চেষ্টা করা যাবে। শতখানেক টাকা হ'লে ছমাস তোর চল্‌বে ত?"

"তা খুব চল্‌বে।"

"আমিও বোধ হয় তাতেই চালাতে পারব। তার পর প্রায় বিঘে কুড়িক জমি যদি হাতে নিয়ে বস্‌তে পারি আর কাজ কিছু দেখাতে পারি, টাকার যোগাড় হবে।—গাঁয়ে না হ'ক, সহরে এমন লোক আছে, যারা এই সব কাজে কর্ম্মে টাকা দাদন দেয়—যদি দেখান যায় লোকসান হবে না, আর সত্যিই এমন একটা ভাল কাজ হচ্চে, যা থেকে পাড়া গাঁয়ের উন্নতির সূত্রপাৎ কিছু হতে পারে, আর গরীব ভদ্রলোকের ছেলেদের জীবিকার নূতন পথের নমুনা একটা দেখান যেতে পারে। দেশের আর দশের ভাল চায়, এমন লোক যে নেই তা নয়। তবে গাঁর জন্যে বাজে হুজুগে টাকা ফেল্‌তে অনেকে চায় না। আমরা যদি কাজের মত একটা কাজ দেখাতে পারি, টাকা পাব। তবে গোড়াতে যা ক'ত্তে হবে, নিজেদেরই কত্তে হবে, তা হ'লে 'শুভস্য শীঘ্রং' চল্ এক্ষুণি, তারিণী বাড়ুয্যেদের বাড়ীতে যাই। হাঁ কিছু মনে করিস্‌নে নিবু—তুই আর আমি এখন ভাই ভাই। টাকাকড়ির পাকা ব্যবস্থা যদ্দিন না হয়, খরচ পত্তরে ঠেক্‌লে কিছু নিস্ আমার ঠেয়ে। হাতে যা আছে, দুজনেরই কিছুদিন চ'লে যাবে এক রকম ক'রে। এখন কিছু দেব?"

নিবারণ কহিল, "এখন—থাক্ বরং। মার হাতে কিছু আছে কি না, জানি না। না থাকে, চেয়ে নেব। না শরৎদা; কোনও লজ্জা করব না তোমার কাছে। আজ থেকে তুমিই আমার সত্যিকার দাদা।"

বলিতে বলিতে নিবারণের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। শরৎ বাহু বিস্তার করিয়া আবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

(২৬)

কিছু দুর্ব্বল চিত্ত হইলেও তারিণী বাড়ুয্যে লোক ভাল

ছিলেন। প্রাণটা উদার ছিল, নিবারণের প্রতি আন্তরিক একটা স্নেহও তিনি অনুভব করিতেন। যদিও পেন্সন নিয়া এখন তিনি বাড়ীতে আছেন ফল তরকারীর একটা বাগান করিতে পারিলে আয় কিছু হইবে, আবার কর্ম্মেরও একটা উপলক্ষ পাইবেন, তাই সেই জমি তিনি নীলামে খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিবারণ ও শরতের প্রস্তাবে তিনি তাহা ছাড়িয়া দিতে সহজেই সম্মত হইলেন। কহিলেন, ভাল পরামর্শই তোমরা করেছ। একটু বুঝে শুনে চ'ল্‌তে পাল্লে আখেরে এতে ভাল হবে। ভাল ভাল মুরব্বি কেউ না থাক্‌লে, চাকরী বাকরীর চেষ্টা আজ কাল মিছে। তা বেশ ত, আমার জমি আমি ছেড়ে দিচ্চি। থাজনাটাজনা কিছু দিতে হবে না। কেবল যে দামটা দিয়ে আমি কিনেছি সেই দামটা—তা এক্ষুণি দিতে হবে না—এই ধর—বছর পাঁচেকের মধ্যে কি আমায় দিয়ে দিতে পারবে না ?"

নিবারণ কহিল, "তা পারব বই কি মামা ? অত দিন লাগ্‌বেও না বোধ হয়। দু'তিন বছরের মধ্যেই হয় ত দিতে পার্‌ব। আপনাদের আশীর্ব্বাদে কাজ যদি তেমন ক'ত্তে পারি, এর মধ্যেই জমি থেকে বোধ হয়, আয় বেশ হবে।"

তারিণী বাড়ুয্যে কহিলেন "তা পার ভাল কথা,—না পার ঐ পাঁচ বছরেই দেবে। লেখাপড়ায় মেয়াদটা ওই থাক্‌বে, না হয় কিছু বাড়িয়ে দেওয়াও যেতে পারে। হাঁ, এক কাজ করগে। কি জান ভবিষ্যতে কোনও গোল না হয়, আগে থেকেই সেটা ভেবে কাজ করা ভাল। আমার এই জমি গে নিবারণ নেও, আর শরতের জমি শরতেরই থাক। কাজ কম্ম তোমরা এক সঙ্গেই কর গে, তাতে ভাল হবে। কিন্তু জমি দু'ভাগ দুজনেরই থাক মাপ জোক ক'রে চৌহদ্দিটাও ঠিক রেখো। প্রায় সমানই হবে—কিছু এসে যাবে না তাতে ? কি বল শরৎ ? সেইটেই ভাল হবে না ?"

শরৎ উত্তর করিল "তা বেশ ত। আপনি যা বলছেন, তাই করা যাক। কে জানে, কখন মনে কি গোল সেঁধোবে আর দুজনে কামড়া কামড়ি ক'রে মরব,—সব মাটি হবে শেষে। তার চাইতে এই ভাল। জমি যার যার আলাদাই থাক— মনের মিল আছে, মিলেমিশেই এখন কাজ করি। অমিল যদি কখনও হয়, কাজের মিলটা সহজেই ভেঙ্গে আলাদা ক'রে ফেলা যাবে।"

তারিণী বাড়ুয্যে কহিলেন, "আচ্ছা তবে মুসোবিদে একটা ক'রে ফেলি—এই ধর দু'চার দিনের মধ্যেই পাকা দলিল ক'রে জমি তোমার হাতে দিয়ে দি। হাঁ, তোমার মাকে বলেছ নিবু ?"

"মা আপত্তি কর্‌বেন না।"

"তা, কর্‌বেন না বটে তবু তাঁকে ব'ল্‌তে ত হয়। যাই যখন কর, তাঁর বুদ্ধি নিয়ে ক'রো। তাহ'লে ঠক্‌বেনা কিছুতে।"

"হাঁ, এক্ষুনি গিয়ে তাঁকে সব ব'লব।"

"হাঁ, আর একটা কথা। বাড়ীটা ভাগ ক'রে নিতে হ'বে। আপনি উপস্থিত থেকে ন কাকা ওঁদের সাম্‌নে তার একটা ব্যবস্থা আজকালই ক'রে দিলে ভাল হয়।"

"এর জন্য এত ব্যস্ত হ'লে কেন বাবাজি ? যাদব ত বাড়ীতে থাকে না আর সে চাচ্ছেও না—চেয়েই বা কি ক'র্‌বে ? মিছে কেন অতটা যায়গা আলাদা ক'রে ফেলে রাখ্‌বে ?"

"রাখাই ভাল মামা"—ভবিষ্যতে আর এ সব নিয়ে কোনও কথা না হয়, খোঁটা না শুন্‌তে হয়, সেইটে আমি চাই।"

"আচ্ছা তোমার মা কি বলেন দেখ, তারপর যা হয় করা যাবে। এত ব্যস্ত কি ?"

শরৎ কহিল, "তাহ'লে ওঠা যাক আজকে বাড়ুয্যে মশাই। নিবু ও যেমন—বাড়ীর ভাগ বাটরার জন্যে আজই কি এমন তাড়া প'ড়ে গেছে। না হয়, মা ত দুজনেরই মা—তিনি না হয় যাদব বাবুর ভাগে থাক্‌বেন, তাঁর যায়গায় শাক পাতা লাউ কুমড়ো রুয়ে খাবেন। পাঁচ টাকার বেশী মাশোরা না দেন, এটা ত আর বারণ ক'ত্তে পার্‌বেন না ? ওঠ্‌—এখন চল্‌,—বেলা বড় কম হয় নি—ওই যে হরি ঘোষাল বাজার ক'রে বাড়ীতে ফির্‌ছে। ইস্‌! কটমট্ ক'রে চাইছে দেখ না, ভাব্‌ছে নিবে ব্যাটাকে খুব জব্দ ক'রেছি। হা—হা—হা ?"

নিবারণও হাসিয়া উঠিল। প্রবীণ বাড়ুয্যে মহাশয়ও মুখ বাড়াইয়া ঘোষালের দিকে একবার সহাস্য দৃষ্টিপাত করিলেন।

হরি ঘোষালের রাগ হইল। হারামজাদারা নিশ্চয়ই তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তিনি একটু থামিয়া দাঁড়া-

ইলেন। তারপরেই একেবারে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

"কি হে তোমরা হাস্‌ছ যে বড় বাড়ুয্যে? আমাকে কি পাগল পেয়েছ?"

"মহাভারত! বল কি ঘোষাল। তোমাকে কেন পাগল পাব! আমরা"—শরৎ বলিয়া উঠিল, "আমরা ত পাগল পাইনি, আপনাকেই পাগলামোতে পেয়েছে। নইলে আমরা হাস্‌ছি, কেন হাসবনা? আপনি ছাড়া কি হাসবার আর কিছু নেই পৃথিবাতে? আপনি অমনি তেড়ে মেড়ে ছুটে এলেন কেন? আপনি যে পথে যাবেন সে পথের ধারে কাছেও কি কেউ হাস্‌তে পাবে না? আপনি ত আর সং সেজে বেরোন নি?"

"কি! এত বড় কথা, আমি সং! শুন্‌লে হে বাড়ুয্যে, শুন্‌লে!"

"হাঁ, তা শুন্‌লেন বই কি।"

"ওই শরতা বাঁদর—ব্যাটাচ্ছেলে আমায় বলে কিনা সং! আর তুমি তাই চুপক'রে ব'সে শুনছ! ওই নিবে হতভাগা হাস্‌ছে। ছোঁড়ারা পথে ঘাটে আমার অপমান ক'রবে! কেমন পঞ্চায়েতী করহে তুমি—এর বিচার কর্‌বে না?"

"আরে কি জ্বালা হলরে?—কথায় কথায় এত ক্ষেপ কেন ঘোষাল?—সং কেন তোমায় ব'ল্‌বে?—এস এস, ব'স, তামাক খাও। ওরে গোবিন্দ, এক কল্কে তামাক দিয়ে যারে।"

তামাকের নামে হরি ঘোষাল কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, হাতের মাছ তরকারী প্রভৃতি ক্রীত দ্রব্যাদি বারান্দায় রাখিয়া, উঠিয়া বসিলেন।—শরৎ ও নিবারণ একটুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

"আর কালের কপালেও একেবারে আগুন লেগেছে! ছোঁড়াগুলো সব একেবারে বেহদ্দ বাঁদর হ'য়ে উঠেছে গুরু লঘু মানবেনা, কাউকে গ্রাহ্যি ক'র্‌বেনা।—সারাটা গাঁ যেন মগের মুল্লুক ক'রে তুলেছে। তুমি বাড়ুয্যে পঞ্চায়েতী কর, কিসের পঞ্চায়েতী তোমার? ঠুটো জগন্নাথ হ'য়ে বসে আছ, আর ওরা সারাটা গাঁ নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে। কারও বাড়ী ঘর পুকুর বাগান আর তার নিজের বল্‌বার যো নেই। এ সব কিছু দেখ্‌বে না, পার কেবল টেক্সো নিতে?"

তারিণী বাড়ুয্যে একটু হাসিয়া কহিলেন, "তাই বা পারি কই? এই ত তুমি আজও পর্য্যন্ত দিলে না।"

"দেব কেন? কাজ কিছু ক'র্‌বেনা, কেন টেক্সো দেব?"

তারিণী বাড়ুয্যে একটু হাসিলেন। ঘোষাল তামাকে লম্বা একটা টান দিয়া কহিলেন, "এর চাইতে—ওরা ত যা খুসী তাই ক'চ্চে—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ওদেরই গাঁয়ের কর্ত্তা ক'রে দেও।"

"তা যদি হ'ত ঘোষাল, তবে আর ভাবনা ছিল কি? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ভাল বুঝত, এই সব ছোঁড়াদের দলের পাকা কমিটি ক'রে গাঁয়ের কাজগুলো ওদের হাতেই ছেড়ে দিত। কাজ যদি কিছু হয়—ত ওদের দিয়েই হবে। আমরা বুড়োরা একেবারেই কিছু নই।"

"তবেই হ'য়েছে! এই ক'র্‌বে নাকি? তাহ'লে আর গাঁয়ে গেরস্তালী ক'রে কেউ বাস্তব্য ক'রে থাকতে পার্‌বে না।"

"পারে ত তাতেই পার্‌বে, নইলে আর বেশী দিন পার্‌বে না। গাঁ, ত সব গেল।"

"হাঁ! তাইত বলি, সাধে ছোঁড়াদের আস্পর্দ্ধা এত বেড়ে গেছে। তুমিও আছ এর তলে তলে! কিন্তু সাবধান বাড়ুয্যে। এ সব হ'চ্চে—বে-আইনী; ভয়ে কেউ কথা বল্‌ছেনা। কিন্তু ভেবো না যে ম্যাজেষ্টের সাহেবের কাছে গিয়ে দুটো ইংরেজি বুলি কেবল তুমিই ঝাড়্‌তে পার। আরও ঢের লোক আছে, যারা গিয়ে মাজেষ্টর সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারে, একদল ছেলে ক্ষেপিয়ে তারিণী বাড়ুয্যে গাঁয়ে যত বে-আইনি জুলুম লোকের উপর ক'চ্চে। আর এই ছেলেগুলকে স্বদেশী বাইতে পেয়েছে! নইলে ভদ্দর লোকের ছেলেরা সব দলবেঁধে পুকুর সাফ, জঙ্গল সাফ করে?"

তারিণী বাড়ুয্যে একটু ভীত হইয়া কহিলেন, "না—না ঘোষাল বল কি? অমি এর তলে আছি? মহাভারত তাও কি হয়? ওদের ঠেকাতে কে পারে? এইত তুমি এত হাঙ্গামা কল্লে, কি হ'ল?"

"আর কিছু না হ'ক পালের গোদা নিবে হারামজাদা জব্দ হ'য়েছে। কি খায় এখন দেখ্‌ব। এখনই হ'য়েছে কি? গাঁ ছাড়া ক'রে ওকে ছাড়ব। দেখ্‌বে দেখ্‌বে; এখনই

ভাঙ্গ্‌ছেনা কিছু—ওই বাড়ীতে কেমন ক'রে থাকে তা দেখ্‌বে। ঘুঘু দেখেছেন বাছাধন ফাঁদ দেখেন নি। হাঁ?"

ঝাঁ করিয়া হরিঘোষাল উঠিয়া পড়িলেন। ক্রীত দ্রব্যাদি হাতে নিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে গেলেন—

তারিণী বাড়ুয্যে কিছু বিস্মিত ও শঙ্কিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। আবার কি চক্রান্ত ঘোষাল পাকা করিতেছে।

আরও কয়েক দিন গেল জমির পাকা বন্দোবস্ত হইল। জমির বন্ধকে প্রয়োজন মত টাকার যোগাড়ও হইল। সাধারণতঃ কিছু ঢিলা ও গাঁছাড়া হইলেও বড় কোনও আশায় উৎসাহে যদি শরৎ কোনও কাজে লাগিত, তার উদ্যমের অবধি থাকিত না। নিবারণ প্রথমে কিছু ভয়ে ভয়ে কাজে ব্রতী হইয়াছিল। কিন্তু শরতের জলন্ত উৎসাহের স্পর্শে তার সব কুণ্ঠা দূর হইল। উভয়ের অক্লান্ত উদ্যমে অল্প দিনের মধ্যেই আয়োজন সব হইল। শেষে এক শুভ দিনে সব ছেলের দল সঙ্গে নিয়া সমারোহে ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা দিয়া তাহারা তাহাদের সংকল্পিত কর্ম্মের সূত্রপাত করিল। কতখানি যায়গা ছেলেরা নিজেরাই লাঙ্গল ধরিয়া চষিল, বীজ ও চারা রোঁপণ করিল। সন্ধ্যায় মহা-সমারোহে হরির লুট হইল।

২৭

সর্ব্বানন্দ ভবানীকে ডাকিয়া কহিলেন, যাদব তাঁহার জন্য ১০ দশ টাকা খরচ পাঠাইয়াছে। ইহার কমে যে তাহার জননীর মাসিক খরচ চলিতে পারে না, ইহা তিনি যাদবকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাতেই যে যাদবের সুমতি হইয়াছে এরূপ একটু সগর্ব্ব আনন্দও প্রকাশ করিলেন। বাস্তবই হউক, আর কল্পিতই হউক, কোনও কার্য্যে নিজের একটু বাহাদুরী আছে, এরূপ মনে হইলে, সে তাহা প্রকাশ না করিয়া বড় থাকিতে পারে না। মানবচিত্তের ইহা একটি সাধারণ দুর্ব্বলতা, অতি অল্পলোকেই এই দুর্ব্বলতার উপরে উঠিতে পারেন। যাদব তাহার মাতাকে একখানা পত্রও এই সঙ্গে লিখিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ সেই পত্র ভবানীকে পড়িয়া শুনাইলেন, মাতার নিকটে সে অতি সশ্রদ্ধ ও বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, মাসে সে দশ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইবে। ব্রত পূজাদির জন্য অতিরিক্ত যখন যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাও লিখিলে পাঠাইয়া দিবে। জননী যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে ও মনের শান্তিতে থাকিতে পারেন, তার জন্য যত্নের ত্রুটি সে কখনও করিবে না। বাড়ীতে থাকিয়া কোনওরূপ অসুবিধা হইলে তিনি সহরেই তাহার বাসায় থাকিতে পারেন—তাহাতে সে বিশেষ সুখী হইবে। অথবা ইচ্ছা হইলে তিনি কাশীতে গিয়াও বাস করিতে পারেন। কোনও অসুবিধা না হয়, নিশ্চিন্ত শান্তিতে গঙ্গাস্নান দেবালয় দর্শন, দেব পূজা ব্রত প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান ইচ্ছামত করিতে পারেন, তার সকল বন্দোবস্ত সে করিয়া দিবে।

ভবানীর চক্ষে জল আসিল, স্নেহবিগলিত হৃদয় হইতে সকল অসন্তোষের কঠোরতা মুহূর্ত্তে দূর হইল। অশ্রু মুছিতে মুছিতে তিনি কহিলেন, "আহা বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, লক্ষীশ্বর হ'য়ে সুখে থাক্! তাইত বলি ঠাকুরপো, যাদব কি আমার তেমনি ছেলে, তবে বউ নাকি সুবুদ্ধি দেয় না, তাই যা একটু ভুল চুক করে! তা যাব যাব বই কি, লিখে দেও, এই পূজোর পরে ওখানে গিয়ে কদিন থাকব, নিবুকে এই অবস্থায় ফেলে একেবারে ত কোথাও যেতে পাচ্ছিনে এখন। তা তার একটু কিছু সুবিধে হোক্—সংসারে আর কি কাজ আমার,—তখন সব ছেড়ে ছুড়ে একেবারে কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে পড়ে থাকব। আহা! কবে যে বাবার দয়া হবে।"

"তা হবে, হবে,—হবে বই কি বৌঠাকরুণ! বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় তোমার যদি কাশী প্রাপ্তি না হয়, তবে আর কার হবে। তা এখনও ত সময় হয়নি—সংসারের কাজও ফুরোয় নি। নিবুর একটা স্থিতি নিবৃত্তি হক্, তার পর কাশী যাবে। দু'ভাই ওরা বেঁচে থাক. ভাবনা কি। সব বাসনা তোমার পূর্ণ হবে।"

শিবুর মা দ্বারের পাশ হইতে প্রফুল্লিত স্মিতমুখে কহিলেন, "কেমন, দেখ্‌লে দিদি, আমি বলি নি, তোমার ও টাকা ফেরত পাঠায়ে দেওয়া হোক তা হইলেই দশ টাকা ক'রে যাদব দেবে। তা আমাদের কথা ত কাণে তোলা হয় না।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "বিলক্ষণ! কথা কাণে তুলি না! শুন্ গো বৌঠাকরুণ?" কথা ত কাণেই তুলেছিলাম—"

"ঐ একটু কথা দিদির ভাগ্যিতে তোলা হ'য়েছিল? নইলে আর হয় কই? হ'লে কি আর দুঃখু ছিল?".

ভবানী উত্তর করিলেন "এ তুমি ভাই অন্যায় কথা ব'লছ, ঠাকুর পো কি তোমার কথা ঠেলে কখনও চলেন? সুবুদ্ধি দিলে কে তা চলে! তা হ'লে উঠি আজকে ঠাকুর পো। ওবেলা আস্‌ব। আমার জবানীতে একটা চিঠি যাদবকে লিখে দেবে। কি জান আমারা ত দুজনেই সমান, নিবুও বড় গোঁয়ার। সেদিন যে ভাবে কথাগুলো ব'লে ছিল সেটাও তার মোটে ভাল হয়নি। আমার কোনও কথা কি শোনে! রেগে গেলে তাকে থামাতে পারি, এমন ক্ষ্যামতা আমার বাপেরও নেই।"

টাকা কয়টি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া নিয়া ভবানী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

"কিরে নিবু? ও কার চিঠি এয়েছে।"

নিবারণ একখানি পত্র হাতে করিয়া বারান্দায় বসিয়াছিল মুখ যারপরনাই অপ্রসন্ন, ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল, মাতার প্রশ্নে নিবারণ উত্তর করিল "দাদার এই চিঠি এসেছে।"

"কি লিখেছে, পড় না শুনি।" নিবারণ পত্র পড়িয়া শুনাইল। যাদব লিখিয়াছে, যখন স্বেচ্ছায় পৃথক হইয়াছে, তার সম্পত্তিতে নিবারণের কোনই অধিকার নাই। সকল স্নেহ ও উপকার বিস্মৃত হইয়া অকৃতজ্ঞ নিবারণ তাহাকে যেরূপ তামাসা করিয়াছে, তাহাতে পৈতৃক বাসগৃহে তাহার অর্দ্ধাংশ যে নিবারণ ব্যবহার করিবে, ইহা একেবারেই তাহার ইচ্ছা নয়। প্রতিবেশী কাহারও হাতে রাখিলে হয় ত ইহার অন্যথা হইতে পারে, তাই শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষাল মহাশয়ের হাতেই সে তার সেই অর্দ্ধাংশ বসতবাটীর রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিয়াছে। নিবারণ ইচ্ছা করিলে প্রতিবেশীদের ডাকিয়া তাহাদের সমক্ষে বাড়ী ভাগ করিয়া নিতে পারে, কিন্তু ভাগ হইলে পরে তার অংশ সে যেন নির্ব্বিবাদে তার প্রতিনিধি ঘোষাল মহাশয়ের হাতে ছাড়িয়া দেয়। লোকে হয় ত বলিবে, নিবারণকে লাঞ্ছিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে এরূপ করিতেছে। যাহা হউক, যে অপরাধ নিবারণ করিয়াছে, তার জন্য অনুতপ্ত হইয়া কনিষ্ঠের ন্যায় জ্যেষ্ঠের বশ্যতা যদি সে স্বীকার করে, তবে যাদব তাহাকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছে, ইত্যাদি।

বড়ই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া ভবানী গৃহে আসিয়াছিলেন। পত্র শুনিয়া তাঁহার মনটা একেবারে দমিয়া গেল। যাদব সর্ব্বানন্দের কাছে যে পত্র লিখিয়াছে সে ত তবে কেবল ছল! মাকে মিষ্ট কথায় আর টাকার লোভে ভুলাইয়া রাখিয়া ভাইকে জব্দ করিতে চায়! লোককে দেখাইতে চায়, আসলে সে মন্দ নয়, মাকে রাখিতে সে প্রস্তুত। কেবল অবাধ্যতার জন্য নিবারণকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যেই এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। মাগো! ফন্দী দেখ না! সব ঐ কুলোকের সন্তান বজ্জাত বউটার চাল! কি সর্ব্বনাশিনী কালনাগিনীই, কর্ত্তা ঘরে আনিয়াছিলেন! সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার জ্বলিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল আঁচলে বাঁধা টাকা কয়টি তিনি খুলিয়া উঠানে দূর করিয়া ফেলিয়া দেন। হতভাগা টাকার লোভে তাঁহাকে ভুলাইতে চায়, ভুলাইয়া বাড়ীতে এত বড় একটা বিষের সৃষ্টি করিবে! আর সেই টাকা তিনি হাতে করিয়া নিবেন! সেই টাকার অন্ন মুখে তুলিবেন! ঘৃণায়, ক্রোধে ও অপমানে আত্মহারা হইয়া ভবানী টাকা কয়টি খুলিয়া সত্যই উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

"ও কি, টাকা কিসের গা? ছুঁড়ে ফেল্লে যে!"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ভবানী কহিলেন, "যাদব পাঠিয়েছে!"

নিবারণ একটু হাসিল।

ভবানী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিবারণ আরও একটু হাসিয়া কহিল, "তা উঠোনে ছড়িয়ে ফেল্লে—লোকে কুড়িয়ে নিবে—তাতে আর লাভ। বরং ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেও। আমার ইচ্ছে তাই দেও, দাদার কোনও সাহায্য তুমি না নেও।"

ভবানী তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন, "কেন নেব না,—তাকে পেটে ধ'রে ছিলাম, এখন খেতে পর্‌তে আমায় দেবে না? অবিশ্যি দেবে। না দিয়ে যাবে কোথায়? সে খরচ দেবে ব'লে কি তার সব অন্যায় বরদাস্ত করব? তারও করব না, তোরও করব না। চাই খেতে তোরা দিস্, চাই না দিস্। তেমন বাপের বেটী আমি নই।"

ভবানী উঠিয়া গিয়া টাকা কয়টি আবার কুড়াইয়া আনিলেন। নিবারণ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভবানী রাগিয়া কহিলেন, "ভারী রঙ্গ প'ড়েছে তোর—তাই হাস্‌ছিস্! এত হাসি কিসে আসে, তা ভেবে পাইনে, এমনিকরে শত্তুরের মুখ হাসাতে বসেছিস্—একটু লজ্জা করে না তোদের!"

নিবারণ উত্তর করিল, শত্তুরের মুখ আমি কিছুই হাসাচ্ছিনা মা। যে হাসাচ্ছে তাকে বরং লিখে পাঠাও।"

"লিখে পাঠাব না কি ছাড়ব? সে উপদেশ তোমায় আমাকে দিতে হবে না। তুই-ই কি কম নাকি? সে দিন বাড়ী এসেছিল—বড় ভাই না হয় দুটো অন্যায় জেদই ক'রেছিল—তোর কি উচিত ছিল, অমন রুকে উঠে যা মুখে আসে, তাই ব'লে তাকে অপমান করা! তার মনে তাতে রাগ হ'তে পারে না? তাই না আজ এই অনিষ্ট উৎপত্তি হ'ল। নইলে সে ত অবোধ নয়—এতটা বাড়াবাড়ি ক'ত্ত?"

নিবারণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কি ভাবে কথা বলিলে যে সে দাদাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তাহা ভাবিয়া পাইল না। আসলে দাদা যা চান, যার জন্যই ধাইয়া সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছিলেন, তা যে সে প্রাণান্তেও করিতে পারে না।

ভবানী কহিলেন, "তা এখন কি হবে? হরি ঘোষাল হয় ত আজ এসে বাড়ী ভাগ ক'রে নিতে চাইবে। আর এমন কুতপিণ্ডেও আমার ছিল, শেষে ওই পাপ হরি ঘোষাল এসে বাড়ী দখল ক'রে বস্‌বে!"

নিবারণ উত্তর করিল, "দাদার ভাগ আমি ভোগদখল ক'ত্তে চাইনে, কিন্তু তাই ব'লে হরিঘোষাল যে এই বাড়ীতে আমার বুকের উপর এসে বস্‌বে, সে আমার প্রাণ থাকৃতে হবে না।"

ভবানী একটু কি ভাবিয়া কহিলেন, "তা দেখ্ হরি-ঘোষাল এলে তুই গিয়ে রুখে পড়িস্‌নে যেন। তাকে যা ব'ল্‌তে হয় আমি বলব।"

নিবারণ কহিল, "তুমি ক্ষেপেছ মা? আমি লুকিয়ে ঘরে ব'সে থাকব, আর তুমি যাবে হরি ঘোষালের সঙ্গে হাতাহাতি কত্তে?"

"হাতাহাতি কেন কত্তে হবে! সে কি পাগল হয়েছে যে আমার গায় হাত তুলবে?"

"গায়ে হাত ঠিক নাও তুল্‌তে পারে, তবে মুখে ঝগড়া ক'ত্তে গেলেও যা অপমান তোমার হবে,—হাতাহাতির চাইতে সেটা বড় কম হবে না। না মা সে হ'তে পারে না। যা বল'তে হয় আমি তাকে ব'ল্‌ব। তজ্জন্য তুমি ভেবো না কিছু।—জোর ক'রে সে দখল ক'ত্তে না এলে আমিও জোর কিছু ক'রব না। আর

তাই যদি সে আসে জোর ক'রেই বাধা দিতে হবে, তা ছাড়া, উপায় কিছু নেই।"

"যাদবকে কেন লিখে দে না। ঐ যে ঠাকুরপো র'য়েছেন, পাড়ায় আরও কত লোক আছে, তাদের কারও হাতে কেন সে তার যক্ষির ধন আগ্‌লে রেখে দিকনা।"

"তা হ'লে যে আমাকে জব্দ করা হ'লনা। স্পষ্টই ত তা লিখেছে।"

"তবু একবার লেখনা, হত ভাগা ছেলে! গোয়ার্ত্তুমি করেই যে একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটালি। তবু যদি শিক্ষে কিছু হ'ল।"

"ইচ্ছে হয় তুমি লেখাও আমি কিছু লিখ্‌তে পার্‌ব না।"

"যাই দেখি একবার ত ঠাকুরপোর কাছে। কি বিপত্তিই যে হ'ল।"

ভবানী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিবারণ কহিল, "হাঁ, ভাল কথা। দাদার ও টাকা কি ক'রবে?"

"কি ক'রব? কেন, তুই ছেলে, আর সে ছেলে নয়? তোমরা দুজনে ঝগড়া ক'রে আলাদা হ'লে ব'লে আমি তাকে ত্যাগ ক'ত্তে পারি? তোর ভাত খাব, আর তার ভাত ফেল্‌তে পারি?"

"তা হ'লে—ও টাকার এক পয়সাও আমাকে কি আমার স্ত্রী পুত্রকে খেতে না হয় এমন ব্যবস্থা তোমাকে ক'ত্তে হবে। দাদা যা পারে, দিচ্ছে, আমি, যা পারি দেব কিন্তু আমার সংসার খরচ আলাদা ক'রে আমাকে চালাতে হবে।"

"কি, আমাকেও আলাদা ক'রে দিবি?" "রাগ ক'রোনা মা। আলাদা একত্তরের কোনও অর্থ নাই। তুমি ত আলাদাই খাও। তোমার পয়সা দিয়ে তোমার যা লাগে, আলাদা কিনে দেব।"

ভবানী ভ্রূকুটি করিলেন,—কহিলেন, "তা যা খুসী ক'রবি। কিন্তু তোর রাগ ছেলে কি কেবল তোরই, আমার কেউ নয়? আমি যদি একটা দ্রব্য তাদের দিই কি ব'লে তুই না ক'রবি? ক'ল্লেই বা তা শুন্‌ব কেন আমি?"

"তোমার নিজের টাকা দিয়ে ত আর দেবে'না।"

"নিজের টাকা নয় ত কি পরের টাকা? বাপের জমিদারীও পাইনি, কর্ত্তাও কিছু আলাদা ক'রে দিয়ে যান্‌নি। তোমাদের দু'ভাইকে পেটে ধ'রে ছিলাম,—তুই দিলেও তা আমার,—যাদব দিলেও তা আমার, দয়া ক'রে ভিক্ষে ত কেউ আমায় দিচ্চিস্‌নে! ছেলের উপরে মার যে দাবী আছে, সেই দাবীতে দিবি। যা দিবি তা আমার।"

এই বলিয়া ভবানী চলিয়া গেলেন। নিবারণ ভ্রূকুটি করিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া রহিল। ইহার কি উত্তর সে দিবে!

(২৮)

অম্বিকা ঘোষাল তাঁহার অগ্রজকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন, নিবারণকে জব্দ করিবার জন্য তাদের বাড়ীর সম্বন্ধে কি পরামর্শ স্থির হইয়াছে। যাদব একটু দোয়ামনা করিতেছে, যাহা হউক, শীঘ্রই সে তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে, যাদবের পত্র পাইলেই তিনি যেন অবিলম্বে তাদের বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া নিয়া দখল করেন। অধীর চিত্তে হরি ঘোষাল যাদবের পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ সেই পত্র আসিল। বৈকালেই তিনি নিজের আত্মীয় ও অনুগত কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়া নিবারণের বাড়ীতে আসিলেন। কে জানে নিবারণ কোনও গোল যদি করে, সাক্ষী কে হইবে। গাঙ্গুলী-পাড়ার কোনও শালা খুন করিলেও নিবারণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। চণ্ডী মণ্ডপের কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া হরি ঘোষাল নিবারণকে ডাকিলেন। নিবারণ বাহির হইয়া আসিল,—ভবানীও পিছনে পিছনে আসিলেন। বলিতে লজ্জা করে, কাদম্বিনীও খোকাকে কোলে লইয়া একটু ঘোমটা টানিয়া চণ্ডী মণ্ডপের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। যদিও সে বধূ মাত্র, স্বামীর উপরে গৃহিণীত্বের জুলুম কিছু করিত না, তবু এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কটে সে বড়ই উদ্বিগ্নই হইয়া উঠিয়াছিল। কেনই বা না হইবে?

"নমস্কার ঘোষাল মশাই! নমস্কার মশাইরা! তা কি মনে করে?"

কোনও প্রত্যভিবাদন না করিয়া হরি ঘোষাল কহিলেন "কি মনে ক'রে? বাঃ! কেন, যাদবের কোনও চিঠি তুমি পাওনি?"

"পেয়েছি। তার কি?"

"তার কি, বটে! সে যে তার বাড়ী ভাগ ক'রে নিতে আমাকে লিখিছে। এই যে চিঠি—" হরি ঘোষাল চিঠিখানি বাহির করিয়া তার পাতা খুলিয়া একটু দূরে দুই প্রান্ত খুব শক্তি করিয়া দুই হাতে ধরিলেন,—পাছে নিবারণ থাবা দিয়া কাড়িয়া নেয়! কাঁচা হইলেও একটা দলিল ত, হাতছাড়া হইলে কিসের বলে, তিনি বাড়ী দখল করিবেন। আবার সই করে যাদবের কাছ হইতে নূতন চিঠি আনিতে হইবে। এর মধ্যে কত কি ঘটিতে পারে। নিবারণ একটু হাসিল,—কহিল, "ও চিঠি আমার দেখবার দরকার কিছু নেই। আমিও চিঠি একটা পেয়েছি।"

"তবে আর কি! আমি এই লোক নিয়ে এসেছি। তুমিও পাড়া থেকে যাদের ইচ্ছা হয় ডাক, ভাগটা আজই ক'রে ফেলা যাক।"

নিবারণ উত্তর করিল, "ভাগ যখন হয় করা যাবে। পাড়ার পাঁচজন মুরুব্বি লোক আছেন, তাঁরা দেখ্‌বেন। আপনার তার জন্যে মাথা ব্যথার কিছু দরকার দেখ্‌ছিনে। নমস্কার, আপনারা তা' হলে এখন আসুন, আমার কাজ আছে।"

বারে বাঃ! আসুন! ব'ল্লেই অম্‌নি হ'ল?—যাদব যে তার বাড়ীর ভাগ আমাকে বুঝে নিয়ে দখলে রাখতে লিখেছে। তুমি কে যে তাতে বাধা হ'তে এসেছ! কি দাবী তোমার আছে?"

নিবারণ উত্তর করিল "আমি নিবারণ গাঙ্গুলী, নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর ছেলে। এ তাঁর বসত বাড়ী, দাবী যা আমারই আছে, এখানে ঘোষালদের কোনও দাবী দাওয়া নেই। আপনি আসুন এখন।"

"বলি নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর ছেলে কি একা তুমি? যাদব কেউ নয় নাকি? বাড়ীর অর্দ্ধেক মালিক কে? তার ভাগে তোমার কি দাবী?"

"লোকত ধর্ম্মত অন্ততঃ এ দাবী আমার আছে যে তাঁর ভাগে তিনি এমন লোক এনে বসাতে পারেন না, যার সংস্রবে ভদ্রলোকের মান ইজ্জত নিয়ে আমি থাকতে পারি না।"

"কি! এত বড় কথা বল্লি—হারামজাদা! আমি কি হাড়ি না মুচি যে আমার সংস্রবে ভদ্দর লোক থাকতে পারে না। শুনলে হে তোমরা শুনলে? কত বড় মান হানির কথাটা আমায় ব'ল্লে!"

নিবারণ কহিল, "বাড়ীতে এসে ওসব বদ গাল দেবেন না ঘোষাল মশাই? আমার মা সামনে দাঁড়িয়ে এটা মনে রেখে কথা বলবেন।"

হরিঘোষাল ভবানীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, হাঁ গো বৌ ঠাক্‌রুণ! তুমি ত শুনছ দাঁড়িয়ে, আমি ওকে গাল দিলুম, না ও আগে আমাকে যা বলতে নেই, তাই ব'লে গাল দিলে? আমি হরিঘোষাল, দিগম্বর ঘোষালের ছেলে, আমায় বলে কি না আমার সংস্রবে ভদ্দর লোক থাকতে পারে না।—ওরে হতভাগা! তোর সংস্রবে কোন্ ভদ্দর লোকের ছেলে থাক্‌বে! চাষ ক'রে খাবে—এও কি কোনও ভদ্দরলোকে ক'রেচে!"

নিবারণ কহিল, "আমি কি ক'রে খাই না খাই, তা নিয়ে আপনার কোনও কথা বলবার দরকার নেই। আমার সংস্রবে আপনাকে থাকতে ব'লছিনা, আপনার সংস্রবেও আমি থাকতে চাইনে। বেশী আর গোলমাল না ক'রে এখন ঘরে যান।"

"তাহ'লে সহজে তুমি বাড়ী ভাগ ক'রে দেবে না।"

"না, সহজেও না, চাপেও না। এ বাড়ীর একপা মাটিতেও আপনি কোনও দখল পাবেন না।"

"শুনলে হে তোমরা শুনলে। মনে থাকে যেন সব কথা, হাঁ—আচ্ছা দেখা যাবে, কাল যখন লোকজন নিয়ে এসে জোর ক'রে দখল ক'র্‌ব, তখন বড়াই কোথায় থাকে!"

নিবারণ উত্তর করিল "লোকজন আমারও আছে ঘোষাল মশাই। এসে দেখতে, পারেন কার জোর বেশী। সোজা একটা কথা আপনাকে বলছি। দাদার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে—তাই ওই চিঠি আপনাকে লিখেছেন—তা তিনি যাই লিখুন,—এ বাড়ীতে ঢুকতে আপনি পাবেন না। যদি লাঠি নিয়ে আসেন, আমিও লাঠি নিয়ে দাঁড়াব। হয় আপনার মাথা যাবে, না হয় আমার যাবে। সেইটি হিসেব ক'রে তবে কাজ ক'রবেন।"

"বটে! একি মগের মুল্লুক পেয়েছিস্—বাঁদর জোর ক'রে তুই পরের সম্পত্তি দখল ক'রে থাকবি।"

"মুল্লুক যারই হ'ক, আমার পৈতৃক বাস্তু, এখানে এজোর আমি কর্ত্তে পারি—করব।"

"যাদব যদি তার অংশ আমাকে বিক্রী করে।"

"তা হলেও মাথা নিয়ে এ বাড়ীতে আসতে পারবেনা।"

ভবানী বলিয়া উঠিলেন, "আরে, নিবু, থামনা হতভাগা! কি ব'লছিস্ পাগলের মত?"

হরি ঘোষাল কহিলেন "শুনলে ত বৌ ঠাক্‌রুণ আমাকে খুন ক'রবে বলে শাসালে; এত বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে তোমার ছেলের। হাঁ হে, তোমরা শুনলে কিন্তু—খুন ক'রবে ব'লে আমাকে শাসালে নিবারণ গাঙ্গুলী; আমি নালিশ ক'রব, জেলে দেব ওকে! তখন দেখ্‌ব পৈতৃক বাস্তু ওর কোথায় থাকে!"

নিবারণ হাসিয়া কহিল, "জেলে গেলেও একদিন আমরা ফিরে আসব ঘোষাল মশাই। পৈতৃক বাস্তুর মান তখন রাখতে পারব।"

ভবানী কহিলেন "ঘোষাল ঠাকুরপো কেন নিজে গোলমাল তুমি ক'রচ। ও ছেলে মানুষ, গোঁয়াড়—ওর সঙ্গে কি এই রকম বকাবকি করা তোমার সাজে? বুড়ো হ'য়েছো, নিজের মান নিজের রেখে চ'লতে হয়। আজ কালকার ছেলে, ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রতে গেলেই অন্যায় দু'কথা শুনতে হবে। তা তুমি আজ যাও,—যাদবের সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই তোমাকে তার বাড়ীর ভাগ দখল ক'রে রাখতে লিখেছে? কেন পাড়ায় আর মানুষ ছিল না? তা আমিও বলছি, সেটা হ'তে পারে না। মিছে আর এ নিয়ে গোল ক'রোনা—তাতে সুবিধে কিছু হবে না। নিবু ত বেটাছেলে, রাগ ওর হ'তেই পারে। আমি যে মেয়ে মানুষ—লোকজন নিয়ে জুলুম ক'ত্তে যদি এস আমিও গিয়ে আড় হ'য়ে দাঁড়াব। পারব তাদের ব'লতে,—আমার গায় হাত তুলুক।"

"তুমিও ত দেখছি বৌ ঠাক্‌রুণ কম পাত্তর নও! কেন, যাদব কি বাড়ীর মালিক নয়? সে কি তার ভাগ যার হাতে ইচ্ছে রেখে দিতে পারে না?"

"না, বসত বাড়ীতে তা পারে না। আর পারে না পারে, সেটা আমি তার সঙ্গে বুঝব! যা ব'লতে হয়, আমি তাকে ব'লব। তোমার কি? তোমাকে লিখেছিল, বেশ ত তুমি তাকে জবাব লিখে দেও, তোমার মা আর

ভাই, তোমার বাড়ীর ভাগ আমার হাতে দিতে রাজি হ'লেন না। পরের সম্পত্তি আগ্‌লে রাখ্‌তে হাঙ্গামা কেন ক'ত্তে চাচ্ছ। তাকে লিখে দেও—হ'ল না, বস্‌ ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা। লেখাপড়া যা ক'ত্তে হয় তার সঙ্গে আমরা ক'রব। তোমার কি?"

সঙ্গে যারা আসিয়াছিল, তারাও একটু ভয় পাইয়াছিল। দেখ দেখি, মিছামিছি কেমন একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদের মধ্যে ঘোষাল তাদের টানিয়া আনিয়াছে? তারাও ঘোষালকে ভবানী ঠাকুরাণীর কথা মত ক্ষান্ত হইতেই পীড়াপীড়ি করিল, অগত্যা ঘোষাল কহিলেন,—"আচ্ছা যাক্‌ ত আজ, এর পরে যা হয় দেখা যাবে। আচ্ছা, আসি তবে বৌ ঠাক্‌রুণ। কাজ তোমরা ভাল ক'ল্লে না কিন্তু, ভেয়ে ভেয়ে ঝগড়াটা আরও জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো। ভাল, টের পাবে এর পরে।"

এই বলিয়া সঙ্গীদের লইয়া ঘোষাল গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃ-স্নেহ।

অপরাধ করা তোমারই স্বভাব,
অপরাধে ক্ষমা আমারি সাজে,
ব্যথা পেলে তুই স্নেহের পুতুলি,
বক্ষে বড়ই বেদনা বাজে।
দাদা ব'লে যবে সুমুখে দাঁড়াস,
আশাতে হৃদয় ফুলিয়া উঠে,
দু'বাহু বাড়ায়ে বুকে তুলে লই
যত দুখ তাপ ভূমিতে লুটে।
তাই বলি ওরে নয়ন-আলোক,
আঁধারে ফেলিয়া দিস্‌ না মোরে,

তোরে দেখে বুকে মহাবল পাই,
তাই দিবারাতি খুঁজিরে তোরে!
আদরে ডাকিয়া নিকটে বসাই,
কত কথা বলি মনের সাধে,
রাগ হ'লে বকি বাহিরেই শুধু
অন্তরে তাহা পশিতে বাধে।
তাই বলি ভাই, চির সুখী হ'স,
অন্তরে চির শান্তি রাজে;
দুখীদের দুঃখ ঘুচাইয়া দিয়ে
মাথা নত ক'রো বিনয়-লাজে!

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

হিন্দু শাস্ত্রে গো ও স্ত্রীতত্ত্ব

গত সেপ্টেম্বর মাসের Modern Review পত্রিকায় "ঘরে-বাইরে" পুস্তক লিখিবার কৈফিয়ত দিতে গিয়া স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন যে ঐ পুস্তক লেখায় তাঁহার কোন অভিপ্রায় (object) ছিল না। আর্টের কোন উদ্দেশ্য থাকে না, আর্ট যাহা দেখে তাহাই অঙ্কিত করে। কিন্তু তিনি তাঁহার পুস্তকের নায়ক নায়িকাদের তাঁহার কলমের দ্বারা কতকগুলি কথা বলাইয়াছেন, যাহাতে হিন্দুদের কতকগুলি প্রিয়তম সংস্কারের উপর মর্ম্মান্তিক আঘাত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, হিন্দুর গৃহধর্ম্মের শ্রী ও সমাজ-জীবনের কেন্দ্র যে সহধর্ম্মিণী তাহাকে

পদচ্যুত করিয়া বিমলার ন্যায় একটি বিকৃতরূপা, অসামাজিক, অস্বাভাবিক "স্ত্রীকে" উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নিখিলেশ বাবুর মতন একজন শুষ্কহৃদয়, স্বার্থপর ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে প্রধান নায়ক (সম্ভবতঃ আদর্শ পুরুষ) করিয়া, হিন্দুদের কপিল হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাদের বৈরাগ্য ধর্ম্মকে একটা "ঘোর" বা নেশা বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, তপস্তেজহীন আধুনিক হিন্দু-জাতির একমাত্র সাধ্য যে দয়া দান ধর্ম্ম, যাহাকে চৈতন্যদেব কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, সেটা মানুষকে "নষ্ট" করিবার একটা উপায় বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বহুদিন পূর্ব্বে কোন কোন হিন্দুর বাড়ীতে শক্তি পূজায় মহিষ বলিদান হইত বলিয়া অবাধে গো হত্যার পোষকতা করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, হিন্দুদের মাতার মাতা, জগন্মাতা স্বরূপা সীতা দেবীও হৃদয়ে অসতী ছিলেন, এমন একটা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শেষের দুইটি কথার যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয়টির অবতারণা করিব, কেননা তাহা প্রসঙ্গ ক্রমে আপনিই আসিয়া পড়িবে।

বাঙ্গলাদেশে দেবী পূজায় মহিষ বলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, এবং ছাগল বলিও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। তামসিক বলিদান যে একটি অনাবশ্যকীয় নৃশংস প্রথা তাহা স্বতঃই সমাজ বুঝিতেছে। উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে (পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে), যেখানে তান্ত্রিকমতে দেবী পূজা ও বলিদানাদি নাই, সেখানেই গো হত্যা অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর অপ্রিয়, ও ইহা নিবারণের জন্য লোকে যথেষ্ট কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এমন কি এই উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষিণী সভা সকল পুনঃ পুনঃ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে হিন্দুদিগের উপর একটি টেক্স বসাইয়া, সেই টাকা হইতে পল্টনের গোরাদিগকে অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ্য মেষ মাংস খাইতে দেওয়া হউক। তা ছাড়া দেবী পূজায় বৎসরে একবার কোথাও কোথাও মহিষ বা ছাগ-বলি হয় বলিয়া যদি অবাধে গো হত্যার পোষকতা করা যায়, তাহা হইলে নরবলির পক্ষে সেই যুক্তি খাটিবে না কেন? মহিষও জীব, গরুও জীব, মানুষও জীব।

"গো মাতা" যে হিন্দুর কি প্রাণের, কি হৃদয়ের পূজার জিনিষ তাহা বাহিরের কেহ হয়ত বুঝিতেই পারে না। কৃষি কার্য্যে ও দুগ্ধ দানে গোজাতির উপকারিতা ও ব্যবহার আছে বলিয়াই যে ইহার এত আদর তাহা নয়। কৃষিকার্য্য মহিষ ও অশ্বাদি পশুর দ্বারা সম্পাদন হইতে পারে ও হইতেছে, ও মহিষ ছাগলাদিরও দুগ্ধ পেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেদের যুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত গব্য দ্রব্য সকল হিন্দুর ধর্ম্মার্থে ও ঐহিক মঙ্গলার্থে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য। বেদাঙ্গ নিরুক্ত শাস্ত্রে যাস্কমুনি বলিয়াছেন—"গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং"—অর্থাৎ গোজাতি সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিষ্ঠাভূমি বা আশ্রয় স্বরূপ, কেননা ইহার দ্বারা মনুষ্য জাতির (১) যজ্ঞ সাধন, (২) ভোগ সাধন, (৩) ও আয়ু সাধন হয়। যথা—(১) পঞ্চগব্য (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) দ্বারা বৈদিক যুগে গোমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, আর হিন্দু শাস্ত্রমতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রজাবৃদ্ধির ও সর্ব্ব ভূতের মঙ্গলের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এই বিশ্বাসের মূলে বিজ্ঞান আছে। জৈমিনি ঋষিকৃত পূর্ব্ব (বা কর্ম্ম) মীমাংসা দর্শন শাস্ত্রের শবর ভাষ্যে পরিষ্কার রূপে দেখান হইয়াছে যে গোমেধ যজ্ঞে গো বলি হইত না, পঞ্চগব্যের আহুতি দেওয়া হইত। পুনশ্চ, অদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য পতিত হিন্দুর প্রায়শ্চিত্তের ও সাধারণ ভারতবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। (২) গব্য দুগ্ধ ও তাহার উৎপাদ্য ঘৃত, দধি, নবনী প্রভৃতি যে মনুষ্য জাতির বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোকের জীবন ধারণের ও ভোগ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা সকলেই জানেন। (৩) আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে যে গব্যঘৃত মনুষ্যের আয়ু বৃদ্ধি করে—"হবিরায়ুঃ"—ঘৃত আয়ু স্বরূপ। বৈদ্য শাস্ত্রে এজন্য ইহার বহুল ব্যবহার, "ঘৃতাদি" শ্রেণীর ঔষধ সকল সুবিখ্যাত। পঞ্জাবে একটি কথা আছে "শও চাচা এক পিউ, শও দাওয়াই এক ঘিউ"—অর্থাৎ এক পিতা যেমন শত খুড়ো অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, সেইরূপ শত ঔষধ অপেক্ষা এক ঘৃত শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য যে শাস্ত্রে ও লৌকিক ব্যবহারে গব্য দুগ্ধ ঘৃতাদির প্রশংসা ও আদর দেখিতে পাওয়া যায়, মহিষ দুগ্ধাদি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। শাস্ত্রে গব্য দ্রব্যের আদরের বিশেষ কারণ এই যে গো শান্ত-প্রকৃতি, সত্ত্বগুণপ্রধান পশু জাতি, মহিষ তমোগুণ প্রধান দুর্দ্ধর্ষ পশু জাতি। পশু বিদ্যায় (zoology)

গো এবং মহিষ এক জাতীয় (bovine species) হইলেও, প্রকৃতিতে দুইটিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ—যেমন বিদ্যা ও অবিদ্যা শ্রেণীর স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রভেদ। গো দেবী প্রকৃতির, মহিষ অসুর প্রকৃতির। প্রথমটি জগন্মাতা ভগবতীর স্বরূপা বলিয়া হিন্দুদের পূজ্য, দ্বিতীয়টি মহিষাসুরের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তান্ত্রিক উপাসকদের দেবী পূজায় বধ্য। জীবহিংসা হিসাবে নরবলির ন্যায় মহিষ বলিও হওয়া উচিত নয়, মাছ খাওয়া উচিত নয়, একটি পিপড়ে মারাও উচিত নয়। কিন্তু সকল জিনিষেরই ইতর বিশেষ আছে। গো ও মহিষে জীব হিসাবেও বিজ্ঞান মতে তুলনা হইতে পারে না। মহাভারতের মহাদেবের বাহন বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

তাহার উপর এই গো জাতির সহিত হিন্দু জাতির ধর্ম্মজীবন ছাড়া গার্হস্থ্য জীবনের কিরূপ মাখামাখি। দুইটি ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। গোপাল নন্দনের গো-লীলা বৈষ্ণব ছাড়া অন্য হিন্দু সম্প্রদায়েরও প্রেমের জিনিষ, ইহা কত কাব্য ও কত গানের বিষয় হইয়াছে। সুতরাং গো মহিমা ও গো ভক্তি হিন্দুর মর্ম্মে মর্ম্মে ঢুকিয়াছে। "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে"—ইহা বাঙ্গালী শিশুদিগের প্রাতরুত্থান মন্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ও প্রাতে উঠিয়াই পবিত্র দ্রব্য ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের স্মরণের একটি উপায়। সন্ধ্যাকালে মাঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ যে গৃহস্থের পক্ষে কি সুমিষ্ট জিনিষ তাহা পল্লীগ্রাম নিবাসীরা, বিশেষতঃ পশ্চিম প্রদেশে, উত্তমরূপেই জানেন; আর গোধুলি যে শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ইহা আয়ুর্ব্বেদের মত, ও গোধূলি লগ্ন যে বিবাহ যাত্রাদি শুভকার্য্যে প্রশস্ত তাহা সকল হিন্দুরই বিদিত আছে। পরিশেষে, গাভীর "হাম্বা হাম্বা" রব যে গভীর মাতৃস্নেহের পরিচায়ক ও মাতৃবক্ষের স্তনদুগ্ধের ব্যথার প্রকাশক তাহা যাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র কবিত্ব আছে তিনিই বুঝিতে পারেন। অতএব যাঁহারা বলেন যে এখানে ওখানে দুটো একটা মহিষ বলিদান হয় বলিয়া ভারতবর্ষে অবাধে গো হত্যা চলিতে পারে, তাঁহারা—আর কি বলিব—হিন্দুর ও হিন্দুত্বের মর্ম্মের কথা বুঝেন নাই। এরূপ কথা নিখিলেশ বাবুর মতন মূর্খ-পণ্ডিতের মুখেই শোভা পায়।

একদিকে নিখিলেশ বাবু গোজাতির অনাদর প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন, অপর দিকে সন্দীপবাবু স্ত্রীজাতির অবমাননা চূড়ান্তরূপে করিয়াছেন। সন্দীপের মত লোকের মুখ হইতে হইলেও চরিত্র মহিমায় অতুলনীয় সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ, যুগান্তর ধরিয়া হিন্দুর পূজিতা সীতাদেবীর সম্বন্ধে যে কথা কবির লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে তা সাক্ষাৎ স্ত্রী-দেবতার অবমাননার মতই প্রত্যেক হিন্দু অনুভব করিবেন। রাক্ষস রাবণ যে "কাঁচা সঙ্কোচের" জন্য তাহার শত্রু রামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গীর সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই, সন্দীপের যাদুমন্ত্র "মক্ষিরাণি"কে মুগ্ধ করিয়া সে কাঁচা সঙ্কোচটুকু ও দূর করিয়া, তাঁহার দ্বারা নিঃসঙ্কোচে এই উক্তি করান হইয়াছে যে সীতাদেবীর সতীত্বনাশে রাক্ষসেরই সঙ্কোচ ছিল, দেবীর কিছুমাত্র বাধা ছিল না, কেবল ছিল যাচকের অভাব। রাবণের হাত হইতে পার পাইলেন, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অবশেষে লোকাপবাদ নিবারণের জন্য বনবাসিনী হইয়া ধরিত্রীর কন্যা ধরিত্রীর ন্যায় সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া, ধরিত্রী-মাতার কোলে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু জনমদুঃখিনী সীতার মরিয়াও নিস্তার নাই। আজ হাজার হাজার বৎসর পরে, দুইযুগ অন্তরে, যে পবিত্র নাম লইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারী জনম সফল করিয়া উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে, সেই নামের উপর বঙ্গের বরেণ্য কবির হাত দিয়া সেই কবির সৃজিত গুণ্ডা একটি ঘোর কলঙ্কের কালি মাখাইল। আর্টের নামে ইহাও কি চলে? *

---

* বঙ্গ দেশের নূতন ধরণের ইন্দ্রিয়লৌল্যাত্মক (sensuous) কাব্য উপন্যাস পড়িয়া বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ তামসিক ভাবাপন্ন ও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা এই সম্বন্ধে পাঞ্জাবের একটি ঘটনা উল্লেখের দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে। কিছুদিন হইল লাহোরের "উর্দ্দু বুলেটিন" নামক একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক কোন প্রসঙ্গে—"রাধা ও নাচবেনা ন-মোন তেলও পুড়বেনা" কথাটি ব্যবহার করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। এই কথাটি এ দেশে, অন্ততঃ লাহোর সহরে প্রচলিত আছে, বোধহয় বাঙ্গালীদের সংস্রবে পাঞ্জাবীরা শিখিয়াছে। কিন্তু উক্ত সম্পাদক যদিও বৈষ্ণব নহেন, আর্য্যসমাজী, তথাপি রাধার নামের সহিত "নাচন" কথাটি ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন ও তাহার স্থানে একটি কল্পিত নর্ত্তকীর "জুলেখা" নাম ব্যবহার করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের পয়গম্বর মোহম্মদের বংশের কোন খ্যাতনামা স্ত্রীলোকের জুলেখা নাম ছিল, তাহা সম্পাদক জানিতেন না। মুসলমানেরা উক্ত সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে তুমুল আপত্তি ও আন্দোলন উঠাইল। সম্পাদক যে

স্যার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত Modern Review পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

We have seen the ugliest calumnies against women written in old Sanskrit verses, such as are rare in those authors who are proud of their Western culture. This proves that our modern Bengali writers have a genuine regard for women.

ইহার অর্থ এই যে, "পুরাতন সংস্কৃত কবিতাতে স্ত্রী লোকের উপর জঘন্য নিন্দাবাদ আছে, সেরূপ আজকাল-কার পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী লেখকদের লেখায় দেখা যায় না। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদের হৃদয়ে স্ত্রী জাতির প্রতি প্রকৃত সম্মানের ভাব আছে"—(যাহা অবশ্য পুরাকালে ছিল না)।

স্যার রবীন্দ্রনাথ পুরাতন সংস্কৃত কবিতার কথা স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একটি অর্দ্ধ সত্য, যাহাকে ইংরাজীতে বলে "a half truth which is worse than an untruth." কবিবর verses শব্দ দ্বারা যে কি অর্থ করিতে চাহেন তাহা বুঝা গেল না। Verses অর্থে "শ্লোক", সুতরাং যদি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কতক-গুলি শ্লোকে স্ত্রী-নিন্দা থাকে, তাহা হইলে আসে যায় কি? কোন স্থলে, কি উদ্দেশ্যে ও কি অবস্থায় ঐ নিন্দা করা হইয়াছে তাহা না জানিলে উহার ঔচিত্যানৌচিত্য কিরূপে বুঝা যাইবে? কাব্য নাটকে বিদূষক বা ভাড় জাতীয় লোক থাকে, তাহারা কেবল একটু মজা ফুটাইবার জন্য নিন্দা বিদ্রূপের কথা বিনা চিন্তায় অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলে। কোন কোন কাব্য নাটক লেখক কবির অপভ্রংশ মাত্র, তাঁহারা ছড়া কাটা কবি ও ভাঁড়ের দলের লোক। তাঁহাদিগকে "তামাসগির" (buffoons, jesters) বলা যায়। পাঠক বা শ্রোতাকে একটু হাঁসাইতে পারিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন, তাঁহাদের কথার ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। বিচারের কঠোর দৃষ্টি ছাড়িয়া উপেক্ষার কোমল দৃষ্টিতে দেখিলে সাতা দেবীর উপর সন্দীপবাবুর মন্তব্য ঐরূপ একটা ভেঁড়োমি মাত্র। কবির হাত দিয়া বাহির হইয়াছে, ও তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার বলে "ঘরে বাহিরে" পুস্তকের আর্টের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সে জন্য বলা যায় না যে আধুনিক সাধারণ বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করা হয় বা ঐরূপ রুচি দেখান হয়।

পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে উহা দুইটি স্বতন্ত্র ভাবে বিভক্ত —একটির নাম শাস্ত্র, দ্বিতীয়টির নাম কাব্য নাটক উপন্যাসাদি। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ চিন্তাশীল ও তত্ত্বদর্শী লোক ছিলেন বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা ওজন করিয়া কথা লিখিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে কতক-গুলি উৎকৃষ্ট লেখক ছাড়া আর কতকগুলি আছেন যাঁহারা কেবল রস ফুটাইতেই উৎসুক, তাঁহাদের কথা সময়ে সময়ে মনোরম হইলেও তাঁহাদের কোন মূল্য বা ওজন নাই। "দশকুমার চরিত" নামক পুস্তকে যে প্রভৃতি স্ত্রী-নিন্দা আছে তাহা এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে, যদিও উহা অবস্থা বিশেষে লেখা হইয়াছিল। উহা সাধারণ স্ত্রীজাতির উপর গালি নহে, যে শ্রেণীর স্ত্রী সকল ঐ গল্পের বিষয়ের মধ্যে আসিয়াছিল তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু

কৈফিয়ৎ ছাপিলেন, তাহাতে তাহার অপরাধ আরও গুরুতর বিবেচিত হইল। মুসলমানেরা বলিল যে, হিন্দু সম্পাদক আপনাদের ধর্ম্মের রাধার সম্মান বাঁচাইবার জন্য মোহম্মদের বংশের সুনামা মহিলার ইচ্ছাপূর্ব্বক অবমাননা করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নাচনের ভাব মুসলমানদের পক্ষে বীভৎসরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। লাহোরের ডেপুটি কমিসনর মুসলমানদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন ও "উর্দ্দু বুলেটিন"কে প্রেসএক্ট অনুযায়ী এক সহস্র টাকা জামিন দিতে হয়। "ঘরে-বাহিরে" পুস্তকে সীতাদেবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা "উর্দ্দু বুলেটিনের" লেখা অপেক্ষা অনেক অংশে গুরুতর। যদি কেহ ভার্জ্জিন মেরীর যীশুর মাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন অশ্লীলভাব প্রকাশ করে, তাহাও যেমন অশ্রাব্য ও লিপিবদ্ধ হইবার অযোগ্য, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু বাঙ্গালীরা এরূপ "তামাসগির" হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কথাটাকে তামাসারূপে নিয়া উপাদেয় ভাবে হজম করিয়াছে। এরূপ আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানশূন্য যে জাতি তাহাদের সার বিষয়ে উন্নতির কি আশা করা যাইতে পারে? তাহাদের দেশে সুরেন্দ্র-মতিলালের কবির লড়াই উৎকৃষ্ট দেশহিতৈষী কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় যোথকারবার, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি, কলকারখানা খোলা, এসব তো বাঙ্গালীর পক্ষে গালাগালির মধ্যে। এসব দিকে কাব্যরস-জ্ঞানশূন্য পাঞ্জাবীরা যাহা করিতেছে, তাহা বাঙ্গালীদের অনুকরণযোগ্য, সময়ান্তরে তাহার বিবরণ দিতে পারি। বোম্বাই প্রদেশে অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হইতে, হোমরুল না থাকা সত্ত্বেও, পার্শি ও ভাটিয়ারা এ বিষয়ে যাহা করিয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এ দুই জাতিদের মধ্যেও কাব্যরসের রসিকের অভাব।

লেখা হইয়াছে। "দশকুমার চরিত" একখানি অশ্লীল পুস্তক। উহার ভাব ও ভাষা আদর্শরূপে লওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। ইহাতে স্ত্রী নিন্দা কিছু কিছু আছে, কিন্তু মুখ্যত স্ত্রীজাতির এরূপ সম্মান ও গৌরব করা হইয়াছে যেরূপ কোন ভাষায় বা কোন শাস্ত্রে নাই। ইহা কি বাঙ্গালার কবিবর জানেন না? ঐ স্তুতি নিন্দা উভয়ই তত্ত্ব দৃষ্টিতে বিচার করিয়া করা হইয়াছে, রঙ্গ করিবার জন্য বা রস ফুটাইবার জন্য এলোমেলো কিছুই বলা হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা প্রকৃতিভেদে স্ত্রীলোকের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াছেন। লিঙ্গ দৃষ্টিতে করেন নাই। কেন না তাঁহারা জানিতেন, যেমন এখনও অনেকে জানেন, যে এমন "নারী" আছেন যাঁহারা কেবল 'মাদিনর' গোঁপ-যোড়াটি নাইমাত্র। এজন্য সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী ও নারী শব্দের মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থের পার্থক্য আছে, যদিও স্থূলভাবে দুইটি শব্দই সচরাচর এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। "স্ত্রী" শব্দের ব্যুৎপত্তি "স্তৃ" ধাতু (তারণ বা নিস্তারণ অর্থে) হইতে করা হয়। যিনি ইহকালে ও পরকালে স্বামীকে ধর্ম্ম সাধন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা ত্রাণ করাইবার উপায় করিয়া দেন তিনিই "স্ত্রী", কেবলমাত্র নারী হইলে তাহা হয় না। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা মাংসপিণ্ড দিয়া মনুষ্যের বিচার করিতেন না—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে বিচার করিতেন। তাঁহারা আজ কালকার স্থূলবুদ্ধি জড়োপাসী লেখকদের ন্যায় পয়োধর যুগল, নিতম্ব ও কটিদেশ দেখিয়াই বিহ্বল হইয়া স্ত্রীলোকের পদানত হইতেন না। বিচার বুদ্ধি দ্বারা দেখিতেন যে ঐ আপাত মনোরম মূর্ত্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে দেবী, কি মানবী, পিশাচী, কি রাক্ষসী। স্ত্রী জাতি প্রধানতঃ প্রকৃতিস্বরূপিনী বলিয়া তাঁহারা মোটামুটি সমগ্র স্ত্রীজাতিকে মাননীয়া, রক্ষণীয়া পালনীয়া বলিয়া বিধান করিয়াছেন। তাহার উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিদ্যা ও অবিদ্যা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম বিচার করিয়াছেন। পুরাতন ঋষি ও শাস্ত্রকারদিগের হৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান ও ভক্তির ভাব ছিল তাহা তাঁহাদের ভাষার দ্বারাই বুঝা যায়। কেন না ভাষা ভাবের পরিচায়ক, আর সংস্কৃত শব্দ সকল যেরূপ প্রকৃত ও সম্যক্‌রূপে বস্তুতত্ত্ব বা বস্তু সকলের ভাব প্রকাশ করে সেরূপ আর কোন ভাষায় দেখা যায় না ইহা ভাষাতত্ত্ববিৎ (philologist) পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। এজন্য সংস্কৃত ভাষার একটি নাম হইয়াছে "শব্দব্রহ্ম", অর্থাৎ শব্দ দ্বারা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সব কিছু বুঝা যায়। এখন দেখুন যে মনুষ্য জাতির কতকগুলিন উৎকৃষ্টতম শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু সংস্কৃত ভাষায় "স্ত্রী" শব্দের সহিত এক পর্য্যায়ে কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বারা বর্ণিত হয়। যথা—হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি) শ্রী (লক্ষ্মী), ঋদ্ধি, সিদ্ধি, শান্তি, ক্ষান্তি, বিদ্যা, (সরস্বতী), স্মৃতি (যাহার দ্বারা বিদ্যার স্ফুরণ ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়) ইত্যাদি।

হিন্দু ঋষি ও শাস্ত্রকারেরা তিন দৃষ্টিতে স্ত্রীজাতিকে বিচার করিয়াছেন বলা যায়—(১) তত্ত্বদৃষ্টি, (২) ধর্ম্ম ও সমাজ দৃষ্টি, (৩) জড় বা material দৃষ্টি। (১) প্রথম দৃষ্টিতে কিরূপ উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন—

> প্রকৃতিরূপিণী নারী রমণীপ্রধানং জগৎ।
> তস্মান্নারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মাননীয়া সদৈবহি॥
>
> —নাগার্জ্জুনঃ।

অর্থাৎ প্রকৃতিরূপধারিণী ঈশ্বর শক্তি বা ভগবান এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন। আর জগতের মধ্যে রমণীই শ্রেষ্ঠ, কেননা রমণী না থাকিলে জগত থাকিত না ও চলিত না। এজন্য প্রকৃতি রূপিণী নারীজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বদা মাননীয়া।

> যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোহপি প্রকৃতিং নাবমন্যতি।
> সর্ব্বে প্রকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্য প্রকৃতেঃকলা॥
>
> - ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

"পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবমাননা করিবেন না। সমস্ত পুরুষজাতি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, আর স্ত্রীজাতি সেই প্রকৃতির অংশ।" এখানে পূর্ব্ব শ্লোক হইতে অর্থে একটু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রীজাতিকে সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপিণী না বলিয়া "প্রকৃতেঃ কলা" বা প্রকৃতির অংশ বলা হইয়াছে। কেননা প্রকৃতি হইতে সমস্ত জীব ও জগৎ উৎপন্ন, কিন্তু প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ যে সত্ত্বগুণ তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের উৎপত্তি। প্রকৃতির সৃজন ও পালন শক্তি যে সত্ত্বগুণ তাহাই স্ত্রীজাতিতে প্রধান, পুরুষে কার্য্যকরী রজোগুণ প্রধান।

এইত গেল স্ত্রীজাতির স্থূল তাত্ত্বিক বর্ণনা। তাহার পর আরও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মানব ভাষায় ও সাহিত্যে অতুলনীয়। প্রসিদ্ধ শরীর তত্ত্ববিৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পণ্ডিত চরক ঋষি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-দ্বয় দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে স্ত্রীজাতি মানুষের এত প্রিয় ও মনোরম কেন।—

ইষ্টাহ্যে কৈকশোঽপ্যর্থাঃপরং প্রীতিকরাস্মৃতাঃ।
কিং পুনঃ স্ত্রী শরীরে যে সঙ্ঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ॥
সঙ্ঘাতোহীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়োহীন্দ্রিয়ার্থা যঃ সঃ প্রীতিজননোঽধিকঃ॥

—চরকসংহিতা।

অর্থাৎ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ,, স্পর্শ একটি একটিই পরম প্রীতিদায়ক। সুন্দর দৃশ্য, সুমিষ্ট রস, সুমধুর স্বর, সুরভি গন্ধ ও প্রিয়স্পর্শ প্রত্যেকটি এক একটি ইন্দ্রিয়কে সুখ প্রদান করে। কিন্তু জগতে একমাত্র স্ত্রী জাতিই আছে যাহাতে এই পাঁচটিই একাধারে বিদ্যমান। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সুখকর বিষয় এক স্ত্রী জাতিতে থাকাতে সৃষ্টিতে এই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক।

ইহা স্ত্রী-শরীরের তত্ত্ববিশ্লেষণ। ইহাতে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ও কাব্য উভয়ই আছে। ইহা স্ত্রীজাতির মাংসপিণ্ডের বা লিঙ্গগৌরবের বর্ণন নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা স্ত্রী-তত্ত্ব বিচার। এরূপ বর্ণনা স্থূলরূপ বা অবয়ব বর্ণনার ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে লক্ষ্য ও আঘাত না করিয়া, একেবারে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকে আঘাত দেয় ও তাহাকে উদ্রিক্ত করে। ইহার দ্বারা পাঠকের মনে স্বতঃই উদয় হয় যে স্ত্রীজাতি একটি ইন্দ্রিয় ভোগের মাত্র বিষয় নহে। বরঞ্চ ইহা ঈশ্বর-সৃষ্ট একটি জগতের উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কবিত্বের সুন্দর কল্পনা (a beautiful scientific fact and poetic idea ,। এই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ভাবটি স্থূলতর রূপে সাধারণ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। যথা বৃহৎ সংহিতায়—

শ্রুতং দৃষ্টং স্পৃষ্টং স্মৃতমপি নৃণাং হ্লাদজননং।
ন রত্নং স্ত্রীভ্যোঽন্যৎকচিদপি কৃতং লোকপতিনা॥

লোকপাল ব্রহ্মা স্ত্রীরত্ন ভিন্ন এমন কোন রত্নই সৃজন করেন নাই যাহা শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন বা স্মরণ মাত্র অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন এই ভাবটি ও স্ত্রীজাতির স্বত্বপ্রধান গুণ সমূহ তাঁহার অমকাল ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

Oh fairest of creation ! last and best
Of all God's works ! Creature in whom excels
Whatever can sight or thought be formed
Holy, divine, good, amiable or sweet !

—Paradise Lost.

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সত্ত্বাধিক্য (passive বা স্থিতিশীল) ও রজাধিক্য (active বা গতিশীল) গুণ ভেদে যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতির স্বতন্ত্র বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহা সকল পাশ্চাত্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও কবিগণও স্বীকার করিয়াছেন। কেবল আধুনিক অল্পসংখ্যক জড়বাদী স্থূলদর্শী ইবসেন, মেটেরলিঙ্ক প্রভৃতি লেখকগণ স্ত্রী ও পুরুষকে এক ভাবে গড়িতে চান, ও তাহাদের উভয়ের জন্য একরূপই শিক্ষা, দীক্ষা, বৃত্তি ও অধিকারের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীদের মধ্যে এই পাশ্চাত্য লেখকেরা কতকগুলি শিষ্য পাইয়াছেন। একজন আমেরিকান ডাক্তার ও শারীর-তত্ত্ববিৎ, এডওয়ার্ড বি, ফুট এম্, ডি, (Edward B. Foot, M. D.) তাঁহার মেডিকেল কমন্‌সেন্স (Medical Commonsense) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

The age of puberty reached, mark the change ! The two sexes now seem to develop in entirely opposite directions. The voice of the boy grows rough and deep, his bony frame-work develops rapidly ; his shoulders grow broader, the soft down of his childish face is fast turning to a heavy beard. Soon we sha'l see in him the sturdy, withy and mossy charac-teristics typified by the oak. But with the girl all development of bone, or *anything dependent upon earthy properties*, nearly or quite ceases when puberty is reached. True, a little prior to and for a little while after, she widens at the hips. The fallopian tubes and ovaries must begin their labors, they demand El bow room

and it is the generative organs that give her the peculiar breadth from hip to hip. But why does she grow physically fine, or what is called feminine, and the young men physically coarse, or what is termed masculine ? .....

Before the age of puberty, and consequently before the organs of the male begin to impart marked masculine characteristics, and the ovaries of the female begin the work of eliminating ths coarcer physical properties, the attraction between them is almost wholly platonic. But after arriving at puberty and the machinery of sex begins to work in each, the delicately organised girl *begins to feel like leaning against the broad shoulders of some favorite of the opposite sex.*

এই leaning (লিনিং) ভাবটি নিম্নলিখিত হিন্দু শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিধানে প্রকাশ পাইয়াছে—

স্ত্রীজাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ।
জনকস্বামীপুত্রৈশ্চ গর্হিতাশ্চৈশ্চ নিশ্চিতা॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে রক্ষতে পুত্র হ্নাথাং জ্ঞাতয়স্তথা॥

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি অবলা, আত্মীয়গণ তাহাকে সতত রক্ষা করিবেন। কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করিবেন। ইহা ছাড়া অন্য রক্ষক বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাহারা অনাথা তাহাদের জ্ঞাতিরা রক্ষা কবিবে।

এই 'অবলা'-ভাবটিকে নব্যসম্প্রদায়ের লোকেরা নিন্দা ও উপহাস করেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না কি যে স্ত্রী-জাতি অবলা বলিয়াই তাহারা পুরুষের নিকট এত আদর ও সম্মানের অধিকারী ? পাশ্চাত্য সভ্যতার gallantry (গেলেণ্ট্রি) একটি কামুকদের sensual (সেন্সুয়েল) ভাব, কিন্তু যাহাকে বলে chivalry (সিভেল্রি) তাহা পুরুষ হৃদয়ের একটি উচ্চতম ভাবের মধ্যে, এবং ইহা স্ত্রী জাতীর অবলাত্বর (weakness) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে প্রকৃতিস্থ সাধারণ স্ত্রী জাতিই উপরি উক্ত leaning ভাবের পক্ষপাতী। ইহাতে কেবল বিজ্ঞান নয়, কাব্যও আছে। তরু-আশ্রিত লতা একটি উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাব। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে সকল দেশেই বিশেষ বিধান আছে। আমাদের দেশেও মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি মহিলাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাম স্মরণ্য। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সাধারণ বিধিই প্রশস্ত।

২। দ্বিতীয়—সমাজ ও ধর্ম্ম দৃষ্টিতে—

ঋষিবর চরক ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতির কমনীয়তা ও মনোহারিণী শক্তি বর্ণনা করিয়াই চুপ হইয়া যান নাই। কেবল একটি সুন্দর ইন্দ্রিয় প্রীতিকর ও মনোমুগ্ধকর দ্রব্য বলিয়া তাঁহারা স্ত্রীজাতির পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহেন। যাহাতে বাহ্যদর্শী, ইন্দ্রিয় ভোগপরায়ণ পুরুষেরা স্ত্রীসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য না হয়, সে জন্য স্ত্রীজাতির পুরুষের সহিত সংসার ও ধর্ম্ম রক্ষার সম্বন্ধ ও দায়িত্বের কথা সত্বর অবতারণা করিয়াছেন। রমণীর হৃদয়গ্রাহিণী শক্তি বর্ণনা করিয়াই চরক ঋষি লিখিয়াছেন—

স্ত্রীষু প্রীতি বিশেষণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতং।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকা প্রতিষ্ঠিতা॥

চরক সংহিতা।

স্ত্রীতে প্রীতি বিশেষরূপে স্থাপিত বলিয়া স্ত্রী সন্তানের আশ্রয় ভূমি হইয়াছেন। অপিচ ধর্ম্ম ও অর্থ (সংসার) ও স্ত্রী লোকেরই আশ্রিত। এজন্য ভাগ্যলক্ষ্মী ও লোক সকল (পরিবার ও সমাজ) স্ত্রীলোকেই প্রতিষ্ঠিত।

আর সন্তানের আদর কেন ?

প্রীতির্বলং সুখং বৃত্তির্বিস্তারো বিভবঃ কুলং।
যশোলোকা সুখোদর্কা স্তুষ্টিশ্চাপত্য সংশ্রিতা॥

চরক সংহিতা।

সংসারে ভালবাসা, বল, সুখ, বৃত্তি (কায কর্ম্ম), বিস্তার (উন্নতি ও প্রতিপত্তি), বংশ রক্ষা, লোক (সমাজ কুটুম্বাদি) আশু সুখ ও উদক (পরিণাম সুখ), অবশেষে মনের সন্তোষ ও শান্তি, এ সমস্তই সন্তানের আশ্রয়াধীন। সন্তান না হইলে এ সবের কোন সার্থকতা নাই।

ঋষিরা যেমন একপক্ষে স্ত্রী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, অপর পক্ষে সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা malthusianismএর পক্ষপাতী ছিলেন না। একপক্ষে বহু পুত্রবানকে শতমুখে প্রশংসা

করিয়াছেন, অন্য পক্ষে অপুত্রককে ভাগ্যহীন ব্যক্তি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। স্ত্রীকে তাঁহারা মাতাভাবে দেখিতে ভালবাসিতেন, সে জন্য তাহাকে পুত্রবতী করিতে ব্যস্ত হইতেন। শিশু ক্রোড়ে নববধূ জগতের মধ্যে এক দিকে সাংসারিক সুখের অপর দিকে স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি—একাধারে পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহ বিদ্যমান। ইহাতে কুমারী ভাবও পাওয়া যায়। আধুনিক অর্থে যে "স্ত্রী" বা ভোগিনী ভাব ফুটাইবার জন্য নব্য সম্প্রদায় এত ব্যস্ত ও বিব্রত, ঋষিরা তাহাকে লুক্কায়িত রাখিতেই চেষ্টা করিতেন, কেন না সেটা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সাত্ত্বিক ভাব নহে, রাজস-তামস ভাব। তাঁহাদের মতে এই রাজসতামস ভাবের কেবল অপত্যোৎপাদনের জন্য অনিত্য সাময়িক আবশ্যক, ইহা মাতারূপিণী জগতের পোষণ কর্ত্রী স্ত্রীজাতির নিত্য বা স্বাভাবিক ভাব নহে। এজন্য সাধ্বী স্ত্রীরা পুত্রবতী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী বা কুমারী শ্রেণীর লোক, তাহা এই পত্রিকায় গত মাসে "স্ত্রী কি সহধর্ম্মিণী" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। যীশুর মাতা যোসেফের স্ত্রী হইয়াও, ও তাঁহার দ্বারা অন্যান্য সন্তান প্রসব করিয়াও চিরকুমারী—Virgin Mary খৃষ্টানদের পরম আরাধ্য দেবী। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পি Raphail (র‍্যাফেইল)এর যীশু কোলে ভার্জিন মেরির চিত্র (Sistine Madonna) শিল্পজগতে একটি অতুলনীয় চিত্র, বংশ বংশান্তরে পাশ্চাত্য জগতের লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর সহভোগিনী স্ত্রীভাব গোপন করার পরিচয় জগতারাধ্যা সাবিত্রী চরিতে উত্তমরূপে দেখা যায়, যেখানে পুরাণকার বলিয়াছেন—

> পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
> সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে॥
> শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
> শ্বশুরং দেবসংকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ॥
> তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণোন শমেন চ।
> রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ।

অর্থাৎ "পরিচর্য্যা, শীলসত্যাদিগুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সকলেরই তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তিনি আচ্ছাদনাদি সর্ব্বপ্রকার শরীরসৎকার দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজার আয়োজন ও বাক্য-সংযমন দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয় সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচর্য্যা দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। (চন্দ্রনাথ বসুর "সাবিত্রীতত্ত্ব")।

সমস্ত দিন গৃহকর্ম্মাদি করিয়া, ও শ্বশুর শাশুড়ি প্রভৃতি সকলের শয়নের পর পতির সহিত মিলন ও পতিসেবা পুরাতন হিন্দু পরিবারের পদ্ধতি ছিল, স্বামী স্ত্রীর কখন মিলন হইত কেহ জানিতে পারিত না। কিন্তু এখন সে নিয়মের ক্রমে ক্রমে ব্যতিক্রমের বৃদ্ধি হইতেছে। এখন শ্বশুর শাশুড়ি বা অন্য গুরুজনের সম্মুখে স্বামী আসিলে বধূর মাথায় কাপড় দেওয়াও একটা অসভ্যতার চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। শাস্ত্রে কুলবধূর লজ্জাকে ব্রহ্ম বিদ্যার সহিত তুলনা করা হইয়াছে ("ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব"), অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা যেমন কেবল মাত্র উচ্চ সাধককে দেখা দেন, সেইরূপ কেবল স্বামীর সমক্ষেই ও অন্যের অবর্ত্তমানে বধূর ঘোমটা খোলা হয়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়িকেরা পুরাতন রীতিকে অজ্ঞান অন্ধকারের পরিচায়ক বলিবেন, ও নূতনকে হিন্দু গৃহে সভ্যতার আলোক প্রবেশের ফল বলিবেন। এজন্য তাঁহাদের সম্মান-যোগ্য একটি ইংরাজী নজীর দিতেছি।—

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত Herbert Spencer (হারবার্ট স্পেন্সার) তাঁহার বন্ধু Mr. Lot (মিঃ লট)কে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে ছাপা (dated 18 March 1845)। ঐ পত্রে ঐ প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছেন—And on this ground I conceive that instead of there bieng, as is commonly the case, *a greater familiarity and carelessness with regard to appearances* between husband and wife, there ought to be a greater delicacy than between any other parties.

ধর্ম্ম ও সমাজ দৃষ্টিতে স্ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে আর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, তৃতীয় অর্থাৎ বড় বা material দৃষ্টিতে শাস্ত্র স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—

> প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
> স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চনঃ॥

মনুসংহিতা।

সন্তানোৎপাদনের কারণ বলিয়া রমণীগণ সংসারের পরম মঙ্গলদায়িনী এবং গৃহের শোভা সংবর্দ্ধনহেতু তাঁহারা পূজার পাত্র। গৃহে স্ত্রী ও শ্রী (লক্ষ্মীতে) কোন পার্থক্য নাই।

তদর্থং ধর্ম্মার্থৌ সুত বিষয় সৌখ্যানি চ ততো।
গৃহে লক্ষ্ম্যো মান্যা সততমবলা মানবিভবৈঃ॥

—বৃহৎসংহিতা।

সংসারে ধর্ম্ম, অর্থ, পুত্রসুখ ও বিষয়সুখের মূলীভূত কারণ সেই লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীরত্ন। অতএব অবলা হইলেও সর্ব্বদা ধন ও যত্ন দ্বারা তাঁহাদের সন্মান করিবে।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলঞ্চ সন্ততেঃ॥
যস্য ভার্য্যা শুচির্দক্ষা ভর্ত্তরিনুগামিনীম্।
নিত্য মধুরবক্ত্রী চ স রমা ন রমা রামা॥

পদ্মপুরাণ।

ভার্য্যা পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। ধর্ম্ম,অর্থ ও ভোগ এই ত্রিবর্গের ও সন্তান সন্ততির ভার্য্যাই মূল। যে ভার্য্যা শুচি, সাংসারিক কাজকর্ম্মে পটু, স্বামীর বাধ্য * ও সর্ব্বদা মধুরভাষিণী. তিনিই প্রকৃত **রমা** (লক্ষ্মী), গোলকধামে যে বিষ্ণুপত্নী **রামা** আছেন তিনি প্রকৃত (রমা) লক্ষ্মী নহেন। এই শেষ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, স্ত্রী গৃহকর্ম্মে ও সেবাধর্ম্মে নিপুণ হইলেই লক্ষ্মী পদবাচ্য। বিষ্ণুর রামার ন্যায় কেবল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইলেই তাহাকে লক্ষ্মী বলা যায় না। সেবাধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ভূষণ, ঐশ্বর্য্য নহে। ইহা অবশ্য প্ররোচনার্থ অত্যুক্তি বুঝিতে হইবে।

শ্রীরত্ন ভোগোঽস্তি নরস্য যস্য নিস্বোঽপি প্রভাবনীশ্বরাঽসৌ।
রাজস্য সারোঽশনমঙ্গলাশ্চ তৃষ্ণানলোদ্দীপন দারুশেষম্॥

—বৃহৎসংহিতা।

যে ব্যক্তি প্রকৃতি রমণীরত্নের অধিকারী তিনি দরিদ্র হইলেও অবনীর ঈশ্বর। রাজ্যের সার পদার্থ দুইটি, (১) খাদ্যদ্রব্য, যাহার দ্বারা জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, ও (২) স্ত্রী, যিনি ইহ ও পরলোকে পতির মঙ্গলের আশ্রয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থই তৃষ্ণানলের উদ্দীপক কাষ্ঠস্বরূপ। (এস্থলে স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, বিলাসিনী নহেন, তিনি স্বামীকে পাপ হইতে রক্ষাই করেন, পাপমুখী করেন না। তাঁহা হইতে সংযম ও ত্যাগ বা সেবাধর্ম্ম শিক্ষা হয়।)

এরূপ সাত্ত্বিকভাবে স্ত্রীপূজা, তাহাকে লক্ষ্মী, দেবী, ধর্ম্মের সহায় ও সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী জানিয়া তদনুরূপ সন্মান ও যত্নকরা, কোন্ জাতির মধ্যে ও কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষায় আছে? ইংরাজী নাটক নভেলের যে স্ত্রীপূজা বা darling-worship তাহা হিন্দু আদর্শের তুলনায় একটি অপবিত্র কামভাব মাত্র। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এই ভাব আমাদের কোন কোন কবি ও ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করিয়া তাহাকে "প্রেম" নাম দিয়া তাহাকে হিন্দু সমাজের মধ্যে ছড়াইতে চাহেন। হিন্দু সমাজ যদিও এখন অধঃপতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তথাপি স্ত্রীকে মুখ্যত সহধর্ম্মিণী ও সন্তানের মাতা বলিয়াই তাঁহার পূজা ও সন্মান করিতে ইচ্ছুক, বিলাসের সঙ্গিনীরূপে লোক সমক্ষে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত নহে। এ বিষয়ে Herbert Spencer [হার্‌বারট স্পেন্সার] যে সংযমের উপদেশ দিয়াছেন তাহা হিন্দুর মনোমত দেশ ও সমাজভেদে আরও উৎকৃষ্টরূপে পালনীয়। কেননা ইংরাজি সমাজে যাহাকে delicacy [ডেলিকেসি] বলা যায় তাহা আমাদের সমাজের "সন্তর্পণের" অপেক্ষা অনেক অল্প। এরূপ সন্তর্পণের সহিত ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীজাতির অধিকতর সমাদর ছাড়া অনাদর হয় না। যে দেশে ঘরে ঘরে বৈধব্যব্রত, সে দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ সংযমেরই আবশ্যক। হিন্দু-গৃহে বা সমাজে স্ত্রীজাতির যে কিরূপ সন্মান ও আদর, মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র সে বিষয়ে কিরূপ উৎকৃষ্ট বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই জানেন, পুনরুল্লেখ করিয়া লিপিবাহুল্য করার আবশ্যক নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা হিন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা ও পদগৌরবের পার্থক্যতা বুঝা যাইবে। বিবাহ সংস্কার, ধর্ম্ম ও সমাজ উভয় দৃষ্টিতেই সভ্য মনুষ্যজাতিদের মধ্যে প্রধান সংস্কার। পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে এই সংস্কারে কন্যার পিতা বা পিতৃব্য বা ভ্রাতা সম্প্রদানের কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয় স্ত্রীলোকের ইহাতে কোন হাত নাই। তাঁহারা আমোদে যোগদান

* ইংরাজ আমেরিকানদের বিবাহ পদ্ধতিতে, বরকন্যার পরস্পর প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের সময়ে, বর অঙ্গীকার করেন to love and to cherish till death us do part কিন্তু কন্যা বলেন to love, cherish *and to obey* till death us do part.

করেন ও বাটির গৃহিণী ভোজাদির জন্য আয়োজন করেন বটে, কিন্তু ভোজ অনেক সময়ে হোটেলেও সম্পাদিত হয়। কিন্তু হিন্দুবিবাহে "স্ত্রী আচার" একটি প্রধান অঙ্গ। সম্প্রদান ছাড়া সকল ব্যাপারই স্ত্রীলোকদের হাতে। অপিচ কেবল বর-কন্যার বাটীর স্ত্রীলোকদেরই ইহাতে অধিকার নহে, আত্মীয় কুটুম্বদের মেয়েরাও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন। শেষ-তোলানি, নমস্কারি প্রভৃতি সব স্ত্রীলোকেরাই পান। ফুল-শয্যায় তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা। আর এই অনুষ্ঠানের সহিত ইংরাজি honeymoon (হনিমুন)এর তুলনা করুন। স্ত্রীজাতি যে হিন্দুর সমগ্র সংসার ধর্ম্মের কলকাটি তাহা বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক ব্যাপার দেখিলেই বুঝা যায়। ইহাতেও যদি কেহ বলেন যে হিন্দুরা স্ত্রীজাতির সম্মান পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে করিতে শিখিয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অন্ধ।

শ্রীঅমৃতলাল রায়।
(লাহোর)

গান

তুই আমার সোনার মাটী, মাগো আমার বাংলা দেশ।
নিকষেতে কষা খাঁটি, স্নেহ দয়ার নাইক শেষ।
কেমন শীতল বাতাস তোমার, কেমন পাখীর মধুর গান।
কেমন ফুলের গন্ধটুকু বিভোর করে তোলে প্রাণ।
ছয় ঋতুতে সদাই সেবে, তুই আমাদের রাজরাণী।
নদী ধোয়ায় চরণ দুটি, কুসুম ভূষণ দেয় আনি।
কাঁচা ঘাসের আসন পেতে ধানের গোছা বাজন করে।
তরুণ রবির সোনার আলোয় আঙ্গিনাটি যায় যে ভরে।
সুজলা তুই, সুফলা তুই, মাটিতে তোর সোনা ফলে।
কতকালের আরাধনায় ঠাঁই পেয়েছি তোমার কোলে।
তোমার শ্যামল রূপের ছবি বুকের মাঝে আছে ফুটি!
নমো, নমো জন্মভূমি, নমি মা তোর চরণ দুটি।

শ্রীপ্রতিভা দেবী।

সুধীবচন

"অবজ্ঞক্রুটিতং প্রেম নবীকর্ত্তুং ক ঈশ্বরঃ।
সন্ধিং ন যাতি স্ফুটিতং লাক্ষা লেপেন মৌক্তিম্॥"

অবজ্ঞায় ভাঙ্গা প্রেমকে কে আবার নূতন করিয়া জোড়া দিতে পারে। ফাটাযুক্ত লাক্ষা লেপে জুড়িয়া যায় না।

"ইচ্ছেচেৎ বিপুলাং মৈত্রাং ত্রীণি তত্র না কারয়েৎ।
বাগ্‌বাদমর্থসম্বন্ধং তৎ পত্নীপরিভাষণম্।"

কোথাও কাহারও সঙ্গে বিশেষ মৈত্রী যদি ইচ্ছা কর তিনটি কাজ সেখানে করিবে না।—বাগবিতর্ক, অর্থসম্বন্ধ আর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ।

"লোকেষু নির্ধনো দুঃখী ঋণগ্রস্ত স্ততোঽধিকং।
তাভ্যাং রোগযুতো দুঃখী তেভ্যঃ দুঃখী কুভার্য্যকঃ।"

লোকের মধ্যে নির্ধন দুঃখী, তার অপেক্ষাও দুঃখী ঋণগ্রস্ত -উভয়ের অপেক্ষাও রোগযুক্ত দুঃখী। আর ইহাদের সকলের অপেক্ষাও দুঃখী সে, যে কুভার্য্যার পতি।

"যৌবনং ধন সম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম॥"

যৌবন, ধন সম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা,—ইহাদের এক একটিই অনর্থের কারণ! চারিটি যেখানে একত্র হয় সেখানে কি না হইতে পারে?

"ধনধান্য প্রয়োগেষু বিদ্যা সংগ্রহণেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সুখীভবেৎ॥

ধন ধান্যের প্রয়োগে, বিদ্যা সংগ্রহে, আহারে, ব্যবহারে যে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে পারে সেই সুখী হয়।

"কিমপাস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যা সুন্দরং।
যদেব রোচতে সর্ব্বে ভবেত্তত্তস্য সুন্দরম্॥"

স্বভাবে কিই বা সুন্দর আর কিই বা অসুন্দর; যার যা ভাল লাগে, তাই তার কাছে সুন্দর।

"যস্য যস্য হি যদ্ভাবং তেন তেন হি তং নরং।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ।

যার যে রূপ ভাব, সেই ভাবের দ্বারাই সেই লোকের মনে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শীঘ্র তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া ফেলে।

"দোষভীতেরনারম্ভ স্তৎ কাপুরুষলক্ষণং।
কৈ রজীর্ণ ভয়াদ্ভ্রাতঃ ভোজনং পরিহীয়তে।"

পাছে কোনও মন্দ হয়, এই ভয়ে, কার্য্য আরম্ভ না করা কাপুরুষের লক্ষণ। পাছে অজীর্ণ হয় এই ভয়ে কে ভাই ভোজন ত্যাগ করে।

"স্থান এব নিযোজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণাণি চ।
নহি চূড়ামণিঃ পাদে নূপূরং মূর্দ্ধি ধার্য্যতে॥

ভৃত্য ও অলঙ্কার যথা স্থানেই নিয়োগ করিতে হয়। পায়ে চূড়ামণি কি মাথায় নুপূর ধারণ চলে না।

"বন্ধু-স্ত্রী-ভৃত্যবর্গস্থ বুদ্ধেঃ সত্যস্থচাত্মনঃ।
আপন্নিকষ-পাষাণে নরো জানাতি সারতাম্॥'

বন্ধু, স্ত্রী এবং ভৃত্যবর্গের বুদ্ধিতে কি সার আছে এবং আপন সত্যেরই বা কি সার আছে, আপদকালে নিকষ পাষাণে মানুষ তাহা জানিতে পারে।

"কুর্ব্বন্নপি ব্যলীকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এব সঃ।
অনেকদোষদুষ্টোঽপি কায়ঃ কস্য ন বল্লভঃ॥"

মন্দ করিলেও প্রিয় যে, সে প্রিয়ই থাকে। অনেক দোষে দুষ্ট হইলেও নিজের দেহকে কে না ভাল বাসে।

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্য্যকালাত্যয়েষু চ।
কল্যাণবচনং ব্রূয়াদপৃষ্টোঽপি হিতো নরঃ॥

আপৎকালে যদি কেহ ভুল পথে যায়, কার্য্যকালে অনিষ্ট হইতেছে দেখা যায়, তবে জিজ্ঞাসা না করিলেও হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ হিতবচন বলিবে।

বাঙ্গালা উপন্যাসে চায়ের প্রভাব

ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে "Tempest in a tea pot"—চায়ের পাত্রে তুফান উঠা—একটা আলঙ্কারিক উক্তি হইলেও আজকাল বাঙ্গালা উপন্যাস যে চায়ের তুফানে প্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা যে কোনও আধুনিক উপন্যাস বা মাসিক পত্রের গল্প পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি", প্রভাতকুমারের "নবীন সন্ন্যাসী" হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাসিক রাম, শ্যাম ও যদুর লিখিত আধুনিক প্রায় সকল উপন্যাসে ও ছোটগল্পে চায়ের অবতারণা অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পিরীচপেয়ালাশোভিত টেবিলই অধুনা যেন সেকালকার কুসুমাবলীশোভিত কুঞ্জকুটিরেরর স্থান অধিকার করিয়াছে। চায়ের টেবিলই আজকালকার উপন্যাসের নায়কনায়িকার মিলনক্ষেত্র—আধুনিক "জগৎসিংহ" দিগের "শৈলেশ্বরের মন্দির"। বস্তুতঃ এই চায়ের টেবিল না থাকিলে আধুনিক উপন্যাসের কত নায়ককে যে মাঠে মারা যাইতে হইত তাহা বলা যায় না।

বৈষ্ণব কবিদিগের সময়ে যেমন কানু ছাড়া গীত হইত না, আজকাল তেমনই চা না হইলে যেন উপন্যাস হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে চায়ের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাহা না হইলে তাঁহার উপন্যাসেও বোধ হয় আমরা চায়ের অবতারণা দেখিতে পাইতাম ও নায়িকার চা প্রস্তুতের বর্ণনার রসাস্বাদে ধন্য হইতে পারিতাম। তাহা না হইলে তাঁহার শ্রীশচন্দ্রকে তাম্রকূট সেবায় তৎপর না দেখিয়া কমল মণির কোমল করে প্রস্তুত চায়ের পেয়ালায় বিভোর দেখিতাম এবং নিশাকর বাবু প্রসাদপুরের উদ্যান বাটীতে গোবিন্দলাল, রোহিনী ও ওস্তাদজীর সম্মুখে সাজসরঞ্জামপূর্ণ চায়ের ট্রে দেখিতে পাইতেন। এমন কি আনন্দমঠের জীবানন্দ ঠাকুরও অত রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া গিয়া নিমাইয়ের নিজের ও তাহার স্বামীর সমস্তগুলি অন্নধ্বংশ করিবার পূর্ব্বে নিমাইকে এক কাপ চা ফরমাস করিতেছেন দেখিতে পাইতাম।

প্রণয়রসের সঙ্গে চা রসের খুব সম্ভব একটা নিকট সম্পর্ক আছে। বোধ হয় দুয়েরই নেশা অনেকটা এক রকম (ক্লান্তি ও জড়তানাশক এবং চিত্তস্ফূর্ত্তিকারক) বলিয়া এবং দুইটা জিনিসই বিদেশীদিগের অনুকরণ বলিয়া (আমাদের দেশে যে প্রণয় ছিল না বা নাই তাহা নয়—আমি আধুনিক উপন্যাসে বর্ণিত বিলাতী প্রেমের কথা বলিতেছি)। উপন্যাসে তাহারা স্থান পাইতেছে। চা যেমন খালি পেটে অনিষ্টকর এবং অনেক সময়ে পরিণামে অম্ল ও অজীর্ণরোগ উৎপন্ন করে, প্রণয়ও সেইরূপ খালিপেটে (অর্থাৎ যাহার পেট ভরাইবার সামর্থ্য নাই তাহার পক্ষে) সহ্য হয় না। সেই জন্যই সম্ভবতঃ উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদিগকে বেশ একটু অবস্থাপন্ন দেখা যায়।

উপন্যাসে এই চায়ের অবতারণার রকম ফের আছে।

কোথাও বা নায়ক অথবা উপনায়ক ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রাতঃকালে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন কিম্বা প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া কোন বন্ধুগৃহে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার দ্বারা চা পানে অনুরুদ্ধ হইতেছেন। ইহা হইল প্রণয়রস বর্জ্জিত নির্দ্দোষ চা পান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু সান্ধ্য বা অপরাহ্নকালীন মজলিসে নায়কের নিমন্ত্রণে বা বিনা নিমন্ত্রণে আবির্ভাব ও তাঁহার সমক্ষে ভৃত্যহস্ত বাহিত ট্রে হইতে লজ্জা-কম্পিত হস্তে গৃহীত পাত্রে নায়িকার চা প্রস্তুতকরন দৃষ্ট হয়। অবশ্য এ সকল মজলিসে সচরাচর নায়িকার কন্যাগত প্রাণ বৃদ্ধ পিতা (সাধারণতঃ বিপত্নীক) এবং ক্কচিৎ অন্যান্য আত্মীয় বান্ধব (সময়ে সময়ে "ওসমান" জাতীয় প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীও) উপস্থিত থাকেন। দুই এক স্থলে চা পানে অনভ্যস্ত নায়কের রবীন্দ্রনাথের গোরার মত প্রথমে চা পানে অনিচ্ছা প্রকাশও দেখা যায়। কিন্তু দুই চারিদিন চায়ের টেবিলে উপস্থিতির পর এ বিষয়ে তাহার মতের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এবং তাহার তৎপরবর্ত্তী ব্যবহার দর্শনে মনে হয় যেন চা পানে তিনি আশৈশব অভ্যস্ত ও ইহার উপরই তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এইরূপ আদান প্রদানের ফলে জড় পদার্থ চা রস বাষ্পীভূত ও রূপান্তরিত হইয়া যে কখন নায়ক নায়িকার হৃদয়ে প্রণয় রস নামক মানসিক বৃত্তিতে পরিণত হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিদ গণের বিচার্য্য, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরে ভবিষ্যৎ প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা এই সকল উপন্যাস ও গল্প পাঠ করিয়া যদি বলিয়া বসেন যে বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার লোকেরা প্রণয়রসের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বেদোক্ত সোমরসের ন্যায় চা রস নামক এক প্রকার কবোষ্ণ তরল পদার্থ পান করিত তাহাহইলে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকিবে না। এমন কি তাঁহারা যদি মনে করেন যে চা রসই পূর্ব্ববর্ত্তী প্রণয়ীগণের একমাত্র আহার্য্য ও পানীয় ছিল তাহাতেও তাঁহাদিগকে দোষী করা যাইবে না।

উপন্যাসে চায়ের এই প্রাচুর্য্য দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হয় বুঝিবা চা ব্যবসায়ীগণ চায়ের মহিমা প্রচারের জন্য আধুনিক ঔপন্যাসিক দিগের সঙ্গে "কেশে মাখ কুন্তলীনে"র মত কোনওরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমাদের জাতির একটা অপবাদ আছে যে কোনও বিষয়ে আমাদের দুইজনের মতের মিল হয় না। কিন্তু চায়ের টেবিলের সহিত নায়ক নায়িকার অচ্ছেদ্যবন্ধন সম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থকারগণের আশ্চর্য্য মতের মিল দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। গতানুগতিকতা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী ও সুপরিচিত দুই একজন লেখক এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক প্রায় সকল গল্পে ও উপন্যাসে লেখক দিগের এই একই বর্ণনা কি ক্রমে হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে না?

শ্রীপ্রমথনাথ দে।

নবীনকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে আমি ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের জীবন কথা কিছু বিবৃত করিয়াছিলাম। আজ আবার তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠকবর্গের গোচরে আনিতেছি। আজ আমি নিজের কথা বিন্দুমাত্র না বলিয়া কয়েকজন গুণী, জ্ঞানী, সদাশয় ও সুবিখ্যাত বিচক্ষণ লোকে তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। মূল পরিচয়টুকু গোড়ায় দিয়া রাখি—৺নবীনবাবু "সংবাদপ্রভাকর", "সাধুরঞ্জনের" নিয়মিত শ্রেষ্ঠ লেখক "তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার" সহকারী সম্পাদক ও পরে প্রধান সম্পাদক, "এডুকেশন গেজেটের" সম্পাদক "বিবিধার্থ সংগ্রহের" সহযোগী সম্পাদক ও পরে যুগ্ম সম্পাদকের অন্যতম এবং 'রহস্য সন্দর্ভ' 'সোমপ্রকাশ' ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনে প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি "হিন্দুপেট্রিয়টের" কিছুকাল সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত আমার অক্ষম হস্তে কিরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবে, জানি না, তবে কাঠামোখানার উপর মাটি ধরাণ হইয়াছে, ইহা মিথ্যা কথা নহে।

এই ক্ষুদ্র গৌরচন্দ্রিকার পর কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রসিদ্ধ লোকে তাঁহার সম্বন্ধে আমাকে পত্র লিখিয়া এবং

অন্যান্য কাগজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা সাজি সাজাইয়া দিতেছি। জগৎ বিখ্যাত জর্ম্মাণ সুধীপ্রবর ম্যাক্সমূলার আমাকে লিখিয়াছিলেন—

Oxford, 6th May 1899,

Dear Sir,

I know indeed the name of the late Rai Nobin Krishna Banerji and his Tattwa Bodhini Patrika. I also know the names of several of his friends and fellow laborers, and the excellent work they have done for the enlightenment of their country and the purification of their ancient religion......Few people in Europe have as yet fully appreciated the labors of these martyrs to a noble cause, bat I have for many years admired their devotion to a noble cause and their perfect unselfishness. We have not many men to place by their side for disinterestedness and perseverence. There must be people who are satisfied with having sown the seed without ever seeing the fruit, but the harvest is ever to follow. All we can do is to record their good work and to follow their good example.

Yours very faithfully,
(Sd.) F. MAX. MULLER.

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন—

নবীন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-চরিত সংগ্রহ হইতেছে, বড় আনন্দের কথা। আমি তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে চিনিতাম। তিনি আমার পিতৃ-বন্ধু। আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমার পিতৃদেব ও নবীন বাবু পরস্পর পরস্পরকে "বৈবাহিক" বলিতেন, কাজেই আমার জন্মের পর একটু জ্ঞান হইলেই আমি নবীনবাবুর জামাই হইলাম। তিনি আমাকে "বাবাজী" বলিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল। বহুদিন ধরিয়া তিনি "তত্ত্ববোধিনীর" সম্পাদকতা করেন, আর বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্যসন্দর্ভ, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি পত্রে এবং "বিশ্বকোষ" প্রভৃতিতে একসময়ে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তিনি তৎকালের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী।

তিনি নিতান্ত অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার মত লোক এখন আর দেখা যায় না। সর্ব্বদাই হাসিখুসি, সর্ব্বদাই রহস্য, একটা গল্পের পর আর একটা গল্প। * * *

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমায় লিখিয়াছেন—

Bhubaneswar, Orissa.
30th Nov. 1911.

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৮ই তারিখের পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি একটি মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। নবীন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি জীবন-চরিত হওয়া আবশ্যক। সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। * *

বিনয়াবনত
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

ভারতীর প্রিয় সন্তান সুবিখ্যাত কবি, শিল্পী, নাট্যকার ও সাহিত্যসেবীর গৌরবস্থল শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন—

শান্তিধাম, রাঁচি, ২৫ ডিসেম্বর

সবিনয় নিবেদন—

৺নবীন বাবুর জীবনী লিখিতেছেন শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি আমাদের বাড়ীর একজন অন্তরঙ্গ লোক ছিলেন। তাঁর মত পরিহাস-রসিক অতি অল্প লোকই দেখিয়াছি। তাঁহার পরিহাস সকলকে আমোদ দিত কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিত না। তাহাতে মার্জ্জিত রুচি প্রকাশ পাইত। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর একটা ছবি পেন্‌সিলে আঁকিয়াছিলাম—সে ছবি আমার ছবির খাতায় আছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশেষে বলি, নিজের কথা পঞ্চাশ কাহন না কহিয়া, আপন মনে নির্ভয়ে খোসমেজাজে গালগল্পে গণ্ডগোলরূপ কাঁটার আগাছা ভরা বিন্ধ্যগিরি সৃজনে বিরত হইয়া, স্বদেশের বিদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কয়েকজন ঋষিকল্প মহাপ্রাজ্ঞ এবং কয়েকটি স্বনামধন্য কবি, লেখক এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক মহৎ ব্যক্তির নবীন বাবুর বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। সহৃদয় ও সমজদার পাঠক আমার অর্চ্চনার প্রতিমা যিনি (hero) তিনি কেমন পণ্ডিত, কেমন সাহিত্য ব্রতে আত্মবিসর্জ্জনকারী, স্বার্থত্যাগী সাহিত্য রস-রসিক, একনিষ্ঠ যোগীকল্প পুরুষ ছিলেন, কত রহস্যপ্রিয় কত সহৃদয়, কিরূপ বন্ধুবৎসল, সরলচেতা, কোমলপ্রাণ সাহিত্য সর্ব্বস্ব অকপট স্বদেশভক্ত, কাব্যগতপ্রাণ কাব্য-গন্ধমোদিতজীবন পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের অসত্য-লেশশূন্য মূল্যবান কথা হইতেই অবশ্য অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন, তবে এখন এ বেচারাকে সাহিত্য বাজারে রচাকথা চালানের দায় হইতে অব্যাহতি দিন।

শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বিদ্যানন্দ।

একাধারে কুমারী ও মাতা ;

রাফেলের জগদ্বিখ্যাত সিসটাইন মেডোনা

৫ম বর্ষ } ফাল্গুন—১৩২৫ { ১১শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্যাটেলের বিল—হিন্দু সমাজে অন্তর্জ্জাতিক বা সঙ্কর বিবাহ।

রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিবাদ

হিন্দু সংজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বৈধ হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে মিষ্টার প্যাটেল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা লইয়া হিন্দু সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

রক্ষণশীল বা Conservative হিন্দুগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, এইরূপ অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী। যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ আশ্রিত, সেই ভিত্তি ইহাতে শিথিল হইবে,—ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ফলে হিন্দু সমাজেরও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে বিদেশী ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষগণের হাত দেওয়া উচিত নয়,—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে এই সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাহা ভঙ্গ হইবে। ইত্যাদি—বহুবিধ আপত্তির কারণ ইঁহারা দেখাইতেছেন। এইসব বিবিধ আপত্তি সম্বন্ধে আমরা ক্রমে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপত্তিগুলির কথা ভাল করিয়া বিচার করিতে হইলে, আগে তাহাদিগকে মোটামুটি বুঝিয়া নিতে হইবে, হিন্দুর সংজ্ঞা কি; হিন্দুসমাজ বলিতে কি বুঝায়, এবং সেই সমাজ কি ভাবে কি নীতিতে শাসিত হইতেছে।

হিন্দু ও হিন্দু সমাজ

কথায় কথায় অনেকেই আজকাল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে কি লক্ষ্য করিয়া, কি ভাবে, কি অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মূল যে চারিবর্ণের বিভাগ ও পর্য্যায়ের উপরে প্রাচীন হিন্দু সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন আর তাহা নাই। যে চতুরাশ্রমগত ধর্ম্ম পালন ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু জীবননীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা এখন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আশ্রম ধর্ম্মের পর্য্যায় ত একেবারেই লোপ পাইয়াছে। ব্রহ্মচারী নাই, সামাজিক হিন্দুগণ শেষ জীবন পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই গৃহস্থ,—যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা প্রথম যৌবনাবধিই সন্ন্যাসী। নিবৃত্তিতে গার্হস্থ্য বানপ্রস্থে পরিণত হইয়াছে,

এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দুই একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। চারি আশ্রম কোথাও নাই, আছে মাত্র দুইটি আশ্রম গার্হস্থ্য আর ভৈক্ষ্য। তাও একটি অপরটির পরিণতি নহে। এইরূপ গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য এই দুই আশ্রম অল্পবিস্তর বহুদেশে বহু সমাজেই দেখা যায়। সুতরাং হিন্দুসমাজের তেমন কোনও বিশেষত্ব অধুনা ইহাতে নাই।

তারপর বর্ণের কথা। ব্রাহ্মণ আছেন; সমাজের শীর্ষ জাতি বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন; এ দাবী নিশ্চেষ্টভাবে একরূপ স্বীকৃতও হয়। কিন্তু যে শিক্ষায় ও গুণে ব্রাহ্মণ পুরাকালে বর্ণশ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে শিক্ষা ও গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে নাই। যা আছে, তাও ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পদ নহে। অন্ততঃ উচ্চতর জাতীয় সকল হিন্দুর মধ্যেই তাহা দেখা যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামধারী সম্প্রদায়ও কতক কতক দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। অসংখ্য জাতিতে ইঁহারা বিভক্ত। এই জাতি সমূহের মধ্যে উচ্চ নীচ একটা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় এখন বড় দেখা যায় না। শিক্ষিত ও মানসিকশ্রমজীবী এবং অশিক্ষিত ও দৈহিকশ্রমজীবী—মোটা মুটি এই দুইটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন নাকি অন্য সকল দেশেই আছে। বেশী এই যে শেষোক্ত এই শ্রেণীর অতি নিম্ন এমন একটি স্তর আছে, যাহাদের পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অন্য জাতিরা ব্যবহার করেন না। প্রত্যেক শ্রেণী আবার বহু জাতিতে বিভক্ত একে অপরের পৃষ্ট পক্কান্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না,—কেহ কাহারও অপেক্ষা নিম্নতর বলিয়াও বড় স্বীকার করে না। একথাও অবশ্য বলিতে হইবে যে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানও হয় না। না হইবার পক্ষে শাস্ত্রবিধির বাধা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া জানি না। তবে না হওয়াটাই একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রবীণ শাস্ত্র সংহিতা সমূহ চারি বর্ণের অতিরিক্ত বহু সঙ্কর বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বর্ত্তমান জাতি সমূহের মধ্যে কোন জাতি যে শাস্ত্রবর্ণিত কোনটি ঠিক সঙ্কর বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও নির্ণয় করিয়া উঠা দুঃসাধ্য।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্ম বলিতে বাস্তবিক কি বুঝায়, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত নাই। এখন যে বর্ণ বা জাতি বিভাগে দেখা যায়, তাহা নূতন ধরণের বস্তু। বহু অবস্থার সংঘর্ষে কালের গতিতে হিন্দুসমাজ এই আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন সেই আশ্রম বিভাগও যে নাই, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

প্রাচীন ও শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি সত্যই নাই, তবে হিন্দুর সামাজিক লক্ষণ কি? প্রশ্ন সহজ নয়,—উত্তর ক্রমে দিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দুর লক্ষণ যেমন তার সামাজিকত্বের দিক দিয়া একটা আছে, তেমনই তার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম সাধনার দিক দিয়াও একটা আছে। এই দিকটা সাধারণতঃ আজকাল 'হিন্দু-ধর্ম্ম' নামে পরিচিত। কিন্তু এই 'হিন্দু ধর্ম্ম' কি যে কি সহজে কেহ কোনও সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি? বেদের ধর্ম্ম? কিন্তু বেদের ধর্ম্ম কয়জনে জানে? মুখে মানিলেও আচারে বেদের ধর্ম্ম অনুসারে কয়জনে চলে? ধর্ম্ম সাধনায় বিশুদ্ধ বেদের বিধি কোথায় এখন দেখা যায়? দুই একটি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকিলেও উচ্চতর জাতি সমূহের ধর্ম্ম সাধারণতঃ এখন স্থূল পরিমাণে তান্ত্রিক। সেই তান্ত্রিকতাও আবার কত রকম আছে। তন্ত্রের বহির্ভূত আরও কতরকম বিশ্বাস কতরকম মত কত রকম সাধনা যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও অবধি নাই। নিম্নতর জাতি সমূহের মধ্যে আরও কত নূতন নূতন বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি দেখা যায়। মোটের উপর এই একটা কথা বলা যায় যে 'হিন্দু ধর্ম্ম' বলিয়া আমরা যাহার উল্লেখ করি, তাহা নির্দ্দিষ্ট কোনও শাস্ত্রবিহিত নির্দ্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞার ভুক্ত বিষয় নহে। ইহা বহুতর বিশ্বাস ও উপাসনা পদ্ধতির একটা বিরাট সমন্বয়। প্রাচীন কাল হইতে বহু ধর্ম্মমতের উদ্ভবে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বহু জাতির সম্মিলনে এই সমন্বয় ঘটিয়াছে।

তবু ইহা সমন্বয়—সহস্র বৈষম্যের অপূর্ব্ব এক অতি বিচিত্র সমন্বয়। সমাজনীতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সাধনার পদ্ধতি—ইহার কোনওটির দিক দিয়াও নির্দ্দিষ্ট এক সংজ্ঞার দ্বারা হিন্দুকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এই সমন্বয়ের বলেই হিন্দু হিন্দুনামধারী; বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ রীতি-নীতি, বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধনাপ্রণালী অনুসারে চলিলেও, সকলের সবই হিন্দু নিজস্ব সম্পদ বলিয়া মানে ও

অন্তরে শ্রদ্ধা করে। বিশেষ দুই একটি অঙ্গ ছাড়া সকলের সকল অনুষ্ঠানেই প্রায় সকলে শ্রদ্ধায় আপনার বলিয়া যোগ দেয়। ভারতময় অসংখ্য হিন্দুর তীর্থ সকলেরই সমান তীর্থ; তীর্থের দেবতাকে প্রতি তীর্থের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সকল হিন্দু সমান শ্রদ্ধায় পূজা করে। তা ছাড়া, ভারতের প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মসাহিত্য সেই সাহিত্যের সাধারণ তত্ত্বকথা, নীতির মূল আদর্শ পুরুষপরম্পরা। সকলেই আপন বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছে। পুরুষপরম্পরাগত সেই সব সংস্কারের বশে তাহাদের ধর্ম্মজীবন পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছে।

ইহার মধ্যে একটি সত্য আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। কি ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধন প্রণালীতে কি সমাজনীতিতে, হিন্দু সেই প্রাচীন হইতে আজ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট এক শাস্ত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে চলিতেছে না। যুগ যুগে অবস্থার পরিবর্ত্তনে যেরূপ প্রয়োজন বহু পরিবর্ত্তন তাহার ধর্ম্মে ও সমাজে হইয়াছে। বহু নূতন নূতন ধর্ম্মমত ও নীতির উদ্ভব তাহাদের মধ্যে হইয়াছে।—বহু নূতন জাতি তাহাদের নূতন ধর্ম্মমত ও সামাজিক রীতিনীতি লইয়া হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাদের সেই সেই ধর্ম্মমত বা রীতিনীতি হিন্দুর সার্ব্বভৌমিক চিরন্তন মর্য্যাদাবৃত্ত সম্বন্ধে হিন্দুজনার আকার ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং যে বৈচিত্র্যময় ধর্ম্মবিশ্বাস, সাধনপ্রণালী ও সামাজিকরীতি হিন্দুমণ্ডলীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাকে এই অর্থে সনাতন ও শাশ্বত বলা যায় না যে, তাতে সবই ঠিক তাহাদের বর্ত্তমান আকারে ও প্রকারে সেই অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একেবারে অক্ষুণ্ণ অবিকৃত অপরিবর্ত্তিত এক অবস্থাতেই আছে ও থাকিবে। জ্ঞানী হিন্দু যাহাকে সনাতন ও শাশ্বত বলিতে পারেন, তাহা যে কি তাহা অল্প কথায় এখানে বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা ও অনাবশ্যক। আর সেই জ্ঞানের অধিকারও আছে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি না।

সুনির্দ্দিষ্ট ও সমগ্র কোনও 'সনাতন' ধর্ম্মের অনুসরণ না করিলেও, এবং খৃষ্টান বৌদ্ধ মুসলমান য়িহুদি প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের ন্যায় স্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা দ্বারা লক্ষিত করা কঠিন হইলেও, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মোট একটা প্রকৃতি যে একেবারেই বোঝা যায় না, তা নয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত, বিশ্বাস ও সাধনার রীতি হিসাবে হিন্দু একেবারেই স্বাধীন। যেরূপ মত ও বিশ্বাস তাহার মনে ভাল লাগে, সে তাহাই পোষণ করিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে সাধনাও যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহা করিতে পারে। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী—সাধারণতঃ সকল হিন্দুই এই দুইএর একটি না একটি আশ্রম ভুক্ত। হিন্দুসন্ন্যাসী কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সাধনামন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং সেই সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই সাধনা করিয়া থাকেন। সেই সম্প্রদায়ের বাহিরে সাধারণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁহার কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই,—তাহার কোনও বন্ধনও তাঁহাকে মানিতে হয় না। এদিকে বাহিরের এই সাধারণ হিন্দুসমাজ অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, প্রত্যেক জাতি আবার বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ ইহার কোনও কোনও সম্প্রদায় ভুক্ত। যে জাতি বা সম্প্রদায়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জাতি বা সম্প্রদায়েরই তিনি একজন সামাজিক কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে—যেমন বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে,—তাহাকে সেই সমাজের আচার নীতি পালন করিয়া চলিতে হয়। কোনও কোনও বিষয়ে এই সব আচার নীতি লঙ্ঘন করিলে, অন্যান্য সামাজিকগণ তাহাকে ত্যাগ করেন। নিজের পৈতৃক সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইলে, হিন্দুর আর কোনও সম্প্রদায়ের সমাজেই তাঁহার স্থান হয় না। কারণ হিন্দুর সামাজিকত্ব এখন একেবারেই তাহার কুলবংশগত। সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া একা কেহ থাকিতে পারে না। আর কিছুতে না ঠেকুক, পুত্রকন্যার বিবাহে, পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে খুব ঠেকে, তাই এইসব আচার নীতি সামাজিক গৃহস্থ হিন্দুমাত্রই পালন করিয়াই চলেন।

এইসব আচারনীতি যে একেবারেই কোনও রূপ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে, তাও নয়। এসবের ব্যাপকতা ও প্রয়োগের কঠোরতা প্রধান ভাবে সামাজিকগণের উপরে নির্ভর করে। কোনও নূতন আচারনীতির প্রবর্ত্তন, প্রাচীন কোনও আচারনীতির পরিবর্ত্তন, সামাজিকগণ

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অনুমোদন করিলেই প্রায় ঘটিয়া থাকে। কালধর্ম্মের অনুরোধে এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানযুগে আমাদের চক্ষের উপর দিয়াই হইতেছে। অবশ্য সামাজিকগণ আগে আপনা হইতেই আলোচনা করিয়া প্রাচীন রীতির পরিবর্ত্তন বা নূতন রীতির প্রবর্ত্তন বড় করেন না। প্রথমে বড় একটা আপত্তির ভাবই দেখা যায়। কিন্তু যখন দশজনে বুঝিতে পারেন আপত্তি চলিতে পারে না, নূতনের প্রবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তখন ক্রমে এট নূতনকে গ্রহণ করেন। দেশাচার বা লোকাচার এই ভাবেই কালের ও কালগত অবস্থার পরিবর্ত্তনে বরাবরই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের ত কথাই নাই, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজশাসনের জন্য রঘুনন্দন যে স্মৃতির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার বিধিব্যবস্থার সঙ্গেও বর্ত্তমান দেশাচার ও লোকাচারের অনেক পার্থক্য—তুলনা করিলে—সকলেই দেখিতে পাইবেন।

আরও একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যক। সামাজিক আচার নীতির পরিবর্ত্তন—(সংস্কার বা বিকার যাহাই এই পরিবর্ত্তনে ঘটুক তাহা) প্রধান ভাবে হইলেও একেবারে সম্পূর্ণ ভাবেই যে কুলবংশগত সামাজিকগণের উপরে নির্ভর করে, তা নয়। ব্রাহ্মণেতর বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে ছোটবড় একটা পর্য্যায় সর্ব্বথা স্বীকার না করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করেন, এবং বড় বড় সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বও অপরিহার্য্য। এইকারণে এই সব সম্বন্ধীয় গুরুতর পরিবর্ত্তনে যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুমোদন আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের সামাজিকগণ এমন ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ যে দীর্ঘ কোনও বিরোধ কোথাও চলিতে পারে না। সামাজিকগণ দৃঢ়ভাবে কোনও নূতন আচার নীতি অনুসরণ করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ও তাঁহাদের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। বিলাতফেরতকে সমাজে চালানর ব্যাপারে ইহার বড় একটি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। সাধারণ সামাজিকগণ অপেক্ষা যাজক ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইহার অনেক বেশী বিরোধী ছিলেন। বিলাতফেরতকে সমাজে গ্রহণ করা সামাজিকগণের যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, 'ব্রাহ্মণ সমাজ' প্রমুখ ধর্ম্মশাসনসমিতি বর্গের সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও যাজক ও অধ্যাপকগণ এই সামাজিকগণের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, এই সমাজের সামাজিক শাসনও কি ভাবে চলিতেছে। প্রাচীন আচার-নীতির ব্যাপকতা সঙ্কীর্ণতর হইতেছে, প্রয়োগের কঠোরতাও শিথিল হইতেছে। কিন্তু যে সব আচারনীতি ত্যাগ করিতে সামাজিকগণ এখনও একেবারেই প্রস্তুত নন, তাহা কেহ লঙ্ঘন করিলে নিজসমাজ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত হইতে হয়। এই বহিষ্কারই সমাজ-শাসনের প্রধান অস্ত্র। সাধারণ হিন্দুগৃহস্থের পক্ষে যে কত কঠিন শাস্তি তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের উচ্চতর স্তরের সাধারণ অবস্থা এই। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা যতদূর জানি, ইহারই অনুরূপ। নিম্নতর স্তরের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা বেশী তফাৎ নহে। শাসনের কঠোরতা—বহিষ্কারের শাস্তি—বরং ইহাদের মধ্যে আরও বেশী।

রক্ষণশীলের আপত্তি ও তাহার বিচার।

এখন প্যাটেলের বিল ও হিন্দুসমাজের উপরে তাহার সম্ভাবিত প্রভাব এবং ইহার বিরুদ্ধে যত আপত্তি উঠিয়াছে, তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

Conservative—বা রক্ষণশীল হিন্দু নায়কগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। আবার তথাকথিত উদার সংস্কার বাদী অনেকে অতি কটু ভাষায় ইহাদের গালি দিতেছেন। 'বুড়োগুলো' 'সমাজের দারোয়ান গুলো' ইত্যাদি অতি অশিষ্ট ও রূঢ় বিশেষণও ইহাদের প্রতি কেহ কেহ প্রয়োগ করিতেছেন। এদেশের এই ঔদার্য্য গর্ব্বিত সংস্কারেচ্ছুগণ মনে করেন, রক্ষণশীলতা এবং তাহার সঙ্গে অনেক স্থলেই যে সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়, তাহা বুঝি কেবল এই 'হীন' 'অজ্ঞানান্ধ' 'দৃঢ় কুসংস্কারের পাশে বদ্ধ' (অবশ্য ইহাদেরই এই সব বিশেষণ) হিন্দু সমাজেই কেবল আছে, আর কোথাও নাই। এইটি তাঁহাদের বড় ভুল। এই রক্ষণশীলতা ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র

মানব জীবনের সকল বড় বড় ক্ষেত্রে—সকল দেশেই দেখা যায়। একদিকে রক্ষণশীল প্রাচীনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চান, আর একদিকে উদ্দাম সংস্কারক তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চান।—সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ববিরোধ চিরকাল চলিতেছে। ইহার ফলে এই ঘটে, যে প্রাচীনও একেবারে তার পূর্ব্ব আধিপত্য রাখিতে পারে না, আবার অজানা অপরীক্ষিত নূতনও পুরাপুরি আপনাকে প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। পুরাতনে নূতনে এইরূপে যে সামঞ্জস্য ঘটে, ইহাতেই প্রকৃত মঙ্গল হয়। পুরাতনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন চালাইতে গেলে তার ফল যে কি ভীষণ হয় জগতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্ত্তমান ইয়োরোপেও তার ভয়ঙ্কর লীলা বেশ চলিতেছে। নূতনের আক্রমণে পুরাতন যে সর্ব্বদা একেবারে অভিভূত হয় না, নূতন যে প্রবল বেগে আসিয়া সর্ব্বদাই পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া বিষম বিপ্লব ঘটাইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণও এই রক্ষণশীলতার প্রভাব। রক্ষণশীল সর্ব্বদা সুযুক্তিমত চলেন না অনেক মঙ্গলকর সংস্কারে, অতি সংকীর্ণতা দেখান, একথা সত্য। কিন্তু উদার সংস্কারকও সর্ব্বদা সুযুক্তির পথে চলেন না,—উদ্দাম আবেগে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। প্রাচীনের বিচারে সঙ্কীর্ণতাও তাহার মধ্যে বড় কম দেখা যায় না।—এই যে সব অশিষ্ট গালাগালি, ইহাও তার একটি পরিচয়। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীরা যেখানে ভুল করেন, ধীর সংযত ও শিষ্টভাবে তাহাদের ভুল দেখাইয়া দিতে হইবে। কটুভাষায় গালি দেওয়াটাই তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। ইহাতে অনর্থক দ্বেষাদ্বেষির সৃষ্টি হয়, দলাদলিতে কোন্দলের দিকটাই বাড়িয়া উঠে।—এই সংযম ও শিষ্টতায় প্রাচীন পন্থীদের আরও একটা বড় দাবী আছে, কারণ প্রাচীনপন্থিরা প্রায়তঃ বয়সেও প্রচীন,—সংস্কারকের দল অপেক্ষাকৃত নবীন। মতের অমিলে নবীন যে প্রাচীনকে 'বুড়োগুলো' 'দারোয়ানগুলো' বলিয়া অবজ্ঞায় গালি দিবে,ইহা এদেশের শিষ্টাচার নহে—কোনও দেশেরই বোধ হয় নহে।

আইন সনাতন কোনও নীতির বিরোধী কিনা—শাস্ত্রের প্রমাণ। বর্ত্তমান হিন্দুত্ব ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে সে সব কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহার পর এই আইন যে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সনাতন নীতির বিরোধী নয়, এ কথার পুনরালোচনা না করিলেও চলে।—প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এখন ঠিক নাই। যাহা আছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এ সম্বন্ধে সনাতন নীতিও কিছু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে না।—আরও একটি বড় কথা এই যে যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনেক বিশুদ্ধতরভাবে বর্ত্তমান ছিল, তখন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহও প্রচলিত ছিল। কেবল কতিপয় পৌরাণিক দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ নহে। প্রাচীন স্মৃতিতে বহুস্থলে এই আন্তর্ব্বর্ণিক বিবাহের উল্লেখ ও বিধি ব্যবস্থা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হিন্দুসমাজে হইয়াছে, প্রাচীন স্মৃতি ইহাদিগকে বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষের মিলনে উৎপন্ন সঙ্কর জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই মিলন ধর্ম্মসঙ্গত বৈবাহিক মিলন, ধর্ম্মবিগর্হিত কামজ মিলন নহে। তা যদি হয়, তবে দুর্ম্মুখ হইয়াই বলিতে হইবে, আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে বিশেষ সুনীতি পরায়ণ ছিলেন না, কারণ বিশুদ্ধ চারিবর্ণের লোকসংখ্যা অপেক্ষা এই সব সঙ্কর জাতি সমূহের লোকসংখ্যা অনেক বেশী, বস্তুতঃ এরূপ অসঙ্গত আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। স্মৃতির প্রমাণ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে এসব মিলন বৈধ ও বৈবাহিকই ছিল। আর তাহা না হইলে এত অবৈধ সন্তান সমাজের অঙ্গীভূত বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া সমাজে সম্মানের স্থান লাভ করিত না।

অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের বিচার।

এই স্থলে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ করিতে হইবে। প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা যায়, তখন অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের নারীর বিবাহই সচ্ছন্দে অনুমোদিত হইত। আর প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নিম্নতরবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চতরবর্ণের নারীর বিবাহ স্মৃতিকারগণ বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এরূপ বিবাহ যাহাতে বেশী না ঘটে তার পক্ষে কঠোর বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুলোম বিবাহজাত সন্তানগণ সাধারণতঃ সমাজে পিতার ও মাতার বর্ণের মধ্যবর্ত্তী স্থান লাভ করিত.

কখনও কখনও তাহারা পিতৃবর্ণের অন্তর্ভুক্তও হইয়াছে। এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ-জাত সন্তানগণের সামাজিক স্থান নিম্নতর পিতৃবর্ণেরও অনেক নীচে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে বিবাহ নিন্দনীয় হইলেও শাস্ত্রানুসারে অবৈধ ছিলনা, কারণ এই বিবাহজাত সন্তানগণ যতই নিম্নে হউক, সমাজে স্থান দেওয়া হইত।

উচ্চনীচ পর্য্যায়ে সমাজে জাতি বা শ্রেণী বিভাগ থাকিলে, এই পার্থক্য কতকটা স্বাভাবিক। শাস্ত্রের বা আইনের বিধি নিষেধ এসম্বন্ধে কিছু না থাকিলেও আপনা হইতেই লোকে প্রায়তঃ এই নীতি অনুসারে চলে। নিম্নতর জাতি বা কুলের কন্যা বিবাহ করিলে সেই কন্যাই উচ্চ হইয়া উচ্চতর জাতি বা কুলের মধ্যে আসে, তাহার পিতৃজাতি বা পিতৃকুলের সঙ্গে তাহার স্বামী বা স্বামীর স্বজনগণ কোনও সংস্রব না রাখিলেও এমন কিছু আইসে যায় না। কিন্তু নিম্নতর জাতির কাহাকেও কন্যা দান করা পৃথক কথা। হিন্দু জামাতাকে আদর করিয়া গৃহে আনিয়া তাহাকে বরণ করিয়া কন্যাদান করে। সেই জামাতাকে শেষে আর ছোট বলিয়া দূরে রাখা যায় না। জামাতার সঙ্গে সংস্রব রাখিতে গেলে, তাহার স্বজনগণের সঙ্গে সংস্রব আপনাহইতেই ঘটিয়া পড়ে। তাই স্বভাবতঃ নিম্নতর কুলের কন্যা বধূরূপে ঘরে আনিতে লোকে প্রস্তুত হইলেও নিম্নতর কুলে কন্যাদান করিতে সহজে প্রস্তুত হয় না। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে এই পার্থক্য বোধ হয় এই স্বাভাবিক নীতিরই অনুবর্ত্তনে ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তখন বর্ণপর্য্যায় যেরূপ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। ব্রাহ্মণের নিম্নে উচ্চতর, শিক্ষিত সুমার্জ্জিতাচার মানসিকশ্রমজীবী—সাধারণতঃ ভদ্রলোক সংজ্ঞাভুক্ত—যে সব জাতি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজন-স্বীকৃত উচ্চ নীচ পর্য্যায় একটা নাই। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও এ সম্বন্ধে একমত নহেন, বস্তুতঃ স্পষ্ট কোনওরূপ নির্দ্দেশও তাঁহারা করেন না। তারপর নিম্নতর অশিক্ষিত অপরিমার্জ্জিতাচার দরিদ্র দৈহিক শ্রমজীবীগণের কথা। ইহাদের সঙ্গে উচ্চতর সম্প্রদায় সমূহের একটা স্বাভাবিক প্রভেদ অবশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের নিজেদের মধ্যে যত জাতি আছে, তার মধ্যেও সর্ব্বস্বীকৃত উচ্চ নীচ পর্য্যায় একটা নাই। জল চলে না, এরূপ অতি নিম্নজাতিদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। প্যাটেলের বিল যদি পাশ হয়, আর সত্যই যদি তাহার ফলে অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়, তবে এই সব বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে কখনও বৈবাহিক আদান প্রদান হইবে, এরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। তবে সমস্তরের জাতি সমূহের মধ্যে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় প্রতিলোম বিবাহের আপত্তি ইহাদের মধ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষায় প্রতিভায়, শিষ্টাচারে, পদগৌরবে, ইঁহারা সর্ব্বসম্মত শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও আজকাল কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের সঙ্গেও ইহাদের কাহারও প্রতিলোম বিবাহ স্বাভাবিক যুক্তির দিক দিয়া আপত্তি জনক হইতে পারে না।

ইতিহাসের প্রমাণ।

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা এখন ইতিহাসের প্রমাণের মধ্যে আসিতে পারি। রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থীগণ ইতিহাসের তথ্য প্রামাণ্য বলিয়া সহজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও, তাহা যে সত্য একথা তাঁহারাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন ভারতের বহু অনার্য্য জাতি ভারতে আজও বহুপরবর্ত্তী যুগে যুগে বিদেশী ম্লেচ্ছ জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে কেবল স্থান পাইয়াছে, তাহা নয়,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চতর বর্ণের অন্তর্ভুক্তও হইয়াছে। শাকদ্বীপীয় ও দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, রাজপুত ক্ষত্রিয় ইহার প্রমাণ। এই দেশের ও এই সমাজের উপর দিয়া রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক বিপ্লব গিয়াছে। বর্ণ-জাতির অনেক ভাঙ্গা গড়া হইয়াছে। এ সব কথার বিস্তৃত আলোচনার অবসর এই নিবন্ধে হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা কিছু করিয়াছেন, বহু প্রমাণ ইহার পাইবেন। ঐতিহাসিক ইহাও জানেন, স্মৃতির ব্যবস্থায় যাহাই থাক, বাস্তব জীবনে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের পার্থক্য পর্য্যন্ত সর্ব্বদা রক্ষিত হইত না।

অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ অবৈধ ও অপ্রচলিত কেন হইল।

অন্তর্জ্জাতির বিবাহ যে প্রাচীন হিন্দুসমাজে খুবই চলিত, তা নয় জাতি বা শ্রেণী বিভাগ যে সমাজে বর্ত্তমান, সেখানে বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সচরাচর বড় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অবৈধ ছিল না। কিন্তু, পরে অবৈধ হয়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে মুসলমান

ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু সমাজের উপরে বড় একটিচাপ আসিয়া পড়ে। হিন্দুর রাজারা কেবল শাসনই করিতেন না—ধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষাও করিতেন। সেই রক্ষকের অভাব হইল,—এদিকে ভিন্ন ধর্ম্মের প্রবল একটা চাপও আসিয়া পড়িল। তখন কঠোর সামাজিক আচার নীতির সাহায্যেই সমাজ রক্ষার প্রয়োজন স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ অনুভব করেন। জাতিবিভাগই হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি। জাতিগুলিকেই কঠোর আচার নিয়মের বন্ধনে তাঁহারা বাঁধিয়া ঠিক রাখিতে চান। নূতন যে সব স্মৃতি তখন সঙ্কলিত হয়, তাহাতেই এই অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ অবিহিত হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তখনকার অবস্থায় ইঁহারা এই সব কঠোর আচারনীতির প্রবর্ত্তনে যদি সমাজ রক্ষা না করিতেন, তবে আজ হিন্দু বলিয়া পৃথক্ অস্তিত্বের একটা গৌরব আমরা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ঠিক সেই অবস্থা নাই বলিয়া তখন ইহার কিরূপ প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, যাহা এক সময়ে বৈধ ছিল পরে অবৈধ হয়,—তাহা আবারও বৈধ হইতে পারে। ইহাতে সনাতন ও শাশ্বত কোনও নীতি ব্যাহত হয় না।

রাজকীয় আইন ও হিন্দুসমাজ।

প্রাচীনপন্থী হিন্দু নায়কগণের আর একটি বড় আপত্তির কারণ ইহা দেখা যায় যে বিদেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজশক্তির পক্ষে প্রজার সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এবং করিতে চাহিলে প্রজারও তাহাতে প্রবল ভাবে বাধা হওয়া উচিত। সাধারণতঃ এই হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, একথা সত্য। কিন্তু যেখানে সামাজিক কোনও অধিকার রাজার আইনের উপরে নির্ভর করে, তখন এই অধিকার সম্বন্ধীয় কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে আইনের পরিবর্ত্তনেই তাহা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। ধরুন, এখন আইন আছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিন্দুবিবাহ অবৈধ। কিন্তু যদি এমন অবস্থা ঘটে, যে হিন্দু সামাজিকগণই আপনাদের মধ্যে অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে চান, প্রবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন, তখন যে যাচিয়া তাঁহাদিগকে এই বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণকে বলিতে হইবে, আইন বদলাইয়া দেও। বিবাহেরও সন্তানের বৈধতা, এবং তাহার উত্তরাধিকারসত্ব, নব্যস্মৃতির যেরূপ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজকীয় আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজের উপরে রাজার আইনের হস্তক্ষেপ এইখানেই আগে হইয়াছে। সেই সম্বন্ধেই নূতন কোনও আইন যদি এখন প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। ইহাতে নূতন হস্তক্ষেপ কিছু হইবে না।

আর এই হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্তও আজ এই নূতন নহে। সহমরণ নিষেধের আইন, বিধবাবিবাহের আইন, তারপর সহবাসসম্মতি আইন—ইহার অন্যান্য পুরাতন দৃষ্টান্ত। তখনও একদল ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার অন্য একদল ইহাও দেখান যে এরূপ আইন অশাস্ত্রীয় নহে।

সমাজের অমঙ্গল আশঙ্কা।

ইঁহাদের শেষ আশঙ্কা এই আইন পাশ হইলে, হিন্দুসমাজের মধ্যে বড় একটা উলট পালট হইবে, জাতিভেদের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সমাজে অতি অমঙ্গলকর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব বজায় থাকিবে না।' এ আশঙ্কাও বড় ভুল আশঙ্কা। আইন কিছু আর এমন হুকুম করিতে পারে না, যে সকলকে আপন আপন জাতি ছাড়িয়া অন্য জাতিতে বিবাহ করিতেই হইবে। আইন এইমাত্র বিধান করিতে চায়, যদি কোনও হিন্দু অন্যজাতীয় কাহারও সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তবে সে বিবাহ আইনে অবৈধ হইবে না, এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি বৈধ বলিয়া পৈতৃকসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এরূপ মতের লোক হিন্দুর মধ্যে আছেন, যাঁহারা মনে করেন এরূপ বিবাহ ধর্ম্মবিগর্হিত ও অশাস্ত্রীয় নয়। বর্ত্তমানে নানাকারণে দেশে এমন অবস্থাও আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে কোথাও কোথাও এরূপ বিবাহের প্রয়োজন হইতে পারে। এখন যাঁহাদের এরূপ বিবাহ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে হিন্দু নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হয়,—অথচ এমনও হইতে পারে, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ এবং হিন্দুনাম ত্যাগ করিতে অতিশয় মর্ম্মপীড়া পান। আইন কেবল রাজবিধিতে ইঁহাদের ও ইঁহাদের সন্তান সন্ততিদের আইনগত অধিকার রক্ষা করিবে। সমাজে ইঁহাদের কি স্থান হইবে, তাহা সামাজিকগণের উপরে নির্ভর করে,—আইনের উপরে একেবারেই নয়।

বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু সামাজিকগণ এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণমণ্ডলী যদি এইরূপ বিবাহ অনুমোদন না করেন এবং ইহা সমাজে প্রচলিত হওয়া সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়াই মনে করেন, তবে কঠোর শাসনে এই সব লোককে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহারা রাখিবেনই। সমাজের আভ্যন্তরিক আত্মশাসনের এই অধিকারের উপরে এই আইন হস্তক্ষেপ করিতেছে না। আইন এমন কথা কিছু বলিতেছে না, যে অন্তর্জ্জাতিক বিবাহকারীকে সামাজিক দণ্ড যে দিবে, সেও দণ্ডনীয় হইবে। তা যদি বলিত, তবে তাহা সকল সামাজিক হিন্দুর ঘোর আপত্তির কারণ হইত সন্দেহ নাই। সেইরূপ আইনই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজশাসন-কর্ত্তৃত্বের উপরে হস্তক্ষেপ করিত।

এখন যে এইরূপ বিবাহ করিবে সাধারণ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে থাকিবে। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে এ বড় কঠোর শাস্তি। এই শাস্তি মাথায় নিয়াও যে এরূপ করিবে,—তার উপরে আবার আইনের শাস্তির জন্যও এত

পীড়াপীড়ি কেন?—আইনে শাস্তির বিধান এতদিন ছিল, এখন যদি তাহা উঠিয়া যায়, তাহাতে এত আপত্তির কারণ কি?

সাধারণ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সামাজিকগণের মতিগতি, যতদুর বুঝিতে পারি, অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ শীঘ্র যে সামাজিকগণের অনুমোদনে সমাজে প্রচলিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কিছু নাই। তবে কালক্রমে দূরভবিষ্যতে সামাজিকগণ যদি ইহা চান, ইহার অনুমোদন করেন, --হিন্দু বিবাহ ও উত্তরাধিকার সত্বের বর্ত্তমান আইন তখন একেবারেই বদলাইতে হইবে। তাহাও রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় হইবে; সামাজিকগণের সামাজিক বৈঠকে নয়।

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাবান্ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় অকালে তাঁহার এই পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমরা একমত ছিলাম না। এরূপ মতবৈষম্যও স্বাভাবিক! কিন্তু যে মতের পোষকতা তিনি করিতেন, সেই মতের লেখকগণের মধ্যে অজিতবাবুর মত চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য, যুক্তির পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া রচনার পারিপাট্য কমই দেখিতে পাইয়াছি। অকালে যে সাহিত্যের সেবা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল, ইহা সাহিত্যানুরাগী সকলেরই অতি ক্ষোভের ও শোকের কথা। যে লোকে তিনি গিয়াছেন, সেই লোকের দেবতা তাঁহাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে আনন্দে রাখুন এই প্রার্থনা করি।

নিম্নে তাঁহার বন্ধু বোলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রেরিত সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী আমরা প্রকাশ করিলাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী—

অজিতকুমার বঙ্গসাহিত্যের উদীয়মান লেখকদের মধ্যে একজন হইলেও, একথা নির্ভয়ে বলিতে পারি—তাঁহার রচনার শক্তি, বঙ্গদেশের অনেক প্রবীণ লেখকদেরও মুগ্ধ করিয়াছে। সাহিত্য লইয়া আলোচনা করার একটা হাওয়া আজকাল বাংলা মুল্লুকে খুব জোরে বহিয়াছে; অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য দিতেছেন। অজিতবাবুর সাহিত্য সম্বন্ধীয় মন্তব্য বাঁধি গৎকে অতিক্রম করিয়া, স্বতন্ত্র একটি নূতন ধারাকে আশ্রয় করিয়াই আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া, মাসিক পত্রে দেখা দিতেছিল। যাঁহারা সত্যিকার সাহিত্যিক, নূতন কথা বলাই তাঁহাদের রীতি। অজিত বাবুর প্রতি রচনার ভিতরে, আমরা সেই নূতনতার আস্বাদ পাই। সর্ব্বদেশেই একদল ব্যক্তি নূতনকে দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। সেইজন্য, পুরাতনের অসারে নূতনকে বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সেই তীব্র সমালোচনার হাত হইতে অজিত বাবু নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন একথা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েক মাস মাস পূর্ব্বে অজিত বাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের কয়েকটি মতামত বেশ জোরের সঙ্গেই ব্যক্ত করায়, বাংলা দেশের চতুর্দ্দিক হইতে মার মার, কাট কাট সমালোচনা উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে অজিত বাবু কি বলিয়াছিলেন—আর সেটা পুরাতন মতের উপর কি পরিমাণ আঘাত আনিয়াছিল—সে আলোচনার কোন প্রয়োজন এখানে নাই। কেবল এইটুকু বলি যে, অজিত বাবুর সেই প্রবন্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মত চিন্তাশীল ও প্রতিষ্ঠ লেখককেও বিস্তর শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং তর্কের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। অজিত বাবুর সমালোচনা সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল—ভাষার সংযম ও শীলতারক্ষা, আজকাল দেখিতে পাই, উৎকট রকমের মর্ম্মন্তুদ ব্যক্তিগত শ্লেষবাক্য সমালোচনার প্রধান মসলা হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এক কথায় বলিতে পারি—অজিত বাবুর লেখার পাল্টা জবাব দিবার মত যোগ্যতা বাংলা দেশে খুব কম লেখকেরই ছিল। সাহিত্যকে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের, প্রলাপ বাক্য বিচার করার দল অজিত বাবুর, লেখার প্রতিবাদ করিলেও তাহা প্রতিবাদ না হইয়া স্বতন্ত্র অন্য একটা কিছু হইত, কারণ অজিত বাবু, শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না। দর্শন শাস্ত্রেও তিনি যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন—সেইজন্যে তাঁহার রচনার মধ্যে, যুক্তি এবং তর্কের বাঁধনটা থাকিত বেশী।

সুললিত গল্প লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এ মহাশয় মালঞ্চের পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। কিছু কাল হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ তিনি একটি পদক পুরস্কার দান করিবেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"অরুণেন্দু পদক"

সেনহাটী 'মনোমহন পাঠাগার' হইতে "৺গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার সমালোচনা ও সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ" বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য "অরুণেন্দু পদক" নামে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। রচনা ৩০ এ চৈত্রের মধ্যে উক্ত পাঠাগারে পৌছান আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষ সকলের রচনাই সাদরে গৃহীত হইবে। বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এ, 'মনোমোহন পাঠাগার', সেনহাটী, এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

"গোবর"

(১)

কেউ খাটেবসে' কথাকয়, হাসে, খেলে তাস, দাবা, পাশা;
খায় সাঁচি পান, জরদা-জৌন্তান্, স্ফূর্ত্তি, স্ফূর্ত্তি খাসা!
কেউ ফুলবনে প্রণয়িনী সনে তোলে ফুল, ফুল পরে;
কেউ গান গায় গজল বাজায়, এন্তার্ আমোদ করে।
মরেছে পাড়ায় দীন রামরায়—পুড়িবে তাহারে কে সে?
ভীষণ শ্মশানে ভয়হীন প্রাণে "গোবর" ডোমের বেশে!

(২)

বাবুদের বাড়ী ধুম-ধাম ভারী—আদুরে মেয়ের বিয়ে;
বাবুদের দল রস-ঢলাঢল গল্প-তামাসা নিয়ে।
গায়ে লাগে মাটী ভেবে দেয় ফুঁ-টি, কিছুরি ধারে না ধার;
রুমালে-রুমালে হাওয়ার হিলোলে উছলে কুসুম-সার।
কত লোকজন করিবে ভোজন, পরিবেষণ করিবে কে যে!
বেঁধেছে কোমর ওই যে "গোবর"—একাই একশ' সে যে!

(৩)

অন্ধকূপ-মাঝে শিশু পড়ে'গেছে—জননী আছাড়ি' কাঁদে;
স্নেহ পরবশ, নাইক' সাহস তবুও নামিতে 'খাদে'।
কেউ এটা আনে, কেউ ওটা টানে, কেউবা দেখিছে চেয়ে;
প্রাণ ঢেলে দিতে আঁধার কূপেতে কেউ না নামিল যেয়ে।
মরিছে পাড়ায় শিশু অসহায়, বাঁচাবে তাহারে কে সে?
ওই দেখ চেয়ে আসিতেছে ধেয়ে "গোবর" কোমর কসে'!

(৪)

কলেরা বসন্ত—ভীষণ! দুরন্ত!—ঘরে ঘরে যবে আসে,
থাকে দূরে দূরে দেখে নাক' ধরে' বসে না রোগীর পাশে;
দেয়নাক জল, পালায় সকল যে যাহার প্রাণ নিয়ে;
কে করিবে সেবা সারা নিশি দিবা আপন জীবন দিয়ে!
বসে' রোগীপাশে সেবা করে কে সে প্রাণপণে দিনরাত?
সে যে আমাদের হত-আদরের "গোবর"-বৈদ্যনাথ!

(৫)

দি'ছে জমীদার শক্তি পেয়েদার লুটিতে গরীব-গেহ,
পেয়াদা লুটিছে যাহা সে পাইছে—নাহিক' মমতা-স্নেহ,
গ্রামের সকলে কিছু নাহি বলে, জমীদার—সে যে রাজা!
সে মহারাজায় কিছু বলা যায় যদিই দেয়বা সাজা!
কে তখন এসে অসহায় পাশে দাঁড়ায় বীরের মত?
গোবর সে যে রে দীন আর্ত্তেরে রক্ষাই যার ব্রত!

(৬)

দীন পরিবার করে হাহাকার, ঘরে যে কিছুই নাই!
শিশুটি মাতারে কহিছে কাতরে—"মাগো, বুঝি মরে' যাই।
চোখে ছলছল জল অবিরল ঝরে, মা কহিছে—"হায়—
কোথা ভগবান?—তোমারি সন্তান্ ক্ষুধায় ম'রে যে যায়!"
কে তখন এসে অশ্রুজলে ভেসে' দাঁড়ায় খাবার হাতে?
"গোবর" সে যেরে, তুলে তোরা দে'রে আশীস্ তাহার মাথে

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

লম্বা চুলের ইতিহাস

(১)

আপনারা আমার মাথায় লম্বাচুল দেখিয়া হাসিতেছেন? এই বিংশ শতাব্দীতে—যখন সকল লোকের চুল মাথার সামনে চৌদ্দ আনা পেছুনে দুই আনা, কাহারও কাহারও বা পেছুনের দিকটা একদম সাদা—এমন সময়ে আমার মাথায় কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দেখিয়া আপনাদের বিস্ময় জন্মিতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা আমায় ঠাট্টা করিবেন না। একটা বিষয় ভালরূপ না জানিয়া কাহাকেও ঠাট্টা করাটা অবিবেচনার কাজ। কি জন্য আমি বড় বড় চুল রাখিয়াছি বুঝিতে পারিলে আমার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য কোন ভাব কিছুতেই উদিত হইতে পারিবে না।

যেমন পায়ে তাল তলার চটি, মাথায় আর্কফলা,

কপালে চন্দন-তিলক ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের লক্ষণ; মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি, গায়ে সাদা জামা, কোমরবন্ধ কনেষ্টবলের চিহ্ন; সেইরূপ অনেকখানি লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুলটা কবিত্ব শক্তির নিদর্শন। আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের খুব মস্তবড় একজন কবি ছিলেন, তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য যমুনার জল উজান বহিত অর্থাৎ নেয়ে মাঝিরা যমুনার জলে উজান বাহিয়া তাঁহার কবিতা শুনিতে আসিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কি? সে তাঁর কবিতা, নিজের রচিত গান। সে গান শুনিয়া সমস্ত বৃন্দাবনের নরনারী আকুল হইয়া যাইত। সেই কৃষ্ণের মাথায় লম্বা কোঁকড়ান চুল ছিল, আপনারা পুরাণে পাঠ করিয়া থাকিবেন; পুরাণ পাঠ না করিয়া থাকেন ত যাত্রার দলে দেখিয়া থাকিবেন।

তা' ছাড়া সাহিত্য-জগতের একটী বিশেষ ঘটনা বশত আমরা অনেক কবি, সাহিত্যিকই লম্বা চুল রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি; অনেকেই প্রত্যহ দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামাইয়া মুখশ্রীতে একটী অপূর্ব্ব নারীজনসুলভ লাবণ্য আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ঘটনাটী বলিতেছি।—

(২)

নীচের ঘরে টেবিলের উপর দুইপা রাখিয়া, কানে পেন্সিল গুঁজিয়া, কোলের উপর কবিতার খাতা রাখিয়া কল্পনা শক্তিকে উধাও করিয়া দিয়াছি—বিকাল তখন পাঁচটা। এমন সময়ে গলির পথে জানালার মুখে দেখি,—সতের কি আঠার বছরের একটী তরুণী মস্ত সাজসজ্জা করিয়া, পৃষ্ঠে বেণী দোলাইয়া, চপল হরিণ শিশুর মত প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে; পেছনে তের চৌদ্দ পনর ষোল নানা বয়সের আরও সাত আটটী বালিকা তরুণী—সকলেরই বেশভূষায় সমান চাকচিক্য, মুখে হাসি, হরিণ শিশুর ন্যায় দ্রুত চপল গতি, পায়ের জুতার টকটক্ শব্দ, হাতে সুদৃশ্য বাঁধাই বাঙ্গালা পুস্তক; ইহাদের পেছুনে একটু দূরে ধীর মন্থর গমনে এক প্রৌঢ়া অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার মুখখানি ঠিক সুগোল, মোটা নাকের উপর চশ্‌মা, মাথার চুল দশআনি সাদা ছ'আনি কালো; পরনে চওড়া কালো পেড়ে শাড়ী, হাতে লাল টুকটুকে একখানি ছোট বই; প্রৌঢ়ার পেছুনে অল্প জলের পুঁটীমাছের মত একদল ছোট মেয়ে তর্ তর্ ফর্ ফর্ করিতে করিতে আসিতেছিল।

দেখিয়া আমার কবিদেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পুরানো বিষয়টা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ এই নূতন বিষয় লইয়া কবিতা লিখিবার আয়োজন করিলাম। খাতাটা টেবিলের উপর রাখিয়া ও পেন্সিলটা হাতে লইয়া জানালাটার দিকে আর একবার চাহিয়াছি; চাহিতেই আবার দেখিতে পাইলাম প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকায় মিলিয়া ছয় সাতটী স্ত্রীলোক খুব দ্রুতগতিতে আগেকার প্রৌঢ়া ও তাঁহার দলবল যেদিকে গিয়াছিলেন সেইদিকে চলিয়াছেন, প্রত্যেকেরই হাতে সুন্দর সুন্দর মলাটের বই, মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন প্রস্ফুট। মনে হইল নিশ্চয় ইঁহারা কোন গুরুতর কাজে যাইতেছেন।

এই দল চলিয়া যাইতে না যাইতেই ঠিক সমবয়স্ক তিনটী বালিকা হন্ হন্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মুখশ্রী উজ্জ্বল হাসিতে পরিপূর্ণ; দৃষ্টি চঞ্চল, সপ্রতিভ, কবি-জন-প্রাণ-মন-হরণকারী ইহারাও দ্রুত-গমনে সেইদিকে চলিয়া গেল।

এইরূপ ব্যাপার দেখিয়াও কি কবির মন স্থির থাকিতে পারে? লেখা স্থগিত রাখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। গায়ে পাঞ্জাবীটা ছিল, তাড়াতাড়ি পাম্প শু জোড়া পায়ে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। দেখিয়া আসি ব্যাপারটা কি?

গলির মোড় হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি,—একটা মস্ত বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড খোলা যায়গায় আশ্চর্য্য ব্যাপার! একেবারে সৌন্দর্য্যের হাট বসিয়াছে। মাঝখানটায় প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি করা হইয়াছে; মণ্ডপের চারিদিকে সুদৃশ্য কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা, দূর হইতে ভিতরের কিছুই দেখিবার যো নাই। মণ্ডপের বাহিরে, দরজার কাছে অসংখ্য ছোট বড় বালিকা, তরুণী, প্রৌঢ়া। সকলেরই মুখে হাসি গল্পের ছড়াছড়ি; অঙ্গে বিচিত্র পোষাকের বাহার; হাতে বই; কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টি। খোলা যায়গাটার সর্ব্বত্র টবের মধ্যে ছোট ছোট ফুলের গাছ; সর্ব্বত্র ফুলের ও পাতার মালা ঝুলিতেছে। রাস্তায় একটী লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—ভিতরে মেয়েদের সভা হইবে। আর কিছু বলিতে পারিল না।

বড় বাড়ীটার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যে দিকে চাই, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য; চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এমন সময়ে বোঁ করিয়া একখানা মোটর ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল আর কি! হাত দুই যায়গা সরিয়া গিয়া জীবনটা বাঁচান গেল। ধরার নশ্বর মানুষকে বর প্রদান করিবার জন্য পুরাকালে ঐরাবতের পৃষ্ঠ হইতে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, সিংহবাহন হইতে শিবের শিবানী যেমন করিয়া পতিত মর্ত্ত্যভূমিতে অবতরণ করিতেন ঠিক সেইরূপ করিয়া মোটরগাড়ী হইতে একটী তরুণী নীচে নামিয়া আসিলেন। কি জানি পূর্ব্ব-পুরুষের কোন্ সৌভাগ্যের ফলে এই আমি কবির দিকে একবার চাহিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গেলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। একদল ছোট ছোট মেয়ে লালফিতায় জড়ানো চুল উড়াইয়া দরজার কাছে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিছুকাল পরেই আবার দেখিতে পাইলাম মোটর হইতে যে তরুণী নামিয়াছিলেন, সমবয়স্কা এক সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া তিনি ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছেন এবং মৃদু হাসিয়া পার্শ্বচারিণীর সঙ্গে কি বাক্যালাপ করিতেছেন—কি সুন্দর সে হাসি!

আমার কবিপ্রাণে আর ধৈর্য্য ধরিতেছিল না—প্রতি-মুহূর্ত্তে ইচ্ছা হইতেছিল ঢুকিয়া পড়িয়া মেয়ে কন্‌ফারেন্সটা দেখিয়া আসি। কিন্তু মনে শঙ্কা হইতেছিল সভায় সাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয় না হইলে লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। অবশেষে কৌতূহল আর থামাইতে না পারিয়া দরজার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এমন সময়ে মাথায় ভীষণ পাগ্‌ড়ীওয়ালা একটা দরোয়ান খাড়া হইয়া কর্কশস্বরে আমাকে বুঝাইয়া দিল, সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। একটানা কবিত্বের মধ্যে নিতান্ত গদ্যের সুরে এই অপ্রিয় কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, সেইখানে সেই মুহূর্ত্তেই লোকটার প্রাণসংহার করি। কিন্তু ব্যাপারটা নেহাৎ আমার কবিদেহের শক্তির অতীত বুঝিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হইলাম না। নিজের হাতপা গুলি কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। সৃষ্টিকর্ত্তা কেন আমায় পুরুষ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন? আমি জন্মজন্মান্তরে কি পাপ করিয়াছিলাম যে বিধাতা আমাকে নারীদেহ প্রদান করিলেন না? তাহা হইলে ত আজ আমাকে এমন আনন্দে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত না।

কিয়ৎক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়া অবশেষে আমার মাথায় এক বুদ্ধি যোগাইল। বিধাতার উপর এক চাল চালিবার সঙ্কল্প করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

(২)

বাক্স হইতে সাবান, ক্ষুর বাহির করিয়া দাড়িগোঁফ দুইই পরিষ্কার কামাইয়া ফেলিলাম। ছেলে বেলা সখের থিয়েটার করিতাম, একটা পরচুলা ছিল; মাথায় আঁটিয়া দিলাম। স্ত্রী তখন কি কাজে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল; তাহার বাক্স হইতে বাছিয়া সুন্দর রংয়ের একখানা শাড়ী নামাইয়া তাড়াতাড়ি পরিয়া লইলাম। আয়নার কাছে গিয়া কেশ-বিন্যাস সমাধা করিয়া দেখি,—চেহারাটা দিব্যি চমৎকার হইয়াছে। নিজদেহের কৃত্রিম নারী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম!

আমার মুখে হাসি আসিল? আয়নার কাছে হাসিয়া হাসিয়া একটু দেখিলাম। তারপর স্ত্রী-জনোচিত পদক্ষেপে নীচে নামিয়া আসিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে দেখি সর্ব্বনাশ! স্ত্রীরূপী মহাবিঘ্ন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত।

নিতান্ত সৌভাগ্যবশত সে বিঘ্ন সহজেই কাটিয়া গেল। আমার নূতন বেশ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল; বসিয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া পড়িয়া গেল। যথেষ্ট আঘাত পাইতে দেখিয়া এবং সে আর আমাকে বাধা দিতে আসিবে না ভাবিয়া অকালে এই বিপরীত রসসঞ্চারের জন্য তাহাকে আর কিছু বলিলাম না। সত্বর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। এইবার কোন্ দরোয়ান্ আমাকে বাধা দিতে আসিবে দেখা যাউক—মনে মনে বলিয়া সভার দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৩)

নারীবেশের কি মাহাত্ম্য! এবারি দরোয়ানটা উঠিয়া আমাকে মস্ত এক সেলাম করিল। দরজা পার হইয়া দেখি, মণ্ডপের বাহিরে একটী প্রাণীও নাই, ভিতর হইতে গুন্ গুন্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মণ্ডপের ভিতর গিয়া

একদিকে বসিয়া পড়িলাম। কথা বড় একটা কাহারও সঙ্গে বলিতে সাহস হইল না, কি জানি পাছে ধরা পাড়িয়া বসি। কৌশলে চেহারা গোপন করিয়াছি, গলার আওয়াজটা গোপন করিব কি প্রকারে ?

প্রথম আমি যে পৌঢ়া রমণীকে গলির মধ্য দিয়া গদাই-লস্করচালে চলিয়া আসিতে দেখিয়াছিলাম, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান, চশমা আঁটা, সুগোল মুখধারিণী সেই রমণীই সভানেত্রীর আসনে বসিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ শেষ হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তিনী দুইটী রমণীর কথোপকথন হইতে সভার উদ্দেশ্যটা কি জানিলাম।

বিধাতার নিয়মানুসারে পৃথিবীর সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। পুরুষ কেবল মাত্র নিজের স্বার্থের জন্য স্ত্রীলোককে ইচ্ছা করিয়া সকল অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। শাসন বিচারাদি ব্যাপারে তাহার কোন হাত নাই, সামরিক বিভাগেও তাহার প্রবেশাধিকার নাই; এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে তাহার ন্যায্য অধিকার সে পাইতেছে না। একমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখন এই দিক হইতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরুষকে পরাজিত করিয়া একটু ভাল রকম জব্দ করিতে হইবে। সাহিত্য জগতে যাহাতে স্ত্রীজাতির বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যে শতমুখী চেষ্টার আয়োজন করিবার এই সভা।

সভায় প্রথম প্রস্তাব এই উত্থাপিত হইল যে পুরুষ-জাতির প্রতি বিহিত সম্মানভক্তি পুরঃসর এই মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতেছে যে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে স্ত্রীজাতি তাহার প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত—ভগবানের নিয়মানুসারে উভয়ে সমকক্ষ; কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে গেলে সেটা তার নিতান্ত অন্যায়।

প্রথম প্রস্তাব অনুমোদিত, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হইলে এক রমণী উঠিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে সাহিত্যের দিকটায় পুরুষ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া লইতে পারে নাই। এই দিক হইতেই স্ত্রীলোককে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরুষ জাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে এই চেষ্টা সফল হয়, সভাস্থ প্রত্যেক রমণীই সে বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন করিবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব যথারীতি গৃহিত হইলে ক্ষীণকায়া এক নারী উঠিয়া মিহি অথচ তীক্ষ্ণস্বরে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে এই সভা আট বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট বৎসর পর্য্যন্ত সকল বয়সের সকল মহিলাকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন অদ্য হইতে প্রাণপণ করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরুষদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন; যতদিনে সে চেষ্টা সফল না হয়, ততদিন যেন প্রত্যেক রমণী দৈনিক তিনি বেলায় অন্ততঃ তিনখানি করিয়া খাতার পৃষ্ঠা সাহিত্য সেবায় উৎসর্গ করেন। কোমল, মধুর ভাব সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে পুরুষ স্ত্রীলোকের সমকক্ষ নহে। সুতরাং অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল নারীই সাহিত্যে এই ভাবের চর্চ্চা করিলে অচিরে পুরুষের দর্পচূর্ণ হইয়া যাইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাব সমর্থনকালে আর এক রমণী স্ত্রীলোকদিগের উৎসাহের জন্য তেজস্বিনী ভাষায় এক মস্ত বক্তৃতা করিলেন। মিষ্ট কণ্ঠের "হিয়ার হিয়ার" শব্দে মণ্ডপ ভরিয়া গেল। তৃতীয় প্রস্তাব গৃহিত হইলে পর কিঞ্চিৎ পরে সভা ভঙ্গ হইল।

সকলের বাহির হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। অবশেষে সকলে চলিয়া গেলে পর বাড়ী ফিরিলাম।

(৪)

দোতলার ঘরে বসিয়া নারীবেশ পরিত্যাগ করিতেছি; মাথার পরচুলাটা মাত্র খোলা হইয়াছে, শাড়ীখানা পরণেই আছে, এমন সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সেই ঘরে উপস্থিত। সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াই বোধ হয় তাহার এই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। আবার সেই হাসি আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের শাস্তি মনে করিয়া এবার সে কতকটা সামলাইয়া লইল। মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সখী সেজে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল? পাড়ায় যাত্রার দল খোলা হয়েছে না কি ?"

সেই পুরাতন গন্ধময় হাসি, তাহাতে আবার বিদ্রূপের ভাব মাখানো—দেখিয়া আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু বেচারী শক্ত অপরাধ করিয়া থাকিলেও তাহার ফুলা পা'টা দেখিয়া আমার মনে ক্রোধের ভাবটা স্থায়ী হইল না। সহানুভূতি কবিদিগের একটী

বিশেষ গুণ। আমি তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "পা'টা যে ফুলেছে দেখ্‌ছি।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে বলিল, "বলি, কোথায় যাওয়া হচ্ছিল বল্‌তে আপত্তি আছে?" আমি বলিলাম, "মেয়েদের সভায়।"

"এ বেশে কেন?"

"ব্যাটাছেলের সেখানে যাবার অধিকার ছিল না।"

"তাই মেয়ে সেজে মেয়েদের মজলিসে ঢোকা হয়েছিল। কেন কি দরকার ছিল তোমার?"

কবির পক্ষে ছদ্মবেশ ধরিয়া সৌন্দর্য্যের রঙ্গমঞ্চে সাহিত্য-আলোচনায় যোগদান করিবার আবশ্যকতা কি গণ্ডমূর্খ নারী তাহার কি বুঝিবে? হায়, অশিক্ষিতা রমণী! তুমি যদি কবিত্বের মহিমা বিন্দুমাত্র জানিতে, তাহা হইলে তোমার মুখ হইতে কি আজ এই একান্ত নীরস হাস্যাস্পদ প্রশ্ন বাহির হইতে পারিত!

আমি তাহাকে বলিলাম, "ঢের দরকার ছিল। তোমার মত অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে তা' বুঝে উঠা অসম্ভব। আর চালাকি কর্‌তে হবে না। এখন উঠে পড়।"

শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ করা সহজ; আসল কথা গোপন করিয়া গেলেও ভদ্রতার খাতিরে সে পীড়াপীড়ি করে না। কিন্তু অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না। মনের কথা ষোল আনা খুলিয়া বলিলেও সে আবার প্রশ্ন করিতে থাকে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অশেষবিধ প্রশ্ন করিয়া স্ত্রী আমার নিকট মেয়ে কন্‌ফারেন্সের সকল কথা জানিয়া লইল।

অবশেষে অনেক বকিয়া ঝকিয়া আমি তাহার মুখ বন্ধ করিলাম। সেদিনকার তাহার হাসি আর কিছুতেই থামাইতে পারা গেল না।

(৫)

সেদিনকার সেই মহতী নারীসভা নিজচক্ষে দেখিয়া, সে বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিয়া, আমার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, কবিমাত্রেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। দৈনিক ছোট বড় পাঁচ ছয়টি করিয়া কবিতার উচ্ছ্বাসে আমার সেই ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

যাক্, নিজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন সাহিত্য-জগতের কথা বলি। নিজের ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত থাকা কখনও আমার ইচ্ছা নয়।

বছর দুই যাইতে না যাইতেই সাহিত্যের বাজারে মস্ত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পুরুষ লেখকদের লেখার আদর একদম কমিয়া গেল। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে লেখিকাদের প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ হইল। মাসিক পত্রিকায়, বাজারের পুস্তকের তালিকায়, দোকানদারের ঘরে চক্‌চকে মলাটের পৃষ্ঠায় যেদিকে চাই কেবল প্রাণ মন স্নিগ্ধকর কোমল মধুর নামের ছড়াছড়ি! গোপনে খবর পাইয়াছি, কোন কোন নব্য কবি যশোলুব্ধ যুবক পর্য্যন্ত মেয়ে-নাম স্বাক্ষর করিয়া নিজের লেখা বাজারে বাহির করিয়াছেন।

নারীজাতি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ এবং সহানুভূতিশীল। সাহিত্যের মধ্যে তাঁহারা একটা কোমল, স্নিগ্ধ, সহানুভূতির ভাব আনয়ন করিলেন, যেটা পূর্ব্বে দুর্লভ না হইলেও এখনকার মত তত সুলভ ছিল না। করুণরসের ভাবটাও ইঁহাদের হাতে বেশী ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং পুরুষ লেখক বেচারারা ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন।

যদিও পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন লেখক ছিলেন যে, নারীগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল লেখা বাহির করিতে পারিলেন না, তথাপি মোটের উপর লেখিকাদিগেরই প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী হইয়া পড়িল। বড়ই লজ্জার কথা! কেবল লজ্জার কথা নয় ভবিষ্যতে মস্ত বিপদেরও কথা। যদিও ঘরের কাজ করিয়া, সন্তান প্রতিপালন করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা চলে, তথাপি সাহিত্য ক্ষেত্রে ও পরে অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোক পুরুষের উপরে উঠিয়া গেলে পুরুষদিগের প্রতি পূর্ব্বের মত ভয় ও ভক্তির ভাব পোষণ করিয়া আর তাঁহারা ঘরে বসিয়া তাঁহাদের সুখশান্তির জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে চাহিবেন না। তখন পুরুষজাতির মনস্তুষ্টির বিধান কে করে? আর স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদিগের প্রভুত্বই বা বজায় থাকে কি প্রকারে?

রাস্তায়, লোকের বাড়ীতে, ট্রামগাড়ীর মধ্যে, সভা সমিতিতে কেবল ঐ একই কথা, এখন পুরুষজাতির সেবা শুশ্রূষা করে কে? যে কোন প্রকারেই হউক, সাহিত্য-প্রাঙ্গন হইতে স্ত্রীজাতির এই কীর্ত্তিবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া পুরুষজাতির প্রাধান্য বজায় রাখিতেই হইবে। বড় বড়

সাহিত্য-রথী অধোমুখ হইয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়?

একদিন খবরের কাগজে পড়া গেল যে পুরুষজাতির এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা সম্বন্ধ আলোচনা করিবার জন্য বেলা পাঁচটার সময়ে এক প্রকাণ্ড সভা হইবে। সেখানে সকল নামজাদা সাহিত্যিকগণ উপস্থিত থাকিয়া পরামর্শ করিবেন।

সভায় যোগদান করিবার জন্য আমার নামে এক সুদৃশ্য চিঠি আসিয়া হাজির হইল।

(৬)

আধঘণ্টা খানেক দেরী করিয়া সাড়ে পাঁচটার সময়ে সভাস্থলে গিয়া হাজির হইলাম। বলা বাহুল্য এবার আর ছদ্মবেশে নয়, নিজের বেশেই গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি তখন পর্য্যন্ত কেহই সেখানে পৌঁছেন নাই। বিলম্ব হইবারই কথা। কবিগণ হয়ত ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, কাহারও কাহারও দিবানিদ্রা হয়ত তখন পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই, ভাবের আধিক্য বশত কেহ বা সভার কথা ভুলিয়াই বসিয়া আছেন।

ঘণ্টাখানেক রাস্তায় ঘুরিয়া আসিয়া দেখিলাম, এক একজন করিয়া বক্তা, শ্রোতা আসিয়া জুটিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল।

বিরাট-কলেবর একজন সাহিত্যিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সভায় উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিলেন,—"হে ভদ্র সাহিত্যিকগণ, আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা সকলে মুখে স্ত্রীজাতির প্রতি যতই সহানুভূতি প্রকাশ করি না কেন, স্ত্রীজাতি পুরুষের প্রভুত্ব ছাড়াইয়া গিয়া বাহিরে আপনাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে, এ কামনা আমরা আন্তরিক ভাবে কেহই করি না। আমরা সভ্যতার খাতিরে, সম্পাদকের পুস্তক, খবরের কাগজ প্রভৃতিতে অবশ্য লিখিয়া থাকি যে খোলা মাঠে হাওয়া খাইয়া, রাস্তা-ঘাটে অবাধ গতিতে ভ্রমণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে দেওয়া উচিত; কিন্তু মনে মনে আমরা ইহাই কামনা করি যে অনন্তকাল তাহারা আমাদের ঘরে থাকিয়া আমাদের মনস্তুষ্টির বিধান করুক, আমাদের সেবা শুশ্রূষায় তাহাদের যত্ন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলুক; তাহারা বরাবর গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিয়া, সন্তান প্রতিপালন করিয়া, সর্ব্বদা আমাদের সুখশান্তির জন্য যত্ন করিয়া, আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হইয়া থাকুক। কিন্তু এইবার আমাদের মনস্কামনা বিফল হইতে চলিল। সাহিত্যের বাজারে দিন দিন স্ত্রীজাতির প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে আর কিছুকাল চলিলে সাহিত্য-জগতেই যে কেবল পুরুষের মুখ ছোট হইয়া গেল এমন নহে, অন্যান্য ব্যাপারেও স্ত্রীজাতি প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে ইহারা একেবারেই পুরুষের উপর আধিপত্য করিতে থাকিবে। ইহা যেমন অপমানের কথা তেমন গুরুতর বিপদেরও মূল হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ হইলে স্ত্রীজাতির সেবাশুশ্রূষা লাভ করিয়া পুরুষের সুখশান্তির সম্ভাবনা আর নাই। অতএব, আপনারা সকলেই এ বিষয়ে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কি উপায়ে এই ভয়ানক বিপদ হইতে নিজেদের মানসম্ভ্রম, সুখশান্তি বজায় রাখিতে পারা যায় তাহা নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব কাজ করিতে অগ্রসর হউন। এই ভয়ানক বিপদ নিবারণের জন্য পরামর্শ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে।"—এত বলিয়া চটাচট্ করতালির মধ্যে সভাপতি মহাশয় বসিয়া পড়িলেন।

সেই শব্দ থামিতে না থামিতে আবার তুমুল শব্দ আরম্ভ হইল। বলিষ্ঠদেহ এক সাহিত্যিক উঠিয়া ভীষণ উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মাননীয় সভাপতি-মহাশয় এবং মহাশয়গণ, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখিবার এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনারা মনোযোগ করিয়া শুনুন। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যে বীররসের ভাবটার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বীরত্ব সঞ্চার না হইলে কোন জাতির উন্নতিলাভের আশা বৃথা। সাহিত্যের ভিতর বীররসের সঞ্চার হইলে দেশের লোক শৌর্য্য-বীর্য্যশালী হইবে। একথা বুঝিতে আপনাদের কাহারও বিলম্ব হইবে না যে কোমলপ্রাণা রমণীরা সাহিত্যের মধ্যে বীররসের ভাব আনিতে পারিবেন না। সুতরাং সাহিত্যিকেরা সকলেই প্রাণপণ যত্ন করিয়া যদি এবিষয়ে

বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই লেখিকারা বিশেষ জব্দ হইবে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে আপনারা সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাহাতে এইরূপে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।"

বক্তার কথা সভাস্থ সকলের মনেই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি বসিয়া পড়িলে ভীষণ করতালির শব্দে, বক্তার উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাক্যে—চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সেই তুমুল শব্দ থামিল।

তখন সভার একদিক হইতে ক্ষীণকলেবর, জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় একব্যক্তি উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার প্রস্তাব আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। এই দারিদ্র-দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে, যেখানে সাহিত্যিকেরা দু'বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পান না, যেখানে বছরের বেশীর ভাগ সময় লোককে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত থাকিতে হয়, সেখানে সাহিত্যে বীররসের ভাবটা বেশী জমিবে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ইতিমধ্যেই যে সকল বীররসের গান, কবিতা বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহা নিতান্তই মড়াকান্নার মত শুনায়। সুতরাং এইভাবে স্ত্রীলোদিগকে জব্দ করিবার আশা ছাড়িয়া দিয়া আপনারা অন্য উপায় চিন্তা করুন।"

কাঁপিতে কাঁপতে বক্তা বসিয়া পড়িলেন। সভা একেবারে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কাহারও মুখে টু-শব্দটী পর্য্যন্ত নাই, হাতের আঙুলটী পর্য্যন্ত নিশ্চল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া সভাপতি মহাশয় বিষন্নস্বরে বলিলেন,—"বক্তা যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্য। কিছুদিন ভাল খাইয়া পরিয়া কবি, ঔপন্যাসিকদিগের শরীর একটু না সারিলে বীররসের ভাব সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না। সুতরাং উপস্থিত সাহিত্যিক মণ্ডলী ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য উপায় স্থির করুন।"

আবার সভা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ। পরে নধরগঠন, লাবণ্যমণ্ডিত দেহ, কোমল শ্রী, এক নবীন সাহিত্যিক উঠিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সাহিত্যিকগণের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। তাহা এই,—আজকাল সাহিত্যে বীররসের ভাব ফুটিয়া উঠিবে না। করুণরসের মধ্যদিয়াই রমণীদিগকে জব্দ করিতে হইবে। আপনারা মনে করিতেছেন ইহা সম্ভবপর নয়; আমি বলিতেছি, সম্পূর্ণ সম্ভব। এ পর্য্যন্ত আমরা তেমন করিয়া চেষ্টা করি নাই, সেই জন্যই আমাদের পরাজয় হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেক কবি, ছোটবড় গল্প-প্রবন্ধ-লেখক সকলকেই প্রাণপণে সাহিত্যে করুণরসের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতে হইবে। শোক, বিরহ, নৈরাশ্য, ভালবাসা প্রভৃতি ভাব ছাড়া কেহ অন্য কোন ভাবের লেখায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। এমন কি খাওয়াপরা, চলাফেরা, পোষাক পরিচ্ছদ, শরীরের চেহারায় পর্য্যন্ত কোমল, সুকুমার, করুণ শ্রী আনয়ন করিতে হইবে। কেহ লম্বা পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু গায়ে তুলিবেন না—তাহাতে অনেকটা সেমিজ গায়ে দেওয়ার মত বোধ হইবে; লম্বা চুল রাখিবেন, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামাইয়া ফেলিবেন। বাহিরে এইরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিলে, ভিতর আপনা হইতেই কোমল, মধুর, করুণ হইয়া আসিবে। আমার মতে আপনাদের সকলের এই পন্থা অবলম্বন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া বক্তা থামিলে হাত তালির চোটে সকলের কাণ বধির হইয়া উঠিল। আবার সকলের মুখে উল্লাসের ভাব দেখিতে পাওয়া গেল। অন্যান্য বক্তারাও উঠিয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পর প্রস্তাব গৃহিত হইল এবং সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। শেষে এই পন্থা অবলম্বন করাই প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

সেই হইতে সকল সাহিত্যিকই সভার নির্দ্দেশমত কাজ করিতে লাগিলেন। কবি, উপন্যাস-প্রবন্ধ রচয়িতা সকলেই ভিতর বাহির সকল দিক দিয়া কোমল, সুকুমার, করুণ-ভাবের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। পথে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যে লেখা দেখিতে পাওয়া যায় সকলই করুণরসের ভাবে পূর্ণ-ভাবে না হইলেও অন্তত ভাষায় করুণরসের একেবারে প্রস্রবণ। হ্যাণ্ডবিল পড়িয়া পর্য্যন্ত লোকে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল। অনেক সাহিত্যিকই লম্বাচুল রাখিতে আরম্ভ করিলেন। গোঁফ-কামানোটা ব্যারিষ্টারি কায়দা বলিয়া কেহ কেহ সেটা বাদ দিয়াও গেলেন। আমি একজন সাহিত্যিক, কবি।

সুতরাং আমিও লম্বাচুল রাখিয়া করুণরসের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল্যাম।

এই হইল আমার লম্বাচুলের ইতিহাস

আপনারা সকলে আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন,—পৃথিবীর সকল বিষয়ে যদি মেয়েদের অধিকার পুরুষের সমান হয়, যদি পুরুষের মত মেয়েদেরও রাস্তায় খোলা মাঠে হাওয়া খাইয়া বেড়াইবার, স্কুলকলেজ সভাসমিতিতে যোগদান করিবার, আফিস আদালত থিয়েটার বায়স্কোপে যাইবার অধিকার থাকে ত পুরুষেরই বা লম্বাচুল রাখিবার অধিকার থাকিবে না কেন ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস

বন্দি তোমায় সুন্দর ওহে মন্দার-ফুলদলে,
এস, শান্তি-সলিলে সিক্ত করিতে মম অন্তর তলে,
এস, সুচারু ভঙ্গে, পুলক রঙ্গে তটিনীর কল তানে,
এস, দিগ দিগন্তে ঝঙ্কার তুলি' পাপিয়ার মধুগানে।
এস, সুধীর সমীরে, নৈশ-নীহারে দিব্য মোহন বেশে,
এস, ইন্দু-কিরণে, তরুণতপনে অতুলন হাসি হেসে।
এস, নদী-হিল্লোলে, বিটপী শাখায় মন্থর-ধীরপদে,
এস, ললিতলতায়, কোটী তারকায়, ফুটন্ত কোকনদে।
এস, অস্তাচলের তুঙ্গ শিখরে রমণীর রূপমাঝে,
এস, শস্যশামলা ধরণীর বুকে অতি মনোরম সাজে।
এস, বিশ্বপ্লাবিত জ্যোছনারে লয়ে আলোকি' ভুবনময়,
এস, নীলিম গগনে, শিশুর বদনে ছড়ায়ে সুষমাচয়।
এস, কুসুম গন্ধে, অমিয় ছন্দে কোকিলের কুহুতানে,
এস, বাসনা শূন্য যোগীর চিত্তে, সাধ্বী সতীর প্রাণে।
এস, জননী হৃদয়ে স্নেহের উৎস উচ্ছসি' শতধারে,
এস, ভকতচিতে বাসনা মিটায়ে, নিরমল উপচারে।
এস, সুহৃদহিয়ায় সুহৃদের লাগি' বিতরিতে ভালবাসা,
এস, হতাসের প্রাণে দিব্য পরশে জাগাইতে নব আশা।
এস, মাধুরী-মণ্ডিত ত্রিদিব হইতে ধরার মাঝারে নামি',
দেব, তোমারে রাখিতে হৃদি-মন্দিরে তব পথ চেয়ে আমি।

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

মানব-সাধনার চরম বাণী

"মনে হয় কি একটী শেষ কথা আছে,
সেইটী হইলে বলা সব বলা হয় ;
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে—
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি'
মানুষ এখনো তাই ফিরিছেনা ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথ

বক্ষ্যমান প্রবন্ধ যে পংক্তি কতিপয় আজ মাথায় করে' দাঁড়াচ্ছে, কিছুদিন আগে আর একটী প্রবন্ধ তা' বুকে রেখে বলেছিল—"কে বলতে পারে, কোন medium কে আশ্রয় করে' সেই last words প্রকাশ পাবে যা' শুনে মানবজগতের মনের চেহারা বিলকুল বদল হয়ে যাবে" আর সেই সঙ্গে এ ইঙ্গিতও ব্যক্ত করেছিল যে কবির সমস্ত হৃদয় যে কথার সন্ধানে ফিরছে তাকে প্রকাশ করবার গৌরবও তিনিই ভবিষ্যতে বহন করবেন। কিন্তু "At the cross roads" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে কবি

স্পষ্টাক্ষরে স্বীয় অক্ষমতা জানিয়ে বললেন যে জগত এমন এক শিশুর জন্ম-প্রতীক্ষায় আছে যার আধ্যাত্মচেতনা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সজাগ হবে এবং তিনি যা' করতে ব্যর্থকাম হলেন তা' অবলীলা ক্রমেই করে যাবে। কবির উদ্দিষ্ট ভাবশিশু যদি এতদিনে জন্মে থাকে তবে তার message নিশ্চয়ই কবি গুরুর হস্তগত হয়েছে; ইতিমধ্যে আমরা যে বাণীর সন্ধান পেয়েছি তার উল্লেখ অনাবশ্যক হবে না,—কেননা তা' শুনলে মানুষ ঘরে না ফিরুক, পথে বেরুতে পারবে। উল্টো ফলের কথা বলছি এই জন্যে যে এ প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাবার বাহাদুরী প্রকাশ করতে পারায় স্বভাবতই তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী, অধিকন্তু ও-সাধনার ধারাকে পেছিয়ে না দিয়ে অগ্রসর করে' দেবার উচ্চাভিলাষও যে রাখে না, একথা বললে মিছে কথা বলা হয়।

রবীন্দ্র সাহিত্য ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ব্যাপারের কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটায় আমার অসংখ্য গুরুর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখেছিলুম—"who aimeth at the sky shoots higher than he that means a tree"—কিন্তু আজ আর কারুর সঙ্গেই আমার কিছুমাত্র মতভেদ নেই, কেননা ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পোলিটিক্যাল বহির্বিদ্রোহ ও ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মক্ষেত্রের ফিলজফিক অন্তর্বিদ্রোহ, এই পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারের সমকালীন অরণি-সংঘর্ষণে সর্ব্ব বিরোধের চরম-সমন্বয়বাণী আমার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছে। কিছুকাল যে অগ্নির জ্বলন্ত শিখার শক্তিতে অনেক বন্ধুবান্ধবকে ব্যথিত করতে বাধ্য হয়েছি, আজ তার শান্ত-শীতল আলোক-প্রভা ভারতবর্ষীয় নব-ব্রাহ্মণসমাজ বা লেখক-মণ্ডলীর পদপ্রান্তে পৌছে দিতে দাঁড়িয়েছি। দুঃখ যে মানুষকে কত সহজে সংশোধন করে, তা' নিজের জীবন দিয়ে সব চেয়ে ভাল জানি বলেই অপরকে দুঃখদিতে আমি ভয় পাইনি,—তবু যাঁদের অন্তরে আঘাত করে' বারংবার নিজেকেও কাঁদিয়েছি তাঁরা আজ আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্ত্তির জয়গান করে' অনেকেরই কাছে আমি প্রহেলিকাবৎ হয়ে আছি—কিন্তু প্রহেলিকা এর মধ্যে কিছুই নেই—আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেমের স্বচ্ছ মুকুরের সামনে যে যে ভাবে দেখা দেয়, মুকুরও তাকে ঠিক সেই ভাবই প্রত্যর্পণ করে' থাকে। প্রমথবাবুর বৃত্তাকার শিল্পচাতুর্য্যই সকল মতে মত দিয়ে, নিজেকে সকলের সমান বুদ্ধিমান মনে করাতে চেয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্যও অগত্যা তাঁর শিষ্যোত্তমের সাহিত্যের স্কন্ধে চরম সদর্থ আরোপ করে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবারই চেষ্টা করে এসেছে। শিবের যখন মাথা ঘোরে সুদর্শন-চক্রও তখন ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে—কেন যে এটা হয় তা বলা যায় না; তবে হয় এরকম। "চার-ইয়ারী"—সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে এ নাগাদ যতগুলি প্রবন্ধ ও চিঠি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তা ঠিক পরপর পড়ে এসে এ প্রবন্ধ পড়লে এবং এ প্রবন্ধ পড়ে সেগুলি আর একবার পড়লে সকলেই তাদের যথার্থ অর্থে চিনে নিতে পারবেন। কিন্তু সে যাইহোক প্রমথনাথের শিষ্যত্ব-গ্রহণ আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল এবং তাতে আমি যথেষ্ট উপকৃতও হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাপ্যের চেয়ে উপরি প্রাপ্যে মানুষের মমতা বেশী; একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে গুরুর চেয়ে উপগুরুর প্রতি টান বেশী দেখিয়ে নিশ্চয়ই আমি অমানুষের কাজ করিনি। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে; রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, তাঁর সার্টিফিকেটের শাসনে শিশু থেকে আরম্ভ করে অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তো চোখ বুজে করতে পারে—ও সার্টিফিকেটকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে তাঁর নিন্দা করতে পারা এবং সার্টিফিকেট বিহীনের উচ্চ প্রশংসা করে লোককে দাবিয়ে দমিয়ে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারাতেই তো কেরামতির পরিচয়। আপনারা আপনাপন মনকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক বলুন দেখি—এ পরিচয় আমি দিতে পেরেছি কিনা?

জানি, আপনারা সব প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে আমাকে একটুও প্রশংসা করবেন না। বেশ, আমিও কারুর প্রশংসার কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখিনে—আপনাদেরও নয়, আপনাদের রবীন্দ্রনাথেরও নয়, প্রমথনাথেরও নয়। তাঁদের সার্টিফিকেট দরকার হয়, অন্যের দেওয়া টাকাকড়ি মান সম্ভ্রম দুহাতে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে আমার কাছে ছুটে আসবেন ভালবাসা নিতে ও ভক্তি দিতে।

কিন্তু না, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা

ভাব প্রকাশ পাচ্চে যেন আমি ইচ্ছা কর্‌লেই প্রমথবাবুর "গুরুমারা বিদ্যের" দোহাই দিয়ে এক ঢিলে এই যুগল-গুরু-হত্যা করে তাঁদের আসনে পাকা হয়ে বস্‌তে পারি। কিন্তু সত্য কথা এই যে সে দুরভিসন্ধি আমার নেই। প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জানেন কিনা বল্‌তে পারিনে, যে আমার অপূর্ব্ব গুরুকরণ সবুজপত্র বেরুবার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে আর সে গুরুকরণের নজির হচ্ছে এই :—

"নমস্কার অতীতের মহাত্মা মহর্ষিগণ
দীক্ষাগুরু যোগীন্দ্র নারদ
নমস্কার হে রবীন্দ্র! যাঁর হরিনাম বীণে
উথলিছে শত চিত্তহ্রদ—
নমস্কার মানবের যত হিতকামীগণ!
তথাপি বিদায় চাহি আজ,
মৃদঙ্গ বাঁশরী স্বরে ছড়ানো জড়ানো হৃদি
মুক্ত হোক বিশ্বরঙ্গ মাঝ,
যাঁর নামে শত বীণা ঝঙ্কারিছে মুহুর্মুহু;
চাহে প্রাণ নিতে তারি নাম,
তাই ভিক্ষা চিত্ত যেন স্বরে শুধু স্বর দিয়ে
নাহি চায় চরম বিরাম ঘুমের আরাম;—
হোক সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে
বুঝি নাই যারে;
খুঁজে লব প্রাণ হতে তারে"—

প্রাণ ও প্রকৃতি (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৯)

এখন জিজ্ঞাস্য—খুঁজে কিছু পেয়েছি কি? উত্তর—অবশ্য Law of Spirit কে পাওয়া গিয়েছে। কি সে Law?

সেই কথাই বল্‌তে দাঁড়িয়েছি—অতএব ক্রমশ বলছি :—

২

পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্যে' সেদিন লিখেছি—"Law of gravitation যেমন আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বেও ছিল এবং মানবজাতি বুদ্ধিবিচ্যুত হবার পরও থাক্‌বে Law of spirit বা আর্টও তেমনি কবি-কুলের জন্মপূর্ব্ব থেকেই আছে এবং ও-বংশ নির্ব্বংশ হবার পরও থাক্‌বে। কোন কবি কি পরিমাণে এই Lawকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন সেইটুকু মাত্র তাঁদের কেতাব পড়ে আমরা জানতে পারি—অবশ্য যদি সে নিয়ম আমাদের মধ্যে থাকে।"

অপর পক্ষে—

পৌষ সংখ্যা 'মালঞ্চে' Sex-problem সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছি তাতে বলেছি—"আত্মার অভাবের নামই প্রেম বা প্রেমের অভাবের নামই আত্মা নয়; প্রেম আত্মারই স্বভাব। এই প্রেমকে নিজের মধ্যে পাবার পর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোন বালাই আর থাকতেই পারে না, কিন্তু তারপর মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাটা সহজেই এসে পড়ে। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সাহায্যে প্রেমকে যথাযথভাবে চালনা কর্‌বার শক্তি তখন অনায়াসেই হয়ে আসে।"

উক্ত উক্তি-যুগল থেকে দেখা যাবে যে প্রথমটীতে যাকে 'আত্মা ও নিয়ম' বলা আছে দ্বিতীয়টীতে তাকে 'প্রেম ও কর্ত্তব্য' নামে চিহ্নিত করা গিয়েছে। প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী স্ত্রী। কিন্তু 'মালঞ্চে' আমি কর্ত্তব্যের বা Law এর internal দিকটি চেপে রেখে external দিকে পাঠক-দের মনকে চালিয়ে দিয়েছি কেন না তখনও সংসারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে দেবার সময় আসেনি। পূর্ব্বেই 'পরিচারিকায়' বলেছি যে মানব চিত্ত-এসরাজের কর্ণমর্দ্দন করে তার তন্ত্রীগুলিকে পর্দ্দায় পর্দ্দায় বেঁধে তুল্‌তে যাওয়াই নিপুণ শিল্পীর কাজ—আর বলিনি যা' তা হচ্ছে এই যে, জীবন-শিল্প সৃজনে আমার স্বহস্ত আমার গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের চেয়ে যে অনেক বেশী পাকা এ বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক আমার নিজের একবিন্দুও নেই। প্রকৃত পক্ষে এটা হওয়াও দরকার—কেননা 'গুরুর চেয়ে শিষ্য বড়' না হলে তাঁর স্বরূপকে পরিচিত কর্‌বে কে?

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে দম্ভ আর গলাবাজি করেই আমি জয়ী হয়ে চলেছি—নইলে Law of spirit, Duty of love ইত্যাদি মামুলী কথাইতো আউড়ে চলেছি law বা dutyটা যে কি তাতো কই বল্‌ছি নে?

বটে!—তবে—

প্রকৃতি ঘোম্‌টা খোল, দেখাও সহজ সত্য
রেখেছ যা' আবরণে ঢাকি'
লুকায়ে স্বরূপ, ছি ছি, কেনগো আকুল কর
চিত্ত-পটে মায়াচিত্র আঁকি

এ প্রাণ-পুরুষ আজি তোমার ঘোমটা দেখি স্বহস্তে
সরায়ে দিতে চায়—
বিশ্বজন-সভামাঝে অয়ি মোর প্রিয়তমা হাসিমুখে
বাহিরিয়া আয়।
শ্লোকের উপরে শ্লোক বর্ষে বর্ষে জমিয়াছে.
শাস্ত্রে রুদ্ধ সাধনার পথ
এই আবর্জ্জনা ভেদি' চলিল ছুটিয়া তবে
সুনির্ম্মল রশ্মি রেখাবৎ দীপ্ত মনোরথ!
ফির প্রেমময়ি অয়ি, ধরিয়া ফেলেছি তোরে,
আর কোথা যাবি—
এই দেখ প্রাণে মোর দুলিতেছে চাবি!

প্রশ্ন শুন্‌ছি—কৈ, দেখাও দেখি চাবি?

দেখবে?—তবে বেরিয়ে পড়—এই দীন-দরিদ্র ভারত-পল্লী-প্রান্তের চির-কিশোর প্রাণথেকে সেই অপরাভূত-পরাক্রম ঐন্দ্রজালিক চাবি যার প্রয়োগ-নৈপুণ্য সাধক-চরিত্রের অজস্র কলঙ্ক-কালিমা মুহূর্ত্তে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—যার অদম্য মন্ত্রশক্তি এই তমসাচ্ছন্ন মানব-বাসভুমিকে কলির অধিকার থেকে আত্মতেজে ছিনিয়ে নিয়ে সত্যলোকের নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও অপাপ-বিদ্ধ সপ্তম স্বর্গে চক্ষের নিমেষে উন্নীত করে ধর্‌তে পারে—বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়, আমার প্রাণের প্রতিভায় অর্থময় চির-পুরাতন নবীন বাণী—ভগবৎগীতার অন্তরাত্মা,—রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত ভগবান,—অতীত ভারতবর্ষের পতিতোদ্ধার-দক্ষ মহা তপস্যার জগৎ-বিস্ময়কর ফল!—বল আমার জীবন-গীতার চরম আর্টিষ্ট, বল এই যোগসিদ্ধ দেহ-মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের আত্মা-সমষ্টিকে আকৃষ্ট করে' জলদ-গম্ভীর বজ্রগর্জ্জনে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডিত পুণ্যবাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং!"—জানিয়ে দাও সকলকে যে এই হচ্ছে 'প্রাণের নিয়ম,' 'প্রেমের নিয়ম,' দৃশ্যমান বিশ্বমর্ম্মের 'কেন্দ্রীয় নিয়ম,' যাতে আত্ম-সমর্পণ করলে নরনারী যেখানে যা করুক্, তোমারি আদেশ-প্রতিপালন করবে—তোমারই চির গৌরবান্বিত জয়পতাকাকে বহন করবে। বৈরাগ্যের পথই প্রেমের পথ—কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এই বৈরাগ্যই তার অচল-শিখা জ্বালিয়ে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছে, রবীন্দ্রনাথের জয়-গৌরব এই বৈরাগ্যেরই দান, আর আদর্শ-নারীরা কবির এই বৈরাগ্য-শিখায় তাদের প্রেমের হবি-পাত্র প্রফুল্লচিত্তে উজাড় ক'রে দিয়ে সে শিখাকে হোমাগ্নি-শিখায় পরিণত করেছে। যাও তবে আমার বক্ষনিঃসৃত মহাবাণী—ধীরে ধীরে গিয়ে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আলিঙ্গন কর, আর আলিঙ্গন কর সেই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য-কীর্ত্তিকে যে রবীন্দ্রনাথ ঐ বাণীরই বরপুত্র।—চারিয়ে যাক্, আকাশে বাতাসে এই পরমাত্মার চরম নিয়ম, আর গড়ে উঠুক এই পলিটিক্সের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের পলিটিক্সে ভরা বিশ্ব-ভুবনের মর্ম্মকেন্দ্রে সেই "প্রেমের জগৎ" যেখানে ব্যবহারিক বা সামাজিক শাসনরজ্জু নরনারীকে স্পর্শও করতে পারে না—যেখানে পাপ নেই, শোক তাপ নাই,—আছে শুধু নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্বর্ণ-সিংহাসনে নর-দেবতা ও নারী-দেবীর অপাপবিদ্ধ যুগল-মূর্ত্তি নির্ভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ; আর তাঁর চতুর্দ্দিকে বিচিত্র-পরহিত-ব্রতে ছুটে বেরুবার জন্যে জাগ্রত ভারতবর্ষের কর্ম্মানন্দ-কলরব। এস ধনী, নির্ধন, যে যেখানে আছ—এস লজ্জাশীলা নারী ও বীর্য্যে অটল পুরুষ—দ্বিধাশূন্য চিত্তে এই আত্মার আদেশ গ্রহণ ও প্রচার কর—গ্রথিত হয়ে যাক তোমাদের দেহে মনে প্রাণে কর্ম্মে ও বাক্যে এই অমোঘ নিয়ম—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"

কৃষ্ণার্পণমস্তু।

বিজয়কৃষ্ণ

মনের মতন

হোক্ না কেন যতই কুরূপ
হোক্ না সে গো যেমন তেমন
হাঁসুক, কাঁদুক, বলুক, কহুক
তবুও সে মোর মনের মতন।
হোক্ না তাহার বাক্য কটু
আমার কাছে রসায়ন ;
চলুক্ না সে আঁকা বাঁকা
তবুও সে মোর মনের মতন।
মূর্খ সে ত নয় গো আমার
বিদ্যা হীনা হ'লেও হায় ;
বুদ্ধি তাহার কাহার চেয়ে
কম কভু না দেখি তায়।
জানে না তো উর্দ্দু ফার্সি
পড়ে মধুর রামায়ণ
নাই বা থাকুল বিদ্যা-বুদ্ধি
তবুও সে মোর মনের মতন।
দিবা নিশিই কুৎসা তাহার
আর কি কোন নাই গো কথা
কাহার তাহায় কি গো ক্ষতি
আমার যে গো বাজে ব্যথা।
সে যে বহু দিনের পরিচিত
বহু কালের পুরাতন,
তোমরা কেন নিন্দা কর
আমার সে যে মনের মতন।
যদিই বল কে তোমার সে
আত্মীয় কেউ হয় গো বুঝি ?
বলব কেন ভেবেই দেখ
সারা জগত দেখ খুঁজি।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী

মুক্তি

(১)

নিতান্ত ভালমানুষ বলিয়া হরকুমার বাবুর চিরকালই একটা সুনাম অথবা অপযশ ছিল। নাগবংশে জন্ম হইলেও তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে নাগের সঙ্গে কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও পরিপূর্ণ, সবল দেহ তাঁহার অটুট স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দিত,—আর শত অত্যাচার অবিচারেও তাঁহার মুখ হইতে কোনরূপ তিরস্কার বা ভৎসনা বাহির হইতে কেহ বড় একটা দেখে নাই। আজ-কালকার এই নিত্য উত্তেজনার দিনে যখন তাঁহার পাড়া প্রতিবাসীরা নিত্য-নূতন হুজুক বা আলোচনা নিয়া মাথা ঘামাইয়া তাহাদের গভীর স্বদেশভক্তি ও সমাজহিতৈষিতার পরিচয় দিত, তখন হরকুমার হয় ত আপনার নিভৃত, অন্ধকার কোঁঠাটির মধ্যে মেঝের উপর সতরঞ্চ বিছাইয়া ছেলেমেয়েদিগকে বর্ণমালা বা হিসাব শিখাইতেন, অথবা সর্ব্বসন্তাপহারিণী আলবোলার সাহায্যে তাম্রকূট সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে তাঁহার জীবনের ধারা কিরূপ ছিল, তাহার কোন সন্ধান কেহ রাখিত না। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে জ্যাকসন কোম্পানীর আফিসে কেরাণীবাবুরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই দিন জীবনচক্রে যে চাবি পড়িয়াছিল তাহারই ফলে এই সুদীর্ঘ চব্বিশটি বৎসর একই ভাবে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া ঘণ্টাখানেক প্রাতর্ভ্রমণের পর বাজার করা, স্নানাহারান্তে দশটার সময় আফিসে যাইয়া অপরাহ্ণে ৬টায় সময় গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন, তৎপর জলযোগান্তে ঘণ্টা দেড়েক ভ্রমণ ও সর্ব্বশেষে রাত্রিভোজনের পর দশটায় সময় শয্যাগ্রহণ—এই

নৈমিত্তিক "রুটিনের" কোনরূপ ব্যতিক্রম তাঁহার জীবনে কেহই বড় একটা দেখে নাই,—বোধ হয়, কল্পনাও করিতে পারে না। একই সূত্রে গাঁথা, বৈচিত্র্যহীন, নিতান্ত একঘেয়ে জীবন তাঁহার নিকট যেন ডালভাতের মতই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেহ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কখনও কোন কথা বলিত বা বহিঃসংসার সম্বন্ধে এতটা নির্লিপ্ততার জন্য তাঁহাকে কখনও অনুযোগ দিত, তবে তিনি কখনও মৃদু হাসিয়া, কখনও বা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিতেন, "মানুষের নিজের ভিতরেই যে সব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তাহার ধাক্কা সামলানই কষ্টকর। ইহার উপর বাহিরের ভাবনা ভাবিয়া জীবনে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপে বৃথা অশান্তি বরণ করিয়া লওয়ার ফল এই হয় যে, তাহারা পরের ভাবনার কোনরূপ কিনারা ত করিতে পারেই না, নিজেদের ভাবনায়ও প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ দিতে পারে না। যদি কেহ তাঁহার এই উত্তরে আপত্তি তুলিয়া প্রশ্ন করিত, "তাহা হইলে মানুষ কি শুধু আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিবার জন্যই সংসারে আসিয়াছে?—অন্যের প্রতি কাহার কোন কর্ত্তব্য নাই?" তাহা হইলে তিনি অম্লানবদনে উত্তর করিতেন—"সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তা না-ই বলিতে হইবে বই কি, কারণ সে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্যের দরকার, সাধারণ মনুষ্যের সে শক্তি ও সামর্থ্য নাই, মানুষ যদি সকলেই নিজ নিজ ভাবনা ভাবিয়া ও নিজের নিজের কর্ত্তব্য বাঁচাইয়া চলে তবে পরের জন্য আর ভাবিবার কাহারও বড় একটি বিশেষ দরকার হয় না। যদি কখনও বা সে প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে জন্য অসাধারণ লোকের দরকার, এবং সেই সব দরকার মিটাইবার জন্য সকল সময়ে সব দেশেই দুই একজন অসাধারণ লোক জন্মিয়া থাকে।"

ইহার পর আর কোনরূপ তর্ক চলিতে পারে না, বা পারিলেও বর্ত্তমানক্ষেত্রে কেহ উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিত না।

কিন্তু এইরূপ স্পষ্ট স্বার্থপরতামূলক মত প্রকাশ সত্ত্বেও হরকুমার বাবুকে সকলেই একটু প্রীতি ও কতকটা সম্মানের চক্ষে দেখিত। তিনি কখনও কোন সামাজিক গোলমালে যোগ দিতেন না। কে ঘরে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা রাখিয়া সমাজে কদাচারের প্রশ্রয় দিতেছে, কোন্ হিন্দু কুলাঙ্গার জাতিভেদ প্রথার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলে নিষ্ফল কুঠারাঘাত করিতেছে,—কোন্ তরুণী বিধবা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস না করিয়া দিনান্তে রাশীকৃত ফলমূল গলাধঃকরণ করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাব্রত ভঙ্গ করিয়া হিন্দু বিধবার উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতেছে, কোন্ অর্থপিচাশ মাসিক দুই শত মুদ্রা-বেতনভোগী হইয়াও কবে বাজার হইতে স্বহস্তে দুইটি ফুলকপি বহিয়া আনিয়া ঘোরতর কৃপণতার পরিচয় দিয়া আপনার সম্মান ও পদগৌরব নষ্ট করিতেছে—সে সব সন্ধান বা আলোচনায় তিনি কখনও মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেন না। এমন কি আজকালকার এই প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনেও হিন্দু বা মুসলমান-শাসন অপেক্ষা ইংরাজ শাসন ভাল কি মন্দ, ভারতের পক্ষে অবাধবাণিজ্যনীতি ও সংরক্ষণনীতি এই উভয়ের মধ্যে কোন্ নীতির অবলম্বন আবশ্যক, ভারতবর্ষ স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত কি না, একষ্ট্রীমিষ্ট ও মডারেট দলের মধ্যে কাহারা দেশের বেশী উপকার করিতেছে—এ সব আলোচনায় তাঁহাকে কেহ কখনও কোন দিন কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনে নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার মত সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, নিতান্ত "গোবেচারী" ভাল মানুষ আজকালকার সংসারে একরকম দেখা যায় না বলিলেই চলে! এই নির্লিপ্ততার দোষ যাহাই থাকুক না কেন ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, তিনি নব্য ও প্রাচীন, নরম ও গরম কাহারও বিশেষ কোন আক্রোশের মধ্যে পড়েন নাই। বরং সকলেই নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া তাঁহাকে একটু কৃপা-মিশ্রিত সহানুভূতির চক্ষে দেখিত।

বলাবাহুল্য কর্ম্মক্ষেত্রেও হরকুমারের এই নির্লিপ্ততা তাঁহার ক্রমোন্নতির পক্ষে অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। কোন গোলমালের মধ্যেই থাকিতেন না বলিয়া তিনি আপনার অফিসের নির্দ্দিষ্ট কাজে অধিক সময় ও মনোযোগ দিয়া উপরওয়ালার মনস্তুষ্টি করিবার সুবিধা পাইতেন। সুতরাং যেখানে সাধারণতঃ সকলে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে প্রবেশ করিয়া বড় জোড় সত্তর টাকায় চাকুরীজীবন শেষ করিতে বাধ্য হয়, সেখানে তিনি প্রথমতঃ ত্রিশ টাকা বেতনে ঢুকিয়া পোনের বৎসরের মধ্যেই একশত টাকা বেতনে কেশিয়ারের পদে উন্নীত

হইতে পারিয়াছিলেন। "ভালমানুষ" বলিয়া এই পদোন্নতির জন্য তাঁহাকে কাহারও ঈর্ষ্যার পাত্রও হইতে হয় নাই।

বস্তুতঃ হরকুমার বাবুর জীবনে বৈচিত্র্যের মোহ বা আড়ম্বরের চাকচিক্য না থাকিলেও তাঁহার দিনগুলি নদীর স্রোতেরমত একটানাভাবে বেশ এক রকম কাটিতেছিল। সহসা একদিন এই প্রবাহে বাধা পড়িয়া তাঁহার সমস্ত জীবনটাকেই তোলপাড় করিয়া তুলিল, এবং অবশেষে উহার গতি একটি সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করিয়া দিল।

(২)

জ্যাক্সন কোম্পানীর ছোট সাহেবের নাম মিঃ ওয়েলবি প্রায় দুই মাস হইল, তিনি কলিকাতার অফিসে বদলী হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অধীন বাঙ্গালী কেরাণীকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যে সব শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব ভারতের অন্নে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ অসভ্য ভারতবাসীর মধ্যে সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক ও সততার পুণ্য মহিমা প্রচার করাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, মিঃ ওয়েলবি তাঁহাদের অন্যতম। কর্ম্মচারীদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রায়ই অসময়ে অতর্কিতভাবে আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং প্রত্যহ হিসাব সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ-পত্র অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সৌভাগ্যদেবীরকৃপাদৃষ্টি তিনি লাভ করিতে যতটা সমর্থ হইয়াছিলেন, সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হইতে ঠিক ততটা বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৈশোরে যখন কোন গুরুতর অপরাধের জন্য স্কুলের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হয়, তাহারই কিছু-দিন পরে এক সুন্দরী জ্ঞাতী-ভগ্নীর সাহায্যে তিনি জ্যাক্সন্ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার জ্যাক্সন সাহেবের শ্যালক-পদে অভিষিক্ত হন। ইহার পর হইতেই তাঁহার দ্রুত উন্নতির পথে আর কোন বাধা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতা ব্রাঞ্চের ছোট সাহেবের পদে নিযুক্ত হইয়া বোম্বাই হইতে কলিকাতা প্রেরিত হইলেন। বিদ্যার এই ন্যূনতায় তাঁহার সর্ব্বদাই একটা সন্দেহ ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। যাহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্য সফল না হয় সে জন্য অধীন কর্ম্ম-চারিদের সততার প্রতি এতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁহার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল; যখনই কোন বিষয় বুঝিতে তাঁহার কিছু গোলমাল হইত, তখনই তাঁহার মনে হইত কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। ইহার ফলে কেরাণী বাবুদের অদৃষ্টে তিরস্কার ও গঞ্জনাভোগটা নিত্যপ্রাপ্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। কারণ মিষ্টার ওয়েলবিকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা বোধ হয়, ভগবান কোন ভারতবাসীকেই দেন নাই। যে প্রকৃতই নিদ্রিত তাহাকে জাগান বিশেষ কষ্টকর নয়—কিন্তু জাগিয়াও যে নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে, তাহার চৈতন্যোৎপাদন করাটা এক রকম অসম্ভব বলিলেও চলে। বহুপোষ্যভারপীড়িত নির্জ্জীব বাঙ্গালী বাবুদিগকে চাকুরীর মায়ায় বাধ্য হইয়া সে সব তিরস্কার ও ভর্ৎসনা চক্ষু বুজিয়া বরদাস্ত করিতে হইত। ঘরে যাহার সর্ব্বদা অভাবের এত তাড়না তাহার পক্ষে আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কখনও চলিতে পারে না। ওয়েলবিও যখন দেখিলেন কেরাণীকুল তাঁহার তিরস্কার ও ভর্ৎসনায় কোনরূপ প্রতিবাদ করে না, তখন তাহারা যে প্রকৃতই দোষী, সে সম্বন্ধে তাঁহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না, নির্দ্দোষ হইলে তাহারা এই অপমান এভাবে নীরবে সহ্য করিয়া যাইত না। সুতরাং কর্ম্মচারীদের মধ্যে সততা বিস্তারের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৩)

রমনীমোহন জ্যাক্সন কোম্পানীরই একজন কেরাণী। মাঝে আমাশয় হওয়ায় সে চারিদিন অফিসে উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অফিসের অন্যান্য কেরাণীবাবুরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সে কয়দিনের কাজ চালাইয়া দিয়াছিল। হরকুমার বাবু চিরন্তন প্রথানুসারে বেতনের বিলে রমনীমোহনের এই অনুপস্থিতির কোন উল্লেখ না করিয়া তাহার পুরা মাসের বেতনই বিল করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট ব্যাপারটা এত সহজ ও সরল বলিয়া মনে হইলেও মিষ্টার ওয়েলবির সূক্ষ্মবুদ্ধির নিকট উহা ভারত-বাসীর স্বাভাবিক অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনেচ্ছার একটা নূতন উপায় বলিয়া মনে হইল। তিনি হরকুমারবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রমনীমোহন যে মাঝে কয়েক-দিন অফিস কামাই করিয়াছিল সে সংবাদ তিনি জানিতেন

কিনা। হরকুমারবাবু উত্তর করিলেন, "রমণীবাবু চারিদিন অনুপস্থিত ছিলেন।"

ওয়েলবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তাহার পুরামাসের বেতন বিল করা হইয়াছে কেন ?"

হরকুমার বাবু কহিলেন, "তাঁহার এই অনুপস্থিতির কয়দিন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার কাজ করিয়া দিয়াছি। অল্প দিনের জন্য হইলে আমাদের আফিসে বরাবরই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার জন্য কাহারও বেতন কাটা হয় না।"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মিষ্টার ওয়েলবি সজোরে টেবিলের উপর মুষ্টাঘাত করিয়া কহিলেন, এতদিন তোমরা কত রকমেই জুয়াচুরী করিয়া আসিতেছিলে, কিন্তু মনে রাখিও আমার আমলে সে সব জুয়াচুরী আর চলিতেছে না। রমণীমোহন অনুপস্থিত ছিল, বেতন সে পাইতে পারে না; কাজ যেরূপেই হইয়া থাকুক তাহা দেখিবার দরকার নাই। আর আমার এটা কখনও বিশ্বাস হয় না যে তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য এভাবে কাজ করিয়া থাক। এই অনুপস্থিত-কালের বেতন তোমাদের মধ্যেই ভাগ হয়, যাহার নামে আদায় হয় তাহার ভাগ্যে জুটে না।"

এই তীব্র অপমানে মুহূর্ত্তের জন্য হরকুমার বাবুর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু এতদিনকার অভ্যাসের ফলে পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া ধীর স্বরে উত্তর করিলেন, "সার, আপনি আমাদিগকে যতটা নীচ মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি ততটা নীচ হইতাম, তবে বোধ হয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের কোম্পানীর এতটা উন্নতি হইতে পারিত না।"

হীন ভারতবাসীর এই অহঙ্কার ওয়েলবির অসহ্য হইল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "Damn your impudence!" তোমার ধৃষ্টতা ক্রমেই সংযমের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে! আমাদের উন্নতি অবনতির কারণ জানিবার জন্য আমি তোমাকে ডাকি নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিও না। এই বিল এখনই ফিরাইয়া নিয়া যাও। নূতন বিল তৈয়ারী করিয়া আন। এবার আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু মনে রাখিও ভবিষ্যতে যদি কখনও এ রকম জুয়াচুরী ধরা পড়ে তবে তোমার পক্ষে তাহা ভাল হইবে না। তোমার আর কোন কথাই শুনিতে চাই না। এখনই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

অপমানের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হরকুমারবাবু নিজের ডেস্কে ফিরিয়া আসিলেন।

দুইদিন পর ছোট সাহেবের আহ্বান অনুসারে তাঁহার খাস কামরায় উপস্থিত হইয়া হরকুমার বাবু দেখিলেন, সাহেব নীরবে চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে টেবিলের উপর সেই দিবসের একখানা (ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান) "Indian opinion" খোলা রহিয়াছে।

হরকুমার বাবু সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই ওয়েলবি তাঁহার দিকে কাগজখানা ঠেলিয়া দিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া পড়িতে আদেশ করিলেন। বিস্মিত হরকুমার কাগজখানা তুলিয়া নিয়া পড়িয়া দেখিলেন "One who knows" স্বাক্ষরিত কে একজন সেই দিনকার ঘটনার উপর নিজের কল্পনাশক্তির একটু কারসাজি দেখাইয়া "Indian opinion"এ একখানা পত্র ছাপাইয়াছে। লেখক মিষ্টার ওয়েলবির মুখে Dam, brute, nonsense, black nigger ইত্যাদি ইংরাজ-সুলভ চলিত সুমিষ্ট বুলি সমূহের আরোপ করিয়া অবশেষে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"ছোট সাহেব অবশেষে ক্রোধে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া খাজাঞ্চি মহাশয়কে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু খাজাঞ্চি মহাশয় অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া সাহেবের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। নতুবা হয়ত প্লীহা ফাটিয়া তাঁহার মৃত্যু হইত।"

হরকুমার বাবুর চিঠিপড়া শেষ হইলে ওয়েলবি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, এই চিঠি কে লিখিয়াছে তাহা জান কি ?"

হরকুমার বাবু জানাইলেন, এই চিঠির লিখককে জানা দূরে থাকুক, এই চিঠি সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না।

কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব কোমল করিয়া ওয়েলবি কহিলেন, "বোধ হয় ইহা তোমার কোন অতিব্যগ্র বন্ধু অথবা আফিসের অন্য কোন বাবুর কাজ। তুমি নিজে লিখিলে প্রকৃত ঘটনা এভাবে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইত না। সত্যবটে সেদিন আমি তোমাকে একটু বেশী রকম

তিরস্কার করিয়াছিলাম। সেজন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আশা করি সে সব কথা তুমি ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। এই চিঠির প্রতিবাদ করিয়া আজই তোমাকে Indian opinion এ একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। অবশ্যই সে চিঠি তোমার নিজের নামেই ছাপান হইবে। ইহাতে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ ঘটনা যেভাবে বিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহা তোমার ও আমার উভয়ের পক্ষেই কলঙ্কজনক।”

ওয়েলবির নিকটে সকলে এতদিন কেবল উদ্ধত ও পরুষ ব্যবহারই পাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আজ এই অকারণ ও আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনে হরকুমার বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ বিনা কারণে যে ওয়েলবির মত লোক ক্রোধের এতটা কারণ সত্ত্বেও আজ এতটা ভদ্রতা অবলম্বন করিয়াছে, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অথচ সেই কারণটুকু যে কি হরকুমার বাবু তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। এই বাহ্য সৌজন্যের অন্তরালে যে কি নূতন শাস্তি বা লাঞ্ছনা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার অনিশ্চিত আশঙ্কায় হরকুমার বাবুর মন উদ্বেগাকুল হইয়া উঠিল।”

তাঁহার নীরবতা, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার বিস্ময়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া ওয়েলবি তাঁহার মনের ভাব কতকটা অনুমান করিয়া লইলেন। কণ্ঠস্বর আরও সহজ করিয়া তিনি কহিলেন, “বাবু কোন কথা বলিতেছ না যে? বোধ হয় তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি, ইহাতে তোমার ভয়ের বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সেদিনকার ঘটনার কথা যাহাতে আমাদের মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় এবং অন্যেও যাহাতে সেটাকে একটা গুরুতর কিছু বলিয়া মনে না করে সেই উদ্দেশ্যেই আমি এই প্রস্তাব করিতেছি। আর ন্যায়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও আমার প্রস্তাব যে অসঙ্গত নয় তাহা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে।”.

হরকুমার বাবু তথাপি ব্যাপারটা এত সহজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া Indian opinion এ প্রকাশিত চিঠির একটি প্রতিবাদ লিখিতে হইল।

পরদিন হরকুমার বাবু ফেরিওয়ালার নিকট হইতে একখানা Indian opinion কিনিয়া নিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতিবাদ পত্র খানি বাহির হইয়াছে।

(৪)

সে দিনই অফিসে হরকুমার বাবু বড় সাহেবের নিকট হইতে এক চিঠি পাইলেন। সাহেব তাঁহার moderation এবং good sense এর জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহার বেতন ১০টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আজ এই সুসংবাদ তাঁহাকে সে রকম আনন্দ দিতে পারিল না। যে হীনতার জন্য আজ তাঁহার এই বেতন বৃদ্ধি তাহারই তিক্ত স্মৃতি বিষাক্ত শল্যের মত তাঁহার মর্ম্মস্থল পীড়ন করিতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, এই বেতন বৃদ্ধি তাঁহার অপদার্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতা আরও জলন্তভাবে প্রকাশ করিয়া দিল। ইহার উপর অফিসের মধ্যেই তাঁহার সতীর্থ কেরাণীকুল Indian opinion এ প্রকাশিত তাঁহার চিঠির কথা নিয়া যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, তখন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলের নিকটই আজ তিনি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। ওয়েলবি তাঁহাকে এত বড় অপমান করিল; তিনি নিজে ত এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেনই না; অধিকন্তু অপরে যদিও বা তাঁহার পক্ষ হইয়া সংবাদ পত্রে একটু আন্দোলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তিনি নিজে সে আন্দোলনের প্রতিবাদ করিয়া সেই অজ্ঞাত বন্ধুর মুখ এভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মুখে এভাবে অপমানের গভীর কালিমা মাখিয়া দিয়াছেন। ওয়েলবির সহিত তাঁহার দ্বিতীয় সাক্ষাতের কথা কেহ জানিত না, তিনিও এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও বলেন নাই। সুতরাং সেই চিঠিখানা সম্পূর্ণ তাঁহার আপন ইচ্ছায়ই প্রেরিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল। এত অপমানের পর এ নীচতা স্বীকারের জন্য আফিসের সমস্ত কেরাণীকুলই তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। ইহার উপর যখন অফিস ছুটির কিছু পূর্ব্বে স্বয়ং ওয়েলবি আসিয়া হাস্যমুখে খাজাঞ্চি বাবুর প্রমোশনের কথা প্রকাশ করিয়া সকলের সম্মুখেই আনন্দপ্রকাশ করিল, তখন তাঁহাদের এই বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। বৃদ্ধ

বয়সে সামান্য দশ টাকার জন্য তাঁহার এতটা নীচতা স্বীকার! চতুর্দ্দিকের তীব্র বিদ্রূপ ও উপহাসের জ্বালায় হরকুমার বাবুর পক্ষে আফিসে তিষ্ঠান এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কিন্তু গৃহেও আজ তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। বাসায় আসিতে না আসিতেই প্রতিবেশীরা সকলে আসিয়া তিনি এভাবে কেন বাঙ্গালীর মুখে ঘোর কালিমা লেপন করিলেন, সেজন্য তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। স্বভাবতঃই তিনি অল্পভাষী ছিলেন। তদুপরি আজ চতুর্দ্দিকের এই বিদ্রূপ ও টিট-কারী তাঁহার মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহার এই নীরবতায় সকলের ক্রোধ ও বিরক্তি আরও বৃদ্ধি হইল মাত্র। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের দল "খয়ের খাঁ, সাহেবের পোষ্যপুত্র" ইত্যাদি শিষ্টাচার সঙ্গত বাক্যাবলী দ্বারা তাহাদের সুশিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। যুবকগণ তাঁহাকে শুনাইয়া বাঙ্গালীই যে বাঙ্গালীর প্রধান শত্রু বিশেষ করিয়া এই মহাসত্য প্রমাণে তৎপর হইল আর প্রৌঢ়ের দল তাঁহাকে দেখিয়া বিষাক্ত সর্পের মত তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ক্রমে অপমানের তীব্র জ্বালায় হরকুমার বাবুর পক্ষে গৃহ হইতে বহির্গত হওয়াই একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তিন চারিদিন পরে হরকুমারবাবু একদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া নীরবে তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় এক হস্তে একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ ও বগলে একটি ক্ষুদ্র বিছানা লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সম্প্রতি কিছুদিন হইল গ্রীষ্মের বন্ধে সে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখানেই তাহার আরও প্রায় একমাস থাকিবার কথা। সুতরাং তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে হরকুমারবাবু বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল, "না আসিয়া থাকিতে পারিলাম কোথায়? সংবাদপত্রে প্রথমে আপনার লাঞ্ছনার কথা ও পরে আপনার স্বলিখিত প্রতিবাদপত্র পড়িয়া আর আমি থাকিতে পারিলাম না। তারপর ষ্টেশন হইতে বাসায় আসিতে পথে সতীশের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তাহার মুখে যে সব কথা শুনিলাম তাহাতে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। অন্যান্য সকলে যাহাই মনে করুক না কেন, আমার বিশ্বাস এ সব ব্যাপারের ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনার মুখ হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।"

হরকুমারবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, সে সব কথা অন্য সময় হইবে। এই মাত্র তুমি আসিতেছ। আগে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর। বৈকালে আফিস হইতে আসিয়াই সমস্ত বলিব।"

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পিতার এ আপত্তি শুনিল না। কহিল, "ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার বিলম্ব আমার সহিবে না। আর আমার এমন পরিশ্রম হয় নাই যে, এখন বিশ্রাম না করিলেই নয়। বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত কথা শুনিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

বাধ্য হইয়া অবশেষে হরকুমারবাবুকে তখনই সমস্ত কথা বলিতে হইল। মিষ্টার ওয়েলবির প্রথমে অফিসে আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার বেতন বৃদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই বলিলেন। পুত্রের নিকট আপনার অপমান-কাহিনী বলিবার সময় লজ্জায়, ক্ষোভে, প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তাঁহার স্বভাবগম্ভীর মুখও আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। আর পিতার অপমানের বিবরণ শুনিতে শুনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথের পিতৃভক্ত হৃদয়ও ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়েলবি হঠাৎ সেদিন আপনার সঙ্গে এতটা ভাল ব্যবহার কেন করিল, সে সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছেন কি?"

হরকুমার বাবু উত্তর করিলেন, "সে সময় কিছু করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু পরদিন ওয়েলবিরই অসাবধানতায় আমি তাহার এই ভাবপরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ জানিতে পারি। আমাদের আফিসের বড় সাহেব অতি ভাল লোক; ওয়েলবি কথায় কথায় যেরূপ সকলকে অপমান করেন, বড় সাহেব ঠিক সেই পরিমাণই আমাদিগকে ভালবাসেন ও আমাদের সঙ্গে ভদ্রব্যবহার করেন। সম্প্রতি ওয়েলবির বাড়াবাড়ির কথা একটু একটু করিয়া তাঁহার কাণে যাইতে-ছিল। তিনি শীঘ্রই একটী প্রতীকারের আবশ্যকতা অনুভব

করিতেছিলেন। এমন সময় Indian Opinion এ প্রকাশিত প্রথম চিঠিখানা তাঁহার নজরে পড়ে। সেইদিনই বিকালে তিনি ওয়েলবিকে ডাকাইয়া তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া-দিয়া আপাততঃ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোলমাল মিটাইতে আদেশ করেন। পরদিন ভোরে আবার একখানা চিঠি লিখিয়া তিনি ওয়েলবিকে এ সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দেন, এবং সঙ্গে ইহাও জানান যে ওয়েলবি যদি তাঁহার কথায় স্বীকৃত না হয় তবে সে যাহাতে ডিস্‌মিস হয় সে জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন। বড় সাহেবের এই চিঠিখানা ওয়েলবি ভুলে আফিস সংক্রান্ত কাগজপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিল। তাঁহার কতকগুলি কাগজ আমার কাছে ফেরত পাঠাইবার দরকার হয়। সে সময়ই সেই চিঠিখানা আমার হাতে আসে, এবং আমি ভিতরের এই সব কথা জানিতে পারি।"

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কেউ এই সংবাদ জানে কি?"

হরকুমারবাবু কহিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না, তবে না জানিবারই সম্ভাবনা।"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তবে আপনি তাহাদিগকে একথা জানান নাই কেন? জানাইলে বোধ হয় সকলে আপনার উপর এতটা বিরক্ত হইত না।"

তীব্রকণ্ঠে হরকুমার উত্তর করিলেন, "নিজের অপমানের কথা নিয়া অন্যের সঙ্গে আলোচনা করার প্রবৃত্তি আমার নাই। আর এই আলোচনা করিবই বা কাহার সঙ্গে? যাহারা আমার উপর এখন এত খড়্গহস্ত তাহাদিগকে আমি মানুষ বলিয়াই গণ্য করি না। আজ যে সব লোক আমার কার্য্যে এত তীব্র সমালোচনা করিতেছে, নিজেদের সময় তাহারা কি করিয়া থাকে? অনেকেরই ভিতরের খবর আমার জানা আছে। সুতরাং আত্মসম্মান-জ্ঞান ও জাতীয়-মর্য্যাদা-বুদ্ধি কাহার কি রকম প্রবল তাহা আমার জানিতে বাকী নাই। এই সব বিষমুখ, হীন, স্বার্থপর লোকের আদর বা বিরক্তির দিকে চাহিয়া কাজ করা, আর নিজের অপমানের বোঝা আরও বাড়ান একই কথা।"

পিতার এই প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথের অবিদিত ছিল না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কোন দিন তাঁহাকে এতটা স্পষ্ট হইতে দেখে নাই। পরিজনবর্গের সহিত ব্যবহারে হরকুমারবাবুর স্বাভাবিক গম্ভীরতা ও বাক্‌কৃচ্ছ্রতা আরও বৃদ্ধি পাইত। ইচ্ছা করিয়া যে তিনি এরূপ করিতেন তাহা নহে। কিন্তু ইচ্ছায়ই করুন আর অনিচ্ছায়ই করুন ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে বিপদে আপদে আপনার জনের নিকট হইতে উপদেশ দ্বারা কোনরূপ সাহায্য লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার সে গম্ভীরতার সম্মুখে কেহ যে উপযাচক হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ বা উপদেশ দিবে সে সাহসও তাহাদের কাহারও হইত না। তাই আজ জীবনে সর্ব্বপ্রথম পিতাকে কতকটা মন খুলিয়া কথা বলিতে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের বহুকাল পোষিত একটা আশা মিটাইবার ইচ্ছা হইল। সে ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া কহিল, "তবে, বাবা আপনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন না কেন?"

সহসা হরকুমারবাবুর মুখভাব আবার অত্যন্ত গম্ভীর হইল। নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "কেন দেই নাই? এ সহজ কথাটাও কি আবার মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে। যে কারণে এই চব্বিশ বৎসর যাবৎ এত অপমানের জ্বালা এ ভাবে নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছি, যে কারণে বাঙ্গালী জাতিটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, তেজ সমস্ত হারাইয়া ক্রমে ক্রমে মেষের জাতিতে পরিণত হইতেছে, ঠিক সেই কারণেই এবারও এই অপমান আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে। তুমি ত আর কিছুদিন পরেই অর্থনীতিতে এম্, এ পরীক্ষা দিতে যাইতেছ, আশা করি তোমাকে আর এই কারণটি মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে না।"

কি গভীর মনোবেদনায় যে হরকুমার বাবুর মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইল তাহা নরেন্দ্রনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু তথাপি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বা লজ্জিত না হইয়া সে কহিল, "চাকুরী ছাড়িয়া না হয় ব্যবসায় আরম্ভ করা যা'ক্। সামান্য মুদির দোকান করিয়াও ত কতলোকে সংসার প্রতিপালন করে, আমাদেরও যে রকমেই হউক এক রকমে সংসার চলিয়া যাইবে। নিত্য এত অপমানের বোঝা সহ্য করা অপেক্ষা শাকভাত খাইয়া চলাও ভাল।"

হরকুমারবাবু কহিলেন, "সংসারে আমাদের এই শাক

ভাণ্ডের জন্যই কত টাকার দরকার তাহা জান কি? ব্যবসায় করিয়া অত টাকা উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত মূলধন কোথায় পাইব?"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "আপাততঃ অল্প টাকাতেই আরম্ভ করা যা'ক। এই অল্প টাকা পাড়ার লোকদের কাছ হইতে বোধ হয় অনায়াসেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে।"

মৃদু হাসিয়া হরকুমার বাবু কহিলেন, "সংসারের শিক্ষা হইতে এবং মানুষ চিনিতে তোমার এখনও অনেক বাকী আছে দেখিতেছি। মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, কার্য্য-কালে কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য পাইবার আশা বড় একটা করিও না। লোকে যখন শুনিবে, এই বয়সে আমি চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসায় করিব ঠিক করিয়াছি, তখন অনেকের গৃহেই সহসা অর্থাভাব উপস্থিত হইবে। যদিও বা কেহ নিতান্ত দয়া করিয়া টাকা দিতে স্বীকার করেন তবে তিনি হয়ত ১২।১৫৲ টাকা করিয়া বার্ষিক সুদ চাহিয়া বসিবেন। এত সুদে মূলধন জোগাড় করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে সে ব্যবসায় কখনও টিকিতে পারে না। ইচ্ছা হয় তুমি নিজে একবার আমার কথা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।"

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এত-দিন পর পিতার মত বদলাইবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সে সুযোগ হয়ত আর কখন পাওয়া যাইবে না। তাই পিতার এই নিরাশাব্যঞ্জক কথায়ও কিছুমাত্র ভগ্নোদ্যম না হইয়া সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিল।

(৫)

সেইদিন অপরাহ্ণেই নরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশী মহলে বাহির হইয়া প্রকাশ করিল, হরকুমার বাবু অবশেষে এত অপমানের চাকুরী পরিত্যাগ করাই ঠিক করিয়াছেন। এ সংবাদে সকলেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল, হরকুমার বাবুর বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার মত এত বড় একজন খাজাঞ্চিবাবুর এ কার্য্যে যে সকল আফিসের সাহেবদেরই একটু চক্ষু ফুটিতে সে সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস জানাইল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করিল হরকুমারবাবু এখন সংসার প্রতি-পালনের জন্য ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছেন, এবং মূলধনের জন্য তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছেন, তখন সকলেরই সে উৎসাহ-বহ্নি সহসা ক্ষীণতেজ হইয়া পড়িল। কাহারও কন্যাদায়, কাহারও পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ, কাহারও পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধের বা পত্নীর কঠিন রোগে আশু সুচিকিৎসার আবশ্যকতা আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্য হরকুমারবাবুর এই সাধু সঙ্কল্পে সাহায্য করিতে পারিলে যে কতদূর সুখী হইত তাহা জানাইতে কেহই ত্রুটি করিল না। কিন্তু কি করিবে, নিতান্ত অনুপায়। কাজেই তাহারা নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও কিছুই করিতে পারিতেছে না।

কেবল দুই তিনজন মহানুভব সদাশয় ব্যক্তি জানাইলেন যে তাঁহাদের নিজেদের কাছে টাকা নাই বটে, তবে হরকুমারবাবুর এই সাধু সঙ্কল্পে সাহায্যের জন্য তাঁহারা তাঁহার হইয়া অন্যের নিকট হইতে টাকা জোগাড় করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অবশ্য সুদটা কিছু বেশী পড়িবে কারণ আজকাল টাকার বাজার বড় চড়া।

নরেন্দ্রনাথের নিকট সমস্ত শুনিয়া হরকুমারবাবু কহি-লেন, "তাহা ত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সকলেই জানে এ বয়সে নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া এত বড় একটা সংসার চালাইবার ক্ষমতা আমার নাই, বরং সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সুতরাং যথেষ্ট প্রলোভন ব্যতীত কেহ টাকা দিতে চাহিবে না। উপদেশ দিতে ও দেশভক্তি, আত্মসম্মান-জ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এ সব জিনিষের দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়।"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "এতটা যে হইবে আমি তাহা আশা করি নাই। যাহা হউক, তথাপি আমি হাল ছাড়িতেছি না। আপনার জামিনের জন্য যে দেড় হাজার টাকা মজুত আছে উহা দ্বারাই এক রকমে কাজ আরম্ভ করা যাউক। আর এদিকে আমিও অন্য রকম আয়ের চেষ্টা দেখি; আমি কলেজ ছাড়িয়া দেই।"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া হরকুমারবাবু কহিলেন, "এখন কিছুতেই তোমার পড়া শেষ করা যাইতে পারে না। আর নয় দশ মাসের জন্য এম্ এ পরীক্ষা বাদ পড়িবে?"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি কলেজ ছাড়িব বলিয়াছি, পড়া ছাড়িব বলি নাই। এম্ এ পরীক্ষা প্রাইভেটভাবেও দেওয়া যায়। আমি তাহাই দিব। তবে সময় এক বৎসর বেশী লাগিবে। কিন্তু

উপায় নাই। এখন শুধু "ল" ক্লাসে যাইব। কলিকাতার মধ্যেই একটা মাষ্টারী অথবা প্রাইভেট টিউশনি বোধ হয় জুটাইতে পারিব। তাহা হইলেই আমার "ল" পড়ার খরচ চালাইয়াও সংসারের অনেকটা সাহায্য করিতে পারিব। কোনমতে একবার বি এল্ আর এম এ টা পাশ করিতে পারিলে পরে চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। দুইটী বৎসর এক রকম করিয়া কাটিয়া যাইবেই।"

গভীর পুলকে হরকুমারবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চিরন্তন অভ্যাস বশতঃ এখনও কথা দ্বারা সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অন্তর দেখিতে পাইত, তবে দেখিত সে শুষ্ক মরুভূমিতে আজ কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও সুখের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু ষোলকলা পূর্ণ হইবার এখনও কিছু বাকী ছিল। সেটুকু আদায় করিবার জন্য তিনি কহিলেন, "কিন্তু তবু ত তোমাকে আবার সেই চাকুরীই করিতে হইবে।"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তা হউক। মাষ্টারী আর আপনার এই চাকুরীতে অনেক প্রভেদ, মাষ্টারীতে অপমান নাই; আর থাকিলেও আমার সঙ্গে আপনার তুলনা করা চলে না। এতদিন আপনি আমাদের জন্য প্রত্যহ এত হীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন,—এখন সে বোঝা না হয় কিছুদিন আমিই বহন করিলাম। যদি চিরকালও আমাকে এ বোঝা বহন করিতে হয় তথাপি এ বয়সে আপনাকে আর অপমানের জ্বালা সহ্য করিতে দিতে পারি না।"

এতদিনকার অভ্যাসজাত সংযমের বাঁধ আজ নবসুখের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেল। পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আনন্দবিগলিত কণ্ঠে হরকুমার বাবু কহিলেন, "আজ তুমি আমাকে যে সুখ দিলে, কি বলিয়া যে সেজন্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব তাহা জানিনা। তোমার কথামতই কাজ হইবে। একবার নূতনপথে ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, ফলাফল ভগবানের হাতে। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আমার এখন আর কোন দুঃখ নাই। আজ আমি তোমার নিকট যাহা পাইয়াছি তাহার আর তুলনা নাই। এতদিন সংসারকে বিকৃত-চক্ষে দেখিয়া কেবল অশান্তির আকর বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি কিন্তু এই অশান্তির মধ্যে ভগবান যে শান্তিরও বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সে শান্তি যে এত কাছেই পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিতাম না। মোহে অন্ধ হইয়া এতদিন কেবল অশান্তির বোঝাই বহন করিয়া আসিয়াছি,—এবং এই-জন্যই আজ এ নূতন শান্তির আস্বাদ এত মধুর বোধ হইতেছে।"

স্বভাবগম্ভীর, স্বল্পভাষী, উচ্ছ্বাসবিরল পিতার আজ এ উচ্ছ্বাসে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় যে অতুলনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। সে নীরবে পিতার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে সরকার

পতিব্রতা

জানি না ত্রিদিব কোথা—সে স্থান কেমন!
কোন্ জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার।
কি আলোকে বিভাসিত তাহার আনন
কোন্ মধু গন্ধে পূর্ণ তার শ্বাসভার?
কেবল পুরাণে শুনি তার বিবরণ।
শোভাময়, সুখময় শান্তির আগার
সেই পুণ্য নিকেতন। দেখিনি কখন।
পাপী মানবের ভাগ্যে রুদ্ধ তার দ্বার।
কিন্তু অয়ি পতিব্রতে জননীরূপিনি
মহাশক্তি-অংশভূতে! তব ফুল্লাননে
দেখি সদা প্রসারিত পীযূষক্ষারিণী
যে অনন্ত পুণ্যজ্যোতি, তাতে হয় মনে
বুঝি ত্রিদিবের এই ছবি মনোহর,
শান্তির পবিত্র খনি, শোভার আকর।

শ্রীপ্রমথনাথ দে

নিজাম উদ্দীন আওলিয়া

বর্ত্তমান দিল্লী নগরী যতগুলি প্রাচীন হর্ম্ম্যাবলী কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া সেই পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, তাপসশ্রেষ্ঠ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার সমাধিমন্দির তাহার অন্যতম। ইহা মুসলমানদিগের একটি তীর্থক্ষেত্র। এখানে প্রতি বৎসর ১৭ই রবিয়স্‌সানি মাসে আড়ম্বরের সহিত উৎসবের আয়োজন করা হয়; এবং ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজও পর্য্যন্ত এই সমাধির উপরে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি ও যথাসাধ্য অর্থাদি পণামী প্রদান করিয়া, একাগ্রমনে সেই পরলোকগত তাপসপ্রবরের নিকট বর যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। কেবল তাহাই নহে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, যাঁহারাই দিল্লী পরিভ্রমণ করিতে আইসেন, তাঁহারা সকলেই এই পবিত্র সমাধি-মন্দির দর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন।

কথিত আছে, নিজাম-উদ্দীন, পেগম্বর মহম্মদের পৌত্র হোসেনের পঞ্চদশ বংশধর। ইঁহার পিতামহের নাম খাজে-আলি-বোখারী এবং পিতার নাম সৈয়দ খাজে আহম্মদ দানিয়েল।

ইঁহার পিতামহ খাজেআলি তুর্কিস্থানের অন্তর্গত বোখারা নগরের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও শিক্ষিত হইলেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা এতদূর হীন ছিল যে, তিনি দারিদ্র্য ক্লেশে প্রপীড়িত হইয়া সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন মানসে, প্রথমে লাহোরে, পরে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বুদাউন নগরে উপস্থিত হইয়া, কালে তথাকার অধিবাসী হইয়া পড়েন।

এই বুদাউন নগরে তাপস শ্রেষ্ঠ নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার জন্ম হয় (হিজিরী ৬৩৪ খৃঃ অঃ ১২১৬)। জন্মকালে তাঁহার পিতামহ খাজেআলি জীবিত ছিলেন না। তিনি পিতামাতার যত্নে ও স্নেহময়ী পিতামহীর ক্রোড়ে অতি আদরের সহিত প্রতিপালিত হইতে থাকেন। কিন্তু এ আদর যত্ন তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। পাঁচ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি পিতৃহারা হন এবং তাঁহার পিতামহী ও এই সময় পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহাকে একমাত্র মাতার ক্রোড়েই পরিবর্দ্ধিত হইতে হইয়াছিল।

তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী ও সুশীলা ছিলেন। দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যেও, একমাত্র পুত্র নিজামের শিক্ষাদানে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই; বুদাউনের সুবিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ-আলা-উদ্দীনের উপর পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে নিজাম অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সাধারণের নিকট সম্মান ও খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে, নিজামের এরূপ গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তিনি যে কোনও সভায় যাইতেন, সভাস্থ সকলে তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া যাইত; কাহারও কোন বাক্য স্ফূর্ত্তি করিবার সাহস পর্য্যন্ত হইত না। একারণ সকলে নিজামকে "মাহফিল-সিকান" (সভাভঙ্গকারী) নামে অভিহিত করিত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দিল্লী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং নিজামকে, গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে, উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার্থ মাতার সহিত দিল্লী আগমন করিতে হয়। এ সময় তাঁহার বয়স মাত্র বিশ বৎসর ছিল। এখানে আসিয়া খাজে-শাম্‌স্ উদ্দিন খোবার-জমী নামক জনৈক সুবিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট নিজাম উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। এই খাজে-শম্‌স্-উদ্দিন সাম্রাজ্যের মধ্যে এতদূর বিজ্ঞ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন যে, সুলতান গিয়াস-উদ্দিন-বলবন স্বয়ং তাঁহাকে "শম্‌স্-উল-মুল্ক" (Sun of the Empire) উপাধি প্রদান করেন এবং পরে তাঁহাকে নিজের উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধনের প্রয়াস পান। উজীরের পদ লাভ করিবার পর শম্‌স্-উদ্দিনকে আর শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী থাকিতে দেখা যায় নাই। তিনি নিজাম উদ্দীনের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে ও সাধুতায় এতদূর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্যান্য

ছাত্রগণ অপেক্ষা নিজামকে অত্যন্ত অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি ও ভবিষ্যত উন্নতির দিকে সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিতেন। নিজাম এ পর্য্যন্ত যোগ শিক্ষা করেন নাই।

নিজাম-উদ্দীনের বাসার সন্নিকটে সেখ্ নজিব-উদ্দীন মুতবক্কিল (১) নামে এক সাধু বাস করিতেন। নিজাম সর্ব্বদা ইঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং অধিকাংশ সময় ইঁহার সহিত ভগবত্তত্বালোচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। সাধুসঙ্গ করিলে কি হইবে, নিজামের মনে কিন্তু রাজ্যের উচ্চপদ লাভ করিয়া, সুবিচার ও লোকহিত সাধন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। একদিন তিনি সেখ নজিবউদ্দীনকে তাঁহার কাজির পদ প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। সেখ নজিব-উদ্দীন উত্তর দেন "বৎস, তুমি কাজি হইতে পাইবে না। তুমি যে কি হইবে তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।"

ঘটনাচক্রে এই সময় দিল্লীর কাজির পদ শূন্য হয়। নিজামের অধ্যাপক খাজে শম্স্ উদ্দীন খোবার-জমী তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। তিনি সুলতানের নিকট নিজামের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মভীরুতার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকেই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজির পদে মনোনীত করেন।

হঠাৎ অযাচিতভাবে চিরাকাঙ্খিত বিচারবিভাগের উচ্চপদ লাভ করিয়া, নিজাম ও তাঁহার মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হন; এবং করুণাময় জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে থাকেন। কথিত আছে, যে দিন নিজাম কাজির পদ প্রাপ্ত হন, সেইদিন সন্ধ্যাকালে ঘটনাচক্রে তিনি সাধুপ্রবর খাজা কুতুব-উদ্দীনের সমাধির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় সহসা এক জ্যোতির্ম্ময় দরবেশ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে "হায় নিজাম, তোমার এ কি নীচ অভিরুচি! তুমি ছার কাজির পদ প্রাপ্তিতেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছ! আমি আশা করিয়াছিলাম, তুমি ধর্ম্মজগতের অধিপতি হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে পাপীর পরিত্রাণ কার্য্যে ব্রতী হইবে।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবেশ অন্তর্হিত হইয়া যান। নিজাম ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৃহাগত হন এবং মাতা ও প্রতিবেশীবর্গ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পরদিনই স্পৃহনীয় কাজির পদ পরিত্যাগ করতঃ বুদাউনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতা পরোলোক গমন করিল। মাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিজাম অত্যন্ত ম্রিয়মান হন। ক্রমে তাঁহার সংসারে বীতরাগ জন্মিতে থাকে এবং তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই সময় পাকপাঠান নগরে বাবা-ফকির-উদ্দীন শকরগঞ্জ নামক জনৈক সাধুপ্রবরের তপোমহিমা ও মাহাত্ম্যের খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নিজাম-উদ্দীন এই তাপস-শ্রেষ্ঠ বাবা-ফকির-উদ্দীনের মহিমা লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার দর্শন লাভার্থ পাকপাঠান নগরে গমন করেন। কথিত আছে, নিজাম বাবা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বাবা সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া বলেন ;—

অয় আতিশে ফিরাকৎ দিলহা কবাব করদা।
সয়লাবে ইস্তিয়াকৎ জানহা খবাব করদা॥

"তোমার বিরহানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে; তোমার সহিত মিলিত হইবার বাসনা আমার জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র নিজাম সেই মহর্ষির চরণতলে পতিত হ'ন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

একদিন নিজাম বাবা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি এখন বিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে থাকিব, কি ঈশ্বর উপাসনায় মনোনিবেশ করিব?" বাবা সাহেব উত্তর করেন; "তুমি এখন দুই কাজই করিতে থাক। এই দুইএর মধ্যে যেটি বলবত্তর হইবে, তাহাই তোমাকে ভবিষ্যতে অধিকার করিবে।"

বাবা সাহেবের শিষ্যগণকে কাষ্ঠ আহরণ, রন্ধন প্রভৃতি কোন না কোনও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। নিজামকে সেইরূপ গুরুগৃহে অবস্থান কালে রন্ধন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক সময় বাবা সাহেব ত্রিরাত্রি উপবাস ব্রত পালন করেন এবং চতুর্থদিন নিজামকে তাঁহার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। নিজাম রন্ধনশালায় গমন করিয়া দেখেন যে, পাত্রে লবণের অভাব আছে। সুতরাং তিনি দোকান হইতে সামান্য

(১) যাহারা খাবার চাহিয়া খায় না, তাহাদিগকে মুতবক্কিল বলে।

লবণ ধারে ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাবার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করেন। বাবা সাহেব আহারে বসিলেন এবং মাত্র একগ্রাস মুখে তুলিয়া বলিলেন "নিজাম, আজ খাবার এত তেত বোধ হইতেছে কেন?" নিজাম আহার্য্য তিক্ত হইবার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, আটা, ঘৃত, কাষ্ঠ প্রভৃতি যে যে শিষ্য যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সকলই গুরুদেবের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। বাবা সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "লবণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলে?" নিজাম সবিনয়ে উত্তর করিলেন "দোকান হইতে ধার করিয়া কিনিয়া আনিয়াছি।" বাবা সাহেব তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নিজাম. জানিয়া রাখ, ফকিরেরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি নিজের জন্য কখনও ধার করিবে না।" ইতিপূর্ব্বে নিজামের অত্যন্ত ধার করা অভ্যাস ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এই কু অভ্যাস সংশোধন করিবার জন্যই তাঁহার গুরুদেব আজ এই ছল অবলম্বন করিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতে নিজাম তাহার সেই চিরাগত ধার করা অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নিজাম 'রাহতুলকুলুব' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া যান। এই পুস্তকের একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, গুরুগৃহ হইতে দিল্লী আসিবার সময়, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে নিজের বসিবার কম্বল খানি উপহার প্রদান করিয়া বলেন "এবার আর তোমার কখন ধার করিবার প্রয়োজন হ'বে না।" বাস্তবিকই সেই কম্বলের মাহাত্ম্যে অতিথি সৎকারাদি ব্যয়সাধ্য কার্য্যে নিজামকে কখন কিছুর অভাব বোধ করিতে হয় নাই।

নিজাম একে সুশিক্ষিত বিদ্বান ও স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার উপর বাবা সাহেবের শিক্ষা প্রভাবে ও নিজের অধ্যাবসায় গুণে যোগ, তপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিতে অতি অল্পকালের মধ্যে এতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে বাবা সাহেব তাঁহার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির বিকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং সাদরে তাঁহাকে নিজের প্রধান শিষ্যত্বপদে বরণ করেন। কথিত আছে যেদিন নিজাম দিল্লী আগমন অভিপ্রায়ে গুরুর নিকট বিদায় লন, বাবা সাহেব সেইদিন পাকপাঠানের যাবতীয় বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এক বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান করেন; এবং এই সভায় শত্রুর সহিত সদ্ব্যবহার ও যথাসাধ্য লোক হিতসাধন করিতে উপদেশ দিয়া, নিজামকে সাশ্রুনয়নে বিদায় দেন। কেবল তাহাই নহে, এই সভা সমক্ষে, তিনি নিজামকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া, তাঁহার নিজের গুরু খাজাকুতুব উদ্দীন বক্তিয়ার কাকী (২) মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাকৃড়ী, লকৃড়ী ও আরও কয়েকটি দ্রব্য নিজামকে প্রদান করেন, এবং বলেন, "আমার মৃত্যুকালে তোমার আমার নিকট থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই বলিয়া, আমি এখনই আমার গুরু প্রদত্ত এই সকল মূল্যবান সামগ্রী তোমায় প্রদান করিতেছি। দেখিও যেন এই সকল পবিত্র দ্রব্যের কোনরূপ অবমাননা করা না হয়।"

নিজাম তাঁহার রাহতুল-কুলুব পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন যে তাঁহার দিল্লী আসিবার সময়ে, পথে একদল ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ করে। ডাকাতগণ অতি আড়ম্বরের সহিত তাঁহার দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কি জানি কেন তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে সহসা পলায়ন করে। দিল্লী আসিয়া প্রথমে তিনি সাধনা করিবার উপযোগী নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই সময় দিল্লীর অন্যান্য ফকিরগণের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ফকিরগণ তাঁহাকে জানায় যে, দিল্লী সহর অতি পাপপূর্ণ স্থান এখানে প্রত্যহ শত শত কুকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সাধুগণের একেবারেই বাসোপযোগী নহে। অগত্যা নিজাম দিল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী গিয়াসপুর নামক গ্রামে কুটীর স্থাপন করেন।

নির্জ্জন গ্রামে কুটীর স্থাপন করিলে কি হইবে, নিজাম যে লোকালয় হইতে দূরে অবস্থান করেন, ইহা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। ইহার অতি অল্পদিন পরে সুলতান মহজ উদ্দীন কায়কোবার গিয়াসপুর গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কিলোকিরী নামক স্থানে প্রাসাদ, দুর্গ

---

(২) ইনিও একজন সুবিখ্যাত মহাপুরুষ ছিলেন। ক্যানিংহাম্ সাহেব ইঁহারই নামানুসারে দিল্লীর বর্ত্তমান কুতব-মিনারের নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। নিজাম কাজির পদ প্রাপ্তির দিন এই মহাপুরুষেরই সমাধিপার্শ্বে জ্যোতির্ম্ময় দরবেশমূর্ত্তির দর্শন পান, এবং পরে ইঁহারই প্রধান শিষ্য বাবা ফাকুর-উদ্দীনের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া, ইঁহারই ব্যবহৃত পাকৃড়ী ও লাকৃড়ীর উত্তরাধিকারী হন।

জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে এই স্থান জনাকীর্ণ হইয়া উঠে এবং লোকে নিজামের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধুতার কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে থাকে। নিজাম নির্জ্জনে কুটীরে সাধনা করিতে ইচ্ছুক; এই লোক সমাগম একেবারেই পছন্দ করিলেন না। জনসাধারণের গতিবিধিতে বিরক্ত হইয়া, একদিন যখন তিনি মনে মনে এই স্থান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার সম্মুখে এক দরবেশ মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, নিজাম, সাধুদিগের প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত নয় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা যখন আপনা হইতেই আইসে তখন বুঝিতে হইবে যে, উহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। লোকহিতার্থে উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।" অতঃপর নিজাম স্থানান্তরে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ করেন।

আশ্রমে লোক সমাগম হইলেও প্রথম প্রথম নিজামের নিকট এমন কিছু প্রণামী আসিত না যাহাতে তাঁহার দৈনিক আহারের সংস্থান হইতে পারে। এক সময় নিজাম চারিদিন যাবৎ সশিষ্যে অনাহারে অবস্থান করেন। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটে এক বৃদ্ধা বাস করিত। সে বড়ই গরিব, চর্‌কা কাটিয়া দিনপাত করা ব্যতীত তাহার আর অন্য কোনও জীবিকা ছিল না। বৃদ্ধা নিজামকে আন্তরিক ভক্তি করিত। নিজামের অনাহারের কথা শ্রবণ করিয়া সে বড়ই ব্যথিত হয় এবং তাহার নিজের হাতে কাটা সুতা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে মাত্র দেড়সের যবের আটা নিজামকে প্রনামী দেয়। নিজাম কিন্তু এ আটা পাইয়া শিষ্যগণকে বলেন "এ খাদ্য আমাদের নয়। একজন অতিথি আসিতেছেন। তাঁহারই আহারের জন্য ভগবান এই আটা পাঠাইয়াছেন। তোমরা এখন ইহাতে জলদিয়া আগুনে চড়াইয়া রাখ।" শিষ্যগণ অগত্যা তাঁহার আদেশানুযায়ীই কার্য্য করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আটা উনানে চড়াইবা মাত্রই এক ফকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। তাহার বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন, দেখিতে কদাকার। আসিয়াই নিজামকে রুক্ষস্বরে বলিল "আমায় খাবার দাও।" নিজাম সবিনয়ে কহিলেন "খাবার প্রস্তুত হচ্চে, একটু অপেক্ষা করুন।" ফকির পূর্ব্বেরই ন্যায় রুক্ষস্বরে বলিল "খাবার যেমন আছে, তেমনি দাও, পাক করিবার দরকার নাই।" অগত্যা নিজাম স্বয়ং ফুটন্ত আটার পাত্রটি লইয়া ফকিরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ফকির পাত্রটি হইতে দু'এক গ্রাস আহার করিয়া পাত্রটি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল "নিজাম, বাবা সাহেব তোমায় অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছেন; কিন্তু আমি এই ফকিরের কদর্য্য হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়া দিয়া তোমার বাহ্যদৃষ্টি দিতেছি।" কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফকির অন্তর্হিত হইল। কথিত আছে, এই দিন হইতে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান পদস্থ ব্যক্তিগণ একে একে নিজামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। নিজামের নিকট এত অধিক পরিমাণে ডালি আসিতে থাকে যে, তিনি অতি আড়ম্বরের সহিত অতিথিশালা ও দানছত্র স্থাপন করিয়া মুক্তহস্তে প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের আহার সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন। এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় যে, একদিন নিজামের অতিথিশালায় প্রায় ৭ মণ লবন খরচ হইয়াছিল।

নিজাম উদ্দীনের জীবনে এমন কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা আছে, যাহাতে তাঁহার মহচ্চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

তিনি অর্থকে তুচ্ছ ধূলিকণার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট যত অর্থাগম হইত, সে সমস্তই তিনি মুক্তহস্তে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে বিতরণ করিতেন, কখনও নিজের ভোগের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদিন কোনও সাধু, বাবা সাহেবের নিকট হইতে একটা টুপী ও একটা কম্বল আনিয়া নিজামকে উপহার প্রদান করে। এই দিন ঘটনাক্রমে বাদশাহের কোনও আত্মীয় নিজামকে ২৫০ আসরফি (স্বর্ণমুদ্রা) প্রণামী দেয়। নিজাম এই অর্থগুলি সঙ্গে সঙ্গে দান করিয়া ফেলিবার প্রকৃষ্ট অবসর পাইয়া, তৎক্ষণাৎ সমস্ত অর্থই এই সাধুটির করতলে অর্পণ করেন, এবং তাঁহাকে বিনীতভাবে নিবেদন করেন যে, এই সামান্য অর্থ ঈশ্বর প্রেরিত, ইহা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে বাধিত করা হইবে।

একদিন তাপস-শ্রেষ্ঠ সেখ-কুতব-উদ্দীনের পৌত্র, নিজামের নিকট আসিয়া, কোনও আমীরকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে, যেন আমীরটি পত্রপাঠ তাহাকে কিছু অর্থ দেয়। নিজাম উত্তর করেন যে, তিনি এই আমীরকে কখনও দেখেন নাই বা চিনেনও না,

সুতরাং এভাবে তিনি কিরূপে এরূপ অনুরোধপত্র লিখিতে পারেন। ইহাতে কুতব-উদ্দীনের পৌত্র অত্যন্ত রাগিয়া উঠে এবং নিজামকে অতি অকথ্য কটূক্তি করিয়া এইরূপে ভর্ৎসনা করে যে, তাহার পিতামহ কুতব-উদ্দীনের শিষ্যের শিষ্য হইয়া তাহার জন্য সামান্য এই কাজটুকু আর করিতে পারিলেন না। নিজাম কিন্তু ইহার অশিষ্ট ব্যবহারে কুপিত হওয়া দূরে থাকুক, সহাস্যমুখে তাঁহার সেই দিনকার সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ প্রদান করিয়া ইহাকে শান্ত করেন।

শত্রুর মঙ্গল চিন্তা করা নিজাম-উদ্দীনের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। সৈব-উল-আরেফিন পুস্তকে লিখিত আছে যে, শামস্-উদ্দীন নামক কোনও এক ব্যক্তি নিজাম-উদ্দীনের ঘোর শত্রু ছিল। সে ব্যক্তি নিজামের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, তাঁহাকে নানারূপ অকথ্য কুকথা বলিত; এবং সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্টাচরণে সচেষ্ট থাকিত। নিজাম কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং তাহার মঙ্গল-বিধানে সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেন। একদিন এই ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুর সহিত সান্ধ্য ভ্রমণ করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্যোৎস্নালোকে নদীর মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে এবং তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কিছু মদ আনাইয়া, তথায় একটু আনন্দোপভোগ করিবার আয়োজন করে। এ ব্যক্তি পাত্রে সুরা ঢালিয়া সবেমাত্র পান করিতে উদ্যত হইবে, এমন সময় সম্মুখে দেখে যে, নিজাম-উদ্দীন তাহাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "শামস্-উদ্দীন, আমার নিষেধ মদ খাইও না। তোমার এতটা অধঃপাতে যাওয়া আমি আশা করি না।" নিজামের কথায় তাহার মনে কেমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে নিজামের সহিত তাহার শত্রুতার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিজামের পশ্চাদ্ধাবন করে। এই ঘটনার পরদিনই সে নিজামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, এবং নিজামের কৃপায় ও নিজের অধ্যবসায় গুণে কালে একজন পরম সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচিত হয়। নিজামের প্রধান শিষ্য সেখ-নাসিরুদ্দীন চিরাগ-দিল্লী (১) বলেন যে, তিনি যখন আহমেদাবাদে যাইতেছিলেন, তখন পথে খাজা-শামস্-উদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁর পরিহিত বস্ত্র ছিন্নভিন্ন। ইনি মাত্র একটি কাঠের বাটী ও একটি মাটীর হাঁড়ি লইয়া বিহারের দিকে যাইতেছিলেন। নাসিরুদ্দীন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি খবর শামস্-উদ্দীন?" শামস্-উদ্দীন উত্তর দেন "গুরুর কৃপায় আমি জ্ঞান দৃষ্টি পাইয়াছি, এখন বেশ আছি।"

গিয়াসপুরের অধিবাসী ছজ্জু নামক এক ব্যক্তি অকারণ নিজামের সহিত শত্রুতাচরণ করিত। এ ব্যক্তি নিজামের কেবলমাত্র অনিষ্ট চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, তাঁহার প্রাণহানি পর্য্যন্ত করিতেও কয়েকবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইনি দেহত্যাগ করিলে, নিজাম ইহাঁর শবানুগমন করেন; এবং ইহার সমাধিক্ষেত্রে বহুক্ষণ যাবৎ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া, ইহাঁর পারলৌকিক আত্মার মঙ্গল কামনায় উপাসনা করিতে থাকেন।

নিজাম বিলক্ষণ জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠাপন্ন সাধুপুরুষ হইলেও, তাঁহাকে যথেষ্ঠ রাজপীড়ন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অবিচলিত চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যখন সুলতান কুতব-উদ্দীন মেবারিক ভ্রাতা খিজির খাঁর রক্তে গোয়ালিয়রের দুর্গ কলুষিত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন খিজির খাঁ, গোয়ালিয়ারের দুর্গে দেবলাদেবীর সহিত বন্দী থাকিলেও, নিজামের শিষ্য দলভুক্ত ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনও নিজামের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ কারণ সুলতান কুতব উদ্দীন নিজামের একজন প্রধান শত্রু; সাধ্যমত নিজামের অনিষ্টাচরণের প্রয়াস পান, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণ নিজামকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করিত বলিয়া, প্রকাশ্যতঃ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। একদা কুতব-উদ্দীন স্বীয় মন্ত্রী কাজি মহম্মদ গজনবীকে জিজ্ঞাসা করেন, নিজামের আশ্রমে প্রত্যহ দান-সেবাদি কার্য্যে যে এত অধিক অর্থ ব্যয় হয়, উহা কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রী গজনবী উত্তর করেন যে, সাম্রাজ্যের যাবতীয় আমীর ওমরাহ ও ধনী ব্যক্তিগণ নিজামকে প্রণামী হিসাবে যে অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইতেই ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই সময় নিজামের আশ্রমে প্রত্যহ ২০০৲ টাকা (রৌপ্য মুদ্রা)

(১) দিল্লীর সন্নিহিত যে গ্রামে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেই স্থানকে তাঁহার নামানুসারে আজ পর্য্যন্তও চিরাগদিল্লী নামে অভিহিত করা হয়।

দান সেবাদি কার্য্যে ব্যয় হইত। সুলতান তখন এইরূপ আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি নিজামের আশ্রমে যাইবে, অথবা তাঁহাকে কোনরূপ অর্থাদি প্রদান করিবে, তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এই রাজাজ্ঞা ঘোষণার সংবাদ নিজামের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বীয় ভৃত্য একবালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ হইতে দান-সেবাদি কার্য্যে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় কর। তোমার যখনই অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখনই ঘরের তাকে "বিশমিল্লা" (ঈশ্বরের দোহাই) বলিয়া হাত দিও, প্রয়োজনীয় অর্থ পাইবে।" একবাল আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। বিনা আমীর ওমরাহগণের সাহায্যে দ্বিগুণ হিসাবে দান সেবাদি কার্য্য চলিতে দেখিয়া নিজামের নামে সহরময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সুলতান কুতব-উদ্দীন কিন্তু ইহাতে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, নিজামের তপঃপ্রভাবের নিকট নিজের রাজশক্তিকে পরাভূত হইতে দেখিয়া, আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন, "ফকীর সেখ-রুকুনুদ্দীন-আবুল-ফাতা প্রায়ই মুলতান হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে, আর তুমি দিল্লীতে থাকিয়াও আমার সহিত দেখা কর না। ইহা তোমার বড়ই ধৃষ্টতা। তুমি অন্ততঃ সপ্তাহে একবার আমার দরবারে হাজির হইবে।" নিজাম জবাব দিলেন, "রাজ দরবারে হাজির হওয়া আমার রীতি নহে এবং আমার গুরুরও এরূপ উপদেশ নয়। সুতরাং আমায় ক্ষমা করিবেন।" বলা বাহুল্য এরূপ উত্তরে সুলতানের জেদ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি পুনরায় নিজামকে এইরূপ এক আজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন, "এটা আমার হুকুম, রাজ আজ্ঞা; মানতে হবে।" নিজাম নির্ভীকচিত্তে উত্তর দিলেন, "এক জগতের অধীশ্বর ব্যতীত কোনও অধীশ্বরেরই হুকুম মানিতে আমি প্রস্তুত নহি।" ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। নিজামের অনিষ্টাশঙ্কায় আমীর ওমরাহগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ষড়যন্ত্রও চলিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী মালিক খুসরু অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, এবং রাজ্যের মধ্যে এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র তাঁহারই পরামর্শে সুলতান পরিচালিত হইতেন; এবং তিনিও সুলতানকে দুর্ব্বলচিত্ত দেখিয়া, দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবার সুযোগ অন্বেষণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এই নিজাম ঘটিত ব্যাপারে রাজ্যমধ্যে এইরূপ অশান্তির উদ্রেক হওয়াটা, তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বুঝিয়াই হউক, অথবা সুলতানের মঙ্গল কামনা করিয়াই হউক, সুলতানকে অতি কষ্টে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত করিল। এ দিকে হোসেন-সুনজুরী নামক নিজামের জনৈক শিষ্য রাজকোপ হইতে নিজামকে বাঁচাইবার জন্য সুলতান কুতুবউদ্দীনের গুরু সেখ জিয়াউদ্দীন রুমীর নিকট গমন করে। জিয়া-উদ্দীন এই সময় পীড়িত ছিলেন। তিনি হোসেন সুনজরীকে অভয় দিয়া বলেন, "বৎস, তোমার গুরু নিজামউদ্দীন এক-জন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ; সুলতানের সাধ্য কি যে তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে। আমি সুলতানের গুরু; তাহার মঙ্গল বিধান করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আর সময় নাই। আমি দিব্যচক্ষে সুলতানের ভবিষ্যৎ পরিণাম দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিতেছি।" ইহার দুই দিন পরে এই গুরু জিয়াউদ্দীন দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যক্ষেত্রে রাজ্যের যাবতীয় আমীর ওমরাহ, সাধু সন্ন্যাসী এবং নিজাম ও স্বয়ং সুলতান কুতুবউদ্দীন উপস্থিত হন। এই স্থানে সুলতান, নিজামকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। অবশেষে নিজামের ভৃত্য এক বালককে দিয়া নিজামের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, নিজাম যদি একটিবারমাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি নিজামের যাইবার নিমিত্ত অতি সমারোহের সহিত রাজযান বাহনাদি প্রেরণ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষাধিক স্বর্ণ মুদ্রা প্রণামী দিতে প্রস্তুত আছেন। নিজাম এ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করিলেন না, ঈষৎ একটু হাস্য করিলেনমাত্র। এই দিন রাত্রেই ক্রূরমতি মালিক-খুসরু কুতুবউদ্দীন খিলিজিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

কথিত আছে, নিজামউদ্দীনের সহিত সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলকের ভীষণ শত্রুতা ছিল। গিয়াস বাঙ্গালা জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে হুকুম করিয়া পাঠান যে তাঁহার দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে নিজাম যেন দিল্লী পরিত্যাগ করে। নিজাম এই সময় পীড়িত ছিলেন। তিনি এই হুকুম শুনিয়া বলেন, "হানুজ দিল্লী দুরস্ত" অর্থাৎ দিল্লী

এখনও বহুদূরে (২) গিয়াস উদ্দীনকে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী আফগানপুর নগরে শিবির সংস্থাপন করিতে দেখিয়া নিজামের শিষ্য তাঁহাকে দিল্লী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তখন নিজাম বলেন—

কম্‌ব জালিম বস্থএ কুশ্‌তনে-মাস্ত,
দিলে মজলুম মা বস্থএ খুদাস্ত।
ও দরীন্ ফিকর তাব মাকে কুনদ্,
মন দরীন্ ফিকর তা খুদা কে কুনদ্॥

অর্থাৎ অত্যাচারীর মন আমার অনিষ্টকরণের চিন্তায় নিবিষ্ট, আর আমার মন ভগবানের উপর স্থাপিত। অত্যাচারী ভাবিতেছে যে, সে আমার উপর কিরূপ ব্যবহার করিবে, আর আমি ভাবিতেছি, ভগবানের মনে কি আছে।" বাস্তবিকই নিজামকে আর দিল্লী হইতে তাড়াইতে হয় নাই সুলতান গিয়াসউদ্দীনকেই ইহজগৎ হইতে দুরীভুত হইতে হইয়াছিল। গিয়াস, দিল্লী প্রবেশের পূর্ব্বে তদীয় পুত্র মহম্মদকে, তাঁহার নিজের অভ্যর্থনার জন্য একটি মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে মহম্মদ রাজকীয় অট্টালিকা সমুহের পরিদর্শক মালিক জাদের তত্ত্বাবধানে তিন দিনের মধ্যে একটি মঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। এই মঞ্চটি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, ক্রীড়াস্থলে হস্তীগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করিলেই উহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গিয়াস দিল্লী পৌছিয়া উৎসবান্তে এই মঞ্চের মধ্যে যখন হস্তীর ক্রীড়া দেখিতে ছিলেন, তখন মহম্মদের ইঙ্গিতে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে হস্তীর স্পর্শ দ্বারা মঞ্চটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। গিয়াস ও তদীয় পুত্র মাহমুদ প্রাণত্যাগ করে। বলা বাহুল্য মঞ্চ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পুর্ব্বেই মহম্মদ বাহিরে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। (৩

নিজাম যে কেবল রাজপীড়নই ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সময় সময় কোন কোন দিল্লীর অধীশ্বরের নিকট হইতেও যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইয়া ছিলেন। তাঁহার ভক্ত রাজগণের মধ্যে আলাউদ্দীন খিল্‌জির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিতে গমন করিলে মোগল সেনাপতি তারগি খাঁ সুযোগ বুঝিয়া ১২০০০০ সৈন্য লইয়া দিল্লী অবরোধ করতঃ যমুনা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করেন। সুলতান আলাউদ্দীন সংবাদ পাইয়া সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু চিতোর যুদ্ধে পরিশ্রান্ত সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত শক্রর সম্মুখীন হওয়াটা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোগলেরা প্রায় দুইমাস যাবৎ দিল্লী অবরোধ করিয়া রাখে। আলাউদ্দীনের সৈন্য শক্র সৈন্যের তুলনায় নগণ্য; তাহার উপর রাজধানী শক্র-করতলগত থাকায় সৈন্য সংগ্রহেরও কোনও উপায় ছিল না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া আলাউদ্দীন একদিন সন্ধ্যাকালে নিজামউদ্দীনের শরণাপন্ন হন। নিজাম আলাউদ্দীনকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, "আজ দেখ, ভগবান কি করেন।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দিন রাত্রেই মোগল সৈন্য কোনও অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া সহসা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ফলতঃ একমাত্র নিজামের তপঃপ্রভাবেই সেবার দিল্লী সাম্রাজ্য মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, আলাউদ্দীনের এমন কোনও ক্ষমতা ছিল না যে দিল্লীকে শক্র কবল হইতে মুক্ত করে। ফরিস্তা বলেন, নিজামের এই আশ্চর্য্য শক্তির কথা তাৎকালিক ঐতিহাসিকগণই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

নিজাম যে কেবল শক্রকবল হইতে দিল্লীকে রক্ষা করিয়া আলাউদ্দীনকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, ঐতিহাসবেত্তা জিয়াবর্ণি তাঁহার তারিখি-ফিরোজশাহি গ্রন্থে বলেন যে, আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে যে সকল শান্তি ও সমৃদ্ধতা দেখা গিয়াছিল, সে সকলেরই নিজামউদ্দীন একমাত্র হেতু। আলাউদ্দীন নিজে অত্যন্ত হীনচরিত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজামকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিতেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহার প্রথম পুত্র খিজির খাঁ ও দ্বিতীয় পুত্র সাদিখাঁকে নিজামের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

নিজামের উপর সুলতান আলাউদ্দীনের অগাধ বিশ্বাস

(২) আজও পর্য্যন্ত এই "আমুজ দিল্লী দুরস্ত" কথাটী এতদ্দেশে 'সে দেখা যাবে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) পর্য্যটক ইবন-বতুতাই একমাত্র মহম্মদের নামে এই অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি বলেন যে, সেখ রোকনউদ্দীন নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারই মুখে তিনি এ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা জিয়াবর্ণি ইহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফরিস্তা বলেন মহম্মদের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ছিল। তিনি কোনও বিষয়ে বিপন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ নিজামের শরণাপন্ন হইতেন। একদা তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। বহুকাল যাবৎ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হন এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নিজামের নিকট আগমন করেন। নিজাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "বৎস, নিশ্চিন্ত হও, কালই তুমি শুভ সংবাদ পাইবে।" বাস্তবিকই পরদিন প্রাতঃকালে উষ্ট্রবাহী দূত আসিয়া আলাউদ্দীনকে বিজয়বার্ত্তা প্রদান করে। আলাউদ্দীন এই বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া এতদূর আনন্দিত হন যে, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং নিজামের নিকট গমন করিয়া ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা প্রণামী প্রদান করেন। এই সময় খোরাসন হইতে আগত জনৈক দরবেশ নিজামের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি দেখিয়া নিজামকে উপহাসচ্ছলে বলেন যে, ইহার মধ্যে তাহারও কিছু অংশ আছে। নিজাম অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়াই তিনি এই সমুদায় অর্থ দরবেশটিকে প্রদান করেন।

নিজামের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাবের আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান শিষ্য নসিরুদ্দীন-চিরাগ-দিল্লী বলেন, এক সময় তাঁহার প্রধান শিক্ষক কাজি-মহিউদ্দীন-কসানি অত্যন্ত পীড়িত হন। এই পীড়া ক্রমে কঠিনতর হইয়া যখন রোগী মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং নাভিশ্বাস বহিতে থাকে, এমন সময় নিজাম সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করেন। তিনি রোগীর মুখে হস্তার্পণ করিবা মাত্র রোগীর নাভিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এবং ক্রমে রোগী সুস্থ ও অতি অল্পকালের মধ্যে একেবারে রোগমুক্ত হইয়া উঠে।

ফরিস্তা বলেন, দাক্ষিণাত্যের বাহামানি রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দীন-হাসান-বাহামানি বাল্যকালে অতি গরীব ছিলেন। তিনি দিল্লীর কোনও এক ব্রাহ্মণের বাটীতে চাকরী করিয়া কোনও প্রকারে দিনপাত করিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষার্থী হইয়া নিজামের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় নিজামের সদাভাণ্ডার হইতে বহুসংখ্যক লোক ভোজনাদি সমাপন করিয়া ফিরিতেছিল। সুলতান মহম্মদ তোগলাকও এই সময় নিজামের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। নিজামউদ্দীন তাঁহার অনুচরবর্গকে বলেন, "একজন বাদশাহ চলিয়া গেল আর একজন বাদশাহ আমার দ্বারদেশে উপস্থিত; তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত এখানে লইয়া আইস।" একজন বাদশাহ বলিতে মোহম্মদ তোগলক; কিন্তু আর একজন বাদশাহ যে কে, তাহা তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা দ্বারদেশে গিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোনও বাদশাহকে দেখিতে না পাইয়া, বিফল মনোরথ হইয়া, নিজামকে জানাইল যে, কোন বাদশাহই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নাই। নিজাম দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে, তোমরা গিয়া ভাল করিয়া দেখ।" অনুচরবর্গেরা উত্তর করিল, "আমরা যথাশক্তি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন বাদশাহই দ্বারদেশে নাই, মাত্র একজন গরীব লোক, বোধ হয় আহারার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।" নিজাম সহাস্যে বলিলেন, —"উনিই বাদশাহ, উহাঁকেই সমাদর করিয়া লইয়া আইস।" অতঃপর হাসানকে অতি অভ্যর্থনার সহিত নিজামের নিকট লইয়া আসা হয়। এই সময় সদাভাণ্ডারের সমুদায় আহার্য্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, নিজামের আহারের জন্য একখানি রুটী অবশিষ্ট ছিল মাত্র। নিজাম এই শেষ রুটীখানি অঙ্গুলির উপর রাখিয়া হাসানকে দেন এবং বলেন, "এই তোমার রাজছত্র, যে রাজছত্র তুমি দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত হইবে।" এই ঘটনার পর হইতে হাসানের দারিদ্র্য দুঃখ দূর হয়। তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ক্রমে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন এবং কালে তথাকার অধিপতি হন। বিদার নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

ইবনবতুতা বলেন, নিজাম-উদ্দীনের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশে মোহ হইত। এক দিন মোহ উপস্থিত হইলে, ঘটনাক্রমে গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ তোগলাক, নিজামের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নিজাম তদবস্থাতেই বলিয়া উঠেন, "আমরা মহম্মদকে সিংহাসন অর্পণ করিলাম।"

শামস্-সিরাজ-আফিফ তাঁহার তারিখি-ফিরোজশাহি গ্রন্থে বলেন, ফিরোজশাহ তোগলক বাল্যকালে একদিন নিজামের আশ্রমে গমন করেন। নিজাম সাদরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, তোমার নাম কি?" ফিরোজ সবিনয়ে

উত্তর করেন, "অধীনের নাম কমাল-উদ্দীন (৪)।" তচ্ছ্রবণে নিজাম ফিরোজকে আশীর্ব্বাদ করেন; "বাবা, তোমার বয়স কমাল (অর্থাৎ পূর্ণ) হউক, তোমার ধন দৌলত কমাল হউক আর তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতাও কমাল হউক।" বাস্তবিকই নিজামের আশীর্ব্বাদ দেববাক্যের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে ফলপ্রদ হইয়াছিল। ফিরোজ প্রায় ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া, অতি প্রতাপ ও শক্তির সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ অর্থ স্বচ্ছলতা ছিল যে, তিনি বৃহৎ বৃহৎ নগরী, সুদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী ও বহুবিধ হর্ম্যাবলী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৯৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিজামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই সময় একদিন তিনি ভৃত্য একবালকে ডাকিয়া, তাঁহার সদাভাণ্ডারের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থাদি দীন-দরিদ্রগণকে দান করিয়া দিবার জন্য আজ্ঞা করেন। একবাল প্রভুকে নিবেদন করে যে, প্রত্যহ যাহা কিছু অর্থাদি পাওয়া যায়, তাহা সেই দিনই দান সেবাদিকার্য্যে ব্যয় করা হইয়া থাকে; পর দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় না। এখন ভাণ্ডারে সামান্য কিছু শস্য সঞ্চিত আছে মাত্র। নিজাম উহাও গরীব দুঃখিগণকে দান করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। অতঃপর তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া লোক-হিতার্থে কাহাকেও দাক্ষিণাত্য, কাহাকেও বা বাঙ্গালায়, আবার কাহাকেও বা কাশ্মিরে গমন করিতে আদেশ করেন। সেখ নাসিরুদ্দীন-চিরাগ-দিল্লী তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল। ইহাঁকে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়া, নিজের গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত খির্‌কা (সার্ট), লাঠি, নমাজ পড়িবার সময় পাতিবার কম্বল, মালা, কাঠের বাটী, প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু উপহার প্রদান করেন; এবং ইহাঁকে দিল্লীতেই অবস্থান করিতে আদেশ দেন।

হিজিরী ৭২৫ শকে রবিয়সসানি মাসের ১৭ই তারিখে বুধবারে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার এই মৃত্যু তারিখ, তাঁহার সমাধি মন্দিরে আজও পর্য্যন্ত পারসী কবিতায় লিখিত আছে। কবিতাটি এইরূপ—

নিজামে দো গেতী শহে মাহুতীন
সিরাজে দো আলম শুদ বিল্যকীন
চো তারিখ ফৌতশ ব জুস্তম জে গৈব
নিদাদাদ্ হাতিফ শাহানশাহে দীন্॥

অর্থাৎ নিজাম ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই আশ্রয়, আমার ও তোমার সকলেরই গুরু; তিনি যে উভয় লোকেরই তমোহারী আলোক স্বরূপ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। আমি যখন তাঁহার মৃত্যু তারিখ অনুসন্ধান করিতে থাকি, তখন উপর হইতে আকাশবাণী হয়,—"শাহানশাহেদীন" স্বর্গের অধীশ্বর। অথবা ৭২৫ শক (৫)।

আশ্রমের যে স্থানে মহাপুরুষ দেহ ত্যাগ করেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সমাধিকালে দিল্লী অধিবাসিদিগের ত দূরের কথা, ফিরোজপুর, বাহাদুর-পুর প্রভৃতি পরিপার্শ্বস্থ নগর সমূহ হইতেও বহুজনসমাগম হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে সমাধিস্থও অতি আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত করা হইয়াছিল। কথিত আছে, সমাধিকালে তাঁহার কবরের উপর এত অধিক পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি হয় যে, পুষ্পগুলি একত্রে একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা সদৃশ আকার ধারণ করে। প্রায় মাসাবধিকাল জনসঙ্ঘের গতিবিধি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে; এবং এই একমাস যাবৎ এখানে অতি আড়ম্বরের সহিত এক মেলার অধিবেশন হয়। আজ পর্য্যন্ত নিজামের মৃত্যু তারিখ ১৭ই রবিয়সসানি দিনে সমাধি মন্দিরে উৎসব ও মেলার অনুষ্ঠান হইয়া, সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন হইয়া থাকে।

ইহাঁর সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু উহা মূল্যবান প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর কবর স্তম্ভটি প্রথমে অতি সামান্যভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে সুলতান ফিরোজশাহ তোগলাক ইহাতে চন্দন কাষ্ঠের দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া এবং ইহার গম্বুজের উপরকার থাঁজগুলি সোনা দিয়া

(৪) সুলতান ফিরোজশাহ তোগলাকের বাল্য নাম কমাল-উদ্দীন ছিল। কমাল শব্দের অর্থ পূর্ণ।

(৫) 'শাহানশাহেদীন' শব্দটি দ্ব্যর্থ বোধক। এক অর্থ স্বর্গের অধীশ্বর, অপর অর্থ ৭২৫ শক। পারসী সাহিত্যে অনেক সময় এইরূপে ঐতিহাসিক তারিখ স্থির করিবার জন্য প্রত্যেক বর্ণেরই একটী সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আছে। শীন, হে, নুন, শীন, আলিফ, দাল, য়ে, এবং নুন এইকয়টী বর্ণ যোগে 'শাহানশাহেদীন' শব্দ উৎপন্ন। শীন বর্ণের সংখ্যা ৩০০, হে—৫, নুন—৫০, শীন—৩০০, আলিফ—১, হে—৫, দাল—৪, য়ে—১০ এবং নুন—৫০ ইহাদের যোগ ফল ৭২৫।

ঢাকিয়া দিয়া, ইহার কিছু সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রয়াস পান। হিজিরী ৯৭০ শকে (১৫৬২ খৃঃ অঃ) মোগল সম্রাট আক্বরের রাজত্বকালে, সৈয়দ ফরদু খাঁ নামক এক ব্যক্তি, এই গৃহে লালপাথরের থাম, উপরের ডুম এবং ইহার চতুর্দ্দিকে মার্ব্বেল পাথরের জাল্‌তি দেওয়া প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই ডুমেব একপার্শ্বে পূর্ব্বকথিত নিজামের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধীয় "শাহানশাহেদীন" অত্র কবিতাটি খোদিত করা আছে। ইহার প্রায় ৪৭ বৎসর পরে, জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে, (হিজিরী ১০১৭ শক, খৃঃ অঃ ১৬০৮), ফবেদু খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি, ডুমের মধ্যে আসল ঝিনুকের কাজ করিয়া দিয়া কবর-স্তম্ভের শোভা বর্দ্ধন করেন। হিজিরী ১০৬৩ শকে (১৬৫৩ খৃঃ অঃ) সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে খলিল-উল্লা খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই কবর স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, বারাণ্ডার একপার্শ্বে তাঁহার নাম ও তারিখ খোদিত করিয়া রাখেন। হিজিরী ১২২৩ শকে (১৮০৮ খৃঃ অঃ) নবাব আমেদ বক্‌স খাঁ বাহাদুর নামক ফিরোজপুরের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সৈয়দ ফরদু খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লালপাথরের থামগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া উহাতে মূল্যবান সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের থাম প্রস্তুত করাইয়া দেন। হিজিরী ১২৩৬ শকে (১৮২৩ খ্রীঃ ফিরোজা উল্লাখাঁ নামক একব্যক্তি সমাধি মন্দিরের ছাত প্রস্তুত করিয়া উহাতে সোণার কাজ করিয়া দেন এবং হিজিরী ১২৩৯ শকে (১৮২৩ খ্রীঃ অঃ), দ্বিতীয় আকবরের রাজত্বকালে উহার গম্বুজটি মার্ব্বেল পাথর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া, উহাতে একটি সোণার চুড়া বসাইয়া রাখেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাধি মন্দিরের বিভিন্ন স্থান নির্ম্মিত হওয়ায়, কালক্রমে উহা স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় এবং কিছু কিছু বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীর কমিশনর Mr. R. Clerke B. C. S. (মিঃ আর ক্লার্ক বি, সি, এস) মহোদয় উহার সংস্কার সাধন করেন।

এই সমাধিভবনে নিজামউদ্দীনের কবরস্তম্ভ ব্যতীত, আরও এমন অনেকানেক হর্ম্ম্যাবলী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবর স্তম্ভ আছে, যাহাদের প্রায় সকলগুলিই প্রাচীন ও মহাত্মা নিজামউদ্দীনের স্মৃতিজড়িত। সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না

সমাধিভবনে প্রবেশ করিতে হইলে তিনটি দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম দ্বার দুইটি সুলতান ফিরোজাশাহ তোগলক নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন (১৩৭৮ খৃঃ অঃ)। নির্ম্মাতার নাম ও তারিখ প্রথম দ্বারেই খোদিত আছে। দ্বারের বামদিকে পাঠান ধরণের একটি পুরাতন কবরস্তম্ভ, এবং দক্ষিণ দিকে একটি দ্বিতল মসজিদ। এরূপ দ্বিতল মসজিদ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কবরস্তম্ভ ও মসজিদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ জানিতে পারা যায় না বটে, তবে দ্বিতল মসজিদটি যে নিজামের সময়েও বিদ্যমান ছিল, এবং নিজাম যে এখানে নমাজ পাঠ করিতেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে একটি সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের বেদী ও তাহার পার্শ্বে লাল পাথরের থামের উপর একটা গম্বুজের মত দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ইহা সম্রাট সাজাহানের প্রধান নর্ত্তকী বাই-কোহাল নদর কবর স্তম্ভ।

প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই একটি 'বাউলি' অর্থাৎ পুষ্করিণী। ইহার জল নীলবর্ণ; বাজিকরেরা অতি উচ্চস্থান হইতে ইহার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া নানারূপ কৌতুক দেখাইয়া থাকে। এই পুষ্করিণী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নিজাম এই পুষ্করিণী খনন কার্য্যে যে সকল মজুর নিয়োগ করেন, সুলতান গিয়াসউদ্দীন তোগলক সেই সকল মজুরগণকে তাঁহার নব অনুষ্ঠিত তোগলকাবাদ সহর নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দিতে বাধ্য করেন। নিজাম অগত্যা রাত্রে আলো জালিয়া পুষ্করিণী খনন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তোগলক দেখিলেন যে, নিজামের পুষ্করিণীতে রাত্রে কার্য্য করিবার পর, দিবাভাগে মজুরগণের আর কার্য্যে সেরূপ উৎসাহ থাকে না। সুতরাং তিনি রাজ্য মধ্যে নিজামকে কেহ আলো জালিবার তৈল বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। নিজাম কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না; তিনি তৈলের পরিবর্ত্তে জলের দ্বারা আলো জালিয়া পুষ্করিণী খনন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। (৬)

(৬) এই প্রবাদ মধ্যে কিছু যে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্করিণীর একপার্শ্বে উহার খননের তারিখ লিখিত আছে হিজিরী ৭১৩ শক; কিন্তু গিয়াসউদ্দীন তোগলক হিজিরী ৭২১ হইতে ৭২৫ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকে জলমধ্যে একটি খিলান দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই খিলানের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ পথে নিজামের নির্জ্জন উপাসনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত ছিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণে সমাধিভবনের তৃতীয় দ্বার। ইহা ফিরোজাশাহ তোগলকের সমসাময়িক প্রাচীন না হইলেও নিতান্ত আধুনিক নহে। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া সমাধি মন্দিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে হয়। দ্বারের দক্ষিণে (প্রাঙ্গনের কোণে) একটি বৃহৎ সভা-গৃহ। ইহা সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহের পার্শ্বে (সমাধি মন্দিরের পশ্চিমে) একটি বৃহৎ মস্‌জিদ। ইহা সাধারণে জামাতখাঁ অথবা খিজিরী মস্‌জিদ নামে পরিচিত। মস্‌জিদটি পাঠানধরণে একটিমাত্র গম্বুজে নির্ম্মিত। ইহার বৃহৎ দরজার উপরকার আঁকাবাঁকা খিলানটি বাস্তবিকই তাৎকালিক সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে। কথিত আছে, নিজামের প্রিয় শিষ্য আলাউদ্দীন খিল্‌জির পুত্র খিজির খাঁ গুরুর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার আশ্রমের পার্শ্বে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই ইহা খিজিরী মস্‌জিদ নামে পরিচিত হইয়াছিল। খিজির খাঁর পক্ষে এরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি আলা উদ্দীনের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে মালিক কাফুরের চক্রান্তে গোয়া-লিয়রের দুর্গে বন্দী হন এবং আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর বৎসর কালের মধ্যেই কুতব-উদ্দীন খিল্‌জির আজ্ঞায় সাদি নামক দুরাত্মা কর্ত্তৃক নিহত হন। মস্‌জিদটীর মধ্যদেশ কতকটা আলাউদ্দীনের 'আলাই-দরজার' অনুরূপ। এ কারণ মনে হয়, উহা সুলতান আলাউদ্দীন কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছিল; নির্ম্মাণকালে খিজির খাঁ নিজামের শিষ্য শ্রেণী-ভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়, কোনও কারণে উহা খিজিরী-মস্‌জিদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই সমাধিভবন মুসলমানদিগের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। এখানে সমাহিত হইতে পাওয়া অনেক পুণ্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ভবনের ইতস্ততঃ যে সকল ভাগ্যপুরুষের সমাধিস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের প্রায় সকলগুলিই, হয় রাজবংশ সম্ভূত, না হয় নিজামের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত। নিজামের সমাধি মন্দিরের দক্ষিণ (খিজিরী-মস্‌জিদের পার্শ্বে), উচ্চ মার্ব্বেল পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত পর পর তিনটি সমাধি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটিতে সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম ও তাহার দুই পার্শ্বে দুই জন মোগল সম্রাটের পুত্র ও কন্যা সমাহিত (৬)। দ্বিতীয়টিতে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহার কবর স্তম্ভ। এই মহম্মদ শাহার সময়ে নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। নাদিরশাহের সহিত মহম্মদশাহের যে কন্যা বিবাহিত হন, সেই কন্যা ও তাঁহার পুত্র মহম্মদশাহের দুই পার্শ্বে সমাহিত আছেন। এই সমাধি মন্দিরের উভয় পার্শ্বের দ্বার পত্রপুষ্পাকৃতিতে খোদিত সুন্দর কারুকার্য্যময় মূল্যবান মার্ব্বেল পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মার্ব্বেল পাথরের জাল্‌তি দেওয়া প্রাচীরও একটি দেখিবার জিনিষ। পার্শ্ববর্ত্তী তৃতীয় মন্দিরটি সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের পুত্র কুমার জাহাঙ্গিরের কবরস্তম্ভ।

এই সমাধি মন্দিরগুলির দক্ষিণে আর একটি ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। ফটকটি অতিক্রম করিলেই একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। কথিত আছে, নিজামউদ্দীনের এক সময় এই বেদীর উপর উপ-বেশন করিয়া শিষ্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই বেদীর পার্শ্বে নিজামের আন্তরিক বন্ধু সুবিখ্যাত পারস্য কবি আমির খুস্‌রু সমাহিত। ইঁহার সমাধি মন্দিরটি দুইটি বারান্দাদ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ইহার মধ্যে বিশেষরূপে আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। নিজামের আর একজন আন্তরিক বন্ধু ঐতিহাসিক বন্দ আমির এই প্রাঙ্গণের কোনও এক স্থানে সমাহিত আছেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, ভক্ত ও শিষ্যগণের কবরের মধ্যে কোনটি যে তাঁহার কবরস্তম্ভ তাহা সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

---

(৬) জাহানারা বেগমের কবরস্তম্ভের কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহার উপরিভাগ দুর্ব্বাদলাচ্ছন্ন, এবং ইহার উত্তরে একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

বগৈর সবজা ন পোশাদ
　　কসে মজারে মরা।
কি কব্‌রে পোশে গরীবাঁ
　　হমী গ্যাহ বস্‌ অস্ত॥

অর্থাৎ সবুজ দুর্ব্বাদল ব্যতীত আমার কবরের উপর অন্য কোনও আচ্ছা-দন দিও না, কেননা দীনজনের সমাধির উহাই উৎকৃষ্ট আবরণ।

অশ্রু

জানি না কোন্ লীলার ছলে গড়িল তোরে বিধি
এমনতর হৃদয় হরণ রূপে !
কম তোমার সকল অঙ্গ, পূত পরাণ খানি ;
এমন সুবাস নাইক বুঝি ধূপে !
কে বলে তোয় অর্থ-বিহীন আমার অশ্রুরাশি ?
তোমার বাড়া অর্থ কাহার আছে ?
বুকের থেকে পাষাণ নামে একটি ফোঁটা জলে
তাপিত হিয়া একটি কণা যাচে !
ধোয় রে অশ্রু মনের মলা, লয় রে হরে' ব্যথা
সুধায় ফেলে নিখিল বিশ্ব ছেয়ে !
সবার মাঝে, সকল কাজে পূর্ণ করে তারে
বাঁচে যে জন তাহার কৃপা পেয়ে।
হাসির আগে অশ্রু তোমার আসনখানি পাতা
জনম মৃত্যু শুধুই অশ্রু, হায় !
তোমার পাশে রয়েছে বলে' হাসির সার্থকতা
তুমিই তারে করেছ মধুময় !

তাপী জনের দুঃখ দেখে ঝরে যখন লোর
তুলনা তার কভু কি পাওয়া যায় ?
তৃণের বুকে নীহার কণা তেমন স্নিগ্ধ নহে,
নাহি সেরূপ ইন্দ্রধনুর গায়।
সতীর চোখে অভিমানের অশ্রু যখন ঝরে'
হয় সে এসে কপোলতলে থির ;
কোথায় লাগে যমুনা তীরে তাজের মঞ্জু ছবি ?
তেমন শোভা নাই রে প্রকৃতির।
হরির নামে প্রেমে পাগল গোরার বক্ষে যবে
যায় রে বয়ে মন্দাকিনীর ধারা,
স্বর্গ মর্ত্ত সোহাগ-হর্ষে হয় যে একাকার
ভুবন ভরে' জাগে প্রাণের সাড়া !
প্রেমের খণি রাধিকা-রাণী শ্যামের কথা স্মরি'
(যবে) মনের ভুলে ভাষায় জলে কলসী,
কাজল হীন সজল সেই নয়ন দুটি আ মরি !
পাষাণ কোন না উঠে প্রেমে উলসি' ?

বিনায়ক সান্যাল।

কোন্ পথে

(১৫)

গভীর রাত্রি। ঘড়ীতে বারটা বাজিল বিজলী বিছানায় ঠিয়া বসিল। শ্যামাশশীর সঙ্গে সে শুইত। বৃদ্ধা নাক াকিয়া তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। পাশের দুটি ঘরেও সব স্তব্ধ সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। বিজলী একটুকাল সিয়া থাকিয়া পা টিপিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিল। পা র থর কাঁপিতে ছিল! কোনও মতে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত াসিয়া বিজলী থমকিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন ার জল হইয়া যাইতেছিল। সর্ব্বনাশ! সে এ কি করিতেছে কাথায় যাইতেছে! না না, কাজ নাই, যা হইবে হউক্ যাইবে না। যদি সময় মত ফিরিতে না পারে! যদি এর ধ্যে কেহ জাগে! কে জানে কি হইবে! যদি আর ফিরিতেই না পারে? বিজলী থর থর কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু তিনি যে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। ঝি দরজায় অপেক্ষা করিতেছে! এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়! তবু তিনি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবেন। হয়ত কোনও দিন আবার সুখীও হইবেন। সে যাইবে বলিয়াছে, আশা দিয়াছে, এখন যদি না যায়,—হয় ত গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিবেন। না—না, যাইবে বলিয়াছে, একবার সে যাইবেই। শেষে যাই কপালে থাক, একবার তাকে যাইতেই হইবে। বেশী দেরী করিবে না,—এখনই আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু একবার যাইতেই হইবে। দৃঢ় সংকল্পে মন বাঁধিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একবার

পিছনে ফিরিয়া ঘরগুলির দিকে চাহিল। শেষে ধীর নিঃশব্দে চরণক্ষেপে নীচে নামিয়া, অতি সাবধানে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিল। ঝি যথাস্থানেই অপেক্ষা করিতে ছিল,—নিঃশব্দে আসিয়া বিজলীর হাত ধরিল। আবার বিজলীর সমস্ত দেহ থরথর কাঁপিয়া উঠিল। ঝি বহুচেষ্টাতে বিজলীকে ধরিয়া নিয়া সম্মুখের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই ঝি আসিয়া আবার দরজার কাছে বসিল। আধ ঘণ্টার উপরে চলিয়া গেল। তখন ঝি দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আবার ভিতরে গেল।

ঝি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চাপাস্বরে ডাকিল, 'নিরুবাবু! নিরুবাবু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, শীগিরি আসুন !"

"কি—কি হ'য়েছে ঝি? একটি ঘরের দরজা খুলিয়া নিরঞ্জন বাহির হইল। বিজলীও ভীত বিশুষ্ক মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঝি কহিল "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এখন উপায়! ওবাড়ীতে গোলমাল শুন্‌তে পেলাম,—আলো নিয়ে সবাই ছুটোছুটি ক'চ্চে। আর কি—সব টের পেয়েছে। এখন কি হবে?"

বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার মত হইল, নিরঞ্জন ছুটিয়া আসিয়া তাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। বিজলী একেবারে অবসন্ন হইয়া গা ছাড়িয়া নিরঞ্জনের বক্ষলগ্ন হইয়া রহিল।

"ভয় নাই! ভয় নাই বিজলী! আমি আছি, ভয় কি তোমার? কে কি ক'রবে?"

ঝি যারপরনাই ভীত ভাবে কহিল. "কে কিনা ক'রবে? যদি সন্দেহ ক'রে বাড়ীতে এসে ওঁরা ঢোকেন—বাবু আছেন, দাদাবাবুরা আছেন, একেবারে যে খুনোখুনি কাণ্ড হবে। পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

"চট্ ক'রে দেখ ত আমার গাড়ী ওই পেছনের দরজায় আছে কি না?"

ঝি ছুটিয়া গিয়া একটা জানালা খুলিয়া চাহিয়া দেখিল। আবার ছুটিয়া আসিয়া কহিল "হাঁ আছে।"

"বস তবে আর ভয় নেই। চল! বিজলী! বিজলী! আর উপায় নাই। চল, এখন ত পালাই। তারপর যা হয়, একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

বিজলীর চলৎশক্তি, বাক্‌শক্তি সবই তখন স্তব্ধ হইয়াছিল। নিরঞ্জন ঝিকে ইসারা করিল। দুইজনে অবসন্না কম্পিতা বিজলীকে ধরিয়া প্রায় টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল. বিজলী ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল নিরঞ্জন আবেগে তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট প্রেম গদগদ স্বরে কহিল "ভয় কি বিজলী! তোমার বাবা ক্ষমা না করেন, আমি আছি। আমার বুকে চিরকাল এম্‌নি ক'রে তোমায় ধ'রে রাখ্‌ব। কাঁটার খোঁচাটি তোমায় গায় কখনও লাগ্‌তে দেব না।"

(১৬)

রাত্রি প্রভাত হইল, সকলে জাগিল, কিন্তু বিজলী কোথায়? স্বর্ণময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। মহীন্দ্র বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহাও কি সম্ভব? ওই বিজলী—অতটুকু মেয়ে—তার পক্ষেও কি ইহা সম্ভব! এত বড় দুঃসাহসিক মত্ততা কি তার হইতে পারে? কিন্তু আর কি হইতে পারে? কোথায় যাইবে? কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? এতখানি সর্ব্বনেশে চাল সে চালিল—ওই টুকু মেয়ে—অত আর তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই! ওই অতটুকু মেয়ে—সেও এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে! উঃ! চক্ষু মুখ তাঁহার অগ্নিবর্ণ হইল। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে, দন্তে অধর দংশন করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভাইরা কিছুই জানিত না, বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিজলী কাহারও সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে, এমন একটা অসম্ভব কথা তাহাদের কল্পনায়ও আসিতে পারে না। তন্ন তন্ন করিয়া তাহারা সকল বাড়ী খুঁজিল। বাড়ীইবা কতটুকু কোথায় সে লুকাইয়া থাকিতে পারে? কেনই বা লুকাইবে? তবে কি হইল? কোথায় গেল সে?

বৃদ্ধা শ্যামাশশী ভয়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন! তাই ত, বিজলী কোথায় গেল? কোথায় যাইতে পারে? কোনও দৈত্যদানা আসিয়া তাহাকে উড়াইয়া নিয়া যায় নাই ত? কি সর্ব্বনাশ! বিজলী যে তাঁর সঙ্গে তারই বিছানায় শুইয়াছিল!

বেলা হইল, ঝি আসে না। সেই বা আসে না কেন? তবে কি সব সেই হারামজাদীরই কারসাজি? মহীন্দ্রবাবু

যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া ছেলেদের একজনকে ঝির খোঁজ নিতে পাঠাইলেন। ছেলে আসিয়া বলিল, ঝি কাল রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিয়া আইসে নাই।

তবে আর কি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সেই হতভাগীই মেয়েটাকে ভুলাইয়া নিয়া গিয়াছে! স্বর্ণময়ী ফুঁকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ও বুক চাপিয়া মাটীতে উবুড় হইয়া পড়িলেন। হায়, হায়! তিনিই ত তবে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! সর্ব্বনাশী তাঁকে ছলে ভুলাইয়াছিল, তার হাতেই যে তিনি বিজলীকে একেবারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। বৈকালে দুজনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাদে বেড়াইত! হায়, হায়! কেন তিনি একবার গিয়া একদিনও দেখেন নাই, ওরা কি করে, কি বলে? তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেন।

এখন কি হইবে! এ লজ্জা, এ গ্লানি, এ কলঙ্ক কি করিয়া তাঁহারা চাপিয়া রাখিবেন? হতভাগী এমন করিয়া চিরদিনের মত তাঁহাদের মুখে কালি লেপিয়া দিল! অতটুকু মেয়ে—পেটে পেটে তার এত বজ্জাতী ছিল! এমন বিষ তিনি পেটে ধরিয়া ছিলেন—বুকের রক্তে এত বড় করিয়া তুলিয়া ছিলেন! আর সেই পোড়াকপালো—তারই বা কি গতি হইবে? উঃ! এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়। হতভাগী মরিল না কেন? কত মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরে, আজ যদি কালামুখী আগুণে পুড়িয়া তাঁরই চক্ষের সামনে ছট ফট করিয়া মরিত—তাও যে তিনি সহিতে পারিতেন! এ লজ্জা, এ দুঃখ, এ গ্লানি আর নিজের রক্তমাংস—স্নেহের পুতলী—বুকের ধন—তার এই দুর্গতি কেমন করিয়া তিনি সহ্য করিবেন।

অতি আর্ত্ত স্বরে চিৎকার করিয়া তিনি কহিলেন, "ওগো দেখ! দেখ! চুপ ক'রে ঘরে ব'সে আছ? তোমরা—দেখ দেখ খুঁজে দেখ পাতা পাতা ক'রে খুঁজে দেখ! ওগো শুধু এই খবরটা আমাকে এনে দেও সে ম'রেছে;—গঙ্গায় ডুবে মরেছে, বিষ খেয়ে ম'রেছে, আগুনে পুড়ে ম'রেছে! ওগো তোমরা কি পাষাণ! এখনও চুপ ক'রে ঘরে ব'সে রয়েছ! ওগো দেখ, দেখ। এখনও হয়ত সময় আছে—এখনও হয়ত তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতে! উহুহু! ওগো এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয় গো!"

অসহনীয় উত্তেজনায় স্বর্ণময়ী বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। মহীন্দ্র বাবু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "চুপ! চুপ কর—চুপ কর—চেঁচিও না। পাড়ার লোকে শুনবে। কাউকে জানাবার দুঃখত নয়। গুমরে মর—মুখ বুজে থাকতে হবে। খুঁজব! কোথায় খুঁজব? এযে কলকাতা, মহান্ধকার মহারণ্য! এখানে লুকুলে কাউকে খুঁজে বার করা যায়?"

উন্মত্তের ন্যায় মহীন্দ্র বাবু ঘর বাহির করিতে লাগিলেন।

"ওগো আমি যে চুপ করতে পাচ্ছিনে—কিছুতেই পাচ্ছিনে। ওরে একটা বাঁশ এনে আমার বুকটা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেল্—গলায় পা দিয়ে আমায় মেরে ফেল্। আমাকে মুখে বালি পুরে দে—দম আটকে আমি মরি। ওরে দে দে —শীগ্‌গির দে! কিছু দোষ হবে না, কোনও পাপ হবে না। ওরে, এর চাইতেও পাপের ফল মানুষের কিছুও হয়? আমি পাপী—মহাপাপী—নইলে এমন পাপও পেটে ধ'রেছিলাম। উঃ! আর যে পারিনে রে—আর যে পারিনে। ও সর্ব্বনাশী, ও বিজলী তুই মরলিনে কেন? একবার দশবার বিশবার কেন মরলিনে? উহু হু হু! একটুও যদি বুঝতাম—একটুও যদি বুঝতাম! আমিই সর্ব্বনাশ করেছি! মহাপাপিনী আমিই সর্ব্বনাশ ক'রেছি। সর্ব্বনাশীকে বিশ্বাস ক'রেছিলাম। হায় হায় হায়! একটুও যদি বুঝতাম কেন বুঝলাম না! কেন বুঝলাম না! কেন—কেন—কেন বুঝলাম না!"

আবার স্বর্ণময়ী বক্ষে অতি বেগে কয়েকটা করাঘাত করিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে ছেলে দুটি হয়রান্ হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে একেবারে অবসন্ন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া স্বর্ণময়ী পড়িয়া রহিলেন।

সমস্ত দিন গেল,—গৃহ যেভাবে ছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। এক প্রাণীও জল স্পর্শ করিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ কাহারও ছিল না। ছেলেরা বাড়ীর বাহির হইল না,—মহীন্দ্রবাবুও আফিসে গেলেন না।—গৃহের মধ্যেও মুখ তুলিয়া কেহ কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। আকাশের সূর্য্য, দিনের আলো—তাও যেন এই মহাগ্লানির সাক্ষ্য হইয়া চারিদিক হইতে সকলকে

অসহনীয় পীড়া দিতেছিল। বিশ্বের সকল লজ্জা সকল মর্ম্মবেদনা যেন এই ক্ষুদ্র গৃহকেন্দ্রে ঘনীভূত হইয়া তার তীব্র জ্বালায় ঘনকালিমায় সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বেদনাদগ্ধ মন সে কালিমার আঁধার,—কিন্তু মুখ ঢাকিয়া রাখা যায়, সে আঁধার, হায়—কোথায়!

প্রথম আঘাতের অতি তীব্র বেদনায় দেহ মন যতই অবসন্ন হইয়া পড়ুক, করুণাময়ী প্রকৃতি দেবী তাঁহার কোমল হস্তে ক্রমে তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন,—চিন্তাশক্তির প্রতিকারের উদ্ভাবনী শক্তি ধীরে ধীরে তাহাতে সঞ্চার করেন। এই অতি পুরাতন ও চির নূতন সত্য এ ক্ষেত্রেও বৃথা হইল না।

দুঃখ ও লজ্জা এখনও বড় পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু পরদিন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে—অবসাদ ভাব অনেকটা লঘু হইল,—ছেলেরা উদ্যোগী হইয়া কিছু আহার সংগ্রহ করিয়াও পিতামাতাকে খাওয়াইল। তাহাতেও দেহ মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল,—মহীন্দ্র বাবু আফিসে গেলেন। আফিসের বড় সাহেবকে বেশী কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।—মহীন্দ্র বাবুর মুখ দেখিয়াই সাহেব বুঝিতে পারিলেন, তিনি অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলেন এবং এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই। আর কয়েক দিনের ছুটীর প্রার্থনা করিতেই সাহেব তাহা মঞ্জুর করিলেন।

মন অতি ক্লিষ্ট, দেহও ক্লান্ত অবসন্ন, মহীন্দ্র বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল তপ্ত ধূলিমলিন রাস্তার উপরেই তিনি উবুড় হইয়া শুইয়া পড়েন। কিন্তু তবু ট্রামে চড়িয়া বাড়ীতে না ফিরিয়া তিনি কত অলি গলির পথ ধরিয়া সহরের নানা পল্লীতে ঘুরিলেন। আশা—অতিক্ষীণ দুরাশা—যদি দৈবাৎ কোথাও তাহাদের সাক্ষাৎ বা সন্ধানের কোনও সূত্র পাওয়া যায়। শেষে দুঃসহ শ্রান্তির ক্লেশে প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া একটা বাড়ীর রকে তিনি বসিয়া পড়িলেন।—সে স্থান তাহার বাসা হইতে অনেক দূরে। অদূরে এক গলির মোড়ে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।—ঐযে! ঝি কোথায় যাইতেছে!

"হারামজাদী! সর্ব্বনাশী!"—

উন্মত্তের ন্যায় বিকট চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া মহীন্দ্র বাবু ঝিকে ধরিলেন। ঝি চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এদিক ওদিক হইতে কতকগুলি লোক ছুটিয়া আসিল। ভদ্রবেশধারী এক গুণ্ডা একটী অসহায়া স্ত্রীলোককে কু অভিপ্রায়ে পথে আক্রমণ করিয়াছে। সহজেই সকলের এই ধারণা জন্মিল। তাহারা মহীন্দ্র বাবুকে টানিয়া লইয়া আনিয়া কত গালি দিল,—কেহ কেহ প্রহারও করিল,—একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আরও কত লোক আসিল। পাহারাওয়ালা ও কয়জন আসিয়া জুটিল। লোকেরা মহীন্দ্রবাবুকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিল। তখন ঝির খোঁজ পড়িল। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। পাহারওয়ালারা অগত্যা মহীন্দ্রবাবুকে টানিয়া থানায় লইয়া গেল। অনেক লোক হৈ চৈ করিতে করিতে পিছনে পিছনে চলিল। মহীন্দ্রবাবু নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট! কি তিনি বলিবেন? কি বলিতে পারেন? যা বলিতে পারেন, সে যে আপন ঘরের বড় দুঃখময় কলঙ্কের কথা। তা কি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলা যায়? বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? দুটি চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আহা, মর্ম্মের কি গভীর স্থল বিদ্ধ হইয়া যে সেই অশ্রুর উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

তখন বেলা প্রায় পড়িয়াছে। পাশে একখানি ট্রাম থামিল, একটি ভদ্রলোক এই দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"এ কি মহীন্‌বাবু যে! ব্যাপার কি?"

মহীন্দ্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আফিসের একজন কর্ম্মচারী। তিনি কিছু বলিলেন না মুখ ফিরাইয়া নিলেন। সেই কর্ম্মচারী যোগেশবাবু—কহিলেন, "কি মহীনবাবু কি হ'য়েছে? আপনাকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে!"

"অদৃষ্ট!"

যোগেশবাবু পাহারাওয়ালাদের মুখে এবং লোকদের মুখে নানালঙ্কারে বহুলীকৃত কথাটা শুনিলেন। বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না। হাঁ, মহীন্‌বাবু! কি, ব্যাপার কি? এরা এ সব কি ব'লছে?"

"যা হ'য়েছিল, তাই ব'লছে ভাই। আমার অদৃষ্ট!"

যোগেশবাবু যারপর নাই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মহীন্দ্রবাবু আবার কহিলেন, "আমি বড় অসুস্থ—মাথার ঠিক ছিল না।"

"তাই বলুন!—ছুটী নিয়ে এলেন, বাড়ীতে না গিয়ে এখানে এসেছিলেন কেন? এ যে অনেক দূর!"

"কি জানি, মাথার ঠিক ছিল না!"

যোগেশবাবুর মনে হইল—ইহার মধ্যে বড় একটা রহস্য আছে। অথবা সত্যই কি ইহাঁর মাথার কোনও ব্যারাম হইল?

পাহারাওয়ালাদের সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "হাঁগো,"—তোমরা ভুল ক'রেছ। উনি ভাল লোক—ভদ্রলোক—ভাল কাজ করেন সরকারী আফিসে। মাথার অসুখ হ'য়েছে। ওঁকে ছেড়ে দেও, আমি বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পাহারওয়ালারা জানাইল,—তাহারা গ্রেফ্তার করিয়াছে, থানায় লইয়া যাইবে। বাবুর ইচ্ছা হইলে থানায় গিয়া দারোগার কাছে জামিন হইয়া আসামীকে মুক্ত করিয়া আনিতে পারেন।

অগত্যা যোগেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে থানায় গেলেন। দারোগাকে মহীন্দ্রবাবুর পরিচয় দিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ইঁহার কথা শুনিয়া, এবং মহীন্দ্রবাবুকেও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া দারোগা সে কথা বিশ্বাস করিলেন। এদিকে বাদিনীও উপস্থিত নাই,—মোকদ্দমা চলিতে পারে না। যোগেশবাবুর জামিনে দারোগা মহীন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়া দিলেন। কেবল পরদিন পুলিশ আদালতে একবার তাঁহাকে হাজিরা দিতে হইবে। কেলেঙ্কারীর উপরে আদালতের আবার কেলেঙ্কারী! হয়ত খবরের কাগজেও উঠিবে। কাতর স্বরে তিনি কহিলেন, "সেটা কি না চ'লে হয় না?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, আমাদের একটা রিপোর্ট যে ক'ত্তেই হবে।"

মহীন্দ্রবাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হায়, কত বিড়ম্বনাই যে তাঁহার অদৃষ্টে আছে।

যোগেশবাবু একখানি গাড়ী করিয়া মহীন্দ্রবাবুকে লইয়া তাঁহার বাসার দিকে যাত্রা করিলেন। হাতে মাথা রাখিয়া নীরবে নতমুখে মহীন্দ্রবাবু বসিয়া রহিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে যে কত বিপদ—কত লাঞ্ছনা—প্রথম দিনেই তাহার কিছু নমুনা দেখিয়া তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাসায় পৌঁছিয়া কিছু সুস্থ হইলে ছেলেরা কহিল, "আপনি আর বেরোবেন না বাবা। কোথায় ঝিকে দেখেছিলেন বলুন, আমরা পাতা পাতা ক'রে খুঁজব।"

"না বাবা, আর কাজ নেই, আবার কোথায় কোন্ বিপদে পড়্বি! যা হ'বার তা ত হ'য়েছে। তোদের আবার না হারাই। আর কোথায় খুঁজবি। যদি সত্যিই কাছে থাকে; আজই আর কোথাও পালিয়ে যাবে। গেছে —যাক্! কপালে তার বড় দুর্গতি আছে, নইলে এ বুদ্ধি কেন হবে?

"তবু চুপ ক'রে আমরা থাক্তে পারি? এখনও যদি ফিরিয়ে আন্তে পারি—"

"কি হবে? কোথায় তাকে রাখ্ব? কলঙ্ক কি দিয়ে চাপা দেব? আর আজ যা রট্লে, আফিসে একটা আন্দোলন হবে। পুলিস আদালতে হাজিরে দিতে হবে; হয়ত খবরের কাগজে উঠ্বে। লোকে সন্ধান নেবে। সব হয় ত প্রকাশ হ'য়ে পড়বে।'

"তাই বলে কি তাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া যায়? তা কি পার্বেন বাবা?"

মহীন্দ্রবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন,—কহিলেন, "না তাও কি পারি? যদি খোঁজ পাই তা'কে নিয়ে আসব। লোকে নিন্দে ক'রবে,—দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। যা কপালে থাকে হবে। তোরা মানুষ হ'য়ে সুখে থাকিস। আমরা তাকে নিয়ে দূরে কোথায় লুকিয়ে থাকব। কেউ খোঁজ নিলে ব'লব—কি ব'লব? ও বিধবা কেউ নেই।"

মহীন্দ্রবাবু শুইয়াছিলেন। বলিতে বলিতে চক্ষু বুজিলেন। ছেলেরা তখন আর কিছু বলিল না। স্বর্ণময়ীও নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

(১৭)

রাত দিনই কেবল কাঁদবে—আর ঘ্যান্ প্যান্ ক'রবে। কাহাতক আর এ সব ভাল লাগে বল ত।"

৭।৮ দিন চলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দ্বিতল ছোট একটি সুন্দর বাড়ী, বেশ সুসজ্জিত একটি কক্ষে সুদৃশ্য পালঙ্কের উপরে বিস্তৃত সুপরিপাটি সুকোমল শয্যা, পর পর ২।৩টি বালিসের উপরে ঈষৎ হেলিয়া নিরঞ্জন গড়গড়ার নলে ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। চক্ষু দুইটি মদিরাঘোরে তখনও কিছু আরক্ত, মুখে

বিরক্তির ভাব, ললাট ভ্রূকুটিকুটিল। বিজলী নীচে এক-ধারে ছুইটি হাঁটুর উপরে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। রুক্ষ চুলগুলি এলাইয়া পিঠ ও দুই বাহু ভরিয়া লুঠিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে চাপা রোদনধ্বনি ব্যক্ত হইতেছে।

নিরঞ্জনের কথায় বিজলী কোনও উত্তর করিল না, তেমনই বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরঞ্জন আবার কহিল, "আচ্ছা, কেন এ রকম জ্বালাতন ক'চ্চ বলত! আমি কি তোমাকে কিছু দুঃখে রেখেছি!"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না, আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। দুঃখ! হায়, বিজলী যে অন্তরে বাহিরে আজ অসহ-নীয় আগুনে দগ্ধ হইতেছে। ইহার বেশী দুঃখ আর কি হইতে পারে? তাই সে যেন এই কথায় আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের ভ্রূকুটি কুটিলতর হইল। গড়গড়ার নলে জোরে আরও গোটাকতক টান দিয়া ঘনধারে ধূম্রকুণ্ডলী উদ্গীরণ করিয়া কহিল, "দেখ, দুজনে মিলে বেশ সুখে থাক্‌ব এই মনে করেছিলাম। তুমিও যাতে বেশ আরামে আর সুখে থাকতে পার, তারও ক্রুটি কিছু কচ্চিনে। কিন্তু তবু যদি কেবলই ঘ্যানঘ্যানি প্যান্‌প্যানি ক'রে এই রকম দেক ক'রে তোল আমাকে তাহ'লে বল্‌ছি আমি চ'লে যাব আর আসব না—কোনও খবরদারী তোমার ক'রব না। তখন কি হ'বে, কোথায় দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখছ না?"

বিজলী যেন একটু ভয় পাইল। অতি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে মলিন শীর্ণ মুখখানি একবার তুলিয়া নিরঞ্জনের দিকে চাহিল। কিন্তু তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া নিল।

নিরঞ্জন কহিল, "আমার কথা তবে শুন্‌বে না?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বিজলী উত্তর করিল, "কি বল।"

"তুমি কি চাও বল দিকি?"

"কি আর চাইব, কিছুই চাই না।"

"তবে কেবলই কাঁদ কেন? খাওনা, দাওনা, স্নান কর না, কাপড় চোপড় ছাড় না, চেহারা কি হ'য়ে গেছে, আরসীতে একবার দেখেছ? দুটো কথা পর্য্যন্ত এখন আর বলনা, কত আর এসব পাগলামো ভাল লাগে বল ত?"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। কি উত্তর দিবে?

নিরঞ্জন কহিল, "এই রকমই যদি করবে, নিজে দুঃখ পাবে আর আমাকে জ্বালাবে, তবে এসেছিলে কেন?"

বিজলী ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "আমি কি এসেছিলাম? আমি কি আস্‌তে চেয়েছিলাম? কেন ভুলিয়ে আমাকে নিয়ে এলে? আমার যে কিছুই ভাল লাগে না! আমি কি করব? কি কল্লাম! কি কল্লাম! আমার মা আমার বাবা, আমার দাদারা, আমার ছোট ভাইবোনরা কেন তাদের ফেলে এলাম। ওগো, কেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এলে, একটিবার তাদের কাছে যেতে পাল্লে যে আমি বাঁচতাম!"

নিরঞ্জন চাপা বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "তা বেশ ইচ্ছে হয়, তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে দেও না? তিনি এসে তোমায় নিয়ে যাবেন।"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তিনি কি আসবেন! আর কি আমায় নিয়ে যাবেন? আমি যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আমার জাত গেছে। কোন মুখে তাঁকে আর চিঠি লিখব? কি ক'রে এ মুখ আর তাঁকে দেখাব? তিনি যে আমার মুখ আর দেখবেন না।"

"তা যদি বোঝ, তবে আর ওকথা ভেবে কেন মন অত খারাপ ক'চ্চো? যখন তাঁদের ছেড়েই এসেছ, ওসব ভেবে আর ফল কিছুই নেই। এখন আমার সঙ্গেই মিলে মিশে যাতে সুখে থাকতে পার, বুদ্ধি থাকে ত তাই কর।"

সহসা নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া বিজলী কহিল "একটা কাজ করবে? বড় সুখী হব। একটি কথা আমার রাখবে?"

"কি?"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিজলী মাথা নীচু করিল। কিছু বলিল না। নিরঞ্জন কহিল, "কি বল না।"

বিজলী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া ফেলিল—"তাঁরা কেমন আছেন, কি ক'চ্চেন, বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে। নিজে যদি না পার, কাউকে পাঠিয়ে আমায় তাদের খবর এনে দিতে পারবে? ফাঁকি দিও না, সত্যি কথা এসে বলো, তোমার পায়ে কেনা হ'য়ে থাক্‌ব।"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া কহিল, "তাতে কি লাভ হবে?"

বিজলী আবার ফুঁকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দুটি চক্ষে আবার অশ্রুধারা বহিল, কহিল,—"লাভ! লাভ আর কি?

তবু জান্‌তে বড় ইচ্ছে ক'রে। সেদিন সকালে উঠে আমায় না দেখে—" বিজলী আর বলিতে পারিল না, আকুল উচ্ছ্বাসে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"ভাল আপদে প'ড়েছি যা হ'ক! দেখ, কেবলই যদি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদবে, তাহ'লে সত্যি বলছি এক্ষুণি বেরিয়ে যাব, আর আসব না।"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এলে? আমি যে আর সইতে পাচ্চি না। মা বাবা, দাদারা—ওগো আমি যে তাঁদের কথা মনেও ক'ত্তে পাচ্চিনে! বড় দাগা তাঁদের দিয়েছি! কি হবে! কি করব! বাবা দাদারা সবাই যে পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছেন। মা যে মাটীতে প'ড়ে কত কাঁদছে। ছি ছি ছি! কি কল্লাম! কি কল্লাম! আর কি তাঁদের কাছে ফিরে যেতে পারবো না?"

"না—তা আর পারবে না। এখন আমি ছাড়া আর কোনও গতি তোমার নেই। সেইটে বুঝে যদি চ'লতে পার ত ভাল। নইলে, যা খুসী কর,—আমি এ জ্বালাতন সইতে পারব না ব'লছি।"

"বিয়ে ক'রবে ব'লে ছিলে, তাও যদি ক'ত্তে—"

নিরঞ্জন একটু হাসিল,—কহিল, "বিয়ে—ধর না হ'য়েই গেছে। কেবল কি মন্তর প'ড়লেই বিয়ে হয়?"

ছি ছি ছি!—ইহাও কি বিবাহ? ঘৃণায় লজ্জায় বিজলী ত মরিয়াই ছিল। এই কথায়—এই বিদ্রূপে সর্ব্বাঙ্গে যেন আর বিষের ছিটা পড়িল। এই অবস্থার সকল গ্লানি তার সম্পূর্ণ কুৎসিৎ বিভৎস রূপ ধরিয়া জাগ্রত জ্বলন্ত হইয়া তার মন ভরিয়া উঠিল।

বুক ভরিয়া অসহ্য একটা কালো আগুনের জ্বালা হা হা করিয়া জ্বলিল। তার ইচ্ছা হইল, সমস্ত দেহ সে নখে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেয়!

ফেলিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া নিরঞ্জন বার বার ভয় দেখাইতেছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজলীকে এখনই ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা যে তার হইয়াছিল, তা নয়। কারণ, দুইদিনও সে বিজলীকে লইয়া সুখে থাকিতে পারে নাই—তার লালসা মিটে নাই। তবে বিজলীর ব্যবহারে মনে মনে সে বড় ত্যক্তবিরক্ত বোধ করিতেছিল।—বড় রাগও মধ্যে মধ্যে হইত, ভাবিত, দূর হ'কগে ছাই! এই হতভাগীর ঘ্যানঘেনি প্যানপেনিতে এত জ্বালাতন হই কেন? হাঁ, বিজলী খাসা মেয়ে! তা—চোকে ধ'রেছিল ব'লে না? ওর মত মেয়ে ঢের আরও পাওয়া যাবে। ওর চাইতে অনেক ভাল মেয়েও কত আছে। রাগ হইত, এই রকমও মনে হইত, তবু আবার মনটা নরম হইয়া ফিরিত,—একেবারে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইত না। তখনও নিরঞ্জন বড় ত্যক্ত বোধ করিতেছিল, রাগও কিছু হইয়াছিল। আবার ইহাও ভাবিয়াছিল, ভয় দেখাইলে বিজলী যদি কিছু নরম হয়। তাই সে ধমকাইয়া বলিতেছিল, সে চলিয়া যাইবে, আর আসিবে না, বিজলীর কোনও খোঁজ খবর আর নিবে না। কিন্তু দেখিল, তাহাতে তেমন কিছু ফল হইতেছে না। তখন তার মনে হইল, ভাল, মিষ্ট কথায় আদর করিয়াই দেখা যাউক না, বিজলীর মনটা একটু শান্ত হয় কিনা। বিজলীর জন্য মনে মনে একটু দুঃখও যে তার না হইতেছিল, তা নয়। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বিজলীর কাছে গিয়া বসিল, আদর করিয়া বিজলীর পিঠে হাত রাখিয়া আর একহাতে তার হাত ধরিয়া কোমল গদগদ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল,—"বিজলী! বিজলী!—

দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির উত্তেজনায় বিজলী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া একদিকে সরিয়া গেল, কহিল, "যাও—যাও! সরে যাও! আমার কাছে এসো না—আমার গায় হাত দিও না!"

"বিজলী! ছি! অমন রাগ ক'ত্তে আছে?" নিরঞ্জন উঠিয়া আবার হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল।—বোধ হয় ভাবিয়াছিল, মানভঞ্জনের পালাই একবার অভিনয় করিয়া দেখিবে। বিজলী দ্রুত আর একদিকে সরিয়া গেল। অগ্নিমুখে অগ্নি দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া কহিল, "যাও—যাও! সরে যাও ব'লছি। কাছে এসো না, আমার গায় হাত দিও না। কেন—কেন—আর আসছ! কে তুমি আমার? যাও—যাও—সরে যাও! দূরে থাক, কাছে এসনা! ভাল হবে না, তাহ'লে!"

"আমি তোমার কে! আঁ! বিজলী, সত্যিই মনে মনে এত বিরক্ত হ'য়েছ আমার উপর? এত ভালবাসা, দুদিনেই ভুলে গেলে?"

"ভালবাসা! ছি—ছি—ছি—! ভালবাসা! এই কি ভালবাসা! ছি—ছি—ছি! ভালই যদি বাস্‌তে তবে কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ে আমি—আমায় ঘরের বার ক'রে নিয়ে আস্‌তে? আমার যে আর কোনও গতিই নেই!"

"কেন বিজলী, আমি আছি। মনটা স্থির কর—আমার বুকে চিরকাল যে নিশ্চয় সুখে থ'কৃতে পার্‌বে।"

"তোমার—ছি—ছি—ছি—? তোমার কাছে! ভয় দেখাচ্ছিলে চ'লে যাবে, আর আস্‌বে না। যাও, এক্ষুণি যাও—এসো না।"

"বটে! কোথায় তুমি থাক্‌বে, কোথায় যাবে?"

"রাস্তায় প'ড়ে থাকব।—রাস্তায় প'ড়ে মরব। তোমার আশ্রয় আমি চাইনে। যাও—এক্ষুণি যাও! আর এসো না! উঃ! তোমার দিকে চাইলে আমার গা জ্বলে ওঠে। তোমাকে মনে হ'লেও আমার মন আগুন হ'য়ে যায়। কদিন কিছু বলিনি—মনের বিষ মনেই চেপে রেখেছি। আজ ব'ল্‌ছি—তুমি বিষ—বিষ—বিষ! বিষের মত তোমায় দেখি।—তোমার দিকে চাইলে—তুমি কাছে এলে—তুমি গায় হাতদিলে—সারা গায়ে আমার বিষ ছড়িয়ে দেয়!"

নিরঞ্জন কহিল, "বিজলী, তোমার মাথার ঠিক নেই এখন। একটু ঠাণ্ডা হও, ভেবে দেখ। সত্যি যদি অমন আগুণ হ'য়েই থাক, কাজেই আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু তুমি বুঝতে পার্‌ছ না, আমি ছেড়ে গেলে তোমার কি দুর্গতি হবে। রাস্তায় পড়ে থাকবে—রাস্তায় পড়ে ম'র্‌বে—ও সব মুখে বল্লেই হয় না। অনেক শেয়াল কুকুর কাক শকুন আছে—টেনে হিঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে তোমায় নাস্তানাবুদ ক'র্‌বে। পৃথিবীর খবর ত রাখ না কিছু। তখন মনে ক'র্‌বে, আমি হেলা তাচ্ছিল্য ক'র্লেও আমি আমার এই আশ্রয়—যাকে আজ নরক মনে ক'চ্ছ—তাও তোমার স্বর্গ হ'ত।"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিল, তার পা দুটি থর থর কাঁপিতেছে। ভাবিল, বিজলী তার ভুল বুঝিতেছে, হয় ত বা এই সব কঠোর উক্তির জন্য মনে মনে কিছু পরিতপ্তও হইতেছে। এইবার তবে মানভঞ্জন পালার শেষদৃশ্যের চরম অভিনয় করিলেই সব গোল হয়ত বা চুকিয়া যাইবে। সহসা সে বিজলীর পদতলে পতিত হইয়া গদগদ স্বরে অনুনয় আরম্ভ করিল।

"কি! আবার! কি ভেবেছ আমাকে? দূর হও!"

বিজলী তার মুখে পদাঘাত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

"কি! আমায় লাথি মাল্লে? মুখে আমার পা দিয়ে লাথি মাল্লে?—বিজলী! এত বড় দুঃসাহস কোনও মেয়ে মানুষের আজ পর্য্যন্ত হয়নি তা জান?"

নিরঞ্জন রুখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী কহিল, "না জানি না,—জানতেও চাই না। আমি মেরেছি—বেশ ক'রেছি—খুব ক'রেছি! আবার যদি এস, আবার মারব।"

নিরঞ্জনের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল,—কহিল, "কি, আমার বাড়ীতে থেকে আমার এই অপমান। হারামজাদী! এক্ষুণি আমার বাড়ীর থেকে বেরো। দেখি, তোর কোন্ বাবা এসে তোকে রক্ষে করে?"

ক্রোধভরে নিরঞ্জন বিজলীর দিকে অগ্রসর হইল। বিজলী কয়েক পা পশ্চাতে সরিয়া দৃপ্তরোষে মুখ তুলিয়া কহিল, "সাবধান! গায়ে হাত তুলোনা বল্‌ছি। প্রাণের মমতা আমার কিছু নেই, তোমার হয়ত আছে। তাই বল্‌ছি সাবধান!"

নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল। বিজলী অবিলম্বে কক্ষান্তরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল। কঠোর ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরঞ্জন বাহিরে চলিয়া গেল। সিঁড়ির কাছে ঝির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তার সঙ্গে আস্তে আস্তে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া নিরঞ্জন চলিয়া গেল।

(১৮)

গভীর রাত্রি, কলিকাতার রাস্তাও প্রায় নিঝুম হইয়াছে। অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর হয়ত কোনও এক পথিকের খট্‌খট্ জুতার শব্দ আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দূরে কোথাও একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছে। ক্বচিৎ কখনও কারও মোটর তীব্র পোঁ তুলিয়া ঘস্ ঘস্ শব্দে ছুটিয়া যাইতেছে। ইহার অধিক নিস্তব্ধতা সারা রাত্রিতেও কলিকাতার কোথাও বড় হয় না।

সেই দুপুরের পর হইতেই বিজলী সেই ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়াই পড়িয়াছিল। ঝি কয়বার আসিয়া ধাক্কা দিয়াছে, ডাকিয়াছে, কিন্তু সাড়া শব্দ কিছু পায় নাই। গভীর এই নিস্তব্ধ নিশায় বিজলী তার ভূমিশয্যা হইতে উঠিল। ঘরের একটি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। তার মনে পড়িল—সেইদিনকার সেই কালরাত্রি—এমনই গভীর নিস্তব্ধ,—সেই রাত্রি যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সে ত সবে এই আটদিনের কথা,—আজ বৃহস্পতিবার গত বৃহস্পতিবারের কথা! তার সেই ঘর সেই তার পিতা মাতা, ভাই বোন্ সব—কোনও দুঃখ ত তার ছিল না। আটদিন মাত্র আগে এই পৃথিবীতে সব তার ছিল, কিন্তু আজ! কি কুক্ষণেই সে ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল, কি ভুলই সে বুঝিয়াছিল,—সেই সুখের ঘরের দ্বার চিরদিনের তরে তার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়াছে! তার সেই স্নেহময় পিতা মাতা—আর ত সে তাদের কোলে যাইবে না!—বড় স্নেহের তার ছোট সেই ভাই বোনগুলি আর ত সে এ জীবনে কখনও তাদের কোলে তুলিয়া নিতে পারিবে না। আর ত সে তাঁদের চক্ষেও কখন দেখিবে না। দৈবাৎ কখনও দেখা হইলেও যে তাকে মুখ ঢাকিয়া সরিয়া যাইতে হইবে। উঃ! কি পাপ সে করিয়াছিল! কোন রুষ্ট দেবতা তাকে এমন অভিশাপ দিলেন! কেন তার এমন কুমতি হইয়াছিল, কেন সে ঘরের বাহির হইয়াছিল? কতক্ষণ দাঁড়াইয়া বিজলী কাঁদিল। সমস্ত হৃদয় যেন তার দারুণ তাপে দ্রব হইয়া তপ্ত অশ্রুধারায় চক্ষু ফুটিয়া নির্গত হইতে লাগিল।

সেই একদিন সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, আর—আজ আবার সে ঘর ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সেই ঘর আর এই ঘর! এও কি ঘর?—এ যে নরক! দারুণ জ্বালাময় নরক! বাহির হইতে পারিলে যে সে বাঁচে।

কিন্তু কোথায় সে যাইবে? এ জগৎ সংসারে তার মত অভাগীর স্থান কোথায় আছে? কে তাহাকে দয়া করিবে? কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? দুঃখের কথা যদি কাহাকেও বলে, সে যে দূরদূর করিয়া তাকে তাড়াইয়া দিবে। কোথায় সে যাইবে, কিন্তু তবু ত তাকে যাইতেই হইবে। নিরঞ্জনও তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আর না দিলেই বা কি? সে কি আর তিলার্দ্ধকাল এখানে থাকিতে পারে। ছি—ছি—ছি! ওই নিরঞ্জন—তার দেহস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শও যে সে আর সহ্য করিতে পারে না—সর্ব্বাঙ্গে তার বিষ ছড়াইয়া দেয়। সে তাড়াইয়া দিয়াছে, হাজার আদর কেন করুক না—তবু কি আর সে তার বাড়ীতে তার কাছে থাকিতে পারে? সে বিবাহ করিবে বলিয়াছিল—ফাঁকি দিয়াছিল। যদি আজ সত্যই আসিয়া বলে, এস বিজলী এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, এস তোমাকে বিবাহ করিব। তবু—তবু কি সে তাহাকে আর বিবাহ করিতে পারে? বিবাহে যে বর হয়, নারীর জীবনে সে নাকি দেবতা। কিন্তু ওই নিরঞ্জন—ছি—ছি—ছি! কি সে—বিষ—বিষ—বিষ! নরকের জ্বালাময় বিষ! জোর করিয়া টানিয়া নিয়া বিবাহ করিলেও যে সে তার কাছে থাকিতে পারে না, তার ঘর ছাড়িয়াই তাকে পলাইয়া যাইতে হয়।

না, আর এখানে নিরঞ্জনের আশ্রয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে কোনওরূপ সংশ্রবে সে থাকিতে পারে না। গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ নিঝুম ওই পথ। এই রাত্রিতে ওই পথেই সে বাহির হইবে। তার পর, তার পর—যা তার কপালে থাকে হইবে। অদৃষ্ট তার মন্দ—বড়ই মন্দ। কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী মন্দ আর কি তার হইতে পারে? না হয়, গঙ্গায় ডুবিয়া সে মরিবে। একদিন ত সে ভাবিয়াছিল মরিবে, সেই বা কদিনের কথা। হায়, কেন সে তখন মরে নাই? তবু ত নিজের ঘরে বাপ মার কোলে ভাই বোন্‌দের দিকে চাহিয়া তাদের দেখিতে দেখিতে সে মরিত। হায়, কেন সে তখন মরে নাই! একবার—আর একবার কি তাদের দেখিতে পায় না? আজ যদি পথ চিনিয়া সে তাদের সেই বাড়ীতে যাইতে পারে, দ্বারে গিয়া যদি পড়িয়া থাকে সকালে তার বাবার তার মার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলে—আমার রক্ষে কর—তাড়িয়ে দিও না। আদর করো না, যত্ন করো না, মেয়ের মত দেখো না, মেয়ে ব'লে পরিচয় দিও না—শুধু দাসী ক'রে ঘরে রাখ। ওই ঝিকে ত রেখেছিলে, আমাকেই না হয় রাখ। না হয় মেরে ফেল—না পার আমায় মরতে দেও। তবু দূর ক'রে আমায় দিও না। এ পৃথিবীতে যে আমার আর স্থান নাই। যদি সে যায় এমনি করিয়া কাঁদিয়া বলে—তবু কি তাঁরা ঘরে কি ঘরের বাহিরেও একটু স্থান তাকে দেবেন না? না দেন আবার সে রাস্তায় বাহির হইবে। রাস্তায়ই ত সে বাহির হইতেছে। একবার

তাঁদের কাছে গিয়া দেখিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু কি করিয়া সে যাইবে? এই কলিকাতায় কোথায় সে আছে. কত দূরে তাদের সেই বাড়ী, কিছুই যে সে জানে না। কিন্তু কেহ কি তাকে পথ বলিয়া দিবে না? কেন দিবে না? রাত্রিকাল-টুকু না হয় সে কোথাও লুকাইয়া থাকিবে,—তারপর সকালে কত লোক রাস্তায় চলে, জিজ্ঞাসা করিয়া সে যাইবে। তার আর লজ্জা কি? ভয়ই বা কি? কিন্তু দিনের বেলায় দিনের সেই আলোতে কি করিয়া সে তাদের সেই বাড়ীতে তার পিতামাতা ভাই বোনদের সামনে গিয়া দাঁড়াইবে? কেমন করিয়া এই কালামুখ তাদের দেখাইবে? জানালার শিকের উপর মাথা রাখিয়া কতক্ষণ বিজলী ভাবিল,—ভাবিল আর কাঁদিল।

কিন্তু ভাবিয়া কি কাঁদিয়া যে কুল পাওয়া যায় না! কেবল একটি কথাই সে স্থির বুঝিল যে তাকে আজ এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তারপর—তারপর যদি কোনও দেবতা তার থাকেন—তিনি যেখানে নিবেন যেদিকে তার পা চালাইবেন সেই দিকে সে যাইবে। সবই ত তার নরক—এই গৃহ নরক, বাহির নরক, সমস্ত পৃথিবী নরক—যেখানেই সে যাক্ না, তার বেশী কি ভয়, বেশী কি ভাবনা?

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়া বিজলী বাহির হইল। সিঁড়ির কাছে গিয়া পা বাড়াইতেই পিছন হইতে কে তার হাত ধরিল।

"কে গা!", বিজলী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় যাচ্চ দিদিমণি?"

"যেথায় খুসী। তোমার কি? হাত ছেড়ে দেও!"

ঝি কহিল, "পাগল হ'য়েছ দিদিমণি?" একা এই রাত্তিরে রাস্তায় বেরোচ্চ, কোথায় যাবে? পুলিশে যে ধ'রে থানায় নিয়ে গারদে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে।"

"রাখে রাখ্‌বে। তোমার কি তাতে? ছেড়ে দেও, আমি যাই।"

"কেন পাগলামি ক'চ্চো দিদিমণি? এস ঘরে এস, খাবার রেখেছি, কিছু খেয়ে গে শুয়ে থাক। আহা সারাটি দিন যে মুখে জলবিন্দু পড়েনি।" ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া টানিল।

"না—না—না! আমি যাব—থাক্‌ব না। কেন টানাটানি ক'চ্চ। জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে? তুমি কে যে এই বাড়ীতে আমাকে রাখ্‌তে চাচ্চ? তোমার বাবু নিজে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

ঝি হাসিয়া কহিল, "পোড়াকপাল! কি যে বল্‌ছ দিদিমণি! তুমি অত বড় অপমানটা কল্লে, আর ব্যাটাছেলে রাগ ক'রে দুটো কথা বল্‌বে না? ও ত মুখের কথা। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাবু চলে গেলেন। কাল সকালে এসে দেখো আবার কত পায় ধ'রে তোমার কাঁদ্‌বে!"

বিজলী মুখ বিকৃত করিয়া জোরে হাত টান দিল। কহিল, "না—না—না! আর না—আর না। ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও আমাকে। রাত পোয়াবে? না—না! রাত পোয়াবার আগেই আমি চ'লে যাব। দূরে—অনেক দূরে চ'লে যাব। আঃ! ছেড়ে দেও না! কেন জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌ছ? বল্‌ছি আমি থাক্‌ব না।"

"কোথায় যাবে! কেনই বা যাবে? একটু ঝগড়া হয়েছে, অমন কত হয়, কত যায়। হাঁ, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে,—সে ত ক'রবেই। তা দুদিনেই সব সেরে যাবে। কিসের দুঃখ তোমার? অমন বাবু—প্রাণের মত তোমার ভালবাসে,—রাজরাণীর মত তোমায় রেখেছে——"

"আঃ! দূর হ হতভাগী।" অতিশয় উত্তেজনার আবেগে বিজলী ঝিকে ধরিয়া এমন এক ধাক্কা দিল যে ঝি কতদূর ছুটিয়া গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। বিজলী ত্রস্ত সিঁড়ি বহিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। ঝিও উঠিয়া ছুটিয়া আসিল। সিঁড়ির আধাআধি পথ নামিতেই বিজলীকে জাপটাইয়া ধরিল।

"আবার—আবার এসেছে! জোর ক'রে ধ'রেই রাখবে! আমি চেঁচাব! ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে পথের লোক পাড়ার লোক ডাক্‌ব!"

"ডাক—আমিও বল্‌ব—বাবু বাড়ীতে নাই, বউ পালিয়ে যাচ্চে। তারাই জোর ক'রে তোমায় ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল,—কহিল, "কেন আমাকে ধরে রাখছ? কি লাভ তোমাদের? আমি পাগলের মত হ'য়ে উঠেছি। দুদিন বাদে একেবারে পাগল হব! ওগো, তোমার পায় পড়ি ঝি—আমায় ছেড়ে দেও। আমি

যাই—আমার মা বাবার কাছে আমি যাব,—আমায় ছেড়ে দেও। না হয় তুমিই নিয়ে যাও, তাঁদের দোরে আমায় রেখে এস।”

“মিছে আর এই এই রাত্রিরে দেক করো না দিদিমণি। ঘরে গিয়ে এখন শুয়ে থাক। সেখানে আর যাবার যো আছে? দোরে উঠলেই যে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে। এস, এখন ঘরে এস। যেতে তুমি পারবে না। বাবুর হুকুম, তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই দেব না। আমাকে ঠেলে ফেলেও যেতে পারবে না। সদর দরজায় কুলুপ দেওয়া—দারোয়ান বাইরে পাহারা আছে। ছাদের সিঁড়ির দরজাতেও কুলুপ দেওয়া। সব পথ বন্ধ। কি ক'রে পালাবে? কাল বাবু আসুন, তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া ক'রে যা হয় ক'রো। আমাকে রেহাই দেও এখন। সারাটা ত আর খামোকা বসে থাকতে পারি নে।”

অনাহারে অনিদ্রায় বিজলীর শরীর যার পর নাই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই উত্তেজনায় ও শ্রান্তিতে সে একেবারে হয়রান হইয়া পড়িল। ঝির কথায়ও বেশ বুঝিল, পলাইয়া যাইবার কোনও উপায় আজ আর নাই। দেহের ক্লান্তিতে ও মনের অবসাদে সে একেবারে গা ছাড়িয়া দিল, সেই সিঁড়ির উপরেই বসিয়া কাত হইয়া দেয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

“এই দেখ! আবার ওখানে গড়িয়ে পল কেন? ঘরে এসো না! ভ্যালা এক আপদে প'ড়েছি যা হ'ক্। এমন ছ্যাকা মেয়েও ত কোথাও দেখিনি গা! উঠে এসো না ঘরে? সারা রাত ভ'রে এই ঠাট করবে নাকি?”

বিজলী ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, “আছি এইখানেই থাকি, ক্ষতি কি? পথ বন্ধ, পালাতে ত পারব না।”

না না! সে হবে না! এখানে এ ভাবে প'ড়ে থাকতে পারবে না। কিসে কি হবে শেষে, তার পর জান নিয়ে পড়ুক টানাটানি। না, উঠে এস! ঘরে গে' শুয়ে থাক। খাবার টাবার আছে, খেতে হয় খাও—না হয় না খাও। আমি আর পারিনে বাপু।”

খুব জোরে ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া টান দিল। উঠিয়া যাইবে, এ শক্তি তখন আর বিজলীর ছিল না। বকিতে বকিতে এক রকম হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঝি বিজলীকে শয়ন গৃহের মধ্যে নিয়া ফেলিল। তার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে শুইয়া রহিল।

(১৯)

আরও দিন দুই গেল।—বিজলী ওঠেও না, স্নানাহারও করে না। ঝি জোর করিয়া কখনও একটু দুধ কিছু সরবৎ কি ফলের রস তার মুখে দিত। নিরঞ্জনও বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন উপায় কি? যদি মরিয়া যায়, হয়ত ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। কোনও মতে কারও হাতে ফেলিয়া দিয়া এড়াইতে পারিলে সে এখন বাঁচে।—একলা ছাড়িয়া দিতেও পারে না,—কে জানে পুলিশের হাতে পড়িলে হয় ত বড় একটা ফ্যাসাদ হইবে।

একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিল। স্ত্রীলোক বয়সে প্রবীণা, মোটা সোটা বিধবার বেশধারিণী। বিজলীকে সে মিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইল, অনেক সান্ত্বনা দিল। বিজলী কাঁদিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “কে তুমি মা? আমার কেউ নেই, বড় দুঃখী আমি। এখানে আর থাকতে পারি না। যেতেও কোথাও এরা দেয় না। তুমি আমায় নিয়ে যাবে? তোমার কোলে আমায় রাখবে?”

স্ত্রীলোক বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “আহা, যাবে মা আমার কাছে? কেন নিয়ে যাব না? আহা, আমিও যে মা বড় দুঃখী। একটি মেয়ে ছিল, ঠিক তোমারই মত। ক মাস হ'ল তাকে হারিয়েছি! ত্রি-সংসারে আর কেউ আমার নেই। আহা, তোকে যদি কোলে পাই মা, তার দুঃখু আমার সেরে যাবে।”

বিজলী বড় শক্তি করিয়া স্ত্রীলোককে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, যাব মা যাব, আমায় নিয়ে যাও। আমার মা ছিল, ফেলে এসেছি, আর তাকে পাব না। দয়া ক'রে যদি এসেছ —মা ব'লে ডাকতে দিয়েছ—তুমিই আমার মা। আমার মা —আমার মা—আমার মা তুমি? মা—মা—মা! আমায় নিয়ে যাও মা। তোমার কোলে আমায় লুকিয়ে রাখ মা। বড় দুঃখু পাচ্ছি। তোমার কোলে বুকটা কি জুড়োবে মা?”

স্ত্রীলোক বিজলীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, —“জুড়োবে—জুড়োবে, কেন জুড়োবে না? ভগবান্ আছেন—দয়াময় তিনি—কারও কোনও দুঃখু কি চিরকাল থাকে মা?”

বিজলী যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আঃ!

এবুক কি আবার জুড়োবে ?—বেশী দিন আর বাঁচব না মা। মর্‌বার আগে একটিবার কি বুক জুড়োবে? যেমন ছিলাম তেমনি কি আর একটিবার মনে হবে? ভগবান্ দয়াময়,—কিন্তু তিনি কি আমার মত অভাগীকেও দয়া করেন ?"

"তাঁর দয়া কে না পায় মা ? বড় দুঃখী যে তাঁকেইত বেশী দয়া করেন। তাই মা তিনি দয়াময় !"

"আহা, যদি পাই—যদি একটু বুকটা জুড়োয়। উঃ! কি দুঃখুই যে পাচ্চি মা। তা মা, নিয়ে যাবে ত আমাকে, কবে নিয়ে যবে? আজই ? ওরা কি যেতে দেবে? জোর ক'রে যে আমায় ধ'রে রেখেছে। নইলে আমি ত কবেই চ'লে যেতাম।"

"দেবে—দেবে, কেন দেবে না ? কিন্তু তুমি যে একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ,—গাড়ীতে কি উঠতে পারবে? শুন্‌লাম, খাও না দাও না—"

"পার্‌ব—পার্‌ব মা। এই দেখ—" বলিতে বলিতে বিজলী উঠিয়া দাড়াইল, কিন্তু তখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোক মাথায় জল দিয়া হাওয়া করিয়া তাকে একটু সুস্থ করিল। কহিল, "এই ত একটু উঠে দাঁড়াতেই ঘুরে পড়ে গেলে। কি ক'রে যাবে? শোন, আমার কথা শোন : কিছু খাও। আমি এনে দিচ্ছি, খাও। খেয়ে একটু সুস্থ হও। কাল তোমায় নিয়ে যাব।"

"না—না মা! আজই—আজই নিয়ে যাও। আচ্ছা, আমি খাব, খেলেই সুস্থ হব, তখন যেতে পারব।"

"আজ থাক বরং। বেলাটাও গেছে। খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ঘুমোও। কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাব। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে একবার আসি। রাত্তিরে বরং তোমার কাছে থাকব। কাল সকালে—কি না হ'য় দুটি খেয়ে দেয়ে তোমায় নিয়ে যাব। কেমন ?"

"আচ্ছা, তাই হবে। তুমি আস্‌বে ত মা? রাত্তিরে আমার কাছে থাকবে ত মা ?"

"ওমা, আস্‌ব না ? বল কি মা ? তুমি যে আমার মেয়ে।"

স্ত্রীলোক উঠিয়া বাহিরে গেল। কিছু দুধ ও খাবার লইয়া আসিল। বিজলী উঠিয়া বসিয়া খাইল। খাইয়া একটু সুস্থ বোধও করিল।

স্ত্রীলোক একটু পরেই চলিয়া গেল। রাত্রি ৮টা ৯টার সময় আবার আসিল। পাক হইয়াছিল। ভাত আনিয়া বিজলীকে সে খাওয়াইল। রাত্রিতে বিজলীকে কোলের কাছে লইয়া শুইয়া রহিল। পর দিন সকাল সকাল সে বিজলীকে স্নান করাইয়া তার চুল আঁচড়াইয়া দিল। পরিষ্কার একখানি কাপড় পরাইল। নিজে কাছে বসিয়া বিজলীকে খাওয়াইল। তার পর কহিল, "তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর। আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আহ্নিক ক'রে দুটি খেয়ে আসি, তার পর দুপুরের পর তোমায় নিয়ে যাব। বাবুকে ব'লে ট'লে রেখেছি। তিনি আপত্তি কিছু করেন নি। তা একবার যদি দেখা ক'রে যেতে চাও—"

বিজলী মাথা নাড়িল।

"আচ্ছা, থাক্ তবে। তুমি বরং একটু ঘুমোও। আমি এই এলাম ব'লে।"

স্ত্রীলোক চলিয়া গেল। দুপুরের পর একখানি গাড়ী লইয়া আসিল। বিজলী তার সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া একটা বাড়ীর দ্বারে থামিল। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স্ত্রীলোক বিজলীর হাত ধরিয়া নিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর, দরজা সব ভিতর হইতে বন্ধ। বিজলীর মনে হইল, ঘরে ঘরে সব লোকেরা ঘুমাইতেছে। তাইত, কত লোক এই বাড়ীতে থাকে। এত লোকের মধ্যে কি করিয়া সে থাকিবে? ভিতরের দিকে দ্বিতলে একটি গৃহমধ্যে স্ত্রীলোক বিজলীকে লইয়া প্রবেশ করিল। একি ? এই কি ইহার ঘর। এই খাট, এই বিছানা—আলনা, আলমারী, দেরাজ, টেবিল, চেয়ার।—দেয়ালে—ছি—ছি। কি সে বিশ্রী ছবি—এও কি ইহাঁর ঘর! কে ইনি ? কেমন ভীত ও বিস্মিত ভাবে বিজলী এদিক ওদিক চাহিল।

স্ত্রীলোক একটু হাসিয়া কহিল, "কি ভাবছ মা, এই আমার মেয়ের ঘর।—জামাই সৌখিন লোক—ঘরটি মনের মত ক'রে সাজিয়েছিল। সাজিয়েই রেখেছে, সে বলেছে, তুমি এই ঘরে থাক্‌বে। বেলা প'লে সে আস্‌বে, তার সঙ্গে আলাপ ক'রো, বড় খাসা জামাই।"

বিজলীর মনের মধ্যে যেন রোদন করিয়া উঠিল, কেমন বিশ্রী একটা সন্দেহ তার হইল। সর্ব্বাঙ্গে তার ঘাম ছুটিল—কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

"ওমা, মাটিতে কেন ব'সে প'লে মা?—এস উঠে এস। উঠে বিছানায় এসে বরং শোও একটু। ভয় কি? তোমার মা আমি,—কত সুখে তোমায় রাখব। এস,—" বিজলীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি টানিল।

বিজলী কহিল, "না—না ও বিছানায় আমি যাব না। কে তুমি? কোথায় আন্‌লে আমাকে? ছেড়ে দেও আমি চ'লে যাই। ওগো তোমার পায় পড়ি—আমায় বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না? না হয় একটা গাড়ী ক'রে দিলেই আমি যেতে পারব।"

"পাগলীর কথা শোন। আর কি সেখানে যাবার যো আছে? তারা কি আর ঘরে নেবে? কিছু ভয় নেই তোর মা! ভাব্‌ছিস্ কেন? আমার মেয়ে হ'য়ে এলি, রাজকন্যের মত সুখে থাক্‌বি। কত খাবি, কত পরবি, গা-ভরা গয়না দিয়ে তোকে সাজাব। আমার ওই দেরাজ ভরা কত গয়না আছে,—এই দেখ্!"

স্ত্রীলোকটি দেরাজ খুলিয়া ঝক্‌ঝকে একরাশি গহনা বাহির করিল। কহিল, "এ সব ত তোরই? পর্‌বি দুখানা এখন?"

"না না না! নাগো, আমার গয়নায় কাজ নেই। তুমি মা—তোমায় মা ডেকেছি—দয়া ক'রে আমায় বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না? বাবার, মার দুটি পা জড়িয়ে আমি প'ড়ে থাক্‌ব, কেন তাড়িয়ে দেবেন? ঘরে না রাখুন আর কোথাও—কি জানি কোথা হবে—তিনি বাবা তাহার একটা গতি আমার করবেনই। ওগো, তোমার পায় পড়ি, বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না?"

স্ত্রীলোক কহিল, "তুমি দেখছি বাছা বড় সহজ মেয়ে ত নও? সাধে তারা বিদেয় ক'রে দিয়েছে? তা এখানে, বাছা, গোলমাল বেশী ক'রো না। তাতে সুবিধে কিছু হবে না। হাঁ, মা বাবা ক'রে এতই যদি দরদ ছিল, পরের সঙ্গে ভাব ক'রে ঘর ছেড়ে এলে কেন? মেয়েমানুষ একবার কুলের বার হ'লে আর ঘরে যেতে পারে? এখন এরি মধ্যে যাতে সুখে থাকতে পার, তাই দেখতে হবে। গোলমাল যদি কর, দুর্গতির একশেষ হবে। ভাল কাপড় চোপড় দিচ্ছি। গয়না দিচ্ছি পর। খাবার টাবার দেব, খাও। জামাই ওবেলা আসবে তার সঙ্গে আলাপ্ সালাপ কর। আমোদ আহ্লাদে সুখে সচ্ছন্দে থাক।"

বিজলী শুনিল,—বুঝিল কোথায় সে কিরূপ লোকের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

"ও মাগো! ও বাবাগো! তোমরা কোথায় গো!" চিৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—বুক দুটি হাতে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িল।

"এই গেল যা! ওমা একি গা! বলি বাছা, ঘরে এমন মড়া কান্না জুড়ে দিও না। থাম! তাতে সুবিধে কিছু হবে না। যদি চেঁচামেচি কর, কাপড় গুজে দিয়ে মুখ বেঁধে রাখব। হাঁ!"

স্ত্রীলোক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা পড়িল, অন্যান্য ঘরে যারা ঘুমাইতেছিল তারা জাগিল। অনেকগুলি স্ত্রীলোকের কলরবে বাড়ী পূর্ণ হইল। বিজলীর ঘরের কাছেও কেহ কেহ আসিল। তাদের কথাবার্ত্তা বিজলীর কাণে গেল। ছি ছি ছি! ইহাও শেষে তার অদৃষ্টে ছিল। এখন উপায়? আর একবার অতি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বিজলী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

(২০)

মাসাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে। বিজলী বড় রুগ্ন। ছোট একটি ঘরে ছেঁড়া ময়লা একটি বিছানায় সে পড়িয়া আছে। গভীর রাত্রি, ক্ষীণ একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি স্ত্রীলোক তার কাছে বসিয়া হাওয়া করিতেছে। এই নরকের আগুনের মধ্যেও এই নারীর হৃদয় একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিজলীর দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদিত, অবসর হইলেই সে বিজলীর কাছে আসিয়া তার শুশ্রূষা করিত। ইহার নাম ছিল মোহিনী। কেহ কেহ বলিয়াছিল, উহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেও। কিন্তু বাড়ীওয়ালী তা দেয় নাই। কে জানে, হতভাগী কাকে কি বলিবে, শেষে বড় একটা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে। হয়ত বা জেলই খাটিতে হইবে। ও ত মরিবেই,—তা হাঁসপাতালে না মরিয়া বাড়ীতে মরিলেই বা ক্ষতি এমন কি?

বিজলী ডাকিল, "দিদি!"

"কি হেনা!" (বাড়ীওয়ালী এই নামেই বিজলীর পরিচয় দিয়াছিল। বিজলীও তার নাম কাহাকেও বলে নাই)।

"একটু জল।"

মোহিনী বিজলীর মুখে একটু জল দিল।

বিজলী আবার ডাকিল, "দিদি"

"কি বোন্?"

"আর ক'দিন আছে? আর যে পারি না।"

মোহিনী অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিল। কহিল, "হেনা!"

"কি দিদি?"

"শুনেছিলাম তোর বাপ মা আছেন। তাঁদের কি দেখতে ইচ্ছা করে? তাহ'লে তাঁদের নাম ঠিকানা আমায় বল্, আমি তাঁদের খবর পাঠাব।"

বিজলী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, দরদর ধারে অশ্রুধারা বহিল। একটু পরে ধীরে ধীরে কহিল, "না দিদি, ছি! এখানে—না তা পারব না দিদি! কপালে যা ছিল, তা'ত হ'ল। এখন যেতে পাল্লেই বাঁচি। তবে একটি বড় ইচ্ছে হয়—"

"কি হেনা?"

বড় দাগা তাঁদের দিয়ে এসেছি। হয়ত কত খুঁজ্‌ছেন কতদিন আরও খুঁজবেন, খোঁজ না পেলে সোস্তি হবেন না। আর ক'দিন আছে দিদি বলতে পার? কেন ভাবছ? আমি যে যেতেই চাই। যেতে পাল্লেই যে এখন বাঁচি। আমি বুঝতে পাচ্চিনে, তুমি যদি পার দিদি বল,—ক'দিন আর আছে?"

মোহিনী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আর ক'দিন? দুই এক দিনের মধ্যেই বোধ হয় তোর দুঃখ শেষ হবে।"

বিজলী কহিল, "একটু কাগজ দোয়াত কলম আমায় এনে দেবে? একটু চিঠি আমি লিখে রাখ্‌ব, বেশী দরকার নেই, পারবও না, শুধু দুটি কথা। আমি গেলে সেই চিঠিটুকু আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিও। দেবে ত দিদি?"

"দেব। কেন দেব না?"

"হাঁ দিও দিদি। ভুলে যেও না। কাউকে দেখিও না, লুকিয়ে রেখো। ওরা দেখ্‌লে দিতে দেবে না। যেদিন যাব চিঠিখানি পারত নিজে দিয়ে এসো, না হয় ডাকে পাঠিয়ে দিও। আর কিছু না, আমি ম'রেছি, এই খবরটুকু তাঁদের শুধু দেবে। তাহ'লে—তাহ'লেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন।—"

"আচ্ছা তাই দেব। তুই এখন একটু ঘুমো ত।"

"ঘুম! একেবারেই ঘুমোব দিদি! দিদি, ম'লে কি মানুষ ঘুমোয়? একেবারে চিরকালের তরে ঘুমোয়! আহা, তা যদি হয় দিদি!"

"কে জানে কি হয়? সে কথা কি আর ভাব্‌তে পারি? ভাবতে ভয় করে। আহা, সত্যিই যদি মরণে চিরকালের ঘুম আস্‌ত! তা হ'লে কে না ম'র্‌ত বোন? তা ভাবিস্‌নি হেনা, বড় দুঃখ পেয়েছিস,—দেবতা যদি দেবতা হন, তোকে দয়া করবেনই।"

বিজলী কহিল, "দিদি, কে জানে, কাল হয়ত পারব না। সমস্ত শরীর—মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে আস্‌ছে। একটু কাগজ দোয়াত কলম এনে দেবে? চিঠি টুকু এখনই লিখে রাখি। শেষে যদি না পারি, তবে সে ঘুমেও যে আমার ঘুম হবে না দিদি!"

মোহিনী উঠিয়া গেল। একটু কাগজ দোয়াত কলম আর একখানি খাম লইয়া আসিল। প্রদীপটি বিজলীর কাছে সরাইয়া দিল। কাত হইয়া বিজলী কষ্টে কয়েকছত্র লিখিল। তারপর খামে ঠিকানা লিখিয়া মোহিনীর হাতে দিল। মোহিনী খাম আঁটিয়া চিঠিখানি সাবধানে তার ঘরে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া আসিল।

* * * *

তিন চারিদিন পরে মহীন্দ্রবাবু বিজলীর পত্র পাইলেন। পত্রের মধ্যে মাত্র এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল:—

"মা! বাবা! কপালে আমার যা ছিল, তা হইল। সব—সব দুঃখ শেষ করিয়া আমি চলিয়া গেলাম। আমার জন্য আর তোমরা ভাবিও না। যদি পার, আমাকে ক্ষমা করিও। বড় দুঃখ—বড় লজ্জা—তোমাদের দিয়াছি। কি করিব? কপালে আমার এই ছিল। ভরসা পাই না, তবু প্রণাম করিতেছি। তোমরা আমার প্রণাম নেবেকি? দাদাদের ব'লো—দিদিমাকে ব'লো—ব'লো সবাইকে আমি প্রণাম করিতেছি। আর মানু মণ্টু খোকা তাদের কি বলিব? আমার আশীর্ব্বাদে তাদের ভাল হবে না। তাদের জন্য প্রাণটা বড় কাঁদছে। আর পারি না। পত্রখানা যখন পাবে,—আমি আর এ পৃথিবীতে তখন নেই। ক্ষমা করিও।"

বিজলী।

সম্পূর্ণ।

মাদুরা

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাদুরার আদি মন্দির খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে মন্দিরের কোন চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই। খ্রীষ্টায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাদুরা মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। খুব সম্ভব প্রাচীন মন্দির সেই সময়ে ধ্বংস হইয়াছিল। তারপরে প্রায় তিনশত বৎসর উক্ত মন্দিরের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে মাদুরার বর্ত্তমান বিশ্ব-বিশ্রুত মন্দির পুরাতনের ভগ্ন সংস্কার কিম্বা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, তাহা সুনিশ্চিত বলাও সহজ নহে। সে যাহাই হউক, মাদুরার বর্ত্তমান গৌরব যে বহুল পরিমাণে মহারাজ তিরুমল নায়কের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিভার দান তাহা, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ তিরুমলের অভ্যুদয় হয়। তিনি প্রায় ৩৬ বৎসর কাল মাদুরার সিংহাসন অলংকৃত করিয়া ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিশ্ববিস্ময়কর অদ্ভুত সৃষ্টি তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের একজন হিন্দু নৃপতির পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মহারাজ তিরুমল শিবোপাসক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দেবাদিদেবের দর্শন চাহিয়া বহু আরাধনা করিলে একদা স্বপ্নে দেখেন—যেন শিব তাঁহাকে বলিতেছেন—"যদি তুমি মাদুরায় আমার যোগ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমার দর্শন পাইবে।" এই স্বপ্ন হইতে তিনি যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, উহা হইতেই বর্ত্তমান মন্দিরের সৃষ্টি হয়। এই মন্দিরের বিশালতা এবং বিরাটত্বের বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক স্বচক্ষে না দেখিলে কেবলমাত্র ছবি দেখিয়া কিম্বা বর্ণনা পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহার দৃষ্টি বহিরঙ্গের পারিপাট্যের দিকে যতটা নিবিষ্ট অন্তরঙ্গের প্রতি ততটা নহে। জৈনশিল্পে ঠিক ইহার বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়। দ্রাবিড়ের মন্দিরগুলিতে গোপুরের সৌন্দর্য্যই বিশেষ ভাবে দর্শকের চিত্তকে মোহিত করে। মন্দিরের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও, বাহিরের দৃশ্যটিই চিত্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে, ভিতরের কথা শেষে আর তেমন মনে থাকে না। মাদুরার মন্দিরে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি গোপুর আছে। সবগুলি সমান উচ্চ নহে। পূর্ব্ব দিকের গোপুরই মন্দিরের প্রধান দ্বার। উহা শতাধিক হস্ত উচ্চ। এই গোপুরগুলির বিরাট দেহ পাদদেশ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি দ্বারা মণ্ডিত। শিল্পি সেই সকল মূর্ত্তির রচনায় যে ধৈর্য্য এবং নৈপুণ্য দেখাইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই মূর্ত্তিগুলির আকার ভঙ্গী এবং অবস্থানের সমবায়ে একটি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র প্রধান গোপুরের সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া কত হাজার মূর্ত্তি যে রচিত হইয়াছে তাহা গণনা করা একেবারেই সাধ্যাতীত। কথিত আছে যে মহারাজ তিরুমল হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীর সর্ব্বলক্ষণযুক্ত পরিপূর্ণ মূর্ত্তির দ্বারা গোপুরগুলিকে সাজাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অন্যূন তিন শত বৎসরের ঝড়, ঝঞ্ঝা, রৌদ্র, বৃষ্টি এবং ভূকম্পের অত্যাচার সহিয়াও এই মঞ্চগুলি অক্ষত দেহে অটুট সৌন্দর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রধান গোপুরটি নয়তলে বিভক্ত এবং প্রায় সার্দ্ধ দুইশত সোপান বাহিয়া উহার চূড়ায় উঠিতে হয়। গোপুরগুলির সর্ব্বাঙ্গে গবাক্ষ। এই গবাক্ষগুলি রাত্রিতে আলোকিত করা হয়। শুনিয়াছি যে মাদ্রাজ প্রদেশের ধনীহিন্দুগণ মৃত্যুকালে স্বর্গ কামনা করিয়া ঐ সকল গবাক্ষে প্রত্যহ আলো দিবার জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বহু স্থলে মৃতের উত্তরাধিকারীরাও এই পুণ্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মন্দিরাভ্যন্তরেও বহুদ্বারে এইরূপ আলো দিবার ব্যবস্থা আছে। একটি প্রধান ফটকে প্রতি সন্ধ্যায় সহস্র ঘৃত প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একজন ধনী নাকি বার্ষিক বহু সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। যে নয়টি গোপুরের কথা উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে একটি এবং উহাই প্রধান ও সর্ব্বোচ্চ গোপুর। উত্তরে দুইটি, পশ্চিমে দুইটি, দক্ষিণে একটি এবং মধ্য ভাগে তিনটি গোপুর অবস্থিত। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দক্ষিণ বলা যাইতে পারে। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধের ব্যঞ্জনা। মাংসপেশীগুলি ক্রোধভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। রক্তের ত্বরিৎ গতিতে শিরা উপশিরা গুলিও ফুলিয়াছে। শত্রুনাশের জন্য একটা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা মূর্ত্তির সমস্ত দেহটাকে যেন কম্পিত করিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ বিরাট এবং ভীষণ পাষাণ মূর্ত্তি ভারতে আর কুত্রাপি নাই। রোম গ্রীসে আছে কি না জানি না। দেখিলাম শুব্ধ যাত্রীরদল দূরে

দিকে সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়। মোট ৯৯৭টি অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত স্তম্ভের উপরে ইহার ছাদ রক্ষিত। স্তম্ভগুলি সবই খোদাই করা, কিন্তু শিল্পের হিসাবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। এই মণ্ডপটির গঠন কার্য্য যে বহু বিষয়ে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ত্রিচীনপল্লী শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরেও এইরূপ একটি সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ আছে। বিস্তৃতির হিসাবেই এই মণ্ডপ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এই মণ্ডপে বহু সহস্র লোকের বসিবার স্থান হইতে পারে। 'সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ' অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই পশ্চিমে সুন্দরেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বাহিরে দরদালান। দরদালানের একপ্রান্তে ঋষি মন্দির। এই মন্দিরে আঠারটি তপস্বীমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এই ঋষিদিগের নাম জানিতে পারি নাই। ঋষি-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নবগ্রহের মন্দির। এই মন্দিরে নবগ্রহের পাষাণ মূর্ত্তি বিদ্যমান। দ্রাবিড়ের প্রায় সকল মন্দিরেই এই নবগ্রহ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরেশ্বরের মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তির স্বর্ণচক্ষু স্বর্ণনাসিকা এবং শিরে কুণ্ডলায়িত স্বর্ণসর্প, কৌতূহলের উদ্রেক করে। দেবার্চ্চনের সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড স্বর্ণস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবার্চ্চনের একপার্শ্বে কয়েকটি পরম রমণীয় পাষাণ মূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তন্মধ্যে চারিটি ভাবে এবং সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। একটিতে এক ভয়বিহ্বলা নারী আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া কৈলাসপতিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শিবের পদতলে যম লাঞ্ছিত। নারীর দৃষ্টিতে ত্রাস এবং করুণাভিক্ষার ভাব আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এক বেদীর উপরে হরপার্ব্বতীর বিবাহ হইতেছে। একপার্শ্বে মহাদেব অপরপার্শ্বে নারায়ণ, মধ্যভাগে পার্ব্বতী দণ্ডায়মানা। নারায়ণ হোমকুণ্ডের সম্মুখে শিবকে পাত্রী দান করিতেছেন। অদূরেই পিনাকীর তাণ্ডবনৃত্য। সেকি নৃত্য! কিবা তার অঙ্গভঙ্গী, কিবা তার দৃষ্টি, কিবা তার ভাবোন্মাদ! পাষাণের সর্ব্বাঙ্গে লীলায়িত জীবন যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। উহার কিঞ্চিদ্দূরে দেবীর ভীষণ রণচণ্ডীমূর্ত্তি দর্শকের ত্রাসোৎপাদন করিতেছে। সে মূর্ত্তির বর্ণনা হয় না। একটি ছোট খাট অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া সেমূর্ত্তি রচিত হইয়াছে। ইহাকে প্রকৃতির ধ্বংস মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতেছে, ভয় মিশ্রিত ভক্তিতে প্রণিপাত করিতেছে এবং অবশেষে অতি সন্তর্পণে মূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া মা, তুমি শান্ত হও; এই বলিয়া সিন্দুর মিশ্রিত বড় বড় মাখনের ডেলা মূর্ত্তির বক্ষে এবং মুখে ছুড়িয়া মারিতেছে। সমস্তদিন মূর্ত্তির দেহ বাহিয়া গলিত মাখনের ধারা নামিয়া মন্দির তল পিচ্ছিল করিয়া দিতেছে। দেবার্চ্চনার অভ্যন্তর ঘোরান্ধকার। ইহা হিন্দুর মন্দির মাত্রেরই একটি বিশেষত্ব। হিন্দু ঋষি তাহার সেই "তমসঃ পরস্তাৎ" বাণীতেই বলিয়া গিয়াছেন যে দেবতাকে দেখিতে হইলে বহু অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে হয়। হিন্দুমন্দিরের সহস্র ঘৃত প্রদীপের ন্যায় মানবাত্মায় জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম ও ভক্তির হাজার বাতি জ্বলিয়া না উঠিলে আত্মারামের দর্শন লাভ হয় না। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই দেবতার সিংহাসন অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয়। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের গোপুর পার হইলেই প্রথমতঃ অষ্টলক্ষ্মীর মণ্ডপ। এই মণ্ডপের ছাদ আটটি বিশাল স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রত্যেকটি স্তম্ভকে কাটিয়া এক একটী প্রকাণ্ড লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই মন্দিরে দেবীর পূজোপকরণের বাজার বসিয়া থাকে। এখানে নানাজাতীয় ফুল, বিল্বপত্র, ধূপ, ধুনা, কর্পূর, চন্দন, তুলসী, গুগ্‌গুল্ এবং নারিকেল প্রভৃতি পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার কিনিতে পাওয়া যায়। অষ্টলক্ষ্মীর মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া আর একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপে পড়িতে হয়। উহার নাম মীনাক্ষীনায়ক মণ্ডপ। তারপরে সুবিস্তৃত চতুরস্রপ্রাঙ্গনে স্বর্ণপদ্ম সরোবর, ইহাকে কেহ কেহ শিবগঙ্গাতীর্থও বলিয়া থাকেন। এই সরোবরের জল অতি জঘন্য। রঙ্গ গাঢ় সবুজ। দেখিলাম যাত্রিরা ভক্তিভরে তাহাতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছে। এই পুষ্করিণীর তীরদেশ হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। উহার একখানি ছবি পূর্ব্ব প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। স্বর্ণপদ্ম সরোবরের পশ্চিম তীর ধরিয়া উত্তরে অগ্রসর হইলেই মীনাক্ষী মন্দিরের দেবার্চ্চনার দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। দেবার্চ্চনার বাহিরে বিশাল প্রাঙ্গন। দেবার্চ্চনার অভ্যন্তরভাগের বিস্তৃতিও প্রায় বহিঃপ্রাঙ্গনেরই অনুরূপ। বহিঃপ্রাঙ্গনের একপার্শ্বে পঞ্চপাণ্ডবের পাষাণ মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ইহার প্রত্যেকটি মূর্ত্তির দক্ষিণে ও বামে দুটি করিয়া সিংহ মূর্ত্তি বিদ্যমান। এখানেও দেবার্চ্চনার পুরোভাগে স্বর্ণস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে দেবার্চ্চনার গর্ভগৃহ ঘোরান্ধকার। সহস্র ঘৃত-প্রদীপের আলোকে দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর মুখখানি কৃষ্ণমর্ম্মরে নির্ম্মিত এবং বহু রত্নালঙ্কারে ভূষিত। দেবীর চরণদ্বয় স্বর্ণনির্ম্মিত এবং প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মোপরি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর পরিধানে রক্তবসন দ্বিভুজে রত্নবলয় কণ্ঠে রত্নহার এবং শিরে রত্নমুকুট শোভমান।

মীনাক্ষী এবং সুন্দরেশ্বর ব্যতীত আরও বিগ্রহ মূর্ত্তি মাদুরার মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সুব্রহ্মণ্য এবং গণপতিই প্রধান। দ্রাবিড়ে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের সুব্রহ্মণ্য নামে পরিচিত।

মন্দির-প্রাঙ্গনের বাহিরে সদর রাস্তার অপর পার্শ্বে—চৌলট্রি হল নামে এক বিরাট মণ্ডপ বিদ্যমান। দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতায় এই মণ্ডপ এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু। এখানেও বহু পাষাণ মূর্ত্তি প্রাচীন হিন্দু শিল্প কলার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে

আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মণ্ডপের একপ্রান্তে কৃষ্ণ মর্ম্মরের এক প্রকাণ্ড বেদী মর্ম্মর স্তম্ভোপরি বিধৃত মর্ম্মর চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত আছে। শুনিয়াছি যে, সুন্দরেশ্বর —বৎসরের মধ্যে সাত দিন এই বেদীতে বসিয়া পূজা গ্রহণ করেন। তখন এই মণ্ডপে মেলা বসে এবং প্রচুর আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের দোকান সারি সারি সুসজ্জিত আছে। তন্মধ্যে মাদুরার স্বর্ণসূত্র নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বহুমূল্য বস্ত্র, বেল্‌মেটালের নানাবিধ পাত্র এবং এক প্রকার উৎকৃষ্ট কৃষ্ণদারুনির্ম্মিত হস্তীমুণ্ড শোভিত ত্রিপদ টেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপের কয়েকটী স্তম্ভ কাটিয়া কতিপয় নারীমূর্ত্তি রচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি উহা নাকি মহারাজ তিরুমলনায়কের রাণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি। উহার মধ্যে একটি নারীমূর্ত্তির উরুদেশে একটি ক্ষত চিহ্নের মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার প্রদর্শক আমাকে বলিলেন যে, শিল্পি পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্ত্তি রচনা করিয়া মহারাজ তিরুমলক উহার অবিকলত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাঁহারই আদেশে পরে উক্ত ক্ষতচিহ্ন কাটিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বার্ষিক বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিশবৎসরে এই মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মাদুরার মন্দিরে কত যে আশ্চর্য্য দর্শনীয় এবং বর্ণণীয় বস্তুও রহিয়াছে তাহার গণনা হয় না। এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। বহু পুণ্যফলে এই সোণার ভারতে জন্ম লইয়া যাহারা ইহার অতীত মহিমার নিদর্শনগুলি দেখিল না তাহারা দুর্ভাগ্য।

মহারাজ তিরুমলের অন্যতম অদ্ভুৎকীর্ত্তি মাদুরার তিরুমল-প্রাসাদ; এই প্রাসাদে প্রাচীন হিন্দুর স্থাপত্য শিল্প যেরূপ দুঃসাধ্য বিপুলতার মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেরূপ আর কুত্রাপি নয়ন গোচর হয় নাই। এই প্রাসাদের কি ফটক কি হল, কি কক্ষ, কি স্তম্ভ, কি গম্বুজ, কি উচ্চতা, কি শিল্পনৈপুণ্য সমস্তই বিস্ময়কর। প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এবং অন্যূন ১৫ ফুট বেষ্টন, অখণ্ড গ্রানাইট্ প্রস্তরের সারি সারি স্তম্ভের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয় এবং সত্য সত্যই মনে হয় যে ইহা বুঝি মানুষে গড়ে নাই; অতিমানুষশক্তি-সম্পন্ন দৈত্য দানবে গড়িয়াছে। এই সকল স্তম্ভের উপরে বিরাট খিলান সকল সার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান। খিলানগুলি ভূমিতল হইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। সিংহদ্বার পার হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই পাষাণনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন। উহা দৈর্ঘে এবং প্রস্থে ১০০ গজের কম হইবে না। প্রাঙ্গনের তিনদিকে, খুব উচ্চ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় ২৫ হাত প্রশস্ত, অলিন্দ বরাবর চলিয়া গিয়াছে। এই অলিন্দগুলির সম্মুখেই সেই অতিকায় স্তম্ভরাজি বিদ্যমান। স্তম্ভের উপরে খিলান, খিলানের উপরে ছাদ। একদিকের অলিন্দের ছাদ এত উচ্চ যে উহা কলিকাতার বড়বাজারের ছয়তলা বাড়ীর ছাদের সমান উচ্চ হইবে বলিয়া মনে হইল। এই অলিন্দের পরেই মহারাজ তিরুমল নায়কের দরবার গৃহ। এই গৃহের ছাদে বিশাল গম্বুজ। গম্বুজের খিলান লালবর্ণে সুরঞ্জিত। গম্বুজকে বেষ্টন করিয়া গ্যালারি। এই আকাশচুম্বী গ্যালারিতে বসিয়া পুরাঙ্গনাগণ দরবার দেখিতেন। দরবার গৃহের একপার্শ্বে আর একটি সুনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত হল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা মহারাজ তিরুমলের শয়নকক্ষ ছিল। এখানেও গ্যালারি আছে। এই গ্যালারি এক সময়ে পুরনারীবর্গের কলহাস্যে এবং কঙ্কণ ঝনৎকারে মুখরিত হইত। মহারাজ দোলায়মান পালঙ্কে শয়ন করিতেন। ছাদের সঙ্গে পালঙ্ক দোলাইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদ দেখিলে মনে হয় যে, হয় মহারাজ তিরুমল ইহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, না হয়, ইহার কতকাংশ ধ্বংশ করা হইয়াছে। ধ্বংশ করা হইয়াছে বলিবার কারণ এই যে তিরুমলের কোন স্থাপত্য প্রতিষ্ঠাই সহজে আপনা হইতে ধ্বংস পাইবার বস্তু নহে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাসও শেষোক্ত অনুষ্টানেরই পরিপোষক। প্রাসাদের পরেই দর্শনীয় বস্তু, 'তেপ্পন কুলম্'। ইহা একটি সুবিস্তৃত সরোবর। ইহাকে 'স্বর্ণ-সরোবর'ও বলে। ইহার তীর ভূমি দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় হাজার হাত হইবে। চতুর্দ্দিকে খোদাই করা পাষাণ প্রাচীর। সরোবরকে বেষ্টন করিয়া সুন্দর রাস্তা। এখানে সহরের লোকেরা সকালে এবং সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য আসিয়া থাকেন। সরোবরের মধ্যস্থানে প্রকাণ্ড বেদী। বেদীর উপরে সুন্দর মন্দির। শুনিয়াছি যে উক্ত মন্দিরে মহারাজ তিরুমলের পাষাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি নিজে তাহা দেখি নাই। পৌষ পূর্ণিমায় সুন্দরেশ্বরদেব মীনাক্ষী দেবীর সহিত রথে চড়িয়া এই সরোবরে শুভাগমন করেন। এখানে তাঁদের স্নানাভিষেক হয়। তখন এই সরোবরের চারি পার্শ্বে মেলা বসিয়া থাকে। দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রীর দল রথযাত্রা দেখিতে আগমন করে। সুন্দরেশ্বরের রথ-যাত্রা মাদুরার একটী প্রধান উৎসব। 'স্বর্ণ-সরোবরের' অতি সন্নিকটে একটি বিশাল বটবৃক্ষ যুগযুগান্তের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। ইহার ছায়ায় অন্যূন দশ সহস্র লোকের বসিবার স্থান হইতে পারে বলিয়া মনে হইল। মাদুরার রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত এবং সুগঠিত। এখানে ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহু সহস্র বয়নশিল্পি অদ্যাপি মাদুরায় বাস করিতেছে। আমি যখন দেখিয়াছিলাম তখন মাদুরায় দুই কলেজ এবং একটি সুচালিত কটনমিল ছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।
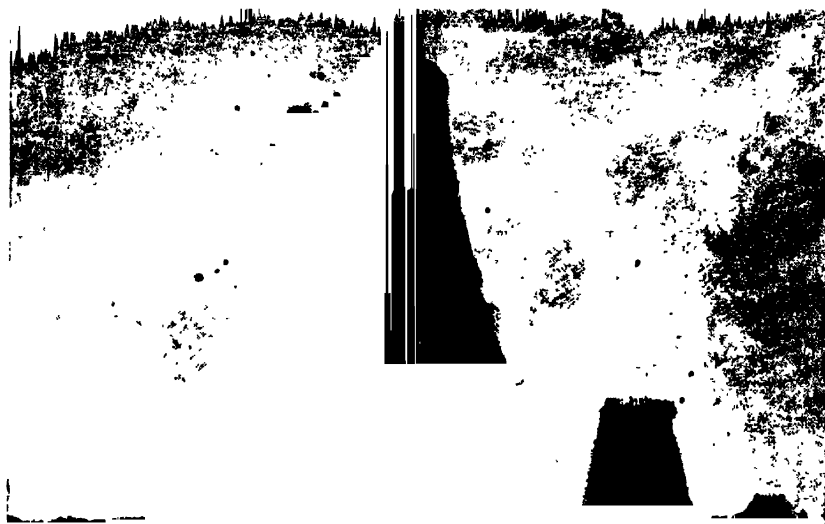
দক্ষিণ গোপুরের সাধারণ দৃশ্য। মীনাক্ষী—মাদুরা
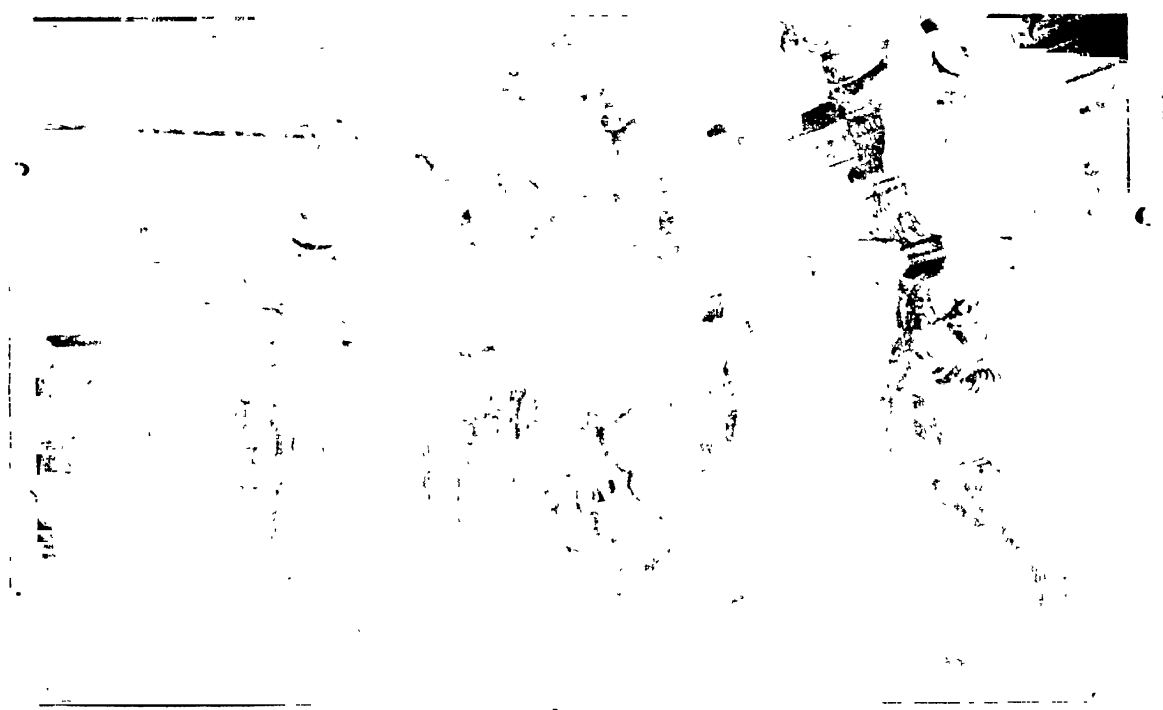
নন্দর মা

সারা উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া আসিয়া নন্দর মা ঘরে ঢুকিয়া পুত্রকে তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া চেঁচাইয়া কহিল—"নন্দা, ওরে নন্দা উঠ্‌বি নে? আজ তোর হল কিরে, দেখ দিকি বেলা কতখানি হয়েচে; ক্ষেত খামার কি ভুলেই গেলি নাকি?" মায়ের ডাকে নন্দ উঠিয়া বসিয়া গোটা দুই হাই তুলিয়া কহিল, "তাই ত মা, বেলা যে বেড়েই গেচে, জল দাও, মুখটা ধুয়ে ফেলি" বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া পূর্ব্বদিক্ ফিরিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া ঘরে ঢুকিতেই অদূরে জমিদারের পেয়াদা মণ্ডল দাদাকে দেখিয়া ফিরিয়া কহিল, "কি মনে করে মণ্ডলদাদা?" অপ্রসন্ন মুখে মণ্ডল দাদা বলিল, "তোদের কি আর ইচ্ছেয় ছোট লোক বলে? যাঁর মাটিতে বাস্ করিস্ তাঁরই সঙ্গে চাস দাঙ্গা করতে? ভাল চাস্ ত ও আবদারটা ছেড়ে দেগে যা, নইলে কেন মিছামিছি একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা করবি বল দেখি রে?" ঈষৎ হাসিয়া নন্দ কহিল, "দাঙ্গা ত আর কেউ করছিনে মণ্ডল দাদা, কিন্তু ভাবছি যে মনিবের সঙ্গে একটা রক্তারক্তি হবে" মণ্ডল দাদা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল "তুই বলিস্ কিরে নন্দা!" নন্দ কহিল "জমিদার মনিব বলেই কি এমন অন্যায় আবদার রাখ্‌তে হবে, তুমিই বলনা যে বাড়ীতে আমার বাপদাদা বাস করে গেচেন, সে বাড়ী কি শুধু মনিবের মুখের কথায়ই হাত ছাড়া করা যায়? দাঙ্গার কথা বলচ? সে জন্য আমার মোটেই ভয় নেই। প্রাণ ত একদিন যাবেই, না হয় দু'দিন আগেই যাবে, সে জন্য ভাবি না মণ্ডল দাদা"। মণ্ডল দাদা জিভ্ কাটিয়া কহিল "চুপ চুপ, ও কথা মুখে আনিস্ নে, বাবুর কাণে গেলে রক্ষেই থাক্‌বে না।" আরও কহিল "দেখ্ একটা কাজ কর্, মিছামিছি জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি? আমি বলি গত সনের খাজনাটা দেগে, আর ঐ বাড়ীটে, না হয় তার বাবদ কিছু নিবি, আমার কথা শোন্, তোর ভাল হবে নন্দ"। রান্না ঘরে কাজ করিতে করিতে নন্দর মা চেঁচাইয়া কহিল "ভালোয়ে আমাদের কাজ নেই মণ্ডলের পো, খাজনা আমি নিজে গিয়েই দিয়ে আস্‌ব, তা নিয়ে কোন ঝগড়া আমি করতে চাইনে, কিন্তু এই বাড়ীটে আমার সোয়ামীর চিহ্ন আমি কিছুতেই হাত ছাড়া করব না। নন্দ আমার একা বলেই ত বড় বাবু এমন সাহস করেচেন, না হলে নন্দর মতন পাঁচটা ছেলে থাকলে বড়বাবুও একথা মনে ভাব্‌তে পার্‌তেন না আর তোমরা পাঁচজনেও তাঁকে তালে নাচাতে পার্‌তে না।" মণ্ডল অগ্রসর হইয়া কহিল—"ও কি বলচ বৌ? আমরা কি তোমার শত্রু? তুমি ত জান না কিন্তু নন্দা জানে যে ওর জন্যে আমরা কত করচি, তবে কেন কড়া কথা বলে কষ্ট দিচ্ছ বৌ?" হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়া নন্দর মা কহিল, "কারুর মনে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে নেই মণ্ডলের পো, কিন্তু তোমরাই কি বড় ভাল করচ?" দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মণ্ডল দাদা কহিল "এর মানে?" "এর মানে আর তোমাকে বলে দিতে হবে না, তুমি নিজের জন হয়ে যে এত বড় শত্রুর কাজ করতে পারবে তাত স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন যদি দুটো কড়া কথাই না বলি তা হলে তাতে কষ্টেরই বা কি আছে আর লজ্জারই বা কি আছে?" মণ্ডল কহিল, "আমি শত্রু, কি বলচ বৌ!" নন্দর মা কহিল "শত্রু হ'লে ভয় ছিল না, কিন্তু তুমি যে ঘরের শত্রু বিভীষণ! আমি কি কিছু না জেনে শুনেই তোমাকে এ সব বলচি, আমি সবই জানি।" মণ্ডল দাদা উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিল "তবে তুমি আমাকেই চোর সাব্যস্ত করলে বৌ?" "আর সে কথা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চাইনে মণ্ডল, কিন্তু এই কথাটা মনে রেখো যে কাগজ পত্র চুরি গেলেও মায়ে পোয়ে বেঁচে থাক্‌তে এ বাড়ীতে কেউ পা ফেল্‌তেও পারবে না" বলিয়াই নন্দর মা গৃহ মধ্যে চলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ মণ্ডল দাদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "শুন্‌লি নন্দা তোর মা'র কথা, শেষে আমাকেই চোর বলে গালি দিলে বেটি ছোট লোকের মেয়ে—" তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া মণ্ডল দাদার মুখ চাপিয়া ধরিয়া নন্দ কহিল, "খবরদার মণ্ডল দাদা, মা বাপ তুলে কথা বলো না" হাত সরাইয়া দিয়া মণ্ডল দাদা কহিল "এত দেমাক্ ভাল নারে নন্দা, তোদের মরণ পাখা উঠেচে তা জানিস্?" নন্দ হাসিয়া কহিল "সে জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না মণ্ডল দাদা, মরণ পাখা উঠে থাকে ত পুড়ে মরব।"—"তাই মর্‌তে হবে" বলিয়া ক্রুদ্ধ মণ্ডল দাদা জমিদার বাড়ীর অভিমুখে চলিয়া গেল।

দিন তিনেক পরে একদিন গভীর রাত্রে সুপ্ত পুত্রকে ঠেলিয়া জাগাইয়া নন্দর মা কহিল "বাগানে গাছ কাটে কে রে?" দুই চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে নন্দ কহিল, "এই রাত দুপুরে কে গাছ কাট্‌তে এসেচে মা, তুমি ভুল শুনেচ।" নন্দর মা কহিল "ওরে নারে আমি নিজের কাণে স্পষ্ট শুনেচি." এমন সময় খট্‌খট্‌ করিয়া শব্দ হইল, নন্দ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "সড়্‌কি দাও মা, সব গাছ বুঝি সাবাড় করলে শালারা"! মাতা কহিল "সড়্‌কি নিয়ে কি করবি, বাতি নিয়ে যা, দেখ্‌গে কা'রা গাছ কাট্‌চে—বাবুর বাড়ীর লোক হ'লে নিষেধ করিস্‌, আগে কিছু বলিস্‌ নে যেন"। "তাই হবে মা, কিন্তু বিনে হাতিয়ারে ত যেতে পারব না" বলিয়া ঘরের কোণ হইতে দীর্ঘ শাণিত সড়্‌কিটা দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া অন্ধকারে নন্দ ঘরের বাহির হইয়া গেল। একমাত্র পুত্রকে রজনীর গভীর অন্ধকারে একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুর মুখে পাঠাইয়া দিয়া বিধবা একখানা শঙ্কা-ব্যাকুল-হৃদয় লইয়া দরোজার সম্মুখে বসিয়া রহিল; ঘণ্টা আধেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নন্দ কহিল, "তুমি সে দিন ঠিক্‌ই বলেছ মা, যে সব ঘরের শত্রু বিভীষণ, শেষে মণ্ডল দাদাই শত্রু হয়ে দাঁড়াল।" নন্দর মা কহিল "সে কি রে নন্দ?" নন্দ কহিল "মণ্ডল দাদা শুধু গাছ কাট্‌তেই আসে নি, আমাকে শুদ্ধ খুন্‌ করতে চেয়েছিল, এই দেখ বলিয়া নিজের কাঁধের উপরের গভীর ক্ষতটা দেখাইয়া দিল, রক্তাক্ত পুত্রের দিকে চাহিয়া মাতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ সর্ব্বনাশ কে করলে রে নন্দা?" বলিয়া কান্দিয়া ফেলিল, মায়ের মুখে হাত দিয়া নন্দ কহিল—"চুপ্‌ কর মা; চুপ্‌ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে দু'দিনেই সেরে যাবে" বলিয়া মাতার পায়েম কাছে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

দিন পনের পরে নন্দ সুস্থ হইলে একদিন বৈকালে কাস্তে হাতে করিয়া বাড়ীর অদূরে মাঠ্‌টার অভিমুখে চলিল, মাতা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাচ্ছিস্‌ রে?" নন্দ বলিল "দিন পনের ত শুয়েই রইলুম, ক্ষেত-খামার যে সব নষ্ট হয়ে গেল মা, ঐ পূবের ক্ষেতটা একটু দেখে আসব বলে ভাব্‌চি।" নন্দর মা কহিল "যাচ্ছিস্‌ ত সকাল করে ফিরে আসিস্‌।" "আচ্ছা" বলিয়া নন্দ চলিয়া গেল, তার পর ক্রমে দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইল, সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি গভীর হইয়া চলিল, তথাপি নন্দ বাড়ী ফিরিয়া আসিল না, মাতা উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে বাহিরে বসিয়া রহিল, কি যেন একটা অজ্ঞাত-আশঙ্কায় তাহার মাতৃ-হৃদয় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অলক্ষ্যে তাহার দুই চক্ষুঃ ছাপাইয়া জল আসিল, ক্রমে পল্লীর দীপালোক নিভিয়া গেল, কাল-আকাশের কোলে চাঁদ উঠিল—তথাপি নন্দ ফিরিল না! নন্দর বিধবা মাতা প্রাঙ্গনের তুলসী-বেদীমূলে বসিয়া যে পথে বৈকালে নন্দ চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথের উপর তাহার দুইটি উৎকণ্ঠিত, অশ্রু-ব্যাকুল চক্ষুঃ পাতিয়া বসিয়াই রহিল; সহসা আকাশ দিয়া এক ঝাঁক্‌ বন-হাঁস সারি বাঁধিয়া 'সোঁ, সোঁ' করিয়া উড়িয়া গেল, বিধবা চম্‌কিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল যেন নন্দ তাহাকে 'মা, মা' করিয়া ডাকিতেছে, যেন সমস্ত পল্লী ব্যাপিয়া সমগ্র আকাশ জুড়িয়া নন্দর কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিল,—বিধবা উন্মাদের মতন উঠিয়া সেই ক্ষেতের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা বাড়ীর কাছে একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া নন্দর মা সেই দিকে চলিল, সারারাত্র কান্দিয়া কান্দিয়া তাহার দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়াছে, সারা গায় ধূলাবালি মাখান উন্মাদিনী জননী পুত্রের অন্বেষণে বাহির হইল, কিছু দূর যাইয়া দেখিল 'পদ্ম পুকুরের' দক্ষিণ পাড়ে গ্রামশুদ্ধ লোক জড় হইয়াছে। পথে হালদার-বৌকে দেখিতে পাইয়া নন্দর মা জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি হয়েচে হাল্‌দার-বৌ?" হাল্‌দার-বৌ কোন কথা কহিল না, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। নন্দর মার উৎকণ্ঠার আর সীমা পরিসীমা রহিল না, পুকুর পাড়ে যাইয়া কোন রকমে ভিড়্‌ ঠেলিয়া চক্ষুঃ চাহিতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদূরে নন্দর রক্তাক্ত বিবর্ণ মৃত দেহটার উপর ছুটিয়া যাইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

* * * * *

"বড় বাবু—"

বড়বাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে ধূলি-ধূসরিতা ছিন্নবাসা বিধবা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিস্মিত বড়বাবু কহিলেন,—"কি চাও?" বিধবা কহিতে লাগিল "কিছু চাইতে আসিনি বড় বাবু, কিছু দিতেই এসেচি, যে বাড়ীর জন্য নন্দকে আমার খুন করলেন সেটা আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে গেলুম, বুড়াকর্ত্তা যে কাগজ

লিখে দিয়ে আমার সোয়ামীকে ঐ বাড়ীটে দিয়েছিলেন, সে কাগজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এই নিন্ সে কাগজ"। বলিয়া কাপড়ের এক খুঁট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বড়বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। পরে কহিল, "গত সনের ও চল্‌তি সনের খাজ্‌নাটাও এনেছি, নিন্" বলিয়া আর এক খুঁট্ হইতে গোটাকতক টাকা বাহির করিয়া নীচে রাখিয়া দিয়া কহিল, "তশিল্‌দারকে ডেকে টাকাটা জমা করে নিন্, শেষে যেন দায়িক হয়ে মরতে না হয়" বলিয়া বিধবা আঁচল দিয়া একবার চক্ষুঃ মুছিল। বড়বাবু বিবর্ণ-মুখে কহিলেন "ও বাড়ী তোমারই নন্দর মা, ও বাড়ীতে আমার প্রয়োজন নেই, আর এ টাকাও তুমি ফিরিয়ে নেও, তোমাকে আর কোন খাজ্‌না দিতে হবে না।" ঈষৎ হাসিয়া নন্দর মা কহিল "সে কি হয় বাবু, বনজঙ্গলে ভরা যে ছোট বাড়ীটের জন্য একটা মানুষ খুন করা যেতে পারে, সে বাড়ীটের যে কত দাম তাত মনেই করতে পারিনে, ও বাড়ী যার ছিল তাকেই যখন থাক্‌তে দিলেন না, তখন আমিই বা ও বাড়ী নিয়ে কি করব? তাই আপনার জিনিস আপনাকেই দিয়ে গেলুম" বলিয়া নন্দর মা ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তারপর একমাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন জমিদার বাড়ীতে সহসা কান্নার রোল উঠিল, বড়বাবুর পাঁচ বৎসরের পুত্র খোকাবাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকে লোক ছুটিল কিন্তু কোথাও খোকাবাবুর সাক্ষাৎ মিলিল না। অন্দরে জমিদার গৃহিনী কান্দিয়া আকুল। দিন কাটিয়া সন্ধ্যা আসিল, বড়বাবু বিষণ্ণ-মনে বাড়ীর সম্মুখ গ্রাম্য রাস্তা দিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক-ভাবে হাটিতে হাটিতে বড়বাবু অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে 'পদ্মপুকুরের' সু-উচ্চ পাড় দেখা দিল, বড়বাবু শিহরিয়া উঠিয়া ফিরিতেই শুনি-লেন,—"বড়বাবু"। ফিরিয়া দেখিলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে উন্মাদিনী নন্দর মা দাঁড়াইয়া আছে, নন্দর মা কহিল "বাড়ী ফিরে যান্ বড়বাবু খালি বুকে কত দিন থাকা যায় বলুন দেখি? বুকের ধন কেড়ে নিয়ে আমার বুক একেবারে খালি করে দিয়েচেন, এই একটা মাস বড় কষ্টেই কাটিয়েচি, কিন্তু আর পারচিনে বলেই আপনার বুকের ধন নিয়ে গেলুম, যদি ওকে বুকে চেপে এ জ্বালা জুড়োতে পারি এই আশায়, আপনার আরও আছে কিন্তু আমার যে আর নেই যে মা বলে ডাকবে বড়বাবু." বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে উন্মাদিনী বনমধ্যে অদৃশ্যা হইল, "দরোয়ান—দরোয়ান" বলিয়া চীৎ-কার করিয়া বড়বাবু পথের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

ভারতী-গাথা

নন্দন বনে আনন্দ বিলায়ে
　　রাণী বুঝি ওই আসে গো,
পরশ পাইয়া শীত নিরদয়
　　পালাইছে দূরে ত্রাসে গো,

কনক কান্তি জিনিয়া শোণ
　　পরমানন্দে হাসে গো,
হরিৎ উর্ম্মি-ছুটিছে তূর্ণ
　　সবুজে বিশ্ব ভাসে গো;

চূত-লতিকা মুকুল-স্মিতা
　　কাঁপিছে ধীর সমীরে,
গর্ব্বী বাবরী হাসে লহুলহু
　　বুকে ধরি মধু মদিরে;

অলিনী সহ গুঞ্জরি অলি
　　ঢলি ঢলি পড়ে কমলে
কুঞ্জ কাননে মুগ্ধ কোকিল
　　কুহুরি কাঁপায়ে অচলে;

দীর্ণ করিয়া সুষমা বক্ষ
　　মূর্ত্তি ধরিয়া এল কে?
হস্তে শোভিছে অমর বীণ
　　শুভ্র কান্তি ভূলোকে;

চেলাঞ্চলে কমলকান্তি
আস্তে হাস্য বিধুর,
ছিন্নি জড়তা 'ও'কার' ধ্বনি
করিছে প্রকৃতি মধুর ;
অর্ঘ্য লইয়া কোবিদ বর্গ
মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া

'মা নিষাদ' শক্তি জাগিয়া
লয়েছে দেবীরে বরিয়া ;
চান্দ্র রজনী চন্দন বায়ু
পিক বধুর কূজন,
দিতেছে ঢালি পীযূষ ধারা,
দেবীর পূজার কারণ।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী

সামাজিক যৎকিঞ্চিৎ

যেমন সঞ্চয় আর ক্ষয়—এই লইয়াই জীবনের বিকাশ তেমনি সঞ্চয় আর ক্ষয়ের ভিতর দিয়াই সমাজের উন্নতি। এই ক্ষয় আর সঞ্চয়টা আজ পর্য্যন্ত কেহ থামাকা করে নাই Circumstances অথবা ঘটনা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই মানুষ কখনো একটা জিনিস গ্রহণ করে আবার তাহা ত্যাগও করে। আজ আমাদের সমাজে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা কেবল মানুষের ইচ্ছায় হইতেছে তাহা নয়—ঘটনা তাহার মূল কারণ, কাজেই আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার আইন কানুন—যেমন পূর্ব্বে ছিল আজ তেমন নাই—থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে যখন আমাদের চিন্তার কারবার সুরু হইয়াছে—তখন আর আমাদের পক্ষে আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া থাকিবার উপায় নাই। যতদিন ভারতবর্ষ শুধু কেবল নিজের দেশের সীমার মধ্যে ছিল—ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সব রকমের বিধি নিষেধ চলিয়াছে কারণ বাহিরের সমস্যার সহিত তাহাকে কার্য্য করিতে হয় নাই। আজকের দিনে সেকেলে সব আইন চলিবে না। গ্রামের ছেলে যতদিন গ্রামের মধ্যে থাকে ততদিন সে গ্রামের প্রচলিত ধরণে কোঁচার খুঁট গায় দিয়া বেড়ায়—কিন্তু সহরে আসিলে সে চাল চলে না। সেই রকম আজ ভারতবর্ষ—সমস্ত জগতের সম্মুখে বাহির হইয়াছে—এখন তাহাকে কতকটা স্বতন্ত্র চালে চলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি যতই কঠিন হউক্—সে আপত্তির গুমর ভাঙ্গিবেই। আজ যখন আমরা পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভিড়িয়াছি—তখন যতই কেননা, সংস্কৃত বুলি আওড়াই—তবু জীবনের দায়ে ছ'কদম, ইংরাজি শিখিতে হইবে—সেই সঙ্গে ম্লেচ্ছ-ভাষাকে, গঙ্গাজলে স্নান করিয়াও ওষ্ঠপুটে সযত্নে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিতে হইবে। কোন জিনিষ ব্যবহার করিতে গেলেই তাহার প্রভাবের বশ্যতা অল্প বিস্তর স্বীকার করিতে হইবে—না করিয়া উপায় নাই। সুবুদ্ধির লোক তাহারাই, যাহারা ব্যবহার্য্য-বস্তুকে কাজে লাগাইবার মত ব্যবহার করে—বাজে পয়সা নষ্ট করিবার জন্য নহে। হ্যাটের যখন আমদানি হইয়াছে—তখন মাঝে মাঝে উহা গোলামীর জন্যই হউক আর সেলামীর জন্যই হউক, উহাকে গর্দ্দভের টুপি বলিয়া—দুই শতবার গালি দিলেও কাজের দায়ে তাহা শিরে ধারণ করিতেই হইবে।

পাশ্চাত্য ভাবকে, আমরা সকলেই অল্প বিস্তর স্বীকার করিয়াছি—কিন্তু নিতান্তই বেয়াড়াভাবে অর্থাৎ আমরা যেটুকু বিলাতী ভাব লইয়াছি তাহা আমাদের উপর অনুকরণের সর্ব্বনেশে ভূতের মত চাপিয়াছে এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদের কেবলি বিব্রত করিতেছে। মধু জিনিষটা ভাল যদি তাহার চাকের ভিতর হইতে মধু সংগ্রহ করিতে পারি। অধিকাংশ সময় আমরা কম্বল মুড়ি দিয়া মৌমাছির চাকে লাঠি দিয়া গুঁতা দেই—আর যেমি মৌমাছির দল, আমাদের নাকে মুখে দু'চারিটা হুল বসাইয়া দেয়, অমনি আমরা সট্‌কাই হয়ত গাছ হইতে পড়িয়া হাত পাও মট্‌কাই ; ফলে মধুটা চাকেই থাকিয়া যায়—জ্বালাটাই হয় আমাদের প্রাপ্য। পাশ্চাত্য-সভ্যতার মৌচাকের মধুর স্বাদ পাইয়াছি

আমরা কিন্তু তাহা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় তাহা শিখি নাই। শিক্ষা করিতে গেলে যে সব ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তজ্জন্য আমরা লেশমাত্র প্রস্তুত নহি—অথচ মধুর লোভটুকুও ছাড়িতে পারি নাই।

স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা মূল্য আছে তাহা যাঁহারা স্বীকার করেন না—তাঁহারা আর যাই করুন অন্ততঃ যুক্তির ধার ধারেন না। অথচ বর্ত্তমান সভ্যতার যুগ, যুক্তির যুগ, তর্কের যুগ—চোক্ বন্ধ করিয়া ছাগলকে কুকুর ভাবিবার যুগ নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল; কিন্তু যে দেশে স্ত্রীরা জন্মাবধি, কেবল মুখ বুজিয়া—ঘাড় গুঁজিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর হিতোপদেশ—সেই সঙ্গে বাক্যশ্লেষ সহ্য করিয়া আসিয়াছে—বাড়ীর সকলের উদর পূজার অর্ঘ্য তৈয়ারি করিয়া বেলা একটা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া ঠাণ্ডা ভাত খাইতে শিখিয়াছে - লঙ্কা হলুদ নোড়ায় শীলে বাঁটিতে শিখিয়াছে—ভাসুরকে দেখিয়াও মুখে ঘোম্‌টা দিতে শিখিয়াছে সেই দেশের মেয়েদের হঠাৎ যদি মেম করিয়া তুলিবার সংকল্প করা হয় তাহা হইলে তাহারা—"যা ছিল শুয়ে বসে তাও সারালে বগ্নি এসে" কথাটারই সত্য পদে পদে প্রমাণ করিতে বসিয়া যাইবে। পাখীকে পিঞ্জরে রাখা নিশ্চয়ই অন্যায়—কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে দুর্ব্বল ডানা লইয়া হঠাৎ পিঞ্জরের বাহির করাইয়া কাক চিলের ঠোক্কর খাওয়াইয়াও কোন লাভ নাই—অন্ততঃ তাহা ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে কি পাখীকে খাঁচায় রাখাই শ্রেয়? যদি তাহাকে ঘরের মধ্যে সামান্য সামান্য মুক্তি না দিয়া হঠাৎ বাজারে ছাড়, তাহা হইলে তাহাকে শুধু পিঞ্জর হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে না—ভবলোক হইতেও সে মুক্তি পাইবে। শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দানের একটা গৌরব সকলেই মনে মনে অনুভব করে। কাজেই যাহারা মেয়েদের স্বাধীনতা দিবার পক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল। উদ্দেশ্য ভাল হইলেই যে ফল ভাল হয় সেটা সব সময় ঠিক নয়। বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—কোন এক অধ্যাপক ছাত্র কি একটা ইংরাজি রচনায় ভুল করিয়াছিল বলিয়া ভ্রম-সংশোধনের মহদুদ্দেশ্যে তাহার গালে বেশ গর্জ্জনসই একটি চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, যে তাহার ফলে ছাত্রটির জীবন তৎক্ষণাৎ সংশোধন হইয়া গেল, অর্থাৎ সকল ভ্রমের পারে পরলোকে গিয়া উপস্থিত হইল। কাজেই উদ্দেশ্য ভাল ভাবিয়া যাঁহারা হঠাৎ হিন্দু-স্ত্রীদের হাওয়া-গাড়ীতে হাওয়া খাওয়াইবেন—তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহার নজির না দেখাইয়া এই পর্য্যন্ত বলাই বোধ হয় শ্রেয় যে—সে ফল সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে না।

সমাজের কল্যাণের জন্য পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েই দায়ী। কাজেই উভয়ের অধিকার সম থাকাই শ্রেয়। স্খলনটা পুরুষের তরফ হইতে কেন মহা কলঙ্কের কথা নয় এ কথার জবাব দেওয়া শক্ত। যাঁহারা বলেন পুরুষ জোয়াল তার একটুখানি দৌড় বেশী—তাঁহাদের কথায় মূল্য থাকিলেও যে সে মূল্য যুক্তির অবতারণা করে সে যুক্তি অবশ্যই বরণীয় নহে। "জোর যার মুল্লুক তার" এই ভাবকে এক সময় সব দেশেই পূজা করা হইয়াছে—অধুনা অনেকেই জোরের অসদ্ব্যবহার করেন—কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের নিন্দা সম্মুখে এবং আড়ালে অহরহই হইতেছে। ইংরাজীতেই একটা কথা আছে "It is good to have a giant's strength but it is bad to use it like a giant" অর্থাৎ দেহে দানবীয় শক্তি থাকাই ভাল কিন্তু ঐ শক্তিকে দানবের ন্যায় ব্যবহার করাটাই অন্যায়"। কাজেই অসম অধিকারের দিন চলিয়া যাইতেছে—সম অধিকারের দিন আসিতেছে। আমাদের সে জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্মুখের আহ্বানকে গ্রহণ করিতে হইবে—বিচার-পূর্ব্বক তাহা হইতে যাহা আত্মার কল্যাণ বিধান করে তাহা বাছিয়া লইয়া অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

স্বীকার করিয়া লইলাম নূতনের আহ্বানের মধ্যে একটা মাদকতা একটা মোহ আছে সেই জন্য তাহা বরণ করিলে আমাদের সমাজে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনা বেশী; কিন্তু ইহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব যে পুরাতনটার মোহ নাই। হইতে পারে সেই মোহের মধ্যে নাই মাদকতা—কিন্তু স্থবীরের জীর্ণতা ও জড়তা তো আছে। কাজেই বিছানায় কোঁকাইয়া মরার চেয়ে বীরের মত সমস্যা-সংগ্রামে মৃত্যু-বরণ করাই শ্রেয়।

যতই তর্ক করি আর যতই তিথি নক্ষত্র গুণি তথাপি মকর্দ্দমার তারিখে যেমন আদালতে যাইতেই হয় তেম্নি—যাই বলিনা কেন—আমরা সেকালের ভাবে চলিব তবু এ কালের আদালতে হাজিরি দিতে হইবে—নচেৎ যুগ-ধর্ম্মের পেয়াদা কাণে ডলা দিবে—সে ডলা যে মিষ্টি তাহা নয়।

এতক্ষণ পরে আমরা যুগ-ধর্ম্ম কথাটার সোপানে আসিয়া ঠেকিয়াছি। এই সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়া বিদায় লইব।

এই যুগের ধর্ম্মই মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া—যে সে কেবল পরের হুকুম পালন করিবার জন্য জন্ম লয় নাই—তাহার নিজেরও চিন্তা করিবার ভালমন্দ বিচার করিবার একটা অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে। সেই জন্যই, আজ ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে—পৈতা ধারণ করিলে কিংবা উত্তম রকমের শিখা রাখিলে সমাজে কোন সম্মান নাই দক্ষিণা লাভেরও সম্ভাবনা নাই যদি—সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্য না থাকে। তাই অনেক ব্রাহ্মণ, কুল-কৌলিন্যের মর্য্যাদার মিথ্যা অহঙ্কার ছাড়িয়া দিয়া—চর্ম্মকারের ব্যবসায়—অর্থাৎ জুতা বিক্রয়ের দোকান খুলিতে বসিয়া গিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দেখিব উচ্চবর্ণ সম্প্রদায় স্বহস্তে জুতা তৈয়ারিও করিয়াছে। এই হিসাবে, কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, চণ্ডাল ও নমঃশূদ্র কেহই আর নিজের নিজের ব্যবসায় আর তেমন মনোযোগী নহে। হইয়া লাভ ত নাই—বরং ক্ষতিই আছে। শূদ্র যখন দেখিতেছে—ব্রাহ্মণ পূজাকর্ম্ম জ্ঞানদান ও জ্ঞান চর্চ্চার কার্য্য ছাড়িয়া জুতার দোকান খুলিতেছে তখন স্বভাবতই শূদ্র আর নিজের মাথাকে, ব্রাহ্মণের চরণ তলের ধূলিরক্ষণের পাত্র ভাবিতে পারে না। নমঃশূদ্র যখন ডিপুটি হইয়া আদালতে হাকীম হইল—শাস্ত্রে যাই থাক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরও মকর্দ্দমার দায়ে সেই নমঃশূদ্রের সামনে হুজুর বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে সেখানে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বের ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিবার মত অবস্থা এখন নাই। এখনকার ব্যবস্থা এখনকার মতই হইবে। এখন মানুষ অন্তত ইহা বেশ বুঝিতে সুরু করিয়াছে যে স্বাধীন মতে কার্য্য করাই শ্রেয়—না ভাবিয়া কার্য্য করা উচিত নয়। এখনকার যুগে দেশে অর্থের মূল্য কমিয়া গিয়াছে কাজেই সেকালে যিনি পঞ্চাশ টাকার আয়ে ধনী ছিলেন, এখন তিনি পঞ্চাশ টাকার আয়ে গরীব। এখন মানুষের কার্য্যক্ষেত্রের ব্যবস্থা মানুষের শক্তির উপর নির্ভর করে—বংশ গৌরব বা জন্ম মর্য্যাদায় নহে। আজ সহরে সহরে মুচিও হয়ত অবাধ জল পান বিক্রয় করিতেছে এবং শত শত ব্রাহ্মণ তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে খরিদ করিয়া খাইতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মণের কোনই ক্ষতি হইতেছে না। জাতি বিচারের আইন কানুন মাত্র এখন বিবাহাদি কাজে কর্ম্মে কোন রকমে লক্ষ্য করা হয়—তাহাও নিতান্ত, গুরুজনের সামনে, নলচে আড়াল দিয়া তামাক টানিবার মত। বস্তুত পক্ষে, মৌখিক তর্কের প্রবল ঘটার জারি জুরির আস্ফালন অগ্রাহ্য করিয়াই জাতিভেদের গ্রন্থি দিনের পর দিন শিথিল হইতে চলিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে, হয়ত এই জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে। এই ভেদ-জ্ঞানের তিমির রজনীর অবসানের শুভলগ্ন আগত প্রায়—কারণ, এখন সমাজনেতাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়াই শূদ্রেরা ত বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষাই মানুষকে জ্ঞান দেয়। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ পরের এবং নিজের অজ্ঞানশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করে। বর্ত্তমান যুগ শুধু ভারতবর্ষে নয়—পৃথিবীর সকল শিক্ষিত তথা কথিত সভ্য জাতির মধ্যে, নূতন চিন্তার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। কালে কালে সর্ব্বদেশের সর্ব্ব সমাজে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই—মানুষের সেই সঙ্গে সম জের ক্রম বিকাশ।

কেহ কেহ বলেন, ভারতে—ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্রে, ব্যক্তি স্বাধীনতার বাধা কোন দিন নাই। এ কথা তর্কের পৈঠায় হয় ত সত্য। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্মটাও গতানুগতিক। ধর্ম্মরাজ্যে, অন্তত, অশিক্ষিত মহলে দেব দেবীর করুণার প্রতি আমাদের অনেকের বিশ্বাস কম—পক্ষান্তরে, তাঁহাদের অর্থাৎ দেব দেবীর শাস্তির প্রতি আমাদের ভয়টা বেশী। মায়ের পূজার সময় বলির পাঁঠার গলা এক কোপে না কাটিলে, গৃহস্থের মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়—পাছে মায়ের ক্রোধে গৃহস্থের ঘরে মড়কের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এ কথার ব্যাখ্যা যাই থাক, অন্তত এই আতঙ্কটা মিথ্যা নয়। অর্থের দায়ে গৃহস্থ জীর্ণ ছেঁড়া কাপড় পরিয়াও বার মাসে তের পার্ব্বণ তাহাকে করিতে হয় পাছে অমঙ্গল ঘটে। বুঝিতাম গৃহস্থ, ভক্তির আনন্দে দেব পূজায় অর্থ ব্যয় করিতেছে—তাহাকে মাথা নত করিয়া পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া নম্রচিত্তে স্বীকার করিয়া লইতাম। অধিকাংশ সময়েই পূজাদি কাজ কর্ম্ম একটা সমাজিক ঠাটে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি মানুষের এই অবিশ্বাস কিম্বা ধর্ম্মের এই ব্যভিচার—হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়েই বাদ নাই।

সমস্ত দিকের এই অসত্যাচরণের ভিতর হইতেই—মুক্তি লাভের জন্য, বর্ত্তমান যুগের আহ্বান আসিয়াছে।

এই আহ্বানের ধ্বনি—অর্দ্ধসুপ্তদের কাণে প্রলয়ের রণ-ভেরীর ন্যায় বাজিয়াছে—যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের কাণে জয়শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি রূপে বাজিয়াছে। আমরা—যাহারা নাক কাণ চোক বুজিয়া আছি তাহাদের কাণে ঐ ধ্বনি, আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে।

পরিবর্ত্তনের প্রথম অবস্থায় একটু বিশৃঙ্খলা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই হয়। একটা বাড়ী হইতে অন্য একটা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাই, জিনিষ পত্র অগোছাল হইয়া পড়ে,—এমন কি দু চারিটা জিনিষ হারাইয়াও যায়। কাজেই সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতগুলি ব্যভিচার এবং কিছু বিপ্লব ঘটিবেই। এই বিপ্লবের ভয়ে কোণে সরিয়া দাঁড়াইলে, কিম্বা ঘরে দরজায় খিল দিলে কোন ফল নাই। বুকের পাটা শক্ত করিয়া বিপ্লবের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়াই কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সাবেকি ঠাট যখন আর ঠিক চলিবেনা—তখন একালের অবস্থাকে কল্যাণে ব্যবস্থিত করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিপদ হইতে এড়ান যায় না—বিপদের সঙ্গে বুক ঠুকিয়া যুদ্ধ করিলেই বিপদের ঝাঁজ কমিয়া আসে—দমিয়া আসে। যাহা ভাল তাহাই বরণীয় এটা সনাতন সত্য। অবশ্য ভাল মন্দের চেহারা কালে কালে বদলাইয়া যায়। যেমন সেকালের স্বয়ংবর প্রথা একালে মন্দ, অর্থাৎ একালে মেয়ে স্বামী পছন্দ করিতে চাহিলেই সমাজে সে ধৃষ্টা, হয় ত পরবর্ত্তী কালে পুনরায় মেয়ের পক্ষে স্বামী, এবং স্বামীর পক্ষে স্ত্রী পছন্দ করিয়া লওয়াই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। যাহা সত্য, যাহা সনাতন, তাহা চির অমর। বিকৃত হিন্দুত্বের অসার আইন তাহাকে চাপা দিয়া মারিবার চেষ্টা করিলেও তাহা মরিবে না। কিম্বা উচ্ছৃঙ্খল নব্য ভাবের নূতন ব্যাখ্যাতেও তাহার অর্থ বদলাইবে না। পরিবর্ত্তনটা এক কথায় অসত্যের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা। বিদ্রোহ ব্যাপারটার প্রত্যেক কার্য্যই যে মঙ্গল বিধান করে অবশ্য এ কথা সত্য নয়। বিদ্রোহ জিনিষটা ক্ষণিক একটা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেও ভবিষ্যতের জন্য বিদ্রোহ কল্যাণ বিধান করে সমাজের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সদ্‌গুণ কি, কিম্বা বদ্‌গুণ কি তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। সুতরাং এ প্রবন্ধে সমাজ বিদ্রোহের কথাই আলোচিত হইল।

আমাদের সমাজে বর্ত্তমান যুগে—মেয়েদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একটা আলোচনা সুরু হইয়াছে। সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে রামের প্রজা মহলে যে সন্দেহ মিশ্রিত কানাঘুসা আলোচনা সুরু হইয়াছিল, তাহার মূলে একটা সন্দেহ ছিল। সে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না তত্রাচ কর্ত্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া ছিলেন। সীতাকে বনে পাঠাইয়া তিনি, কোন আদর্শকে বড় করিলেন—আর কোন আদর্শকেই বা ছোট করিলেন সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। অন্তত এটা ঠিক যে তিনি আলোচনার জিদ্ বজায় রাখিয়া ছিলেন। আমাদের সমাজে এই যে নূতন আলোচনা উঠিয়াছে—তাহার মূলে কারণ আছে। অকারণ একটা আলোচনা উঠে না। মেয়েদের প্রতি আমাদের শাসনটা স্নেহময় না হইয়া অনেকটা লৌহময় হইয়া উঠিয়াছে—এ কথার প্রতিবাদ, গলাবাজির সাহায্যে করা যাইতে পারে;—যে হেতু পুরাণ ঘাঁটিতে গেলে সাকার উপাসনার নিদর্শন এবং যুক্তি অনেক মিলিবে,—তবু তাহাতে এই প্রতিবাদের নজির মিলিবে না। সমাজে আমরা কথায় কথায় সতী সাবিত্রী লইয়া, বধূবর্গকে নাটক লিখিয়া উপন্যাস লিখিয়া উপদেশ দিতে বসিয়া যাই ভুলেও একবার মনে হয়না, যে সত্যবান, আর রাম চন্দ্রের পদ-নখের যোগ্যও যুবক একালে মিলে না। বলা বাহুল্য আমার এই কথার অর্থ ইহা নহে যে,—যেহেতু পুরুষেরা একটু উচ্ছৃঙ্খল সেই জন্য রমণীরাও "ততৈবচ" হউক। পক্ষান্তরে আমার বক্তব্য এই যে সামাজিক শাসনটা এবং পবিত্রটাও যেন পুরুষের ক্ষেত্রে অবহেলার বিষয় না হয়।

বাংলা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র গুজরাট উত্তর পশ্চিমের অধিবাসিগণকে নিজেদের সঙ্গে সনাক্ত করিয়া "আমরা ভারতবাসী" এই বলিয়া গৌরব করেন। এমন কি, ওই সমস্ত দেশের অতীত ইতিহাসে পরিচিতা রমণীদের অতুলনীয়, কীর্ত্তি গুলি বাংলা মুলুকের বড় বড় লেখকেরা বহি আকারে প্রকাশ করিয়া সেই আদর্শে বঙ্গ মহিলাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে—আমরা আমাদের বাঙ্গালিনীদের চরিত্র মহিমা চাই রাজপুতানীদের মত—অথচ তাহাদের সামাজিক স্বাধীনতা কোন দিনই রাজপুতানীদের মত দিতে চাই না। কাজেই পুরাণ আখ্যানের

সতী-সাবিত্রী গৃহস্থ জীবনের আদর্শ না হইয়া বর্ত্তমান বাংলার রঙ্গমঞ্চে খোস খেয়ালের রঞ্জনের মোহিনী অভিনেত্রী হইয়া উঠিয়াছে। সত্য যখন এই রকম ভাবে—পদে পদে লাঞ্ছিত হয় তখনই ঘরে বাইরে নানা রকম আলোচনা উঠে। কাজেই এই ন্যায় আলোচনাকে,—পুঁথি দেখাইয়া—কিম্বা "নব্য রসের ব্যভিচার" বলিয়া—উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে—সে চেষ্টাকে অত্যন্ত জঘন্য ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। বাঙ্গালী মেয়েদের উপর অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশের মহিলাদের গুণ সকল আরোপ করিলেই যে তাহারা সেই সেই প্রদেশের রমণীদের মত গুণশালিনী হইয়া যাইবে—এত বড় একটা আশা নিশ্চয়ই জাগ্রত অবস্থায় করা চলে না।

আমাদের আশা এবং ভরসা দুইটাই কাগজে এবং কলমে চলে বলিয়া—সংসারে না হোক উপন্যাসে এবং নাটকে সীতা-সাবিত্রীর ছড়াছড়ি হইতেছে। এই সকল সতীদের আসন পুরাকালে, এমনকি এদেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হইবার বহুপূর্ব্বে কোন স্বর্গে ছিল জানিনা—আপাতত ইহাদের আসন রঙ্গমঞ্চের নৃত্য গীতে, এবং পুষ্পমাল্যের সৌখীন-শয্যায়। অধঃপতন আর কাহাকে বলিব। এই অধঃপতনের জন্য নব্য সম্প্রদায় কেবল দায়ী নহে—দায়ী, সেকেলে সমাজনেতারাও।

মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া মানে—মেম সাহেব, কিম্বা পরী রাজ্যের বিবি তৈরি করা এ কথা মিথ্যা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মহিলারা পর্দ্দানশিনা নহেন—তাই বলিয়া তাঁহারা "বিবি" কিম্বা "মেম" সাহেব আখ্যা পাইবার মত নহেন। মহারাষ্ট্রী কিম্বা রাজপুতনার মেয়েদের গৌরবে—আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলার মেয়েরা সেই দিনই গৌরব অনুভব করিতে পারিবে যেদিনত াহাদের সমাজ জীবনের চতুর্দ্দিকে মুক্তির উদার হাওয়া বহিবে, যে দিন তাহারা ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের, মহিলাদের মত স্বাধীনতা লাভ করিবে। "ঘরে বাইরের" বিমলার চরিত্র দেখিয়া—সামাজিক নেতারা—তার স্বরে চিৎকার করিতেছেন—"স্ত্রী-স্বামীর সহধর্ম্মিণী," বিমলার মত বিপথগামিনী নহে। স্ত্রী যদি স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণী হয়, তাহাতে যদি কিছু আপত্তি করার থাকে সে আপত্তি স্বামীদের তরফ হইতে উঠিবে। কারণ, সম অধিকারিণী না হইলে সহধর্ম্মিণী হইতে পারে না। ধর্ম্ম জিনিষটা কোন দিনই abstaction নয়। কর্ম্মের সঙ্গেই তাহার যোগ। কোন স্ত্রী কবি লিখিয়াছেন—

"জীবনটিত নরক শুধু
ফুলের মত ফোটা
ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার
যুক্ত থাকে বোঁটা।"

জীবনের বিকাশ হাওয়ার ভিতর দিয়া হয় না—হয় প্রতি দিনের কর্ম্মের ভিতর দিয়া। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ধর্ম্মের সাম্য সেই খানেই পূর্ণ সেই খানেই সত্য—যেখানে তাহাদের উভয়ের কর্ম্মের মধ্যে সম অধিকার থাকিবে। দেবতার মত ক্ষমাশীল স্বামীকে, তেমন ভাবে না আঁকড়িয়া ধরিয়া—অন্য একজন, যৌবনে তরল যুবকের প্রতি মনে মনে অগ্রসর হইয়া বিমলা, যে খুব ন্যায় সঙ্গত কার্য্য করেন নাই—এটা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বর্গের—অকারণ হায় হায় রোদনের বহুপূর্ব্বেই ঘরে বাইরের লেখক নিজেই কবুল করিয়াছেন—প্রমাণ, বিমলা শেষটায় ন্যায়ের পথে ফিরিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যেদেশে উপন্যাসের, নিখিলেশ বিমলাকে অধঃপাতে যাইতে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া সমাজের মান্যবরেরা চটিয়া আগুন —সেই দেশেই জীবন্ত সমাজে—পুরুষের ব্যভিচার, অবাধ।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে অন্তত ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশের পুরুষেরা যুক্তি এবং তর্কের সদর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া কেবল প্রাণহীন অভ্যাসের দাসত্বের কাছে আত্ম বেচিয়া ফেলিয়াছে।

সমাজের সংস্কার যাহা নিতান্ত আবশ্যক—তাহা না করিয়া সমাজ নেতারা সাহিত্যের সংস্কার সুরু করিয়া দিয়াছেন। এতদিন জানিতাম—"সাহিত্য" সাহিত্যই, তাহার গতি স্বতন্ত্র। আজ শুনিতেছি—সাহিত্য নাকি সমাজের শিক্ষা গুরু। কথাটা অপ্রিয় তবু সত্য যে, "বিদ্যাসুন্দর," "মেঘ দূত" "কুমার সম্ভব" এই সব সাহিত্যে, সাহিত্যের সম্পদই আছে—বাকি যা আছে তাহা সমাজে অনুকরণীয় নহে। যাক্—সাহিত্য বিচারের জন্য এ প্রবন্ধ নহে। মোটের উপর—ইহাই প্রমাণ হইল যে, আমরা, রক্ষণশীলতারও অপটু—আর পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেও দুর্ব্বল।

শেষ কথা, হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন হিন্দুত্বের সনাতন আদর্শ এবং সনাতন ধরণেই হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশুষ্ক গোলাপ ফুলকে তাজা এবং সুন্দর গোলাপ ফুল করাই শ্রেয়ঃ যদি সম্ভব হয়। গোলাপকে, গাঁদা কিম্বা গাঁদাকে গোলাপ করিতে যাওয়া, বিড়ম্বনা।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রামায়ণের সমসাময়িক ভারতবর্ষ।

(৫ম বর্ষ মালঞ্চের ৫৭৭ পৃষ্ঠার পরে)

প্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা।

আধুনিক অনেক শিক্ষাভিমানী হিন্দু সন্তানও মনে করেন, যে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা দর্শনাদি বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও জড়বিজ্ঞানে তাহারা একান্তই অজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে তাঁহাদের এই বিশ্বাস কিরূপ ভিত্তিহীন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া প্রচলিত উপাখ্যান বা ঠানদিদির গল্প হইতেই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সূর্য্য কিরণে সমুদ্রবারি বাষ্পীভূত হইয়া প্রথমে বায়ুমণ্ডলকে আর্দ্র করিয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ আকাশের বায়ুরাশি পূর্ণাসিক্ত করিয়া শেষে মেঘের সৃষ্টি করে। এই তত্ত্বটি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগেরই উদ্ভাবিত বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার পার্শ্ববর্ত্তী "মাল্যবান" পর্ব্বতে যখন শ্রীরামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়ে তিনি বর্ষাগমে একদিন লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—ভাই লক্ষ্মণ!

"সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরি সন্নিভৈঃ॥
নবমাস ধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্॥"

(কিষ্কিন্ধ্যা ২৮ সর্গ)

অর্থাৎ "দেখ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘে নভোমণ্ডল সমাবৃত হইতেছে। দ্যৌঃ (আকাশ) কার্ত্তিক মাস হইতে ক্রমাগত নয় মাস পর্য্যন্ত (আষাঢ় পর্য্যন্ত) সূর্য্যের কিরণ দ্বারা সমুদ্ররস (জল) পান করিয়া এত দিন তাহা স্বীয় গর্ভে রাখিয়া এখন (শ্রাবণ মাসে) মেঘরূপে তাহা প্রকাশ করিতেছে।" রামায়ণের এই উক্তি দেখিয়াও কি কেহ মনে করিতে পারেন যে "ইন্দ্রের ঐরাবত শুঁড় দিয়া নদী সমুদ্রাদি হইতে জল শোষণ করিয়া সময়ে তাহা ছড়াইয়া দিয়া বৃষ্টিপাত করে?" ঠানদিদিদের এই গল্পই হিন্দুর বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় নয়। জ্যোতিঃশাস্ত্রে "বৃষ্টি গণনা" সম্বন্ধে একটী অধ্যায় আছে। তাহাতে অগ্রহায়ণাদি মাস হইতে আকাশে সঞ্চিত দৃশ্যমান মেঘ দেখিয়া কোন্ মাসের কোন্ তারিখে ঐ মেঘ বৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইবে তাহা নির্ণয় করিবার নিয়ম আছে। মেঘ দর্শনের দিন হইতে ঐ মেঘ বর্ষণের দিন পর্য্যন্ত সময়কে মেঘের গর্ভকাল বলা হয়।

চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি তত্ত্ব এবং জোয়ার ভাটার কারণও রামায়ণের সমকালবর্ত্তী হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে আলোকশূন্য জড়পিণ্ড, সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াই তাহা আলোকিত হয় এ তত্ত্বও হিন্দুরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে শিক্ষা করেন নাই। সুন্দর কাণ্ডের ৫ম. সর্গের প্রথম কয়েকটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, "হনুমান যে সময়ে রাবণান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে চন্দ্র সূর্য্য কিরণ সংসর্গে প্রকাশিত হইয়া গোষ্ঠ মধ্যস্থ মত্ত বৃষের ন্যায় আকাশ গোষ্ঠের তারাবলীরূপ গাভী মধ্যে যেন বিচরণ করিতেছিল। তাহার প্রভাবে সমুদ্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সূর্য্য কিরণে চন্দ্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় কলঙ্ক চিহ্নগুলি বিশেষভাবে প্রকাশিত হইল।" অন্যত্র উত্তর কাণ্ডের ২৬শ সর্গে) রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

"স ভূর্ণং পাতিতস্তেন রাবণঃ শক্র কেতুবৎ।
তদা স নৃপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদ্গত বলো বভৌ॥
সকলেন্দু কলাঃ পৃষ্ট্বা যথাম্বুণবণাম্ভসঃ॥"

(৩৯—৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ "যখন মান্ধাতার প্রভাবে রাবণ রাজা ইন্দ্রধ্বজ পতনের মত ভূতলে পতিত হইলেন, তখন লবণ-সমুদ্রের জল রাশি যেমন পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ সংস্পর্শে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, মহারাজা মান্ধাতাও তেমনি (বিজয় গৌরবে) প্রীতি-লাভ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।" এই সকল বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইউরোপীয়দিগের বহু পূর্ব্বেই হিন্দুগণ "জোয়ার ভাটার" এবং "পূর্ণিমা অমাবস্যা"র সঙ্ঘটন রহস্য অবগত হইয়াছিলেন।

উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যোগে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে

সময়ে সময়ে তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিহ্নগুলি সৌর কলঙ্ক নামে অভিহিত হয়। অনেকের বিশ্বাস গালিলিওর দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই সৌরকলঙ্কের বিষয় অপর কোন জাতি অবগত ছিল না। কিন্তু রামায়ণ পাঠে এই ভ্রান্ত ধারণা সহজেই দূরীভূত হয়। শ্রীরামচন্দ্র যখন সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কার প্রান্তভাগে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেই সময় হইতেই নানাবিধ দুর্নিমিত্ত লঙ্কাবাসিগণের নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচনা করিতেছিল। সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ঐ সকল দেখাইতে দেখাইতে সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছিলেন—

"হ্রস্বোরূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষঃ সুলোহিতঃ।
আদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ্য লক্ষ্মণ দৃশ্যতে॥"

(লঙ্কা ৪১শ সর্গ)

"হে লক্ষ্মণ! চাহিয়া দেখ সূর্য্যমণ্ডলে কেমন হ্রস্ব, রূক্ষ, অপ্রশস্ত এবং রক্তবর্ণ একটা পরিবেষ ও তাহার মধ্যে নীল বর্ণ চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রদর্শিত এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নীলবর্ণ চিহ্ন যে সৌরকলঙ্ক, তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। তৎকালে হিন্দুগণ সৌরকলঙ্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে কখনও অনুমানে এমন অপরিজ্ঞাত সত্যের বর্ণনা করিতে পারিতেন না।

আধুনিক ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী 'সাহারা' 'গোবী' প্রভৃতি সুবৃহৎ মরু প্রান্তরে শঙ্খ, শম্বুকাদির খোলা ও নানাবিধ জলজন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া অনুমান করেন যে সুদূর অতীতে ঐ সকল স্থান মহাসাগরের অংশীভূত ছিল। ভূকম্পনাদি নানা প্রাকৃতিক বিপ্লবে ঐ সাগরগর্ভ উচ্চ হইয়া মরুভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। রামায়ণেও এই প্রাকৃতিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। লঙ্কাকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গে একস্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, "সমুদ্র শাসনার্থে মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র অধিজ্য শরাসনে শর যোজনা করিলে সমুদ্র ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীরাম সকাসে যুক্ত করে নিবেদন করিল যে, "হে দেব, আপনি এই আরোপিত শর সংহার করুন। আমি আপনাকে এমন উপায় করিয়া দিতেছি যে তাহাতে আপনার সৈন্যগণও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, অথচ মদগর্ভস্থ যাদোগণও রক্ষা পাইবে। শর বর্ষণে আমার জলরাশি শোষণের কোন প্রয়োজন নাই।" বীরকেশরী রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধি হইলে আর সমুদ্র শোষণের কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই অব্যর্থ সংহিত শর কোথায় নিক্ষেপ করিব?" সাগর কহিল, "উত্তরপ্রদেশে 'দ্রুমকুল্য' নামে আমার একটী অংশ আছে। তথায় আভীরাদি উগ্রদর্শন পাপমতি দস্যুপ্রায় জাতি সকল বাস করে। ঐ পাপীদিগের সংস্পর্শে আমি তথায় দূষিত হইয়াছি। অতএব আপনার দিব্যাস্ত্র আমার সেই প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া আমার সেই অঙ্গ শোষণ করুন।" শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের প্রার্থনানুরূপ প্রদেশেই শর নিক্ষেপ করিলেন।

"তস্মাত্তদ্বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষু শোষয়ৎ॥
বিখ্যাত ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তার মেবচ।"

"সেই বজ্রাগ্নিতুল্য বাণ পতিত হওয়ায় তত্রত্য সাগর গর্ভস্থ সমস্ত জল শোষিত হইয়া গেল এবং শেষে তাহা মরুকান্তার নামে খ্যাত হইল।" এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাগর শুষ্ক হইয়াই যে মরুভূমি সৃষ্ট হইয়াছে, তদানীন্তন হিন্দুগণও তাহা বর্ত্তমান পণ্ডিতদিগের মতই অবগত ছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণ কেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, রামায়ণে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকবন-বাসিনী সীতা কামাভিহত রাবণের পৈশাচিক উৎপীড়নে উৎপীড়িতা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রত্যাশায় তাহার নিকট কিছুকাল সময় চাহিয়া নিয়াছিলেন। একদিন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"তস্মিন্ননা গচ্ছতি লোক নাথে,
গর্ভস্থ জন্তোরিব শল্য কৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্য চিরাদনার্য্যঃ,
শরৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥"

(সুন্দরকাণ্ড ২৮শঃ সর্গ)

অর্থাৎ "সেই লোকনাথ রামচন্দ্র যদি রাবণ প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আসিতে না পারেন তবে অস্ত্র চিকিৎসক যেমন শল্যদ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করেন, দুরাচার রাক্ষসেন্দ্র রাবণও তেমনই তীক্ষ্ণ শরদ্বারা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।" জানকীর এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান সময়ে সুদক্ষ ডাক্তারেরা যেমন কোন কোন অবস্থায় ভ্রূণদেহ খণ্ড খণ্ড

করিয়া তাহা গর্ভিনীর গর্ভ হইতে নির্গত করিয়া প্রসূতির জীবন রক্ষা করেন; তদানীন্তন শল্য-শাস্ত্রজ্ঞ নিপুণ চিকিৎসকেরাও তেমনই শস্ত্রোপচারে অনেক সময়ে প্রসূতির জীবন রক্ষা করিতেন।

জড় বিজ্ঞানে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে কোন জাতিই শিল্পে বা যুদ্ধ বিজ্ঞানে সমধিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শিল্পিগণ এই বিজ্ঞান বলেই নগর নির্ম্মাণ নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ এবং পুষ্পকের মত বিমান যান নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন; তৎকালে এদেশে কত প্রকার শিল্পোপজীবী বাস করিত তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। যন্ত্রবলে সুবৃহৎ প্রস্তরাদি বাহিত হইয়া সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমুদ্র বন্ধনকালে বানর শিল্পিগণের নিয়োগানুসারে—

"হস্তি মাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরি বহন্তি চ॥

"হস্তীর ন্যায় সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড এবং পর্ব্বতাংশ সকল উৎপাটিত হইয়া যন্ত্রদ্বারা পরিবাহিত হইয়া সমুদ্রতীরে আনিত হইতে লাগিল।" গুরুভার বস্তু পরিচালন ও ঊর্দ্ধে উত্তোলনের জন্য তৎকালে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, সম্ভবতঃ পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পীরা তাহার ব্যবহার প্রণালী অবগত ছিলেন। উড়িষ্যার কণারকের মন্দির এবং জগন্নাথের শ্রীমন্দির যেরূপ সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডদ্বারা গ্রথিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! কোন্ শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে নির্ম্মাতৃগণ এমন গুরুভার সুবৃহৎ প্রস্তরগুলি এত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারেরাও বিস্মিত হন।

সমরনীতি ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি

রামায়ণ রচনাকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আর্য্য উপনিবেশ বা আর্য্যগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই। তখনও সমগ্র দক্ষিণাপথ ও আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থান প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্য রাজা বা সর্দারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। আর্য্যগণের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের ও রীতি নীতির অত্যন্ত অসামঞ্জস্য থাকায় সর্ব্বদাই উভয় জাতির মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। এই সঙ্ঘর্ষকালে দেবতা বা ঋষিগণই আর্য্য সমাজ পরিচালন করিতেন তাই ঐ সকল অনার্য্য রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের নেতা ঋষিগণও ঐ সকল আততায়ীর হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম চিন্তার ন্যায় শত্রু সংহারের উপায়ও চিন্তা করিতেন।* এইজন্য ঋষিগণই সর্ব্বপ্রথমে "ধনুর্ব্বেদের" উদ্ভাবন ও উন্নতি সাধন করেন। মহর্ষি "অগস্ত্য" ও "বিশ্বামিত্র" নানাপ্রকার সংহারাস্ত্রের উদ্ভাবন, ও দেবতা গন্ধর্ব্বাদি জাতি হইতে দৈবাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, ঐন্দ্র্যাস্ত্র এবং গান্ধর্ব্বাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া, শ্রীরামাদি ক্ষত্র কুমারগণকে তাহা শিক্ষা দিয়া এদেশে সামরিক বিদ্যার ভূয়সী উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রকুলাবতংশ বীর কেশরী শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে যে সকল আগ্নেয়, বায়ব্য, বারুণ ও ঐশিক মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন রামায়ণের সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ সর্গে তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধাদির প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকারের কার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে এত বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে বিগত সময়েও এত প্রকারের অস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সকলগুলি অস্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুমান করা সহজ সাধ্য না হইলেও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বোধ হয় যে ঐ সকল অস্ত্রের মধ্যে "ক্ষুরপ্রা, অর্দ্ধ চন্দ্রাদি" বাণে শত্রুর হস্ত পদ ও মস্তকাদি ছেদন করা হইত, নারাচ, ভল্ল, শূল, শোন, শিলীমুখাদি বাণে আততায়ীর দেহ ভেদ করা হইত; নাগপাশ, কালপাশাদি দ্বারা বিপক্ষকে বন্দী করা হইত; ব্রহ্মাস্ত্রের গোলকাঘাতে রথাশ্ব গজ সহ শত্রুর দেহ চূর্ণীকৃত হইত; মুষল পরিঘাদি অস্ত্র প্রহারে শত্রুর দেহ নিষ্পেষিত হইত; শীতেষু, জৃম্ভকাদি সম্মোহন শরে বর্ত্তমান যুগের বিষ বাষ্পের ন্যায় শত্রুসৈন্য অচেতন বা জৃম্ভণকারী নিদ্রাতুরের মত অবস্থায় পতিত হইত। নালীকাদি অস্ত্র হইতে গুটিকাক্ষেপণ করিয়া শত্রুদলকে ছিন্ন ভিন্ন করা হইত; দুর্গ প্রাকারে শতঘ্নী নামক ভীষণ অস্ত্রের সমাবেশ করিয়া বিপক্ষগণের পক্ষে ঐ দুর্গাক্রমণ অসম্ভব করিয়া তুলিত।

* ১৩২৫ সালের আশ্বিনের মালঞ্চে শূর্পণখার অভিশাপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বায়ব্যাস্ত্রে বায়ুমণ্ডল আলোড়ন পূর্ব্বক ধূলা উড়াইয়া এবং আগ্নেয়াস্ত্রে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান যুগেরই মত শত্রুর উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া রণক্ষেত্র শত্রুর পক্ষে অনধিগম্য করিয়া তুলিত।

শত্রু নিসূদন শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্র-সারথি মাতলির অনুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য প্রদত্ত যে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসেশ্বর রাবণকে সংহার করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার কামান বা বৃহদাকার বন্দুক বলিয়াই বোধ হয়। ঐ ব্রহ্মাস্ত্রটী—

"ব্রহ্মণো নির্ম্মিতং পূর্ব্বমিন্দ্রার্থমমি তৌজসা।"

"অমিততেজা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইন্দ্রের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

"তস্য বেগেষু পবনঃ ফলে পাবক ভাস্করৌ।
শরীর আকাশময়ং গৌরবে মেরু মন্দরৌ॥
সধূম মিব কালাগ্নি দীপ্তমাশী বিষোপমম্।
রথ নাগাশ্ব বৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্র কারিণম্॥
দ্বারাণাং পরিঘানাঞ্চ গিরীণাঞ্চাপি ভেদনম্।
বজ্রসারং মহানাদং………ইত্যাদি………"

(লঙ্কাকাণ্ড ১১০ সর্গ)

অর্থাৎ "ঐ ব্রহ্মাস্ত্রের বেগ পবনের ন্যায়, ইহার ফলার (গোলক) অগ্নি বা সূর্য্যের ন্যায় জলন্ত, ইহা সধূম কালাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এই অস্ত্রের শরীর আকাশময় অর্থাৎ ফাঁপা, গুরুত্বে মেরু বা মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়। ইহা নিক্ষেপ করিলে, রথ, অশ্ব, গজ, সুদৃঢ় দ্বার এমন কি পর্ব্বতাদিও বিদীর্ণ হইয়া যায়। "ইহা বজ্রবৎ কঠিন এবং ভয়ঙ্কর শব্দকারী।" এই লক্ষণ গুলি পাঠ করিয়া এই প্রহরণটীকে কামান বা তদ্রূপ ভীষণ কোন সংহারাস্ত্র বলিয়া মনে করা নিতান্ত উদ্ভট কল্পনা নহে। শুধু কল্পনার সহায়তায় ঋষি প্রবর বাল্মীকি যে এই অবাস্তব মানসাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করিবার কোন সুসঙ্গত হেতু আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সীতাহরণ কালে দস্যু প্রকৃতি রাবণ যে নালীকাস্ত্রের সাহায্যে মহাপ্রাণ জটায়ুকে অবসন্ন করিয়াছিল (আরণ্য—৫১ সর্গ) তাহার একপ্রকার বন্দুক বিশেষ। "শুক্রনীতি" নামক সুবিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থে নালীকাস্ত্রের যে বিশদ বর্ণনা আছে তাহা এইরূপ—

"নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকং॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্য ভেদি তিল বিন্দু যুতং সদা।
সুকাষ্ঠো পাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্॥
স্বন্ত্যগ্নি চূর্ণ সন্ধাত্রী শলাকা সংযুতং সদা।
লঘু নালীক মপ্যেৎ প্রধ্যার্য্যং পত্তি সাদিভিঃ॥
যথা যথা তু ত্বক্ সারং যথা স্থূলং বিলান্তরন্॥
যথাদীর্ঘং বৃহদ্গোলং দূর ভেদী তথা তথা॥
বৃহন্নালীক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠ বুধ্ন বিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয় প্রদং॥"

অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালীক এবং বৃহন্নালীক নামক দুই প্রকার নালীকাস্ত্র আছে। উভয় নালীকেই মূলদেশে ছিদ্র থাকে। ক্ষুদ্র নালের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ পাঁচ বিতস্তি (আড়াই হাত), লক্ষ্যভেদের সুবিধার জন্য নালের মাথায় একটী তিলবিন্দু স্থাপিত হয়। উহার বুধ্নদেশ (বাট) সুকাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়, অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) পূর্ণ করার জন্য উহার সঙ্গে একটী শলাকা সংযুক্ত থাকে। নলের দৈর্ঘ্য, গোলকের গুরুত্বাদি অনুসারে উহার দূরভেদিত্ব হয়। সাধারণতঃ পদাতি ও সাদি সৈন্যগণই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বৃহন্নালীকে কাষ্ঠবুধ্ন থাকে না, উহা শকটাদি দ্বারা প্রবাহ্য এবং সুপ্রযুক্ত হইলে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হয়।" এই সকল লক্ষণ দেখিয়া শুক্রনীত্যুক্ত "ক্ষুদ্র নালীক" বন্দুকের এবং "বৃহন্নালীক" কামানের প্রকারান্তর বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতে "তুলাগুড়" নামক এক প্রকার আয়ুধেরও এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়—যথা

তথৈবাসনয় শ্চৈব চক্র যুক্তা স্তুলা গুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘ স্বনাস্তথা।"

(মহাভারত—বনপর্ব্ব)

ইহাতে বোধ হয় রামায়ণোক্ত "ব্রহ্মাস্ত্র" ও 'মহাভারতোক্ত—"তুলাগুড়" এবং শুক্রনীতির "বৃহন্নালীক", একই প্রকার জিনিষ। আজকাল যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন সহস্র সহস্র কামান ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ সকল অস্ত্রের

তেমন বহুল প্রচার ছিল না। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিকট মাত্র তাহার দুই চারিটী অস্ত্র থাকিত এবং বিশেষ সঙ্কটকালেই তাহা ব্যবহৃত হইত। কেন না তৎকালীন আর্য্যসন্তানগণ কুটযুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা পুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে বীরগতি লাভ করাই শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেন। কৃত্রিম যন্ত্রযোগে লৌহ সীসকাদি নির্ম্মিত গুলি নিক্ষেপ করিয়া শত্রু সংহারকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন। ধনুর্ব্বেদের ৫ম অধ্যায়ে উক্ত আছে—

"যন্ত্রাণি লৌহ সীসানাং গুলিকাক্ষেপ কানি চ,
তথা চোপল যন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্য পরাণি চ।
কুট যুদ্ধ সহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপঃ,
অধর্ম্ম বৃদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্য ত্তরোত্তরম্।"

অর্থাৎ "লৌহ সীসকাদির গুলি নিক্ষেপকারী যন্ত্রগুলি হেয় কলিযুগে নৃপতিগণের কুটযুদ্ধের সহায়তা করিবে এবং ইহাতে উত্তরোত্তর অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে।" অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া দৃঢ় প্রতীতি হয় যে সুদূর প্রাচীনকালে আধুনিক যুগের মত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না হওয়ার কারণ ধর্ম্ম ভয় মাত্র; ঐ প্রকার অস্ত্রের ঐকান্তিক অভাব নহে। শত্রু বিনাশ অপেক্ষা পুরুষোচিত বীরত্ব প্রদর্শনই তখন গৌরব জনক ছিল। তবে তৎকালে কুট যুদ্ধ যে একবারেই ছিল না, এমন নহে। ইন্দ্রজিত মেঘের মধ্যে লুকাইত থাকিয়া যেভাবে যুদ্ধ করিতেন তাহা সম্পূর্ণ কুটযুদ্ধ। এই ভাবে শত্রু সংহারকে বর্ত্তমান জেপ্লিন প্রভৃতি শ্রেণীর বিমান যান হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু সংহারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লঙ্কাকাণ্ডের অশীতিতম সর্গে দেখা যায় যে বিভীতক কাষ্ঠ দ্বারা নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞ ভূমিতে প্রচণ্ডাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার প্রভাবে ইন্দ্রজিৎ স্বীয় রথখানা এমন উর্দ্ধগামী করিয়া নিতেন যে নিম্ন হইতে রাম লক্ষ্মণের মত বীরগণও তাহা বাণবিদ্ধ করিতে পারিতেন না। যখন বিমানখানা নীচে নামাইয়া সুবিধাজনকস্থানে আনিয়া নিম্নস্থ শত্রুগণের উপরে অস্ত্র বর্ষণ করিতেন তখনই সেই রথখানার চতুর্দ্দিকে এমন ধূমরাশি বিস্তারিত করিতেন যে রাম লক্ষ্মণাদি আর লক্ষ্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। (১) তবে এই প্রকার কুটযুদ্ধ তখন খুব কম লোকেই করিত। আর এরূপ বিমান যানও সমগ্র ভারতে দুই তিন খানার অধিক ছিল বলিয়া কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা হউক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারত সন্তানগণ জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে যুদ্ধাস্ত্র ও যান বাহনাদির কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ বৈজ্ঞানিক সংহারাস্ত্রের একান্ত অভাব না থাকিলেও প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শনার্থে ভারতবাসিগণ সুদৃঢ় বর্ম্ম ও গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলীত্রাণ পরিধান করিয়া যে স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি খচিত সুদীর্ঘ ধনু, খড়্গ, প্রাশাদি ধারণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহারা যেরূপ সুদীর্ঘ খড়্গ ও প্রকাণ্ড গদা, পরিঘাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের বিলাস-পরায়ণ বাবুরূপী তালপাতার সিপাহীগণের নিকটে অসম্ভব বোধ হইবে। রাবণ-নন্দন অতিকায় সর্ব্বদা যে দুইখানা খড়্গা ব্যবহার করিতেন, বাট সহিত তাহার দৈর্ঘ্য ছিল চৌদ্দ হাত (লঙ্কা ৭১ সর্গ)।

দ্বৈরথ যুদ্ধকালে মল্লযুদ্ধও প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী রাজন্যবৃন্দ যেমন সভ্যতা ও সুশাসন বিস্তারের দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে আফ্রিকার কৃষ্ণত্বক্ জাতির রাজ্য উচ্ছেদ করিয়া তথায় স্বজাতীয় রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন; তাহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা

(১) "সহি ধূমান্ধকারঞ্চ চক্রে প্রচ্ছাদয়ন্নভঃ।
দিশশ্চান্তর্দ্দধে শ্রীমান্নীহার তমসাবৃতাঃ।"
(লঙ্কাকাণ্ড—৮০ সর্গ)

শিল্প সংহিতা ১৮শ অধ্যায়ে বাষ্পচালিত পুষ্পকের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"বাষ্প যোগে তু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ,
অবিচ্ছেদ গতির্যস্ত বায়ুবৎ কাম গামিনম্।
নানোপ করণৈর্যুক্তং ভাবন্তং পুষ্পকং বিদুঃ॥

অপিতু—

সলব্ধা কামগং যানং তমোধাম * দুরাসদম্,
যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণ কৃতং স্মরণ।
কচিদ্ ভূমৌ কচিদ্ ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গ জলে কচিৎ।

* তমোধাম—ধুমাচ্ছাদিত বা ধমযুক্ত।

এই শ্লোকগুলিতেও প্রাচীন ভারতে বিমানের অস্তিত্ব সূচনা করে।

করিতে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর বিধিনিষেধের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য করেন না, রামায়ণের যুগে আর্য্য নরপতিগণও তেমনিই গোব্রাহ্মণ রক্ষা ব্যপদেশে কৃষ্ণবর্ণ পাপমতি রাক্ষস অসুর বা দিতি সন্তানগণের জীবন এবং রাজ্য হরণ করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতিও ঠিক এইপ্রকার অজুহাতেই দৈত্যরাজ "লবণের" সুজলা সুফলা মধুপুরী অধিকার করিয়া তথায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আদেশ করিয়াছিলেন। মধুনন্দন লবণ বড় সহজ লোক ছিল না। মহাদেবের প্রদত্ত অদ্ভূত শক্তি সম্পন্ন যে শূল দ্বারা তাহার পিতা মধুদৈত্য বড় ২ বীরকেও পরাভূত করিত, পুত্র লবণও তাহা সযত্নে রক্ষা করিতে ছিল। বর্ষাকাল যুদ্ধের সময় নহে বলিয়া সে তখন ঐ শূল গৃহে রাখিয়া নানাস্থানে যাতায়াত করিত এবং যদি কোন বিপক্ষ তাহার নিকটে যাইত তবে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে সেই শূল নিয়া শত্রু সংহার করিত। ঐ দেব শূল অব্যর্থ ছিল। তাই শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে বর্ষাকালে ৪ হাজার অশ্বারোহী, ২ হাজার রথী এবং একশত হস্ত্যারোহি সেনার সঙ্গে মথুরা (মধুপুরী) জয় করিতে পাঠাইয়া এইরূপ উপদেশ দিয়া ছিলেন যে তুমি সৈন্যগণকে পৃথক্‌ভাবে পাঠাইয়া—

"এক এব ধনুষ্পানির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্।
যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধ কাঙ্ক্ষিণম্॥"

(উত্তরকাণ্ড ৭৭ সর্গ)

"তুমি একাকী ধনুর্ব্বাণ সহ এমন প্রচ্ছন্নভাবে মধুবনে যাইবে যেন লবণ তোমাকে যুদ্ধার্থী বলিয়া বুঝিতে না পাবে।" আরও—

"স ত্বং পুরুষ শার্দ্দূল তমাযুধ বিনা কৃতম্,
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠধৃতাযুধঃ।
অপ্রাবিষ্টঞ্চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ,
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্।
অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্য স ভবিষ্যতি॥"

(উঃ কাঃ ৭৮ সর্গ)

অর্থাৎ "যখন সেই লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় বাহির হইতে গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, অমনি তুমি সশস্ত্রে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তদবস্থায়ই তাহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিবে, এবং সেই শূল আনিতে অবকাশ না দিয়া নিরস্ত্র অবস্থায়ই তাহাকে বধ করিবে! অন্যথা তাহাকে কোন মতেই বধ করিতে পারিবে না।" বলা বাহুল্য ভ্রাতৃভক্ত শত্রুঘ্নও অক্ষরে অক্ষরে দাদার আদেশ পালন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে যদিও রামায়ণে—

"যোহি মত্তং প্রমত্তং বা ভগ্নং বা রহিতং কৃশং,
হন্যাৎ স ভ্রূণহা লোকে........এবং
"ন্যস্ত শস্ত্রৌ গৃহীভৌ চ ন দূতৌ বধ মহর্থঃ।" ইত্যাদি

রূপ উচ্চ বীরনীতি লিখিত রহিয়াছে, তথাপি সম্ভবতঃ কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য্য বধে শ্বেতাঙ্গ আর্য্য বীরেন্দ্রবৃন্দ সেই নীতি অনুসরণ করিতেন না। বালীবধে স্বয়ং রামচন্দ্রও ঐ বীর নীতির সম্মান রক্ষা করেন নাই। কৃষ্ণাঙ্গ হতভাগ্যগণ চিরকালই শ্বেতাঙ্গের উন্নত আইন কানুন ভোগে বঞ্চিত!

রথী, সাদি (গজারোহী), এবং পত্তি (অশ্বারোহী) এই চারিশ্রেণীর সৈন্যই সে সময়ে যুদ্ধ করিত। সেনাপতি, রাজা বা প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গই রথারোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। রাজগণের রথ যেমন সুবৃহৎ তেমনই বিবিধ কারুকার্য্য খচিত হইত! ঐ যুদ্ধ-রথগুলির কোন কোনটী ব্যাঘ্র, বৃক বা গোচর্ম্মাচ্ছাদিত থাকিত। কোন রথে স্বর্ণখচিত মৎস্য, সপুষ্প বৃক্ষ, বিচিত্র পক্ষী অঙ্কিত হইত এবং তাহা সুবর্ণ খচিত আস্তরণে, কিঙ্কিনী জালে এবং সমুজ্জ্বল নানাবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত হইত। দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে পুষ্পক বিমানারোহণ করিয়া রাবণ যুদ্ধযাত্রা করিতেন তাহা কার্ত্তস্বর (প্লাটিনাম?) এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণে খচিত ছিল; রথের স্তম্ভগুলি রৌপ্যময় ও চূড়া আকাশস্পর্শী ছিল। ইহাতে আরোহণ করার জন্য কাঞ্চন খচিত সোপান পংক্তি ছিল। ঐ রথের কূট গৃহে (চূড়ার উপরিস্থ ক্ষুদ্র গৃহে) এবং বিহার গৃহে স্ফটিক ও স্বর্ণময় গবাক্ষ ও ইন্দ্র, নীল, মহানীলাদি উৎকৃষ্ট মণি নির্ম্মিত বহু বেদিকা ছিল। উহাতে বিচিত্র প্রবালাদি খচিত একটী সুপ্রশস্ত কুট্টিম (হলঘর) ছিল; (সুন্দরকাণ্ড ৯ম সর্গ)। বর্ত্তমান যুগের সুবৃহৎ "জেপলিনের" সহিতই এই বিমানটীর তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমান কালের সামরিক মটরগাড়ী চালকগণের মত সেকালেও—

"দেশ কালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণানীঙ্গিতানি চ,
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ বলাবলম্।
স্থল নিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণিচ,
যুদ্ধ কালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তর দর্শনম্।
উপযানাপযানেচ স্থানং প্রত্যপ সর্পণম্,
সর্ব্বমেতদ্রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথ কুটুম্বিনা।"

(লঙ্কাঃ—১০৫ সর্গ)

সারথিগণের দেশ, কাল, রথীর লক্ষণ, ইঙ্গিত, বিপক্ষের দৈন্য, হর্ষ; উভয় রথীর বলাবল, ভূমির সমতা ও বিষমতা; বিপক্ষের ক্রটী, যুদ্ধের অবসর, আক্রমণ এবং পলায়নের সুযোগ, পার্শ্বদেশ আক্রমণ কৌশল ইত্যাদি জানিতে হইত।" উপযুক্ত রথ চালকের অভাবে বড় বড় বীরও পঙ্গু হইয়া থাকিতেন।

'রাজোয়াড়া নারী'র ন্যায় সেকালের রমণীগণও সময়ে সময়ে স্বামি-সহ সমরক্ষেত্রে গমন করিতেন, এবং শঙ্কট সময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। দশরথের প্রেয়সী পত্নী কৈকেয়ী, সম্বরাসুরের সহিত দশরথের যুদ্ধকালে স্বামীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন এবং সম্বরাসুরের অস্ত্রাঘাতে দশরথ রাজা হতচেতন হইয়া পড়িলে তিনি পতিকে যুদ্ধস্থল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে সরাইয়া আনিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর সেখানেও অসুরগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিলে তিনি সেই সঙ্কটপূর্ণ স্থান হইতে তখনই স্বামীকে নিরাপদ স্থানে অপসারিত করেন। এই জন্যই শেষে দশরথ তাঁহার প্রেম মুগ্ধ হইয়া স্ত্রৈণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (অযোধ্যাকাণ্ড ৯ম সর্গ)।

রামায়ণে জলদুর্গ (পরিখা), স্থলদুর্গ, পার্ব্বত্য দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ এবং মরুদুর্গ, ইত্যাদি নানাপ্রকার দুর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভৌগোলিক জ্ঞান।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যেসময়ে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় রেল ও টেলিগ্রামের প্রচার ছিলনা সে সময়ের লোকের পক্ষে ভৌগোলিক তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ নিতান্তই অসম্ভব ছিল। রামায়ণে জলযানের সাহায্যে সমুদ্র গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও ঐ যান বায়ু যোগে চালনার উল্লেখই দেখা যায়, সুতরাং তৎসাহায্যে সমুদ্র পরপারবর্ত্তী বহু দেশে গমনাগমন করা সম্ভবপর ছিল না। তথাপি রামায়ণে ভারতবর্ষের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত ও সমুদ্র ব্যবহিত এত দেশ, পর্ব্বত, নদী দ্বীপ ও সাগরাদির উল্লেখ দেখা যায় যে কিরূপে তাঁহারা ঐ সকল স্থানের সন্ধান পাইয়া ছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সীতা অন্বেষণ প্রসঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ হইতে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ মধ্যে বহু স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভাগীরথী, যমুনা, সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী, শোণ, সরস্বতী, সিন্ধু, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী ইত্যাদি নদী এবং ব্রহ্মমাল, বিদেহ (ত্রিহুত), মালব, কোশল, কাশী, মগধ, মহাগ্রাম (?), পুণ্ড্র, অঙ্গ, যে দেশে কোশের তন্তু (রেশম) উৎপন্ন হয় (বঙ্গদেশ) এবং যথায় রৌপ্যের ন্যায় শ্বেত মৃত্তিকা সেই দেশ, যবনগণের বাসস্থান পার্ব্বত্য প্রদেশ, মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, দশার্ণ, আব্রবন্তী (?) অবন্তী, বিদর্ভ, মাহিষিক (?) মৎস্য, কৌশিক প্রদেশ দণ্ডকারণ্য, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল পাণ্ড্য, কেরলাদি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থ রাজ্যের এবং বহু পর্ব্বতের প্রায় যথাযথ অবস্থান বর্ণিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্র মধ্যে যে সকল দ্বীপ ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ আছে, তাহার নাম ও অবস্থানের অনেক গোলযোগ দৃষ্ট হয়। মানস সরোবর, যবদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপাদি দুই চারিটী স্থানের নাম ও অবস্থানের সহিত বর্ত্তমানকালের ভৌগোলিক ঐক্য থাকিলেও যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থিত স্বর্ণ দ্বীপ, রৌপ্য দ্বীপ, পূর্ব্ব সাগরস্থিত দীর্ঘকর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নরমাংসভোজি রাক্ষসগণের দেশ, সূক্ষ্ম কেশকলাপ এবং কাঞ্চনকান্তিবিশিষ্ট, সুন্দরাকৃতি অথচ অপক্ক মৎস্য ভোজী ও জলে বিচরণকারী অদ্ভুত জাতির দেশ, ভীষণ বদন বিশিষ্ট নরব্যাঘ্র এবং লৌহবৎ দৃঢ় মুখাকৃতি বিশিষ্ট অসভ্য জাতির বাসভূমি বলিয়া যাহা বর্ণিত আছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের কোন্ কোন্ স্থান তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বর্ত্তমানকালেও প্রশান্তমহাসাগরে এবং ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বাংশে আণ্ডেমান, অষ্ট্রেলিয়া ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে বিকটাকার যে সকল নরব্যাঘ্র বাস করে সম্ভবতঃ তাহাই লক্ষ্য করিয়া বাল্মীকি এই অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ ইক্ষু সমুদ্র, তৎপর তিমিঙ্গিলাদি মহাসর্প নিষেবিত লোহিত সমুদ্র,

পরে ক্ষীরোদ সাগর এবং তৎপর অগ্ন্যুদগারী বড়বামুখ (আগ্নেয় পর্ব্বত) বিশিষ্ট সুবিশাল জলোদ সাগরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই "জলোদ" সাগর এবং সুবিস্তীর্ণ প্রশান্ত মহাসাগর একই স্থান। দক্ষিণাপথে কাবেরী নদীর তীরস্থ মলয়াচলেও যে রাক্ষস বৈরী অগস্ত্য ঋষির প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লঙ্কাদ্বীপের বহু দক্ষিণে নাগরাজ বাসুকির রাজধানী "ভোগবতী" পুরীর যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহা কোন স্থান নির্ণয় করা যায় না। তাহার দক্ষিণেই সূর্য্যদেবের অগম্য ঘোরান্ধকারময় পিতৃলোক বা দক্ষিণ মেরু, প্রদেশ। ভারতের উত্তর প্রান্তে স্থিত ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, কাম্বোজ, শক, যবন, মদ্র, কুরু, বরদ শূব সেনাদি এবং হিমালয় কৈলাস, ক্রৌঞ্চ, মৈনাক প্রভৃতির পর পারে "উত্তর কুরু" দেশের বর্ণনা দেখা যায়। সেই স্থান স্বর্গীয় সম্পদে পূর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ তাহাই আর্য্যগণের স্বর্গ। সেখানের বৃক্ষগুলি কেবল ফল পুষ্প নহে, নানা কাম্য বস্তু প্রসব করে। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিশের ভারতবর্ষের বর্ণনায় যেমন নানা অদ্ভুত মানব, আশ্চর্য্য জীব জন্তু এবং রহস্যময় প্রদেশের উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, বাল্মীকির ভৌগলিক বর্ণনাও কতকটা তাহারই মত। সম্ভবতঃ তদানীন্তন প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বতে হস্তী, তিমি প্রভৃতি বৃহদাকার প্রাণী সংহারকারীর "সিংহ পক্ষী"র, বাদুরের মত পর্ব্বতপ্রান্তে দোদুল্যমান রাক্ষস, সুবর্ণময় পর্ব্বতাদির বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক উত্তরদিকে যে সুমেরু পর্য্যন্ত আর্য্যগণের যাতায়াত ছিল, রামায়ণে তাহার সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর কুরু প্রদেশের বর্ণনার পর তাহার উত্তরস্থ দেশের এই প্রকার বর্ণনা আছে—

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোম গিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
সতুদেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্যভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভি বিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা॥
* * * *
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ চ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রমতি বৈ গতিঃ॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৪শঃ স্বর্গ)

অর্থাৎ "পরে সেই মৈনাকবিশিষ্ট উত্তর কুরুদেশ অতিক্রম করিয়া উত্তর মহাসাগরের মধ্যস্থ স্বর্ণময় সুমহান "সোমগিরি" নামক পর্ব্বত দেখিবে। ঐ প্রদেশে সূর্য্য দেখা যায় না, তথাপি ঐ সোমগিরির প্রভাতে সেই স্থান এমন আলোকিত হয় যে, সূর্য্য কিরণেই যেন আলোকিত হইতেছে এমনই বোধ হয়। উহার উত্তরে আর কোন প্রাণীই যাতায়াত করিতে পারে না।"

এই বর্ণনায় বোধ হয় এই সোমগিরিই উত্তর মেরুকেন্দ্র। আর ঐ অসূর্য্যম্পশ্য প্রদেশের (সোমগিরির) প্রভা "মেরু জ্যোতিঃ" বা "অরোরা বরিয়ালিস্" ভিন্ন অন্য আর কিছু নয়। অল্প কয়েক বৎসর হইল কাপ্তান "পেরী" প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসিক পর্য্যটক দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশেরই ঋষিগণ পদব্রজে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গিয়া যে মেরুজ্যোতি দেখিয়াছিলেন—আমরা কি তাহার প্রমাণ পাইয়াও বিশ্বাস করিতে পারি?

বিদেশী পণ্ডিতগণ "সার্টিফিকেট" না দেওয়া পর্য্যন্ত কি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শত শত গৌরবের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিখিব না? আর যে দিগ্বিজয়ী আর্য্যবীরগণের পদভরে সমগ্র এসিয়া খণ্ড কম্পিত হইত, কিরাত, যবন, শক, কালকেয়াদি দুর্দ্ধর্ষ জাতি সভয়ে যাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র গিরিকন্দর ভেদ করিয়া ছুটিত, সাগর গর্ভস্থ সুদূর "যব" এবং ভীষণ রাক্ষসাধ্যুষিত লঙ্কা দ্বীপে যাঁহারা এক সময়ে বিজয়কেতন উড়াইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তানগণ "তুর্কী" এবং "জার্ম্মাণ" বিজয়ী দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, বঙ্গমাতার বীরপুত্রদিগকে আর্য্যসমাজ হইতে বর্জ্জনের জন্য লালায়িত হইয়াছেন; সমুদ্রযাত্রী বণিক্ ও বিদ্যার্থিগণ দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের মত জাতিচ্যুত হইয়া অপমান ভোগ করিতেছেন! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

ক্রমশঃ

শ্রীনীলকণ্ঠ দে।

(২৯)

যথাসময়ে যাদব তার মার পত্র পাইল। অম্বিকা ঘোষালের কাছেও হরি ঘোষালের লম্বা চিঠি আসিল। অম্বিকা বুদ্ধিমান্, সহরে থাকে অত বড় উকিলের মুহুরী—কত মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করে, সে কি তার অগ্রজের মানরক্ষার জন্য এই একটা 'ক অক্ষর গোমাংস' গেঁয়ে বাঁদরকে দমন করিতে পারিবে না? না যদি পারে, তবে তিনি আত্মহত্যা করিবেন, পৈতা ছিঁড়িয়া বেণী বসুর চরণতলে নিক্ষেপ করিবেন। কারণ, এই গ্রামে তাঁহার বাস করা ইহার পরে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। পথে ঘাটে নিবারণ তাঁহাকে অপমান করিবে। পত্রের উপসংহারে এইরূপ কত কথাই হরি ঘোষাল লিখিয়াছিলেন। অম্বিকা ঘোষালেরও রাগ হইল। তাই ত! গেঁয়ে একটা ছোঁড়া,—সকল বিবাদে সে তার জিদ বজায় রাখিবে, আর তাঁহারা তাই নীরবে সহ্য করিয়া থাকিবেন? না, সে কিছুতেই হইতে পারে না।

বেণীবাবু ঘোষালের অভিযোগ সব শুনিলেন,—মুখে একটু হাসি ফুটিল। কহিলেন, "তাই নাকি! আচ্ছা, তেজী ছেলে ত বটে! অ্যাঁ!"

"আপনি ত তারিফ ক'চ্চেন, কিন্তু তেজে যে আমরা পুড়ে মচ্চি, তার কি হবে এখন? কি ব'লেন আপনি?"

"তুমি কি বল?"

"আমি আর কি ব'লব, আপনি কর্ত্তা, মুরুব্বি, আপনার আশ্রিত হ'য়ে আছি, মান রাখতেও আপনি মারতেও আপনি। ক'রবার যা আপনিই ক'রবেন।"

"বড় ভুল বুঝ্‌ছ ঘোষাল। এ ক্ষেত্রে আমি কি ক'ত্তে পারি আর?"

"তলে তলে যাদবের টিপ আছে। নইলে এতটা সাহস পেত না নিবে।"

"আরে, না না না! সে সব কিছু নয়। ও সব ছেলেই ওই এক আলাদা ধাতুর। একটা জিদ নিলে, দমাতে ওদের কেউ পারে না। আর এ জিদ ত সে ক'রবেই। তোমরাই ভুল ক'রেছিলে তখন। তোমার দাদাকে—যার সঙ্গে তার এত শত্রুতা তাকে—সে বাড়ীর সরিকিতে ব'সতে দেবে কেন? সহজে কেউ এমন দেয় না।"

"সহজে না দিক্, দায়ে প'ড়লে দেয়।"

"কি দায়ে তাকে ফেল্‌বে?"

"যাদব কেন তার বাড়ীর অংশ একটা বেনামী কবলা ক'রে দাদাকে ছেড়ে দিক্ না? তা হ'লে দেখে নেব, বাড়ী দখল করা যায় কি না।"

"তাতেও পারবে না। কেবল একটা ফৌজদারী দাঙ্গা ফ্যাসাদ হবে,—খুনোখুনি না হয় ত ভাল। লোকের বল ত তারও আছে। তোমরা ত তোমরা, যাদব নিজে গিয়েও তা পারবে না। পাড়ার সব লোক এসে আড় হ'য়ে প'ড়বে। তার মাও ত নেহাৎ সহজ মেয়েমানুষ নন্।"

"তা হ'লে আপনি কি বলেন?"

"আপাততঃ ত কিছুই ব'লতে পাচ্চি নে। তাকে জব্দ ক'ত্তে চাও ত অন্য চেষ্টা দেখ। তার বুকে ব'সে তাকে কিলোতে যেও না—বেণী কিল নিজেরা খাবে।"

"আচ্ছা, আপনি যাদবকে একবার ব'লেই দেখুন না। এটা ত সে ক'রে দিক্, তারপর দেখা যাবে কি হয়। দাঙ্গার ভয় দেখায়, পুলিশ নিয়ে গিয়ে দখল ক'রব।"

বেণীবাবু কহিলেন, "পুলিশ ক'দিন তোমার দখল পাহারা দেবে? তারা চ'লে এলেই সে গলাধাক্কা দিয়ে তোমার দাদাকে বের ক'রে দেবে। লাভের মধ্যে কেবল মামলার উপরে মামলা ক'রে নাস্তানাবুদ হবে।"

অম্বিকা ঘোষাল কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "তা হ'লে আপনি কি ব'লেন?—এত বড় অপমানটা অম্‌নি হজম ক'রে যাব? দাদা কি আর গাঁয়ে টিঁকতে পারবেন এর পর?"

বেণীবাবু তাঁর গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিয়া কহিলেন, "ঘোষাল, ভুল চাল একটা চেলেছিলে, এ ছাড়া উপায় কিছু দেখ্‌ছি নে। বাড়াবাড়ি ক'ত্তে গেলে, আরও ঠকতে হবে,—বেজায় বেগ পেতে হবে এর পর। আমার বুদ্ধি যদি শোন—এ সব ঝগড়া এখন ছেড়ে দেও। নিবারণ নেহাৎ বদ ছেলে নয়, তোমার দাদার বাস্তবিক কোনও মন্দ সে ক'ত্তে চায় না। পুকুরটা সাফ ক'রেছিল,—কি এমন ক্ষতি

তোমাদের তাতে হ'য়েছিল ? তা' নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি ক'ত্তে গিয়ে তোমার দাদা তখন বুদ্ধির কাজ করেন নি।"

ঘোষাল একটু চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, "কেবল কি তাই ? আরও ত——"

"আর ত ওই তারকের পরিবারের কথা, সেটাও তোমরা ভুল বুঝেছ। দুঃখ ক্লেশ পায়, কিছু সাহায্য তার ক'রেছে। সে ত ঢের অমন ক'রে থাকে শুনেছি। এতে এটা তোমরা মনে ক'রে কেন নিলে যে তাকে উস্কে দিয়ে একটা সরিকি মাম্‌লা বাধিয়ে তোমাদের জব্দ ক'র্‌বে সে। নিবারণ—যদ্দূর বুঝ্‌তে পারি—গোঁয়ার হ'ক্, অমন পেঁচুটে কুট-বুদ্ধির ছেলে নয়। কি জান, ঘোষাল, যার সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে তুল্‌ছ সে কি ধাতুর লোক, সেটা আগে বুঝে নিতে হয়। নইলে ভুলে ভুলে মেলাই বাজে ঝগড়া বেধে ওঠে, আর কেবলই ঠক্‌তে হয়।"

ঘোষাল উত্তর করিলেন, "আপনি যা ভাব্‌ছেন অত সরল সহজ লোক সে নয়। ভাই হ'লে কি হয়, যাদবে আর তাতে—অনেক তফাৎ।"

বেণীবাবু হাসিয়া কহিলেন, "সেটা যা ব'লেছ ঠিক্ ঘোষাল। তোমাদের খাতির না ক'ল্লে পাছে ব্যবসায় তার কিছু ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় যাদব যা ক'রেছে—আবও হয়ত যা ক'ত্তে পারে, কেটে ফেল্লেও নিবারণ তা ক'ত্ত না। মানুষ চেননি তোমরা ঘোষাল। তোমাদের আসলে ক্ষতি সে কিছু ক'র্‌বে না; আর সহজে জব্দও তাকে ক'ত্তে পার্‌বে না। দমবার ছেলে সে নয়। এই ত—কি ক'ল্লে তার ? যাদবকে বাড়ীতে পাঠালে,—যাদবই নিজের ভাগী হ'য়ে এল, নিবারণের ত শাপে বর হ'ল। ভায়ের মুখাপেক্ষী ছিল, এখন আলাদা হ'য়ে জমিটমি ক'রে নিয়ে ব'সেছে,—দেখো, বেশ গুছিয়ে নেবে, কোনও দুঃখ পাবে না। বাড়ীর ভাগ নিতে গিয়েছিলে, তোমাদেরই বেকুব হ'য়ে ফির্‌ত হ'ল। আর যাদব বেচারী—তাকে যা লোকে ছি ছি ক'চ্চে, সে আর কি ব'লব!"

ঘোষাল একটু মুখ ভার করিয়া কহিল, "বেকুব হ'য়ে এসেছি—তাই ত প্রতিকার চাই। যাদবের অবিশ্যি একটু নিন্দে হবে,—তা যাহা বায়ান্ন তাহা তেপান্ন—আর এই কবলাটা যদি সে ক'রে দিত—"

"তা—ব'লে দেখ্‌তে পার, কিন্তু যাদব কি তাতে রাজি হবে ? আমিই বা এতটা তাকে কি ক'রে বলি ? এতে যে তার স্বার্থহানির বড় একটা আশঙ্কা র'য়েছে! তার পৈতৃক বাস্তু, তোমার দাদাও ত—শেষে একটা গোলমাল ক'ত্তে পারেন ? আর ব'ল্লুম ত, যাদবকে দিয়ে এ সব সরিকির প্যাঁচে তাকে জব্দ ক'ত্তে পার্‌বে না।—এতে লাভ হ'চ্চে এই যে তাকেই বড় ক'রে তুল্‌ছ, যাদবকে মিছে ছোট ক'চ্চ,—আর তোমরাও বেকুব হ'চ্চ।"

ঘোষাল সাভিমান ক্ষোভে উত্তর করিলেন, "আপনার আশ্রয়ে আছি—আর ঐ একটা মুখ্‌খু গেঁয়ে ছোঁড়া—এম্‌নি ক'রে আমাদের অপমান ক'রে বাহাদুরী নিচ্ছে,—বরাত বরাত! সবই আমাদের বরাতে হয়। কিন্তু লোকেও ত ব'ল্‌বে, বেণী বোসের মুরোদ ত ভারী। তার আশ্রিত ঘোষালদের নিবারণ সাত ঘাটের জল খাওয়াল, কিছুই ক'ত্তে পারল না।"

বেণীবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ঘোষাল, দুঃখিত হয়ো না। তাকে তোমরা জব্দ ক'ত্তে পার, আমার আপত্তি কিছু নেই। সাহায্য ক'ত্তেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোনও বেকুবির মধ্যে যেতে আমি পরামর্শ দিইনে। আমি ব'ল্‌ছি—যাদবকে দিয়ে তাকে জব্দ ক'ত্তে আর গেলে—কেবল তোমাদের কেন আমার ও মুখ ছোট হবে। সবুর কর না ? দেখ, চোক্ রাখ,—ফাঁক যখন পাও, চেপে ধ'র্‌বে। এখন এ পথে কিছু হবে না। যত খোঁচাবে—তত তাকেই তুলে দেবে, নিজেরা নাম্‌বে।"

ঘোষাল একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "তা—যা বলেন আপনি। তবে ক'দিনের জন্য একটু বিদায় চাই,—একবার দেশে যাব।"

"গিয়ে একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ ত বাধাবে না ?"

"না—না। দাঙ্গা ফ্যাসাদ আর কি নিয়ে বাধাব ? দাদা বড্ড মন মরা হ'য়ে আছেন, একবার দেখে আসি গে। আর মেয়ের সম্বন্ধটাও একেবারে পাকাপাকি ঠিক্ ক'রে আস্‌তে হ'চ্চে এখন। কে আবার ভাংচি দিয়ে ভাগিয়ে নেবে।"

"তা—যেতে পার একবার। তবে নিবারণের সঙ্গে খামোকা একটা ঝগড়া গে বাধিও না। তাতে এখন সুবিধে কিছু হবে না।"

"না—না—তা' ক'র্‌ব না। তবে এও ব'লে যাচ্ছি—কোনও ফাঁক্ খুঁজতেও ছাড়্‌ব না। আপনি যাই-ই বলুন,

ওঁহারামজাদা যে আমাদের ছোট ক'রে গাঁয়ে উচু মাথা তুলে থাক্‌বে —তা এ প্রাণ থাক্‌তে বরদাস্ত ক'ত্তে পার্‌ব না!"

"তা দেখ, ফাঁক কিছু পাও কেন ছাড়বে? তবে কি জান, শত্রুতা যদি ক'ত্তে চাও-নেহাৎ সহজ শত্রু তাকে মনে করো না। যত দুর্ব্বল আর নগণ্য তাকে ভাবছ, সে তা নয়। আমি ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি—তার সব কথা শুনে। কোনও বড় স্বার্থ এর মধ্যে কিছু নেই, শুধুই মনের রাগ। এ রকম লোকের সঙ্গে এ সব ঝগড়া বাড়িয়ে না তুলে মিটিয়ে ফেল্লেই ভাল হয়। সেটাও ভেবে দেখো।"

ঘোষাল আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গৃহিণীর নিকটে গেলেন। বেণীবাবু তাঁহার কাগজপত্রের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

(৩০)

রাজতরঙ্গিণী সব কথা শুনিয়া অবশ্য তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন, তেলেবেগুণেই যে একথায় জ্বলিতে হয়,—না হলে তাঁর মত মহিমাময়ী গৃহিণীর মান থাকিবে কেন! অবশ্য বিস্তর বকাবকি করিলেন। কিন্তু কেবল ঘরে বসিয়া বকিলেই বা চলিবে কেন? যাদবের বউটাকেও ত কড়া দুকথা শুনিতে হইবে। সুতরাং সে দিন তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল, নিজে যাইতে পারিলেন না,—চারুমুখীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর এক কথা নিয়া রোজ তার বাড়ীতে যাইয়া গিয়াই বা বকিবেন কেন? একদিন কি বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াই তিনি তাহাকে গালি দিতে পারেন না? দিয়া তাকে বুঝাইতে পারেন না, তিনি কত বড় একজন ব্যক্তি? সে আসিলে আগে তার শাশুড়ী ও দেবরকে যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি পাড়িলেন। তারপর যাদবও স্বয়ং চারুমুখীকে নিয়া পড়িলেন। ইহারা উভয়েই যে তলে তলে বজ্জাতী চাল চালিতেছে, এ কথা অনেকবার ধম্‌কাইয়া শুনাইলেন,—তাঁহাদের বিরুদ্ধে এত দূর দুঃসাহস যে তা'দের মোটেই ভাল নয়,—তাহা অতি কঠোর ভাষায় প্রতিপন্ন করিলেন। এইরূপ চাল চালিলে যে বিস্তর দুঃখ তাহাদের পাইতে হইবে, তিনি ও কর্ত্তা উভয়েই তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইবেন,—এইরূপ ভয়-প্রদর্শনও অনেক করিলেন। কাঁদিয়া চারুমুখী সে দিন গৃহে ফিরিল। রাজতরঙ্গিণীর গর্ব্বিত ব্যবহারে অনেকদিনই চারুমুখী মনে মনে কিছু অপমান বোধ করিয়াছে, কিন্তু স্বার্থহানির আশঙ্কাই মনেই তাহা চাপিয়া রাখিয়াছে,—রাখিয়া রাজতরঙ্গিণীকে সন্তুষ্ট করিবারই প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু আজ বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া এই ভাবে তাঁকে আর স্বামীকে মাগী গালি দিল! তারপর শাশুড়ী আর দেবরের কথা,—হাজার হ'ক্, তারা আপনার জন ত! পর একজন যখন তখন বাড়ীতে আসিয়া তার বাড়ীতে ডাকিয়া—অথবা নিয়া এই রকম যা' মুখে আসিবে তাই বলিয়া তাদের গালি দিবে কেন? ছি! ছি! ছি! ঘরের দাসী বাঁদীকেও কেহ নাকি কথায় কথায় এমন করিয়া গালি দিতে পারে! মনটায় আজ ব্যথাটা বড়ই বাজিয়াছিল,—তাই বাসায় ফিরিয়া চারুমুখী গৃহকর্ম্মাদির পরিদর্শন করিতে পারিল না—স্বামী ও ছেলেদের খাবারের জন্য ঝিকে কয়টি পয়সা ফেলিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল,—পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আগে যাদব বাসায় ফিরিল। শয্যাশয়িতা ক্রন্দিতা পত্নীকে দেখিয়া তার বড় ভয় হইল। মাতার পত্রই যে এই দুর্জ্জয় মানের কারণ, সে বিষয়ে যাদবের সন্দেহ মাত্র রহিল না। পত্র পড়িয়াই চারুমুখী বড় কুটিল ভ্রূকুটি করিয়াছিল,—সে কাছারী যাওয়া পর্য্যন্ত চারুমুখখানি ভার আঁধার করিয়াই ছিল। সারা দ্বিপ্রহর কত কি ভাবিয়া না জানি এই অতি ভীষণ মান করিয়াছে। হয়ত বা বসু-গৃহিণীও আসিয়া উস্কাইয়া দিয়া গিয়াছেন। না জানি চারুমুখী এখন কি বলিবে,—কি অসাধ্য সাধনের পণে না জানি মহা-মানিনীর এই মান তাকে আজ ভাঙ্গিতে হইবে! কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তার ভরসা হইল না। আস্তে আস্তে, ধড়াচুড়া সব ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে বসিল,—বহুক্ষণ ধরিয়া সে তামাকু সেবন করিল। তারপর হাতমুখ ধুইয়া আসিল।—আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপরে তার খাবার, জল ও পাণ রহিয়াছে। একটু হাসিও যাদবের পাইল। নিঃশব্দে জলযোগ করিয়া সে আবার বারান্দায় গিয়া বসিল,—আবার কতক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইল। শেষে আর থাকিতে পারিল না,—মনটা বড় উস্‌খুস্ করিতেছিল।—আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া শয্যাপ্রান্তে চারুমুখীর পায়ের কাছে বসিল,—চারুমুখী পা টানিয়া গুটাইয়া নিল।

ভয়ে ভয়ে যাদব ডাকিল, "চারু! চারু!" চারুমুখী কোন উত্তর করিল না। আরও ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। যাদব যারপরনাই সঙ্কুচিতভাবে আবার কহিল, "কি

হ'য়েছে চারু? কাঁদ্‌ছ কেন? তা—কি ক'র্‌ব বল—আমি ত——

"কি ক'র্‌বে তা তুমি জান। আমি রোজ রোজ আর এ অপমান সইতে পার্‌ব না। ছি—ছি—ছি! ঘেন্নায় যেন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়! কেন, আমি মেয়েমানুষ ঘরের বউ—আমাকে কথায় কথায় এত কথা শুন্‌তে হয় কেন?"

বলিতে বলিতে চারুমুখী উঠিয়া বসিল। যাদব ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিল।—কহিল, "কেন, কি হ'য়েছে? বোস্‌ গিন্নি এসেছিলেন বুঝি?"

"আসেন নি,—এলেও ত হত। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ীতে নিয়ে তার বউ, মেয়ে, ঝি, চাকর সবার সাম্‌নে—যাচ্ছে তা' ক'রে, কি গাল না আমাকে দিল,—কি ধম্‌কানিই না ধম্‌কাল—যেন আমি তার কেনা দাসী। আমার সাম্‌নে তোমাকে পর্য্যন্ত না ব'ল্লে এমন কুকথা নেই। লেখাপড়া শিখেছ, উকিল হ'য়েছ, নিজের বিদ্যে বুদ্ধিতে যদি ওকালতী না ক'ত্তে পার,—পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষ ক'রে খাও। নিজের স্ত্রীর মান যে রাখ্‌তে না পারে, তার আবার সহরে এ উচুপদের ঠাট কেন?"

যাদব মাথা নাড়িয়া নাতিদীর্ঘ একটি "হুঁ" শব্দ উচ্চারণ করিল। বড় একটা স্বস্তি যেন সে বোধ করিল। মনে মনে একটু আনন্দিতও হইতেছিল। অন্য সময় অন্য কোনও ব্যাপার উপলক্ষে চারুমুখী এরূপ রূঢ় কথা বলিলে, তার গ্লানির ও মনঃপীড়ার অবশ্য অবধি থাকিত না। কিন্তু আজ—হাঁ, ঠিক্‌ হইয়াছে! চারুমুখী, বড় আঘাত পাইয়া বুঝিয়াছে, বড়লোকের কৃপার্থী হইয়া তা'দের হুকুমে যা' তা করিতে প্রস্তুত হওয়াটা ঠিক্‌ নয়। চারুমুখী এত দিন না করিলে, সে কি বেণী বসুর কথায় এতটা হীনতা কখনও স্বীকার করিত?

চারুমুখী কহিল,—"হুঁ বলেই যে চুপ ক'র্‌লে বড়? তা' আমি স্পষ্ট বল্‌ছি এ সব অপমান আমি সইতে পার্‌ব না। তোমরা বাইরে কাজ কর,—যা খুসী তাই-গে কর। ঘরে কেন পরে এসে তাই নিয়ে আমাকে রোজ গাল দেবে? বাড়ীতে ডেকে নিয়ে অপমান কর্‌বে?"

"সেটা অন্যায়—অতি গুরুতর অন্যায় কথা।"

"অন্যায় মুখে বল্লেই ত কেবল হয় না। এর প্রতিকার কিছু ক'র্‌বে না?"

"প্রতিকার—আমি কি ক'ত্তে পারি? প্রতিকার যদি কিছু থাকে ত তোমার নিজেরই হাতে।"

চারুমুখী উত্তর করিল,—"তা' আমি ব'ল্‌ছি, আবার যদি উনি আসেন, অবশ্যি খামোকা কোনও অভদ্রতা আমি ক'র্‌ব না—কিন্তু অন্যায় কথা কিছু বলেন যদি, আমিও দু-কথা শুনিয়ে দেব। ডেকে যদি পাঠান আর যাব না। নিজের শাশুড়ী—তিনি দু-কথা ব'ল্লে কখনও সইনি—আর উনি কে যে যা' মুখে আসবে তাই আমাকে বল্‌বেন, আর আমি মুখ বুজে তাই সয়ে যাব?"

"কেন সইবে? কেনই বা সয়েছ এদ্দিন? প্রথম থেকে যদি একটু শক্ত হ'তে, তিনিও এতটা বাড়াবাড়ি ক'ত্তে ভরসা পেতেন না।"

"স'য়েছি ত তোমার ভাল চেয়ে। বোস্‌মশাই না পেছনে থাক্‌লে তোমার না কি ওকালতীতে পশার থাক্‌বে না,—তিনি চ'টলে তোমার ক্ষতি হবে, তাইত, বোসগিন্নীর এত দেমাক—এত মুখনাড়া চোকা মুখ বুজেও আমাকে সইতে হ'য়েছে!"

যাদব কহিল, "ঐখেনেই বড় ভুল ক'রেছ চারু। আমার পশার—ব্যবসায়ে আমার লাভ লোকসান—এ সব আমি দেখ্‌ব। অপমান যদি কিছু সইতে হয়, বাহিরে না হয় আমিই সইব। কিন্তু সে অপমান ঘরে তোমাকে পর্য্যন্ত এসে পৌঁছবে কেন? পৌঁছ্‌তে তুমি দেও কেন?"

চারুমুখী উত্তর করিল, "আট দশ বছর ওকালতী ক'রে এদ্দিনে ক'ল্লে কি? নিজের ক্ষমতায় যদি কিছুই না পার্‌বে, এখনও যদি ওই বেণী বোসের ইসেরায় উঠ্‌তে ব'স্‌তে হবে, তবে ওকালতী ক'ত্তে এলে কেন? এর চাইতে কোনও চাক্‌রী বাক্‌রী ক'ল্লেই হ'ত?"

"না পারি, চাকরী বাকরীরই চেষ্টা এরপর দেখ্‌ব। তুমি যদি না বল, বেণী বোসের ইসারায় উঠ্‌তে ব'স্‌তে ইচ্ছে আর নাই।"

"আমি ব'ল্‌ব!—হঁা, আমার দোষই ত এখন দেবে। কবে আমি ব'লেছি যে বেণীবোস্‌ যা বলে তাই কর,—মান অপমানের দিকে চেও না। না, এমন নিঘিন্নে ছোট-মনের মেয়েমানুষ আমি নই। তবে তোমার ভেয়ের এই কথা,—তা যা বলেছিলুম, সে কি বোস্‌গিন্নীর হুকুমে

ব'লেছিলাম ? গুরুতর একটা অন্যায় সে ক'রেছে—তুমি বড় ভাই—তাকে শাসন তোমার ক'ত্তে হয়, তাই ব'লেছিলাম।"

"তা ঠিকই ত—তা ঠিকই ত! তুমি ব'লেছ—তা ত বলিনি। তবে আমার অনিষ্ট পাছে কিছু হয়—তাই ভেবে এর পর না ব'ল—তাই ব'লছিলাম ——"

চারুমুখী বলিতে লাগিল, "আর এই যে নূতন গোলমালটা বাধাল—সেইটিই কি তার উচিত হ'য়েছে? বাড়ীতে কি দাবীদাওয়া তোমার কিছু নেই? গায়ে প'ড়ে তোমায় ত্যাগ ক'রে যদি আলাদাই হ'ল, তোমার সম্পত্তির উপরে এত জোর সে কেন করে? আর তোমার মা—ব'ল্লে চ'ট্‌বে—তিনিই কি ভাল ক'রেছেন? কেবল ত তোমার ফ্যাসাদই তিনি বাড়াচ্ছেন? তা আজ এ আর নূতন কি? বরাবরই দেখ্‌ছি, ঐদিকেই কোলটানা তিনি। আরও মাসে দশ টাকা ক'রে খরচ পাঠাবে তুমি!"

"হুঁ—নিবারণেরও কাজটা মোটেই ভাল হয়নি! আচ্ছা, দেখা যাক্,—ছাড়্‌ছিনা আমি।"

"ছাড়্‌বে না কি ক'র্‌বে তার তুমি? ক্ষমতা যে কত, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। সেই ত তার সব জেদ বজায় রেখে চ'ল্‌ছে,—যা খুসী তাই ক'চ্ছে। কোন্ কথাটা তোমার থাক্‌ছে? লাভের মধ্যে গাঁয়ে নিন্দের ভাগী, আর এখানে অপমানী হ'চ্চ। তার ত ষোলআনা মজা! তোমাকে সাত ঘাটের জল খাওয়াচ্ছে, আবার তোমার টাকাতেই জমাজমি বেশ গুছিয়ে নিচ্চে—নইলে পেল কোথা? আবার মাকে সামনে খাড়া ক'রে, মাসে মাসে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে খরচ নেবে? এই ত ওকালতী বুদ্ধি—আর এই ত ক্ষমতা! এখন দেখ্‌ছি,—তার বুদ্ধি, তার ক্ষমতা তোমার চেয়ে ঢের বেশী। তুমি তাকে ছাড়বে না কি, সে তোমাকে ছাড়ে ত তোমার ভাগ্যি।"

যাদব উত্তর করিল, "এক হিসেবে বেশী বই কি চারু? আমি লেখাপড়া শিখেছি, ওকালতী ক'চ্ছি,—তবু পরের মুখ চেয়ে চ'ল্‌তে হয়। আর সে অশিক্ষিত গেঁয়ে এক ছোঁড়া—বেপরোয়া হ'য়ে যা ভাল বুঝছে তাই কচ্চে, কারও তোয়াক্কা রাখ্‌ছে না। আবার নিজের খাওয়া পরারও সংস্থান ক'রে যা নিল, দুঃখ ক্লেশ বোধ হয় কখনও পাবে না। কারও মুখও কখনও চাইতে হবে না।"

"এ কথা ব'ল্‌তে একটু লজ্জা হ'ল না? ভাতকাপড় দিয়ে এদ্দিন পুষেছ—এখন পদে পদে তোমায় জব্দ ক'চ্চে—আবার তারই বাহাদুরী ক'চ্চ,—ছি—ছি—ছি! ঘেন্নায় আমার গলায় দড়ী দিয়ে ম'র্‌তে ইচ্ছে হয়।"

"জব্দ ক'চ্চে,—সে অবসর যে আমিই দিয়েছি। বেণী বোসের কথায় হরি ঘোষালের হাতে বাড়ীর ভার দিতে যাওয়াই হদ্দ বেকুবী হ'য়েছিল আমার।"

"তা, এখন কি ক'ত্তে চাও? অবিশ্যি আমি এমন কথা ব'ল্‌ছি না যে বোসেদের কথায় মা ভেয়ের সঙ্গে ঝগড়া কর। কিন্তু সে যে তোমার এটা অপমান ক'ল্লে—তোমাকে একেবারে অগ্রাহ্যি ক'রে তার জিদই বজায় রাখ্‌ল—এও কি চুপ ক'রে স'য়ে যাবে? কিছু প্রতিবিধান ক'র্‌বে না?"

"দেখি কি ক'ত্তে পারি? ভুল যে গোড়ায় আমারই হ'য়েছিল——"

"তবে আর কি?, যাও—কালই দেশে ছুটে যাও,—গাঁয়ের লোক ডেকে সবার সাম্‌নে পায় ধ'রে গে মাপ চাও! এই বুদ্ধি আর এই ক্ষমতা না হ'লে আজ এই দশ বচ্ছর ধ'রে শামলা মাথায় দিয়ে বেণী বোসের ল্যাজ ধ'রে বেড়াচ্চ!"

উঠিয়া চারুমুখী বাহিরে চলিয়া গেল। যাদবও ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় গিয়া তাকিয়ার আশ্রয় অবলম্বন করিল।

(৩১)

শিবুর পিতা সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। পাশের গ্রামেই জমিদারের এক কাছারী ছিল, সেখানে তিনি দপ্তরখানার কাজে নিযুক্ত ছিলেন,—কিছু জমি করিয়াছিলেন, বৎসরের ধানটা আসিত। পৈতৃক নগদ সম্পত্তিও কিছু ছিল, সুদে খাটিত।—ইহাতে সচ্ছন্দে মোটা ভাত কাপড়ে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত,—পালপার্ব্বণাদিও কিছু করিতেন। তবে বি এ পর্য্যন্ত শিবুর পড়ার খরচ চালাইতে কিছু ক্লেশ তাঁহাকে পাইতে হইয়াছে। কিছু দেনাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লগ্নী পৈতৃক মূলধন তুলিয়া খরচ করেন নাই। দেনা মাথায় থাকিলে তাহা শোধ হইবে। কিন্তু লাগান টাকা তুলিয়া ভাঙ্গিলে তা আর পুরিবে না,—সহজবুদ্ধিতে তিনি এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। ঘোষালরা লোক ভাল নয়, মনে মনে তাহাদের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। গৃহিণীও ঘোষালদের ঘরের মেয়ে আনিতে নারাজ ছিলেন। ঐ বাম্ম—মাগো! তার ত ভাইঝি: সে কি কখনও ভাল হইতে পারে?

ও ঘরের মেয়েরা সব রণচণ্ডী। অবশ্য বামাব্যতীত ঘোষালদের আর কোনও সহোদরা ছিল না। পিতৃ সহোদরা কে কে নাকি ছিলেন,—কিন্তু তাঁহাদের কেহ চক্ষেও কখনও দেখে নাই, অথবা রণচণ্ডিকাত্বের খ্যাতিও কেহ শুনে নাই। কিন্তু বামা একাই এত প্রচণ্ডা ও ব্যাপিকা ছিলেন, যে বোধ হয় ঘরে আরও সাতটি সুশীলা ভগ্নী বর্ত্তমানা থাকিলেও, তাঁহাদের সে সুশীলত্ব কাহারও চক্ষে পড়িত না! তারপর বামার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে দেখিত, ঝগড়াটে পেঁচুটে তাঁহার সহোদর ওই হরিঘোষালকে। তাই লোকের কেমন একটা সংস্কার হইয়া গিয়াছিল,—ঘোষালদের ঘরের মেয়ের কথা হইলেই সকলে বলিত—ওরা সব রণচণ্ডী! যাহাহউক, ঘোষালরা যে টাকা দিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে দেনা যাহা হইয়াছে সব শোধ দিয়াও বেশ ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। আবার পাঁচজনে বলিয়াছিল, অম্বিকা ঘোষালের মেয়ে বিবাহ করিলে বেণী বসু মুরুব্বি হইবেন,—ওকালতীতে বসিলেই শিবুর পশার জাঁকিয়া উঠিবে। তাই অন্যান্য আপত্তির কারণ সত্ত্বেও সর্ব্বানন্দ এই সম্বন্ধ করিতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিবুর মাও আগে অনেক ঝগড়া করিয়া শেষে একরূপ সম্মতি দেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, অম্বিকা ঘোষাল মেয়েকে গা-ভরা সোণার অলঙ্কার দিয়াছে। তা—বামা মন্দ বলিয়া অম্বিকার মেয়ে মন্দ হইবে, এমন কথা কি আছে? হরি-ঘোষাল যতই লক্ষ্মীছাড়া হউক, অম্বিকা কি তেমন? তারা সপরিবারে সহরে থাকে, তরিবৎ অনেক ভাল। ইত্যাদি সব যুক্তিও ক্রমে শিবুর মার মাথায় আসিয়া তাঁহার মনটা নরম করিয়াছিল। ভবানীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও এই যুক্তির সমর্থন করেন।

সম্বন্ধ প্রায় স্থির হইয়াছিল,—কেবল সাক্ষাৎ মত পাকা কথা আর পাকা দেখা-দেখি বাকী। ইহার মধ্যে এই সব গোলমাল বাধিয়া উঠিল। শিবুর বরাবরই এই সম্বন্ধের প্রতি একটা বিরাগ ছিল,—এখন সে শক্ত জিদ করিয়া বসিল, ঘোষালদের মেয়ে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। পিতা যদি পীড়াপীড়ি করেন, সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

সর্ব্বানন্দ নিজেও মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। বেণীবসু আর অম্বিকা ঘোষালের কুচক্রে যাদব কি না করিল! ছি! তারপর হরিঘোষাল যে বাড়ী দখল করিতে আসিলেন, ইহাতে একা তিনি কেন, গাঙ্গুলী পাড়ার সকলেই যারপরনাই রাগিয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলীদের মধ্যে প্রবল একটা জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ছিল। আপনারা ঝগড়াঝাঁটি যতই করুক, বাহিরে কাহারও সঙ্গে বিবাদের সূচনা হইলে, পাড়াশুদ্ধ লোক এক জোট হইয়া দাঁড়াইত। ঘোষালদের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের সামাজিক একটা আড়াআড়ি ভাবও বরাবর ছিল। বিশেষ হরিঘোষালকে কেহই দেখিতে পারিত না। সেই হরিঘোষাল আসিয়া তাহাদের পাড়ার এক বাড়ীর ভাগ দখল করিয়া বসিবে, সরিকী ঝগড়া করিবে,—কে জানে, হয়ত কোনও দুর্দ্দান্ত ছোট লোককেই আনিয়া সেখানে বসাইবে, কাহারও মান ইজ্জৎ থাকিবে না! পাড়াশুদ্ধ লোকই তাই হরিঘোষাল ও তাহার ভাই অম্বিকা ঘোষালের বিরুদ্ধে একবারে আগুন হইয়া উঠিল। সে আগুন সর্ব্বানন্দকেও বেশ স্পর্শ করিয়াছিল। তাই শিবুর এই আপত্তিতে তিনি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না। ওদিকে শিবুর মাও জিদ করিয়া বলিলেন,—না, এ বিবাহ হইতেই পারে না। বেণীবসুর মুরুব্বিয়ানায় ওকালতী করিয়া শিবু ত শেষকালে পাঁচ টাকা মাত্র তাঁর মাসোয়া বরাদ্দ করিয়া দিবে! না, থাক্, এ মুরুব্বিতে কাজ নাই। বাঁচিয়া থাক্, লেখাপড়া শিখিয়াছে,—দুপয়সা রোজগার করিতে পারিবেই।—কত ছেলে বি এ পাশ করিয়াছে—করিতেছে। কয়জনের বেণীবসু মুরুব্বি আছে? তারা কি রোজগার করিতেছে না,—না করিবে না? এক পণের নগদ টাকা। তা ছেলে বি-এ পাশ দিয়াছে,—অম্বিকাঘোষাল যে টাকা দিতেছে, সে টাকা অনেকেই দিবে। পাঁচখানা সোণার গয়না? তা যার আছে, সেই আজকাল মেয়েকে দিয়া থাকে। অম্বিকাঘোষাল একাই ত আর সব সোণার মালিক হইয়া বসে নাই। করে ত মুহুরীগিরি, কত সোণাই সে চক্ষে দেখিয়াছে!

পাড়ারও পাঁচজনে বলিল, না ঘোষালদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিও না। প্রবীণারা কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, ওদের ঘরের মেয়েদের কপালও ভাল নয়। ওই ত বামা ছেলেবেলায় বিধবা হইয়া ভাইএর ঘরে আসিয়া রহিয়াছে। না, অমন অলক্ষুণে ঘরের মেয়ে রাজার ঐশ্বর্য্য পাইলেও আনিতে নাই।

যাহাহউক, আপত্তিগুলি সব আবার প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। একরূপ স্থিরই হইল, এ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এসব কথা ঘোষালদের কাণেও গেল। চন্দ্রমণি ঘন ঘন গাঙ্গুলীপাড়া ও ঘোষালপাড়ার মধ্যে যাতায়াত করিতেছিলেন। আর কেবল চন্দ্রমণিরই বা অপেক্ষা কি? এ সব আলোচনা কিছু নিভৃতে চুপি চুপি হইত না,—অনেকের কাণেই যাইত,—গ্রামময় একরূপ রাষ্ট্র হইয়াই পড়িয়াছিল। বামা রুদ্ধ বাঘিনীর মত বাড়ীতে গজরাইতে লাগিলেন। অম্বিকা আসিতেছে,—একটা হেস্তনেস্ত সে করিবেই। সুতরাং আগেই তাদের বাড়ীতে ধাইয়া গিয়া গালিগালাজ করাটা ভাল নয়। আর গালিগালাজের দিন ত ফুরাইয়া যাইতেছে না। সম্বন্ধটা তারা ভাঙ্গুক না? গাঙ্গুলী পাড়ার হারামজাদা হারামজাদীদের তখন তিনি দেখিয়া নিবেন। আর নিবে গুওটা—নির্ব্বংশ হবে—নির্ব্বংশ হবে - নির্ব্বংশ হবে! এ দিকে যদি পা কখনও দেয়—মুড়োখ্যাংরা তার মুখে তিনি মারিবেন! সেই হারামজাদা আটকুঁড়ীর ব্যাটাই ত সব নষ্টের মূল! নহিলে ওই সর্ব্বা গাঙ্গুলী—তার এমন বুকের পাটা হয় যে অম্বিকাকে কথা দিয়া এখন এই সম্বন্ধে সে ভাঙ্গিয়া দেয়!

অম্বিকা বাড়ীতে আসিয়া সব কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইলেন। নিবারণের উপরে রাগ তাহার শতগুণে বাড়িল। রাত্রিটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়া সকালেই তিনি গিয়া সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

আজকালকার ইংরেজি পড়া পাশকরা সব ছেলে—বাপমার কথা শোনে না—এখন বিবাহ করিতে চায় না—উহাদের মতিগতি ওই এক আলাদা রকম—কিছুতেই তাকে বাধ্য করিতে পারিলেন না,—ইত্যাদি সব আপত্তির কথা তুলিয়া সর্ব্বানন্দ জানাইলেন, পাকা কোনও কথা তিনি দিতে পারিতেছেন না। অম্বিকা ঘোষাল প্রথমে অনেক অনুনয় করিলেন,—শেষে সম্বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রাগিয়া অনেক ধমকাইয়া শাসাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হায়, হায়! এই সম্বন্ধই যদি ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবে কেন সেই পুকুরের দাঙ্গার সময় এই গুণ্ডার দলকে ক্ষমা তাঁহারা করিয়াছিলেন! স্বদেশীওয়ালা একটা গুণ্ডার দলের জুলুম বলিয়া নালিশ দিলে যে দলশুদ্ধ বাঁদরেরা জেলে যাইত!

হরিঘোষাল কহিলেন, "সেটা কি এখনই করা যায় না অম্বিকা? ওই যে তোরা স্বদেশী স্বদেশী বলিস্, ওরা ত তাই-ই, নইলে ভদ্দর লোকের ছেলেগুলো—দল বেঁধে ওরা এর পুকুর সাফ করে, ওর জঙ্গল ঝোরে—তার ঘর বাঁধে,—আর বুড়োবুড়ো লোকদের সব অপমান করে! ঐ যে জমিটমি নিয়ে চাষবাস আরম্ভ ক'ল্লে, আর ওই শরতা হতভাগা চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে গিয়ে জুট্‌ল—দলবেঁধে ছেলেগুলো গিয়ে কি পূজো ক'ল্লে—নামও কখনও শুনিনি,—এ সব কি? আর ওই তারিণী বাড়ুয্যে—সরকারী পঞ্চায়েতী করে—পালের গোদা হ'ল সে। আমরা গেঁয়ে লোক—আইনকানুন বুঝিনি। তোরা সহরে থাকিস্, মামলা মোকদ্দমা কত করিস্, পুলিশ হাকিম—এদের সঙ্গেও জানাশুনো কত আছে। গুছিয়ে যদি পুলিশকে ব'ল্‌তে পারিস, কি ম্যাজেষ্টর সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে পারিস্, দলের সব হারামজাদার হাতে হাতকড়ি পড়বে। খালাসও যদি শেষে পায়, ওই নিবে নির্ব্বংশের ব্যাটা হাতপা ভাঙ্গা হ'য়ে থাক্‌বে। কেউ আর তার ছেলেকে তার কাছেও ঘেঁস্‌তে দেবে না। ওই যে শরতার সঙ্গে মিলে জমিটমি ক'রেছে, কে জানে তা নিয়েও হয়ত একটা ফ্যাসাদ বেধে যাবে। পুলিশ এসে যদি দুই একটা খোঁচা দেয়, মজুরও পাবে না। একা হাতে কি ক'র্‌বে সে?"

অম্বিকা নিঃশব্দে অগ্রজের কথাগুলি সব শুনিলেন। শুনিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হু—! আচ্ছা, দেখা যাক্।"

আহারাদি করিয়া বেলা পড়িলে অম্বিকা থানায় গেলেন। সন্ধ্যাসন্ধি বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন, দাদা তারকের স্ত্রী কমলাকে ধাইয়া ধাইয়া গিয়া ঘোরগর্জ্জনে গালি দিতেছে।

ইহার সঙ্গে আর একটি বড় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছিল। শিবু আগেও মধ্যে মধ্যে বলিত, সম্প্রতি বন্ধুদের সকলকেই বলিয়াছিল, ঘোষালের বাড়ীতে যদি বিবাহ করিতেই হয়, তবে বাবা যদি বলেন বরং কুন্তীকে বিবাহ করিবে, অম্বিকা—ঘোষালের মেয়েকে কখ্‌খনো নয়। অবশ্য সর্ব্বানন্দ এ কথা কখনও মনেও করেন নাই। তিনি টাকা চাহিতেন। কুন্তীর মা টাকা ত কিছু দিতে পারিবেই না, তাহার কন্যা ঘরে আনিলে বরং সপুত্রা তাহারই প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু শিবুর বন্ধুরা এদিকটা একেবারেই দেখিল না। শিবুর মত একজন গ্রাজুয়েট ছেলে টাকার লোভ ছাড়িয়া যে অতি দরিদ্রা এক বিধবার কন্যা দয়া করিয়া বিবাহ করিবে, ইহাতে তাহারা বড় একটা সময়োপযোগী দৃষ্টান্তই দেখিল। তারা ঘোঁট করিতে লাগিল, কেমন

করিয়া শিবুর পিতাকে ধরিয়া পড়িয়া এই বিবাহেই তাঁহাকে রাজি করাইবে। নিবারণ প্রথমে ইহাতে অনেক আপত্তি করিয়াছিল। কারণ সে জানিত, শিবুর পিতা কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইবেন না,—অনর্থক পিতা পুত্রে একটা গুরুতর মনান্তর ইহাতে ঘটিবে। কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের পিড়াপীড়িতে শেষে সে বলিয়াছিল, "আচ্ছা, পারত তোমরা দেখ আমি এর মধ্যে একেবারেই নেই। ন কাকা বড় চটুবেন।"

এই ঘোঁটের কথাও চাপা থাকিতে পারে না। দৈবাৎ ঠিক সেই দিনই বামার কাণে এই সংবাদ পৌঁছিল।—কি? এত বড় কথা! তাঁর সহোদরতনয়াকে অবজ্ঞা করিয়া শেষে ওই হাড়হাভাতী হতচ্ছাড়ীর মেয়েকে শিবে এই বাড়ীতে ঝাঁকিয়া আসিয়া বিবাহ করিবে! শয়তানী নিবের সঙ্গে ঘোঁট করিয়া শেষে এত বড় অপমান তাঁহাদের করিতে প্রস্তুত হইয়াছে! তিনি কি না জানেন?— ওই নিবে—আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? অশ্রাব্য অতি কু কথা তুলিয়া তিনি কহিলেন, সে যে কেন এত আম দুধ মাছ তরকারী পাঠায়, ঘর ছেয়ে দিয়ে যায়, তা কে না জানে? কেবলই ঘনাঘনি করিত, পান চিবাইতে চিবাইতে ঘর হইতে যাইত,—এখন সে পথে কাঁটা প'ড়িয়াছে কিনা, —তাই দুয়োরের কাছে পড়সীর ঘরে নিতে চায়! তা নেবে যদি, একেবারে সদরে নিজের ঘরেই নিয়া রাখুক না? লুকোচুরী খেলিয়া পরের জাতি মারে কেন? ইত্যাদি কত কুৎসিৎ কথা বলিয়া কত কুৎসিৎ গালিই যে বামার অনর্গল মুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে নির্গত হইতে লাগিল! যেন ভিস্‌ুবিয়সের মুখ হইতে ভীমশব্দে সধূম উত্তপ্ত ভস্মসহ গলিত দ্রবধাতুর ধারা নিঃসৃত হইতেছে! প্রচণ্ড এই কুৎসাগালির স্রোতের সম্মুখীন হইতে পারেন, এমন শক্তি কমলার ছিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন,—বসিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। কুন্তী আর—সর্ব্ব শরীরে তার যেন অগ্নি ছুটিল। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ঘরের এক কোণে সে বসিয়া রহিল।

অম্বিকা ঘোষাল স্তব্ধভাবে কতক্ষণ ভগ্নীর এই গালিবর্ষণ শুনিলেন।—একি! দিদি বলে কি! এ সব কি কথা! রহস্যটা বুঝিবার জন্য স্বভাবতঃই তাঁহার বড় একটা কৌতুহল জন্মিল। বামাকে তিনি থামিতে বলিলেন। গৃহবাসী জ্যেষ্ঠকে বামা অবশ্য একেবারেই গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু সপরিবারে সহরবাসী ও উপার্জ্জনশীল কনিষ্ঠের খাতির একটু করিতেন। সুতরাং অম্বিকা দুই একবার বলিতেই তিনি কলহ বেগ সম্বরণ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিলেন।

অম্বিকা কহিলেন, "এ সব কি কথা শুনছি দিদি? ব্যাপার কি?" বামা নিবারণের সঙ্গে ওঘরের এই অতি গর্হিত সম্বন্ধের কথা সালঙ্কারে বহু কল্পিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিলেন। দাক্ষায়ণী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "মিছে কথা—সব মিছে কথা ঠাকুরপো! আমরাও বাড়ীতে আছি। কই, এ সব ত কখনও কিছু দেখিনি।"

বামা গর্জ্জিয়া উত্তর করিলেন "তুই দেখ্‌বি কেন? চোক্ বুজে থাক্‌লে কেউ কিছু দেখে? ভাগ্যি আজ তোর নিজের মেয়ের সম্বন্ধ, তা'হলে সব দেখ্‌তিস্। দেওরের মেয়ে কিনা—দরদ হবে কেন? দুপয়সা ও রোজগার করে, সেই হিংসেতেই আট্‌কুড়ী মরিস্। ওলো, হিংসে যে করিস্ আজ ও খেতে না দিলে এক পাল শেয়াল কুকুরের ছা বিইয়েছিস্—ওদের নিয়ে যে আদাড়ের এঁটো কুড়িয়ে খেতে হ'ত! হারামজাদী!"

"শুনলে ঠাকুরপো কথা! আমি তোমাদের হিংসে করি! ওমা, এ সব কি সর্ব্বনেশে কথা। সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল, তাতে কি আমি দুঃখ পাইনি? তাই ব'লে ওদের নামে এ সব জাতমারা কথা কেন ব'লব? সেই যে কবে একদিন দুটো আম আর দু'খানা মাছ পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেই অবধিই উনি এই সুর ধ'রেছেন। আর মন্দ যদি কিছু হ'য়েও থাকে, তা কি আমাদের মুখ দিয়ে বেরোন ভাল? হাজার শত্রুতা থাক, এক রক্ত ত? এক পিতেমোর সন্তান—ওদের জাত মান তোমাদের জাত মান নয়?"

বামাও উত্তরে উঁহাদের প্রতি দাক্ষায়ণীর পক্ষপাতিত্বের কথা তুলিয়া, অনেক দৃষ্টান্ত তার দেখাইয়া, ভ্রাতাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন, এক্ষেত্রে ও মাগীর কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। গ্রামের বহু লোক এই কলঙ্কের কথা বলিয়া থাকে। চন্দ্রদিদিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই অম্বিকা সব বুঝিতে পারিবে।

অম্বিকাও যাহা বুঝিবার বুঝিলেন।—এমন একটা ঘটনা যে হইতে না পারে, তা নয়। কিন্তু সত্যই যে হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। তবে সত্য হউক, মিথ্যা হউক,— এইরূপ একটা কলঙ্কের যে কথা উঠিয়াছে, গ্রামের কোনও কোনও লোক কাণাকাণিও যে ইহা লইয়া করে, তাহা ঠিক।

শিবুর সঙ্গে যে কুন্তীর বিবাহ হইবে,—এ কল্পনাও তাঁহার অসহ্য। শিবুর পিতা টাকা চান, এরূপ দীনহীনা নিরন্না বিধবার কন্যা সহজে নিবেন না। আরও এই একটা কলঙ্কের কথা উঠিয়াছে। আজ চাপা থাকিলেও, ভগ্নীর রসনাতাড়নায় ইহা চাপা আর থাকিবে না। তবে স্বদেশী বাতিকগ্রস্ত ছেলের দলের কাণ্ড কিছুই ত বলা যায় না। শত্রুপক্ষের মিথ্যা গ্লানি বলিয়া হয়ত সব উড়াইয়া দিবে,—আরও জিদ তাদের বাড়িবে। শিবুর পিতাকে বাধ্য করিয়া, অথবা তাঁহার সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিবে। তা যদি হয় তাঁহাদের নাক কাঁটার উপরে একেবারে ঝামা ঘসা হইবে! না, ইহার পথ একেবারেই বন্ধ করিতে হইবে। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তাঁহার মাথায় একটা মতলব ঢুকিল। তিনি উঠিয়া কমলার গৃহে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

৫ম বর্ষ চৈত্র—১৩২৫ ১২শ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাউলাট বিল

রাউলাট বিল উপলক্ষে দেশের মধ্যে আবার একটা প্রবল অসন্তোষের উত্তেজনা দেখা দিতেছে। দুইটি বিলের একটি পাশ হইয়া আইন হইল,—আর একটিও হইবে বই কি? দীর্ঘযুদ্ধের বিরামে লোকে বড় একটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল, আবার শাসনসংস্কারের প্রস্তাবে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা হইবে, এইরূপ আশাতেও অনেকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংস্কার প্রস্তাব ভারতের জননায়কগণ সকলে একবাক্যে আশানুরূপ উত্তম বলিয়া গ্রহণ না করিলেও, ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে যে রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারতবাসী অনেক দূর অগ্রসর হইবে, এরূপ অনেকেই মনে করেন। এদেশে এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান্ এবং বিলাতে তাঁহাদেরই পার্শ্বপোষক সম্প্রদায়ের তীব্র প্রতিবাদও ইহার একটি প্রমাণ। ওদিকে যুদ্ধে ভারতবাসী ধনে ও জনে যেরূপ সহায়তা দান করিয়াছেন—বৃটিশসাম্রাজ্য রক্ষায় এই সহায়তায় যেরূপ কাজে আসিয়াছে, বলিয়া বৃটিশ রাজপুরুষগণই শত মুখে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ আশাও অনেকের মনে হইয়াছিল, যে বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে ভারতীয় প্রজার সম্বন্ধে সত্যই বুঝি নূতন এক যুগ আসিতেছে,—যাহাতে সকল অবিশ্বাস ও ভয় দূর হইয়া পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ বিশ্বাস ও ভরসাই প্রধান হইয়া উঠিবে। ঠিক এমনই সময় প্রজামণ্ডলীর একরূপ সমবেত প্রতিবাদ অবজ্ঞা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই বিল পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল অসন্তুষ্ট নয়,—অনেকে বিশেষ বিস্মিতও হইয়াছেন।

বিপ্লব বাদ ভারতে আছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।—যুদ্ধের সময় জর্ম্মাণীর প্ররোচনা ও সহায়তায় বিপ্লববাদীরা একটা গোলমাল ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাও হইতে পারে। কিন্তু ভারতের বাহিরে ভীষণ এই যুদ্ধে বৃটিশরাজের সমস্ত শক্তি যখন ব্যাপৃত ছিল, জর্ম্মাণীও যখন এমন প্রবল ছিল, তখন সেই জর্ম্মাণীর সহায়তা লাভ করিয়াও বিপ্লববাদীরা যখন অতিক্ষুদ্র একটি বিদ্রোহও কোথাও ঘটাইতে পারে নাই,—তখন যুদ্ধের পরে জর্ম্মাণী যখন একেবারে হতবল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিপ্লব-বাদীদের হইতে আশঙ্কার এমন কি কারণ থাকিতে পারে বুঝি না, যাহাতে প্রজার এরূপ তীব্র অসন্তোষকর একটা

আইন পাশ করার প্রয়োজন হইল। বস্তুতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শক্তি যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রবল, এবং ভারতীয় প্রজা যেরূপ ভাবে এই শক্তির শাসনাধীন হইয়া আছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে কোনওরূপ ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করাই অসম্ভব। ভিতরে এরূপ আয়োজন না হইলে, বাহির হইতে কাহারও সহায়তাও কার্য্যকর হইতে পারে না।—তার পর অতি প্রবল কোনও শত্রু যদি ভারত আক্রমণ করে, তখনও গবর্ণমেণ্টের সহায়তা যাহারা করিবে, তাহাদের কাছে অন্তর্ব্বিপ্লবে অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি নগণ্যই হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টের আয়োজনের তুলনায় তাহাদের আয়োজনও অতি যৎকিঞ্চিৎকর হইতে পারে। দেশের অনুকূল প্রজার বলেই গভর্ণমেণ্ট তাহা পিঁপড়ার মত টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারেন।

ভারতবাসী উচ্চতর রাষ্ট্রীয় অধিকার চায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যে খাস বৃটিশ প্রজার সঙ্গে সমান হইয়া থাকিতে চায়। ইহা অস্বাভাবিক কি অন্যায়ও নয়, অসম্ভবও নয়। দৃঢ় অটলভাবে যদি অন্দোলন করিতে পারে, আজই না হউক, নিকট ভবিষ্যতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই এ অধিকার ভারতীয় প্রজাকে না দিয়া পারিবেন না। ইহাই সম্ভব, ইহাই ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর। বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটাইয়া বৃটিশশক্তিকে ভারত হইতে দূর করিয়া দিয়া, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার যে বাতুলের স্বপ্ন, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে এখন পারেন।

বস্তুতঃ বিপ্লববাদীদের সংখ্যা যতই হউক, সমগ্র প্রজার সংখ্যার তুলনায় আর কয়জন তাহারা? যেরূপ চেষ্টা বা আয়োজনই তাহারা করুক, অতি গোপনে অতি সাবধানে তাহাদের করিতে হয়। বিদ্রোহ একটা খেলা নয়, যুদ্ধই বটে—আবার আজকালকার যুদ্ধ—বৃটিশ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ! সেনার শিক্ষা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ, এবং আরও কত কি জটিল ও ব্যাপক আয়োজন একটা যুদ্ধ চালাইতে করিতে হয়। ভারতীয় গুপ্ত বিপ্লব সম্প্রদায়ের পক্ষে কি তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? ধরিলাম, ভারতবাসীর মনে তেমন আন্তরিক রাজভক্তি নাই। নাই থাকিল, আপনাদের হিতাহিত বোধ ত একটা আছে? এরূপ বিদ্রোহের প্রয়াস যে কিরূপ পাগলামো, অনিষ্ট বই কিছুমাত্র ইষ্টের সম্ভাবনা ইহাতে নাই, অন্ততঃ তাহা বুঝিয়াও প্রজাসাধারণ এরূপ চেষ্টার কোনও সমর্থন বা সহায়তা কখনও করিতে পারে না। দুই চারিটি ডাকাতি, দুই চারিটি পুলিশ কর্ম্মচারীর হত্যা—এপর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, বিপ্লববাদীদের দল বাঁধা যদি এখনও থাকে, অথবা সে দল যদি তাহারা আবার বাঁধিতে চায় ও বাঁধিতে পারে, তবে মাত্র ইহাই হইতে পারে,—বেশী কিছুই আর হইবে না। ইহা দমন করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আগে হইতেই এরূপ অসাধারণ আইন কানুনের দরকার হয় কি?

আরও একটি বড় কথা ইহার মধ্যে আছে। বিপ্লববাদীরা কি চায়? ইয়োরোপে 'এনার্কিষ্ট' বলিলে যাহা বুঝায়, ভারতের এই বিপ্লববাদীরা সেই শ্রেণীর লোক নয়। পাশ্চাত্য 'এনার্কিষ্ট' সম্প্রদায় সকল শাসনশক্তি তুলিয়া দিয়া অবাধ স্বেচ্ছাচার দেশে আনিতে চায়। শাসনপদ্ধতি ও সমাজ পদ্ধতির বিরোধী নানারূপ মত ইয়োরোপে আছে। 'এনার্কিষ্ট' বা তাহারই একটা কোনও মতানুসারী নামেরও অর্থ তাই—অর্থাৎ যাহারা এনার্কিজম্ বা অরাজকতা চায়। কিন্তু এদেশের বিপ্লববাদীদের ঠিক 'এনার্কিষ্ট' নাম দেওয়া যায় না। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, বৃটিশশাসনের পরিবর্ত্তে ভারতে ভারতবাসীর স্বতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহের আয়োজন করা সম্ভব নয়,—তাই গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গুপ্তভাবেই ইহারা যাহা কিছু আয়োজনের চেষ্টা করিয়াছে। সি, আই, ডি, পুলিশ এই সব গুপ্তসমিতি ধরিবার চেষ্টা করিত, তাই মধ্যে মধ্যে ইহারা এই বিভাগের পুলিশ কর্ম্মচারীকে খুন করিয়াছে। অর্থের প্রয়োজন, কেহ দান করে না—করিবেও না,—তাই ডাকাতী করিয়া ইহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু যদি ইহারা এখন বুঝিতে পারে, ইহাদের এই চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ, নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানারূপ লাঞ্ছনা বই হিত কিছুই হইবে না,—আবার ইহাও যদি বুঝিতে পারে, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিয়াই ভারতের পক্ষে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হওয়া নিতান্ত দুরাশা নয়, তবে হয়ত এই সব গর্হিত চেষ্টা ইহারা ছাড়িয়া দিবে। এই যুদ্ধও বড় একটা শিক্ষার স্থল সকলের হইয়াছে। গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া লুণ্ঠনলব্ধ দুই এক

লক্ষ টাকা, দুই চারিশত রিভলবার, দশ বিশটা রাইফেল কি বোমা—এই মাত্র সম্বল লইয়া যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কাত করিয়া ফেলা যায় না—(আরও এই যুদ্ধের পরে)—, যদি কোনও বুদ্ধি ইহাদের নেতৃগণের থাকে, তাহা অবশ্য তাঁহারা এখন বুঝিবেন। তারপর এখন নূতন যে এক যুগ পৃথিবীতে আসিতেছে, তাহাতে ভারতও উন্নত রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগে অধিক দিন বঞ্চিত থাকিবে না—ইহারও আশা যে না দেখা যাইতেছে, তা নয়। ভারতকে জগতের রাষ্ট্র-সমাজে যোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে হইলে, বৃটিশশক্তির সঙ্গে থাকিয়াই করিতে হইবে, সেইভাবেই তার জন্য কোমর বাঁধিয়া লড়িতে হইবে।—বিপ্লবে বা বিদ্রোহচেষ্টায় এই সম্বন্ধ ছিন্ন করা একেবারেই সম্ভব নয়। এই সব বুঝিয়া বিপ্লববাদীরা হয়ত এখন এসব বৃথা অমঙ্গলকর চেষ্টা ছাড়িয়া দিবে,—প্রজাব ধর্ম্মে থাকিয়াই প্রজার অধিকার লাভে চেষ্টা এখন করিবে। তা যদি হয়, গবর্ণমেণ্টের কোনও আশঙ্কার বা আপত্তির কারণ অবশ্য থাকিতে পারে না। যুদ্ধের পর বাস্তবিক অবস্থাটা কিরূপ হয়, বিপ্লববাদী বা বিদ্রোহ-প্রয়াসী বলিয়া যাহাদের তাঁহারা সন্দেহ করেন, কিরূপ আচরণ তারা এখন করে, তাহা অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট একবার দেখিয়া নিতে পারিতেন। আর এক আধ বৎসর কাল এইরূপ ভরসা ও বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কি এমন সর্ব্বনাশ হইত? গবর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই কি মনে করেন ইহার মধ্যেই ইহারা এমন আয়োজন করিয়া ফেলিবে, অথবা এমনই অশান্তি দেশে ঘটাইবে, যে তাহাতে দুর্দ্দমনীয় ঘোর অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইবে? যুদ্ধের সময়—যখন নাকি জর্ম্মাণীর সাহায্যও তাহারা পাইতেছিল বলিয়া শুনিতে পাই—তখনই যদি ইহাদের এমন করিয়া হাত পা বাঁধিয়া ফেলা সম্ভব হইল, এখন কি আর ইহাদের সেরূপ চেষ্টা কিছু দেখিলে দমন করা যাইবে না?

কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধের পর বহু দেশীয় সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া দেশে আসিতেছে, বিপ্লববাদীরা সব ছাড়া পাইলে ইহাদের হাত করিয়া ফেলিবে, তখন সর্ব্বনাশ হইবে। হায়, একথা শুনিতেও হাসি পায়! প্রথমতঃ এরূপ চেষ্টা করিলে বিপ্লববাদীরা ধরা পড়িবে, গবর্ণমেণ্টের চর সর্ব্বত্র আছে। তার পর যদি কতক সৈনিক ইহাদের আয়ত্ত হয়ও, তাহাতেই বা কি? কেবল কতকগুলি লোক হইলেই ত যুদ্ধ করা যায় না। অস্ত্র চাই, আরও কত আয়োজন চাই। তা কোথায়? তারপর ইহারা কেবলই সৈনিক, অস্ত্র চালাইবার একরূপ যন্ত্রস্বরূপ,—যুদ্ধের প্রণালী নির্দ্দেশ ও নেতৃত্ব করিতে কি লাগে কিছু জানে না। বিপ্লবের ষড়যন্ত্র যাহারা করিবে, তাহারাও জানে না। সুতরাং আশঙ্কার কারণ কি আছে? কি থাকিতে পারে?

কেহ কেহ ইহাও বলেন, যুদ্ধের সময় যে আইনের ফলে দেশে শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল, খুন ডাকাতী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল,—সে আইনের বল এখনই গবর্ণমেণ্ট হাতছাড়া করিতে পারেন না, করাটা উচিতও হইবে না। যে সব খুন ডাকাতীকে 'রাজনৈতিক' বিশেষণ দেওয়া হয়, তাহা খুব কমিয়া গিয়াছে, এ কথা সত্য। হয় ত বা অন্তরীণে বদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেকেই এই সব কার্য্যে সংসৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইহাও ত হইতে পারে, যে এরূপ চেষ্টার ব্যর্থতা এবং অনিষ্টকারিতা এবং বিপ্লব ব্যতীতও আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশা আছে, ইহা বুঝিয়া, ইহারা এখন শান্ত হইয়াছে। এমনও যদি হয় যে বিপ্লববাদীরা প্রায় সকলেই আটক পড়িয়াছে, তাই বন্ধ হইয়াছে, তবু এরূপ আশাও ত করিতে পারা যায় যে ইহারা এই সত্যটা বুঝিয়াছে, ছাড়া পাইলেই আর এই ভুল পথে যাইবে না।—অন্ততঃ ছাড়া পাইলে তারা কি করে না করে, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা ত অনায়াসেই করা যাইত। এইটুকু সবুর কেন সহিল না?

সত্যাগ্রহ—Passive Resistance.

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যে উত্তেজনা ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তার মধ্যেই প্রজার সকল আপত্তি উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজার অধিকারের বিরোধী কোন আইন করিলে, অথবা এইরূপ আইন যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধে ভারতীয় প্রজা যাহাতে 'সত্যাগ্রহ' বা passive resistance নীতি অবলম্বন করে, তাবজ্জন্য মহাত্মা গান্ধি এক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। নানা স্থানে গিয়া তিনি সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ করাইতেছেন।

প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স (passive resistance) এবং সত্যাগ্রহ দুইটি নামই নূতন। কেবল নাম নয়, ব্যাপারটিও

এ দেশে একেবারে নূতন। সাধারণ পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা সংক্ষেপে ইহার পরিচয় বিবৃত করিতেছি। রাজশক্তি যেখানে প্রজাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, সেখানে এরূপ আইন অনেক হইতে পারে, যাঁহা প্রজাসাধারণ অথবা তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়, আপনাদের পক্ষে অতি অন্যায়, গ্লানিজনক ও অতি কঠোর ক্লেশকর বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের সকল আপত্তি সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটা আইন পাশ করিলেন, করিয়া তাহা চালাইতে থাকিলেন। প্রজার মনে স্বভাবতঃই এইরূপ আইনের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অসন্তোষের উত্তেজনা এবং আইনের প্রযোগে বাধা দিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। এখন এই বাধা বা রেজিষ্টান্স (resistance) কিরূপ হইতে পারে? আইন লঙ্ঘন করিলে শাস্তি হয়। আবার শাস্তির জন্য ধরিতে আসিলে বাধা দিবে—যাহাকে active বা কার্য্যতঃ সাক্ষাৎ বলপ্রয়োগে resistance বা বাধা বলা যাইতে পারে, তাহা প্রজার পক্ষে সম্ভব নয়। অপরাধীকে ধরিতে পুলিশ আসে। পুলিশকে জোর করিয়া বাধা দিলে, জঙ্গী পুলিশ আসিবে। তাহাকেও জোর করিয়া বাধা দিলে বা দিতে পারিলে, সরকারী সেনা আসিবে। সুতরাং এরূপ বাধা সফল করিতে হইলে, প্রজাকে সমবেত ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। তাই Active resistance আর বিদ্রোহ একই কথা।

কিন্তু বিদ্রোহ কি সর্ব্বদা সম্ভব হয়, না তা ভালই হয়? তাই এরূপ অবস্থায় প্রজারা অনেক সময় দলবদ্ধ হইয়া পরোক্ষ ভাবে আর একরকম বাধা বা বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইয়োরোপের ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে এবং ইংরেজিতে ইহারই নাম passive resistance বা পরোক্ষ বিরোধ। অবশ্য এ নামটিও যে ঠিক হইল, তা বলা যায় না। বাঙ্গলায় কেহ কেহ ইহাকে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নাম দিয়া থাকেন। এ নামটি একেবারেই ঠিক হয় না, কারণ প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় কখনও হইতে পারে না, বস্তুতঃও তাহা নয়। এই প্রতিরোধেরও একটা ক্রিয়া আছে, তবে তাহা সাক্ষাৎভাবে বলপ্রয়োগ জনিত বাধার ক্রিয়া হইতে ভিন্ন রকম। যাহা হউক, যৌগিক ভাবে না হইলেও অন্ততঃ যোগরূঢ়ভাবে সত্যাগ্রহ * কথাটি এই অর্থে এখন ব্যবহৃত হইতেছে।

এখন এই সত্যাগ্রহ বা প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স ব্যাপারটা কি? ইহাতে কি করিতে হয়? একটা আইন হইল,—আইনটা অন্যায় ও উৎপীড়ক হইবে বুঝিয়া প্রজারা অথবা বিশেষ কোনও প্রজাসম্প্রদায় আপত্তি করিয়া প্রতিবাদ করিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া আইন পাশ করিলেন। Active resistance হইতে পারে না। সকল আপত্তি আবেদন অবজ্ঞাত হইল,—বলিয়া কহিয়াও আইন আর সহজে রদ করা যাইবে না। এখন উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় আইন রদ করিবেন না। তখন এই Pasive Resistance নীতি অবলম্বন করিয়া, প্রজা গবর্ণমেণ্টকে আইন রদ করিবার জন্য বাধ্য করিবার চেষ্টা করে। তুমি আইন করিয়াছ, বলিয়াছ, এই এই কাজ করিলে, এই এই শাস্তি তোমার হইবে। আমি বলি, এসব কাজ অন্যায় নহে, আমার স্বার্থ রাখিবার জন্য আমার মান রাখিবার জন্য আমার ন্যায়ানুগত অধিকার ভোগের জন্য এই এই অবস্থার এই এই কাজ আমাকে করিতে হয়,—আমি করিব। তুমি শাস্তি দেও, তাহাতে বাধা দিব না, শাস্তি গ্রহণ করিব, কিন্তু তবু করিব। জেলে পাঠাও, জেল হইতে বাহির হইয়া আবার করিব। আবার জেলে দাও, আবার বাহির হইয়া আবার করিব। যতদিন না আইন তুলিয়া দাও, এইরূপই করিব।

এইরূপ ভাবে দলবদ্ধ হইয়া আইন না মানা এবং শান্ত ভাবে তার শাস্তি গ্রহণ করা,—ইহাই হইল 'প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স্'। বিরোধী হইতেছি, অথচ আমি Passive—কোনও বল প্রয়োগ না করিয়া শান্তভাবে তার শাস্তি স্বীকার করিতেছি। তাই এইরূপ বিরোধের নাম হইয়াছে —Passive Resistance.

প্রজা দল বাঁধিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ আইন লঙ্ঘন

---

* 'সত্য' অর্থাৎ শপথ বা প্রতিজ্ঞা, তাহার 'আগ্রহ' বা গ্রহণ,—অর্থাৎ শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। ইহাই 'সত্যাগ্রহ' শব্দের যৌগিক অর্থ, যোগরূঢ় প্রয়োগে বিশেষভাবে passive resistance সম্বন্ধীয় 'শপথ গ্রহণ' অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতে আবার passive resistance রূপ ক্রিয়াটিই ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে।

করিতেছে, অবশ্য গবর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। আইন লঙ্ঘককে শাস্তি দিতে হয়,—এই জিদ যাহাতে প্রজার ভাঙ্গে তার জন্য অনেক সময় অতি কঠিন শাস্তিও দিতে হয়, আনুষঙ্গিক আরও অনেক লাঞ্ছনা এই সব প্রজার মাথায় আনিয়া ফেলিতে হয়। প্রজার যদি এই সত্যাগ্রহে দৃঢ়তা থাকে, তবে তাহারা টলে না, তাহাদের দলও ভাঙ্গে না! ইহারা বাস্তবিক চোর ডাকাত গুণ্ডা-জাতীয় Criminal নয়, সাধু, মহাপ্রাণ, দৃঢ়চেতা লোক, প্রজার ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছে। ক্রমে দেশের ও বিদেশের লোকেরও ভক্তিশ্রদ্ধা ইহারা আকর্ষণ করে, গবর্ণমেণ্ট অতি কঠোর ও উৎপীড়ক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হন। এ অবস্থা কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই প্রীতিকর নয়, সম্মান-জনক নয়, হিতকরও নয়। তাই গবর্ণমেণ্টকে বড় বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। সত্যাগ্রহ ক্রমশঃ ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিলে, গবর্ণমেণ্টকে শেষে প্রজাকে শান্ত করিবার জন্য আইন রদ করিতে হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও বিশেষ সতর্ক হইতে হয়।

সুতরাং এই 'সত্যাগ্রহ' বা passive resistance প্রজার হাতে বড় একটা বল। এই বল প্রজা প্রয়োগ করিতে পারিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আপত্তি ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া তাবা অন্যায় মনে করে এরূপ আইন বেশীদিন চালাইতে পারে না।

কিন্তু যথোচিত ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে ইহার প্রয়োগ না হইলে ইহাতে বিশেষ কোনও ফল হয় না। মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক সত্যাগ্রহ করিলে, তাহাদের দমন করিয়া সহজেই ইহার প্রসার গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এমন নীতি অবলম্বন করিতে পারেন, যাহাতে সাধারণ লোক ভীত হইয়া ইহার কাছেও ঘেঁসিবে না। অনেক সময় আবার অতি দীর্ঘকাল একটির পর একটি করিয়া অতি কঠোর শাস্তি ইহাতে বহন করিবার প্রয়োজন হয়। যাহারা দণ্ডিত হইবে তাহাদের পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণ, সন্তানসন্ততির শিক্ষাদান করিতে হইবে। ভারতে প্রজার সংখ্যা কম নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে বিপুল যে জনসাধারণ রহিয়াছে, আধুনিক রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি তাহা-দের মধ্যে এমন জাগরিত হয় নাই, যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় সত্যাগ্রহের এই কঠোর ক্লেশ তাহারা স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে। ইহাদের তুলনায় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সংখ্যা আর কত? তাঁহাদেরও মতি গতি—রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আগ্রহ এখন যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে খুব বেশী লোক ইহার মধ্যে আসিবে, এমন ত মনে হয় না। যাহারা আসিবে, তাহাদের পরিবার পরি-জনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহাই বা কে দিবে? কেমন করিয়া সংগৃহীত হইবে? গবর্ণমেণ্ট বাদী হইলে, এই অর্থসংগ্রহও নিতান্ত সহজ হইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বাধীনে তথাকার ভারতবাসীরা সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে যে সাফল্যটুকু দেখা গিয়াছিল, তার কারণ আছে! সেখানে ভারতবাসীরা বিদেশীর মধ্যে আপন আপন ভাবে অতি নিকট সম্বদ্ধ একটা সম্প্রদায়ের মত ছিলেন। কতকগুলি কঠোর আইনে সকলেই সমান ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন। এই লাঞ্ছনাও অতি গ্লানিকর ও ক্ষতিকর হইতেছিল। ইহাতে সহজেই তাঁহারা এক যোগে এই সব আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তার জন্যও ভারত হইতে অর্থসাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভারতে ভারতবাসী প্রজার অবস্থা একেবারে অন্যরূপ। এ সব আইনও অন্যরূপ। এসবের কঠোর ফল সাক্ষাৎ-ভাবে খুব বেশী লোকের উপরে গিয়া পড়িবে না। যেরূপ জীবনে পুরুষানুক্রমে সাধারণ ভারতবাসী অভ্যস্ত হইয়াছে, তার কোনও সুখ স্বস্তি মান ইজ্জতের উপরে এই সব আইন গিয়া সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বদা আঘাত করিবে না। ভবিষ্যতে দেশের সাধারণ অবস্থার উপরেই ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বুঝিয়া তার প্রতিকারের জন্য এখনই এত ক্লেশ স্বীকার করিতে কয়জনে আসিবে?

সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই সত্যাগ্রহ প্রচলনের চেষ্টা এখন এদেশে কোনওরূপ সাফল্য লাভ করিবে এই-রূপ মনে হয় না।

তারপর বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি সকলের সম্মুখেই রহিয়াছে! সেও একরূপ প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্সের চেষ্টাই হইয়াছিল। তাহা দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার চাপই দেশের

লোক সহিতে পারে নাই। যাঁহারা লোককে মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারাও শেষ সামলাইতে পারেন নাই। আপনাদের অবশ্য অনেকেই সামলাইয়া নিয়াছেন, কিন্তু যারা মাতিয়া ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাঁরা অনেকে অনেক রকম ক্লেশ দুঃখ পাইয়াছে ও পাইতেছে।

এ শিক্ষাও আমাদের এখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সত্যাগ্রহ সফল করিতে হইলে যেরূপ আয়োজন ও Organisation দরকার, নেতৃবর্গের যে ত্যাগ স্বীকার দরকার, তা যদি না হয়, তবে ইহাতে লাভ কিছুই হইবে না। বাঘ মহিষের যুদ্ধে কেবল নল খাগড়ার প্রাণান্ত ক্লেশ হইবে।

পরলোক গতা কৃষ্ণভামিনী দাস

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিলাতে থাকিয়া—ভারত মহিলা কেমন করিয়া খাঁটি ভারতীয় ভাবে এবং বেশে দিন যাপন করেন ইহা হয়ত এখনকার দিনে কাহারো কাহারো মনে একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। বস্তুত পক্ষে, সংসারে যাঁহারা অনন্যসাধারণ জীবনী শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, দেখিতে পাই তাঁহাদের জীবন যাত্রার গতি বিশেষ রকম স্বতন্ত্র; যে সব অভাব এবং আঘাতে সাধারণ মানুষ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়—সেই সকল অভাব এবং আঘাতের মধ্য দিয়াই তাঁহারা মনুষ্যত্বের জ্যোতির্ম্ময় লোকের সম্মুখ পথে সোৎসাহে অগ্রসর হইয়া চলেন। স্বাধীনতা এবং শিক্ষার আসরে নামিয়া কি মেয়ে কি পুরুষ, উভয় জাতিই অনেক সময় মনুষ্য জীবনের যথার্থ সার্থকতার দিকে অগ্রসর না হইয়া অনেক সময় বিফলতার পথে পদে পদে হোঁচট খাইতে থাকে। স্বাধীনতা এবং লেখা পড়া শিক্ষার এই অসদ্ব্যবহার—শুধু এদেশে নয় সব দেশেই অল্পবিস্তর হয়। খুব অল্প ব্যক্তিই স্বাধীনতা এবং শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন—দেশের ও দশের শ্রদ্ধার পাত্র হন। সমস্ত লোকে তাঁহাদের স্মৃতিকে কালে কালে পূজা করে। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সেক্রেটারীর সহযোগিনী পরলোকগতা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাস—শিক্ষা এবং স্বাধীনতাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য এবং প্রশংসানীয়। নারী জীবনের সার্থকতা তাঁহার মধ্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—আজ তাঁহারা অশ্রু আপ্লুত চক্ষে ভাবিতেছেন—গত ২৭এ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৯টার সময় ৪নং উলিয়েম লেনে কলিকাতায়—সমস্ত বাংলা দেশের কত বড় ক্ষতি হইয়া গেল। আদর্শ মহিলার চরিত্র উপন্যাসে নাটকে দেখিয়াছি—কিন্তু স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি আদর্শ মহিলার সে নমুনা এমন অল্প কোথাও দেখি নাই। জয়ঢাক বাজাইয়া করতালির লোভে অনেকে অনেক রকম বড় কাজ করেন। সে কাজের অবশ্য মূল্য আছে কিন্তু তাহা ঢাকের বাদ্যধ্বনির সঙ্গেই লোপ পায়। নীরবে কত অসুবিধা শত আঘাত সহ্য করিয়াও যাঁহারা পরসেবায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য কার্য্য করেন তাঁহাদের কীর্ত্তি মাসিক পত্রিকার বক্ষে কিম্বা মস্ত একটা লাইব্রেরিতে বেশী দিন না টিকিলেও তাহা সকলের, অন্তত পরিচিত জনের অন্তরে স্মৃতির অক্ষয় কবচের মত হইয়া থাকে।

"মিসেস্ দাস", নামটা হয়ত আমাদের মনে একটু অন্য রকম ভাবের সঞ্চার করে। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে মিসেস্ দাসের সহিত পরিচিত সে বেশ জানিতে পারিয়াছে, তাঁহার নামের সঙ্গে "মিসেস" বিশেষণ জড়ান থাকিলেও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী ভাবের সারল্য করুণা, সত্যনিষ্ঠা, অনাড়ম্বরতা সকলি তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভালকে সকলেই ভালবাসে, মিসেস্ দাসের জীবনে দেখিয়াছি—তিনি খারাপকে, দরিদ্রকে, লাঞ্ছিতকে, অপবিত্রকে, বুকের কাছে টানিয়া নিজের মাতৃহৃদয়ের অমৃতধারায় স্নান করাইয়া তাহাদের সকল গ্লানি হইতে মুক্ত করিতেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ব্যথিতাকে শান্তি, লাঞ্ছিতাকে সম্মান দান, তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যাঁহারা সংসারে এই রকমভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—তাঁহাদের চরণে কাহার না মাথা নুইয়া পড়ে। দুঃখীর দুঃখ হরণ করিতে হইলে বিলাসিতা ছাড়িতে হয়। মিসেস্ দাস বিলাত ঘুরিয়াছেন—ইংরাজী পড়িয়াছেন, জীবদ্দশায় স্বামী যে রকমভাবে তাঁহাকে চালাইয়াছিলেন—পতিপ্রাণা সতীর মত তিনি তাহাই করিয়াছিলেন—ছায়ার মত স্বামীকে অনুসরণ করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস্ দাস সামাজিক ঠাটের কৌলিন্য হইতে বিদায় লইয়া বাংলার সাধারণ নারী সমাজে নামিলেন, মোটা সাদা ধুতি পরিয়া নগ্নপায়ে থাকিয়া, নারীসমাজের উন্নতির জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কন্যার বিয়োগে কন্যাগত মাতৃস্নেহ মাতৃপ্রেম, বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্গসমাজের বিস্তর অনাথা. তাঁহার স্নেহচ্ছায়ে যে আশ্রয় লাভ করিল। এক কন্যাহারা জননী—বহু কন্যার আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের মাতৃহৃদয়ের গৌরববর্দ্ধন করিলেন। কতদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছি মিসেস দাস নিজের ক্লান্ত শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া নিজের ঘোড়ার গাড়ী অন্যকে ব্যবহারের জন্য দিয়া নিজে পদব্রজে অলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কোন মেয়ের কি কষ্ট, কোথাকার কি অভাব এই সব অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। মিসেস দাস ছিলেন ৺শ্রীনাথ দাসের পুত্র, প্রোফেসার ডি, এন্ দাসের স্ত্রী। ডি এন্ দাস কেম্ব্রিজের বি এ ছিলেন। বৈধব্যবেশে যিনি মিসেস দাসকে দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অনুমান করা কঠিন হইত যে এই মিসেস্ কোন সময়ে

রিতিমত সাহেবী ধরণে স্বামীর সঙ্গে বিলাত বাস করিয়াছিলেন। আমরা তাহার বিধবা অবস্থাই দেখিয়াছি। তিনি শিক্ষিত পরিবারের কন্যা ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত বিধাতা বুঝি একটি সেমিজ এবং একটি মোটা সাদা ধুতি ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছুই দেন নাই। বিধাতা তাঁহাকে সবই দিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বিধাতার কোন দানকেই অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি পতিপরায়ণা ছিলেন—সুগৃহিণী ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সংসারে পরম আত্মীয়া ছিলেন—লোক সমাজে অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্না মহিলা ছিলেন।

ইদানিক অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় তিনি একটু কাতর হইয়াছিলেন। দুর্ব্বল হইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। বাড়ীতে, পাছে চাকর বাকরের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় এই ভয়ে, নিজের ভারত-মহামণ্ডলের রাশীকৃত কার্য্য এবং স্কুলের ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের কার্য্য শেষ করিয়া নিজের বিশ্রামের সময়েও তরকারী কোটা ঘর ঝাঁট, ইত্যাদি কাজ করিতেন। তিনি একাধারে গৃহিণী এবং সমাজের কল্যাণবিধায়িনী ছিলেন। বাহিরের কর্ম্মসাগরে নিঃশেষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও ভাসুরের সংসারের প্রতি উদাসীনা ছিলেন না। সংসার-ধর্ম্মকে শেষ পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই—অথচ, কেবল মাত্র নিজের সংসারের তেল আর নুনেই ডুবিয়া থাকিতেন না। পরের সেবায় পরের অভাব মোচনে নিয়ত যত্নবান ছিলেন। মুখ বন্ধ করিয়া কাজ করিতেন। যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে—তাহারা জানিয়াছে নারীত্বের আদর্শ কি—মনুষ্যত্বের সার্থকতা কিসে।

যে সর্ব্বনাশ রোগ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করিল—সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ, তাঁহার আত্মীয়বিশেষের নিকট শুনিয়াছি—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন "আমার শরীর ভেঙে পড়ছে—কিছুদিন একটু বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন।" বাঙ্গলা দেশের অন্য কোন মহিলা তাঁহার বিশ্রামের পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত কি না জানি না। অন্তত সেজন্য অপেক্ষা না করিয়া, জন্মমৃত্যু যাঁহার লীলা সেই বিশ্বনিয়ন্তা মিসেস্ দাসের বিশ্রামের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ইহলোকে আমরা যাহাকে বিশ্রাম-শয্যায় নিদ্রিতা দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, পরলোকে তিনি আবার কোন্ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন কে জানে। মিসেস্ দাস চলিয়া গিয়াছেন—যদি ইহলোকের পরপারে মৃত্যুর আড়ালে শান্তির রাজ্য থাকে তবে সেখানে তাঁর শ্রান্ত আত্মা শান্তিলাভ করুক। স্বার্থের বশ হইয়া কত লোকে তাঁহাকে কত আঘাত করিয়াছে, শান্তিময়ের স্পর্শে তাঁহার সে আঘাত নিবারণ হউক। যিনি আপন জীবনের সমগ্র শক্তি দিয়া, বাঙ্গলার নারী সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যিনি দীনের দুঃখ দূর করিবার জন্য দৈন্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি দেশ হইতে তাঁহার স্মৃতিলুপ্ত হইয়া যাইবে? দেশের বিস্তর শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে কি এমন কেউ নাই যে, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারেন। এমন কি কেউ নাই যে বাঙ্গলার মাতৃ স্বরূপা মিসেস্ দাসের নামকে অক্ষয় করিয়া বাঙ্গলার নারী সমাজের সেই সঙ্গে মাতৃজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারেন? আমরা সেই আশায় পথ চাহিয়া আছি। আশা করি আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। *

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

ভারত কি সভ্য?

(Is India Civilised?)

এই নাম দিয়া বিখ্যাত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার জন্ উড্রফ সাহেব এক বই লিখিয়াছেন। এক শ্রেণীর সাহেব ও এক শ্রেণীর দেশী ভায়াদের জন্য এরূপ বইয়ের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল, খাস করিয়া সাহেবের হাত দিয়া। প্রথমে পুস্তকের সার্থকতাটা সাহেব ভায়াদের তরফ হইতে দেখা যাউক। কথাটা অদ্ভুত হইলেও সত্য যে পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এমন লোক আছেন, যাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন—"ভারত কি সভ্য?" অর্থাৎ সভ্যতা অর্থে পাশ্চাত্য জগতে সচরাচর লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, ভারতবর্ষও কি ঐ পদার্থটি ঐ অর্থেই চিরকাল বুঝিয়া আসিয়াছে? রুষ জাপানের যুদ্ধের পর শ্রীযুক্ত হারাদা ও মোতাদা নামক দুইজন জাপানি পণ্ডিত এদেশে আসিয়া অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একটি বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত হারাদা সভ্যতা সম্বন্ধে দুঃখের সহিত একটি কথা বলিয়াছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বহুকাল ধরিয়া শিল্প সাহিত্য কলা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম চর্চ্চায় সফলকাম হইয়াও পাশ্চাত্য জগতে জাপানের "অসভ্য" নাম ঘুচে নাই—ঘুচিল সেই দিন হইতে যে দিন হইতে জাপানিরা প্রত্যহ যষ্টি হাজার করিয়া রুষ মারিতে লাগিল।

* মিসেস্ দাস এ সংসারে তাঁহার কোন ফোটো রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ফোটো লওয়ার জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সম্ভব হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াই নিজের ফোটো তুলিতে দেন নাই। কর্ম্ম করিতে এসংসারে আসিয়াছিলেন কর্ম্ম করিয়াই বিদায় লইয়াছেন। যিনি আপনাকে সংসারের অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু মনে করিয়া ফোটো পর্য্যন্ত রাখিতে সম্মতি দেন নাই——আজ বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠরত্ন জানিয়াও আমারা তাঁহার সেই করুণাময় মাতৃমূর্ত্তির ফোটো সকলের কাছে উপস্থিত করিতে পারিলাম না—এ আক্ষেপ ঘুচিবার নহে। নিজের চক্ষে যাঁহারা তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি না দেখিয়াছেন ফোটো থাকিলে—তাহা দেখিয়াও তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, বাঙ্গালী মহিলার যথার্থ মাতৃমূর্ত্তি কি।

অতএব প্রশ্নটিতে নূতনত্বের গৌরব না থাকিলেও অদ্ভুতত্বের সৌরভ আছে। সাধারণ বিলাতি অর্থে সভ্য কেবল তাহারা যাহাদের প্রধান লক্ষ্য ইহলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, এমন কি পশুবলের প্রয়োগ দ্বারাও—সে জন্য জিনিসের বোঝা, অভাবের বোঝা, তোপ বন্দুক বারুদের বোঝা যতই বাড়ুক না কেন। এই সে দিন আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক দুঃখ করিয়াছিলেন, "হায়! জিনিসের বন্যার নীচে আমাদের আত্মাটা যে কোথায় চাপা পড়িয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর!" এই জিনিসের বোঝাটা যে ক্রমে দুখের বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, সেটা পাশ্চাত্য জগতে সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, বরং এই নিত্যবর্দ্ধনশীল অভাবের বোঝার অভাবটাকে অসভ্যতার নিদর্শন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। এবং ঐ অভাবটার দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন—"ভারত কি সভ্য?" এই প্রশ্নের উত্তর সার জন উড্‌রফ সাহেব তাঁহার পুস্তকে বিশদভাবে দিয়াছেন, এবং দিবার ক্ষমতা ও অধিকার তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। হিন্দুশাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী বিজাতি ভায়াকে তিনি যে বিষয়ে বিশেষ করিয়া সাবধান করিতে চাহেন সেটি এই যে নিজের ধারণা ও অভিজ্ঞতার বাহিরে যে সকল বস্তু আছে সে সকল বস্তু নিন্দনীয় নাও হইতে পারে, খাস করিয়া ভারতের সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তাহারা যেন আদৃত জিনিসটিকে হিসাবের মধ্যে আনেন, প্রাচীন মহীরুহের গায়ে যে সব আগাছা জন্মিয়াছে, শুধু সেগুলিকে নয়। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা শুধু দেহকে লইয়া—দেহের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকেই ইহার লক্ষ্য। ভারতের লক্ষ্য সেই সুখ ও সম্পদকে প্রাপ্ত হওয়া যাহা দেহ, মন এবং আত্মার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এতদিন ধরিয়া যে রেখা টানিয়াছে, তাহা খাঁটি সোনার নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজিও সে পথ খুঁজিয়া পায় নাই, যে পথে মানুষ বিরোধ হইতে শান্তির দিকে, সুখ হইতে স্বস্তির দিকে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির দিকে,—এক কথায় মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতার দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে পারে। ভারতের সভ্যতাই শুধু ঐ পথের সন্ধান পাইয়াছে।

সার জন উড্‌রফ সাহেব আরও বলেন যে, যাঁহারা শুধু অনিত্য বস্তুর উপাসক, অর্থাৎ জড়জগতের সম্পদ লইয়াই যাঁহাদের কারবার, তাঁহারা ভারতবর্ষে এমন কিছুই পাইবেন না, যাহা তাঁহাদের দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে। তবে দেখিবার ও বুঝিবার দৃষ্টি ও মন থাকিলে তাঁহারা দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেন যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক বেশী যাহাদের বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে, অর্থাৎ সাত্ত্বিকতার দিকে, দেবত্বের দিকে এতদূর অগ্রসর যাহার বিনিময়ে জড়জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত পশুবল অবাঞ্ছনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। ঐহিক ঐশ্বর্য্য আধুনিক সভ্যতার চরম লক্ষ্য হইলেও উহা মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা নয়। পশু হইতে মানুষের প্রকৃত প্রভেদ তাহার আধ্যাত্মিকতা লইয়া—দেহের গঠন লইয়া নয়, আহার বিহার লইয়াও নয়। যে মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটা যত বেশী পরিপুষ্ট সে তত বেশী মানুষ, এবং ওদিকটার পরিপুষ্টির অভাবে সে পশু। ওদিকটা ছাড়িয়া দিলে মানুষ ও পশুর মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী থাকে না। বরং পশু হইলে মানুষ পশুরও অধম হয়, কেন না সে বুদ্ধিমান এ কথার একাধিক দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। পশুর স্বধর্ম্ম পশুত্ব, মানুষের স্বধর্ম্ম মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি শুধু দেহের ভিতর দিয়া নয়, দেহ ছাড়াইয়া যে আত্মা আছে, তাহার ভিতর দিয়া। মনুষ্যজীবনের এই স্বভাবনিয়োজিত আধ্যাত্মিক দিকটার পরিপুষ্টিই মানুষের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মবিমুখ জীব বিকৃত, অস্বাভাবিক সৃষ্টির নিয়মাবলীর মধ্যে বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতার স্থান নাই, তাহার পরিণতি ও প্রতাপের শেষ গতি ধ্বংসের দিকে।

সার জন উড্‌রফ সাহেব দেখাইতে চাহেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসভ্যতার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য মানবজীবনের স্বধর্ম্মপালন। তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্মের যেটা সব চেয়ে বড় কথা, সেটা মনুষ্যজাতি মাত্রেরই সবচেয়ে বড় কথা। সেটা এই যে কত যুগযুগান্তরের পরিণতির ভিতর দিয়া জীবজগৎ তাহার চরম পরিণতিতে উপনীত হইয়াছে—আত্মাবিশিষ্ট নরাকারে, এবং এই দুর্লভ মানবজীবনকে তাহার স্বাভাবিক গতি ও লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিলে জীবজগতের মুক্তির পথ কোথায়? সার জন উড্‌রফ সাহেবের মতে ভারতের সভ্যতাকে তাহার এই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া দেখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানবজগতে একমাত্র ভারতই প্রকৃত সভ্য।

নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের এক শ্রেণীর দেশী ভায়াদের মধ্যে যাহারা একথা ভুলিতে বসিয়াছেন সার্‌জন্ উড্‌রফের মতে তাঁহারা নিতান্তই কৃপার পাত্র। তিনি বলেন যদি ইহা কখনও সম্ভব হয় যে পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব ও রীতিনীতির প্রভাব ভারতে এত বেশী হইয়া পড়ে যাহার দ্বারা ভারত তাহার নিজস্ব হারাইয়া বসে, তাহা হইলে সেটা শুধু এই "মর্ম্মান্তিক" কথাটাকেই প্রমাণ করিবে, যে "those of this country were fit to be eaten"—এই দেশের লোকেরা ভক্ষিত হইবারই যোগ্য।

প্রেমাশ্রু

সত্য সে কি চলে গেছে ? সত্য সে কি আর নাই
সুন্দর শ্যামল ধরা পুড়ে হ'ল ভস্ম ছাই
কেমনে বিশ্বাস করি ? সে যে শুধু ছিল মোর
কেমনে সে একা যাবে টুটিয়া এ ভুজ-ডোর

তবু সে যে চলে গেছে ! নাহি আর বসুধায় !
কায়াখানি মিলায়েছে কোথায় ছায়ার প্রায় !
পড়ে আছে খেলা ঘর শূন্য ধূ ধূ তমোময় !
নীরব মধুর বীণা ছিন্ন তন্ত্রী সমুদয় !

আশৈশব এক সাথে দেহে মনে প্রাণে প্রাণে
মিলে মিশে এক হয়ে ছুটেছিনু কার ধ্যানে !
অর্দ্ধ পথে যাত্রা তার হয়ে গেল সমাপন !
ফুটিতে ফুটিতে কলি বজ্রাহত কি ভীষণ !

হে দেবী, হে প্রেমময়ী, কল্যাণী জীবন প্রিয়া !
দগ্ধ হৃদি প্রবোধিব বল আজি কিবা দিয়া ?
কত কথা মনে পড়ি' করিছে ব্যাকুল মোরে,
কে মুছাবে অভাগার উচ্ছ্বাসিত অশ্রুলোরে !

সংসার পাষাণ বড়, হেথা তব নাহি ঠাঁই,
বিকচ মাধবীলতা শুষ্ক হয়ে গেল তাই
তব তরে নাহি ছিল একবিন্দু আঁখি জল,
তেমতি জগৎ আজি রয়েছে যে অবিচল !

কত কথা তোমারে যে ছিল মোর কহিবার,
এ জনমে হায় সখী, হ'ল না—হ'ল না আর !
সৌদামিনী খেলে গেল, র'ল শুধু অন্ধকার,
বুক ফাটা আর্ত্তনাদ দীর্ঘশ্বাস ঝটিকার !

আমার গানের রাণী ! আমার সকল গান,
জানি আমি চিরদিন তোমারি—তোমারি দান।
তোমা ঘেরি' গুঞ্জরিত মানস-মধুপ মম,
আজ সে যে সুরহারা রুদ্ধ সুধা-উৎস সম !

এ জনমে আগে আসি' প্রেম-দীপ জ্বেলেছিনু,
সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করি' তোমা ভাল বেসেছিনু।
জন্মান্তরে তুমি আগে প্রেমের আলোক জ্বালি,
মোর তরে রহিবে কি সাজায়ে বরণ-ডালি !

তবে দেবী, তাই হোক্। আমি র'ব সে আশায়,
জুড়াব সকল জ্বালা লভি তোমা পুনরায়।
মোর সব সুখ-সাধ-প্রীতি-প্রেম-স্নেহরাশি,
জন্মান্তে সার্থক হবে তোমারেই ভালবাসি।

প্রেমময় ! দয়াময় ! কর এই আশীর্ব্বাদ,
জন্মান্তরে ঘুচে যেন মর্ম্মের আর্ত্তনাদ !
শান্তির শীতল ছায়া তার পরে প্রসারিয়া,
তোমা মাঝে তারে প্রভো ! রাখ আজি বাঁচাইয়া।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নূতন জামা।

প্রায় বহুদিন হইতেই একটু একটু করিয়া হরিচরণ তাহার সংসারের প্রায় সমস্ত ভার ভগ্নী কাত্যায়নীর হস্তে তুলিয়া দিতেছিলেন। এবার একদিন সমস্তটাই কাত্যায়নীর করে সমর্পণ করিয়া হরিচরণ লীলা সম্বরণ করিলেন।

গাঁয়ের লোকে বলিল, 'একটা দিক্ খসে গেল,—এ গাঁয়ে আর এমনটী হইবে না।

হরিচরণ বিপত্নীক ছিলেন,—সুতরাং সংসারের ভারার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দুই বৎসরের পুত্র অম্বিকাচরণের ভারও কাত্যায়নীর হাতেই পড়িয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্যামাচরণ বড় হইয়াছিল, স্কুলে পড়িত। তাহার বয়স তখন ১৫।১৬, তাহার ভার সে নিজেই লইতে শিখিয়াছে।

কিছুদিন গেলে পিসিমা বলিলেন, শ্যাম, ও সব ছ প্যাতা ইন্জীল্ মিন্জীল্ পড়ে দরকার নেই, বাপ যা রেখে গেছেন তাই দেখে শুনে নাও। আমিও বুড়ো হয়েছি, আমি আর কয়দিন, এ সংসার তোমাকেই নিতে হবে।"

অম্বিকাকেও তিনি প্রথম 'কথ' শিখাইয়া রামায়ণ মহাভারতের গল্পে ডুবাইয়া রাখিলেন।

শিক্ষকদের শাসনের ভয়ে শ্যামাচরণ পলাইয়াই ফিরিত স্কুলের সঙ্গে কখনও তেমন একটা বড় সম্বন্ধ ছিল না; তবে তাঁহার নাকি খুব মাথা ছিল। পাকা লোকের মত বড় বড় জটীল কথা গুলিও অনেক সময় চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলিয়া শ্যামাচরণ তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া দিতেন। এবার সুবিধা পাইয়া শ্যামাচরণ প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন মাথাটী লইয়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির কাগজ পত্র নাড়িতে লাগিলেন।

প্রথমেই সেদিন শ্যামাচরণ আহারে বসিয়া বিজ্ঞের মত বলিয়া ফেলিল,—"পিসিমা।"

পিসিমা ডালের বাটীটা নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—"কিরে আর দুটী ভাত দেবো?"

"না—না—তা নয়—বাবা একটা বড়ই ভুল করে গিয়েছেন।" শ্যামাচরণের এই গম্ভীর ভাব দেখিয়া পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "কি রে কি ভুল করে গেলেন দাদা? তিনি ছোট ভুলও করেছেন বলে শুনিনি কখনও, একটা বড় ভুল করে গেলেন!" "হাস্বার কথা নয় পিসিমা, বাবা কোন উইল করে যান্‌নি।"

পিসিমা আর একটু হাসিয়া কহিলেন,—'এই কথা—তা উইল করে দেওয়া ত বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া—তোরা দুটী ভাই যদি দরকারই মনে করিস্ ত একটা উইল করেই নিস্ না হয়। আর এর আবার উইল করাই বা কি না করাই বা কি। দাদা যা রেখে গেছেন—দুটী ভাই তোরা সমান ভাগ করেই নিবি। কেন রে শ্যাম এ কথা মনে হ'ল—যে—।"

"না না অমনি; দেখলুম কি না বাবার সিন্ধুক খুলে কোন উইল নেই। তা দরকারও নেই পিসিমা, অবু আর আমি ত ভিন্ন হব না, নাই বা থাক্‌লো উইল।"

"মা দুর্গা করুন যেন তোর এই মতিই থাকে।"

"বাড়ুয্যে খুড়ো আসিয়া কহিলেন, 'কই গিন্নী কই—"

কাত্যায়নী অম্বিকার মাথায় খানিকটা তেল মাখাইয়া দিয়া গামছা হস্তে তাহাকে কোলে লইয়া আসিয়া বলিলেন, এই যে - "বাড়ুয্যে খুড়ো যে,—কি মনে করে?"

"এলাম, তোদের বাড়ী আস্‌তে কি নেই? হরি থাকতে কত এয়েছি।"

"না না আসবে না কেন? এসোনা তাইত ভাবি। বোসো, আমি অবুর মাথায় একটু জল দিয়ে আনি।"

অনেক কথা বার্ত্তার পর অবুর মুখে বড় বড় গ্রাসগুলি চোখ বুজিয়া "কে খায়" "কে খায়"—বলিয়া তুলিয়া দিতে দিতে কাত্যায়নী কহিলেন,—"আমি চাই খুড়ো, বনেদী ঘরের মেয়ে। একটু চালাক চতুর হয়। আমার এ সংসার চালাতে পারে,—তেমন। আমরা গেরস্ত লোক; লেখা পড়া জানা কনে আমাদের দরকার নেই।"

"আহা যেমনটী চাস্ তেমনটীই এনে দেবোরে, তুই ভাব্‌ছিস্ কেন বড় কনে চাস্ তুই?" বলিয়া বাড়ুয্যে খুড়ো প্রস্থান করিলেন—।

কাত্যায়নী অম্বিকার শরীরের অধিকাংশ স্থলে ধোয়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"আমার অবুর একটী বউ চাই, নারে অবু?"

অম্বিকা মুখের জলগুলি কুলকুচী করিতে করিতে "হু।"

শুভলগ্নে শ্যামাচরণের বিবাহ হইয়া গেল। পিসিমা বধু ঘরে আনিলেন। শ্যামাচরণ আসিয়া বলিলেন, "পিসিমা, অবুকে স্কুলে দিই, কিছুই করছে না।"

কোন দরকার নেই তোদের যা আছে রেখে খেতে পারলে পায়ের উপর পা দিয়ে তোফা জীবন কাটাতে পারবি। কি হবে ইংরেজী পড়ে। রামায়ণের গল্পে অনেক সার বেশী।" বলিয়া পিসিমা অম্বিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন,"কেমন নয় রে অবু? বল্‌ত ভরতের কথা।"

শ্যামাচরণ বলিলেন,—"কেবল মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, একেবারেই বোকা হয়ে থাকবে।"

পিসিমা বলিলেন,—"বেশ আছে। কেন, ইংরিজি টিংরিজি পড়িয়ে মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিবি রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে যা যা শিখবে, তাতেই ঢের হবে। ভাতের ভাবনা ত নেই। চাকরী ক'র্ত্তে কিছু আর যেতে হবে না।

পাঠশালায় যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই ভাবিয়া অম্বিকা নিশ্চিন্ত মনে তাহার ডাংগুলির ডাণ্ডা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

পিসিমা বলিলেন,—"বউ পছন্দ হয়েছে রে?"

শ্যামাচরণ যেন শুনিতেই পান নাই মতন শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন।

পিসিমা বলিলেন—"বেচারা। ইংরেজী পড়েছেন যে।"

অল্পদিনের মধ্যেই নববধূ মোক্ষদা সংসারে বেশ জাঁকিয়া বসিল; দুই একবার পিসিমার অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত,—কিন্তু পারিত না।

পিসিমা বলিলেন,—"যতদিন আমি আছি, ততদিন এ সংসারের সমস্ত আমার কথামতই চল্‌চে—চল্‌বে।"

মোক্ষদা বলিল "আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনি আর এখন সবটাতেই কেন, আমরা আর হবে কেন আছি মা।"

পিসিমা বলিলেন, "তোমরা আছ থাকবে। যখন আমি সরে পড়বো তখন তোমরা সব তোমাদের মতন করে নিয়ো।"

বুদ্ধিমান শ্যামাচরণ অল্পদিনেই বুঝিল—নবাগতাটীও নিতান্ত অপাকা নহেন। সেও বেশ বিষয় বুদ্ধি লইয়াই এ সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। শ্যামাচরণ আজকাল দুই একটা করিয়া কাজে কর্ম্মে পিসিমাকে ছাড়িয়া, মোক্ষদার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ফলে এই দাঁড়াইল, শ্যামাচরণ এক উইল করিয়া ফেলিলেন; তাহাতে বিষয়ের বারো আনা শ্যামাচরণের এবং চারি আনা অম্বিকার। সহি না থাকিলে নাকি উইল হয় না, শ্যামাচরণ তাই হরিচরণের নামটাও উইলে সহি করিয়া দিল, অবিকল তাঁহারই দস্তখৎ;—কে অবিশ্বাস করিবে?

কার্য্যটা অবশ্য পিসিমাকে লুকাইয়াই করিল, কিন্তু পিসিমার চক্ষু এড়াইতে পারিল না। পিসিমা সবই বুঝিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্যামাচরণ তেমন দৃষ্টি দিতে পারিল না—তার কাজ কত। অম্বিকা ডাংগুলি ছাড়িয়া পিসিমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

পত্নীবিয়োগের কিছুকাল পরেই হরিচরণের সংসারটী যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের হাত এড়াইয়া আসিতেছিল, তখন হইতেই কাত্যায়নী সদ্য বৈধব্য লইয়া দাদার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্তা আছেন। এ সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শৃঙ্খলা সবই তাঁহারই কৃত। নিজের হাতে গড়া এ সুন্দর গৃহখানি বিদ্বেষের আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই তিনি আবার তাঁহার ভ্রাতার নূতন সংসারের ভার লইতে চলিয়া গেলেন।

২

কয়েকদিন পর্য্যন্ত অম্বিকা পিসিমার জন্য খুব কাঁদা কাটি করিল। শ্যামাচরণ তখন ভুলাইয়া রাখিল। যতদিন নিজে কিছুই বুঝিয়া করিবার ক্ষমতা না হইল শ্যামাচরণই দেখিত শুনিত অম্বিকাকে ভাল বাসিত, ভাইত বটে। রক্তের টান কোথায় যাইবে? তবে বিষয় বুদ্ধি কাহার না থাকে? তাহার উপর যদি বিষয় ও বুদ্ধিমতী ভার্য্যা গৃহলক্ষ্মী রূপে বর্ত্তমানা থাকেন, তবেত কথাই নাই। অম্বিকা তাহার পুরাণো রামায়ণ মহাভারতের গল্প লইয়া, জেলেদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলিয়া, জলে ডুবিয়া, রোদে ঘুরিয়া গাছে উঠিয়া কতবার পড়িয়া, সময় বুঝিয়া দাদা না দেখে মতন্ হুকোটায় দু'চারটা টান্ মারিয়া বছরের পর বছর বড় হইতে লাগিল।

অনুদ্বিগ্ন চিত্তে শ্যামাচরণ মোক্ষদার সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিসে সংসারের উন্নতি হইবে, কিসে কেমন করিয়া কি হইবে, এবং কি করিয়া কি করিতে হইবে।

শ্যামাচরণ বলিলেন, "এইবার অম্বিকাকে বিষয় কার্য্য বুঝিয়ে দিই।"

মোক্ষদা কহিলেন,—"তুমি ক্ষেপেছো, ওদিকে মোটেই নয়। বরং একটী কনের সন্ধান ছাখ,—কিছু টাকাও পাওয়া যাক্,—অম্বিকাও মজে থাকবে।"

শ্যামাচরণ বলিলেন,—"না না সবে ষোলয় পা দিয়েছে। এখুনি বিয়ে, আরও যাক্ কাজ কর্ম্মই শিখুক।"

"তবে তোমার যা খুসী তাই করগে। আমার বুদ্ধি নিয়েই, সব গুছিয়েছ। একরকম করে তোলা গেছে, সব আবার গুলিয়ে দিতে চাও। ঠাকুরপোকে কাজ কর্ম্ম শেখাও আর তা না চাও ওদিকটাই ভুলে যাও। বিয়ে না করালে নেই, যেমন আছে তেমনি থাক। তোমার উপর এই অচলা ভক্তি ওর থাকবে যতদিন অবু সংসার না চিনবে।"

শ্যামাচরণ চুপ্ করিল। মোক্ষদার মতবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে শ্যামাচরণ বিশেষ ভাবিয়া দেখিতেন, এযাবৎ ত করেন নাই।

অম্বিকা আসিয়া কহিল, "দাদা না হয় আমার থেকেই

দিন কিছু, দাদাঠাকুর বল্লেন—আমারও টাকা আছে, যুদ্ধের চাঁদা সবাই দিচ্ছে, দেওয়া উচিত।"

মোক্ষদা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন,—"ওকি কথা গো, তোমার টাকা এর টাকা কিগো ঠাকুরপো।"

শ্যামাচরণ কহিলেন,—"অবু! বুঝিস্ না কেন, টাকা বড় কষ্টের পাওয়া ধন, কত কষ্টে এই সব বিষয় সম্পত্তি করেছি তা আমিই জানি। এ সব কি পরের কাজে ওড়াতে হয়।"

"বাবার টাকা থেকে দিন।"

"ওরে পাগলা বাবার টাকা আবার কি? বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাকে কি আর রেখে যাওয়া বলে? পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই ছিল না আমাদের বাবা তোকেই শুধু দিয়ে গিয়েছেন। তুইও যদি না থাক্‌তিস্ অবু, তাহলে আমি হয়তঃ পাগল হয়ে যেতুম। কোথায় বা থাকতো বিষয় আসয় কোথায় থাকৃতো কে? তোদের জন্যই সব, তোরা সব বুঝে নিলেই আমার শান্তি।"

দাদার মুখে "অবু" ডাক শুনিলেই অম্বিকা গলিয়া যাইত অম্বিকা ভাবিল,—দাদা কি মিথ্যা বলবার লোক, দাদা অতি সজ্জন। এখনও যে তিনি গৃহ দেবতা নারায়ণের পূজা না করিয়া জল স্পর্শও করেন না। দাদাঠাকুর জানেন না আমাদের কথা। ছিঃ অমন চিন্তাও করিতে নাই, দাদা যাহা দয়া করিয়া দিবেন তাহাই আমার খুব। আমার দাবী কি?

বরং আমারই জীবনের জন্য আমি দাদার কাছে ঋণী। দাদা যদি প্রতিপালন না করিতেন তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম। বাঁচিতাম কি? মরিয়াই যাইতাম। না ছিঃ আর কখনও দাদাকে অপকারী ভাবিব না,—সাধু সজ্জনেরা মনের কথা জানিতে পারেন। দাদাও জানিয়া দুঃখ করিবেন।"

দাদাঠাকুর কহিলেন,—"কি হ'লরে।"

অম্বিকা কহিল,—"না দাদাঠাকুর আমরা কিছুই দিতে পারবো না। আমার কিছুই নেই।"

দাদাঠাকুর কহিলেন, 'অম্বিকা,—একটু চালাক হ। নিজে কামাতে শেখ্‌ নিজে কামাতে শেখ্‌ নিজের পাওনা বুঝে নে।' সংসার চিনে চল্।

অম্বিকা কহিল,—"তুমি কি যে বল, দাদাঠাকুর আমি আবার কি করবো! দাদা যতদিন আছেন, দাদাই সব করবেন। আমায় যা বলেন,—করি, করবোও তা। দাদাই যে আমায় এতটুকু থেকে আজ এত বড় করেছেন। আমরা গরীব ছিলুম দাদাই সব বিষয় করেছেন। আমায় খেতে পরতে দিচ্ছেন,—আবার কি! জান দাদাঠাকুর,—দাদা আমার রামচন্দ্র, দেবতা।'

দাদাঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না। অম্বিকার জন্য তাহার প্রাচীন প্রাণটা আরও যেন সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

দাদাঠাকুর, রাধানাথ গোস্বামী, গাঁয়ের একজন প্রাচীন লোক বিষয় সম্পত্তি ছাড়া গাঁয়ের বাজারে তাঁহার একখানি জামা কাপড়ের দোকানও ছিল। লুকাইয়া সেই দোকানে তিনি নাকি জুতাও বিক্রয় করিতেন। শ্যামাচরণের কপট সম্ভাষণে, স্নেহের ভনিতায় অম্বিকাই তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করিত। কিন্তু গ্রামের অনেকেই বলিত, "আহা ভাইটাকে একেবারেই পথে বসাবে শেষে। কোন কর্ম্মেই লাগলো না।"

অম্বিকার সরল মধুর সেকেলে স্বভাবের জন্য অনেকেই তাহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

৩

কিছু দিন পরে একটা নিলাম খরিদ করিতে হাজার কয়েক টাকা ব্যয়িত করিয়া শেষে একদিন মোক্ষদার পরামর্শ মতে শ্যামাচরণ প্রাণের ভাই অম্বিকার জন্য একটু দূরের গ্রামের এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেন। কনে দেখা হইল, কথাবার্ত্তা হইল, পাকা দেখা হইল। ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে তাহার ভিটা বাড়ী বিক্রয় করিয়া কন্যা নিস্তারিণীকে অম্বিকার করে সম্প্রদান করিলেন।

অম্বিকা বধূ লইয়া ঘরে আসিল, শ্যামাচরণ মোক্ষদায় টাকা গুলি বুঝাইয়া দিলেন, নিস্তারিণীর পিতা পত্নীপুত্রসহ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

অম্বিকা আসিয়া একদিন কহিল,—"দাদা এইবার আমায় একটা কাজে লাগিয়ে দিন, বসে বসে কতদিন চলবে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন,—"তা বেশ, বেশ অবু, আমি দেখ্‌বো'খন।"

মোক্ষদা কহিলেন,—"কাজ আবার কি করবে ঠাকুরপো, বেশত আছ। অভাব কিসের?"

শ্যামাচরণ কহিলেন,—"হা যাক্ আর কিছুদিন।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না নিস্তারিণী ভিতরের কথাটা অনেকটা বুঝিয়া ফেলিল,—কিন্তু অম্বিকার বুকে শ্যামাচরণ অনেকটা দখল করিয়া বসিয়াছে,—কাজেই তাহাকে একধারেই পড়িয়া থাকিতে হইল।

অম্বিকা আবার তেমনি মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাডুডু, গোল্লাছুট্, ডাংগুলি ছাড়িয়া ঘুড়ি উড়াইয়া বিশ্বাসদের বাড়ী তাস খেলিয়া, দত্তদের পুকুরে মাছ ধরিয়া পাড়ার কোন বৃদ্ধার সম্মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করিয়া, দাদাঠাকুরের দোকানে, দুই হস্ত কৃতাঞ্জলির অগ্রে তপ্ত কলিকাটায় খুব একটা কসে টান্ লাগাইয়া, অধিকাংশ সময় বাহিরেই কাটাইয়া দিতে লাগিল।

আজকাল তাহার নিজেরও একটা হুকো হইয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে রাত্রি ছাড়া ধূমপানের সুবিধা নাই,—দাদা দেখিতে পাইবেন। তাও আবার হুকোয় জল পুরিবার যো নাই, দাদা শুনিতে পাইবেন। দাদাকে দেখিলে এখনও সে সভয় ভক্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

বালিকা নিস্তার তাহার ক্ষুদ্র ঘরখানি ঝাড়িয়া মুছিয়া প্রয়োজন মত আবশ্যকীয় গৃহ কর্ম্মাদি করিয়া মোক্ষদার নবজাত পুত্র হীরণ কুমারকে কোলে করিয়া শূন্যে নাচাইয়া কাঁদাইয়া, ভুলাইয়া, খাওয়াইয়া বুকে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া পান চিবাইয়া, চুল বাঁধিয়া কোন প্রকারে দিনটা কাবার করিয়া দিত। সমস্ত দিন ঘুরিয়া আসিয়া আহার করিয়াই অম্বিকা শুইয়া পড়িত। যেদিনও বা ঘুম না আসিত, নিস্তারের শত প্রশ্নের উত্তর দিবার মত তাহার কোন কথাই জোগাইত না বলিয়া অম্বিকা চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিত। নিস্তার যতই তাহার ভিতরকার প্রাণটা জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইত, অম্বিকা যেন সেই ভয়েই আরও দূরে সরিয়া যাইত।

"আমার কতটুকু", "আমার কি দাবী" "আমার কি প্রাপ্যাংশ" এসবের চেয়ে দাদারই সব, আমারও দাদার ইহাই তাহার ভাল লাগিত। অত গোলমালের ভিতর সে যাইতেও চাহিত না তাহার ভালও লাগিত না। মাথায় এসব ভাল আসিতও না। এক কথাতেই সে তাই নিস্তারের সব প্রশ্নের উত্তর দিত,—"দাদা দেবতা দাদা যা করেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া নিস্তার এতটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিত। তাহার মনের আরও অনেক কথা যেন ঐ নিঃশ্বাসটার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িত। অম্বিকা তাহা সম্যক্ না বুঝিলেও নিস্তারের প্রাণের একটা ব্যথা যেন হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে চাহিত, পারিত না। কিছুই সে ভাবিয়া পাইত না। 'এতো বেশ আছি কোন গোলমালইত নাই, দাদাই সব করেন,—দাদাই সব করবেন,—নিস্তারকে বুকের দিকে টানিয়া লইয়া নিতান্ত নির্ভাবনায় অম্বিকা কখন ঘুমাইয়া পড়িত, প্রভাতোত্তীর্ণ প্রখর রোদের আলোয়ও তাহা জানিতে পারিত না,—অনেক বেলায় উঠিয়া অম্বিকা নিয়ম মত পাড়ায় কে কেমন আছে একবার দেখিয়া আসিত।

নিস্তার রাঁধিত সুন্দর। শ্যামাচরণ খাইতে খাইতে বলিলেন—"বৌমা বড় চমৎকার রান্না কর্ত্তে পাবে।"

মোক্ষদা বলিলেন, "মুড়োর ঘণ্টটা আর একটু দাওনা বউ।"

'না—না আর লাগ্‌বে না এনোনা তুমি, বউমা।'

রন্ধনের সুখ্যাতিতেই নিস্তার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, শ্যামাচরণ মানা করিতে আর উঠিলই না।

আহারান্তে শ্যামাচরণ চলিয়া গেলেন,—মোক্ষদা কহিলেন, "দিতে পারলি না আর একটু, রাক্ষুসে দৃষ্টি, আমারতো জ্বরই—গিল্‌বে কে অতগুলো।"

"মানা কর্‌লেন তিনি।"

মোক্ষদা এদিকে আর সুবিধা না পাইয়া কহিলেন, "তেল ঘিটা একটু মায়া করে খরচ কর বউ, তোমার যেমন হাত দুদিনেই যে ফতুর করবে তুমি; খরচ করতে আর কি, যে কামায় সেই জানে—কামাতে কি কষ্ট। একাইত পাল্‌চেন এক পাল।"

সংসার খরচ বাদে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থসংখ্যা মোক্ষদা নিস্তারের হাতে দিতেন ইহাতেই তাহাকে করিয়া লইতে হইবে। অথচ রান্না সুখাদ্য হওয়া চাই।

নিস্তার বলিল, "দিদি এতে ত কুলোয় না আর কিছু বেশী করে দিতে বোলো বড়ঠাকুরকে।"

"আরও? বাপ্! টাকা গাছে ধরে না ছোট বউ। এতে পার ভাল নয়—" কি বলিতে গিয়া না বলিয়াই মোক্ষদা বলিলেন—"আমরা আর কয়জন।"

হাত খরচের বাবদে দুটো একটা টাকা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে অম্বিকাকে দিতেন; নিস্তার একদিন কহিল,—"ও বাবা! আমি আর পারিনা,—খরচে কুলোয় না অথচ কুলিয়ে নিতে হবে।"

অম্বিকা কহিল, "আমার ত বেশী নাই, আমায় যা দেন দাদা, নিও তুমি আমি দেবো'খন।"

মোক্ষদা একদিন কহিলেন, "এখন হয় কি করে।"

নিস্তার শুধু কহিল, "হচ্ছে, হয়।"
সাহস করিয়া আর উপায়টা কহিল না। যদি তাহাও বন্ধ হইয়া যায়।

৪

মাকে "মা" ডাকিলেও মায়ের কাছে হীরণ মোটেই থাকিত না। মোক্ষদার সদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, কাজ না থাকিলেও যেন কত কাজের ভাব, কারণ অকারণে বাড়ী মাথায় করিয়া তোলা, বালক হীরুর কিছুতেই ভাল লাগিত না। সে তাহার হাসিভরা মুখ, সদা শান্ত ভাব, সুমধুর ভাষিণী কাকীমার কাছেই থাকিত। কাকীমার কাছেই ঘুমাইত।

যখন সে চার পাঁচ বছরেরটী হইল, তখনও তাহার মাতা মোক্ষদা অনেক সময় চোখ রাঙ্গাইয়া যত বলিয়াছেন, "ওর কাছে অত কি? ডাইনী ছেলে ভুলোনী। ছেলেটাকে খুব আপনার করে নিয়েছে। ওর কাছে অত যেতে পাবিনি"—ততই তাহার বাল্য হৃদয়টুকু তাহার কাকীমার বুকে মুখ লুকাইতে না পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। যতই মোক্ষদা হীরণকুমারকে নিস্তারের স্নেহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ততই এই একফোঁটা ছেলে নিতান্ত অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের মত মাতৃআজ্ঞা অমান্য করিয়া সেই নিষিদ্ধ গণ্ডীটার ভিতরই নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার নিস্তার কোন এক বাল্য সখীর বিবাহ দেখিতে দুদিনের জন্য স্থানান্তরে গেল, হীরণ এই দুই দিবসই শুধু কাঁদিয়া কাটাইল, ঘুমের মধ্যেও কতবার চমকিয়া উঠিয়া "কাকীমা, কাকীমা" করিয়া উঠিল। মোক্ষদা নিস্তারের উপর হাড়ে চটিয়া রহিলেন।

নিস্তার সবে অন্দরে প্রবেশ করিয়া হীরণকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে—মোক্ষদা আসিয়া কহিলেন, "বলি ছোট বউ, তুমি কেমন মেয়ে গা; ছেলেটাকে কি মেরে ফেলতে চাও?"

নিস্তার সবিস্ময়ে হীরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া শশঙ্ক দৃষ্টিতে মোক্ষদার দিকে চাহিয়া কহিল,—"কেন দিদি, বালাই, হীরণ আমার চিরকাল বেঁচে থাক।"

সব্যঙ্গে মোক্ষদা বলিয়া গেলেন,—"আমি যেন পেটে ধরিনি; মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে, তাকে বলে ডা'ন্।"

যেদিন পাঠশালায় যাইতে হীরণ বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "কাকীমা," তুমি বলনা আমি যাবো না পড়্তে—কাল যাবো, দেখো তুমি।"

"কেন, আজ কি হ'ল?"

"আজ যাবো না, হাঁ, বলনা কাকীমা।"

"না—না, মা মারবে, পড়তে যাবিনি কেন"—

"না—না আমি যাবো না আজ।"

মোক্ষদা শুনিয়া বলিলেন,—"না তা যাবি কেন—এঘরের হাওয়া লেগেচে; কতকগুলি আকাট মুখ্যুতে ঘরটা বোঝাই করে তোল্। লেখা পড়া শিখে কি হবে? এ দিন এমনই যাবে!—বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি খুব ব্যস্ততার সহিত চলিয়া গিয়া খাটের উপরের উঠানো শয্যাটা আর একটু গুছাইয়া রাখিয়া, কি ভাবিয়া বাক্সটা একবার খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া তাহার উপরটা আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটা কি দেখিতে একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া রান্না ঘরের চৌকাটটার কাছে আসিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

নিস্তার কি একটা ভাবিতে ভাবিতে সনিশ্বাসে বলিল,—"হুঃ, কাকে কি বলে গেলে তুমি দিদি, আমি কি আর বুঝি না? বুঝি, কি করবো। বরাত আমার ভাল কি তোমার ভাল, আমি বুঝ্তে পারচিনি।"

কাকীমার মুখে "হু" শুনিয়াই হীরণ দ্রুত বাহির হইয়া গেল, কাকীমা "হু" বলিয়াছে আর পায় কে?

দুপুরে অনেক বেলায় খাইতে আসিলে, মোক্ষদা কহিলেন, "এস তুমি আজ ঘরে,—পড়্তে যাওয়া ভাল না খেলাই ভাল টের পাইয়ে দিচ্ছি আমি।"

"কাকীমা বলেছে ত?"

"হুঁ তা জানি, তোর আর কি সাহস?—অমন হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কে তোর? বলি ছোট বউ কি মনে

করেছ, তোমরা ছেলেটাকে একেবারেই মাটী কল্লে যে। এ কেমন ভাব বাছা, মার্ত্তে আর পাওনি কাকেও? তোকেও বল্‌ছি হীরণ ফের্ তুই ছোটর ঘরে যাবি, দু'টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌বো, ডাক্‌লেও যেতে পারবিনি।"

হীরণ সজল নেত্রে বলিল, "কাকীমা বলেনি'মা।"

মোক্ষদা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"যা' দূর হ' হতভাগা।"

হীরণ আবার বলিল,—"পড়তে যাই মা?"

মোক্ষদা কহিলেন,—"বেরো বাড়ী থেকে, নইলে দেখ্‌ছিস্" বলিয়াই তিনি অদূরবস্থিত একটা গাছের শুক্‌নো ডা'ল হাতে তুলিয়া লইলেন,—"যা বেরো, খেতেও পাবিনি আজ দেখি তোর কোন দাদা বড়ঠাকুর আছে পিণ্ডির জোগার রাখ্‌বে। আয়—এদিকে—"

হীরণ দাঁড়াইয়া রহিল।

মোক্ষদা হাতের ডালটা নাড়িয়া কহিলেন,—"আয় শীগ্‌গীর,—ভাল চাসতো আয়—"

এ ভালোর মানে যে "কয়েকটা ঘা পিঠ পেতে নিয়ে যা—" বুঝিয়া হীরণ পশ্চাতের দিকেই একটু সরিয়া দাঁড়াইল,—মোক্ষদা উঠিলেন;—হীরণ "আর করবো না কখনও না" বলিয়া দৌড়াইয়া ভিন্ন দ্বারপথে নিস্তারের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া তক্তাপোষের নীচে লুকাইয়া রহিল। ওটাই যেন তাহার দুর্জ্জয় দুর্গ, এ দুর্গের প্রাচীর পার হইয়া কেহ যে বাহির হইতে আসিয়া তাহাকেও বাহিরে টানিয়া লইতে পারিবে, উহা সে মোটেই ভাবিতে পারে নাই।

অনেক খুঁজিয়াও কেহই তাহাকে পাইল না। কি একটা কাজে নিস্তার ঘরে ঢুকিতেই, মৃদু চাপা কণ্ঠে হীরণ কহিল,—"কাকীমা, আমি এখানে আছি মাকে বোলো না।"

নিস্তার তাহার এ ভাব দেখিয়া না হাসিয়া পারিল না,—"আয়, আয়, কিছু করবে না আর। তুই বলিস্ পাঠশালে গিয়েছিলি—আহা, সারাদিন যে খাসনি রে হতভাগা, আয় না।"

হীরণ বলিল—"মারবে যে"

"মারবে না আর।"

মোক্ষদা কহিলেন,—"কিরে পড়তে গিয়েছিলি?"

হীরণ ভয়ে ভয়ে বলিল—"হু"

"দাও দাও, ছোট বউ, খেতে দেও হীরুকে, সারাদিন খায়নি। আর করিসনি কখনও।"

হীরণ বলিল—"না"।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মোক্ষদা শ্যামাচরণের সহিত তর্ক করিতেছিলেন। হীরণকে আজ তিনি জোর করিয়াই তাহার নিকট আনিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। হীরণের কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না, কেবলই এ পাশ ও পাশ করিতেছিল।

মোক্ষদা কহিলেন, "এবার দাও বিদেয় করে। আবার কি? বে থা করিয়ে দিলুম, এখন যে যার সরে পড়ুক। হীরুর মাথাটা খাচ্ছে।"

শ্যামাচরণ বলিলেন "না না লোকের কথাত ভাবতে হয় হয় গিন্নী, আছে থাক—ভাই! আর অবু আমা বই জানে না। এখনও আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলে না।"

"না—না আর বলে না; স্বাথই বটে অমন মুখে রা নেই, ও বেটী মিটু মিটে ডান্, আমি যাই তাই সয়ে আছি, আর কেউ হলে দিন কাটাকাটী হ'ত। দুদিনেই ছেলেটাকে কেমন হাত করে নিয়েছে। আমি মা, আমায় মোটে কেয়াব করেনা। ছোট বউকে কিছু বল্‌তে গেলে আমার মুখ চেপে ধরে বলে,—"কাকীমাকে কিছু বল্‌তে পারবে না।" একি আর ও বলে, বলায় ওকে। ও আর কি বোঝে বলিয়াই মোক্ষদা একবার হীরণের দিকে চাহিলেন। এখনও ঘুমায় নাই জানিলে মা আর রক্ষা রাখিবেন না ভাবিয়া হীরণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

মোক্ষদা আবার কহিলেন, "না না আর দেরী নয়। ওরাও এবার বুঝে শুনে নিক্; আমরাও আমাদের মত থাকি। আমি কালই বোল্‌বো। এত করে ছুঁতো খুঁজে বেড়াই, পাইওতো না ছাই, যে তার মুখে বল্‌বো! শয়তানের চাঁই—ওকি মেয়ে, ও ডান্।"

শ্যামাচরণ কহিলেন,—"না মা গিন্নী, থাক আরও ক'দিন, অবু আরও একটু বড় হোক্। আমার ছোট ভাই,—বয়সেইবা কি! বিষয় আশয়ত করে দেওয়াই গেছে একরকম, যে উইল করেছি, ও বুঝবেও না, কথাও কইবে না। যা দেবো তাই নিয়ে চলে যাবে, আমার

বড় মানে। এত শীগ্‌গীর ভুলতে পারবো না, থাক এখন।”

“পারবে গো পারবে। হীরুর মুখ চেয়েই করেছো, হীরুকে দেখেই ভুলবে। এখন ও পাপ বিদেয় হলেই ভাল। খুব করা গেছে। চার আনা যা দেওয়া গেছে তাই বেশী, আবার কি? চিরকাল বসিয়েই যদি খাওয়ালে তবে ও কারসাজির কিই বা দরকার ছিল।”

“তুমি বল্লে দেখলুম মন্দ নয়, করলুম, তবু যাক্ আরও কিছুদিন।”

“আমার দোষেই করে থাক ত ভাইকে নিয়ে থাক— আমি হীরুকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাই। তোমারই বা এত কি? আমার বাপেরও কিছু নেই এমন নয়, যে পেটে ধরেছে সেই হাঁড়ীতে জায়গা দেবে।”

“না—না, দেখিই না, আর একটু যাক্, তুমি বোঝ না।”

মোক্ষদা আর কথা না কহিয়া হীরণের দিকে ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ কিং কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

হীরু কিন্তু তখনও জাগিয়াছিল। তাহার কাকীমা কাকাবাবুকে লইয়াই যে কথার এই প্রসঙ্গ তাহা সে তাঁহাদের নামোল্লেখে কতকটা বুঝিয়া লইয়াছিল। কাকীমার জন্য চোখ দুটী সজল হইয়া উঠিল; আবার এদিকে এক রাশি ঘুমও দুটী চক্ষু চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল। বাবা ও মা ঘুমাইয়াছেন জানিতে পারিয়াই হীরণ আস্তে আস্তে উঠিয়া নামিয়া গেল।

শ্যামাচরণ স্বপ্নে কি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না কোথায় যাবে, থাক্ এখানে।”

স্বপ্নে কথা কওয়া তাঁহার একটা রোগ ছিল। হীরণ তখন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দরজার ও ধারেই কাকীমার ঘর। অন্ধকারে হঠাৎ ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—“কাকীমা। ও কাকীমা!”

দুঘরের লোক জাগিয়া বাতি জ্বালাইল।

মোক্ষদা প্রায় সমস্তটা দোষ নিস্তারের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া কিছু পরিমাণ হীরণের পিঠের উপর নামাইয়া দিলেন।

প্রহারের জ্বালায় হীরণ সেদিন সেখানেই কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

খোঁটার জ্বালায় নিস্তার কহিল,—“শুনলেতো আজ নিজের কানে! আমি ওকে খুন করেছি,—আমার লাভ? এমন অদেষ্ট নিয়েও এসেছিলুম,—বাপের বাড়ীও নেই একটা যে চলে যাবো, দুদিনকাল জুড়াবো। এর চেয়ে মরণ ভাল।”

আজ সে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল আরও কহিল— “মাগকে যে খাওয়াতে পরাতে পারবে না, নিজে যে উপায় কর্ত্তে জানে না,—সে আবার বিয়ে করে কেন জানিনি।”

সদ্য নিদ্রাভঙ্গে অম্বিকা উঠিয়া তামাক টানিতেছিল। বলিল, “দাদাতো কিছু বলেন নি, ব্যস্। নিস্তার, আমি আজকাল দেখ্‌ছি সবই। একেবারেই যে বুঝ্‌ছি না, তাও নয়। তবে আমি কেমন ভাব্‌তেও পারিনা এসব। দাদা যেদিন কিছু বল্‌বেন, সেদিন তোমার হাতটী ধরে বেরিয়ে পড়বো। তার আগে যেমন আছি থাক্‌তেই হবে, দাদা তেমন নয়। দাদা কি তা পারবেন?”

নিস্তার অম্বিকার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, “ওগো, তুমি বোঝনা, আমরা ঘরের বউ। আমরা যদি তোমাদের জোর না পাই, তবে আমাদের কি সাধ্যি কিছুই করতে পারি। তোমার দাদার জোর না পেলে বড় বউ কি আর এতটা গড়াতে পারতো। তোমাদের জোরেই আমাদের জোর, তোমাদের মিলেতেই আমাদের মিল্।”

অম্বিকা কথাগুলি ভাবিতে লাগিল,—এত কথা তাহার এইটুকু কোলের বউ কোথায় শিখিল। এসব যে তাহার মাথায়ও আসে না।

ইহারই কিছু দিবস পরে নিস্তারের একটী ছেলে হইয়াছে। এবং ইহারই পাঁচ বৎসর পরে আমাদের ঘটনার কাল। এই পাঁচ বৎসর শ্যামাচরণও আজ কাল করিয়া কাটাইয়া দিলেন। মাঝে একবার পিতার অসুস্থতার সময় মোক্ষদা অনেক দিন পিত্রালয়ে এবং পিতার সহিত নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। গোপনে যাহাই বলুন যাহাই আঁচিয়া রাখুন প্রকাশ্যে এযাবৎ তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। একটা অছিলাত চাই, অন্ততঃতাহাও যে অম্বিকা কিম্বা নিস্তার কেহই ঘটিতে দেয় নাই! মোক্ষদা মনে মনে তাই আরও বেশী ফুলিতে ছিলেন। সাগরের সগর্জ্জনোত্তাল তরঙ্গ গুলির মত অনেকবারই তিনি নিরীহ নিস্তার অম্বিকার গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়াছেন। অম্বিকা তীরের বালুতটের

মত তাহারই সহিত মিশিয়াছেন। নিস্তার বেলার উপরের তৃণগুচ্ছের মত অম্বিকার বুকে মুখ লুকাইয়া সমস্তই সহিয়া গিয়াছে। পাগল ঢেউগুলি ফিরিয়া আবার মোক্ষদার প্রাণটাকেই প্রতিঘাতে জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছে।

হীরণ আজ দশ বছরের হইলেও এখনও তেমনি কাকীমার "আঁচল ধরা" সেই হীরুই যেন রহিয়াছে। বিশেষ ভিতরের উন্মুখপ্রায় বিচ্ছেদানলের তাপে আরও যেন বেশী নিস্তারকেই জড়াইয়া ধরিয়াছে। নূতন একটী প্রাণের সুহৃদও সে কাকীমাব নবজাত পুত্র কিরণচন্দ্রের প্রাণে খুঁজিয়া পাইয়াছে। দাদার অনুকরণ সব কাজের মধ্য দিয়া করিতে গিয়া কিরণ নিস্তারকে 'কাকীমা' ও মোক্ষদাকে 'মা' ডাকিতে শিখিল।

অম্বিকাকে 'বাবা' ডাকিত,—শ্যামাচরণের নিকট সে যাইতই না।

হীরণ কিম্বা মোক্ষদা কেহই তাহার এই ছোট খাট বেয়াদবী গুলি শোধরাইতে পারিত না।

'মা' 'মা' বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিলে মোক্ষদার প্রাণটা যেন কেমন করিয়াই উঠিত,—অনেকটা রাগ যেন পড়িয়া যাইবার মত হইত। মনে মনে বলিতেন,—"এ আবার কি আপদ—না, এ ত নিশ্চয়ই ছোটর কাজ,—হুঁ, সেই শিখিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে ভুলোবে!" কিরণকে বলিতেন,—"জ্যেঠাই মা বল্—জ্যেঠাই মা,—মা না,—বল জ্যেঠাই মা।"

কিরণ মোক্ষদার গলাটা আরও জোরে জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া দু'একবার মস্ত হাঁ করিয়া জ্যেঠাইমার নাকটা মুখটা গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া আপন মনে কত কি বলিয়া, আবার ফিরিয়া 'মা' 'মা' করিয়া মোক্ষদার মুখের উপর মুখ রাখিয়া তাহার বক্তব্য বিষয় অজ্ঞাত দেশের কোন অজ্ঞাত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দিত।

হীরণ বলিত, "বলে মা, তায় কি!" মোক্ষদা বলিতেন,—"আমি ওর মা নাকি? যে পেটে ধরলো সে গেল স্বর্গে। এখন না শেখালে পরেও যে ভুলতে পারবে না! চিরকালই আমাকেই মা বল্‌বে, নাকি?"

হীরণ কহিত, "না না, তা তাতে আর কি?"

মোক্ষদা বলিতেন, "হ্যা তা বই কি?"

৫

আজ ষষ্ঠী! গৃহে গৃহে উৎসব! সোনারগাঁয়েও দুএক ঘরে মায়ের শুভাগমন হইয়াছে। দুখানি বাড়ী পরেই দত্তবাড়ীতে ধুমধাম করিয়া দুর্গা পূজা হয়। গাঁয়ের ছেলের দল সেখানেই সমবেত হইয়াছিল। সকলেই নূতন জামা জুতা পরিয়া আসিয়াছে। হীরণের দাদা মহাশয় হীরণকে নূতন বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিরণও একটা নূতন জামার জন্য বায়না ধরিল। শ্যামাচরণ তখনও এবারের পূজার কাপড় কেনেন নাই। যে বাজার!

অম্বিকার হস্তে একখানি নোট দিয়া শ্যামাচরণ কহিলেন,—"অবু, গোসাঞজীর দোকান থেকেই ওদের দুজনকে দুটো জামা এনে দে। ছেলে মানুষ সবাই পরেছে।"

আগের দিন কি একটা কথা লইয়া মোক্ষদা নিস্তারিণীকে খুবই চাপিয়া ধরিয়াছিল।—নিস্তার বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গিয়া নিজের ঘরেই চুপ করিয়া ছিল। মোক্ষদা তাহাতে নিজেকে আরও বেশী অপমানিতা মনে করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।—"নিস্তারিণী এত তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া গেল!"

নূতন জামা গায়ে হীরণ কিরণ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বাপ!" গাঁয়ে আর লাগেনা, এমন কি বাপু যে এত দামের জামা গায়ে না পরালেই নয়!—"

নিস্তার কহিল,—"বছরকার দিন দিদি, ছেলেমানুষ সাধ হয়েছে, সবাই ত সাধ করে।"

মোক্ষদা কহিলেন, "অত সাধ সোহাগ থাকেত, নিজে রোজগার করেদিতে হয়। পরের ঘাড় ভেঙ্গে কেন! দিয়েছে আমার বাপ,—আমাকে,আমার ছেলেকে, নিজের রোজগার থেকে, হুঁ! ঐতো দেওয়া। পরের ধনে বড় মানুষি কেন?"

নিস্তার আর কোন কথা না কহিয়া কিরণের হাত ধরিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিল।

স্বামীর নির্লিপ্ততায় নিস্তার বড়ই অশান্তিতে ছিল। কিন্তু আজ এই শারদ প্রভাতে ছেলে একটা নূতন জামা গায়ে দিয়েছে বলিয়াই এত কথায় তাহার মাতৃহৃদয়টা বড়ই কাঁদিয়া উঠিল।

অম্বিকা আসিয়া কহিল, "আবার কি হ'ল আজ? অমন কর্ত্তে নেই, বছরকার দিন ওঠ।"

নিস্তার শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। উঠিল না, সাড়াও দিলনা।

কিরণ গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল। পিতৃপ্রদত্ত এই নূতন জামাটী গায়ে দেওয়ার পূর্ব্বেও কাকীমা (মা) কত হাসিয়াছে, মুখে চুমা খাইয়াছে, আর জামাটী গায়ে দিয়া মাঁকে (জ্যেঠাই মা) প্রণাম করিবার পরই এমন কি ওলট্‌ পালট্‌ হইয়া গেল। কিরণ ভাবিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে;—এই নূতন জামাটাই যত অনিষ্টের মূল।

অম্বিকা কিরণের চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে বাবা!"

কিরণ ছল্‌ ছল্‌ চোখে বলিল,—"জামাটা খুলে দেও, কাকীমা কাঁদচে, মা গাল দিয়েছে যে।"

জাহাজের সার্চ্চলাইটের মত হঠাৎ এই একটা কথা অম্বিকার চোখে যেন অনেকটা রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিল। অম্বিকার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—ধীরে ধীরে জামাটী খুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কিরণ কাঁদিল না, তেমনি বসিয়া রহিল। তাহার পর হীরণ যখন আসিয়া কহিল,"আয় কিরণ আমার সঙ্গে, আয়" —দাদার হস্ত ধরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল।

গোসাঞি কহিলেন, "কি হে অম্বিকা জামা ফিরিয়ে আন্‌লে যে?"

সমস্ত পথ অম্বিকা ইহারই প্রত্যুত্তর ভাবিয়াছিল,— "গায়ে লাগে নাই, দাদা ঠাকুর।"

জীবনে আজ এই প্রথম মিথ্যা কথা কহিয়া অম্বিকা নিজেই যেন একটু শিহরিয়া উঠিল—।

দাদাঠাকুর কহিলেন,—"ছোট—না বড়!"

অম্বিকা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, ইহার প্রত্যুত্তর তো সে ভাবিয়া রাখে নাই। মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কহিল,—"কি জান দাদাঠাকুর, গায়ে লাগে নাই।"

গোসাঞী আবার বলিলেন,—"ওহে, আর একটা নেবেতো হে, ছোট দেবো, না বড় দেবো।"

অম্বিকা আরও মুস্কিলে পড়িল, এখন সে কি বলিবে। আজ তাহার কেবলই কান্না পাইতেছিল।

"দাদাঠাকুর আমার লাগ্‌বে না। জামাটা রেখে আমার দামটা ফেরৎ দাও।"

গোসাঞী সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। লইবার সময়ও তিনি অম্বিকাকে বলিয়াছিলেন, "এত দাম দিয়া লইও না অম্বিকা, আবার ফিরিয়া আসিবে।"

অম্বিকা তখন বলিয়াছিল, "না না দাদাঠাকুর ভাল দেখেই দাও একটা, হ্যাঁ এটাই বেশ, বছরকার দিন সবাই পরবে। দাদাও নিতে বলেছেন।"

"তবে নাও" বলিয়া গোসঞী জামাটী দিয়াছিলেন, "তবে দাও" বলিয়া আবার জামাটী আল্‌মারায় তুলিয়া রাখিলেন। অন্য খরিদদার হইলে কি করিতেন বলা যায় না, কিন্তু এই সংসার-প্রতারিত নিরীহ গোবেচারা অম্বিকাকে ঠাকুর ফিরাইতে পারিলেন না।

"হু, কলিকাল ভাইয়ের চেয়ে মাগ বড়। নরম পেয়ে সবাই চেপে ধরেছে। বাপের বিষয় আধখানাই যে তোর রে বোকা,আর নিজের ছেলেকে একটা ভাল জামা দেওয়ার যো'টা নেই তোর। হরিহে দয়াময়!" বলিয়া দাদাঠাকুর গুনিয়া গুনিয়া অম্বিকার হস্তে চারটী টাকা দিলেন। অম্বিকা ধীর পদে দোকান হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল "দাদাঠাকুর যা বল্‌লেন, তাহাই কি ঠিক?"

অম্বিকার মনটা কেবলই যেন রাগিয়া যাইতে লাগিল, অনেক কথা যেন গলায় ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—"নিজেও সে ঠিক এতটা নিঃস্ব নয় যতটার মত সে থাকে; এতটাই সে তাহার দাদার দিকে চাহিয়া নাই যতটাই তাহাকে থাকিতে হইতেছে।" ইত্যাদি আরও কত কি, রাত্রে ঘুমাইতে আসিয়া নিস্তারও অনেকবার এই সব কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। অম্বিকা তখন ভাবিয়া দেখে নাই—। অম্বিকা একবার ভাবিল "আর বাড়ী ফিরিব না" অবোর ভাবিল "না বাড়ী গিয়াই নিস্তার কিরণকে লইয়া চলিয়া যাইব আর, ওখানে থাকিব না।" অবশেষে ইহাই স্থির করিতে করিতে অম্বিকা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

গোলযোগটা যত শীগ্‌গীর মিটিয়া যাইবে বলিয়া অম্বিকা ভাবিয়াছিল, তত শীগ্‌গীর তাহা মিটিল না। জামাটী ফিরাইয়া দিয়া আসিয়া ফেরৎ টাকা কয়টা জ্ঞানাচরণের হাতে দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টাকা?"

"ও আপনারই টাকা, হীরুর জামা কিন্‌তে দশ টাকা

দিয়েছিলেন, বাকি ক্রেমং।" বলিয়াই অম্বিকা অগ্রসর হইতেছিল।

শ্যামাচরণ চসমাটার ভিতরে চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—"জ্যেঠামশায়কে দিলিনি একটা ?"

অম্বিকার আর সহ্য হইতেছিল না, সে বলিয়া ফেলিল, —"অত টাকার জামা গায়ে দেওয়ার মত অবস্থা কিরণের নয়। হয়, কোনদিন সেও দেবে—দেবেনাকি আর! দেবে।"

শ্যামাচরণ অন্দরের গোলমালটা বাহির হইতেই শুনিয়াছিলেন, এখন আরও বুঝিয়া ফেলিয়া, চসমাটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া বলিলেন—"তা, তা অবু, ও অম্বিকা।"

অম্বিকাচরণ ততক্ষণে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নিস্তার তখনও তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। কিরণ নাই।

শ্যামাচরণ চাদরটা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অম্বিকা ডাকিল,—"নিস্তার!"

৬

নিস্তার তখনও কাঁদিতেছিল, কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া বসিল।

"কিরণ কই ?"

নিস্তার জানিত না; অম্বিকার প্রশ্নোত্তরে কহিল, "জানি না, কোথাও আছে হয়ত। ও তো ছেলেমানুষই বটে, ওতো জানেনা ও গরীবের ছেলে।"

আর কোন কথা না বলিয়া অম্বিকা ধূমপান করিতে বসিল। তামাক টানিয়া মনটা অনেক হাল্‌কা করিয়া অম্বিকা উঠিয়া দাঁড়াইতেই নূতন জামা নূতন কাপড় নূতন জুতা পরিয়া জরীর টুপি মাথায়, গলায় একখানি লাল রুমাল বাঁধিয়া কিরণ কোথা হইতে আসিয়া তাহার পায়ের উপর চিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিয়াই কহিল,—"গুড্‌মনি পাপা।"

অম্বিকা অবাক হইয়া কিরণের দিকে চাহিয়া, না হাসিয়া পারিল না।

নিস্তার কহিল, "কোথায় পেলি এ সব।"

কিরণ নিস্তারকেও একটা প্রণাম করিয়া, "দাদা দিয়েছে, দাদা দিয়েছে—গুড্‌মনি পাপা", বলিয়া নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া হীরণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এক্ষণে ভিতরে আসিয়া কহিল,—"কেমন হ'য়েছে, বল দেখি কাকীমা।" মর্নিং আর বল্‌তে পারলে না, গুড্‌মনি—" বলিয়াই হীরণ হাসিয়া ফেলিল।

নিস্তার ডাকিল, "হীরু"

হীরণ কহিল, "কাকীমা, ওকি! কাঁদ্‌ছিলে তুমি? কেন কাকীমা?"

"তুমিই দিয়েছো কিরণকে ?"

"দিয়েছি কাকীমা।"

"কোথায় টাকা পেলে ?"

"আমার ছিল", বলিয়াই হীরণ বাহির হইয়া গেল।

অধিকতর মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কিরণ বারবার মোক্ষদার সম্মুখ দিয়া যাইতে আসিতে লাগিল।

মোক্ষদা ডাকিয়া কহিলেন, "আবার এসব পেলি কোথায় রে ?"

কিরণ হীরণের শিক্ষিত মত বড় বড় পা ফেলিয়া মোটা গলায় কহিল.—"হুঁ. দাদা দিয়েছে।"

"দাদা দিয়েছে ?"

"হুঁ, গুড্‌মনি পাপা।"

"গুড্‌মনি পাপা আবার কে দাদা এল তোর ?"

"হুঁ, দাদা শিখিয়ে দিয়েছে," বলিয়াই কিরণ মোক্ষদাকেও একটা প্রণাম করিয়া অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দত্তবাড়ী ঠাকুর দেখিতে চলিয়া গেল।

মা জানিতে পারিলে একটা তুমুল বাঁধিয়া যাইবে, ইহা সে জানিত। কিন্তু আগে অতটা ভাবিয়া দেখে নাই, তাই কিরণকে ওরকম শিখাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে ভয়ে ভয়ে সেও দত্ত বাড়ীর ছেলের ভিড়ে লুকাইয়া রহিল। মোক্ষদা সমস্ত বাড়ী হীরণকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন। ইসারায়, ইঙ্গিতে অম্বিকা নিস্তারকে সপুত্রে সহস্রবার সহস্র স্থানে প্রেরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নিস্তারের দেশত্যাগী পিতা মাতাও বাদ পড়িলেন না। অম্বিকা বাহির হইয়া গিয়াছিল, শুনিতে পাইল না, নিস্তার শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "কেন তুমি বাপান্ত পিতান্ত কয়ছো দিদি, আমার বাপ মা কি তোমার কেউ নয়, না উনিও তোমার কেউ নন্‌?"

"বল্‌বো, আমার খুসী, কি করবে তুমি,ফাঁসী দেবে? তোমার জোর থাকে তুমিও বল। যারা আমার ছেলের মাথা বিগ্‌ড়ে দিলে, যারা আমার ছেলের ভালো দেখতে পারে না, যারা আমার ছেলেকে গুণ করেছে, তাদের আমি একশ'বার বল্‌বো—বল্‌বো—বল্‌বো।"

"তা যারা তোমার ছেলের মন্দ করেছে তাদের তুমি একশ'বার কেন এক হাজারবার বল। আমিও তোমার সঙ্গে বল্‌বো। কিন্তু আমাদের নাম কেন করচো দিদি? আমি হীরুকে গুণ করেছি! হীরু যে আমার পেটের ছেলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়!"

"বটে, হীরু আর কিরণচন্দ্র সমান! হীরু এনে দিয়েছে তবে ছেলে পুজোয় জামা গায়ে দিলে। বাপের ক্ষমতা হ'ল না। হীরুর দাদামশায় ভিক্ষে করে না, বাপ পরের খায় না, মাও কারও মুখ চেয়ে নেই।"

নিস্তারের মনে বড় একটা আঘাত লাগিল, বলিল, "আমি এ ভেবে বলিনি দিদি।"

"যাও যাও, বলতে হবে না আর। ওলো আমি কচি খুকী নই। সময়ে হলে তোর মতন মেয়ে হবার বয়স আমার, আমায় আস্‌চেন উনি "এ বলি নাই, তা বলেছি" বোঝাতে। সব বুঝি আমি। পটিয়ে পটিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ে দিলে। আসুক আজ ও, আমি এই বস্‌লুম, আজ ওরই একদিন কি আমারই এক দিন। হয় ওকে আজ বাড়ী থেকে তাড়াবো, নয় আর সব বেরোবে। একদল না তাড়িয়ে আমি আজ উঠচিনি।"

"কেন যাবে দিদি। ওর বাড়ী ওর ঘর। বালাই, বেঁচে থাক বাছা। আমাদেরই স্পষ্ট করে বল না দিদি, আমরাই চলে যাই।"

"আমি ত কারও হাত পা ধরে বসে নেই। যখন খুসী, যেখানে খুসী চলে গেলেই হয়। কেউ মানা করবে না। ধাড়ীটা ঠাণ্ডা হয়। ছেলেটা মানুষ হয়।"

"আমরাই কি ছেলেটাকে অমানুষ করচি।"

"কেউ কি আর শিখিয়ে দেয়, দেখেই শিখে। কাকা-টিত আছেন দিন রাত্তির মাছ ধরে বেড়ান, আর তামাক টানেন। খাওয়ার ভাবনাতো ভাবতে হয় না। একজন আছেন গোষ্ঠী গোত্রের গোলাম, খাওয়াবেই যেমন করে হোক। ওই হতভাগাও তাই শিখবে। ওতো শুকিয়ে মরবে ওরতো একটা অমন ভাই নেই যে চিরকাল বসিয়েই খাও-য়াবে। তবে যদি মামারা নিয়ে যায়! আর ঐটুকু ছেলে ওর আর অত বুদ্ধি নেই তাও বুঝি, কে আর ওকে ও সব এনে দিতে বল্লে?"

নিস্তার কোন কথা না বলিয়াই আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অম্বিকা যথেষ্ট আশ্বাস প্রদান করিয়া হীরণকে বাড়ী লইয়া আসিল।

দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই মোক্ষদা দৌড়াইয়া হীরণের কানে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, "হতভাগা ছেলে, আমি তোর মা জানিসনি।"

হীরণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মোক্ষদা কহিলেন, "জামা কই তোর?"

হীরণ নীরব।

"বল শীগ্‌গীর—জামা কই, নূতন জামা?"

হীরণ কাঁদিতে কাঁদিতে সভয়ে কহিল, "ফিরিয়ে দিয়েছি।"

'ফিরিয়ে দিয়েছিস্‌!! টাকা কই?"

হীরণ আবার নীরব।

'বল—রক্ষা রাখবো না আজ আমি,বল কই সে টাকা।'

হীরণ তবু নীরব।

মোক্ষদা এবার প্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। "সেই টাকাতেই বুঝি দাতব্য করা হয়েছে?"

হীরণ ব্যথিত হৃদয়ে ডাকিল—"কাকা বাবু!"

অম্বিকা কহিল, "বৌঠান, 'কিছু করবে না তুমি' বলেই আমি ওকে আন্‌তে পেরেছি; যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। যা করেছে তাতে লোকে ওকে ভাল বই মন্দ বলবে না। আমার কথা রাখ আর মেরো না, মরে যাবে যে!"

'যাক্‌, যাক্‌, অমন ছেলে মরে যাওয়াই ভাল। সর, সর ধরো না ঠাকুর পো, যাও সরে যাও, সোহাগে কাজ নেই, যাও নিজের ছেলে নাচাও গে।"

"ও ত আমার দাদার ছেলে, তোমারই একলার নয়। আর মারতে দেবো না আমি, কই মার দেখি।"

নিস্তার চোখ মুখ ফুলাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "থাক, থাক ঢের হয়েছে। কাজ নেই আর। আমাদের জবাব হয়ে গেছে আজ। চলে এসো তুমি, ঘরে এস।"

কাকীমাকে দেখিয়াই হীরণ দৌড়াইয়া আগেকার মতন তাহার কাকীমার কোলে মুখ লুকাইয়া কহিল, "কাকীমা আমায় বাঁচাও, আমায় মেরে ফেল্‌লে মা।"

সেই ক্রোড়েই যেন তাহার অজেয় আশ্রয়, অমিত প্রতাপ।

নিস্তার সমস্ত ভুলিয়া দুই হস্তে হীরণকে বুকে জড়াইয়া কহিল, "ভয় কি বাবা, আমি রয়েছি,আর মারবেনা কেউ।"

নিস্তারকে দেখিয়াই মোক্ষদা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "শীগ্‌গীর এদিকে আয় বল্‌ছি। ছেড়ে দে ছোট বউ, আমার ছেলে আমি মারি কাটী খুন করি তা তোদের কি? আমায় আর হিরণের বাপ পাস্‌নি। আমি মোক্ষদা। ছেড়ে দে—ডাইনী পোড়ার মুখী।"

"যত গাল দেবে দাও দিদি, এখন আর কিছুতেই হীরুকে ছেড়ে দেবো না। আমায় মার, মেরে ওকে মেরো।"

ধৃত কাষ্ঠখণ্ডটা সমেত হাত নাড়িয়া মোক্ষদা কহিল, "ছেড়ে দে বল্‌ছি, চলে আয় হীরণ যদি ভাল চাস্‌। ছোট বউ, ছেড়ে না দিস্‌ তোর স্বামী পুত্রের মাথা খাস্‌, ছেলের রক্তে স্নান করিস্‌।"

"কি করলে দিদি!"

নিস্তারিণীর দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ হস্ত দুখানি শিথিল হইয়া গেল। নিস্তার হিরণকে ছাড়িয়া দিল।

"হতভাগা এইবার," বলিয়া মোক্ষদা কাষ্ঠখণ্ডটা তুলিয়া মারিতে গেলেন।

সভয় শঙ্কাকুল নয়নে নিস্তারের দিকে চাহিয়া হিরণ কাঁদিয়া উঠিল,—"কাকীমা!"

নিস্তার ছুটীয়া হিরণকে বুকের আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রক্ষিপ্ত কাষ্ঠখণ্ড নিস্তারের মস্তকে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। হিরণকে লইয়া নিস্তার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌ অম্বিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—"বৌঠান, তুমি কি মনে করেছো,"—তাহার পর আবার কি ভাবিয়া কথা ফিরাইয়া, বলিল, "না বৌঠান, আমাদের ক্ষমা কোরো। চল নিস্তার, আর এ বাড়ীতে নয়।"

শ্যামাচরণ বাজার হইতে কিরণের জন্য একটা জামা কিনিয়া আনিয়া, অন্দরে আসিয়া কহিলেন, "কিরণ কইরে, জ্যেঠামশায়?"

অদূরেই মোক্ষদা রাগে গর্‌ গর্‌ করিতেছিল। জামাটা তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন, "বৌমাকে দাও, কিরণের জন্য এনেছি একটা! ভাল্‌তো পাওয়া যায় না এখানে পাড়া গাঁয়!"

মোক্ষদা নূতন জামাটা টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মোক্ষদার অনেকরকম রাগ তিনি দেখিয়াছিলেন, অনেক সহ্যও করিয়াছেন। কিন্তু এত উগ্রভাব তিনি এ যাবৎ আর দেখেন নাই। নূতন জামাটা নগদ ৩৸০ আনা দিয়া কিনিয়া আনিলেন,—এ কত বড় অন্যায় যে তাঁহারই সম্মুখে কেহ একবারও গায়ে না দিতেই মোক্ষদা তাহা শতছিন্ন করিয়া ফেলিলেন! তাহার পর আবার ফিরিতেই যখন দেখিলেন, হিরণকে ক্রোড়ে লইয়া নিস্তার বসিয়া রহিয়াছে, রক্তের ধারায় হিরণের বুক ভাসিয়া গিয়াছে, শ্যামাচরণের আর সহ্য হইল না। রুক্ষ স্বরে ডাকিলেন "বড়বৌ।" সে কণ্ঠ স্বরে মোক্ষদাও কাঁপিয়া উঠিলেন। শ্যামাচরণের মুখে এত রুক্ষ স্বরও মোক্ষদা এ যাবৎ এ বাড়ীতে আসিয়া শুনেন নাই। শ্যামাচরণ কহিলেন,—"না,—তোমায় কি বল্‌বো, আমারই দোষ। নাই দিয়েছি, তাই আজ কুকুরের মত তুমি মাথায় উঠেছো। বড়বৌ, আর যাই মনে কর, যাই ভাব, সবটার আগেই ভেবো অম্বিকা আমার ভাই, ছোট বউ আমারই ভ্রাতৃবধূ, এ সংসারে ছোট বউ তোমার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বড় বৌ, তুমি কি 'মা'? যে আঘাতে ছোট বউয়ের মাথা ভেঙ্গে অত রক্ত পড়েছে, সে আঘাতে যে হিরণের প্রাণও বেরিয়ে যেতো যদি তা হিরণের মাথায় লাগ্‌তো। তুমিই কিনা ব'ল্‌তে বড় বৌ, মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে সে ডান! আজ কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তুমিই ডা'ন, অতি বড় শয়তানি তুমি। এমন ভাই, এমন তার বউ, এমন সোণার সংসার তুমি, ছারখার করে দিতে বসেছিলে! এমন আপনার জনকে এত পর বলে আমায় বুঝিয়েছিলে। আর আমিও এত অন্ধ, তোমার কথাতেই নেচে উঠেছিলুম্‌। হায় হায়! পিসিমাত ঠিকই ব'লে ছিলেন। অবু যদি আমারই মত দুপাত পড়তো, এতদিন এসংসার পুড়ে ছাই হয়ে যেতো, তাতে এ সোণার প্রাণগুলি খুঁজেও পাওয়া যেতোনা আর।"

এই বলিয়াই তিনি সহসা সিন্দুক খুলিয়া স্বকৃত উইলখানি বাহির করিয়া আনিয়া নিজ হস্তে তাহা শতছিন্ন করিয়া,

ছিন্ন নূতন জামাটার সহিত একত্রে জ্বালাইয়া দিলেন। নিজেই যাহা করিয়াছিলেন নিজেই আজ তাহা পোড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"বড় বৌ এ আগুণ সাম্‌নে বল্‌ছি আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলুম্। ছোট বউমা, হিরণের বাপ মা বলে আমাদের ক্ষমা কর তুমি, এর বেশী চাইবার কৈফিয়ৎ রাখিনি কিছু। অম্বিকা! অবু! তোর ক্ষমা চেয়ে তোর অকল্যাণ করবো না। তুই কাজ খুজ্‌ছিলি একদিন, আয় ভাই কত কাজ তোরই পড়ে রয়েছে, করবি আয়, আমি আর একা পারছিনি। হিরণ! আমি তোর বাপ, কিন্তু তুই আজ আমায় বাপের মত শেখালি,—ভাই বড় না টাকা বড়,—ভাই বড়—সবার চেয়ে বড়! আয় অবু বাহিরে চল!" বলিয়া তিনি অম্বিকার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "বড়বৌ, যা হয়ে গেছে, গেছে, ওসব ভুলে যাও। জেনো যদি আমায় ভিক্ষেও কর্ত্তে হয়, তবু অবু আর বৌমাকে আমি কোথাও যেতে দেবোনা।"

কোথা হইতে কিরণচন্দ্র বাহুদুটী সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া, নূতন জামা জুতার দিকে সগর্ব্বে চাহিতে চাহিতে, বড় বড় পা ফেলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া শ্যামাচরণের পায়ে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়াই, কহিল,—"হুঁ, গুড্‌মর্নি পাপা।"

কিরণের সে ভাব দর্শনে শ্যামাচরণ হাসিয়া ফেলিলেন; কিরণকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

অতি আনন্দে কিরণ নতমুখী মোক্ষদার পৃষ্ঠের উপর মুখ লুকাইয়া পশ্চাত হইতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, "মা, মা জ্যেঠামশায়—"

মোক্ষদা নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত নতমুখে বসিয়া ছিলেন। একটী অঙ্গও একটু কম্পিত হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে আঘাতটা সামলাইয়া নিস্তার আসিয়া কহিল, "দিদি, আমি তোমার মেয়ের মতন, আমায় ক্ষমা কর দিদি, ছেলে কোলে নাও।"

মোক্ষদা নড়িলেন না, কথাও কহিলেন না। তেমনি বসিয়া রহিলেন। তেমনি স্থির দৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন টপ্ টপ্ করিয়া রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সম্মুখেই নূতন জামাটার সঙ্গে উইল্‌খানি পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। আগুনটা যেন তখনও মোক্ষদার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। অবিরল অশ্রু বর্ষণে মোক্ষদা সে আগুনগুলি নিবাইয়া দিতে লাগিলেন।

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

ভবিতব্যতা

যাহা হইবার ভবে সদা তাহা হবে
কাননে কুসুম কলি প্রস্ফুটিত রবে।
হয় না কখনও তাহা যা' হ'বার নহে
আকাশে কুসুম গুচ্ছ ফুটিয়া না রহে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য

ভ্রমে নর বনে ও কান্তারে
দেখে বিশ্বে কি শোভা অপার!
পর্ব্বত-কন্দরে রুদ্ধ ব'সে মৌন ধ্যানী
নয়ন সমুখে দেখে সৌন্দর্য্য স্রষ্টার!

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী।

গীতা কি ?

[নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি একজন উচ্চ সাধক ও সুশিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর লিখিত, তাহা পাঠক পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন বন্ধুর সূত্রে আমরা ইহা পাইয়াছি। লেখক দূরে থাকায় তাঁহার অনুমতি অভাবে তাঁহার নাম স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। "মালঞ্চ" সম্পাদক।]

গীতা সম্বন্ধে অনেকে নানারূপ প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর নিম্নোক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দিতে হইবে।

প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য—গীতা কবে রচিত। "ব্রহ্ম সূত্রাদিভিঃ পদৈঃ" গীতার এই বচন হইতে জানা যায় যে উহা ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শনের) পর রচিত। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডন আছে। ইহা শঙ্করাচার্য্যাদি ব্যাখ্যাকারেরা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং গীতা বুদ্ধের পর অর্থাৎ কৃষ্ণের বহুশত বৎসর পরে রচিত।

গীতাকারও উহা কৃষ্ণের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন। ষট্‌সংবাদ সেই ইঙ্গিত। কোন অজ্ঞাতনামা লেখক বলিতেছেন, "সূত উবাচ"; সূত বলিতেছেন "জনমেজয় উবাচ", আর জনমেজয় ব্যাসের নিকট শুনিয়াছিলেন যে "সঞ্জয় উবাচ"; সঞ্জয় দিব্যজ্ঞানে জানিয়া বলিয়াছিলেন "শ্রীভগবান্ উবাচ"; এইরূপে ছয়জন "উবাচ"। "উবাচ" লিটের পদ। যাহা বক্তার পরোক্ষে তাহাতেই লিট্ হয়; (পরোক্ষে লিট্), সুতরাং ছয়জনেরই উহা শোনা কথা। আর শ্লোকের রচয়িতা যে কে তাহাও অজ্ঞাত। তবে তিনি যে একজন কবি ও লোকচরিতজ্ঞ মনীষী, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তিনি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন না। এরূপ কাব্যগ্রন্থে দার্শনিক সূক্ষ্মতা প্রাপ্তব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ—গীতার প্রধান উপদেশ কি ? নির্ব্বাণ মুক্তি যাহা সাংখ্য, যোগ ও উপনিষদে প্রতিপাদিত, তাহাকেই গীতা শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন। "শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎ সংস্থানধিগচ্ছতি"। "জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং"—ইত্যাদিতে শান্তিকেই পরাগতি বলা হইয়াছে। শান্তি অর্থে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। ইহা ছাড়া শান্তি শব্দের মোক্ষশাস্ত্রে অন্য অর্থ নাই। আর্য্য, বৌদ্ধ, জৈন, সকলেই ঐ অর্থে শান্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং "পরা" বা "শাশ্বতী শান্তি" অর্থে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ। চিত্তবৃত্তির রোধ হয়—"অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" অভ্যাস অর্থে পুনঃ পুনঃ নিরোধের চেষ্টা। বৈরাগ্য অর্থে চিত্ত হইতে রাগ বা আসক্তিকে তাড়ান। এই দুই সাধন অধিকারী ভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার—জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ। যাঁহারা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা ও আমূল সমস্ত রাগ বা আসক্তি তাড়ানর সাক্ষাৎ চেষ্টার দ্বারা শান্তির পথে যান তাঁহারাই জ্ঞান যোগী সাংখ্য। আর যাঁহাদের বিক্ষেপ সংস্কার অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, তাঁহাদিগকে যে গৌণ উপায়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ তিনটি, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'—যোগসূত্র ২।১। ঈশ্বর ভক্তি—যাহাকে লোকে সাধারণতঃ ভক্তিযোগ বলে—তাহাও ক্রিয়াযোগ।

ক্রিয়াযোগীদেরও পূর্ব্বসংস্কার হইতে অশেষ তারতম্য হয়। তন্মধ্যে প্রধানতঃ দুই ভেদ আছে যথা—প্রব্রজিত ও গৃহস্থ। যাঁহারা 'ব্রহ্মচর্য্যাদি লইয়া তপঃ স্বাধ্যায়াদি করেন' তাঁহারাই উদাসীন বা প্রব্রজিত সাধক। আর যাঁহারা সামাজিক কার্য্যও করেন এবং যথাশক্তি তপঃ স্বাধ্যায়াদিও করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ সাধক। স্বকীয় সামর্থ্য বা সংস্কার অনুসারে ঐ দুই পথ গ্রহণ করিলে আশ্রমসঙ্কর হয় না। তাহা না করিলে আশ্রমসঙ্কর ঘটে। গীতার প্রধান উপদেশ ইহার (আশ্রমসঙ্করের) প্রতিষেধ।

যদি কেহ শোক, মোহ, লোভ আদি বশতঃ সামাজিক কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইতে যায়, তবে তাহার দ্বারা সমাজের অশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে। শোকে বা মোহে অভিভূত হইয়া কঠোর কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া অনধিকার ঔদাসীন্য গ্রহণ করিলে সে ব্যক্তি 'ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হয়।' শ্মশান বৈরাগ্য প্রকৃত বৈরাগ্য নহে; ক্ষণিক অবসাদ মাত্র। তদ্বশে কেহ যেন কর্ত্তব্য ত্যাগ না করে, ইহা গীতাকার

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যমোহও কৃষ্ণের প্রবোধ এই আখ্যায়িকার দ্বারা দেখাইয়াছেন।

প্রব্রজিতের কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য এবং দিবসের অধিকাংশ কাল তপঃ স্বাধ্যায়াদিতে যাপন। যাহাদের তাহাতে সামর্থ্য নাই, তাহারা প্রব্রজিত হইলে আশ্রম সঙ্কর হয়। তাহাদের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া যথাশক্তি তপঃ স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ করাই প্রকৃত পন্থা। 'তপঃ' অর্থে ভোগবিলাস যথাসম্ভব ত্যাগ ও চিত্ত স্থির করার জন্য কষ্ট সহন (আসনাদি অভ্যাস)। 'স্বাধ্যায়' অর্থে জপ ও মোক্ষ শাস্ত্র অধ্যয়ন। ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ, অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে স্মরণ করা, এবং কর্ম্মের ফল চাহিনা মনে করা কর্ম্মের সুখময় ফলে অনাসক্তির ভাব আনা। এই সব সাধনও আবার প্রব্রজিতের এবং গৃহস্থের পক্ষে কিছু বিভিন্ন। সেই ভেদ তারতম্যের ভেদ, মৌলিক নহে। প্রব্রজিতদের প্রচুর অবসর, আর তাঁহাদের বাহ্য কার্য্যও অল্প,—তাই তাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময় এবং নিজেদের বাহ্যকার্য্য কালেও ঈশ্বরপ্রণিধি করিতে পারেন। তপঃ স্বাধ্যায়ও তাঁহারা অধিক করিতে পারেন।

গৃহস্থদের তত করার অবসর নাই। তাঁহাদের যে অল্প অবসর, তাহাতেই তাঁহারা তপঃ ও স্বাধ্যায়াদি করিতে পারেন এবং বিক্ষেপজনক অনেক বাহ্যকর্ম্মে সামান্য ভাবেই ঈশ্বরপ্রণিধি করিতে পারেন। এই সমস্ত সাধন করিতে করিতে উহার সংস্কার বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে ক্রমশঃ সংযমের জ্ঞানের এবং শান্তির পরম আদর্শ ঈশ্বরে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে বিষয়রাগ কমে এবং শান্তির অভ্যাসে সামর্থ্য বাড়ে। অবশ্য প্রব্রজিতেরা উহার অধিক অভ্যাস দ্বারাতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অভীষ্ট শান্তির দিকে যাইতে পারেন, এবং গৃহস্থেরা উদাসীন হইবার যোগ্য হন। ইহাই ন্যায্য পথ। এরূপভাবে না যাইয়া শোকে মোহে বিভ্রান্ত হইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হয়। ইহাই গীতার সার ও সমীচীন উপদেশ। সম্ভবতঃ বৌদ্ধাদি মতের প্রভাবে অনেকে ঐরূপ ব্যর্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সমাজের বিশৃঙ্খলা করিতেছিল বলিয়া গীতাকার এইগ্রন্থ রচনা করেন।

গীতার এক এক অধ্যায়ের নাম এক এক যোগ। উহাতে অনেকে বিভ্রান্ত হইয়া "কোন যোগ করিব" এইরূপ প্রশ্ন করেন। তাহাদিগকে বক্তব্য—"শুধু যোগ করিবে।" বস্তুতঃ উক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ছাড়া আর কোন যোগ বা চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় গীতায় কথিত হয় নাই, এবং অন্য কিছু উপায়ও নাই। (যেমন চা'ল সিদ্ধ ভাত, হাঁড়িতে রাঁধা ভাত, আগুনে পক্ক ভাত সব এক, সেইরূপ সব যোগই এক)। চিত্তের নিরোধ অর্থে জ্ঞানের একতানতা; সুতরাং তাহা জ্ঞানের দ্বারাই সাক্ষাৎ সাধিত হয়। তপঃ স্বধ্যায় ও ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা তাহা গৌণভাবে সাধিত হয়। উহারা সব বাহ্যকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, অথচ গৌণভাবে চিত্তের শান্তিদায়ী, এজন্য উহাদিগকে কর্ম্মযোগ বলা হয়।

অতএব জ্ঞানযোগ প্রথম এবং কর্ম্মযোগ দ্বিতীয় (তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে)। গীতার সময় সাংখ্য ও যোগ নামক দুই সম্প্রদায়ই প্রবল ছিল, কিন্তু নিষ্প্রতিভ হইয়াছিল। গীতায় যে যে যোগের বিলোপের কথা আছে, তাহাতেই উহা বোধ হয়। তন্মধ্যে সাংখ্যেরা জ্ঞান-যোগের পক্ষপাতী ছিলেন ও যোগীরা কর্ম্মযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উভয়ই যে বস্তুতঃ এক, তাহা গীতাকার বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

কঠোর কর্ত্তব্য দেখিয়া অবসন্ন হইলে তাদৃশ ব্যক্তিকে গীতা হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় লক্ষ্য না করিয়া দৃঢ়চিত্তে কর্ত্তব্য সাধন করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য সুখদুঃখে সমান হওয়া অসাধকদের পক্ষে সম্ভব নহে। পরন্তু উহা কঠোর সাধনসাধ্য। অসাধক গৃহস্থদের পক্ষে ওরূপ তিতিক্ষা সহসা সম্ভবপর না হইলেও ঐরূপভাবে চিত্তকে দৃঢ় করিয়া সহিষ্ণুতার অভ্যাস করিয়া তাঁহারা যখন কালক্রমে প্রব্রজ্যা আশ্রমে উপনীত হইবেন, তখন সংস্কারবলে তাঁহারা উন্নত তিতিক্ষু সাধক হইতে পারিবেন।

ফলে ঐ উপদেশ সমস্ত আশ্রমীর পক্ষে। যিনি যতদূর পারেন করুন, তবে উহার সিদ্ধি অর্থাৎ সম্যক্ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা প্রব্রজ্যা আশ্রমের সম্যক্ সাধনের দ্বারাই লাভ হয়। সম্যক্ সাধন যাঁহারা করেন, যেরূপ বেশ ধারণ করুন না কেন, —তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী; কারণ তাঁহাদের দ্বারা সাধন ব্যতীত অন্য কর্ম্ম কৃত হওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু তাঁহারা যাহা করেন তাহাই সন্ন্যাসধর্ম্মের সার।

আর এক কথা—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো-

নিরাশ্রয়ঃ, কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।” ইত্যাকার-উপদেশ দেখিয়াও অনেকে ভ্রান্ত হন, নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় এরূপ হইলে তবেই তিনি কর্ম্ম করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। কিন্তু ঐ নিত্যতৃপ্ত, নিরাশী যতচিত্তাত্মা, ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ ইত্যাদি কিরূপে হওয়া যায় ? উহা কঠোর যোগসাধন ব্যতীত হইবার নহে। তাদৃশ পুরুষ যে কেবল শরীর কর্ম্ম করেন তাহাতে তাঁহার বন্ধন হয় না। যাঁহাদের ঐ সকল সিদ্ধি নাই তাহারা কর্ম্ম করিলে বন্ধন (ফলভোগ) হইবে না—ইহা সম্ভব নহে। উহা স্মরণ করিয়া সব অবস্থার ব্যক্তিই কথঞ্চিৎ ফলাসক্তি কম করিয়া যদি কর্ম্ম করিতে থাকে, তবে তাহাদের আসক্তি কমিয়া নৈষ্কর্ম্মরূপ চরমসিদ্ধি কখনও ঘটিতে পারে—ইহাই তাৎপর্য্য।

তৃতীয়তঃ—গীতার মত। গীতার মত প্রধানতঃ সাংখ্য। তাহার সহিত ঈশ্বরকর্তৃত্বের যোগও আছে। গুণত্রয় ও নিগুর্ণ পুরুষ এই দুই তত্ত্ব গীতা গ্রহণ করিয়াছেন—(শাঙ্কর দর্শনে গুণত্রয় গৃহীত হয় নাই)। তৎসহ কর্ত্তা ঈশ্বরও যোগ করিয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব বাদের সহিত সাংখ্যবাদের সমন্বয় করার চেষ্টা গীতায় দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। উহাতে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহা গীতাকার বা কোন ব্যাখ্যাকার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। “ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।” ইহার অর্থ কি? ঈশ্বর কি সব লোককে সর্ব্বকর্ম্ম করাইতেছেন ? ঈশ্বর এবং এই “সর্ব্বভূত” ইহাদের সম্বন্ধ কি ? উহারা এক না ভিন্ন ? এক হইলে মামামেতাং তরন্তি তে” এই “তে” কে ? ভিন্ন হইলে ঈশ্বর কেন তাহাদিগকে দুঃখ দিতেছেন ? একবারে মায়া সংহরণ করিয়া মুক্ত করেন না কেন ? ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ; কিন্তু অল্পজ্ঞ কে ? বৈদান্তিকদের জীব ও ঈশ্বর এক, সুতরাং তন্মতে অল্পজ্ঞ বলে অবিদ্যাবান্‌কে ? আর বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের পৃথক অসংখ্য অনাদি জীবদিগকে ঐ ঈশ্বর কেন ঐরূপ ঘুরাইতেছেন ? এইরূপে ঐ দুই দর্শনের দ্বারা ঐ বাদ স্থাপিত হয় না। উহা সাংখ্যমতে কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারে। তন্মতে হিরণ্যগর্ভনামক প্রথমজ পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরের অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। আর সমস্ত বদ্ধজীব (যাহাদের কর্ম্মাশয় আছে) তাঁহার ঈশিতৃত্ব অভিমানের দ্বারা ভাবিত হইয়া ভূতভৌতিক দ্রব্য দর্শন করিতেছে ও স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। এই মতে কিন্তু সগুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বও যেমন, জীবের কর্ত্তৃত্বও তেমনই। জমিদার জমি দিল, প্রজা কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিল—ইহাতে যেরূপ উভয়ের কর্ত্তৃত্ব, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ। সাংখ্যমতে (এবং অন্যান্য সমস্ত সমীচীন দার্শনিক মতে) পঞ্চভূত অভিমানাত্মক (God's willও অভিমান) সেই অভিমানকে (যাহা বাহ্যবিস্তারহীন মনোভাব)। অনন্ত বিস্তৃত ভূত সংঘাত দেখা বা পুত্রকলত্রাদিরূপে দেখা যে “মায়া দর্শন” তাহাতে কথা নাই। সাংখ্য ঠিক তাহাই বলেন। হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যাভিমানে ভাবিত হইয়া সমস্ত প্রাণী ঐ মায়া দেখিতেছে। এই হিসাবে ঐ শ্লোকার্থ অতি সমীচীন।

অন্যত্র—“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।” এই শ্লোকের অর্থও ঝাপসা ; কে “কর্ত্তাহং” মনে করে ? অহংকারই ত অহং। সে অবার “অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা” হইবে কিরূপে ? আর অহঙ্কারও প্রাকৃত গুণ, মননও প্রাকৃত গুণ। গুণত্রয়ের দ্বারা বিমূঢ়, অথচ গুণত্রয় হইতে পৃথক, এমন কেহ নাই যে মনে করিবে “আমি কর্ত্তা।” “অহঙ্কর্ত্তা” ইহা এক প্রকার বুদ্ধি বা গুণবিকার। অতএব গুণত্রয়ই যখন কর্ত্তা, তখন তাহা “কর্ত্তাহং” মনে করিলে বিমূঢ়ত্ব হইবে না পরন্তু সত্যজ্ঞানই হইবে।

অতএব এই যে শ্লোকে অস্পষ্ট সাংখ্যমত কথিত হইয়াছে, ঐ শ্লোকটি ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল :—“প্রকৃতেঃ ক্রিয়েমানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অবিদ্যয়া বিমূঢ়াত্মা পুমান্ কর্ত্তেতি মন্যতে।” ফলত “অহং কর্ত্তা” এরূপ ভাব মোহ নহে,—কারণ অহংকারই কর্ত্তা, কিন্তু অকর্ত্তা দ্রষ্টা পুরুষ যে কর্ত্তা তাদৃশ জ্ঞানই মোহজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান।

আরও দ্রষ্টব্য যে ‘ব্রহ্মাহং’, ‘সোঽহং’ প্রভৃতি বাক্যে উদ্দিষ্টভাবও প্রকৃত নহে। কারণ ব্রহ্ম অবিকার, তাহা কিছুর পরিণাম নহে। কিন্তু অহংকার বিকারী দ্রব্য ; তাহা পরিণত হইয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না। ঐ সকল বাক্যের অর্থ দুই প্রকারে সঙ্গত হয়। (১) সগুণভাবে, অর্থাৎ অবিদ্যানাশে যখন সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ঐশ্বরিক গুণ আসে, তখন বর্ত্তমান আমিত্ব পরিণত হইয়া “ব্রহ্মাহং” হইয়াছে বলা সঙ্গত, কিন্তু উহা চরমপদ নহে। ঐ আমিত্বের ত্যাগে যে “অদৃষ্ট” ‘অব্যবহার্য্য’ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত লক্ষণ ঈশ্বরভাবের অতীত

ভাব, তাহাই "তুরীয় আত্মা।" (২) কণ্টকের দ্বারা যেরূপ কণ্টক উদ্ধার্য্য, সেইরূপ "অহং মনুষ্যঃ, অহং দেবঃ" ইত্যাদি ক্ষুদ্র আমিত্ব পরিণামিত করিয়া 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাত্মাকার বিশুদ্ধতা আমিত্বে উপনীত হইতে হয়। তাদৃশ ভাবনা শ্রেষ্ঠ সাধন, পরে তাহাও ত্যাগ হয়।

প্রকৃত যে নির্ব্বাণসাধন যাহা সাংখ্যকারিকায় উক্ত নাহং, নমে (নাস্মি) তাহার দ্বারা তখন তুরীয় তত্ত্বের লাভ হয়, ফলে 'অহং মনুষ্যঃ' ইহাও যেরূপ অহংকার, 'অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহাও সেইরূপ অহংকার বিশেষ (যদিও বিশুদ্ধতম)। উহার অপগমনই তুরীয় ভাব।*

গীতায় আছে প্রকৃতি মহতাদি আটটি আমার প্রকৃতি—(মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা)। এই "আমার" শব্দের অর্থ কি? সমস্ত পুরুষেরই ঐ আটটি প্রকৃতি আছে, ঈশ্বরেরও আছে, —সুতরাং 'আমার' অর্থে পুরুষের বা আত্মার এরূপ হওয়াই যুক্ত। উহাতে "মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা" এই বাক্যের বক্তার কিছুই বিশেষত্ব নাই; পরন্তু ওস্থলে 'আমার' এই সম্বন্ধবাচী পদও তত সার্থক নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অত্যন্ত পৃথক্ সত্ত্বা।

আর গীতায় এক নূতন প্রকৃতির কথাও আছে, যথা—"জীবভূত" প্রকৃতি। ইহার কথা সাংখ্যে নাই। বলা বাহুল্য, উহা পুরুষাকারা বুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং উহা সাংখ্যের বুদ্ধিরই অন্তর্গত। বৈদান্তিকদের (এবং সাংখ্যদেরও) উহা চিদবভাস, উহা কোন তত্ত্ব নহে, কিন্তু বুদ্ধি ও পুরুষরূপ দুই তত্ত্বের একত্বখ্যাতিরূপ জ্ঞান (বুদ্ধি) বিশেষ।

গীতার আর এক বিশেষত্ব অবতারবাদ। উপনিষদে কুত্রাপি অবতারবাদের প্রসঙ্গ নাই, পরন্তু অবতারবাদ উপনিষদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। গীতাতে দুই প্রকার অবতারবাদ আছে। (১ম) যাহা বিভূতিবং, শ্রীমৎ, ঊর্জ্জিত, তাহাকেই ঈশ্বরাংশ বলিয়া জানিবে। (২য়) "সম্ভবামি যুগে যুগে"—এইরূপ বাক্যে বোধ হয় ঈশ্বর সত্য সত্যই শরীর ধারণ করিয়া পাপীদের সংহার করেন ও পুণ্যবান্‌দের উদ্ধার করেন।

প্রথম প্রকারের অবতারবাদ অন্যায্য নহে। সমস্ত বিভূতিবং ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য বা ঐশ্বরিক গুণের কিছু বিকাশ আছে। এই দৃষ্টিতে ঐ বাদ যুক্ত হইতে পারে এবং গীতাকারেরও সেইরূপ অভিমত, যেমন অশ্বত্থবৃক্ষ বৃক্ষের মধ্যে ইত্যাদি। ইহার অর্থ ঈশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে।

দ্বিতীয়প্রকারের অবতারবাদ অবশ্য অন্যায্য। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সব সিদ্ধ হয়, তাঁহাকে মানুষ পশু হইয়া ক্ষুদ্র অসুরাদিকে নৃশংসভাবে হনন করিতে হয় না। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে শত শত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণকালে লয় হয় এবং অতি পাপীও ধার্ম্মিক হয়। সুতরাং তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে ক্ষুদ্র দুই দশটা অসুরকে বা পাপীকে মারার জন্য অবতীর্ণ হইতে হয় না।

"সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাক্য দ্বারা যাহা কিছু বুঝায়, তাহা এই যে জগতের অবস্থা বিশেষে এরূপ অসাধারণ ঐ ধী শক্তি সম্পন্ন মনুষ্য উৎপন্ন হন, বা এরূপ অসাধারণ অবস্থান্তর হয় (যথা বর্ত্তমান ইয়োরোপের যুদ্ধ) যাহার দ্বারা সাধারণ লোকের পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভয় এবং ধর্ম্মের প্রতি মতি ও প্রীতি হইতে পারে।

সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায় হীনপ্রভ হইলে প্রাচীনকালে যোগমত পরিণত হইয়া "ভাগবত" নামক এক মত প্রবর্ত্তিত হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উহার সূচনা দেখা যায়। গীতা সেই মতের গ্রন্থ।

আরণ্য।

(হিমালয়)

* অহং "ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যার্থ বৈদান্তিকেরা এইরূপে বুঝান—অহং প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম, কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ 'অহং মনুষ্য' ইত্যাদি মনে করে। মায়া বা অবিদ্যা গেলে "আমি ব্রহ্ম„ পুনরায় এই যথার্থ জ্ঞান হয়। ইহাতে শঙ্কা হয় অহং যদি ব্রহ্ম, তবে তাহা অজ্ঞানী হইল কিরূপে? ব্রহ্ম বা বৈদান্তিকবাদের ঈশ্বর ত সদাই বিদ্যাবান্. তিনি অবিদ্যাবান হইলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে গীতার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাবান্ যে সে-ই অবিদ্যাবান্, অর্থাৎ ইহার কোন উত্তর দেন নাই। সাংখ্যমতে ঐ মহাবাক্যের সঙ্গত অর্থ হয়, তন্মতে বিশুদ্ধ বুদ্ধির গুণ ঐশ্বর্য্য। যোগের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং ঈশ্বর বুদ্ধবৎ হয়। অতএব ব্রহ্ম অর্থে যেখানে ঈশ্বর, সেখানে ঐ দৃষ্টিতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" উত্তম শ্রেয়স্কর ভাবনা। আর ব্রহ্ম অর্থে যথায় "তুরীয় আত্মা" সেখানেও উহা উত্তম ভাবনা। সাংখ্যমতে অহং বা আত্মভাবের দুই হেতু—দ্রষ্টা ও দৃশ্য, সুতরাং অহং ভাবের প্রকৃত অধিকারী-হেতু দ্রষ্টা বা তুরীয় আত্মা, ইহাই ন্যায্য ভাবনা।

প্রাপ্তি সাফল্য

আজি এ প্রভাতে কোন্ সুরে তব
মঙ্গল বাঁশী বাজে।
মন্দিরে মম নন্দন ধন
সুন্দর দেব রাজে।
পুষ্পিত শাখী কুঞ্জে
অবিরল অলি গুঞ্জে
নৃত্য পুলকে হেসে যায় হাসি
ব্যাকুল রোদন মাঝে।
কোন্ সুরে বাঁশী বাজে?

চন্দনে ঘন চর্চ্চিত পদ
অর্চ্চিত ফুল হারে।
(সেথা) বন্দে জনম মধুর ছন্দে
মৃত্যু নয়নাসারে।
হর্ষ সলীল হাস্যে
বর্ষে অমিয় আস্যে
বিফলতা আজি চূর্ণিত পদে
সফলতা সব কাজে।
ওই মঙ্গল বাঁশী বাজে।

উচ্ছ্রিত আজি আশ্রয় হীন
অশ্রু করুণা ধারা।
দুর্ব্বল হেথা সবল চিত্ত
বেদনা বিত্ত হারা।
যৌবন মধুর গন্ধ
জরারে করেছে অন্ধ
জীবন বক্ষে রাখে অলক্ষ্যে
মরণ মুখ কি লাজে।
ওই মঙ্গল বাঁশী বাজে।

বাসনা শান্ত আসন প্রান্তে
দান্ত পরাণ হীনা।
ইন্দ্রিয় সব নিস্পৃহ আজি
তৃষ্ণা মলিন দীনা।
বিপুল বিভব তুচ্ছ
এ যে প্রাপ্তি মহা উচ্চ
রিক্ত সকলি পূর্ণ আমার
মুক্তি চরণে গাজে।
(হৃদে) মঙ্গল বাঁশী বাজে॥

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

ভৃত্য

শরৎকালে গোমতী নদীর তীরে অর্পণার পিতা মাছ ধরিতে ছিলেন। সন্ধ্যার গলিত স্বর্ণ ধান ক্ষেতের উপর কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে। অর্পণা একাকী নদীর তটে দাঁড়াইয়া।

অর্পণার পিতা সন্ধ্যা দেখিয়া জাল গুটাইতে ছিলেন। অর্পণাকে কহিলেন চল্ বাড়ী চল্।

অর্পণা কহিল—তুমি যাও বাবা। আমি আসছি।

যখনকার কথা বলিতেছি তখনকার এবং এখনকার মধ্যে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান।

অর্পণার পিতা মনে মনে হাস্য করিলেন সুরথের সঙ্গে যে অর্পণার প্রণয় ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছে তাহা তিনি জানিতেন সুরথ ধান্য আনিবার জন্য নদীর পরপারে গিয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে অর্পণা তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাল গুটাইয়া লইয়া তিনি গৃহে গমন করিলেন।

গৃহ এখান হইতে অদূরবর্ত্তী, পথের দুই পার্শ্বে দীর্ঘ শাল তরু, তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র পথটী শালগাছের ছায়ার তল দিয়া সরীসৃপের মত বক্র হইয়া চলিয়া

গিয়াছে। তাহাদের গৃহখানি ঘন দেবদারু কুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত।

পিতা চলিয়া গেলে অর্পণা তখনও নদীর তীরে দাঁড়াইয়া। বহুদূর হইতে একখানি নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে তাহারই দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নৌকাখানি ভাসিয়া আসিয়া অর্পণা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই লাগিল। অর্পণা বিস্মিত হইয়া দেখিল তাহার মধ্যে একটী সুন্দর গৌর উন্নত যুবা পুরুষ।

যুবক আর কেহ নয় মগধের রাজপুত্র। কলিঙ্গ হস্তে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সে গোপনে গোপনে রাজ্য জয়ের চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়া নিজের শিরটীকে শত্রুর তরবারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য দীনবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

নদী তটে দাঁড়াইয়া সম্মুখেই দেখিল পঞ্চদশ বর্ষের সুন্দরী বালিকা। সন্ধ্যার দিব্য বিভায় সুন্দরীর সমস্ত তনুখানি রঞ্জিত। যেন সন্ধ্যার দেবী নদীর তটে দাঁড়াইয়া।

অর্পণা যুবককে বিমূঢ়ার মত হইয়া অবলোকন করিতেছিল। রাজপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রে! তুমি কোথায় থাক?

অর্পণা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার বাড়ী খানি দেখাইয়া দিল। রাজপুত্র দেখিল দেবদারুর শাখায় আচ্ছাদিত তপোবনের মত একটী সুন্দর বাড়ী, সম্মুখে একটী কালো হরিণ চরিতেছে। এবং পায়রাগুলি কুটীরের ছাদে বসিয়া নিজ নিজ প্রণয়ীদের সঙ্গে বোধ হয় রহস্যালাপে নিযুক্ত আছে।

রাজপুত্র অর্পণাকে কহিল—ঐযে কালো হরিণটী চরিতেছে ঐ বাড়ী তোমাদের?

অর্পণা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রাজপুত্রের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি বিদেশী?

"হাঁ।"

তবে আজ রাত্রে কোথায় থাকবে?

তাইত ভাবছি কোথায় আর থাকব? এই নৌকাতেই আজ কাটাতে হবে।

তুমি এই বিদেশে এসেছ, অথচ কারো পরিচয় জাননা?

আমার তো পরিচিত কেউ নেই। কল্যাণী যেন ইতিপূর্ব্বে আর এমন করুণ কথা শোনে নাই। দয়ার্দ্র হইয়া কহিল,—

তোমার বাপ নেই?

না।

মাও নেই?

না।

কল্যাণীর মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল, কহিল—বাপ মা, ভাই কেহই নাই?

রাজপুত্র হাসিয়া কহিল—না, কেহই নাই।

কল্যাণী বলিল,—সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, এস, আমাদের বাড়ীতে এস।

সেই দিন রাত্রে কল্যাণীদের বাড়ীতে থাকিয়া রাজপুত্র প্রভাতে উঠিয়াই বিদায় গ্রহণ করিল। নদীর তীরে গিয়া আর তাহার যাইতে ইচ্ছা করিতে ছিল না। এক সন্ধ্যায় এক নিমেষের পরিচয়ই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে মনে করিল রাজ্য, ধন, উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই বৃথা। তাহাতে জীবনের তৃপ্তি নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কোন একটী স্নিগ্ধ কুলায়ে কোন একটী সঙ্গিনীকে লইয়া যদি জীবনটাকে স্বপ্নের মত কাটাইয়া দেওয়া যায় সে মন্দ কি?

দ্বিপ্রহরে কল্যাণী লাউয়ের ঠোঙ্গা করিয়া অদূরবর্ত্তী শান বাঁধান ইঁদারা হইতে জল তুলিতে গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের খরতাপে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পুনরায় রাজপুত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দরী পুনরায় রাজপুত্রকে দেখিয়া অকারণ লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কহিল,—আবার ফিরে এলে যে?

কোথায় আর যাব? তাই ঘুরে ঘুরে ফিরে এলাম, আমাকে একটু জল দেবে?

বোসো দিচ্ছি।

রাজপুত্র অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে তাজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। অর্পণা রাজপুত্রের হস্তে সুশীতল কূপোদক ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল—খাওয়া হয়নি বুঝি তোমার?

তা করে নেব এখন।

অর্পণার মুখ দিয়া একটী 'আহা' শব্দ বাহির হইল। সকরুণ হইয়া কহিল এস না, আমাদের বাড়ীতেই এস।

রাজপুত্র কহিল,—কাল রইলুম আবার আজ।

তাতে কি দোষ হয়েছে? তুমি এস কোন লজ্জা নেই।

যাইতে যাইতে অর্পণা কহিল,—তুমি একাকী থাক কাজ করনা কেন?

পাই কোথায়?

কেন, কোন কাজ পাওয়া যায় না?

আপাততঃ তো খুঁজে পেলাম না।

আমাদের বাড়ীতে থাকবে?

রাজপুত্র আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—রাখ্‌বে?

তুমি থাকতো রাখি আমাদের একজন চাকরের দরকার আছে। তা দেখ চাক্‌রী বিশেষ কিছু নয়। তুমি কি কি কাজ কর্‌তে পার?

যে কাজের ভার দেবে তাই পারব।

তুমি নূতন মানুষ বিশেষ কিছু পারবে না। আমিই করে টরে নেব—তবে দেখ—

কি?

বাবা বুড়ো মানুষ; তিনি কাছে এলেই দেখাবে খুব কাজ কর্‌ছ বুঝলে?

আচ্ছা।

অর্পণা যখন রাজপুত্রকে লইয়া কুটীরে উপস্থিত হইল তখন তাহার বৃদ্ধ পিতা জালে গাবের আটা দিয়া রঙ্‌ করিতেছেন। তিনি কহিলেন এ কে কল্যাণী? কালকের ছেলেটী নয়?

হ্যাঁ, বাবা।

খায়নি বুঝি এখনও কিছু?

তখন কল্যাণী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তাহার পিতা অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—তা বেশ করেছিস্‌ মা। আমি তো সব সময়েই বাড়ীতে থাকতে পারিনে; জাল নিয়ে মাছ ধরে বেড়াই, এ' থাকবে ভালই হোলো।

তার পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নামটী কি বাছা?

রাজপুত্র প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া কহিলেন—অরুণ।

অরুণ কার্য্যে বহাল হইয়া গেল।

২

অর্পণা যথার্থই বলিয়াছিল যে তাহাদের কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছুই নাই। রাজপুত্রকেও পরিশ্রম বেশী করিতে হইত না মাঝে মাঝে অর্পণার ডুরে শাড়ীখানা নদী হইতে ধৌত করিয়া আনিয়া ঘাসের উপর রৌদ্রে ছড়াইয়া দিত। সুন্দরী নদীতে স্নান করিতে গেলেন পশ্চাতে পশ্চাতে অর্পণার কাপড় গামছা ও মাটীর কলসী হাতে করিয়া লইয়া যাইত। অর্পণার গৃহসংলগ্ন অড়হরক্ষেত্রে অপরাহ্নে কাজ করিত। ইহাতে রাজপুত্র কোনও কষ্টই অনুভব করিত না; হাসি মুখে সে অর্পণার সমস্ত মৃদু তিরস্কারই বহন করিত।

একদিন বিকালবেলা যখন রোদের আলো নিষ্প্রভ হইয়া দূরে মন্দিরে ত্রিশূলের উপর কতখানি আলো ঢালিয়া দিয়াছে অর্পণা অরুণকে ডাকিয়া কহিল—এখনও কাঠগুলো চিরে দিলে না রাঁধ্‌ব কি করে? এমন সময়ে মুখখানি তুলিয়া দেখিল সম্মুখে সুরথ। এক ঝাপ্‌টা রক্তে অর্পণার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে কহিল—কবে এলে?

সে কহিল—একটু আগেই।

যে দিন রাজপুত্র আসিয়া এই বাড়ীতে কাজ লইয়াছে সেই দিনই সুরথ মামার বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। সুরথ কহিল কাকা কোথায়?

মাছ ধর্‌তে গেছেন।

সুরথ রাজপুত্রকে দেখাইয়া কহিল—একে?

অর্পণা কহিল—এর নাম অরুণ। এ আমাদের বাড়ীতে থাকে আর কাজ করে।

সুরথের কেন এই যুবককে প্রথম হইতেই ভাল লাগিল না। ইহার আকৃতি ঠিক ভৃত্যের মত নয় যেন শাপভ্রষ্ট কোন দেবতার পুত্র। দুই একটী লোক আছে যাহাকে না ভালবাসার জন্য কেবল মুখখানার আকৃতি দেখাই যথেষ্ট। ভগবান্‌ যেন তাহার মুখের উপরেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন এ তোমার জীবনে কোনও অনর্থ ঘটাইবে। ইহার ছায়ার সংস্পর্শে কখনও আসিও না।

সুরথ মাটীর বাসনের উপর কাজ করে। মাটীর থালা বাটী গেলাসের উপর কারুকার্য্য করিতে সে ইদানীং তাহার পিতার মত ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আর অর্পণাদের বাড়ীর মধ্যে একটী ছোট মাঠের ব্যবধান মাত্র। তাহাদের বাড়ী হইতেই অর্পণাদের বাড়ীর সম্মুখেই কালো হরিণটীকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বাঁশের উপর অর্পণার ডুরে শাড়ীখানি শুকাইতেছে সে তাহা নিত্য

দেখিতে পাইত। উভয় বাড়ীরই ধেনু ও ভেড়াগুলি একই মাঠে চরিয়া ঘাস খায়।

সুরথের সঙ্গে অর্পণার বিবাহের প্রস্তাব কিছু এ যাবতই চলিতেছে। অর্পণা এখন পঞ্চদশ বর্ষে পড়িয়া একটী মাধবী মঞ্জরীর মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুরথও যুবক বলিষ্ঠ এবং উপার্জ্জনক্ষম।

একদিন অর্পণাকে নিভৃতে পাইয়া সুরথ এদিক ওদিক তাকাইয়া ডাকিল—অর্পণা!

এই নিভৃতে তাহার সহিত কি কথা! অর্পণা বিরক্ত হইয়া কহিল—কি?

শোন।

এই নির্জ্জনে আমার কোনও কথা শুনতে ইচ্ছা করে না।

সুরথ কহিল—আমার বেশী: কথা বল্‌বার নাই। তুমি বোধ হয় জান তোমার সঙ্গে আবার বিবাহের প্রস্তাব চল্‌ছে।

হাঁ, তার কি?

তোমাকে আমি স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি তুমি কি এই বিবাহ চাও না।

কৈ আমি তো কথা বলিনি। কয়েক দিন যাবতই দেখ্‌ছি তুমি আমি কাছে এলেই কেন যে চটে ওঠ।

অর্পণা লজ্জিত হইয়া কহিল না, না, তুমি পাগল, ছি! ছি!

রাজপুত্র অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সমস্ত কথাই শুনিতে পাইলেন; সুরথকে তিনি কখনই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না; এখন হইতে বস্তুতঃই এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য যুবককে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন।

সুরথকে বিদায় দিয়া অর্পণা মনে করিল ছি! ছি! আমার কি এমনই পরিবর্ত্তন হইতেছে যে বাহির হইতে তাহা বোঝা যায়। হৃদয়ের সীমান্ত পর্য্যন্ত চোখ নামাইয়া দেখিল একটী নবাগত তরুণ ভৃত্যের মুখখানি উকী দিয়া যাইতেছে। কিন্তু, ইহার সঙ্গে কি বিবাহ হওয়া সম্ভব? অসম্ভবই বা কি? তাহাদের সমান সমান ঘর; সুশ্রী উপার্জ্জনক্ষম যুবাপুরুষ এমন বিবাহ তো নিত্যই ঘটিতেছে।

দুই চক্ষু রাঙা করিয়া সে তাহার মনকে ভৎর্সনা করিল। সুরথের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির; সে তাহার আবাল্য পরিচিত, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আজ অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা মনে পড়ে কেন? অরুণের উপর সে অকারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অরুণ ঘরে ঢুকিতেই কহিল আজ এখনও কাঠ চিরে রাখ নাই?

এইমাত্র মাঠ থেকে এলুম এখনই দিচ্ছি।

জলও এনে রাখনি?

এই এনে দিচ্ছি।

অর্পণা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল তুমি দিন দিন কি কুড়ে হচ্ছ; এক এক কাজ করতে তিন দণ্ড লাগে।

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল; অর্পণাকে এত ক্রুদ্ধ হইতে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সে কহিল আমার কি কোনও বিশেষ দোষ দেখেছ অর্পণা!

দেখ্‌ছি না! রোজই দেখ্‌ছি; কোনও কাজ তোমা দ্বারা হবার নয়, এমন হলে তুমি কেমন করে থাকবে। রাজপুত্র মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

মাথা নীচু করে থাকলে হবে কেন, কাজ করগে।

রাজপুত্র সমস্ত কাজ শীঘ্রই শেষ করিয়া দিল কিন্তু অর্পণার ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইল। সেই রাত্রে সে কিছুই খাইল না।

অর্পণা নিজেই বুঝিতে পারে নাই যে অরুণকে তিরস্কার করিয়া তাহার মনে এতটা ব্যথা লাগিবে। সে চুপে চুপে গিয়া পিতাকে কহিল—বাবা, অরুণ তো আজ রাত্রে কিছুই খেলে না। পিতা কহিলেন—ডেকে দেগা না, যা।

সে আজ রাগ করেছে, তুমি না বল্‌লে হয়তো খাবেই না। পিতা একটু ঘুম দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অকারণ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—আজি কি করব তার?

অর্পণা ধীরে ধীরে অরুণের ঘরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল খাবে না বলে কাজও করবে না নাকি?

অরুণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অর্পণা কহিল—ভাতগুলো অম্নি পড়ে থাকবে?

অরুণ কহিল—আজ কিছু খাবনা অর্পণা!

কেন খাবেনা শুনি?

শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে।

অর্পণা বলিল—বুঝেছি, বুঝেছি আমার উপর রাগ করেই খাওয়া হচ্ছে না।

অর্পণা গম্ গম্ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ভাত খাইতে তাহার প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে শয়ন করিয়া অর্পণা ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হয়? অরুণ খেল'না তার জন্য আমার এত বেদনা কেন? তাকে ব্যথা দিয়া নিজেরই চক্ষু দিয়া কেন জল হুহু করিয়া ঝরিয়া পড়ে। পরদিন সুরথের সঙ্গে অরুণের অতি অল্প কারণ লইয়া একটা বিবাদ হইয়া গেল। প্রেমের পরিণাম এতই ভয়ানক যে তাহাতে রাজপুত্রের ও একটা ক্ষুদ্র কৃষকের সঙ্গে ঝগড়া হয়!

সুরথ অর্পণাদের বাড়ীতে বাল্যকাল হইতেই যাতায়াত করিত, সুতরাং তাহাদের বাড়ীতে অনেকটা মনিবের মতই তাহার প্রভুত্ব ছিল। অর্পণা যেমন অরুণকে নানা কাজ করিবার আদেশ দিত সুরথও মাঝে মাঝে সেইরূপ আদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। অপর্ণা গৃহে অবস্থান করিলে রাজপুত্র সুরথের আদেশ মতই সমস্ত কাজ করিত। পাছে অর্পণার মনে আঘাত লাগে এই জন্য সুরথের আদেশে দ্বিরুক্তি না করিয়া সুরথের তিরস্কার পর্য্যন্ত মাথায় বহন করিয়া লইত। কিন্তু, বহুদিন যাবতই সুরথের প্রতি একটা ঈর্ষা তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। অর্পণা গৃহে ছিল না; সুরথ কহিল—গাইটাকে মাঠে বেঁধে দিয়ে এস।

অরুণ একটা বাঁশের বেড়া দিয়া ছোট একটা বাগান পরিবেষ্টন করিবার জন্য কতকগুলি কাইম চাছিতে ছিল। সুরথের কথাও কর্ণপাত করিল—না।

সুরথ জিজ্ঞাসা করিল—কথা কি কাণে যাচ্ছে না?

রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—না।

ক্রোধে সুরথের কর্ণমূল পর্য্যন্ত কালো হইয়া উঠিল। সে চেঁচাইয়া কহিল—তুমি আমার কথা শুন্‌বে না?

অধিকতর মনোযোগ দিয়া রাজপুত্র কঞ্চি চাছিতে লাগিল। এমন সময়ে অর্পণা সেই স্থানে প্রবেশ করিল। তখন গো ও বৎস লইয়া অরুণ মাঠে চলিয়া গেল।

সুরথ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল তুমি ওকে তাড়িয়ে দাও।

অর্পণা মনে করিল সুরথ অরুণকে ঈর্ষা করিতেছে। সে কহিল—কেন?

ও আমার কথা অবজ্ঞা করে; তুমি ওকে আদেশ কর্‌তে যাও কেন?

এই তোমার উত্তর?

সুরথ। তুমি পাগল হয়ো না; কাল অকারণ ওকে কতখানি তিরস্কার কর্‌লাম, আজ আর কর্‌তে পারিনে।

সুরথের আদেশ এতদিন পরে অর্পণা এমন অমান্য করিল। সুরথ ধীরে ধীরে ম্লান মুখে উঠিয়া গেল।

সাত আট দিনের মধ্যে সুরথ আর ফিরিয়া আসে নাই। ভিতরে ভিতরে অর্পণা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অরুণকে কহিল দেখে এসতো অরুণ, সুরথের কি হয়েছে?

কতক্ষণ পরে সুরথের সংবাদ লইয়া অরুণ ফিরিয়া আসিয়া কহিল—সংবাদ বড় খারাপ।

আশঙ্কায় অর্পণার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। কম্পিত বক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

সেই দিন সে গোমতী নদীর তীরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সহসা তীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তবে সে রক্ষা পাইয়াছে।

অর্পণার মনে হইল তাহারই উপর রাগ করিয়া বোধ হয় সুরথ জলে ডুবিতে গিয়াছিল। অনুতাপ বোলতার মত তাহাকে হুল ফুটাইতে লাগিল।

অর্পণা কহিল—আমি একবার যাই।

অরুণ কহিল—এই অন্ধকারে?

হাঁ।

আমি সঙ্গে আস্‌ব?

অর্পণা আগুন হইয়া কহিল—তোমার কাজ করগে।

অরুণ অবনত শিরে কাজ করিতে লাগিল।

অর্পণা সুরথের বাড়ীতে গিয়া দেখিল সুরথ নিদ্রিত রহিয়াছে। সুরথের বৃদ্ধা মাতা তাহার মাথায় বসিয়া বাতাস করিতেছিল। অর্পণাকে দেখিয়া কহিল—আয় মা আয়, সুরথ ভালই আছে এখন।

অর্পণা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। আবেগের ঝোঁকে সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে সুরথের সঙ্গে তাহার অবিলম্বেই বিবাহ হইবে। সে মনে করিল ছি! ছি! এই উদ্বেগের জন্য ইহারা কি ভাবিতেছেন?

সুরথের মা কাছে ছিল বলিয়া অর্পণা সুরথের কাছে ক্ষমা চাহিতে না পারিয়া মনে মনে আরও ক্ষুব্ধ হইতেছিল। গৃহে আসিয়া নানাপ্রকারে সে অরুণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সৌভাগ্যক্রমে সুরথের সঙ্গে অর্পণার

নিভৃতে সাক্ষাৎ হইল। অর্পণা কহিল—আমাকে ক্ষমা কর।

সুরথ কহিল—তোমার কি দোষ?

না; আমারই অপরাধ হয়েছে; তোমার অরুণকে ডেকে তিরস্কার করা উচিত ছিল।

তা—আর আমি কিছু মনে করিনি অর্পণা!

কিন্তু, আমিতো বুঝছি অরুণের এ অন্যায়। আমি আজই তাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেব।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে কঠিন কণ্ঠে ডাকিল—অরুণ!

অরুণ কহিল—কি?

তোমাকে আর রাখবনা তুমি যাও।

নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না তাহার কি অপরাধ। কিছু বুঝিতে না পারিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃই গভীর হইতেছিল। আবার তাহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অর্পণা কহিল যাও। এখানে আর তোমার স্থান নাই।

ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া রাজপুত্র তাহার ছিন্ন পাদুকা ও ভগ্ন বীণাটী কুড়াইয়া লইল। এই দূর বিদেশে গোচারণ ও ভৃত্যের কাজ তাহার পড়িয়া রহিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—তবে আসি অর্পণা!

অর্পণার মুখের রেখা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। সে কহিল—যাও।

হায়, একদিনেই সমস্ত ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। এতটা যে হইবে অর্পণাতো তাহা চিন্তা করে নাই। সে মনে করিয়াছিল অরুণ তাহার মনটীর একটুখানি কোণ মাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছিল। পাছে সুরথের প্রতি কোনদিন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই সে অরুণের সহিত নিজের সম্বন্ধ একটা ক্ষুদ্র অছিলায় নির্ম্মম করে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কতখানি যে গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি ঝিল্লী মন্দ্র মুখরিত। যতই রাত্রি গভীর হইতেছে ততই অর্পণা বোধ করিতে লাগিল কতটা গেল। একটা বেদনা ধীরে ধীরে তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। শরাহত বিহঙ্গীর মত ছট ফট করিতে করিতে সে বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—ফিরে এস, ফিরে এস।

তাহার পিতা বহুরাত্রে জাল লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন আর আর দিনের মত বাহিরে জলভরা ঝারীও নাই এবং জলচৌকীর উপর গামোছা খানিও কেহ সাজাইয়া রাখে নাই।

ধীবর কহিলেন—অর্পণা! অরুণ গেল কোথায়?

অর্পণা কাঁদিতে কাঁদতে কহিল—তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

আঃ! তাড়িয়ে দিলি?

অর্পণা ভাবিতে লাগিল তাহার বৃদ্ধ পিতা পর্য্যন্ত অরুণের জন্য ভাবিতেছেন আর সে কেমন করিয়া এত নিষ্ঠুর হইতে পারিল যে অরুণকে তাড়াইয়া দিল।

অর্পণা কহিল,—বাবা! খুঁজে দেখলে হয় না।

আজ রাত্রে?

কাল আর তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

জেলে বলিলেন,—আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আজ আর আমি পারবো না।

অর্পণা দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল ও কহিল—হবে আর তাকে পাওয়া যাবে না।

ধীবর কহিলেন,—"তাতে আর কি রে মা! এক চাকর গেলে আর এক চাকর পাওয়া যাবে। তাতে আর ভাবনা কি! তারপরে শোন্।

অর্পণা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

জালখানা গুটাইতে গুটাইতে ধীবর কহিলেন—সুরথের সঙ্গে একরকম বিবাহ স্থির ক'রে ফেলেছি। কবে দিব তাই ভাবছি।

এই সময়ে সুরথের সহিত বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়াতে তাহার সমস্ত মন খড়্গের মত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তথাপি সমস্ত ক্রোধ দমন করিয়া সে কহিল 'বাবা, আরো কিছুদিন যাক।'

বৃদ্ধ অন্য কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া দীপের আলোকে একখানি কাপড় সেলাই করিতে লাগিলেন।

অর্পণার দিন গুলি আর কাটিতে চায় না। সে প্রত্যহ নদীর তীরে যায়। কত বিচিত্র বর্ণের নৌকা পাল তুলিয়া যায়, কত ফিরিয়া আসে। কিন্তু, সে যে নৌকাখানি চায় সেখানে আর ফেরে না। মাল বোঝাই করা ব্যাপারী-দের নৌকা বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসে, নদীর জল আলোড়িত করিয়া বোল বৈঠা ফলিয়া মাঝিরা সারিগান

গাহিতে গাহিতে, প্রস্থান করে, নৌকার দুই দিকে প্রকাণ্ড কাঠ বাঁধিয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য বহুলোক বিদেশ হইতে বাণিজ্য করিতে আসে কিন্তু, সে যে নৌকাখানি চায় সেইখানি আর ফিরিয়া আসে না। পরপারে সন্ধ্যা বেলা যখন তরুণীরা মৃন্ময় কুম্ভ কক্ষে ফিরিয়া যায়, রাখালের বাঁশীর সুর যখন সন্ধ্যা অবসান হইতেছে জ্ঞাপন করে এবং পরপারে সূর্য্যের আলোক সোণার মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় তখন সে গৃহে ফেরে। আর একটা দিন ব্যর্থ হইল ভাবিয়া তাহার বক্ষপঞ্জর হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠে।

যখন বিদেশী তাহার কাছ হইতে বিদায় লইয়া যায় তখন গ্রীষ্মের রাত্রি। আম্র মঞ্জরী ঝুর ঝুর করিয়া শাখা হইতে স্খলিত হইতেছে। পাপিয়ার কণ্ঠও স্খলিত ও ক্লান্ত। গ্রীষ্মের তাপে ধরিত্রীর শ্যামল শোভায় ম্লানিমার ছায়া ফেলিয়াছে। সে দিনও সে এত বেদনাতুর হয় নাই। গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসিল, তখন মাঠে তাহাদের অড়হর ক্ষেতের মধ্যে উভয় দিক প্লাবিত গোমতীর জল নানা ধারায় প্রবেশ করিয়াছে। মাঠে মাঠে জলের উপর চন্দ্র কিরণের নৃত্য তখন সে চক্ষে কাজল আঁকিতে লাগিল।

এমনই করিয়া অনেক কষ্টে শরৎ, হেমন্ত, শীত চলিয়া গেল। আগমনীর সহিত তাহার বুকের আন্দোলনও দ্রুত হইতেছিল, হেমন্তের হেমকান্তি তাহার মনের মধ্যে চিহ্ন আঁকিয়া গেল, শীতের শিশিরেও তাহার মনের দাহন নিভিল না।

অবশেষে নবমঞ্জরীর ভারে বসন্ত আসিল। এখন ফুল ফুটিবার ও ফল পাকিবার সময়। আজ আর বাহিরের দিকে তাকাইয়া অর্পণার দিন কাটিতে চাহেন না। সে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল।

সুরথ অর্পণার মন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অর্পণার বাল্যবন্ধু সুরথ কত দিন দীর্ঘিকা হইতে তাহার জন্য শালুক তুলিয়া আনিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে প্রশংসা-সূচক দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, উড্ডীয়মান হংসীটিকে হাতের কাছে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছে, কর্ণে লবঙ্গীর পল্লব পরাইয়া দিয়াছে, পায়ে বিদ্ধ কণ্টক উন্মোচন করিয়াছে, সেই অর্পণা আজ পর হইয়া গেল।

তাই তুচ্ছ্যকে অর্পণা সুরথের সহিত সাক্ষাৎ করে না। খেজুর কলিসে খেজুরের রস প্রার্থনা করে না। অর্পণা যখন গোদোহন করে সুরথ কাছে আসিলে বিরক্ত হইয়া উঠে।

সেইদিন নদী হইতে অর্পণা যখন জল আনিতে গিয়াছে তাহাকে অতিশয় ক্লান্ত দেখিয়া সুরথ কহিল—অর্পণা! আমার হাতে কলসীটে দাও।

অর্পণা বিরক্ত হইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিল, আমিই নিতে পারবো।

সুরথ কহিল—বিরক্ত হয়েছ অর্পণা?

হাঁ হয়েছি। তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করতে এসোনা।

অর্পণা যখন গৃহে ফিরিল তখন তাহার পিতা জালটার নানা স্থান সেলাই করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই মুখ তুলিয়া কহিলেন সুরথের সঙ্গে তোর বিয়ে।

অর্পণা একটু চমকিত হইল, তারপরে স্থির হইয়া কহিল—আরও কিছুদিন যাক্ বাবা!

তাহার বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—আমি কোন আপত্তি শুনছিনা, আর পনরদিন মাত্র সময় দিলাম।

অর্পণার মনে হইল এখনও সেই অরুণ ফিরিয়া আসিবে। ভগবান এই পনরটি দিনের মধ্যেই তাহার বাঞ্ছিতকে ফিরাইয়া আনিবেন। সুরথকে বিবাহ! যাহার জন্য অরুণকে লাঞ্ছনা করিয়া তাড়াইয়া দিল তাহাকেই সে বিবাহ করিবে?

পনরটী দিন মাত্র সময়। তাহার প্রত্যেকটী দিন যেন চারিখানি পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া চলিতে লাগিল।

অবশেষে সেই পনরদিনের দিন উপস্থিত হইল। অর্পণা সমস্ত দিন নদীর তটে; ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসল। সূর্য্যের আলো পশ্চিম আকাশে লাল কালি ছড়াইয়া দিয়া পরপারের সর্ষপ ক্ষেত্রকে রাঙ্গা করিয়া ডুবিয়া গেল। গ্রাম-বধূদের জল ভরা শেষ হইল। ঘরে ঘরে শঙ্খরব। কেবল একটী রমণী শূন্য হৃদয় লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত তাহার গৃহে ফিরিল।

পর দিন সকাল হইতেই শানাই বাজিতেছিল। মাথা ঘসিয়া লালফিতা দিয়া গৌরীর চুল বাঁধা হইয়াছে।

আলিপনা আঁকা পিঁড়ির উপরে বসাইয়া মন্ত্রপূত জল দ্বারা যখন পুরোহিত উভয়ের হাত একত্রে বাঁধিয়া দিলেন

এমন সময়ে নদীর তটে কয়েকটি দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল। সেখানে অন্ধকারে কেবল কয়েকটি দীপ জ্বালাইয়া স্কন্ধে একটি শিবিকা বহন করিয়া কয়েকজন সৈনিক গম্ভীর পদবিক্ষেপে সেই বিবাহ ভবনের দিকেই আসিতেছিল। কলিঙ্গ দেশ জয় করিতে গিয়া মগধের রাজপুত্র নিহত হইয়াছে। তাহারই আদেশ মত শিবিকা ধীবরের ভবনে আনয়ন করা হইতেছে।

গোমতীর জল এখন জোয়ারে স্ফীত হইয়া কল কল করিতেছে। উচ্চে নহবতের ধ্বনি আকাশকে সকরুণ করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপরে উদাত্ত স্বরে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

সৈনিকেরা সেইখানে আসিয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইল।

মুহূর্ত্তে বিবাহের সমস্ত শব্দ নিস্তব্ধ। যখন মৃতের মুখের ঢাকা খানি খুলিয়া ফেলা হইল তখন সকলেই দেখিল সে ধীবরের পুরাতন ভৃত্য—অরুণ।

রাজপুত্র আদেশ করিয়াছিল তাহার দেহ যেন এই ক্ষুদ্র গ্রামে গোমতী নদীর তীরে দাহ করা হয় এবং নিজের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া একটা হীরার কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিল—অর্পণাকে দিতে।

বিবাহের সভায় সেই মুক্তার মালা ও অলঙ্কার গুলি দীপালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখটী

জহরব্রত

জ্বলিছে অনল হুঙ্কারি, লভি আহুতি হবির ধার,
বাহক শতেক আনিয়া ঢালিছে চন্দন ভারে ভার।
সুরভি জড়িত পট্ট বসন উড়িয়া পড়িছে কত!
অঞ্জলি হ'তে যেতেছে খসিয়া শতদল শত শত।
কুসুম-কলিকা হুতাশন বুকে স্থজিয়া দিতেছে পথ,
রূপরাশি লয়ে ছুটিবে যে-পথে সহস্র শিখার রথ!
উঠিছে বাজিয়া অযুত শঙ্খ তুলিয়া মঙ্গল তান;
ঘুরিছে চৌদিকে চারণবৃন্দ গাহিয়া গাহিয়া গান!
সহসা অমনি উঠিল ভাসিয়া সহস্র শুকের মত
লাবণ্য-বিভায় উজলিয়া পুরী অমরী—অমরী শত!
সম্মুখে রাণী রক্ত-বসনা ইন্দ্রাণী সমতুল,
শিরে মণিমালা গলে ফুলহার করতলে বনফুল!
একটির পর একটী রমণী (ঊর্ম্মি ঊর্ম্মির পরে)!
রূপের ঊর্ম্মি খেলিছে যেন সে দিব্য দেহ-সরোবরে!
কল কণ্ঠে শত ফুটিল অমনি সঙ্গীত মনোহর,
কিন্নরী যেন খুলে দিল তার স্বর্গ-সুলভ স্বর।-
রাজপুতবালা গলে ফুলমালা শীতল অনল-ছায়
জুড়াবি হৃদয় আজি এ সময় আয় সবে ছুটে আয়!
ধরার ধূলায় দেবতার কায় মলিন হয়েছে যার,
পাবকের রথে মরণের পথে ম্লানতা ঘুচিবে তার।

এ নহে মরণ স্বর্গ-জীবন লভিতে সুখের সেতু,
নিরয়ের দায় অতিক্রমি যায় উড়াবি সতীত্ব কেতু!
পাপ দূত সনে যুঝি রণাঙ্গণে পতিগণ গেছে যায়,
যাব সেই দেশে বীরনারী বেশে ঘুচাব পাপের দায়।
দাহিরের নারী কৃষ্ণকুমারী পদ্মিনী—দেবীগণ
কর্ম্মদেবী আর দেহ সংযুক্তার যেথা হ'ল বিসর্জ্জন,
পাবক-শিখার ওই দেখা যায় সে পথ রয়েছে পড়ি
আলিঙ্গন-আশে দেবীগণপাশে আয় সবে ত্বরা করি।
স্নেহ মমতার অবনীতে আর নাহিক বিন্দু ছায়
পুণ্য-হরষে অঙ্গ অবশে আয় তোরা হেথা আয়।"
হুঙ্কার পুন জ্বলিল অনল লভিয়া হবির ধার;
প্রদক্ষিণ করি বীরনারী সবে চলিলা সপ্তবার!
বোম্ বোম্ রবে বিদারি গগন উঠিল কণ্ঠস্বর;
দেবীদের মুখে অলোক-প্রভিভা প্রকটিল মনোহর!
শত শিখা-কর করি প্রসারিত রূপের প্রসাদ আশে
পাগলের প্রায় ছুটিল পাবক অমর-প্রতিমা পাশে!
ক্ষণকাল সবে নীরব—নীরব, তার পর! তারপর!
হয়েছে ভস্ম দেবীরূপ রাশি আঁধারিয়া চরাচর?
শুন—ওই শুন—হ'ল দৈববাণী—"নহে, বিধাতার বরে
রূপের 'ফিনিক্স্' জনমিবে কোটি হিন্দুর ঘরে ঘরে।"

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর বি-এ।

চিত্র-চাতুর্য্য

সম্রাট পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর এবং ভাস্কর আনিয়াছেন তাঁর পরি-কন্যার চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করবেন।

সম্রাট দুজনকেই সভায় ডেকে জানালেন, তাদের আশার অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে; কিন্তু শিল্পচাতুর্য্য এমনই হওয়া চাই যে, সর্ব্বদেশের সর্ব্ব লোক অবাক্ বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে থাকবে।

রাজোদ্যানের একপ্রান্তে চিত্রকরের বাসা, আর এক-প্রান্তে ভাস্করের।

ভাস্কর তার যন্ত্রপাতি আর 'লাল, নীল, শাদা আশমাণি জরদা' প্রস্তর খণ্ডে ঘরটি সাজিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভাবছে, মানুষের মন কুঁদে তৈয়ারী করা যায় কি না। এমন সময় ঝুম্—ঝুম্—ঝুম্ মধুর নুপুর নিক্কণ ভাস্করের দ্বারের কাছে কাণের পাশে বেজে উঠিল। চকিতে চেয়ে দেখে সে সৌন্দর্য্য-কাননের শ্রেষ্ঠ কুসুম তার চোখের সামনে পূর্ণ বিকসিত!

রাজকুমারী সহচরী সাথে ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল ও আঁচলখানি বিছিয়ে এক খণ্ড শুভ্র প্রস্তরের উপর স্থির হয়ে বসিল।

ভাস্করের বিহ্বলতা আকুলতার কাণে আঘাত দিয়ে সখি বল্ল 'ওগো শিল্পি ভাল করে দেখে নাও, মনে এঁকে নাও। আর কাল থেকে সুরু করে দাও তোমার কাজ'। চমক ভেঙ্গে ভাস্কর দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দূর থেকে রাজকুমারীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে লাগল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল, এতদিন পর তার যন্ত্র ধরা সার্থক হবে। পাথরের গায়ে এমন একটা সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার নাম চিরকাল অক্ষয় অমর করে রাখবে।

ভাস্করের কাছ থেকে রাজকুমারী ছুটী পেল। এখন তাকে আবার যেতে হবে চিত্রকরের কাছে।

মুক্ত জানালা দিয়ে সহরে সাঁঝের আকাশের পানে চেয়ে চিত্রকর ভাবছে, কার তুলির স্পর্শে আকাশের গায় এ মোহন ছবি আঁকাবে!

রুণু রুণু ঝুম—রুণু রুণু ঝুম—; তার মনে হল নীল আকাশের পথ দিয়ে, পেঁজা মেঘের ধাপ বেয়ে নুপুর শিঞ্জিত চরণ দুটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার কল্পনার ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে সখি ডাকিল, 'চিত্রকর চেয়ে দেখ তোমার ঘরের দ্বারে রাজকুমারী।' চেয়ে দেখে সে—আকাশের গায় আবছায়া। যে চিত্রখানি ছিল, যার অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, একে! তার ঘরের দ্বারে, তার বাহুর পাশে, তার হৃদয়ের এতো কাছে, এতো স্পষ্ট হয়ে কখন নেমে এল সে!

তার মোহের ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সখি আবার বল্ল 'ওগো দেখে নাও, মনে এঁকে নাও। কাল থেকে সুরু করে দাও তোমার অঙ্কন'। সময় ধার্য্য হয়ে গেছে—এত দিনের ভিতর চাই মূর্ত্তি, এত দিনের ভিতর চাই চিত্র।

ভাস্কর প্রাণপণে লেগে গেছে কাজে। কত উৎসাহ কত আনন্দ তার। 'খট্ খট্—খিট্', ঘাএর উপর ঘা। নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই মূর্ত্তি গড়ে ফেলেছে সে। সে তার চারু শিল্পে নিজেই মোহিত—কি অপরূপ সৌন্দর্য্য সে পাথরের গায় ধরে দিয়েছে। গর্ব্বে, আনন্দে, আশায় তার বুকের রক্ত নেচে নেচে উঠছে।

চিত্রকর—নাই তার তুলি, নাই তার রং—ধ্যান স্তিমিত লোচনে বসে আছে, কোন সুদূরের পানে চেয়ে। কোথা তার দক্ষ তুলির তরুণ স্পর্শে, কোথা তার আপন চিত্র!

নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখতে এলেন সম্রাট ভাস্করের কীর্ত্তি, সঙ্গে অসংখ্য সভাসদবর্গ।

'বা—বা' সমস্বরে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠিল সব। সম্রাট তাঁর হীরক হার খুলে ভাস্করের গলায় পরিয়ে দিলেন। উপরে হাসির মতো বিজয় গর্ব্বে তার মুখখানি লাল হয়ে উঠিল।

* * * * * চমকিত হয়ে চেয়ে দেখে চিত্রকর তার ঘরে কিসের কোলাহল!

'কই, তোমার চিত্র কই? সম্রাট আগ্রহ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চিত্রকর চেয়ে রইল সম্রাটের মুখপানে।

'দেখাও—দেখাও।' কি দেখাবে সে!

ওকি! উঠ—ওঠ, আমি তোমার নয়নানন্দকর অপরূপ

ছবি। হে মর্ত্তের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর দেখাও তোমার বিচিত্র অঙ্কণ।

কোথা পাবে সে! এতদিন সে যে শুধু মনের ভিতরে তার ছবি এক একবিন্দু হৃদয়-শোণিত দিয়ে এঁকে রেখেছে। বাহিরে ত সে সে চিত্র ফোটায়নি—সে যে সব ভুলে গিয়েছিল।

সম্রাটের ধৈর্য্যের বাঁধ অনেকক্ষণ ভেঙ্গে গিয়েছিল। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—উত্তর দাও কোথায় তোমার চিত্র?'

হঠাৎ তার মনে হল, হাঁ তার চিত্র অনেক দিন আঁকা হয়ে গেছে। ভিতরের চিত্র সে বাহিরে দেখাবে। এমন ছবি সে দেখাবে যা কেউ কখনও দেখেনি, আর কোথাও দেখবেও না।

ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে সে উঠল, সম্রাটের কটীদেশ থেকে সহসা তরবারী উন্মোচন করে নিল।

'দেখবে সম্রাট—চিত্র দেখবে, তবে ঐ শুভ্র দেয়ালটার পানে চেয়ে দেখ' এই বলেই তরুণ চিত্রকর নিজের বুকের মাঝখানে তরবারির আঘাত করে। রক্তের ফুলকি ফিন্‌কি দিয়ে উর্দ্ধে উঠে দেয়ালের গায় একি অপূর্ব্ব নিখুত চিত্র এঁকে দিল। অন্তরে গভীর অঙ্কিত চিত্র পথ পেয়ে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ভুবন ভুলান হৃদয়রক্তে অঙ্কিত একি অনির্ব্বচনীয় চিত্র-চাতুর্য্য তার!

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী।

স্মৃতি

লক্ষ প্রেম মঞ্জু গাথা ফুটিত যার মঞ্জীরে—
চিত্তখানা রিক্ত করি আজ সে ওগো কোন্ তীরে?
ইন্দ্র সভায় সুন্দরী কি নৃত্য করে প্রাণ খুলে,
স্বর্গলাভ মর্ত্ত্যপানে চায় না কি তাই চোখ তুলে!
অতীত প্রেমের মধুর গাথা জাগছে না কি অন্তরে,
পারিজাতের রূপ দেখে কি ভুল বেলার গন্ধরে!
আজ সে কি লো কুঞ্জরাণী—লক্ষ পিক চন্দনা,
প্রাণ ভরিয়া দিক্ ছাপিয়া গায় কি তারি বন্দনা!

কোন্ কাননে পরশ তাহার ফুটায় প্রেম মঞ্জরি,
কুঞ্জ হিয়া মুঞ্জরিয়া উঠছে ভ্রমর গুঞ্জরি!
দৈন্য ভরা দগ্ধ দেহ—নাইক শোভা অন্তরে,
অন্ত হারা অন্ধ ব্যথা অশ্রু রূপে আজ ঝরে।
কোথায় আজি সুন্দরী মোর—কোন্ সাগরের কোন্ তীরে,
বক্ষখানি পূর্ণ করি আসবে কি গো আর ফিরে?

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

আমাদের সমাজ সংস্কার ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

"সমাজ সংস্কার" এই কথা শুনিলেই অনেকেই শিহরিয়া উঠিত, তাঁহার মনে অকস্মাৎ সামাজিক একটা লণ্ড ভণ্ড বিশৃঙ্খলার চিত্র জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃপক্ষে সমাজসংস্কারের গোড়ার পর্ব্বে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজ সংস্কারের প্রথম পর্ব্বের বিশৃঙ্খলা শুধু ভারতে নহে সভ্যদেশে সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে। কাজেই বর্ত্তমান যুগে যখন জগত ব্যাপিয়া সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিষয়েই সংস্কারের একটা আন্দোলন উঠিয়াছে তখন আর আমাদের তরফ হইতেও নিতান্ত আলগোছ হইয়া বসিয়া থাকাটা ঠিক নয়। মানুষের সংস্পর্শে যেমন মানুষ পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় তেমি জাতির সংস্পর্শেও জাতীয়তার পূর্ণতা হয়। কাজেই ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে যে ভারতবর্ষের বিভিন্নজাতি

আজ য়ুরোপীয় এবং অন্যান্য দেশের জাতি সমূহের সংস্পর্শে, কাজে এবং চিন্তায় নূতন ধরণে জীবন যাত্রার পাড়ি দিবার সংকল্প করিতেছে। এই জন্যই আজ কাল সমাজকে নূতন করিয়া, গড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা চারিদিক হইতে দেখা দিতেছে।

সমাজের ব্যবস্থা যখন জীর্ণ হইয়া আসে তখন এই রকমে সংস্কারের দক্ষিণা বসন্ত হাওয়া জোরে আসে। তাহার আঘাতে চারিদিকে বেশ এক চোট ভাঙ্গা গড়া সুরু হইয়া যায়। সামাজিক এই প্রয়োজনীয় সংস্কারকে জোর করিয়া ঠেকাইতে যাওয়ারও একটা প্রবল চেষ্টা চারিদিক হইতে দেখা দেয় কিন্তু সে চেষ্টাকে প্রতিহত হইয়া, শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। অবশ্য ইহা খুবই সত্য সেই প্রতিকূল চেষ্টাও একদিক দিয়া সমাজে কল্যাণ বিধান করে। কারণ ঝড় ঝাপটের ভিতর দিয়া যে শক্তি মাথা উচু করিয়া দাঁড়ায় সেই শক্তিই সত্যকার শক্তি। কাজেই যেখানে নবীন প্রবীণের দাবড়ানিকে গ্রাহ্য করে—সেখানে ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হইয়া যায় যে নবীনের প্রাণ শক্তির ভিতর ফাঁপা। ফাঁপা শক্তি কখনই কোনদিকে কোন মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। যাহা হউক ইহা খুব সত্য যে, একশত কিম্বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সমাজে ব্যবস্থার জন্য যে সব আইন কানুন পাশ হইয়া গিয়াছে একশত কিম্বা দুই শত বর্ষ পরেও সমাজে সেই সব আইন কানুন ষোল আনা চলিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্ব যুগ হইতে এই বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, আচারে ব্যবহারে মানুষ অনেক বিষয়ই নূতন ভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছে। কাজেই একথা ভাবাই বাহুল্য যে, আমরা পূর্ব্বে যা ছিলাম আজকের দিনেও ঠিক তাই থাকিব। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদের কাজের গতিকে পড়িয়া অনেক নিয়ম কানুন বদলাইতে হইবে। গৌরীদানের পুণ্য যতই বেশী হউক তথাপি অর্থাভাবে পড়িয়া আজ কাল অনেক পিতাকেই গীতা হাতে লইয়া পনের বছরের অবিবাহিতা কন্যাকে ঘরে রাখিয়া জোর করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের মন্ত্র আওড়াইতে হয়। উপায় নাই। যে কালে টাকায় একমণ চাল আর দুইসের ঘৃত পাওয়া যাইত—সেকালে বড় ভাইর পক্ষে ছোট ভাইর স্ত্রী পুত্রকে নিজের সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারে রাখায় কষ্ট ছিল না। কিন্তু এখন ত্রিশ কিম্বা ৩৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র থাকিতে এক ভাইর পক্ষে অন্য ভাইর স্ত্রী পুত্রের ভার লইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে হয়। এই কারণেই একে একে অর্থহীন পরিবার হইতে একসঙ্গে থাকার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। এজন্য নব্য ভাবকে গালি দিলে নিজেরই রসনাকে পদে পদে মর্য্যাদাহীন করা হইবে। যে দিক দিয়া দেখিনা কেন—দেখিতে পাইব, অকারণ নিয়ম কানুনে ভাঙ্গা গড়া উপস্থিত হয় না। সবটির মূলেই কারণ থাকে।

(২)

যাহা হউক এই মহা পরিবর্ত্তনের কিম্বা সমাজ সংস্কারের পর্ব্বে আমাদের একবার অবহিত হইয়া বিচার করা আবশ্যক, আমাদের পরিবর্ত্তনের অধিকার কোন পর্য্যন্ত অর্থাৎ কোনটা পরিবর্ত্তন করা চলে আর কোনটা চলে না। নাকের চশমা পরিবর্ত্তন একশত বার করা চলে—কিন্তু নাক পরিবর্ত্তন করা চলে না। করিলেও তাহা স্বাভাবিক হয় না, নয় কাঠের—নয় রবারের হয়। অবশ্য সেটা কাহারো পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই আমাদের বোধ হয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে আমাদের মধ্যে নূতনকে আমরা কোথায় গ্রহণ করিব আর কোথায় ছাড়িব?

বৈশিষ্ট্য শব্দের অর্থ বিরোধ নয় এই জন্যেই আমরা দেখিতে পাই বৈশিষ্ট্যময় জগতে নিরন্তর একটি মৈত্রীভাব জাগিয়া আছে। এই জন্যই ফুলের বাগানের হাজারো ফুলের একত্র সম্মিলনেও আশ্চর্য্য শোভা আছে বিরক্তিকর কিছুই নাই। বস্তুত পক্ষে, বিচিত্রতায় বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতা। নচেৎ কোন জিনিষ সম্পূর্ণ হয় না। অনেকগুলি বিচিত্র জিনিষ লইয়াই একটি পূর্ণ জিনিষের গঠন হয়। মানুষের দেহ, প্রস্ফুটিত পুষ্প এই সত্যকে নিত্য প্রমাণিত করিতেছে। চিত্রের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মধ্যেই শিল্পী পূর্ণ একটি সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলেন।

আমরা অনেক সময় এই বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিয়া একটা একতা গড়িতে চাই, ফলে সেই একতা গড়নের চেষ্টা ব্যর্থতায় লাঞ্ছিত হয়। মনুষ্য সমাজে প্রত্যেক জাতির ভিতরে একটি প্রাণগত বৈশিষ্ট্য আছে। উহা যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। স্থান এবং আব-

হাওয়ার প্রভাবে গোলাপের বর্ণের উজ্জ্বলতার কম বেশী হয় সেটা বাহ্য পরিবর্ত্তন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাহাকে যদি চামেলিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে, সেই রাঙা কিম্বা পীত গোলাপ না হইবে চামেলি, না রহিবে গোলাপ—একটা স্বতন্ত্র দো-আঁসলা পদার্থ হইয়া যাইবে। কাজেই প্রাণগত বৈচিত্র্য বিনষ্ট করিবার বস্তু নহে। এই জন্য আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যেন আমরা পরিবর্ত্তনের হাঁপায় আমাদের ভারতীয় প্রাণগত বৈশিষ্ট্যকে না হারাইয়া ফেলি; দেশের নেতাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আমাদের বলিতেছেন আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া বসিয়া থাকিও না—সাবেকী নিয়ম কানুনের অনাবশ্যক প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশ্বের দিকে আত্মার গতিকে মুক্ত করিয়া দাও। সত্যই আজ আমাদের চিত্ত মনকে আপন দেশের ভাল মন্দের বিচারের কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না—এখন আমাদের কুসংস্কারের বেড়া ভাঙ্গিয়া বিশ্বের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু সেই বিশ্ব সভায় হাজিরা দিতে যাইয়া যদি বাড়ীর কথা ভুলিয়া যাই সেটা বড় লজ্জার বিষয় হইবে। শুধু লজ্জা নয়—সেইটাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে। এক কথায় বলিতে পারি—আজ, ঘরের কোনে টবের ফুল না হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য, দশজনের সামনে বাগানের ফুল হইয়া অন্য দশ রকম ফুলের সঙ্গে দাঁড়ান। এই রকম করিয়াই বিশ্বের সঙ্গে যোগ সাধন করিতে হইবে। কেবল মন্ত্র আর শাস্ত্র আওড়াইলে যেমন স্বদেশ প্রীতি পূর্ণ হয় না—, তেমি নিজের সমাজ ছাড়িয়া হ্যাট কোট পরিলেও বিশ্বের সঙ্গে যোগ সাধন করা হয় না।

গাছের সঙ্গে মাটির যোগটা তাহার প্রাণগত যোগ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা স্থির সত্য, যে গাছের প্রতি দিনের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতির পক্ষে কেবল মাটিই একমাত্র সহায় নয়। আলো, বাতাস এই সব মাটি ছাড়া বস্তুর সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ট। অথচ গাছের পক্ষে মাটি ছাড়া হইয়া ইহাদের সহিত কোন রকমের যোগ রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং গাছের সঙ্গে মাটির যোগটাই অপরোক্ষ, কাজেই এই যোগটাই গাছের জীবনের বৈশিষ্ট্য—অন্য বস্তুর সঙ্গে যোগটা পরোক্ষ। এই প্রাণগত বৈশিষ্ট্যই বৃক্ষের যথার্থ আশ্রয় স্থল।

(৩)

আজিকার দিনে আমাদের দেখিতে হইবে, আমাদের জীবনের সেই আসল বৈচিত্র্যটি কি, কিসের ভিতর হইতে আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা জীবন পুষ্টির সেই সঞ্জিবনী অমৃতরস আকর্ষণ করিতেছি। একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব—আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য বস্তুরাজ্যে নাই, আছে বস্তুর অতীত ধর্ম্মরাজ্যে, ধর্ম্মের যে আদর্শ বহুর মধ্যে এককে স্বীকার করিয়াছে সেই আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলার মধ্যেই আমাদের আসল বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমের প্রতি অনুষ্ঠানে আমরা দেখিতে পাই কর্ম্মের প্রবল তড়িৎ প্রবাহ। আর ভারতের জাতি সমূহের জীবন ধারার ভিতরে শুনিতে পাই—"শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই সঙ্গীত। পশ্চিম বস্তুরাজ্যেই উন্নতির চরম সাধনা করিতে চাহিতেছে। আর ভারতবর্ষ তাহার সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া বস্তুর অতীত সেই পরম জ্ঞানকে চাহিতেছে। বস্তুর ভিতর দিয়া বস্তুর অতীতকে খুঁজিবার চিন্তা আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বাভাবিকত আমরা বস্তুরাজ্যে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই। এই অক্ষমতাকে অবশ্য বাহবা দিতে পারি না। কারণ, যখন বস্তুরাজ্যে বাস করি তখন বস্তুকে বড় জ্ঞান না করিলেও নিতান্ত ছোট জ্ঞান করা অন্যায়। গীতায় বলা হইয়াছে, কার্য্য করিবে, কিন্তু ফলের কামনা করিবে না। অধুনা আমরা এমনি ধর্ম্ম প্রাণ হইয়া পড়িয়াছি, যে ফলের প্রতি লোভ সম্বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা সম্বরণ করিয়াছি, অর্থাৎ ফলের সঙ্গে কর্ম্মকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। এই রকমের সুবুদ্ধির জন্যই সমাজ পঙ্গু হইয়া গেল। কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ যখন ভাব লোকের ধ্যান করে তখনি তাহার ভাবের সাধনা পূর্ণ হয়, সে ভাব এবং কর্ম্ম এই দুইটারই সত্য যুগপৎ উপলব্ধি করিতে পারে। চিৎ হইয়া শয্যায় শুইয়া ভাবলোকের ধ্যান করিলে সে ধ্যান মানুষের চোখে এবং মনের উপর আফিমের নেশা আনে, মানুষ তখন ক্ষণে ক্ষণে হাঁই তোলে আর কেবল তুড়ি বাজায়।

নানা কারণে আমাদের সমাজে অনেকগুলি ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে। এই ব্যভিচারের যথার্থ কারণ কি এই লইয়া, দেশের চিন্তাশীল নমস্য ব্যক্তিরা নানা রকমের মত দিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র

নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন সমাজে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বড় বেশী শাসন চালাইয়াছি বলিয়া সমাজের প্রাণ শক্তি এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ প্রতি এক ব্যক্তি অর্থাৎ every one individual সমাজেরই অঙ্গ। সেইজন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরই শক্তি এত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধের আলোচনায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন, যে—রাষ্ট্র স্বাধীনতার অভাবেই সমাজে পদে পদে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্ফুর্ত্তিলাভের কোন সুযোগ পাইতেছে না বাস্তবিক পক্ষে উভয় জনের বক্তব্যের মধ্যেই সত্য আছে।

যেদিন হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের সেই পরম আদর্শকে আমরা সাধনা দ্বারা পূজা না করিয়া কেবল শাস্ত্র আর অনুশাসনের কৃত্রিম পুরুৎএর সাহায্যে পূজা করাইতেছি সেইদিন হইতে, আমাদের সব সাধনা মাটি হইয়া গেল। আমাদের আদর্শও ছোট হইয়া গেল। অপ্রিয় সত্য হইলেও এখানে ইহা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, "জগজ্জননী নাম দিয়া যে প্রতিমাকে আমরা চণ্ডীমণ্ডপে পূজা করি, যাঁহার চরণপদ্মে ভক্তির অঞ্জলি দেই সেই জননীর পায়ের উপর হাত দিয়া মণ্ডপে উঠিয়া যদি, কোন ডোম কিম্বা কাওরা অঞ্জলি দিতে চায় অমনি আমাদের গায় কাঁটা দেয়।" তর্কের আসর হইতে নামিয়া আসিয়া কোন হিন্দু কি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারেন "হাঁ জগজ্জননী শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের জননী"। ভাল ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ থাকে, কাণাছেলের প্রতি থাকে না এইকথা যেমন ঘোর মিথ্যা তেমনি নিদারুণ মিথ্যা জগৎমাতা শুধু ভদ্রলোকেরই অঞ্জলি লয়েন,—হাড়ি ডোমের অধিকার নাই তাঁর পায়ে হাত দিবার। যাহা হউক, সামাজিক ব্যভিচার দিয়া জাতির জীবনের বৈশিষ্ট্যের বিচার চলে না। কারণ ব্যভিচারটা বাহিরের একটা ক্ষণিক উন্মাদনা মাত্র, সমাজে যখন প্রাণ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখনি সমাজে ময়লা ঢোকে। সাধনায়, ধ্যানে, যে প্রাণ শক্তি এক সময়ে নানা রকমের আলোকচ্ছটা বিস্তার করিয়াছিল—সে সাধনা, সে জ্ঞানের পূজা আজ নাই, তাই আজ পদে পদে আমরা অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ জীবের মত যেখানে সেখানে কেবলি ঠোকর খাইতেছি। বর্ত্তমান সুসংস্কারের আন্দোলনের পর্ব্বেও আমরা আসল সংস্কারের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, কেবলি ভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পাকা নকল নবীস হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

(৩)

নকল করাটা যেক্ষেত্রে আমাদের কল্যাণ বিধান করে—সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নকলটা ভালো। কিন্তু যেক্ষেত্রে নকলটা আমাদের সঙ সাজায় দিয়া অকল্যাণের অন্ধকারে টানিয়া লইয়া যায় সেক্ষেত্রে নকল করাটা পরিহার্য্য। নকল করিতে যাইয়া যে জাতি আপনার বিশিষ্টতাকে হারায়—সে জাতির সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই, বিফলতার নৈরাশ্য সর্ব্বদিক দিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। অপ্রিয় সত্য হইলেও একথা আজ নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি আমরা সেই প্রাণগত বৈশিষ্ট্যকে প্রবল অনুকরণের এবং অত্যধিক বিধি নিষেধের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা দিয়া বসিয়া আছি। তাই আজ মণিহারা সর্পের গর্জ্জনের মত আমাদের প্রতি কর্ম্মের মধ্যেই শুধু ব্যর্থ গর্জ্জন সেই সঙ্গে গরলোদ্গারই ক্ষণে ক্ষণে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সেই উজ্জ্বল মণির সন্ধান আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে?

কে আসিয়া, অতীত কালের ঋষিদের মত আমাদের আশ্বাস দিয়া বলিবে—

ওঠ জাগ—সত্যের সন্ধানে দৃঢ় চিত্ত লইয়া অগ্রসর হও। সমস্ত দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের পরপারে যে সত্য, সেই মহান্ সত্যের পথে কে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইবে, যাহাকে তাহাকে ছুঁইয়া অন্ন গ্রহণ করিলে, কিম্বা ফোঁটা তিলক কাটিয়া বাহ্যিক আড়ম্বর করিলেই যদি, সেই দুর্লভ সত্যকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রধানদেশে আজ মৃত্যু এমন তাণ্ডব নৃত্য করিত না কিম্বা "সর্ব্বভূতেষু আত্মবৎ" ভাবের প্রাধান্য যে দেশে সেই দেশে "স্পৃশ্য আর অস্পৃশ্যের" বিচার এমন প্রবল ভাবে দেখা দিত না।

পুঁথির বাঁধিগৎ ছাড়িয়া দিয়া এবং শতাব্দ ব্যাপী সামাজিক প্রথা হইতে অনেকটা আলগোছে সরিয়াই আজ

প্রত্যেক নবীন উৎসাহী ভারত সন্তানকে স্থির হইয়া যথার্থ কল্যাণের চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যতের সমাজ নবীন যুবকদের কর্ম্মকীর্ত্তির শক্তি দ্বারাই চালিত হইবে, সেকেলে পুঁথির পুরাণ বাঁধাবুলি কিম্বা প্রবীণদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভবিষ্যৎ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবে এ আশা করা বৃথা। যাঁহারা প্রবীণ তাঁহাদের যাহা দেয় তাহা সুদে আসলে উসুল করিয়া লইয়াছি, পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের ভক্তি প্রণতি জানাইয়া এখন নূতন ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের আদর্শের বীণায়, এতদিন ধরিয়া যে ধূলি যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে চেষ্টা করিয়া দেখিব সেই ধূলি সেই আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া আবার তাহাতে, সুমধুর সুর বাহির হয় কি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্তুর অতীত সেই পরমকে আমরা চাহি তাই আমাদের জীবনের মধ্যে কেবল বস্তুতন্ত্রতার বোঝা নাই। সেই জন্য গরুর দুধ খাই বলিয়া আমরা তাহাকে মাতা বলি। কৃতজ্ঞতার এমন উদার পরিচয়, অল্প দেশেই পাই। তবু বলি সে গৌরবে আমাদের দাবী নাই। এখন গরু আমাদের সামাজিক রীতি বজায়ের মা, মাত্র। সে মাকে ন্যাজে মোচড় দিয়া আবশ্যক হইলে লাঙ্গলে জুড়িয়া দেওয়া কিম্বা কসাইর হাতে বিক্রয় করিতে আমাদের সেণ্টিমেণ্টে তেমন কঠিন ভাবে এখন আর বাধে না। এক কথায় আমাদের মুখের বুলির সঙ্গে কাজে অনেকটা প্রভেদ হইয়া গেছে। যাক্ সে কথা, তবু আজ আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে কেমন করিয়া আদর্শের ছাঁচে সমাজকে গড়িতে পারি। নবীন যুবকদের নিকট বার বার আমার অনুরোধ, তাহারা ভাবুন যে আমাদের ভাবী সমাজের নেতৃত্বের ভার তাঁহাদেরই স্কন্ধে। কাজেই তাঁহাদের দায়িত্ব বেশী।

নিজে খাইয়া পরিয়া সুখে দিনযাপন করা সামাজিক কর্ম্ম নহে। নিজে খাইয়া অন্যকে খাওয়ানর মধ্যেই সামাজিক লোকের সার্থকতা, ছোট বড় সকলকে লইয়াই সমাজের পূর্ণতা। যখন কমলা, একদলকে অর্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্য দলকে, গাড়ি ঘোড়ায় চড়ান তখনি, হাটে বাজারে লুটের হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যায়। দারোগা বাবু লাঠি এবং পুলিশ লইয়া হাটের দক্ষিণে লুট থামাইতে গেলে উত্তরে আবার চুরী আরম্ভ হয়। এর কারণ কি? এর কারণ একদিকে সমাজে মোটর আর ল্যাণ্ড অন্যদিকে ছেঁড়া কাঁথার ব্যবস্থা। কথায় বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যা"। ইংরাজীতে বলে—Empty bag cannot stand up high. খাইতে না পাইলে গরীবে চুরী করিতে বাধ্য হয়। এজন্য গভরমেণ্টকে দোষ না দিয়া দেশীয় ধনকুবের দিগকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ইয়ুরোপে এইজন্য দরিদ্রদের তরফ হইতে ক্যাপিটালিষ্ট অর্থাৎ ধনীদের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সেখানকার নব্য সমাজ সংস্কারক বর্গ অর্থাৎ সোসিয়ালিষ্টগণ, দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি এবং তর্কের আসরে কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছেন। সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দরদ যখন দেখা দেয় তখনি সত্যিকার একটা একতা দেখা দেয়। বরাবর চাষাদের পায়ে ঠেলিয়া বয়কটের সময় যখন তাহাদের ঐক্য প্রার্থনা করা গেল তখন যে তাহারা ভদ্র লোকদের, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিল—সেটা স্বাভাবিক হইয়াছিল। কারণ যে অবহেলা পায় সে অবহেলা করে।

আজ আমাদের কর্ত্তব্য, উদার চিত্তে সকলের প্রতি সকল অবহেলার বাধাকে সরাইয়া ফেলিয়া, উন্নতির প্রশস্ত পথে বাহির হইয়া পড়া। সমাজের মধ্যে একবর্গা ব্যবস্থায় ভেদজ্ঞান রাখিলেই সর্ব্বনাশ। নৌকায় একদিক খালি রাখিলেও যে দিকটা ভারি হয় নৌকা ডোবে সেই দিক দিয়াই। কাজেই সমাজের ব্যবস্থার মধ্যে কোন যায়গায় ওজনের পার্থক্য থাকিলেই ঠিক সেই পার্থক্যের ভিতর দিয়া সর্ব্বনাশের অঙ্কুর গজাইয়া উঠে। একদিকে সমাজের কর্ম্ম ব্যবস্থা অন্য দিকে আমাদের আত্মার উন্নতির জন্য ধর্ম্মের সাধনা এই দুই দিক হইতেই আমাদের সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। যেখানে স্বার্থপরতা দেখা দিবে সেইখানে ধ্বংস।

পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই ত মনুষ্য জীবনের সকল উন্নতি। কাজেই যুগে যুগে সমাজের মধ্যে প্রয়োজন বোধে নানা রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহা কেহ কোন দিন, ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই পারিবে না। সুতরাং আজ সমাজে আমরা যে সব নূতন সংস্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছি পরবর্ত্তী যুগে আমাদের উত্তর বংশীয়গণ এই সকল সমাজিক বিধি নিষেধকেও জীর্ণ মনে করিয়া ত্যাগ করিয়া

নূতন আর একরকম সমাজ গড়িতে পারে। বহুদর্শিতার গুণেই মানুষের বড় জ্ঞান, এই জন্যই ত পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী। বিবিধ জ্ঞানের আহরণেই ত মানুষের জীবনের সেই সঙ্গে চিন্তা শক্তির বিকাশ হয়।

৪

এতক্ষণ ধরিয়া দুইটি কথা লইয়া আমাদের আলোচনা হইল। তন্মধ্যে সমাজের সংস্কার সম্বন্ধেই বোধ করি বেশী বলা হইয়াছে। কর্ম্মের সততার পরেই সমাজ সংস্কারের ভিত্তি। অর্থাৎ আমাদের সকলের মধ্যেই যাহাতে কর্ম্মক্ষমতা সজাগ হয় সে দিকে, আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ললিত কলায়, শিল্পে, সর্ব্বদিকেই আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে প্রসারিত করিতে হইবে। কেবল, দলাদলি এবং ছোট খাটো সামাজিক ব্যাপার লইয়া ঘোঁট পাকান আর পরনিন্দা পরচর্চ্চা, আমাদের অলস এবং অকর্ম্ম জীবনের একটা বাতিক হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও এই বদ্ বাতিকের ঘুন দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনে হয় মন্দ জিনিষটা, বৈজ্ঞানিক মতে না হোক, অন্তত একমতে কতকটা ছোঁয়াচে। কাজেই এই সব হইতে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। জীবনের সম্মুখে কর্ম্ম করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র না থাকিলেই মানুষ ছোট খাটো কার্য্যে মনোনিবেশ করে। যদি সত্যই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতাকে, অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতে চাহি, যদি সত্যই সভ্য জগতের সম্মুখে আমাদের বৈশিষ্ট্যের দাবী এবং গৌরব রক্ষার স্পর্দ্ধা আমাদের থাকে, তাহা হইলে আমাদের উন্নতির পথের যাত্রার অভয় মন্ত্র হোক। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" এই প্রাণবান্ সতেজ মন্ত্র আমাদের মর্ম্মে অক্ষয় কবচের মত বিরাজ করুক। কিছু নয়—একবার যদি আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের পুণ্যজ্যোতি আমাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, আমাদের অন্তরকে আলোকে উজ্জ্বল করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব—সমাজের সকল সংস্কার হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের কণক রশ্মিপাতে যেমন রজনীর অন্ধকার অল্প সময়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায় তেমনি করিয়াই, আমাদের জীবনে আমাদের সত্য জ্ঞানের প্রভাত সূর্য্যোদয়ের হেমকিরণচ্ছটায় জীবনের সকল অন্ধকার দূর হইয়া আমাদের কর্ম্মের প্রতি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সফলতার আনন্দশ্রী ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

বৃদ্ধের স্বপ্ন

(খেয়া ঘাটে)

বহু দূর হ'তে আসি ধীরে অতি ধীরে ধীরে
সাথী যত ক্রমাগত পড়ে সবি খসিয়া;
কেহ যায় দ্রুত চলি—শুনে না মিনতি মোর
সে ত হায়! লুকে যায় মহাশূন্যে মিশিয়া!
যারা ছিল পিছে পড়ি ছুটে তারা তড়্‌তড়ি
কোন্ পথে যায় তারা নাহি পাই খুঁজিয়া।
পিঠে যে বিষম ভার বহিতে পারি না আর!
কেন রে বাড়া'নু বোঝা বৃথামোদে মজিয়া?
ওই—ওই ডুবে রবি (সজীব-সবিত্ত-ছবি!)
হায় রে! আঁধার রাশি আসিতেছে ছুটিয়া!
সাথে আলো নাই মোর—সমুখে তামস ঘোর!
পাটনী ফিরিল বুঝি শেষ খেয়া করিয়া!

"থাম!" থাম! খেয়াতরী, আমি যে রহিনু পড়ি
বৃদ্ধ আমি—অন্ধ আমি যেওনাকো ফেলিয়া;"
একি! যারা যায় চলি পরিয়াছে নামাবলী
আমি যে রে 'নামাবলী' আনি নাই ভুলিয়া!
'বাবা!' 'বাবা!' স্নেহভরে ডাকিল অবোধ শিশু
চকিতে বৃদ্ধের আঁখি খুলিল যখন,
নাই তরঙ্গিত নদী—নাই খেয়া তরীখানি
সম্মুখে দাঁড়ায়ে শিশু প্রসন্ন-বদন

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর বিএ।

কলিকাতার পুরাবৃত্ত

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি
তদ্দেহঃ বিষ্ণুনা ছেত্তুং ধৃয়তোসৌ সুদর্শনঃ।"

বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবী বক্ষে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে, যে যে স্থানে এই সকল অংশ পতিত হইয়াছে সেই স্থানই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা তাহাদের মধ্যে একটি। এই স্থানে সতীর দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠাঙ্গুল পতিত হয়। ইহার আদিম নাম কলিকাতা নহে। সতীদেহের একাংশ এই স্থলে পতিত হইয়া ৺কালীরূপে আবির্ভূতা হ'ন; এই জন্ম ইহার আদিম নাম কালীক্ষেত্র। "কালীক্ষেত্র হইতে "কলাখেতা" ও "কালীকোতা" ও ক্রমশঃ কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন কলিকাতা ৺কালীঘাটের অপভ্রংশ; কিন্তু অনেকেই ইহাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পান না। পরন্তু কলিকাতার দাক্ষণে ৺কালীঘাটের প্রতিষ্ঠিত ৺কালী হইতেই যে কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই।

নিগামকল্পে পীঠমালা নামক শ্লোকে এই সকল একান্নটি তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে কালীক্ষেত্র বাহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত দুই যোজন (১৬ মাইল) বিস্তৃত। গঙ্গার উপরে পীঠভূমি ত্রিভুজাকারে দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ত্রিভুজের তিন অংশে (কোণে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, মধ্যস্থলে ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণে বাহুলা (বেহালা) পরিবেষ্টিত এই ত্রিভুজাকার স্থলখণ্ডের সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর কলিকাতার বিশেষ কোনই প্রভেদ ছিল না। উত্তরে চিৎপুর খাড়ী (creek), দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূর্ব্বে লবণাক্ত হ্রদ (যেখানে আধুনিক শিয়ালদহ অবস্থিত) এবং পশ্চিমে হুগলি পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ড ত্রিভুজাকার। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে আদি গঙ্গা আধুনিক চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ও এখন যে স্থানে শিয়ালদহ অবস্থিত সেই স্থানেই পূর্ব্বে লবণাক্ত হ্রদ ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে আধুনিক কলিকাতা ও পৌরাণিক কালীক্ষেত্র একই স্থান।

১৩০৮ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "নব্য-ভারতে" ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর পোস্ত বাজারে আদিম ৺কালীমন্দিরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পৌরাণিক ইতিবৃত্তে কথিত আছে যে এই ত্রিভুজভূমির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে—অর্থাৎ আধুনিক ভবানিপুরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং বিষ্ণু মন্দির ইহার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে; ও ব্রহ্মামন্দির আধুনিক বাগবাজার চিৎপুরের দক্ষিণে (খোড়োপোস্তা) অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভূমিকম্পে ৺কালীমন্দির মৃত্তিকাকবলিত হইলে পর ঐ মন্দির স্থানান্তরিত করিয়া শিব মন্দিরের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হয়। সেই হইতে সেই স্থানের নাম ভবানিপুর হইয়াছে। ব্রহ্মামন্দির ষোড়শ শতাব্দীতে জলে প্লাবিত হয়। কিন্তু উক্ত স্থানে ১৮৬২ খ্রীঃ পর্য্যন্তও বৎসরে একদিন বহুলোকের সমাগম হইত।

মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে কালীক্ষেত্রের কোনই চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু বল্লালসেনের সময় ইহা কিয়ৎপরিমাণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই সময়ে ৺কালীমন্দিরের পুরোহিত পরিবার রাজ-সরকার হইতে প্রতিপালিত হইতেন। এই সময়ে সিরো ঘোষাল কিংবা শিশো গাঙ্গুলী ৺কালীমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সিরো ঘোষাল সেই পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

বিপ্রদাস বর্ণিত মনসার আখ্যান হইতে জানা যায় যে ১৪৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কালীক্ষেত্র কিংবা কলিকাতা প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। "মনসায়" তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "ত্রিবেণী পার হইয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণ বাসভূমি কুমারহাটা—অধুনা ইহা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর নামে পরিচিত। হুগলির পশ্চিম পারে ঋষিরা ও কোন্নগর এবং পূর্ব্বে শুকচর, কোৎরাহ ও কামারহাটি। চিৎপুরের উত্তরে আড়িয়াদহ ও ঘুষুরি ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের জন্ত বিখ্যাত ছিল।" চিৎপুরের পর কলিকাতার উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু বিশেষ কোন বর্ণনা নাই। কিন্তু ইহার নিকটে বেতোরে (আধু-

নিক বাঁতরা) বেতাইরচণ্ডি মন্দিরের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। বেতোর সে সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য স্থান ছিল। ইহার পর ধালান্দা (ইহা হইতেই বোধ হয় দালান্দা গারদের নাম হইয়াছে) পার হইয়া ৺কালীঘাট। এই স্থানে বণিকগণ ৺কালী পূজা দেন। অতঃপর ৺কালীঘাটের দক্ষিণে চুরাঘাট আধুনিক চুরাপাড়া, তৎপরে জয়ধুলি ও ধানস্থানের পর বারুইপুর অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কলিকাতা ও কালীঘাট বিভিন্ন স্থান ছিল। এবং তখন পর্য্যন্ত এই ৺কালীমন্দির চিৎপুরের সর্ব্বমঙ্গলা দেবী কিংবা, বেতোরে বেতাই চণ্ডির ন্যায় বিখ্যাত ছিল না।

১৫৭৭ খৃঃ হইতে ১৫৯২ খৃঃ মধ্যে মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডিকাব্য রচনা করেন। নায়ক ধনপতি নৌকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিয়া কালীঘাটে ৺কালীদেবীর পূজা করেন। ক্ষেমানন্দ রচিত আর একটি বাঙ্গালা পদ্যে কালীঘাট বেতাই ও বেতোরের সমকক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৭৪০ খ্রীঃ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে কালীঘাটের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ১৪৯৫ খৃঃ এর পূর্ব্বেই কালীঘাটের প্রতিষ্ঠা হইলেও ১৫৯২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইহা সেরূপ সমৃদ্ধিশালী হয় নাই। ১৪৯৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৯২ খৃঃ মধ্যেই কালীঘাটের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া বেতাই ও বিতোরের সমকক্ষ হইয়া উঠে।

২

১৫৮০ খৃঃ ১৫৮২ খৃঃ মধ্যে আকবর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া টোডরমল বাঙ্গালাদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি হিন্দুদিগকে নিজ নিজ ভূসম্পত্তি ও জায়গীর ভোগদখল করিবার অনুমতি দেন। ইহারই অল্পদিন পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া এস্থানে আসেন ও ১৬০৬ খৃঃ তিনি বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন। ইঁহাদিগের শাসনকালে বাঙ্গালায় তান্ত্রিক পূজার পুনরুত্থান হয়; এবং এই সময়ে ভবানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও জয়ানন্দ নামক তিনজন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সরকার সাতগাঁর (আধুনিক যে স্থানে কলিকাতা ও কালীঘাট অবস্থিত) অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। লক্ষ্মীকান্ত ৺কালীমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জায়গীর স্বরূপ পরগণা মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, হাভেলীসহর ও হাতীয়াগড় প্রাপ্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের Permanent settlement এর (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের) সময়ও এই সকল স্থান তাঁহারই বংশধরগণ পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং তদ্‌সহিত কলিকাতা ও কালীঘাট সমৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী সবর্ণচৌধুরীরাই লক্ষ্মীকান্তের বংশধর। ইঁহাদিগের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বসাক ও শেঠ পরিবারের ও পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহারা কলিকাতার উত্তর ভাগকে ৺চিত্রেশ্বরীর নামানুসারে চিৎপুর ও দক্ষিণ ভাগকে তথায় প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবের জন্য গোবিন্দপুর নাম দিয়াছিলেন। এই বিগ্রহ এখনও শ্যামরায় নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই যে প্রতিবৎসর এই স্থানে ছত্রের নিম্নে প্রচুর ভিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা হইতেই ছত্রলুট ও চলিতভাষায় সুতানুটি গ্রামের নাম হইয়াছে। এই বিগ্রহের ইতিবৃত্তে আরও কথিত আছে যে প্রতিবৎসর এই শ্যামরায় ও রাধার দোলযাত্রায় বহুপরিমাণ রক্তকুঙ্কুম তাঁহাদিগের কাছারী পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান হইত। ইহা হইতেই কলিকাতার লালদিঘি, লালবাজার ও রাধাবাজার নামের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং এইরূপে অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে তখন বসবাস ছিল, সবই প্রায় দেবদেবীর নামে পরিচিত হয়,—যেমন শিবতলা, কালীতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, পঞ্চাননতলা ও ষষ্ঠীতলা। এই ইতিবৃত্ত অনুসারে আধুনিক চৌরঙ্গী তদ্‌কালীন ৺কালী চেরাঙ্গী হইতে উদ্ভূত। অন্য পক্ষে কেহ কেহ বলেন যে চৌরঙ্গী স্বামী এই স্থানে আসিয়া বাস করেন, ও তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম চৌরঙ্গী হইয়াছে।

কলিকাতার প্রাচীন জমিদারগণের পারিবারিক ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে হাট, বাজার; ও পুষ্করিণীর পশ্চিমে তাঁহাদিগের পাকা কাছারী গৃহই আধুনিক কলিকাতার প্রথম ভিত্তি। ইহা হইতে হাটখোলা,—পরবর্ত্তী হাটখোলা ও বড়বাজারের নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে সবর্ণ জমিদারগণই প্রাচীন কলিকাতার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হন। এতদ্ব্যতীত ৺কালীমন্দিরের একজন

অধ্যক্ষ ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার আত্মীয় রামগোবিন্দ রামশরণ ও যাদবেন্দ্রও এস্থানের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারা গোবিন্দপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদিগের সামাজিক ও নৈতিক সংসর্গবাস ইচ্ছুক আরও অনেক হিন্দু পরিবারও ক্রমে এস্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহারাজ নবকৃষ্ণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত দেবও এই সময় এইখানে আসিয়া বসবাস করেন। সাতগাঁয়ের প্রসিদ্ধ বণিক্ শেঠ ও বসাক পরিবারও অতি প্রাচীনকালে গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারা নিজ হস্তে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁহাদেরই অধ্যবসায় ও যত্নে গোবিন্দপুর ও সুতানুটি ক্রমে প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া উঠে ও তাহার ফলে ইংরাজ বণিকগণ যখন বাঙ্গলায় আসেন তখন তাঁহাদিগের দৃষ্টি প্রথমেই এই প্রসিদ্ধ বন্দরের উপর পতিত হয়; এবং পরে তাঁহাদিগেরই চেষ্টায় কলিকাতাবাসিগণ বেতোরে পর্টুগীজদিগের বাণিজ্যের উন্নতি বুঝিতে পারে। তাঁহারা সেখান হইতে উঠিয়া কলিকাতায় আসিয়া অধুনিক ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক তুলার কুঠি নির্ম্মাণ করেন (algodam)। উহা হইতেই এখনও পর্য্যন্ত ক্লাইভ ষ্ট্রীটের উক্তস্থান 'আল্‌গুদাম' নামে পরিচিত। এই সময়ে ওলন্দাজগণ বেতোর ও কীদিরপুরের মধ্যবর্ত্তী হুগলী নদীর শুষ্কতল খনন করেন; এবং যে সকল নৌকা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঐ খাল বাহিয়া যাইত তাহাদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। ইংরাজী Toll (শুল্ক) কে তাঁহারা Zoll বলিতেন; ও ইহা হইতেই কলিকাতার ঐস্থান ব্যাঙ্ক জোল (Bankzoll) ও পরে ব্যাঙ্কশাল (Bankshall St.) নামে পরিচিত হইয়াছে।

আধুনিক জোড়াসাঁকো যেস্থানে অবস্থিত উক্তস্থানে পূর্ব্বে একটি ছোট নালা ছিল। কলিকাতার প্রাচীন জমীদারগনের যত্নে ঐ নালার উপর দুইটি পুল নির্ম্মিত হয়। তদবধি উহা জোড়াসাঁকো নামে পরিচিত।

আধুনিক ৺কালীমন্দির ষোড়শ শতাব্দীর ৺কালীমন্দির হইতে প্রায় একাধিক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে ৺কালীমন্দির আধুনিক ভবানীপুরের মধ্যে ছিল। সবর্ণ পরিবার এই সময়ে দুই অংশে বিভক্ত হন। এক পরিবার হালীসহর ও অপরটি বঁরিসাতে বসবাস করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাঁহারা এইস্থান দ্বয়ের মধ্যে এক রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। আধুনিক রসারোড্ চৌরঙ্গীরোড্, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্, চীৎপুর রোড্ বারাকপুর রোড্ এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ ঐস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষরোপিত হইয়াছিল। লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত সুন্দর ঘাট, উভয়পার্শ্বে বৃক্ষগুল্ম আচ্ছাদিত মনোহর রাজপথ পক্ষীকূজন মুখরিত হইয়া পল্লী কলিকাতার সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিত।

এই সময়ে যে সমস্ত হিন্দুগণ কলিকাতায় বসবাস করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে চিৎপুরে দেওয়ান শ্রীহরিঘোষের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর ঘোষ; হলওয়েলের অধীনে কৃষ্ণ জমীদার (Black Zamindar) নামে পরিচিত গোবিন্দরাম মিত্র এবং আধুনিক হাটখোলার দত্তপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্ত সুতানুটিতে, ও পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন।

হাটখোলার দত্তগণ বলেন যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্তের নামে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছিল; কিন্তু শেঠবংশধরগণ বলেন যে তাঁহাদিগের স্থাপিত গোবিন্দ-বিগ্রহ হইতেই গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই সকল পারিবারিক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে পৌরাণিক আখ্যায়িকাবর্ণিত কালীক্ষেত্র ক্রমশঃ চিত্রপুর আধুনিক চীৎপুর, ছাত্রলুট আধুনিক সুতানুটি, গোবিন্দপুর, চেরাঙ্গী অধুনা চৌরঙ্গী, ভবানীপুর এবং কালীঘাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থান দেবদেবীর মাহাত্ম্যের জন্যই বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা আরও ধারণা করিতে পারি যে আখ্যায়িকাবর্ণিত ত্রিভুজাকার কালীক্ষেত্রে বহু দেব দেবীর মন্দির ছিল; এবং এই সকল দেবদেবীর নামানুযায়ী অধুনা বিভিন্ন স্থানের নাম হইয়াছে।

বেতোর (অধুনা বাঁত্‌রা) ও গার্ডেনরীচে ওলন্দাজ ও পর্টুগীজদিগের বাণিজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া সাতগাঁ হইতে বণিকগণ ক্রমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে অনেক বস্ত্রব্যবসায়ীগণও (weavers) এই স্থানে আসিয়া তুলার ব্যবসা করেন, এবং পর্টুগীজগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। এই সময়ে কৃষিকার্য্যেরও অনেক

উন্নতি হয়। তখন ৺কালীমন্দির ভিন্ন পুষ্করিণির পার্শ্বে একখানি পাকা কাছারী ঘর, নদীতটে অবতরণ করিবার এক নির্জ্জন সোপান এবং উভয় পার্শ্বে বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত দুইটি কাঁচা পল্লীপথ মাত্র কলিকাতার সভ্যতার একমাত্র চিহ্ন ছিল। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত খাড়ী ও নালা এখনও অনেক বিদ্যমান আছে, যদিও উহারা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আদি গঙ্গা অধুনা চৌরঙ্গীর মধ্যে ছিল, ক্রমে উহা স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবানিপুরের মধ্য দিয়া অধুনা কালীঘাটে অবস্থিত হইয়াছে। ৺কালীমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহও অধুনা কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কালীঘাটে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রীটিশ বণিকগণের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গলার পৌরাণিক ইতিবৃত্তও পারিবারিক ইতিহাস হইতে পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কলিকাতার ইতিহাস আমরা এইরূপ জানিতে পারি।

(৩)

মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গলায় আসিবার পূর্ব্বে এ স্থান বিদ্রোহ ও অসন্তোষের লীলাভূমি ছিল। কিন্তু মানসিংহের সুশাসনে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইলে পর কিছুদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্য দেখা যায়। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে বাণিজ্য ব্যবসার ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

পর্ত্তুগীজ সেনানায়ক রডার সাহায্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে মাতলায় রায়গড়ে (অধুনা গার্ডেনরীচ), বেহালা, টানা (tanna), সাল্‌কিয়া, আত্‌পুর (মুলাজরের নিকটবর্ত্তী ও চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এইরূপ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নদী তখন ক্ষুদ্র নালার মত ছিল। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ভিন্ন আর কিছু যাতায়াত করিতে পারিত না। এই সময়ে নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী নদীগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিল, এবং সাতগাঁয়ের নিকটবর্ত্তি ত্রিবেণীর পরপারে হালীসহরে এক বৃহৎ চড় পড়িতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে যমুনা নদী ক্ষুদ্র নালায় পরিণত হয়। এই সময়ে সাতগাঁয়ের নিকটে সরস্বতী নদীও ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করে। ফলে ভাগীরথী (অধুনা হুগ্‌লী নদী) বৃহদায়তন হইয়া উঠিল, এবং আদি গঙ্গা ও ভাগীরথির পূর্ব্বপারে যে সমস্ত খাল বিল ও ক্ষুদ্র নদী ছিল সমস্তই শুকাইয়া উঠিল।

এই সময়ে প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে বন্দী হন। তাঁহার অধীনে যে সমস্ত লোক ছিল তাহাদের অনেকেই এই সকল স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে অনেক পর্টুগীজ ও আর্ম্মেনিয়ান ও ছিল। ১৫৯৯ খৃঃ তাহারা একটী চার্চ্চ নির্ম্মাণ করেন ও জীবিকার্জ্জনের জন্য কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হন। ইহারা সকলেই লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের জমীদারির এলাকায় বাস করিতেন। এই সময়ে হালী সহর, নিমতা, ত্রিবেণী ও যশোহর হইতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণও কলিকাতা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে ভাগীরথির আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় ও সরস্বতী শুকাইয়া যাওয়ায় সাতগাঁয়ের বণিকগণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন ও ক্রমে সাতগাঁয়ের সমস্ত বানিজ্য কলিকাতায় উঠিয়া আসে। চেতোব সরস্বতী ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। সাতগাঁয়েব সহিত ইহার বাণিজ্য চলিত। এ স্থানের বাণিজ্য রক্ষার্থে প্রতাপাদিত্যের পর্টুগীজ সেনানায়ক রডা ইহারই নিকট টানায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু সাতগাঁয়ের বাণিজ্যের অবনতির সহিত এ স্থানেরও বাণিজ্যের পতন হয়। ফলে ১৫৪০ খৃঃ হইতে সমস্ত পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য বেতোর হইতে হুগ্‌লীতে আনিত হয়। ইহারই ৫৯ বৎসর পরে এই স্থানে পর্ত্তুগীজগণ তৎকালীন মুসলমান বাদ্‌সার নিকট হইতে একটি দুর্গ ও একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য নদী সকল শুকাইয়া যাওয়ায় পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা সকল ভাগীরথি দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করে ও ফলে উহার উভয় তটে অনেক নূতন গ্রাম ও সহরের সৃষ্টি হয়। এইরূপে ছাত্রলুট (সুতানুটী), কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর ও ইহাদের দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালীঘাট ও উত্তরে চিত্রপুর গ্রাম ক্রমে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। তখন পর্য্যন্ত কেবল নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামে লোকের বসবাস ছিল। উহার

পশ্চাতে নিম্নভূমি সকল বৃষ্টিতে ও জোয়ারের সময় জলপ্লাবিত হইয়া যাইত। এই সকল স্থানে কৃষিকার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইত না। গোবিন্দপুর ও কালীঘাটের মধ্যে পূর্ব্বে যে স্থানে আদি গঙ্গা অবস্থিত ছিল, উহার উত্তর পার্শ্বে একটি খাড়ী ছিল। ইহা ভাগীরথি হইতে বহির্গত হইয়া বালুঘাটার মধ্যদিয়া লবণাক্ত হ্রদে গিয়া মিশিয়াছিল। তদপেক্ষা আর একটি ছোট নালী গোবিন্দপুর ও কলিকাতার মধ্যে ও আর একটি কলিকাতা ও সুতানুটীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। নদীতটে উচ্চ-ভূমিখণ্ডকে ডিহি বা বস্তী বলিত। এই বস্তীর উপরই তখন গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানটী গ্রাম অবস্থিত ছিল। এই বস্তীর সংলগ্ন একটী পথ চিৎপুরের সহিত কালীঘাট সংযুক্ত করিয়াছিল। এখন যে স্থানে চিৎপুর রোড্ সেই স্থানে পূর্ব্বে সুতানুটি গ্রাম ছিল। আধুনিক হাটখোলা ঘাটকে সে সময়ে সুতানুটি ঘাট বলিত। ইহারই নিকটে একটি বাজার ছিল,—উহাকে সুতানুটী বাজার বলিত। উত্তরে বাগবাজার খাল, পূর্ব্বে অপার সার্কুলার রোড্। পশ্চিমে হুগ্‌লী নদী ও দক্ষিণে রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট্ সে সময়ে সুতানুটির সীমারেখা ছিল। গোবিন্দপুরের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। সেখানে কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁচা বাড়ী ও তন্মধ্যবর্ত্তি স্থান সকল জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। অধুনা যে স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম অবস্থিত ঐ স্থানেই পূর্ব্বে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল। চাঁদপাল ঘাটের বেঙ্গলব্যাঙ্কের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভাগীরথি হইতে একটি খাল বাহির হইয়া চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া আধুনিক সিয়ালদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে নিকারী, জালিয়া, পোঁদ প্রভৃতি মৎস্যব্যবসায়ীগণ রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া থাকিত।

সাতগাঁয়ের বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় হুগ্‌লী প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। পর্টুগীজ ও ওলন্দাজগণ ১৬২৫ খৃঃ ইহারই নিকটে চিন্‌সুরায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৬৪৫ খৃঃ গ্যাব্রিয়েল ব্রাউটন (Gabriel Broughton) সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারাকে কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া বাদসাহ দরবারে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করেন ও বাঙ্গলার নবাব সা সুজার সহিত রাজমহলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৫২ খৃঃ তিনি বাদসার নিকট হইতে ইংরাজদিগকে বিনাশুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে দিবার অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ব্রীজ্‌ম্যান ও ষ্টীফেন্স নামক দুইজন ইংরাজ বণিক হুগ্‌লীতে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৮৬ খৃঃ ইংরাজদিগের সহিত সায়েস্তা খাঁর বিবাদ উপস্থিত হইলে, উহারা হুগ্‌লী প্রভৃতি স্থান হইতে বহিষ্কৃত হন। চার্ণক্ সেই সময়ে প্রথম সুতানুটিতে আসেন। ১৬৮৭ খৃঃ নবাবের সহিত সন্ধি হইলে পর তিনি পুনরায় সুতানুটিতে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার স্থানে ক্যাপ্তেন হীথ্ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের সহিত বিবাদ করিয়া শেষে মান্দ্রাজে পলাইয়া যান। সায়েস্তা খাঁর পর ইব্রাহিম্ খাঁ বাঙ্গলার মস্‌নদে আরোহণ করিয়া মান্দ্রাজের ইংরাজদিগকে পুনরাহ্বান করেন। ইহার ফলে ১৬৯০ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট চার্ণক তৃতীয়বার সুতানুটিতে পদার্পণ করেন, ও তথায় কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহাই ইংরাজ কলিকাতার সূত্রপাত।

ইংরাজগণ সুতানুটিতে কুঠি নির্ম্মাণ করিলে পর উহার চতুষ্পার্শ্বে আর্ম্মেনিয়ান ও পর্টুগীজগণ আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। অতঃপর ১৬৯৫ খৃঃ আয়ার (Eyre) জায়গীরদারের নিকট হইতে সুতানুটি ও তদ্‌পার্শ্বস্থ গ্রামদ্বয় লইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হ'ন। ইহার পর বৎসর ১৬৯৬ খৃঃ সুবাসিং বিদ্রোহী হ'ন। ফলে ইংরাজগণ নবাবের নিকট হইতে আপনাপন কুঠিরক্ষা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে হুগ্‌লীর শাসনকর্ত্তা জইনুদ্দিখাঁর সাহায্যে ইংরাজগণ আজিম্-উস্-সানের (Azim-us-shan) পুত্র কুমার ফারুক সাহারের (Farruck Siyar) অনুগ্রহ লাভ করেন। অতঃপর ১৬৯৮ খৃঃ ফারুক সাহারকে ১৬০০০৲ টাকা যৌতুক দিয়া তাঁহারা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হ'ন। ইহার পর তাঁহারা ১৩০০৲ টাকা দিয়া রামচাঁদ রায়, মনোহর প্রভৃতির নিকট হইতে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের মৌজা ক্রয় করেন। আমরা এইস্থলে সেই বয়নামার ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Copy of the deed of purchase of the villages

Dihikalkatah &c. bearing the seal of the *quzi* and the signature of the Zamindars :—

(*Bainamah*)

"We submissive to Islam, declaring our names and descent (Viz) Munohar Dat son of Bas Deo, the son of Raghu, and Ram Bhadar, the son of Ram Deo, son of Kesu ; and Pran, the son of Kalesar, the son of Gouri ; and Manohar Singh, the son of Gandarb, the son of........ ; being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by the law ; avow and declare upon this wise, that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the village *Dihikalkatah*, and *Sutanuti* within the jurisdiction of *Parganas Pacyan* and Kalkatah, to the English Company with rents, and uncultivated lands and ponds and groves and rights over fishing and wood lands and dues from resident artisans, together with the lands appertaining thereto, bounded by the accustomed notorious and usual boundaries, the same being owned and possessed by us (up to this time the thing sold being in fact and in law free from adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer) in exchange for the sum of one thousand and three hundred rupees, current coin of this time, including all rights and appurtenances thereof, internal and external ; and the said purchase money has been transfered to our possession from the possession of the said purchaser and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, and we have become absolute guarantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward, the defence thereof is incumbent upon us ; and henceforth neither we nor our representatives absolutely or entirely, in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries, nor shall the charge of any litigation fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered these few sentences that when need arises they may be evidence. Written on the 15th of the month Jamadi I in Hijree year 1110, equivalent to the 44th year of the reign full of glory and prosperity."

অতঃপর ইংরাজগণ উক্ত মৌজাত্রয় বিদ্রোহী সুবাসিং এর নিকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতি সত্বর পূর্ব্বারব্ধ দুর্গ সুসম্পন্ন করেন ; এবং ১৭০২ খৃঃ আরম্ভ করিয়া ১৭০৬ খৃঃ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট প্যালেস্ নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে সুবাসিং এর অত্যাচারে ধনী দরিদ্র অনেকে এইস্থানে আসিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে বাস্ করিতে থাকেন।

সুবাসিং এর বিদ্রোহে ইংরাজদিগের আর এক প্রকার সুবিধা হয়। এতাবৎ ইংরাজবণিকগণ দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। কোম্পানী নিযুক্ত কেরাণীগণ একদল ও স্বাধীন বাণিজ্যব্যবসায়ীগণ আর একদল গঠিত করেন। ১৬৯৮ খৃঃ স্বাধীনব্যবসায়ীদল ইংলণ্ড হইতে রাজসনদ্ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে ইংলিস্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে অভিহিত করেন। এই দুই পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা চলিত। সুবাসিং যখন বিদ্রোহী হ'ন, তখন লণ্ডন কোম্পানি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও ফলে সেই সময়ে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডন কোম্পানীর সহিত এই সময়ে (১৭০২ খৃঃ) সম্মিলিত হ'ন ও ফলে দুইদল একীভূত হইয়া ১৭০৪ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্টি হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তৃত করিতে থাকেন। ইহাতে আজীম উস্সান ও জাফর আলিখাঁর ঈর্ষার উদ্রেক হয়। সে সময়ে কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি চক্লার অধীনে ছিল। হুগলীর শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেন। ফলে ইংরাজবণিকগণ মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান।

ইংরাজগণ কুমার ফারুক সাহারকে ১৬০০০৲ টাকা দিয়া কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উক্ত গ্রামত্রয় খাল্সার অধীনে ছিল। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ইহার জায়গীরদার ছিলেন। ইংরাজগণ যখন রাজসনদ্ প্রাপ্ত হন, তখন লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণই এই জমীদারীর উত্তরাধিকারী ছিলেন। নবাবের নিষেধ স্বত্বেও বিদ্যাধর রায় ইংরাজ বণিকদিগকে সুতানুটিতে বসবাস করিতে ও আপনার জমীদারীর কাছারী ঘর অধিকার করিবার অনুমতি দেন। কথিত আছে যে এই অপরাধে তিনি নবাব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দৃষ্টিবন্দী থাকেন। অতঃপর ইংরাজগণ রাজসনদ্ প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার বংশধরগণ উহাদিগের নিকট এই গ্রাম তিনটি ১৩০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন। এই বিক্রয়ের ফলে ইংরাজগণ সবর্ণ জমীদারীর সমস্ত স্বত্বপ্রাপ্ত হন। জায়গীর পূর্ব্বের খাল্সার অধীনেই থাকে। ফলে ইংরাজদিগকে ডিহি কলিকাতার জন্য ৪৬৮৷৷/১৫, সুতানুটির জন্য ৫০১৸৴১০ ও গোবিন্দপুরের জন্য ১২৩৸৴৫ কর দিতে হয়। এইরূপ কর বৎসরে তাঁহাদিগকে তিনবার দিতে হইত (১লা এপ্রিল, ১লা আগষ্ট, ও ১লা ডিসেম্বর)। কিন্তু এই সকল কর আদায়কারীদিগের অত্যাচারে ইংরাজগণ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ফলে ১৭০৭ খৃঃ তাঁহারা সার্মান (Surman) ও খোজা সুরহদ্ (Khoja Surhaud) নামক দুইব্যক্তিকে দিল্লীদরবারে প্রেরণ ও কার্য্যোদ্ধার হইলে খোজা সুরহদকে ৫০,০০০টাকা পুরস্কার দিবেন, এই অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা বাদ্সার নিকট সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দ পুরের পার্শ্বস্থ অন্যান্য গ্রামগুলি ক্রয় করিবার অধিকারের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে তাঁহারা জায়গীর স্বত্বের জন্য কোনরূপ প্রার্থনা করেন না। সুরহদের চেষ্টায় তাঁহারা এই অনুমতি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে তাঁহারা বিনাশুল্কে এই সকল স্থানে বানিজ্য করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইংরাজগণ নদীর উভয়পার্শ্বে উত্তরে বরাহ-নগর ও দক্ষিণে খিদিরপুর ইহার মধ্যবর্ত্তি গ্রাম সকল ক্রয় করেন।

সম্রাটের আদেশস্বত্বেও বাঙ্গালার নবাব এই সকল গ্রামের জমীদারদিগকে ইংরাজদিগের নিকট স্বত্ব বিক্রয় করিতে নিষেধ করেন। জমীদারগণ বিক্রয় ইচ্ছুক হইলেও নবাবের ভয়ে ইংরাজদিগের নিকট ইহা বিক্রয় করিতে সাহসী হয়েন নাই! কিন্তু ইংরাজগণ কৌশলে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করিতে সক্ষম হন; এবং জায়গীরদারদিগকে ইহার কর দিতে অস্বীকার করেন। জায়গীরদারগণ পূর্ব্ববর্ত্তি জমিদারগণের নিকট হইতে উক্ত জমিদারীর কর আদায় করেন। তালুকদার-গণের নিকট হইতে ইংরাজগণ এই সকল জমিদারী ক্রয় করেন। ফলে জমিদারগণ তালুকদারদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করেন, ও নবাবের নিকট এই ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু ইংরাজ বণিকগণ ইহাতেও বিচলিত হন নাই; ফলে ১৭০৭ খৃঃ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংরাজ অধিকৃত এই সকল গ্রামের খাজনার কোন প্রকার বন্দোবস্ত হয় না। ইংরাজগণ এই সময়ের মধ্যে সালিকা (সাল্কিয়া), হাবিরা আধুনিক হাওবা কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুব, বেতোর অধুনা বাঁতরা, ডাকুনি পাকুপাবা (দক্ষিণ পাইকপাড়া), বেলবাসিয়া (বেলগাছিয়া), দক্ষিণদারী, হোগলচুন্দি অধুনা হোগল-কুড়িয়া উল্টাঢাং (উল্টাডিঙ্গি), সিমিলিয়া অধুনা শিমলা, মাকন্দ (মাকন্দা), কোমরপাড়া (কামারপাড়া), কাঁসার গামছিয়া (কাঁকরগাছি), বাগমারী, আরকুলি, মিরসাপুর (মির্জ্জাপুব), শিয়ালদা, কুলিয়া, তাঁজারা (তেজরা), সুন্দা (সুরা), বাদ্সুন্দা (বাহিরসুরা) সেকুপাড়া (সিকপাড়া) দোলান্দ (দালান্দা), বাসুগি (বিরজী), তিলতলা (তিলজালা), তোপসিয়া, সাপগাসি (সাপগাছি), চোবোগা (চৌবাগা), চেরাঙ্গী (চৌরঙ্গী), কোলিঙ্গা (কলিঙ্গা), গোবোয়া (গোবরা), বাহির দক্ষিণদারী,

সিঁকামপুর (শ্রীরামপুর), জোলা কলিঙ্গা (জালকলিঙ্গ), গোন্দালপাড়া (গোন্দলপাড়া), হিন্তালী (ইতালী), চিৎপুর এই ৩৮টি গ্রাম ক্রয় করিয়া ভোগ দখল করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নবাবের পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শনেও তাঁহারা খাজনা দিতে স্বীকৃত হয়েন না।

১৭৫৪ খৃঃ হলওয়েল নওয়াজী মালিক ও রশিদ্ মালিকের নিকট হইতে ২২৮১৲ টাকা দিয়া সিম্‌লার পাট্টা ক্রয় করিয়া উহা দখল করেন। কিন্তু নন্দলাল মজুমদার এই সিম্‌লার জমিদার ছিলেন, ও নওয়াজী মালিক তালুকদার ছিলেন। দরবারে ইহা বিক্রয় করিবার কোন স্বত্ব ছিল না! ইতি পূর্ব্বে ১৭৪৭ খৃঃ নন্দলাল রাজদরবারে নওয়াজী মালিক ও রাসবিহারী শেঠের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের ইংরাজি অনুবাদ আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Badshah Muhammad Shah Ghazi, Victorious, year 1155 *Hijra*, humble servant Sayyid Muhammad Khan Bahadur.

The petition of Ram Ram, Vakil (of Nandalal, Proprietor of Pergana Khaspur etc, appertaining to Chukla Hooghly.

Mauza Baliaghata has yielded but small rent as the taluka of Manik Chand Sett. But as Dewan Mulichand used foul language towards petitioner, petitioner paid the revenue in full. But this humble servant has always paid revenue according to the amount of collection mentioned in Court. Last year Rash Behari Sett, son of Manik Chand, obtained a *Sanad* by an intrigue with Bhajan Singh, and took possession of the ghat in the said Village Baliaghata (to which he had no right as talukdar). This year the ghat is as usual, in the possession of Nandalal, my client. But now Rash Behari has collected a lot of low people at the ghat, and may very likely make an attack upon my client. Secondly, Nawaji Malik of Calcutta, without any reason, has taken the possession of Mauza Simla, and has procured a got up *Sanad* although I always pay the prescribed revenue in the fixed time.

The petitioner, therefore, humbly prays to the Government for the favour of issue of an order upon Muhammad Yar Begkhan for enquiring into these matters, and settlement of the disputes.

ইহার ফলে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর মহম্মদ ইয়ার বেগ্‌কে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ইহার মীমাংসা করিবার অনুমতি দেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনই ফল হইল না। জমিদারী নওয়াজীর এলাকায় থাকিল ও রাজকর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং ১৭৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত নন্দলালকেই এ সকল খাজনা দিতে হয়। উক্ত বৎসর সরকার হইতে এইরূপ আদেশ জারী হয়।

Year 1162 Hijra, Ahmad Shah Bahadur Ghazi, year 1st Badshah, Ghazi Muhammad Yar Begkhan

"Know ye all chiefs, raiyats, cultivators of Mauzah Simla of this division and also ye Amla in parganna Manpur, chukla Hooghly, Sarkar Satgaon, that on the death of Nawaji Mali and Rashid Malik, Talukdars, Rustom, son of Nawaji defaulted to pay his rent, and never came to Calcutta now inhabited by the English and thereby incurred the liability of a considerable amount of arrears of the royal revenue, upon the payment of which depended his talukdership, and that therefore it is now declared on the revenue being realised from Nandalal chowdhury, the superior proprietor. that the estate is made over to (the khas possession of) the said Nandalal Chowdhury as per details recorded below, and that the said Chowdry shall remain in possession thereof and pay the revenue in due time into the royal treasury.

The chiefs, raiyats and cultivators shall acknowledge that Chowdry as their *independent talukder*, and pay him the rents, and they shall not acknowledge *any other man as his equal or partner*. They must acknowledge this as an obligation.

The 4th Rajab, 7th year of the August Accession.

Total collection—Rs 127. 7. 15 Mauzah Simla—Rs 50. 12 16 gondas 2 cowries Mauzah Makla—Rs 76. 10. 18 gondas 2 cowries	Paragana Manpur, chukla, Hoogly, Surkar Satgaon.

কিন্তু ইহাতেও কোন ফল দর্শিল না। কেহই এ আদেশে কর্ণপাত করিল না। ইংরাজদিগের আধিপত্য ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। এবং ইহার কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করেন ও ১৭৪২ খৃঃ মীরহাবীব যখন হুগ্‌লী অধিকার করেন, সেই সময়ে এই সকল স্থানের অনেক লোক কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল।

৫

১৭৫৭ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজগণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি করিয়া এই ৩৮টি গ্রামের সমস্ত জমিদারীস্বত্ব প্রাপ্ত হন। ইহারই পর বৎসর ১৭৫৮ খৃঃ সুবাদার জফর আলিখাঁর সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পি ও উত্তরে মহারাষ্ট্রডীচের পার্শ্বস্থিত সমস্ত গ্রামের মৌজা প্রাপ্ত হ'ন। (১) সুতানুটি ও বাজার, (২) ডি কলিকাতা, (৩) গোবিন্দপুর ও বাজার, (৪ মির্জাপুর, (৫) হোগল কুড়িয়া, (৬) সিমলা, (৭) চৌরঙ্গী, (৮) বীরজি, (৯) জোলা কলিঙ্গা, (১০) ডীচের অপর পারে কতকটা স্থান, (১১) আমহাতী, (১২) কীসপুর পারা (১৩) মাকুন্দা, (১৪) বাহির বীরজি, (১৫) বাহির শ্রীরামপুর, (১৬) শ্রীরামপুর, (১৭) দালান্দা, (১৮) ধালদাঙ্গা (১৯) সিন্নালদহ, (২০) দক্ষিণ পাইকপাড়া, (২০½) মৌজা মালঙ্গ, অন্তর্বর্ত্তি অধুনা যেস্থানে মহারাষ্ট্র ডীচ সেইস্থানে অবস্থিত গনেশপুরের অর্দ্ধ মৌজা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহারা সন্ধির স্বত্ব অনুসারে চব্বিশ পরগণার জমিদারী ও উপরোক্ত মৌজার বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার সনদ্ প্রাপ্ত হন। আমরা এই সনদের ইংরাজী অনুবাদ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

A translation of the Sunnad for the Zamindari of the Hon. East India Company's lands given under the Seal of the Nawab Alloo Dowlah Mir. Mahomed Saddockhan Bahadoor Assadjang Diwan of the Subah of Bengal.

To the Matsuddies for affairs for the time being and to come, and chowdries and Kanungoes and inhabitants and husbandmen of the Kismut parganas of Calcutta etc., of the Sarcar Santgaum, etc., belonging to the Paradise of Nations. Subah of Bangala, be it known that in consequence of the Ferd Sawa (signed by the Glory of the Nobility and Administration Sujah-ul-Mulk Hoossein-a-Dowla Mir Mahomed Jafir Khan Bahadur, Mahbat Jung Nazim of the Subah and the Ferd Huckeekut and Muchilka signed conformably thereto, the terms of which therein fully set forth, the office of the Zamindari of the parganas above written in consideration of the sum of Rs 20,101 (twenty thousand one hundred and one rupees) pres cush etc., to the Imperial Sarker according to the endorsement from the month Pous (1164) in the year eleven hundred and sixty four of the Bengal era, is conferred upon the noblest of merchants the English Company—to the end that they attend to the rites and customs thereof as is fitting, nor in the least circumstance neglect or withhold the vigilance and care due thereto; that they deliver into the Treasury in the proper times the due rents of the Sarcar; that they behave in

such a manner to the inhabitants and lower sort of people that by their good management the said parganas may flourish and increase ; that they suffer no robbers, nor house-breakers to remain within their districts and take such a care of the king's highways that the travellers and passengers may pass and repass without fear and molestation ; that (which God forbid) if the effects of any person be plundered or stolen, they discover and produce the plunderers and thieves, together with the goods, and deliver the goods to the owners, and the criminals to condign punishment, or else that they themselves be responsible for the said goods ; that they take special care that no one be guilty of any crime or drunkenness within the limits of their Zamindari, that after the expiration of the year they take a discharge according to custom, and that they deliver the accounts of their Zamindari, agreeable to the stated forms, every year into the duftercana of their Sarcar, and that they refrain from demanding the articles forbidden by the Imperial Court (The asylum of the world).

It is their (The Mutsuddies etc) duty to look upon the said Company as the established and lawful Zamindar of these places ; and whatsoever appertains or is annexed to that Office is their right. In this particular be they strictly punctual. Dated the first Rubbee Ossance in the third Sun of the reign.

অতঃপর ইংরাজগণ কলিকাতা ক্রমশঃ সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া উহাকে "আলীনগর" বলিয়া অভিহিত করেন ; এই সময়ে উঁহার তিন মাইল দক্ষিণে নগরের প্রধান অধিনায়ক বাস করিতেন। উক্তস্থান তদবধি আলিপুর নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। ১৭৫৮ খৃঃ মীরজাফর ইংরাজদিগকে আর একটি সনদ্ দেন। উহাতে আলীনগরের নাম্ পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় কলিকাতা দেওয়া হয়।

উইলসন্ বলিয়াছেন :—

"The first English settlement at Sutanuti, seems to have consisted of mud and straw hovels with a few masonry buildings. Its chief defence was the flotilla of boats lying in the river. The renewed settlement established by Charnock in 1690 was of the same nature, but as time went on, the number of masonry buildings increased."

ফোর্ট ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থিত কতক স্থান লইয়া আধুনিক কলিকাতার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬৯৮ খৃঃ আজীম উস্সান ইংরাজদিগকে এইস্থানে ৫০৭৬ বিঘার যে সনদ দেন, তন্মধ্যে সে সময়ে ৮৪০ বিঘা বাসোপযোগী ছিল। অবশিষ্ট নালা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কালে দ্বাদশশতাব্দীর এই জলাজঙ্গলময় হিন্দু কালীক্ষেত্র ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ-কলিকাতায় পরিণত হয়।

১৭২৬ খৃঃ হইতে ১৭৩৭ খৃঃ মধ্যে ইংরাজগণ চৌরঙ্গীতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। গোবিন্দপুর ও চৌরঙ্গীর মধ্যে তখন এক বিরাট জঙ্গল ছিল। এইস্থানেই অধুনা গড়ের মাঠ অবস্থিত।

ফোর্টের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে, একটি রাস্তা বাহির হইয়া হুগলী নদীতে মিশিয়াছিল। উহাকে তখন কেল্লাঘাট বলিত। ইহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধুনা কয়লাঘাট হইয়াছে।

১৬৯০ খৃঃ জবচার্ণক্ ঘোষণা করেন যে যাহারা সুতানুটিতে বাস করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা কোম্পানি অধিকৃত যেস্থানে ইচ্ছা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ইহার ফলে অচিরেই বহুলোক অন্যান্য স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া সুতানুটিতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৭০৪ খৃঃ সরকার হইতে এইরূপ নিয়ম করা হয় যে অধিবাসীদিগের নিকট হইতে যে অর্থ শাস্তিস্বরূপ সংগৃহীত হইবে উহা দ্বারা সহরের উন্নতি সাধিত হইবে। উক্ত বৎসর

একজন প্রধান ও ৪৫ জন অন্যান্য পিয়ন, দুইজন চোবদার, এবং ২০ জন গোয়ালা সরকার হইতে নিযুক্ত করা হয়। পরবৎসর সহরের কয়েক স্থানে চুরি ও ডাকাতি হওয়ায় একজন ফর্পরাল্ ও ৬ জন সৈনিক নিযুক্ত হয়, ও নগর কোতোয়ালের গৃহে তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার পরও সহরে চুরি ও ডাকাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতঃপর ইহার পর বৎসর অতিরিক্ত ৩১ জন পাইক্ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়।

এই সময় পুতিগন্ধময় নালা ও পুষ্করিণীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ঘটে। দুর্গের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ছোট ছোট বস্তী, গাছ ও পুতিগন্ধময় নালা ছিল। ইহার ফলে ১৭০৭ খৃঃ আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাস মধ্যে কলিকাতার ১২০০ শত ইংরাজের মধ্যে ৪৬০ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭১০ খৃঃ এই সকল স্থান পরিষ্কৃত করিয়া স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি সাধিত হয়।

১৭২৭ খৃঃ একজন মেয়র (Mayor) ও ৯ জন সদস্য (alderman) লইয়া কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে সহরের কর আদায় ও রাস্তাঘাট উন্নতি করিবার ভার স্থানীয় জমীদারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। কর্পোরেশন সহরের কোন প্রকার উন্নতি সাধন করে নাই। পরন্তু এই সময় দেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

১৭৪৯ খৃঃ এই সকল পুষ্করিণী ও নালা পরিষ্কৃত করাতে ইহার জল পানোপযোগী হয়। ১৭৫২ খৃঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া পুড়াইয়া ফেলিবার জন্য আদেশ করা হয়। কিন্তু এযাবৎ বর্ষাকালে কলিকাতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ার কোনই বিরতি ছিল না।

১৭৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কোন প্রকার ভাল পাকা রাস্তা সৃষ্টি হয় নাই। এই সময়ে কলিকাতা হইতে বারাসাত পর্য্যন্ত একটী কাঁচা রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়া সকলে সান্ধ্য ভ্রমণ করিত। ১৭৬২ খৃঃ কলিকাতার পার্শ্বস্থিত সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া নূতন রাস্তার সৃষ্টি হয় ও এই সকল রাস্তা পর্য্যবেক্ষণাদিরও ব্যবস্থা হয়।

এই সময়ে চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ১৭৬৪ খৃঃ হাসপাতালের ডাক্তারদিগের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল উত্থাপিত হয়; ও তাহার ফলে এইরূপ ঘোষিত হয় যে, কৌন্সিলের সদস্যগণ প্রত্যেকেই এক একবার করিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করিবেন। সে সময়ে পুরাতন দুর্গের মধ্যে হাসপাতাল অবস্থিত ছিল, ও সাধারণতঃ সৈন্যদিগের জন্যই ব্যবহৃত হইত। ইহারই নিকটে একটী গোরস্থান ছিল। উহার পুতিগন্ধে সে সময়ে জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। ফলে ১৭৬৮ খৃঃ একটী নূতন হাসপাতাল ও নূতন গোরস্থান নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প হয়।

১৭৪৬ খৃঃ হইতেই ইংরাজগণ চৌরিঙ্গিতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু এ যাবৎ যাহার যে স্থানে ইচ্ছা গৃহ নির্ম্মাণ করায় উহার মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছিল না।

কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর বায়ুর জন্য উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ নদীর নিকটে অন্যান্য স্থানে বাগান বাড়ীতে বসবাস করিতেন। এইরূপ ক্লাইভ দমদমায়, সার উইলিয়ম জোন্স গার্ডেন রীচে, সার আর চ্যাম্বারস্ ভবানীপুরে ও জেনারাল ডিকেন্সন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন।

১৭৭০ খৃঃ কলিকাতায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়; ও ইহার ফলে কলিকাতার লোক সংখ্যার প্রায় একতৃতীয়াংশ অকালে মৃত্যু কবলিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর মধ্যে কলিকাতার রাস্তায় ন্যূনাধিক ৭৬০০০ লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

কিন্তু ১৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত ও কলিকাতার বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় না। এ যাবৎ নদীর পারে ও রাস্তার উপর পর্য্যন্ত ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত। এই সকল মৃতদেহ পচিয়া এক বীভৎস দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিত। হেষ্টিংস্ ও ফ্রান্সিসের সময়ে এখানে চুরি ও ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ঘটে ও কলিকাতাবাসীগণ ইহাতে এতদূর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন যে তাহারা সমস্ত রাত্রিই প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়া দিতেন। এখন যে স্থানে ফরডাইস্ লেন অবস্থিত ঐ স্থানে বিশেষতঃ ডাকাতির উপদ্রব অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠে। উক্ত স্থান এখন পর্য্যন্ত "গলাকাটা গলি" নামে পরিচিত। কথিত আছে যে রাত্রে ওপথে যে যাইত তাহারই প্রাণনাশ হইত। সাধারণের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে ১৭৮৫ খ্রীঃ কলিকাতা নিম্নোক্ত ৩১টি থানায় বিভক্ত হয়। (১) আর্ম্মেনিয়ান চার্চ্চ, (২) ওল্ড ফোর্ট, (৩) চাঁদপাল ঘাট, (৪) সাউথ অফ্ দি গ্রেট ট্যাঙ্ক, (৫) ধরমতলা, (৬) ওল্ডকোর্ট

হাউস, (৭) দমটোলা ,(দমটুলি), (৮) আমড়াগলি ও পঞ্চানন্দতলা (পঞ্চাননতলা), (৯) চীনাবাজার, (১০ চাঁদনি চক্ (১১) জলবাজার, (১২) গোলন্দা পোকের, (১৩) চক্রকডাঙ্গা, (চবকডাঙ্গা), (১৪) শিমুলা বাজার (১৫) ঠনঠনিয়া বাজার, (১৬) মোলাঙ্গা ও পুতুলডাঙ্গা (পটলডাঙ্গা), (১৭) কোবের ডিঙ্গার (গোবরডাঙ্গা), (১৮) বৈঠকখানা, (১৯) শ্যামপুষ্করণী (শ্যামপুকুর), (২০) শোমবাজার (শ্যামবাজার), (২১), পদ্মপুকেরিয়া (পদ্মপুকুর), (২২) কুমারটুলি, (২৩) জুড়াসাঁকো (জোড়াসাঁকো), (২৪), মৎস্য বাজার (মেছুয়া বাজার), (২৫) জানবাজার, (২৬) ডিঙ্গাভাঙ্গা, (২৭) সুতানুটী হাটখোলা, (২৮) দইহাটা, (২৯) হাঁসাপুকুরিয়া (হাঁসপুকুর), (৩০) কলিম্বা (কলিঙ্গা), (৩১) জোড়াবাগান, কিন্তু তথাপি রাস্তা ঘাটের অপরিচ্ছন্নতা ও চুরি ডাকাতি সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল না।

১৭৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ও কলিকাতার কর আদায় করা, শান্তিস্থাপন করা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা প্রভৃতি সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় জমিদারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এ যাবৎ তাঁহারা বিশেষ কোন উন্নতি করিতে না পারায় ১৭৯৪ খৃঃ সহরের জন্য জাস্টিসেস্ অভ্ দি পিস্ নিযুক্ত হয়। তাঁহারা দ্রুত সহরের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন, এবং অবিলম্বে সাকুলার রোড একেবারে পাকা করিয়া ফেলিলেন।

১৮০৫ খৃঃ ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটির সৃষ্টি হয়, এবং উক্ত কমিটি ১৮১৪ খৃঃ লটারি কমিটিতে পর্য্যবসিত হয়। এই কমিটি প্রতি বৎসর লটারির টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিতেন, ও উক্ত অর্থদ্বারা সহরের সাধারণ উন্নতিসাধিত হইত। তাঁহারাই প্রথম কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করেন, ও পুরাতন কলিকাতা ভাঙ্গিয়া আধুনিক কলিকাতার ভিত্তি স্থাপিত করিয়া যান। তাঁহাদেরই অধ্যবসায় ও যত্নের ফলে, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট, উড্ ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালীস স্কোয়ার, কলেজস্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ওয়েলেস্লি স্কোয়ারের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এরূপভাবে অর্থসংগ্রহ করায় ইংলণ্ডে এই লটারি কমিটির বিরুদ্ধে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে ১৮৩৬ খৃঃ এ কমিটি ভাঙ্গিয়া যায় ও ইহার স্থলে লর্ড অকল্যাণ্ড ফিভার হস্পিটাল কমিটি নিযুক্ত করেন ও স্যার জন্ পিটার গ্রাণ্ট উক্ত কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এখন হইতে তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্নে কলিকাতা দিন দিন উন্নত ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে থাকে।

*　　*　　*　　*

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে কলিকাতা বা কালীক্ষেত্রের মধ্যস্থলে কালীমূর্ত্তি ও তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মন্দির ছিল। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে এই সকল বিগ্রহ হইতেই চীৎপুর, সুতানুটি, গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট, লালদিঘি, লালবাজার, বীরজি ও নীবজিতলা (ব্রজনাথ হইতে উৎপত্তি), ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা, শিবতলা, কালীতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, বাধাবাজার, চোরঙ্গী, চড়কডাঙ্গা ও বথতলার নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ৺কালীমন্দির কলিকাতা হইতে অধুনা কালীঘাটে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এইরূপ নামকরণ প্রথা ক্রমে লোপ পাইল, তখন স্থানীয় প্রাকৃতিক কোন বিশেষ চিহ্ন হইতে স্থানের নাম নির্দ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপ বটতলা, নিমতলা, নেবুতলা, কদমতলা, বেলতলা বইঞ্চিতলা, বাশতলা, গাবতলা, ঝাউতলা, আমড়াতলা, বাদামতলা, তালতলা, চাঁপাতলা, দালিমতলা, প্রভৃতি স্থান সকল উহার নিকটবর্ত্তী বিশিষ্ট বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। যদিও এই সকল স্থানের অধুনা বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, তথাপি উহা উক্ত নামেই প্রায় পরিচিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা যে স্থানে পদ্মপুকুর অবস্থিত উক্তস্থানে পূর্ব্বে একটী পুকুর ছিল, ঐ পুকুরে প্রচুর পদ্ম ভাসিত। ইহা হইতে উক্ত স্থানের নাম পদ্মপুকুর হইয়াছে। হিন্তালী হইতে হিন্তালীর নাম হইয়াছে। শিমুল বৃক্ষ হইতে শিমুলিয়া ও শিমলিয়া ও পরে শিমলার উৎপত্তি হইয়াছে। অধুনা যে স্থানে হোগলকুড়িয়া সে স্থানে পূর্ব্বে বহু হোগলা নির্ম্মিত গৃহ ছিল। উহা হইতেই হোগলকুড়িয়া হইয়াছে। নারিকেল বৃক্ষ হইতে নারিকেলডাঙ্গা হইয়াছে। পুষ্করিণীর পার্শ্বে বহুগোলপাতা জন্মাইত বলিয়া উক্ত স্থান গোলপুকুর হইয়াছে। মৃত্তাজপুর (পুর—গৃহ—অর্থাৎ মৃত্তিকা গৃহ) হইতে মির্জাপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, ও ইহারই নিকটে ঠনঠনিয়া, ইহার নাম ইটের মত শক্ত মাটী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপ ঝামা ও পুকুর হইতে ঝামাপুকুর হইয়াছে। অধুনা যে স্থানে পটলডাঙ্গা

উক্ত স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর পটল উৎপন্ন হইত, ও উহা হইতেই উহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। হেছুয়া হ্রদের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হয়। অধুনা যে স্থানে উল্টাডিঙ্গি, সে স্থানে পূর্ব্বে গোবিন্দপুর খাড়ী ছিল। সেই খাড়ীর মধ্যে নৌকাদি অনেক সময় উলটাইয়া যাইত, সেই হইতে উহার নাম উল্টাডিঙ্গি হইয়াছে।

আবার কলিকাতার কতকগুলি জায়গা স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপ মেছুয়াবাজার, শিকারীপাড়া, কলিঙ্গা, মোলাঙ্গা, নিমকপোস্তা (লবনের ব্যবসা হইতে), মুচিপাড়া, মুচিবাজার ইত্যাদি।

অতঃপর কলিকাতায় বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় ও ব্যবসায়ী লোকের সমাগম হইতে আরম্ভ হইলে তাহাদিগের জন্ম বিভিন্ন স্থান বা পাড়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ইংরাজগণের আগমনের অল্পকাল পরেই পর্টুগীজগণ আসিয়া অধুনা যে স্থানে মুর্গিহাটা উক্ত স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহারা গৃহে মুরগী পুষিতে থাকেন। ইহাতে হিন্দুগণ ও স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র আসিয়া বাস করেন ও উক্ত স্থান তদবধি মুরগিহাটা নামে পরিচিত। এইরূপে আর্ম্মেনিয়ানরা যে স্থানে বসবাস করিতেন, সে স্থানকে আর্ম্মেণিয়াটোলা বলা হইত। ইহার পর পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার লোকসংখ্যা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সরকার হইতে সরকারনিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার আদেশ হয়। অতঃপর হলওয়েল তাঁহার প্রজাদিগকে তাহাদের ব্যবসা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহা হইতেই কুমার হইতে কুমারটুলী কলু হইতে কলুটোলা, জালিয়া হইতে জেলেটোলা, ডোম হইতে ডোমটুলি, গোয়াল হইতে গোয়ালটুলি, আহির (খেহারী গোয়ালা) হইতে আহিরীটোলা, কসাই হইতে কসাইটোলা, পটুয়া (চিত্রকর) হইতে পটুয়াটোলা, সাঁকারী হইতে সাঁকারীটোলা, বেপারী হইতে বেপারীটোলা, কম্বুলিয়া (যাহারা দেশী কম্বল বিক্রয় করিত) হইতে কম্বুলিটোলা, হাড়ী হইতে হাড়ীপাড়া, কাঁসারী হইতে কাঁসারীপাড়া, কামারপাড়া, কামারডাঙ্গা, মুসলমানপাড়া, উড়িয়াপাড়া, দর্জ্জিপাড়া, খালাসীটোলা, ধোপাপাড়া, তেলীপাড়া বেনিয়াটোলা, বেনিয়াপাড়া, ছুতারপাড়া, জুগিপাড়া, তাঁকরাপাড়া, শিকদারপাড়া ইত্যাদি।

এই সময় কলিকাতার বাজার সংখ্যায় বৃদ্ধি হয় ও যে সমস্ত প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই সকল বাজারে বিক্রয় হইত, তাহা হইতে এই সকল স্থানের নাম নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। যথা দরমাহাটা, দরমাগলি, সব্জিমহল, মেছোহাটা, আম্‌হাট (আম হইতে), দইহাটা, (দধি হইতে) ময়রাহাটা, সুতাহাটা, চিনিপটী, সিন্দুরেপটী, চাউলপটী ইত্যাদি।

ফকীর পীর মাণিকের নামানুসারে মাণিকতলার নাম হইয়াছিল। উক্ত স্থান ব্রীটিশ আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরাজগণের আগমনের পর পর্য্যন্ত বহুদিন যাবৎ হুগলীর ফৌজদার লোয়ার চিৎপুর রোড্ ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলের কিছু উত্তরে যে মস্‌জিদ্ বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে মাঝে মাঝে আসিয়া বিচার করিতেন। তদবধি উক্ত স্থান ফৌজদারী বালাখানা নামে পরিচিত; এবং উহার উত্তরে মাত্র একটী বাজার ছিল। এই বাজারকে তখন সুবাবাজার (বাঙ্গলায় সুবার বাজার) বলিত। ইহাই এখন শোভাবাজার নামে পরিচিত। অধুনা যে স্থানে বৈঠকখানা রোড ও বহুবাজার সম্মিলিত হইয়াছে উক্ত স্থানে পূর্ব্বে মুদিগণের দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য একটী বৈঠক বসিত। ইহা হইতেই বৈঠকখানা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বহুবাজার ষ্ট্রীটে পূর্ব্বে বহু ছোট ছোট বাজার ছিল বলিয়াই বোধ হয় উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই বাজার তৎকালীন স্থানীয় জমিদার বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়ের পুত্রবধূর স্বত্বাধীনে ছিল, এবং ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে (বধূ—বৌ) বৌবাজার নামের উৎপত্তি হয়।

ইংরেজদের আগমনের পর কলিকাতার বাণিজ্যের উন্নতির সহিত লোকদিগের প্রচুর অর্থোন্নতিও হয়; ফলে অনেক ধনীপরিবার এই সময় পাকাবাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সকল বাগান বাড়ীর নামানুযায়ী অনেক স্থানের নাম সৃষ্টি হয়। এই সকল বাগান হইতে ব্যারেটো, সুকিয়া, বসাক ও হজুরিমলের নাম হইয়াছে। অধুনা যে স্থানে বাগবাজার অবস্থিত উক্ত স্থানে ক্যাপ্টেন পেরিণের এক মনোরম বাগানবাড়ী ছিল। পূর্ব্বে কোম্পানির মেম্বরগণ অনেকে এই স্থানে থাকিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ চৌরঙ্গী অঞ্চলে উঠিয়া আসিলে উক্ত বাগান ২৫,০০ টাকায়

বিক্রয় হয়। ইহা হইতেই অধুনা এ স্থানে (বাগ-বাগিচা-বাগান) বাগবাজার নামে বিখ্যাত। মিঃ সার্ম্মাস সে সময়ে বেল্‌ভিডিয়ারের মালিক ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে এই বাগানবাড়ী নিলামে বিক্রয় হইলে ক্যাপ্টেন টলি (Captain Tully) ইহা ক্রয় করেন, ও পরে উহা হেষ্টিংস্ পুনরায় ক্রয় করিয়া লন। উক্ত ক্যাপ্টেন টলি নিজ ব্যয়ে টালি নালার শুষ্কতল খনন করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে উহার নাম হইয়াছে। কিন্তু কথিত আছে যে বেলভিডিয়ার বাগান প্রথম ১৭০০ খৃঃ আজীম উস্‌মান প্রস্তুত করেন; ও উক্ত স্থানে হুগলীর শাসনকর্ত্তা মধ্যে মধ্যে বসবাস করিতেন। কর্ণেল ওয়াটসনের (Colonel Watson) নামে ওয়াটগঞ্জের নাম হইয়াছে। অধুনা বেলগাছিয়ার পাইকপাড়ার রাজার বাগানবাড়ী পূর্ব্বে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ছিল। তাঁহার নিকট হইতে ইহা ঠাকুর পরিবারের হস্তগত হয়। কিন্তু ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন, ও এই সময় তিনি উহা পাইকপাড়ার রাজার নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এইরূপ বাগান হইতে বহুস্থানের নামকরণ হইয়াছিল; ও অদ্যাবধি সে সকল স্থান সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে—যথা চোরবাগান—(এ স্থানে পূর্ব্বে জঙ্গল ছিল ও তন্মধ্যে অনেক সময় চোর লুকাইয়া থাকিত), মেঁহেদিবাগান, বাদুরবাগান (এ স্থানে বাদুরের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল), ইত্যাদি। সে সময়ে নদী হইতে একটি রাস্তা উল্টাডাঙ্গিতে উমিচাঁদ ও গোবিন্দরাম মিত্রের জোড়াবাগান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ও ইহা হইতেই উক্ত স্থান জোড়াবাগান নামে পরিচিত। অধুনা যে স্থানে হাতীবাগান অবস্থিত উক্ত স্থানে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকারের পর সমস্ত হাতী রাখিয়াছিলেন; ও উহা হইতে হাতীবাগান নাম হইয়াছে। এইরূপে ফুলবাগান, পালবাগান, কলাবাগান, নারিকেল বাগান, বকুলবাগান, হরিতকিবাগান প্রভৃতি স্থানের নাম হইয়াছে। লটারি কমিটির পুরষ্কার পাইয়া সে সময়ে কেহ অধুনা যে স্থানে স্বর্ত্তিবাগান অবস্থিত সেই স্থান ক্রয় করেন। তদবধি উহা স্বর্ত্তি (লটারি) বাগান নামে পরিচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু বাগান বাড়ীর মালিকদিগের নামানুসারে অনেক স্থানের নাম হইয়াছে। এইরূপে শেঠবাগান, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, রামবাগান (রামরায় হইতে), রাজাবাগান (রাজা রাজবল্লভ হইতে), নন্দন বাগান (নন্দরাম সেনের প্রমোদ উদ্যান হইতে), মোহন বাগান (রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা গোপীমোহন দেবের নামানুযায়ী), রায়বাগান, শিঙ্গিবাগান, বসাকবাগান, বামুনবাগান, বিবিবাগান, গুল মহম্মদের বাগান, শিকদার বাগান তাঁতীবাগান, কেরাণিবাগান (এইস্থানে সেই সময়ে কেরাণিগণ বাস করিত) ইত্যাদি।

এইরূপে কলিকাতায় লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও তদ্‌সহ সহরের সৌন্দর্য্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ও রাস্তা ঘাটের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে ব্যক্তি বিশেষের নামানুযায়ী সমস্ত রাস্তা ঘাট নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে।

কলিকাতার পশ্চিমভাগে কুমারটুলি, হাটখোলা জোড়াবাগান ও বড়বাজার অঞ্চলে বহু দেশী ধনীব্যক্তি বসবাস করিতেন। উক্ত স্থানে তাঁহারা বড় বড় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রায় দুর্লভচাঁদ, রাজা মাণিকচাঁদ ও ফটেচাঁদ এই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। উমিচাঁদ সে সময়ে লালদিঘির উত্তরে বাস করিতেন। বৈষ্ণবদাস শেঠ, হুজুরিমল ও গোবীসেন সে সময়ে বড় বাজারে বাস করিতেন। সাল্‌কিয়ার অপরপারে মারহাট্টা ডীচের উত্তরে চিৎপুরের নবাব রেজাখাঁর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। ইঁহারা সকলেই সে সময়ে প্রসিদ্ধ ও প্রচুর অর্থশালী ছিলেন। তাঁহাদের নামে অনেক প্রবাদবাক্য লোকমুখে চলিত আছে। "লাগে টাকা দেবে গৌরিসেন" গৌরিসেন সে সময়ে তাঁহার উদারতা ও দানপরায়ণতার জন্য সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের নামে অনেক ছড়া সে সময়ে লোক মুখে চলিত ছিল—

১। নন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
হুজুরিমল্লের কড়ি
বনমালী সরকারের বাড়ী॥

২। গোবিন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি
নকুধরের কড়ি
মথুর সেনের বাড়ী॥

কলিকাতার মানচিত্র

চিৎপুর খাড়ী
সুতানুটি
কলিকাতা
খাড়ী
গোবিন্দপুর
ভবানীপুর
কালীঘাট
মানচিত্র।

দক্ষিণেশ্বর
চীৎপুর খাড়ী
ব্রহ্মমন্দির
কালীমন্দির
কলিকাতা
গোবিন্দপুর খাড়ী
মহেশ্বর মন্দির
মানচিত্র।

ব্রাটিশ আগমনের সমসাময়িক কলিকাতার মান চিত্র।
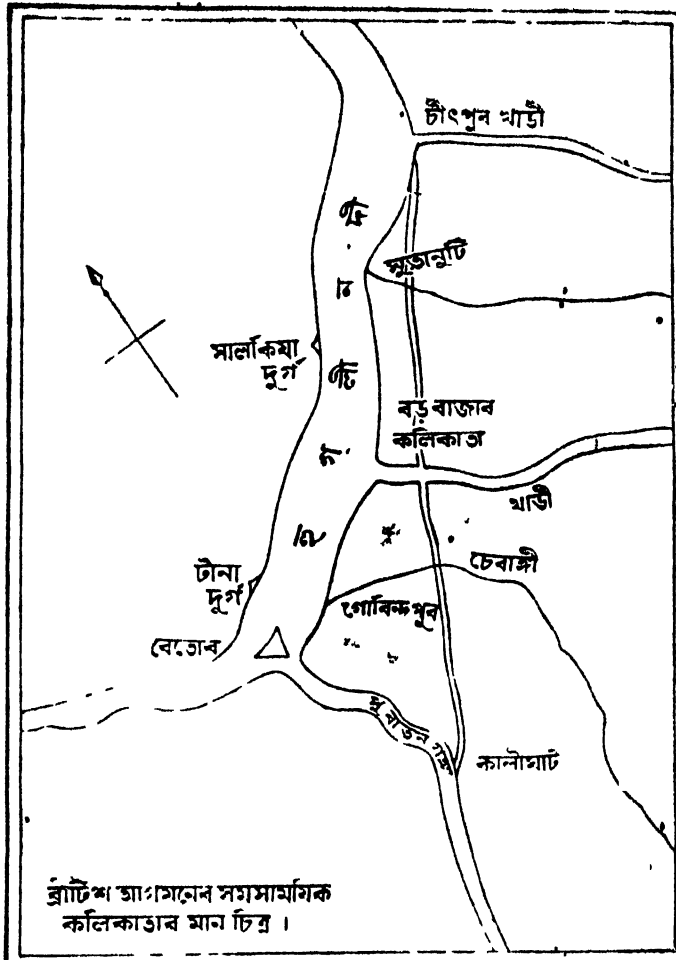
এইরূপে তাঁহাদের নাম সে সময়ে প্রায় প্রত্যেকের মুখেই শুনা যাইত।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী সে সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পর ব্রীটিশশক্তির ক্রমোত্থানের সহিত কলিকাতার শ্রীসৌন্দর্য্য শতধা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে ১৮৭২ খৃঃ হাইকোর্ট, ১৮৭৯—৮৪ খৃঃ মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংস্, ১৮৭৭—৮২ খ্রীঃ মধ্যে ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট ও ট্রেজারি বিল্ডিংস্, ১৮৯৯ খ্রীঃ নিউ কাষ্টম হাউস্, জেনারেল পোষ্ট আফিস, ১৮৭১ খৃঃ পোর্ট কমিশনার্স বিল্ডিংস্, সেণ্ট পলস্ ক্যাথেড্রল, সেণ্ট জেমস্ চার্চ্চ, ১৮০৯ খ্রীঃ বেঙ্গলব্যাঙ্ক, ১৮৩২ খ্রীঃ মীণ্ট, এসিয়াটিক মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারী, ১৮৯৫—১৮৯৮ খ্রীঃ মধ্যে জেনারেল হস্পিটাল, ১৮৮২ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল ও ইডেন হস্পিটাল, ১৮৯৭ খ্রীঃ লেডী ডাফ্রিন্ হস্পিটাল, সিনেট্ হাউস্, ১৮৫৪ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কয়েক বৎসর হইল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্ম্মিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এদেশীয় অনেক ধনী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি বড় ও মনোরম বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাথুরিয়া ঘাটায় মহারাজা সার্ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসাদ দুর্গ, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীটে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার (ইহা পূর্ব্বে স্বর্গীয় সার তারকনাথ পালিতের কোন পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল), চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের "মার্ব্বেল প্যালেস্", সার্কুলার রোডে দিঘাপটিয়ার রাজবাড়ী, জানবাজারে রাণী রাসমনির বাটী, ঝামাপুকুরে রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ, পরেশনাথের মন্দির, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও রাজা শ্রীকৃষ্ণমল্লিকের বাটী, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহন রায়ের গৃহ, আলীপুরে কুচবিহারের মহারাজার উডল্যাণ্ডস্ বর্দ্ধমানের মহারাজার

বিজয়মঞ্জিল, টালিগঞ্জে নবাবের বাটী ও লোয়ার চিৎপুর রোডে স্বর্গীয় মির্জা মেহেদির আবাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্যালেসই কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম অট্টালিকা। ১৭৯৭খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইহা ডার্বি-শায়ারের "কেডেলষ্টন হ'লের" মডেলে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন ১৮০৪খৃঃ ইহা সম্পূর্ণ হয়। রয়েল ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন উইয়াটের (Captain Wyatt) উপর ইহার নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হয়। উক্তস্থান সে সময়ে ৫০,০০০টাকায় সরকার হইতে ক্রয় করেন। সমস্ত বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১৩০০০০০তের লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ও ৫০,০০০টাকার আসবাব ক্রয় করা হয়।

এইরূপে অতিধীরে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সেই আখ্যায়িকা বর্ণিত দুর্গম বনাকীর্ণ খাল বিল নালা সঙ্কুল কালীক্ষেত্র আধুনিক শোভাসম্পদশালী কলিকাতায় পরিণত হইয়াছে। তখনকার খাল বিলের উপর এখন বিস্তৃত রাজপথ, ডোবার স্থলে সুন্দর উদ্যান পরিবেষ্টিত পুষ্করিণী ও জীর্ণ হীন মৃৎকুটীরের স্থলে রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা এখন কলিকাতাকে বর্ত্তমান সভ্যজগতের নগর সম্প্রদায়ের ভিতর উচ্চস্থান দিয়াছে। একাধিক দশলক্ষ লোকের আবাসভূমি এই বিরাট জনপদ যে এক সময়ে কয়েকটি অতিক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি ছিল তাহা এখন কল্পনায় অলীক স্বপ্নের মত বোধ হয়। কিন্তু এই বিশাল হর্ম্ম্যোদ্যান-রত্নসঙ্কুল city of palacesএর সহিত সেই দীন হীন তদানীন্তন কালীক্ষেত্রের আজ কত প্রভেদ! কালের কি বিচিত্র গতি!

শ্রীসুশীল সেন।

"অপূর্ব্ব সাধ"

সাধ যে কত হৃদে আমার নিত্য নব জাগে,
সাহস করে কইনি কারো কাছে,
কি জানি তা' তাদের পাশে কেমনতর লাগে,
হেসেই যদি ওঠে তারা পাছে।

যদিই ওঠে বলে তারা—এমন ধারা ক্ষ্যাপা—
সারা জগৎ জুড়ে কোন খানে,
এ' যাবৎ ত কোন দিনও যায়নি পাওয়া ছাপা!"
কাজকি, তাহা থাকুক আমার প্রাণে।

ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলিয়ে, দুলিয়ে গাছের পাত,
আজকে বহে হেমন্তেরি বায়;—
কঠিন হ'ল আজ যে আমার ঠিক রাখা এ মাথা,
শুধু কথা গোপন রাখাই দায়!—

ওপারের ওই কুঞ্জ হ'তে, আকাশ-পথ দিয়ে,
আস্‌ছে যে ঐ পাখীর কলতান;—
সাধ হয়েছে আজ্‌কে আমার—ওইখানেতে গিয়ে,
তাদের সনে আমিও ধরি গান।

গভীর বনে যেথায় খেলে কুরঙ্গমচয়,—
মনের সুখে বেড়ায় দিশি দিশি,—
সেখানে সে' নিবিড় বনে ইচ্ছা যেতে হয়;
সাধ মনেতে—তাদের সনে মিশি।

তাদের সনে হেথা হোথা বেড়াই আমি ছুটি';
শ্রান্ত আমি পড়্‌ব হয়ে যবে,
আমলকীর ওই গাছের ছায়ে পড়্‌ব আমি লুটি,'
নিদ্ আসিবে পাখীর কলরবে।

সাধ যে আমার মিশে রহি সবুজ পাতার সনে,
ফুলের সনে আমিও হাসি দুলি;—
মনের যত কথা আছে, জানাই সমীরণে,—
দুখেরে যাই এ' জগতের ভুলি'।

বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে আছে কতইযে আনন্দ,—
কতই হাসি, কতইযে গান আর,—
সে' সব কি হায়, আমার বেলা রইবে হয়ে বন্ধ?
কেহই কি হায়, খুলবে না তার দ্বার?

তোমরা সবে হাস্‌ছ বুঝি উপহাসের হাসি?
কেউবা সখা কর্চ্ছ বুঝি রোষ?
আজকে আমার প্রাণের মাঝে বাজছে কিসের বাঁশী,
আজকে আমায় দিওইনাকো দোষ।

শ্রীঅজিতকুমার সেন

স্বামি-স্ত্রী

(গল্প)

(১)

ছোট সহরটির একধারে ছোট ছোট কতকগুলি বাসা, পাঁচ সাত কি বড় দশ টাকা—মাসিক ভাড়া সব এই রকম। কয়েকজন গরীব মাষ্টার ও কেরাণী এই সব বাসা ভাড়া করিয়া পরিবার লইয়া থাকিতেন। ঘরগুলি প্রায়ই টিনের দোচালা কুড়ে। দুপুরে পুরুষরা সব ইস্কুলে কি আপিসে যাইতেন,—সেখানে পাকা কোঠা কি খড়ের বাংলার মধ্যে টানা পাখার হাওয়ায় স্নিগ্ধ আরামে কাজ করিতেন। আর মেয়েরা তখন ছোট ছোট ছেলে পিলেগুলি লইয়া সেই সব আগুনের মত টিনের চালাগুলির নীচে দীর্ঘ অবসর কাল ছটু ফটু করিয়া কাটাইত, ঘন ঘন জলন্ত দীপ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, কখন লম্বা বেলাটা পড়িবে. ঘরের চাল আর গাটা মাথাটা একটু জুড়াইবে। পাড়ার এক পাশ দিয়া একটা খাল গিয়া সম্মুখের দিকে নদীতে পড়িয়াছে, খালের উপরেই নাতি উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিচিত্র উদ্যানে ও ময়দানে পরিশোভিত রাজাবাহাদুরের বাসাবাড়ী। সহরের ও সহরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের জমির মালিক তিনি। স্থায়ী একটা কাছারী সেখানে ছিল। আর মধ্যে মধ্যে রাজাবাহাদুর নিজেও কখন সক করিয়া আসিয়া কিছুদিন থাকিতেন। খালের পাড়ে কতকগুলি গাছ ছিল,—রাজাবাহাদুরের বাসাবাড়ীর দৃষ্টি হইতে দরিদ্র চাকুরেদের ছোট বাসাগুলি আবৃত করিয়া রাখিত। তবে মেয়েরা খালে গিয়া স্নান করিয়া আসিত, জল তুলিয়া আনিত, বাসনও কেহ কেহ গিয়া মাজিত। কারণ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নিরালাই দেখা যাইত, দুই একখানা নৌকা মধ্যে মধ্যে চলিত, কখনও দুই একখানা নৌকা বাঁধাও থাকিত। কিন্তু এপারে কি ওপারে নিকটে কোনও রাস্তা ছিল না,—সুতরাং সহরের বাবুলোকদের যাতায়াত এদিকে মোটেই ঘটিত না। জমিদারের কাছারীর লোকজনও এদিকে বড় আসিত না। সুতরাং পাড়ার মেয়েরা যখন ঘাটে কাজ কর্ম্ম করিতে যাইত, আবরুর জন্য তাহাদের তেমন কোনও চিন্তা করিতে হইত না।

একদিন বৈকালে পাড়ায় একটা কথা উঠিল, প্রভাস মাষ্টার ইস্কুলের তহবিল ভাঙ্গিয়াছিল, আজ ধরা পড়িয়াছে, হেডমাষ্টার তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন। হাকিমের কাছেও নাকি খবর গিয়াছে। পুলিশ আসিয়া প্রভাসকে গ্রেপ্তার করিবে অথবা ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া গিয়াছে। শুনিয়া সকলেই সত্রাস বিস্ময়ে একেবারে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! প্রভাস বয়সে যুবা, অতি সুচরিত্র ও সহৃদয় লোক,—পাড়ার সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত। অবশ্য সে দরিদ্র,—ইস্কুলে ত্রিশটি টাকা মোটে বেতন পায়। গতবৎসরের মধ্যে পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হওয়ায় কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও কি সম্ভব যে সে ইস্কুলের তহবিল ভাঙ্গিবে? হিসাবেই কিছু একটা ভুল চুক হইয়াছে। আহা, যদি চাকুরীটুকু যায়, কি জেল টেলই যদি হয়, ওই বউটি আর ঐ শিশুপুত্রটি—কি গতি তাহাদের হইবে? সকলেই যেমন বিস্মিত, তেমন ত্রাসিত, তেমনই ব্যথিত হইল। কথাটা সকলেই শুনিল,—কিন্তু একটা সোর গোল উঠিল না। চুপি চুপিই সকলে আলোচনা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা ঘুরিয়া গেল, প্রভাস ফেরে না। কথাটা তবে সত্যই নাকি! পাড়ার পুরুষ যাহারা বাসায় ফিরিয়াছিলেন, অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইলেন।

অনেক ইস্কুলেই কেরাণী ও হিসাবরক্ষকের কাজের ভার নিম্নতর কোনও শিক্ষকের উপরেই থাকে। এখানেও প্রভাস সেই কাজ করিত। ইস্কুল ছুটী হইলে, হিসাব নিকাশ মিলাইয়া রাখিবার জন্য কিছু সময় তার লাগিত। কিন্তু পাঁচটার মধ্যেই সে প্রায় বাসায় ফিরিত। আজ এত বিলম্ব হওয়ায় তার স্ত্রী পদ্মা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ওদিকে পাড়ার লোক সব এখানে ওখানে কি কানাকানি করিতেছে। ভয়ে ও উদ্বেগে সে এত অধীর হইয়া উঠিল

যে কেহ কেই তাহাকে—যতদূর সম্ভব নরম করিয়া কথাটা না জানাইয়া পারিলেন না। একজন প্রবীণা গৃহিণী তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—"ভয় নেই মা ভয় নেই! হিসেবে কি একটা ভুলচুক হ'য়েছে, তাই ঠিক ঠাক ক'রে চুকিয়ে দিয়ে এই এল আর কি? ভয় নেই—ভয় নেই। প্রভাস এমন লক্ষ্মী ছেলে, সে কি তহবিলের টাকা ভাঙ্গবে?"

পদ্মা বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল,—ছেলেটি কাছে বসিয়াছিল তাকে টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তার মনের মধ্যে কেমন যেন ডাক দিয়া উঠিতেছিল, কথাটা সত্য। কয়েক দিন ধরিয়া স্বামীর কেমন একটা উদ্বিগ্ন ও আনমনা ভাব সে দেখিতেছে। শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে অনেক দেনা হইয়াছিল, মাসে ১৫।২০ টাকা করিয়া তার জন্য বাহির হইয়া যাইত। বাকী যা হাতে থাকিত, তাহা দ্বারা কি ভাবে যে এই কয় মাস সে সংসারটা চালাইতেছে, সেই জানে। কোনও দিন একমুঠা বাসি পান্তা মাত্র খাইয়া সে সারাটাদিন কাটাইয়া দিয়াছে, বৈকালে কোনও দিন খায় নাই, কোনও দিন স্বামীর পাতে যে দুটি ভাত পড়িয়া থাকিত, তাহাই মুখে দিয়া এক ঘটি জল খাইয়া সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। প্রভাস নিজে পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই, কত দিন এইরূপ অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে সে কাটাইয়াছে। কিছু দিন আগে ছেলেটির আবার খুব অসুখ হইয়াছিল, ডাক্তারে ঔষধেও ব্যয় তাহাতে নিতান্ত কম করিতে হয় নাই। হয়ত বা দায়ে পড়িয়া কিছু টাকা—হাতেই ছিল, খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, আর পুরাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যেই হিসাবে তাহা ধরা পড়িয়াছে। তাই কাহারও কোনও প্রবোধ বাক্যে একটু আশা কি একটু স্বস্তি মনে আসিতেই আবার তখনই দূর হইয়া গিয়া আশঙ্কায় তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

ছেলেটি কাঁদিয়া কহিল, "ক্ষিদে পেয়েছে মা, ভাত দে।"

একজন প্রতিবেশিনী কহিলেন, "আহা, রান্নাও বুঝি এখনও করনি বোন্!"

পদ্মা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তার চক্ষে জল আসিল। হায় রান্নাই বা সে কি করিবে, ঘরে চাউল ছিল না, হাতেও টাকা ছিল না। প্রভাস বলিয়া গিয়াছিল, সে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া চাউল কিনিয়া আনিবে।

"এস, বাবা, এস, ভাত খাবে এস।"

প্রতিবেশিনী হাত বাড়াইয়া শিশু বালককে কোলে তুলিয়া নিয়া চলিয়া গেলেন। অপর একজন প্রবীণা কহিলেন, "তা যাওনা মা, উঠে যাও রান্না করগে। ভয় কি?—এত রাত হ'ল, হয়রান্ হ'য়ে আস্‌বে, যাও দুটি রাঁধগে। না হয়—তোমার মনটা ভাল নেই,—আমিই দুটি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে রেখে যাই। চাল টাল কোথায়?"

পদ্মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "না না, আমিই রাঁধব এখন। যাই,—রাত হয়েছে, আপনারা এখন ঘরে যান বরং।"

একটা কেরোসিনের কুপি ধরাইয়া পদ্মা ত্রস্তভাবে বাহির হইল। প্রতিবেশিনীরাও সঙ্গে বাহির হইলেন। পদ্মা দরজায় ঝাপ আটাইয়া দিয়া নিঃশব্দে পাকের ঘরের দিকে চলিল। সমবয়স্কা জনৈকা প্রতিবেশিনী সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। পদ্মা ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তুমি আর কেন আস্‌ছ দিদি? আমি একাই পারব। তুমি বরং যাও, খাওয়া হ'লে খোকাকে তোমাদের কারও কাছেই রেখে দিও। এলে পর যদি বলেন, আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

প্রতিবেশিনী কহিল, "আচ্ছা, আসি তবে ভাই। তুমি ভেবোনা কিছু, ভয় নেই। হিসেব পত্তরেরই কি একটা গোলমাল হ'য়েছে। নইলে সত্যিই কি এমন একটা কাণ্ড হ'তে পারে?"

পদ্মা একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তাই হ'ক্ দিদি, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!—কে ও!"

বাহিরে দরজার কাছে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিবেশিনীও চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—সংত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, "কেগা তুমি! কি চাও এখানে?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞে আমি রাজেন্, ইস্কুলে পড়ি। 'সার' পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"কি!—কি!" পদ্মা ব্যস্ত সমস্তভাবে অগ্রসর হইল।

"আজ্ঞে 'সার' পাঠিয়ে দিয়েছেন কথা একটা ব'ল্‌তে—"

এই বলিয়া বালক প্রতিবেশিনীর দিকে চাহিল। পদ্মা মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি, তুমি তবে—এখন এস তবে।"

প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল।

"সার এই পাঠিয়ে দিলেন"—এই বলিয়া বালক জামার

নীচে হইতে একটি পুঁটলি বাহির করিল। একধারে সের দুই আড়াই চাউল এবং অন্তধারে আধসের টাক ডাল তাহাতে বাঁধা ছিল। পদ্মা পুঁটলিটি হাতে লইয়া কহিল, "তিনি কখন আস্‌বেন ? কি হ'য়েছে ?"

শীগ্‌গিরই আস্‌বেন। ব'ল্লেন—এই ঘণ্টাখানেক আর দেরী হ'তে পারে।"

"কি হ'য়েছে ইস্কুলে ?"

"তা ত জানিনে মা। কি হিসেবের গোলমাল নাকি হয়েছে—হেডমাষ্টার মশাই খুব রাগ ক'রেছেন—সেক্রেটারী মশাইও এসেছেন—

"পুলিশ—"

"না—না—পুলিশ কেন আস্‌বে।—হিসেবের গোলমাল হ'য়েছে, ওঁরাইত দেখ্‌ছেন—পুলিশ কেন আস্‌বে ? কই পুলিশ ত, দেখিনি। 'সার' বল্লেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আস্‌বেন।"

বালক তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।—পদ্মা গিয়া পাক চড়াইয়া দিল।

(২)

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় প্রভাস বাসায় ফিরিয়া আসিল। পদ্মা কোনও কথা না তুলিয়া হাত মুখ ধুইবার জল, খড়মজোড়া গামছাখানি, আর একটি আলো নিয়া বারান্দায় রাখিল। প্রভাস স্ত্রীর মুখের দিকেও চাইতে পারিতেছিল না,—কোনও মতে হাত পায়ে ও মুখে জল দিয়া আসিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। পদ্মা ঠাঁই পীড়ি করিয়া ভাত বাড়িয়া আনিয়া রাখিল। স্বামীর কাছে গিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "এস, ভাত খাও এসে।"

"না থাক্‌, ক্ষিদে নেই, আজ আর খাবনা।"

"সেই বেলা দশটায় দুটি ডাল ভাত খেয়ে বেরিয়েছ, আর রাত এই দশটা বাজ্‌ল। এস এস—উঠে এস—ভাত জুড়িয়ে যাবে যে।"

কাছে গিয়া প্রভাসের হাত ধরিয়া পদ্মা একটু টান দিল। প্রভাস বালিশে মুখ গুঁজিয়া রহিল—বোধ হয় কাঁদিতেছিল।

পদ্মা আবার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "ছি!। উঠে এস। বড্ড কষ্ট হচ্ছে,—এস, উঠে দুটি খাও, তারপর শুয়ে থাক।"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে প্রভাস কহিল, "কিছু শোন নি ?"

"তা,—তুমি খেয়ে ওঠ, একটু সুস্থ হও,—শেষে ভাল করে সব শুন্‌ব। এস, উঠে এস, আমার মাথা খাও, এস, সেই কখন দুটি ডাল ভাত খেয়ে গেছ,—"

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা প্রভাস উঠিয়া দুটি খাইল। স্বামীকে পান দিয়া পাতের বাকী ভাত পদ্মা ঢাকিয়া রাখিয়া আসিয়া কাছে বসিল,—কহিল, "কি হ'য়েছে বল ত ?"

"তুমি খেলে না।"

"তা, খাব এখন, এত তাড়া কি ? আগে বল না সব শুনি।"

'না—না, যা পার, দুটি খেয়ে এস।—রাত অনেক হ'য়ে গেছে, খোকা কোথায়।'

"তখনও রান্না হ'য়েছিল না। শান্তির মা তাকে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। বিনো দিদিকে ব'লে দিয়েছিলাম, তাদের কাছেই যেন তাকে আজ রেখে দেন।"

"চাল ডাল দিয়ে গিয়েছিল ত রাজেন্‌ ?"

"হাঁ তখনই দিয়ে গেল।"

প্রভাসের চক্ষে জল আসিল, কম্পিত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, সন্ধ্যে বেলার শেষে যদুবাবুর ঠেঁয়ে একটা টাকা ধার নিয়ে রাজেন্‌কে দিয়ে দিই—ঘরে কিছুই ছিলনা—"

বলিতে বলিতে প্রভাস কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ খানি দুইহাতে ঢাকিয়া হাঁটুর উপরে রাখিল। পদ্মা কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া হাত দুটি ধরিয়া কহিল, "ছি ছি! কেঁদো না, কেঁদো না। যা কপালে থাকে হবে। তুমি কেঁদো না। ছি! পুরুষ মানুষ, বিপদে পড়েছ, এমন কাঁদতে আছে ?"

প্রভাস অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া কহিল, "যাও, তুমি খেয়ে এস।"

পদ্মা আর কিছু না বলিয়া স্বামীর পাতে যে ভাতছিল, তাই দুটি মুখে দিয়া আসিল।

"কি হয়েছে এখন বল ত ? টাকার কি সত্যিই গোলমাল হ'য়েছে কিছু ?

"হাঁ।"

"কত টাকা ?"

"পঁচিশ।"

পদ্মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হায়, এই সামান্য টাকা। ইহার জন্য এই গ্লানি, এই অপমান, এই শাস্তি !

একটু ভাবিয়া সে কহিল, "তুমিই খরচ ক'রেছিলে ?"

"হাঁ।"

'খোকার ব্যামোর সময় বুঝি ?"

"হাঁ।" প্রভাস আবার ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটু সুস্থ হইয়া শেষে কহিল, "কোনও উপায় আর তখন ছিল না। ধার কোথাও পেলাম না। যতীন্ বাবু আর তারকবাবু ব'লেছিলেন, কোনও মতে চালিয়ে নিতে যদি পার, মাস কাবারে মাইনে পেলে আমরা দেব। কাল তাঁরা মাইনে পাবেন। কালই ওটা পুরিয়ে রাখ্‌তে পাত্তাম। হিসেব পত্তরও কাল বুঝিয়ে দেবার কথা। কিন্তু হেড্‌মাষ্টার মশাই হঠাৎ আজ হিসেব তলব ক'ল্লেন—"

"তাঁকে ব'লে, টাকাটা নিলেই ত ভাল হ'ত। আগে ত মাঝে মাঝে ইস্কুল থেকে হাওলাত আন্‌তে।"

প্রভাস উত্তর করিল "আগে সেরকম চ'লত। কিন্তু এই নতুন হেড্‌মাষ্টার বাবু বড় কড়া লোক, সেক্রেটারীকে ব'লে একটা হুকুম আনিয়েছিলেন, মাসকাবার না হ'লে মাষ্টাররা কেউ টাকা হাওলাত নিতে পার্‌বে না। আগেও পাঁচ টাকার বেশী পাওয়া যেত না। পঁচিশটি টাকার দরকার হ'ল—চাইলেও দেবেন না—আর কোথাও পেলাম না,—শেষে ভাবলাম,—

পদ্মা কহিল, "সব কথা বুঝিয়ে তাঁকে ব'লেছিলে ?"

"অনেক ব'লেছি পদ্মা। আমার মাইনেও ত এক মাসের পাওনা হ'য়েছে, তাথেকে কেটে রাখ্‌তে কত মিনতি ক'রে ব'ল্লাম। কিন্তু তিনি কোনও কথাই শুন্‌লেন না।—বড় কড়া লোক তিনি, বল্লেন আমি তফিল তছ্‌রুপ ক'রেছি, এটা বড় গুরুতর অপরাধ। শিক্ষকের পক্ষে এ সব অপরাধ অমার্জ্জনীয়। ছেলেরা শিক্ষা লাভ করে, ভবিষ্যতে অন্য মাষ্টাররা সকলে সতর্ক হন, এজন্য আমার শাস্তিটা একটা দৃষ্টান্তের মত তিনি করবেন।"

"মোটে ত পঁচিশ টাকা। আর চুরী করবার মতলব ত তুমি কিছু করনি—"

প্রভাস উত্তর করিল, "সবাই এই কথা ব'লে এটা মিটিয়ে নেবার জন্যেই তাঁকে অনেক অনুরোধ ক'রে-ছিলেন। কিন্তু তিনি কড়াভাবে জবাব ক'ল্লেন, "তফিল ভাঙ্গলেই সেটা তছ্‌রুপ হ'ল, সে হাজার টাকাই হক্ আর এক টাকাই হ'ক্। আইনে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এসব অপরাধ মার্জ্জনা ক'রা যেতে পারে না।"

"ছি—ছি—ছি! একটু দয়া মায়াও কি নেই ?"

"এক ত মেজাজই ওই রকম। তাতে আবার আমার উপর তিনি মোটেই খুসী নন। প্রথম থেকেই কেমন একটা বিরক্তির ভাব দেখ্‌তে পাই। কেবলই খুঁৎই ধ'ল্লেন, কথায় কথায় এমনি খিট্ খিট্ করেন যে—"

"কেন ?"

"কেন ? আমার অদৃষ্ট—আর কেন ? তবে তাঁর মন যুগিয়ে তেমন চ'ল্‌তে পারিনে। ছেলেদের উপরও তিনি বড্ড কড়া। তাদের সঙ্গে খেলা টেলা করি, আমায় তারা খুব ভালবাসে মেলে মেশেও খুব, এটা তিনি বড় পছন্দ করেন না। কমিটির লোক কারও কারও কাছে ব'লেছেন, আমি ছেলেদের মাথা খাচ্চি—

প্রভাস একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আবার কহিল এইত সেদিন বাজারে বারোয়ারীতে যাত্রা-গান হ'ল,—তিনি ছেলেদের যেতে বারণ ক'রে দিলেন। বাজারে বারোয়ারী পূজো—তিনি ব'লেন ও সবই খারাপ ওর সংস্রবে কিছুই ভাল হ'তে পারে না। আমায় বলেছিলেন, ছেলেরা কে কে যায়,তাহাই দেখ্‌তে আর তাদের নাম তাঁকে জানাতে। যাত্রা শুন্‌তেও তাই আমি গেলাম না। তাতেও বেজায় চটেছিলেন, অনেক গালাগালি আমায় করেন।"

পদ্মা কহিল,—"তোমাদের সেক্রেটারীকে আর কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁদের গিয়ে সব বল না ?"

"সেক্রেটারী এসেছিলেন, কমিটির মেম্বরও জন দুই এসেছিলেন। তবে বাইরে দেখ্‌তে—দোষ বড় একটা আমারই হয়েছে। হেড্ মাষ্টার মশাই অত কড়াভাবে যখন দোষটা ধরে নিলেন, তাঁরা কি ক'ত্তে পারেন ? উনি বল্লেন এর উপযুক্ত বিচার না কল্লে কাজ ছেড়ে দেবেন, ইন্‌স্পেক্টর আফিসে রিপোর্ট করবেন। অগত্যা সেক্রেটারী, আমাকে সাস্পেণ্ড করা হ'ল, এই হুকুম লিখে দিলেন।

কমিটির বিচার হ'য়ে শেষে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। তাঁদের অনুরোধে হেডমাষ্টার এই টুকু দয়া আমাকে ক'রেন যে চোর ব'লে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেন না।

টস্ টস্ করিয়া প্রভাসের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষোভে ও অভিমানে বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পদ্মাও কিছু আর বলিতে পারিল না। দুঃখে অপমানে ও রোষে তাহারও বুক ভরিয়া গিয়াছিল। ভরা বুক উথলিয়া দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল। রুদ্ধকণ্ঠে আর কোনও বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না। কতকক্ষণ পরে প্রভাস আবার কহিল,—"চাকুরী গেল, তার জন্যে ত ভাব্‌ছি না পদ্মা। এক তুমি আর খোকা—না হয় গায়ে খেটেও তোমাদের খাওয়াতে পারতাম। কিন্তু মুখে চুণকালী প'ল। গরীব হ'লেও সবাই এখানে ভালবাসে। আর কেউ ভাল চ'ক্ষে আমায় দেখবে না—কেউ আর শ্রদ্ধা ক'রবে না। আমিও মুখ তুলে কারও পানে চাইতে পারব না। মুখ উচু ক'রে সবার সঙ্গে মিলে মিশে হেসে খেলে বেড়িয়েছি—চোরের মত রাত্তিরে একদিন পালিয়ে যেতে হবে।"

পদ্মা কহিল,—"কেন তা হবে? সবাই ত তোমাদের হেড্‌মাষ্টার নয়,—সব শুন্‌লে—যার একটু প্রাণ আছে—সেই তোমার জন্য দুঃখ ক'র্‌বে।"

"দুঃখ—ক'ত্তে পারে। দয়া হয় ত ক'র্‌বে, কিন্তু শ্রদ্ধা আর কেউ ক'র্‌বে না। যতই দায় ঠেকে ক'রে থাকি—কাজটা আমার ভাল হয়নি। নিজের মন ভরেও বড্ড ধিক্কার উঠ্‌ছে। তবে খোকার প্রাণটা—বড় বেশী গরীব আমি পদ্মা, আমার মত গরীবের বিয়ে করাই ঠিক নয়। আর ছেলে পিলে হওয়া সেটা একেবারেই একটা মহাপাপ!"

অদূরে থানার ঘড়ীতে একটা শব্দ হইল—ঠং। পদ্মা কহিল, "ইস্! রাত যে একটা বাজল। এখন ঘুমোও। ক'ঘণ্টা আর রাত আছে? শেষে একটা অসুখ হবে।"

"অসুখ! কি আর অসুখ হবে? কাজ ত ফুরিয়ে গেল। সারাদিন পড়ে ঘুমোব।

পদ্মা কহিল, "পাগলের মত কথা ব'ল্‌ছ কেন? গা ছেড়ে প'ড়ে থাকলে কি এগোবে? যত মুখ লুকিয়ে ঘরে ব'সে থাকবে, তত লোকে আরও বেশী ছি ছি ক'রবে। সবার সঙ্গে দেখা কর, লজ্জা ক'রো না, লজ্জার কিছু হয় নি তোমার। মুখ তুলে ভরসা মনে ধ'রে সবার কাছে যাও, সবাইকে বুঝিয়ে বল। না হয় এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে যাবে, কিন্তু এই সামান্য কারণে এত বড় একটা কলঙ্ক দিয়ে তোমাকে বরখাস্ত ক'রবে—কেন তা হ'তে দেবে? সহরের লোক ত আর সবই অবিবেচক নয়? এত বড় একটা অত্যাচার তোমার উপর হবে, আর তারা সব চুপ ক'রে থাকবে? তবে তাদের ব'ল্‌তে হবে, বোঝাতে হবে, ধ'ত্তে পাকড়াতে হবে। পাড়ার লোকেও সবাই তোমার সহায়তা ক'র্‌বে।"

প্রভাস ধীরে ধীরে কহিল, "ইস্কুলে সরকারী সাহায্য আছে। হেডমাষ্টার যে রকম জেদী লোক—ইনেস্পেক্টরের আফিসে যদি একটা রিপোর্ট ক'রে দেয়—সহরের লোক কি ক'রবে? আরও বেশী কেলেঙ্কারী একটা হবে। চারদিকে একটা জানা জানি হ'য়ে যাবে, আর কোথাও গিয়ে যে দুটি ক'রে খাবো, সে পথও বন্ধ হবে।"

পদ্মার মুখখানি অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল,—বিস্ফারিত প্রদীপ্ত চক্ষু দুটি স্বামীর দিকে তুলিয়া কহিল, "ওই ছোট লোক হেডমাষ্টার যা খুসী তাই করবে, এমনি ক'রে ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে, আর তাই সকলে নির্ব্বাক্ হয়ে স'য়ে যাবে।..কেন, কি ক'র্‌বে ইন্‌স্পেক্টর? ইস্কুলের সাহায্য তুলে নেবে? তা নিক্ না, কেন এই সহরের লোকেরা কি একটা ইস্কুলও চালাতে পারবে না? মাসে ওই কটি টাকা—তার জন্যে এত বড় একটা অন্যায় হ'চ্ছে—বুঝেও তার প্রতিকার ক'র্‌বে না? ছি, ছি, ছি! এরা কি আবার মানুষ?"

প্রভাস একটু হাসিয়া শান্ত করিবার প্রয়াসে পদ্মার পিঠে হাত বুলাইয়া কহিল, "পদ্মা, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ—ভুল বুঝ্‌ছ। আমি সামান্য একটা লোক—আর অন্যায়ই সত্যি একটা ক'রেছি। তার জন্যে কি ইস্কুলটার এত বড় একটা ক্ষতি লোকে ক'ত্তে পারে? আর তাতেইবা লাভ কি? আমার অপরাধটা যে জাতীয়—তাতে আমার পক্ষ নিয়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে একটা জেদবাদ চলে না। ইস্কুলের সাহায্য থাক্ বা যাক্, ইনেস্পক্টর চটে গেলে, এখানে কেন কোথাও আমি আর শিক্ষকতা কত্তে পারব না। তবে

বাড়াবাড়ি একটা না ক'রে আমি চাকরী ছেড়ে গেলেই যদি হেডমাষ্টার সন্তুষ্ট হন—সেইটেই আমার পক্ষে এখন পরম মঙ্গল। হাঁ, তার জন্মে চেষ্টা যথাসাধ্য ক'ত্তে হবে বই কি, সে যা হয়, কাল করা যাবে। এখন ঘুমোন যা'ক্। খোকাকে কেন আর এক বাড়ীতে পাঠালে? বিছানাটা বড় খালি খালি লাগ্‌ছে না?

"তাকে কি নিয়ে আস্‌ব?"

"নাঃ—থা'ক্ আর আজ। এত রাত্রিতে গিয়ে আবার তাদের ত্যক্ত করবে।"

৩

প্রভাস একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। হাতে কিছুই একেবারে ছিল না। ইস্কুলে বেতন পঁচিশ আর কেরাণীর কাজের জন্ম ভাতা পাঁচ—মোট এই ত্রিশটি টাকা সে পাইত। পঁচিশ টাকা কাটিয়া নিয়াও বাকী যে পাঁচটি টাকা তার পাওনা হইয়াছিল, তাও হেডমাষ্টার আটক করিয়া রাখিলেন। কে জানে হিসাবে যদি আর কোনও গোল থাকে,—ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি তাহা দিতে পারেন না। কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠান ইস্কুলের ক্ষতি তিনি কি প্রকারে করিতে পারেন। তাঁহার বিবেক এরূপ কৃপার পক্ষপাতী হইতে তাঁহাকে কিছুতেই অনুমোদন করিতেছিল না। বিবেকই হইতেছে মানবের চিত্তনিহিতা ভগবদ্‌বাণী—সেই বাণীকে তিনি কি প্রকারে অবজ্ঞা করিতে পারেন। বিশেষ কৃপার পাত্র এমন গুরুতর অপরাধে সেই ভগবানের নিকটে অপরাধী হইয়াছে। এক উকীলের বাড়ীতে ছেলে পড়াইয়া অতিরিক্ত দশটি করিয়া টাকা প্রভাস পাইত। সে টাকা কয়টিও আগাম আনিয়া সে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। পদ্মার গায়ে এমন একখানি রৌপ্য অলঙ্কারও ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া দুটিদিন চলিতে পারে।

কাহারও কাছে হাওলাত চাহিবে, সে মুখ আর প্রভাসের নাই। সত্যই সে একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। সের দুই চাউল, পোয়া দেড়েক ডাল আর ৪।৫ আনার পয়সা, যে টাকাটি হাওলাত করিয়াছিল—তার অবশেষ—এই মাত্র সম্বল। দু তিন দিন কষ্টে তাহাতে চলিতে পারে। কিন্তু তারপর—এদিকে চাকরী গেল, সহর ছাড়িয়া তাকে যাইতে হইবে। দোকানে বাকী কিছু কিছু আছে—এর ওর কাছে হাওলাতও কিছু আছে। সব চুকাইয়া কি লইয়া সে যাইবে? পরদিন সকালে উঠিয়া স্বামী স্ত্রী দুই চারি কথা আলোচনা করিতেই এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যারপর নাই, ভীত হইয়া উঠিল। দুদিন গেলেই ত পাড়ার সকলে দেখিবে। কেহ দুটি চাল, কেহ এক মুঠা ডাল, কেহ দুই একখানা তরকারী আনিয়া দিবে। ছি ছি! এ লজ্জা পদ্মা কেমন করিয়া সহিবে।

প্রভাস বাহির হইয়া গেল। পদ্মা পাক চড়াইয়া দিয়াই তার পিতাকে একখানি পত্র লিখিল। পিতা দরিদ্র। কিন্তু তাদের মত এমন নিঃসম্বল হইয়া ত পড়েন নাই। যে ভাবে হইক, কন্যা জামাতার এই দুর্গতির কথা শুনিলে, কিছু টাকার যোগাড় করিয়া নিয়া আসিবেনই। ৩।৪ দিনের মধ্যেই তিনি আসিয়া পৌছিতে পারিবেন। আর একটি মাত্র টাকা কোনও মতে জোগাড় করিতে পারিলেই এই ৩।৪ দিন চলিয়া যাইবে। হাওলাত না মিলে, না হয়—দুই একখানা বাসন বিক্রয় করা যাইবে। পিতাকে পদ্মা পত্র লিখিল। কিন্তু স্বামীকে সে কথা জানাইল না।

তবে বাস্তবিক প্রভাসকে একেবারেই বিপন্ন হইতে হইল না। পাড়ার বন্ধুরা তার দুর্গতির কথা বুঝিতে পারিয়া অযাচিত ভাবে কিছু কিছু করিয়া হাওলাত সকলেই দিলেন। ইহাও বলিলেন, এজন্য প্রভাসের বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, সুবিধামত যখন হয় শোধ করিলেই চলিবে।

কয় দিন প্রভাস খুব ঘুরিল, কিন্তু সুবিধা কিছু হইল না। তার এইমাত্র প্রার্থনা ছিল যে, তার নামে কোনও অভিযোগ কমিটিতে উপস্থিত করা না হয়,—সে পদত্যাগ পত্র লিখিয়া দিতেছে, তাহাই কমিটি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। কিন্তু হেডমাষ্টার মহাশয় নূতন এক আপত্তি দেখাইলেন, ইস্কুলের বহিতে প্রভাসকে সস্পেণ্ড করা হইল, এই হুকুম সেক্রেটারী নিজে লিখিয়াছেন, তাহা প্রচারিতও হইয়াছে। সুতরাং এখন কি প্রকারে ব্যাপারটা একেবারে চাপিয়া দেওয়া যায়? সেক্রেটারী নিজেও তাঁহার লিখিত ও প্রচারিত সেই হুকুম নাকচ করিয়া দিতে ভরসা পাইলেন না। কে জানে, আবার ইহা লইয়া কি গোলযোগ পড়িতে

হইবে। ইনেস্পেক্টর আসিয়া যদি ধরে, তবে কি জবাব দিবেন? হেডমাষ্টার, প্রকাশ্যে না হউক গোপনেও যদি ইনেস্পেক্টরকে জানায়, তবে একটা বিশেষ কেলেঙ্কারী হইবে।

সেক্রেটারী ছিলেন সহরের একজন প্রবীণ উকিল, রাজাবাহাদুরের সব মামলা মোকদ্দমার কাজ কর্ম্মও তিনি দেখিতেন। রাজাবাহাদুর একরকম সহরের মালিক ছিলেন, বলিলেও হয়। ইস্কুলের বাড়ী তিনি করিয়া দিয়াছেন, আরও অনেক সাহায্য করিয়াছেন। সৎকার্য্যে দানশীল বলিয়া ইঁহার নামও আছে, এবং গবর্ণমেণ্টও এই জন্য প্রথমে রায় বাহাদুর তার পর রাজা খেতাব ইঁহাকে দিয়াছেন। অনেক পাইয়াছেন, আরও অনেক পাইবার আশা রাখেন, তাই কমিটি ইঁহাকেই আপনাদের প্রেসিডেণ্টের পদে স্থায়ী ভাবে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার পুত্র (মন্মথভূষণ সহরে অবশ্য এখন কুমার সাহেব নামে পরিচিত) আমেরিকায় ও জাপানে কয়েক বৎসর বেড়াইয়া কিছুকাল হইল দেশে ফিরিয়াছেন। পাশ্চাত্য অঞ্চল প্রত্যাগত কুমারকে রাজাবাহাদুর তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়া দিলেন, দেখিয়া শুনিয়া যদি তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার বলে কাছারীগুলির কার্য্যপ্রণালীর কোনও সংস্কার করিতে পারেন। অন্যান্য অনেক কাছারী পরিদর্শন করিয়া দুই তিন দিনের মধ্যেই কুমার সাহেব এই সহরে আসিয়া পৌঁছিবেন, এই সংবাদ আসিল। সহরে এবং বিশেষ ভাবে ইস্কুলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনও আরম্ভ হইল।

প্রভাসের বন্ধুরা এবং হিতৈষী ব্যক্তিরা সকলেই বলিলেন কুমার সাহেব সহৃদয় লোক, ইস্কুলের উপরেও প্রভাব ইঁহাদের একটা আছে, উপস্থিত মত ইঁহার নিকটে আবেদন করিলে তার সুবিধা হইতে পারে। দয়া করিয়া চাই কি ইনি প্রভাসকে ইঁহাদের সরকারে একটা কাজও দেওয়াইতে পারেন। তাঁহারাও পাঁচজনে গিয়া না হয় তাঁহাকে ধরিয়া পড়িবেন। সেক্রেটারী নিজেও গোপনে প্রভাসকে ডাকিয়া এই উপদেশ দিলেন। প্রভাস বড় আশায় ইঁহার শুভানুগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে প্রভাসের শ্বশুর রেবাকান্ত বাবুও সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া নিয়া জামাতার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

কুমার বাহাদুরের বজরা আসিয়া একদিন রাজাবাহাদুরের বাসাবাড়ীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। পত্র পুষ্প পতাকায় এবং বিচিত্র বস্ত্র ও কাগজের তোরণে ও থামে ঘাট পূর্ব্বেই সুপরিপাটিরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সহরের ভদ্রলোকগণও অনেকে চোগা চাপকান পাগড়ীতে সাজিয়া অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। ইস্কুলের ছাত্রগণ নিশান হাতে লইয়া ঘাটের দুই ধারে এবং ঘাট হইতে জমিদার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কয়েকটি সুকণ্ঠ বালক কুমার সাহেবের অবতরণমাত্র অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাহিয়া মালা ও স্তবক উপহারদানে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। সহরের 'লিডার' রূপ প্রবীণ এক উকিল সংবর্দ্ধনা কমিশনের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। দুইটি ছাত্রও ছাত্রদের পক্ষ হইতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিল। একটির রচয়িতা পণ্ডিত মহাশয় তখন প্রহৃষ্ট বদনে পার্শ্বস্থ একটি ভদ্রলোককে কবিতার তাৎপর্য্যের ও উপমাদির সার্থকতা মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিলেন। অপরটির রচয়িতা একজন নবীন উকিল গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, শ্রোতৃবর্গ বিশেষ কুমার সাহেব নিজে—কবিতাটির তারিফ কিরূপ করিতেছেন। এইরূপে যথারীতি অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন, এবং কুমার সাহেবের সবিনয় প্রত্যাপ্যায়নের পর তিনি যখন ঘাট হইতে রক্তবস্ত্রাবৃত পথে পদার্পণ করিলেন, বালকগণের সমবেত কণ্ঠে ত্রি 'চিয়ার' সহ হিপ্ হিপ্ হুররে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। অত্যোৎসাহী অতি ভক্ত প্রবীন ও কেহ বাহু তুলিয়া এই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন। ঘন ঘন এইরূপ জয়ধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হইয়া সলজ্জ কুমার সাহেব বাসাবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তারপর সুমিষ্ট সম্ভাষণে সকলের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া সুসজ্জিত গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। হেডমাষ্টার সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বালকদের নিকটে ঘোষণা করিলেন, মহামহিম এই অভ্যাগত পুরুষের সম্মানার্থ আজ বালকগণ ছুটী পাইল। উল্লাসে অতি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনিসহ বালকগণ লাফাইয়া দৌড়িয়া করতালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। অন্য সকলে হাসিলেন, কেবল হেডমাষ্টার মহাশয় বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করিয়া লজ্জিত বদন একবার নত করতঃ ঈষৎ রুষ্ট দৃষ্টিতে আবার চাহিলেন। কিন্তু বালকেরা সকলেই তখন বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, গেটের বাহিরে রাস্তার উপরেই তাহাদের অবশিষ্ট কলরব তখন শ্রুত হইতেছিল।

প্রভাস ও এই অভ্যর্থনা উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল। যে মহামান্য ব্যক্তির নিকটে সে কৃপাপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইবে, তার চেহারাটা কেমন কিরূপ ব্যবহার সকলের সঙ্গে করেন, দেখিবার জন্য তার অদম্য প্রবল একটা আগ্রহ হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনা না ঘটিলে এই অভ্যর্থনায় আজ ছাত্রদের নেতৃত্ব সেই গ্রহণ করিত। আজ দূরে চোরের মত দাঁড়াইয়া তাকে সব দেখিতে হইবে,কিন্তু তবু সে আসিয়াছিল। সব সে দেখিল,—দেখিয়া বড় গভীর একটি নিশ্বাস সে ত্যাগ করিল এই জমিদার পুত্রের সৌভাগ্য আর-তার দুর্ভাগ্য—ইহার পার্থক্যটা বড় তীব্রভাবেই সে অনুভব করিল। হায়, কেন এই পার্থক্য। কেন এ আজ সকলের এত সমাদৃত, আর সে সর্ব্বের অবজ্ঞাত—ঘৃণিত অথবা নিতান্ত কৃপার পাত্র! এ ধনীর গৃহে জন্মিয়াছে,—আর সে দরিদ্রের সন্তান এই ত! আর কি এমন পার্থক্য আছে তার পিতার যদি অর্থ বল থাকিত, এইরূপ আদর কি লোকসমাজে সেও পাইত না? বুকভরা স্নেহের পুত্রটির জীবনরক্ষার্থে ২৫টি টাকার জন্য এত বড় দারুণ লাঞ্ছনা কি তাকে আজ ভোগ করিতে হইত? ইনি উচ্চ শিক্ষিত, কারণ পাশ্চাত্যমণ্ডল প্রত্যাগত। কিন্তু তাতেই কি কেবল উচ্চ শিক্ষা হয়? বিদ্যায় কই, ইনি প্রভাস অপেক্ষা এমন বড় কি? অর্থ থাকিলে সেও কি ইহাঁর মত একবার পাশ্চাত্যমণ্ডল ঘুরিয়া আসিতে পারিত না? চরিত্র? কে জানে,ইহাঁর চরিত্র কি? কে জানে, চরিত্রে কি হৃদয়ের মহত্ত্বে হয়ত দীনদরিদ্র দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত প্রভাসই ইহাঁর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইবে। আজ দারিদ্র্যের তাড়নায় বড় দায়ে পড়িয়া সে একটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মকে সে লঙ্ঘন করে নাই, সেরূপ অভিপ্রায়ও তার ছিল না। নহিলে চরিত্রে ত সে হীন নয়। পদে ও অবস্থায় যত ক্ষুদ্রই সে হউক,মনে তার—কই—ক্ষুদ্রতা কি আছে? সঙ্গে সঙ্গে তার অভাগিনী স্ত্রীর কথাও মনে পড়িল। দরিদ্র পিতার কন্যা—নহিলে রূপে গুণে রাজরাণী হইবার যোগ্যা সে! ইহাঁরও অবশ্য স্ত্রী আছেন,কিন্তু তিনি কি কোনও বিষয়ে পদ্মার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন? তবু পদ্মা এত দুঃখিনী, তার লাঞ্ছনায় সেও আজ কত লাঞ্ছিতা! আজ যদি ইহাঁর সহধর্ম্মিণী সে হইত, ইহাঁরই গৌরব বাড়িত, পদ্মার নয়! ধন—ধন—ধনবানের গৃহে জন্ম! ইহাতেই কি মানুষে মানুষে এত পার্থক্য হয়? কোন্ পুণ্যে ইনি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয় জন্মিয়াছেন, আর কোন্ পাপেই বা সে আর পদ্মা এই দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিল? বড় কোনও পাপের ফলেই যদি ইহা ঘটিত, তবে তার ছাপ কি তাহাদের মনের সংস্কারেও পড়িত না? পাপের ফল কি কেবল বাহিরের অবস্থারই নিয়ন্তৃ, মতিবুদ্ধির নিয়ন্তৃ নহে। কেন, দুটি উদরান্নের জন্য ইহাঁর কৃপাপ্রার্থী তাকে কেন হইতে হইল। এ নিয়তি কেন, কিসের ফলে তার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। না, কাজ নাই, সে আসিবে না, আবেদন করিবে না। দর্শন প্রার্থনায় দীনভাবে ইহাঁদের দ্বারে গিয়া অপেক্ষা করিবে না! আদেশ পাইয়া করজোড়ে নত শিরে গিয়া ইহাঁর সম্মুখে দাঁড়াইবে না। পদ্মা অবশ্য দেখিবে না—কিন্তু যদি দেখিত—ছি; তার সম্মুখে সে কি তা পারিত! কমিটির অধীনে কাজ করে, কমিটির কাছে মানুষের মত পুরুষের মত সে বিচার দাবী করিতে পারে, সরল নির্ভীক ভাবে তার কাজের একটা কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে। কিন্তু কে ইনি! ইহাঁর কাছে দীন ভিখারীর মত কৃপাপ্রার্থী হইয়া কেন সে গিয়া দাঁড়াইবে? না, সে তা কখনও পারিবে না। কৃষাণ হইয়া দীন মজুরী করিয়া খাইবে, তবু ইহা সে পারিবে না। নদীর পাড়ে একটা গাছ তলায় বসিয়া প্রভাস অনেকক্ষণ এই সব কথা ভাবিল। ভাবিয়া সে একরূপ স্থিরসংকল্প হইল, কমিটির কাছে সকল অবস্থা জানাইয়া সে বিচারের দাবী করিবে, কৃপাপ্রার্থী হইয়া কাহারও সম্মুখে নতশিরে গিয়া দাঁড়াইবে না।

বাসায় ফিরিয়া প্রভাস পাকের ঘরের দ্বারে গিয়া উঁকি দিল। পদ্মা রাঁধিতেছিল। বেলা তখন অনেক হইয়াছে, চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। টিনের ছোট চালা দুইখান একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরেও উনানে আগুন জ্বলিতেছে। চালা আবার এত নীচু যে ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে প্রায় মাথায় ঠেকে। পদ্মা তখন শিকায় ঝুলান একটা মাটীর ভাঁড় হইতে কি মশলা নিবার জন্য ঠিক একধারেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুন্দর মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া প্রভাসের যেন কান্না আসিল। আহা, পদ্মা তার হাতে পড়িয়া কি ক্লেশই পাইতেছে! এই ক্লেশ ত সে আরও বাড়াইতে প্রস্তুত হইয়াছে! ধিক্! কিসের তার অভিমান! অভি-

রায়পুত্রের কৃপাভিক্ষা করিলে যদি পদ্মার এই ক্লেশ কিছু প্রশমিত হয়, তাকি সে করিতে পারে না? তার অপমান, কিন্তু পদ্মার এই দারুণ ক্লেশের কাছে তার সে অপমান অতি তুচ্ছ!

পদ্মা স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। কহিল "কি, কি দেখ্‌ছ?"

"খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, নয় পদ্মা?"

"কষ্ট! কষ্ট আর কি এমন? এ ত অভ্যেস হ'য়ে গেছে।"

"বড্ড রোদ উঠেছে আজ। সব যেন আগুন—"

পদ্মা তেমনই হাসিয়া কহিল, "এ আর নতুন কি আজ? গরমের দিনে এমন রোদ ত কত ওঠে। যাও, তুমি নেয়ে এসগে। এখন রান্না হ'ল,—বাবাও বসে আছেন।"

বৈকালে পদ্মা ছিন্ন মলিন বসনে কোনও মতে দেহ আবৃত করিয়া খালের ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখের দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। ছোট খালের উপরেই রাজাবাহাদুরের বাসাবাড়ীর নাতি উচ্চ দেওয়াল, ওধারে তার একটি সুদর্শন সুকান্তি যুবক তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে! যুবকের দৃষ্টি স্থির, কেমন একটা বিস্ময় ও করুণার ভাব তাহাতে যেন প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষে চক্ষে মিলিল, পদ্মা চমকিয়া উঠিল। মুখখানি যেন লাল হইয়া গেল,—সে মুখ নত করিল, হাতের আঙুল যেন আড়ষ্ট হইয়া হাতের বাসনে লাগিয়া রহিল। পদ্মা আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। যুবক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ যুবক সরিয়া গেল। পশ্চাতে কার পদ শব্দ পাইয়া পদ্মা ফিরিয়া দেখিল প্রতিবেশিনী একজন কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছেন, সঙ্গে একটি মেয়েও আসিয়াছে।

পদ্মা কহিল, "কে ও দিদি?"

প্রতিবেশিনী কোনও উত্তর দিবার আগেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "ওই যে দাঁড়িয়েছিল? ও ত কুমার সাহেব, ওই যে ওবেলা এসেছেন—কত ঘটা হ'ল—আমরা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।"

প্রতিবেশিনী কহিল—"কুমার সাহেব! ওই কুমারসাহেব! ওমা ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কেন, ছি।"

পদ্মা কোনও উত্তর করিল না। নতমুখে খুব জোরে জোরে বাসনে ঘসা দিতে লাগিল।

প্রতিবেশিনী হাসিয়া কহিল, "ওমা বাসনে তোর কি হ'য়েছিল? এক দিনেই ক্ষয় ক'রে ফেল্‌বি যে—"

পদ্মা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

ওমা, কি হ'য়েছে? তোমার কি কোনও অসুখ ক'রেছে?"

"অসুখ! না, অসুখ ত কিছু—"

"মুখ যে শুকিয়ে একেবারে কালী হ'য়ে গেছে। হঠাৎ বুকে টুকে ব্যথা ধরেনি ত?"

"না না—কিছু না দিদি! বুকে ব্যথা ওমা, বুকে কেন ব্যথা ধর্‌বে?" পদ্মা তাড়াতাড়ি বাসন কয়খানি ধুইতে আরম্ভ করিল।

"তা যদি অসুখ কিছু হ'য়েই থাকে, লজ্জা কি? কমলি বরং বাসন কখানা ধু'য়ে নিয়ে আস্‌বে। তুই যা ঘরে যা।"

"না না, কিছু হয়নি দিদি! এইত হ'য়ে গেল,—কমলি আবার কি ক'রবে।"

কয়খানিই বা বাসন, দেখিতে দেখিতে ধোয়া হইল। পদ্মা তাড়াতাড়ি বাসায় চলিয়া আসিল।

রাত্রিতে আহারে বসিয়া শ্বশুর হরকান্ত বাবু কহিলেন, "তোমাদের কুমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছ প্রভাস?"

"আজ্ঞে না।"

"শুনলাম কালই তোমাদের কমিটি হবে, ওঁকেও উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ ওঁরা করেছেন। আজই একবার দেখা ক'র্‌লে ভাল হয় না?"

হেডমাষ্টারটা যে পাজি, হয়ত এরি মধ্যে গিয়ে কত কি ব'লে এসেছে। সেক্রেটারীটাও যে জোর ক'রে তোমার হ'য়ে দুকথা ব'ল্‌বে, তেমন মনে হয় না। আমি আজ দেখা ক'রেছিলাম।"

"হুঁ—।"

"তা কাল সকালে উঠেই যেও। জান্‌লে? একটা দরখাস্তের মত লিখে নিয়ে গেলে ভাল হয়! অত বড় একটা লোক—হয়ত ঘাব্‌ড়ে যাবে, কথা সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বে না।"

"আচ্ছা, দেখি।"

"দেখি কি? আজ রাত্রিতেই লিখে রাখ। কাল সকালে যেতেই হবে যে। বলত আমিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারি—"

"আজ্ঞে না, না, তার দরকার কিছু নেই। আপনি কেন যাবেন?"

"আচ্ছা, সে যা'হ'ক কালবোঝা যাবে, দরখাস্ত একটা তুমি আজই লিখে রাখ। উনি লোক কেমন?"

"আজ্ঞে, তাত জানিনে। আর কখনও দেখিনি। এখানে উনি এই প্রথম আসছেন।"

"ওবেলায় একবার ভাবছিলাম, যাই দেখে আসিগে লোকটার চেহারা কেমন। তবে মনটা ভাল নয়—ভাল লাগল না। যা'হক কাল—"

প্রভাস উত্তর করিল, আজ্ঞে "আমার কথা নিয়ে আপনি কারও কাছে ঘোরাঘুরি করবেন, এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যা ক'ত্তে হয়, আমিই ক'র্‌ব। আপনি কেন এত মুখ ছোট ক'রে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবেন?"—

"তাতে দোষ হয় না কিছু বাবা, তাতে দোষ হয় না কিছু। বিপদে প'ড়লে সবই ক'ত্তে হয়। তোমরা ছেলেমানুষ রক্ত গরম তাই মনে অপমানের বোধটা কিছু বেশী তেজাল। হয়ত তেমনি ক'রে লোককে ধরে প'ড়ে ব'ল্‌তেও পার না। সংসার বড় শক্ত ঠাঁই বাবা,—বড়শক্ত ঠাঁই, ঠেকে শিখেছি—গরীব হ'লে মান অপমান তেমন গণে কেউ চ'ল্‌তে পারে না।

প্রভাস কোনও উত্তর করিল না। গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র ত্যাগ করিল।

ঘরের একটা খুঁটির গা'য় হেলিয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া পদ্মা দাঁড়াইয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতে এক ফোঁটা অশ্রু মাটিতে পড়িল, অবশ্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আহারাদির পর প্রভাস কাগজ কলম লইয়া বিছানায় একটা বালিশের উপরে কাত হইয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, আর কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে পদ্মা আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি, দরখাস্ত লিখ্‌ছ না কি?"

প্রভাস একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "না, তাইত ভাব্‌ছি—'

কি ভাব্‌ছ কি, লিখ্‌বে ভাই।"

পদ্মা স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিল,—চাহিয়াই আবার মুখ নামাইল। বুক ফুলিয়া একটা নিশ্বাস তার উঠিল,—চাপিয়া চাপিয়া ধীরে ধীরে সেই নিশ্বাস পদ্মা ত্যাগ করিল। প্রভাস কহিল তুমি কি লিখ্‌তে বল পদ্মা?"

"না।"

"আমিও চাই না, কেমন যেন মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না ওটা। তিনি কে? কেন তাঁর কাছে লিখে দয়ার ভিখারী হয়ে দাঁড়াব? হাঁ, কমিটির অধীনে কাজ করি, বিচার সেখানে চাইতে পারি, চাইবও। কিন্তু এই যে বড় মানুষের ছেলে—কোনও সম্বন্ধ যার সঙ্গে নাই—কি ব'লে কোন্ মুখে তাঁর কাছে গিয়ে এই মাথা নিয়ে দাঁড়াব, অন্ততঃ পাপীর মত হাত জোড় ক'রে তাঁর কৃপা ভিক্ষে ক'রব? কেন। এরা বিচার কল্লেন না, বিচার ক'র্‌বেন না, ওই বড়মানুষের ছেলের কথায় যদি দয়া আমাকে করেন। আরে ছ্যা—ছ্যা—না,—না। এ দয়াও এদের কাছে আমি চাইনে। বিচার করেন ভাল, না করেন—যা হয় হ'ক গে।

চাক্‌রীত এই মাষ্টারী। গেছে—যাক্, হাত পা ত কেউ বেঁধে রাখ্‌ছে না? না হয় জন খেটেই তোমাদের খাওয়াব।'

আনমনাভাবে অন্য দিকে চাহিয়া প্রভাস কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া দেখিল, পদ্মা কাঁদিতেছে।

প্রভাস স্নেহে তার হাত ধরিয়া কহিল, "পদ্মা! তুমি কাঁদছ। তা—তুমি যদি বল, দরখাস্ত একটা লিখি"—

"না—না—না! তা নয়—তা নয়! ছি। তার জন্যে কি আমি কাঁদ্‌ছি।—তুমি দরখাস্ত দিওনা—কখনো দিওনা; বাবা হাজার বলুন—তবু দিওনা। যদি দেও—যদি সেখানে যাও—তবে তবে—"

পদ্মা আর বলিতে পারিল না। সহসা স্বামীর পাদুটি জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপরে খুব জোরে নিজের অশ্রুসিক্ত মুখখানি চাপিয়া রাখিল;

"একি! ছি। এই দেখ পাগল হলে নাকি পদ্মা? ওঠ ওঠ! ছি। এর জন্যে এত কেন? দরখাস্ত আমি দেব না। নিজের ত ইচ্ছে হচ্ছিল না। ওঠ ওঠ—ছি?"

প্রভাস পদ্মাকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। পদ্মা আরও জোরে স্বামীর পাদুটি চাপিয়া ধরিয়া রহিল, কহিল "না—না—আমি উঠব না। থাক্‌তে দেও, আর একটু থাক্‌তে দেও! তোমার এই দুটি পায়ে জড়িয়েই যে থাক্‌তে

চাই। জীবন ভ'রে যেন তাই থাকতে পারি। আর এই আশীর্ব্বাদ আমায় কর।"

প্রভাস হাসিয়া কহিল, "এই দেখ, পাগল আর কি? কি হয়েছে? একেবারে নাটকের অভিনয় আরম্ভ করে দিলে। ছি। ওঠ ওঠ। লক্ষ্মীটি, ওঠ। কি অপরাধ ক'রেছ তুমি যে পায়ে পড়ে থাকবে? তোমায় মাথায় ক'রে, রাখলেও যে আমার তৃপ্তি হয় না পদ্মা? ওঠ ওঠ। ছি, কেন আমাকে দুঃখ দিচ্চ?"

পদ্মা আর জোর করিল না। প্রভাস তাকে তুলিয়া বুকে টানিয়া নিল। বুকে বড় জোরে চাপিয়া ধরিল। পদ্মা স্বামীর বুকে তার মুখখানি রাখিয়া দুটি হাত তুলিয়া শক্ত করিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিল। যেন কেহ তাকে কাড়িয়া নিতে আসিয়াছে। সে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত স্বামীর বুকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন সকালে হরকান্ত বাবু যখন শুনিলেন, প্রভাস দরখাস্ত লিখে নাই, কুমার সাহেবের কাছেও যাইবে না, তখন তিনি মনে মনে বড় বিরক্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে জামা উড়নী ও ছাতাটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বলিলেন, একটু ঘুরিয়া তিনি আসিতেছেন।

দুপুরের পর কুমার সাহেব ইস্কুল পরিদর্শন করিলেন। বৈকালে ইস্কুল কমিটির একটি সভা হইল। কত অনুরোধে কুমার সাহেবও সভায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল, এই কমিটিতেই প্রভাসের অপরাধের বিচার হইবে। সুতরাং সে বিষয়টিও উঠিল। এদিকে প্রভাসও একখানা দরখাস্ত কমিটির নিকট পাঠাইয়াছিল। কি অবস্থায় কি উদ্দেশ্যে সে টাকা খরচ করিয়াছিল, তাহা সরলভাবে সব বিবৃত করিয়া সে জানাইয়াছিল সে পদত্যাগ করিয়াছে। কমিটি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াই তাহাকে নিষ্কৃতি দিলে সুখী হইবে।

সেক্রেটারী অবশ্য কুমার সাহেবের অভিমত জানিতে চাহিলেন। যদিও হেডমাষ্টার পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যার পরেই গিয়া প্রভাসের অপরাধের গুরুত্ব এবং দৃষ্টান্তকর শাস্তির প্রয়োজনীয়তা কুমার সাহেবকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছিলেন, এখন দুই দিকের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন এই সামান্য অপরাধে গরীব বেচারীকে একেবারে বরখাস্ত করাটা নিষ্প্রয়োজন অতি কঠোর শাস্তি বলিয়া তিনি মনে করেন। কমিটি যদি তাকে কার্য্যে না রাখিতেই চান, তার পদত্যাগ পত্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে কোনও পক্ষের কোনও ক্ষতি দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য সকলেই আগ্রহে এই মত সমর্থন করিলেন। হেডমাষ্টারেরও কোনওরূপ আপত্তি তখন দেখা গেল না।

প্রভাস এই সংবাদ পাইয়া অবশ্য সুখী হইল। কুমার সাহেব যে এইরূপ সদয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সে একটুও বিস্মিত হইল না। কারণ বিশেষ কোনও দ্বেষ বা ভয় না থাকিলে সহৃদয় ভদ্রলোক মাত্রই এ অবস্থায় এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিবেন। সেক্রেটারী একটু দৃঢ়চেতা লোক হইলে ব্যাপার আদবেই এত দূর গড়াইত না। ব্যাপার যে এতদূর গড়াইল কুমার সাহেবের কাণে পর্য্যন্ত এই কথা গেল ইহাতে প্রভাস মনে মনে একটু লজ্জিত হইল। তবে ইঁহার সঙ্গে তার কোনও পরিচয় নাই হইবেও না। সে এই সহর ছাড়িয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এই যা কিছু সান্ত্বনার কথা।

সন্ধ্যার পর হরকান্ত বাবু আবার কোথায় বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। আহারাদির পর বাহিরের ঘরটিতে তিনি শুইতেন, প্রভাসকে সেখানে ডাক দিলেন।

"আজ্ঞে কোন কথা আছে?"

"হাঁ, আছে। একটু বস।"

প্রভাস বিছানার এক প্রান্তে বসিল। হরকান্ত বাবু আরম্ভ করিলেন, "এদিককার ত গোলমাল যা হয় এক রকম মিটে গেল। এখন কি ক'রবে ঠাওরালে?"

"কি আর ক'রব। কিছু টাকার যোগাড় ক'র্ত্তে পারলে এখানকার দেনাপত্তর সব শোধ ক'রে দেশে যাব। বাড়ীতে ওদের রেখে কোথাও বেরোব কাজ কর্ম্মের চেষ্টায়।

"তা ওদের কিছু দিন রাণাঘাটে আমার ওখানেই রাখতে পার।" তিনি রাণাঘাটে সরকারী এক আফিসে কেরাণীর কাজ করিতেন।

প্রভাস কোনও উত্তর করিল না। হরকান্ত বাবু আবার কহিলেন, "সে যা হয় একটা করা যাবে। তার জন্যে আর

এমন অবস্থা কি? তা এদিকে কত টাকা হ'লে তুমি সব চুকিয়ে যেতে পার?"

প্রভাস মনে মনে একটা হিসাব ধরিয়া কহিল, "এই টাকা যেটেক হ'লেই হয়। হাতেও কিছু থাকা দরকার।"

"হুঁ—তা এত টাকা কি যোগাড় ক'ত্তে এখানে পারবে?"

"তাইত ভাবছি। ধার আর কেই বা দেবে? একবার দেশে যেতে পারলে বাড়ী বাঁধা রেখে হয়ত কিছু যোগাড় ক'ত্তে পারব—"

হরকান্ত বাবু কহিলেন, "সেটা দরকার হবে না। তাহ'লে খুলেই বলি। আমার একজন আলাপী লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল এখানে। তাঁর অবস্থা ভাল—মনটাও দরাজ। তিনি সব কথা শুনে দুশো টাকা আমার কাছে দিলেন।"

"দুশো টাকা। কে? কে তিনি? এখানে—"

"দুশো টাকা ত দিলেনই। আরও ব'ল্লেন—কাজ কর্ম্মেরও একটা সুবিধা যাতে ক'রে দিতে পারেন, তাও দেখবেন। যদ্দিন না হয়,—দরকার হ'লে আরও সাহায্য করবেন।"

প্রভাস বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কে এই লোক! এই সহরে কে—কে এমন আছে। তবে কি তাঁহার শ্বশুরের কোনও বন্ধু কোনও কার্য্যোপলক্ষে সহরে আসিয়াছেন। কে ইনি। অবশ্য কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিতে অনেকেই চাহিতে পারে। কিন্তু বন্ধুর জামাতাকে অযাচিতভাবে একেবারে দুই শত টাকা—প্রয়োজনের অনেক অধিক সাহায্য দান—এরূপ উদারতা—এ যে একেবারেই অসম্ভব. কে এই লোক?

হরকান্ত কহিলেন,—"অবশ্য এটা বিস্ময়েরই কথা। কারণ এ রকম সচরাচর দেখা যায় না। তবে কি জান বাবা,-সবই এই পৃথিবীতে সম্ভব।"

"ইনি কে?"

"তা কি জান—তা কি জান বাবা, তিনি তাঁর নাম জানাতে তোমাকে বারণ ক'রে দিলেন। ঐ এক খেয়াল। তা, যখন তাঁর ইচ্ছে নয়, নামটা না হয় নাই শুনলে। এই যে টাকা, নেও, তুলে নিয়ে রেখে দেওগে।"

হরকান্ত বাবু বিছানার নিচে হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া প্রভাসের সম্মুখে ধরিলেন। প্রভাস নোটে হাত দিয়াই আবার হাত টানিয়া নিল। কহিল, না—থাক্ বরং আজকে আপনার কাছে। আমার যেন কেমন লাগ্‌ছে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে সব যেন কেমন স্বপ্নের মতই মনে হ'চ্চে।"

হরকান্ত বাবু কহিলেন,—"তা ত হ'তেই পারে। এ রকম একটা কথা কি তুমিই ভাব্‌তে পেরেছ, না আমিই ভাবতে পেরেছি। তা থাক্ বরং আজ আমারই কাছে, কাল সকালেই নিও।"

নোটের তাড়াটি হরকান্ত সাবধানে আবার বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

প্রভাস উঠিয়া আসিল। পদ্মাকে সব কথা বলিল। কিছুকাল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পদ্মা স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। সহসা দন্তে অধর দংশন করিয়া সে ভ্রূকুটি করিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুখ যেন আগুন হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। একটু—একটু কাল মাত্র সে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরেই উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া ডাকিল,—"বাবা!"

"কিরে! কি পদ্মা! কি হ'য়েছে?"

"বাবা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কে তোমায় টাকা দিয়ে গেল বাবা?"

"কে দিয়েছে! কেন, তা দিয়ে তোর কি হবে! তার নাম যে সে জানাতে চায় না,—

পদ্মা কহিল,—"আমি জানি কে দিয়েছে? ছি, ছি, ছি! কেন তুমি গেলে বাবা, কেন টাকা আন্‌লে বাবা!

হরকান্ত বাবুর মুখখানি একেবারে চুণ হইয়া গেল। প্রভাস ও স্ত্রীর পশ্চাতে আসিয়া বাহিরেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, সেও অবাক্ হইয়া রহিল। হরকান্ত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—"তুই জানিস সব, তুই কি ক'রে জান্‌বি! পাগল আর কি? কি বলে।"

আমি জানি—আমি সব বুঝ্‌তে পারি বাবা! তুমি—তুমি মন্মথ বাবুর কাছে গিয়েছিলে, সেই টাকা দিয়েছে,—

"ম—ন্—ম—থ! ব'লিস্ কি পদ্মা? ম—ন্ম—থ—! মন্মথ—এখানে কোথায়?"

পদ্মা কহিল, "আমি জানি বাবা—তাকে কাল দেখেছি, —ওই—ওই—তোমাদের কুমার সাহেবই মন্মথ"!"

হরকান্ত একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কন্যার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। ওদিকে প্রভাসও একেবারে যেন পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন্মথ—কুমার সাহেব—কে তিনি এদের? কেন এত টাকা তাকে পাঠাসেন?

পদ্মা কহিল, "কাল তাকে একবার দেখেছিলাম। ঘাটে তখন আমি বাসন মাজতে গিয়েছিলাম। দেয়ালের ওধারে এসে দাঁড়িয়েছিল—আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।" সহসা যেন শত বৃশ্চিক দংশনের মত তীব্র যাতনায় পদ্মা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। কহিল, "তার কাছে তুমি গিয়েছিলে বাবা—তার কাছে থেকে টাকা এনেছ? ছি—ছি—ছি? বাবা তেমন মন ত তোমার ছিল না? আজ এ কি করে পারলে? একটু কি লজ্জা হ'ল না তোমার?

হরকান্ত বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি জান্‌তাম না পদ্মা সেই মন্মথ। গিয়ে চিন্‌তে পাল্লাম্। টাকাও আমি আনতে চাইনি—বড্ড পেড়াপীড়ি ক'রে হাতে গুজে দিল। প্রভাসেরও এখন বিপদ—"

"হোক্ বিপদ? তার সাহায্য তিনি নেবেন—তার চাইতে—তার চাইতে—

পদ্মা বড় কঠিন একটা শপথ উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল,—মুখে বেধে গেল, সে থামিল।—একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়াই সে কহিল, "না বাবা, ও টাকা উনি রাখতে পারেন না। তুমি যাও টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস। যাও এখুনি যাও—

হরকান্ত বাবু কাতরভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—এই এত রাত্তিরে? তা তোমরা না রাখতে চাও, কাল সকালে বরং দিয়ে আসব।

"না। এক্ষুণি, আজই, এই রাত্তিরেই, ওটাকা এক-রাত্তিরও এঘরে থাকতে পারবে না। আমি সোয়াস্তি পাব না, ঘুমোতে পারব না—পাগল হয়ে যাব! না—না—আজই এক্ষুনি যাও—টাকা দিয়ে এস। একটা রাত্তির থাকবে? না—না? কে জানে কি হবে। যদি চোরে নিয়ে যায়, আগুনে পুড়ে যায়—আর দিতে পারব না। একটা রাত্তির—লম্বা একটা রাত্তির—কে জানে কি হবে। না—না—সকালে নয়—আজই, এক্ষুনি যাও—টাকা দিয়ে এস। বাবা রাগ ক'রো না তোমায় কষ্ট দিচ্ছি! কি ক'রব। আমি পাচ্ছি না। কিছুতেই সইতে পাচ্ছি না—সবুর কত্তে পাচ্ছি না। দোহাই তোমার—যাও, এক্ষুণি যাও—আমার মাথা খাও।"

হরকান্ত বাবু জামা উড়্‌না ও টাকাগুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—প্রায় আপন মনে কহিলেন "আর এমন কর্ম্মের ভোগও মানুষের হয়। এখন কি যে গিয়ে তাকে ব'লব—"

পদ্মা উত্তর করিলেন। ব'লবে, আমি জানতে পেরে টাকা ফেরত পাঠিয়েছি, ব'লবে—আমার স্বামী তাঁর সাহায্য প্রার্থী নন, কখনও হবেন ও না। তিনি যেন কোন দয়া তাঁকে ক'র্ত্তে না চান।"

হরকান্ত বাবু বাহির হইলেন। প্রভাস একটু সরিয়া দাঁড়াইল। পদ্মা কহিল। উনি একা—বুড়োমানুষ, তুমি একটু সঙ্গে যাবে? সে বাড়ীতে যেওনা, দরজায় বাইরে থেকো। উনি ফিরে এলে ওঁকে নিয়ে এস।"

প্রভাস কহিল "কি পদ্মা! এ সব কি? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"ফিরে এস। সব তোমাকে বলব। আমি নিজেই ব'লব। বাবাকে কিছু শুধিওনা। উনি—হয় ত বুঝিয়ে সব ব'লতে পারবেন না।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে দুইজনে ফিরিয়া আসিলেন। হরকান্ত বাবু নিঃশব্দে গিয়া শয়ন করিলেন। প্রভাস ও তার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। পদ্মা শয্যার পাশে বসিয়াছিল। কোনও উত্তেজনার চিহ্ন তার মুখে তখন ছিল না। প্রভাস দেখিল ধীর স্থির শান্ত উজ্জ্বল যেন দেবীমূর্ত্তির ন্যায় পদ্মা বসিয়া আছে!

প্রভাস ঘরে প্রবেশ করিতেই পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল "এসেছ বস।"

"তুমি উঠিলে কেন? ব'স না, ব'সেই সব বল।"

নতমুখে মৃদুস্বরে পদ্মা কহিল,—"না আগে সব বলি তুমি শোন।"

প্রভাশ বসিল, পদ্মা বলিতে আরম্ভ করিল,—"সে এই আট বছরের কথা, আমাদের বিয়ে হবার বছর দুই আগে উনি একদিন রাণাঘাটে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। বিপিনদার সঙ্গে উনি এক কলেজে পড়তেন। বিপিনদা, উনি, আরও কে কে শান্তিপুরে রাস দেখতে যান। ওঁর হঠাৎ খুব অসুখ হয়, বিপিনদা আমাদের ওখানে নিয়ে আসেন। কদিন আমাদের ওখানে ছিলেন, মা একা সংসারের কাজকর্ম্ম ছেড়ে আসতে পারতেন না, আমিই ওঁর শুশ্রূষা করতাম আর বিপিনদা ছিলেন, সেই

অবধি মধ্যে মধ্যে উনি বিপিনদার সঙ্গে আমাদের ওখানে আসতেন। আমার জন্যে অনেক ভাল ভাল জিনিষও আনতেন। আমার ছোট ভাই বোনদের জন্যেও খেলনা টেলনা আন্‌তেন। বিপিনদা ব'লেছিলেন, ওঁর বাপ বড় লোক জমিদার, ক'ল্‌কেতায় থাকেন। তাই বাবা শেষে আর আপত্তি এতে ক'রতেন না। তবে ওঁর বাবা যে খুব বড় জমিদার—রাজা এটা আমরা জান্‌তাম না। বোধ হয় পরেই রাজা হ'য়েছেন। বিপিনদা তা বলেনি কিছু।

প্রভাস কহিল, "রাজা উপাধি তিনি এই বছর তিনেক হ'ল পেয়েছেন, হাঁ, তারপর?"

পদ্মা কহিল, "বছর খানেক গেল—শেষে তিনি একদিন জানালেন, আমাকে বিয়ে করবেন। বাবা গরীব, বড় লোকের ছেলে আদর ক'রে তাঁর মেয়েকে বিয়ে ক'রবে, খুব আনন্দে এতে মত দিলেন। প্রথমে শুনেছিলাম, ওঁর মত হ'লে ওঁর বাবা আপত্তি ক'রবে না। শেষে বিপিনদা একদিন ব'ল্লেন, ওঁর বাপ এ বিয়েতে মোটেই রাজি নন। তবে উনি বিয়ে ক'রবেনই। আমাকে খুব ভাল বেসেছেন, এতটা এগিয়েছেন, বাপকে না জানিয়েই বিয়ে ক'রবেন। শীগ্‌গিরই একটা দিন ঠিক ক'ত্তে বলেছেন। দিন ঠিক হ'ল, আয়োজনও আরম্ভ হ'ল। উনিও আরও দুই একবার এলেন, বাবাকে অনেক ব'ল্লেন, আমাকেও—"

ব'লতে বলিতে পদ্মা চুপ করিল। প্রভাস কহিল,—"থাক বুঝেছি, আর ব'ল্‌তে হবে না পদ্মা। শেষে অবিশ্যি বিয়ে আর হ'ল না।"

"না। দিন দুই আগে বিপিনদা এসে ব'ল্লেন, ওঁর বাপ জোর ক'রে অন্য এক জায়গায় বিয়ে দিচ্ছেন, সেই দিনই বিয়ে—অনেকদিন আগেই সেইখানে বিয়ের কথা হ'চ্ছিল। বাবা তক্ষুনি ছুটে ক'ল্‌কেতায় গেলেন। কিন্তু দেখাও ক'ত্তে পাল্লেন না।"

প্রভাস কিছু বলিল না। গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল. পদ্মা আবার কহিল, "তারপর বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন। দুঃখ ক'রে, অনুতাপ ক'রে মাপ চেয়ে লিখেছিলেন। যত ভাল ছেলে তিনি পান তার সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ যেন তিনি করেন। বিয়েতে যত টাকা লাগে, তিনি দেবেন। কোনও সুপাত্রে আমি প'ড়েছি শুন্‌লে তিনি যারপরনাই সুখী হবেন।"

"তাও বুঝি শেষ দেন নি।"

"তখন বাবা সে সাহায্য নিতে চান নি।"

প্রভাস উত্তরে কিছু বলিল না। পদ্মাও নীরবে রহিল, তার চক্ষুদুটি হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে সে কহিল, "কাল রাত্তিরে তখন তোমাকে সব ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না, লজ্জা ক'রল। আরও ভাবলাম, থাক কাজ কি, শুন্‌লে হয় ত তুমি মনে একটা আঘাত পাবে, একটা অশান্তি তোমার জন্মাবে। আজ সব ব'ল্‌লাম, ভালই হ'ল। আমারও মনটা হাল্‌কা হল। সব শুন্‌লে জানি না তোমার মনে কি হবে, তবে আমাকে ভুল বুঝো না। যদি ত্যাগ ক'রে সুখী হও কোনও দুঃখু আমি ক'রব না। দয়া ক'রে যদি পায় রাখ, আমি কৃতার্থ হব। আমার—আমার দাবী কিছুই নেই।"

"দাবী নেই পদ্মা! সব দাবীই যে তোমার আমার উপরে।" বলিতে বলিতে প্রভাস উঠিয়া দাঁড়াইল। দুটি বাহু বিস্তার করিয়া পদ্মাকে বক্ষে টানিয়া নিতে নিতে কহিল, "পদ্মা এস। আমার বুকের লক্ষ্মী বুকে এস। আমার ঘরের লক্ষ্মী চিরদিন ঘর আলো ক'রে থাক। তোমায় ত্যাগ ক'রব! কেন কি হ'য়েছে? আজ এই পাঁচ বছরেও কি তোমায় চিন্তে পারিনে, যে আজ এক কথায় তোমায় ত্যাগ ক'রব। আর ও কথা তুলো না, ভুলে যাও। তোমার মনে কোনও দাগ প'ড়েছে কি না, কোনও দাগ এখনও মনের তলে কোথাও আছে কি না, কিছুই আমি জান্‌তে চাইনে। জানবার কোনও দরকারও নেই। মন্মথ একদিন যাই হ'ক আজ তুমি আমার স্ত্রী—আজ তুমি আমার কেবল আমারই। আমি স্বামী, আমার এই বুকে তোমায় বক্ষে না ক'রে ত্যাগ ক'রব।"

স্বামীর সেই প্রশস্ত উদার বক্ষে সাশ্রুধৌত মুখখানি পদ্মা রাখিয়া যেন আজ কৃতকৃতার্থ হইল। মনের কোণে কোনও দাগ যদি তার তখনও ছিল,—এই বক্ষের প্রশস্ত স্পর্শে তার পূত সেই অশ্রুধারায় তাহা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা কহিল, "তোমায় লুকোব না কিছু। দাগ—ছিল, কিন্তু আর নেই।"

বড় আবেগে প্রভাস পদ্মাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

গ্রাম্য-সাহিত্য

ঐতিহাসিকগণের তীব্র তাড়নায় গ্রামের উপকথা ব্রতকথা গাজনের গান প্রভৃতি গ্রাম্য সাহিত্য সাহিত্যের উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই! ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে তাঁহারা যথার্থ ঘটনা হইতে ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু উপকথা ব্রতকথাসমূহ কাল্পনিক ঘটনামাত্র। এক্ষণে এই মত বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য-প্রবাদ যতই বিশ্বাসের অযোগ্য হউক না কেন সেই প্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে অথবা তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ সত্যনির্ণয় করিতে যাইয়া যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আলোচনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ভুল বাহির হইতে হইতেই সত্যনির্ণয় হইবে। ইতিহাসবেত্তাগণ বলিবেন পর পর যেরূপ সত্যঘটনা ঘটিতেছে তাহা এবং নানাবিধ সত্য দলিলদস্তাবেজ সন্নিবিষ্ট করিয়া ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় আকস্মিক কারণে অনেক ঘটনার সন্নিবেশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে কোন একটী বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কোন ঐতিহাসিক আকৃষ্ট হইলেন অপর একজন হইলেন না। সে কারণ ইতিহাসের মধ্যে অনেক ফাঁক পড়িয়া থাকে। ইতিহাসের কোন্ একটী সময়ে কেন একপ্রকার বিশ্বাস একপ্রকার কার্য্য-প্রণালী—একপ্রকার প্রথা কোন একটী জাতির মধ্যে প্রচলিত হইল তাহা ইতিহাস বলিতে পারিবেন না। তাহা জানিতে হইলে ঐ সামান্য প্রবাদ, ঐ সামান্য উপকথা, সাধারণ বিশ্বাস কি জানিতে হইবে। ইহা জানিলেই মানুষের হৃদয়খানি জানা যাইবে। তখন প্রত্যেক উপকথা ব্রতকথা, প্রবাদ, প্রথা এবং কুসংস্কারের অভ্যন্তরে যে একটী মনুষ্যহৃদয়ের ইতিহাসের সত্যঘটনা নিহিত আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। জগদ্বিখ্যাত গ্রিম সাহেবের সূত্রের ন্যায় প্রতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনার সত্যতা নির্ণীত হইয়া মনুষ্য জীবনের ইতিহাসের এক একটী করিয়া সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

মানুষ কল্পনায় যে সমস্ত আপাত নূতন জিনিষ গড়ে বলিয়া বোধ হয় তাহার কোনটীও নূতন নহে। মানুষ কোন না কোন সময়ে কোন না কোন স্থানে একটী জিনিষ দেখিয়া যাহা বুঝিল তাহাই কল্পনা বলে নূতন রঙ্গে সাজাইয়া প্রচার করিয়া থাকে। রংটী চটাইয়া দেও সেই চির পুরাতন জিনিষ বাহির হইয়া পড়িবে। মানুষ আদিম কালে তীরধনু লইয়া যুদ্ধ করিত। ভীষণ যুদ্ধে যে তীর-বৃষ্টির উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকে শিলাবৃষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত উপকথাচ্ছলে একজন দৈত্য তাহার ধনু হইতে বাণবৃষ্টি করায় শিলাবৃষ্টি হয় এইরূপ বলিবে। তজ্জন্য তাহার ঐ বর্ণনা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া দোষ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। কারণ তাহার কল্পনা নূতন নহে। প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইতে তাহার কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। এখনকার অনেকব্যক্তি হয়ত আদিম মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে তথাপি শিলাবৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলিতে পারেন? জল জমাট বাঁধিয়া বরফ হইতে আমরা দেখিতেছি সুতরাং আমরা বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কিরূপে শিলাবৃষ্টি হয় তাহা দ্বারা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কেন শিলাবৃষ্টি হয় তাহা আদিম কালেই হউক আর বর্ত্তমান কালেই হউক কেহ কখন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এক্ষণে যেমন জল জমাট বাঁধার বিষয় শুনিয়া আমরা সন্তুষ্টচিত্তে শিলাবৃষ্টির কার্য্য-কারণ বিষয়ে উপলব্ধি করিতেছি সেইরূপ আদিম কালেও দৈত্যের বাণবৃষ্টির বিষয় উপলব্ধি করিয়া মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে কারণ উপলব্ধি করিত। এক্ষণে কি দৈত্যের বাণবৃষ্টিকে মিথ্যা কল্পনা বলিতে পারেন? কিছুতেই নহে। তবে প্রতি উপকথার, প্রতি ব্রতকথার অর্থ নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয় করিতে যতটুকু সময় ব্যয় করিয়া থাকি তাহার শতাংশের একাংশ সময়ও উপকথার তথ্য নির্ণয় করিতে ব্যয় করি নাই। জাতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ইতিহাস হইতে জানিলাম কিন্তু প্রতি মানুষের অভ্যুদয়ত ইতিহাস হইতে জানিতে পারিব না।

ইংরাজ রাজত্বের অব্যবহিত পর হইতে ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে মস্ত মাংসের সম্যক্

প্রচলন হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আবার সেই ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসী মতবাদে এক প্রকার পরিত্যাগ করিতেছেন। এই দুইটী ঘটনায় বিশেষ কারণ কি? তাহা ইতিহাস বলিতে পারিবেন না। তাহা জানিতে হইলে মানুষকে জানিতে হইবে। এই পৃথিবীটী একটী বড় রকমের নাট্যশালা। আমরা মানুষগুলি এক একটী নট-নটী। সুতরাং আমরা সর্ব্বদাই বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ভালবাসি। এখন এই একজনের অংশ অভিনয় করিলাম আবার অমনি বেশ বদলাইয়া অপর এক জনের অংশ অভিনয় করিতে চলিলাম। সুতরাং মানুষের রঙ্গমঞ্চে পোষাক হইতে যথার্থ মানুষ বাহির করা সুকঠিন। অভিনেতার পোষাক খুলিয়া তাঁহাকে নিজের পোষাকে বাহির করিতে হইবে। তবে আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব এবং আমাদের যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। দরিদ্র অভিনেতা যখন তাহার বসনভূষণ খুলিয়া সঙ্গীদের ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখনই আমরা প্রকৃত মানুষটি দেখিতে পাই। মানুষ প্রকৃত থাকিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে, সেই জন্য রঙ্গমঞ্চের রাজার সাজে বসনভূষণ পরিলেও শিশুর ন্যায় তাহা তাহার নিকট বিষম ভার বোধ হয়। তাই কবি গাহিয়াছেন—

রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন হার—
খেলাধুলা আনন্দ তা'র সকলি যায় ঘুরে,
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,
পাছে ধুলায় হয় সে দাগী,
আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হ'তে দূরে,
চল্‌তে গেলে ভাবনা ধরে তা'র
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার।
কি হবে মা অমনতর রাজার মত সাজে,
কি হবে ঐ মণিরতন হারে।
দুয়ার খুলে দাও যদিও ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্র বায়ু ধূলা কাদার পাড়ে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা,
সমস্তদিন নানান্ খেলা,
চারিদিকে বিরাট-গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার—
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার॥

কি কি প্রবাদ কি কি উপকথা এবং কি কি গান ও ছড়া প্রচলিত আছে, প্রতি গ্রামে প্রতি গ্রামবাসীর বাটীতে কি কি প্রথা আছে কি কি প্রকার বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে, কি কি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার সঙ্কলন করা আবশ্যক। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত মানুষের ইতিহাস পাইতে পারিব। একটী সামান্য ছড়ার ভিতরে কত মর্ম্মস্পর্শী ভাব নিহিত থাকিতে পারে, একটী সামান্য গানের ভিতরে কত মহৎ সত্য থাকিতে পারে তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকুক বা নাই থাকুক তাহাতে বড় আসে যায় না। কিন্তু আমাদের জাতীয়তা ঐ সকল প্রবাদ ঐ সকল উপকথা ঐ সকল গান ও ঐ সকল ছড়ার ভিতর জাগিয়া রহিয়াছে। সেই জাতীয়তার বিকাশ করিতে হইবে। জাতীয়তা হারাইলে মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকে না। নিদ্রিত জাতীয়ভাব সমূহ জাগরিত করিতে হইবে। আমরা মনঃক্ষেত্র পতিত রাখিয়াছি—ঐ জাতীয়ভাব জাগরিত হইলেই আবাদ হইবে। এবং আবাদ হইলেই—সোনা ফলিবে। সহরে সকলেই রঙ্গমঞ্চের সং সাজিয়া বসিয়া থাকি। সহরে অভিনয় কার্য্যের বিরাম নাই। সহরে যাত্রা করিয়া না বেড়াইয়া এস আমরা সাতকোটি ভাই মাতৃভাষার ডাকে মিলিয়া যেথায় মাটী ভেঙে চাষা চাষ করচে, যেথায় পাথর ভেঙে পথ কাটচে, রৌদ্র জলে সব একাকার হইয়া ধুলা মাখিয়া জীর্ণবস্ত্রে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ গ্রাম্য প্রবাদ ঐ গ্রাম্য উপকথা ঐ গ্রাম্য ছড়া ও গানের আবিষ্কার করতঃ গ্রাম্য-সাহিত্যের প্রচার করি। তাহা হইলেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন চেষ্টা সার্থক হইবে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পল্লীর প্রাণ

(৩২)

কমলার গৃহদ্বারে উঠিয়া অম্বিকা কিছু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি শুন্‌তে পাচ্চি ছোট বউ ?"

কুন্তী দ্রুত উঠিয়া আড়ালে গিয়া অন্ধকারে লুকাইল। কমলা কাঁদিতেছিলেন, আরও কাঁদিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কহিলেন, "মিছে কথা! সব মিছে কথা ঠাকুর পো!—ঠাকুরঝিই রাগ ক'রে এই সর্ব্বনেশে কথা তুলেছেন। কই নিবু ত কখ্‌নো এখানে আসে না। সেই একদিন ক্ষেতু ডেকেছিল—মাছ কিন্‌তে দেবে বলে—"

অম্বিকা কহিলেন, "কেন, তোমার ঘরও নাকি সে মেরামত ক'রে দিয়ে গেছে!"

কমলা থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "ঘরে তখন কিছু ছিল না,—তাই দেখে গিয়েছিল, আমি ডাকিওনি, বলিওনি কিছু। নিজে এসে জোর ক'রে সেরে দিয়ে গেল। কত লোকের ত অমন তাবা দেয়—"

"হুঁ—! তা যাইহ'ক্‌ কথা যখন একটা উঠেছে—"

"মিছে কথা—সব মিছে কথা। কই কে এমন কথা ব'লে? এক উনিই রেগে যত কুকথা ব'ল্‌ছেন। শিবুর সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে—ওমা এও কি একটা কথা! আমি—"

কথাটা কাণে যাইতেই অম্বিকার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। উচ্চস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি টাকা দিতে পারবে যে সর্ব্বগাঙ্গুলী তোমার মেয়ে নিবে? অমন দুরাশা মনেও যদি এনে থাক—বড্ড ভুল ক'রেছ।"

"দোহাই ধর্ম্মের, ঠাকুরপো! এত বড় দুরাশার কথা স্বপ্নেও যে ভাবিনি! ওর যে মোটে বিয়েই হবে সে আশাই ত কখনও করিনে।"

"বিয়ে কেন হবে না? মোটেই বিয়ে কেন হবে না? তুমি না পার, আমাদে'ই ওকে পাত্রস্থ ক'রে দিতে হ'বে। ঝগড়া ঝাটি যাই থাক, জাতমানের দায়িক ত আমরাই।—তবে তেমন ভাল অবশ্য পারব না—"

"ভাল আর কি ঠাকুরপো। দুটি ভাত দিয়ে ঘরে রাখ্‌তে পারে, এই হলেই বে'চে যে হ'য়।"

অম্বিকা কহিলেন, "সেটা—তা তুমি যখন পারবেই না—যাহ'ক, একটা গতি ক'রে দিতেই হবে। কিন্তু এই যে একটা কথা উঠেছে—"

"ও কিছু না কিছু না ঠাকুরপো! অমন সর্ব্বনেশে কথা কেউ ব'লবে না—"

"বলছে ত। মিছে হ'ক সত্যি হ'ক—কথা একটা উঠেছে। কেবল কি দিদি রেগে গাল দি[illegible]? আরও অনেকে বলে, আমি কি না জেনে ব'লছি?"

কমলার মুখ শুকাইয়া গেল। তবে কি সত্যই এত বড় একটা কথাই অভাগীর নামে রটিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ!

অম্বিকা কহিলেন, "কুমারী মেয়ে—এইরকম একটা কলঙ্ক প্রচার হ'য়ে গেলে কি আর বিয়ে দেওয়া যাবে? একেবারে যে জাতমারা হ'য়ে থাকবে। হাড়ী আলাদা হ'লেও একই ঘর ত। আমরাই বা লোককে কি ক'রে মুখ দেখাব?"

"তা হ'লে—কি ক'রব ঠাকুরপো এখন?"

অম্বিকা কহিলেন, "বাড়ীতে থাক্‌লে কথাটা ডালপালা নিয়ে আরও বাড়্‌বে। সে হতভাগাও হয় ত আসবে যাবে, এটা ওটা পাঠাবে—মনের অগোচর পাপ নেই—কার মনে কি আছে—তুমিও জান না, আমিও জানি না। শেষে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে। এ জাতমান কেবল তোমার নয়, আমাদেরও বটে। তাই ব'লছিলাম, বাড়ীতে থেকে আর কাজ নেই। আমার সঙ্গে চল। ওখানে আমার বাসায় থাক্‌বে। শিগ্‌গিরই একটা সম্বন্ধ দেখে ওর বিয়ে দিয়ে ফেলব। এখানে না থাক্‌লে কথাটাও চাপা প'ড়ে যাবে।"

কমলা উত্তরে হাঁ না কিছু বলিলেন না। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, ধীরভাবে কিছুই বিবেচনা করিবার মত শক্তি তখন তাঁহার ছিল না।

অম্বিকা কহিলেন, "তা হ'লে কি বল? আর বলাবলি আর কি? তোমাকে যেতেই হবে। আমাদেরও ত দায় একটা আছে। মান অপমানেরও ভয় আছে। এই সব কথা যখন হ'চ্ছে—আরও হ'তে পারে—বাড়ীতে

তোমাদের আর রাখতে পারিনে। যাবার জন্যেই তৈরী হও। কালই পারিত আমি যাব। কি বল?"

শুষ্ককণ্ঠে কমলা উত্তর করিলেন "ব'লব আর কি? যেতেই যদি হয় ত যাব।"

"যদি হয় কি? যেতেই হবে। বাড়ীতে এই সব কেলেঙ্কারী হয়ে জাত যাবে, আর আমরা চুপ ক'রে থাকব? সে হ'তেই পারে না।—কালই আমার সঙ্গে যেতে হবে। আর ক্ষতি কি তোমার, এখানে শুনছি দুঃখক্লেশ পাও, আমার পরিবার ভুক্ত হ'য়ে থাকবে,—খেতে প'রতে আমিই দেব। মেয়ের বিয়ে দেব, আর বরাবর যদি থাক মেজোকেও ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

"আচ্ছা।"

অম্বিকা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার সঙ্গে যদি হইলই না, কুন্তীর সঙ্গে শিবুর বিবাহ কিছুতেই না হয়, তাহা করিতে হইবে। একবার তাঁহার বাসায় নিয়া ইহাদের পুরিতে পারিলে কারও সাধ্য নাই ওই হতভাগীর মেয়েকে আনিয়া বিবাহ দেওয়াইতে পারে! হতভাগী নিজে যদি কারও সঙ্গে কোনও কুচক্র চালায়; তৎক্ষণাৎ তিনি যার সঙ্গে হয় মেয়েটার বিবাহ দিয়া ফেলিবেন। একটি কুলীনের ছেলে—না হয় বংশজ হইল—অপত্নীক কি বিপত্নীক কি সপত্নীক—যে বয়সের যেমনই হউক সহরে অবশ্য মিলিবে।

শিবুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া অম্বিকা এইরূপ একটা মতলব স্থির করিলেন। ওদিকে ঠিক এই সম্ভাবনাই চিন্তা করিয়া কমলার মতলব স্বভাবতঃই বিপরীত দিকে গেল। অবশ্য এমন একটা দুরাশার কথা ইতিপূর্ব্বে স্বপ্নেও তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু বামার বকাবকি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন এইরূপ একটা কথা হইয়াছে বটে। নিবু টিবু ওরা সব চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে শিবুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ দিতে পারে। তা নিবুরা যদি মতলব করে কি না পারে? শিবু ত একেবারে নিবুর হাতে। আজকালকার ছেলে, বিবাহেও বাপমায়ের মতে সর্ব্বদা চলে না। গ্রামের আরও ছেলেরা সব এই মতলব করিয়াছে। কেজানে, হয়ত বা—কপালে যদি থাকে—হইতেও পারে! কেজানে বিধাতা যদি এত বড় ভাগ্যই মেয়েটার কপালে লিখিয়া থাকেন কেনই বা না হইবে, এমন ত কত হইতেছে। গরীবের মেয়ে কত রাজার ঘরে যাইতেছে। তবে এই একটা বিশ্রী কলঙ্কের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এবে একেবারে মিথ্যা কথা! ওই সর্ব্বনাশী বামা অভাগীর রটনা। কিন্তু ধর্ম্ম ত এখনও আছেন? এত বড় মিথ্যা কথাটা কি লোকে বিশ্বাস করিবে? না—না, তা কখনও হইতে পারে না! এমন কি মহাপাপ তিনি করিয়াছেন, যে এত বড় একটা জাতমারা শাস্তি বিধাতা তাহাকে দিবেন। কিছু না—কিছু না। কেহ বিশ্বাস করিবে না! বামাকে কে না জানে? আর নিবুর মত ছেলে—তার নামেই বা এমন একটা কুকথা কে মনে ধরিবে? না—না! কিছু ভয় নাই। বিধাতা কি এমনই নিষ্ঠুর যে দুঃখীকে এত বড় একটা আশা দেখাইয়া আবার এমন করিয়া নিরাশা করিবেন? কিন্তু কালই যদি অম্বিকার সঙ্গে মেয়ে লইয়া তিনি সহরে চলিয়া যান, তবে ত কিছুই হইবে না সব মিথ্যা হইবে। উহাদের ইচ্ছা নয় যে শিবুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয়। সেই সহরে, দেবরের বাসায় দেবরের হাতের মধ্যে গিয়া পড়িলে, আর তিনি মেয়ে আনিয়া শিবুর সঙ্গে বিবাহ দিতে পারিবেন? হয় ত সেই মতলব করিয়াই তাঁহাদের নিয়া যাইতে চায়। নিয়াই হয় ত একটা লক্ষ্মীছাড়া বুড়ার হাতেই তিনি কুন্তীর বিবাহ দিয়া ফেলিবেন। একা অসহায় মেয়েমানুষ, তিনি কি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন? না—না। উহাঁর সঙ্গে যাওয়াটা ভাল হইবেনা! কিন্তু থাকিবেনই বা কি প্রকারে? উনি যদি জোর করিয়া লইয়া যাইতে চান? তিনি কি জিদ করিয়া থাকিতে পারিবেন? ওরা কি তাহা হইলে তাহাকে আস্ত রাখিবে? একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইবে! হয় ত আরও কত কুৎসা করিয়া দশপাঁচ জন লোক ডাকিয়া এই কথা বলিবে। সকলে জিদ করিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে! তাইত! এই সঙ্কটে এখন উপায় কি।

অনেকক্ষণ বসিয়া কমলা ভাবিলেন অনেক রাত্রি হইল। দরজা খুলিয়া একবার বাহির হইলেন। গভীর অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে সব নিঝুম নিস্তব্ধ। ওঘরে কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। ঘরে আসিয়া চুপি চুপি তিনি কুন্তীকে ডাকিলেন।

কুন্তী চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তখনও ঘুমায় নাই, ঘুম পাইয়াছিল না—মায়ের ডাকে চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কি মা?"

"চুপ! আস্তে!—শব্দ করিস্‌নি কিছু।"

"কেন, কি হ'য়েছে মা?—" ভয়ে কুন্তী শিহরিয়া উঠিল।

কমলা কহিলেন "শোন্‌, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, হয় ত ফিরতে একটু দেরী হবে—"

"সেকি! কোথায় যাবে মা? এই এত রাত আঁধার পথ—একা—আমার যে বড় ভয় ক'চ্চে—"

"ভয় কি মা বড় যে বিপদে প'ড়েছি—কুল পেতে হবে। এসব ছোট ভয়ে দম্‌লে কি চলে?"

"বিপদ—তা—এত বেতে কোথায় কার কাছে গিয়ে তার কুল পাবে মা?"

"না—না, ত নয়া। তার জন্যে আর এই রাত্তিরে কার সঙ্গে যাব? গিয়েই বা কি হবে! ধর্ম্ম আছেন,—তিনিই কুল দেবেন।—তোর কাকা যে আর এক সর্ব্বনেশে কথা ব'ল্লেন, তিনি যে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে যেতে চান।"

কুন্তী কিছু বলিল না। চুপ করিয়া রহিল। কমলা কহিলেন, "সেটা ভাল হবে?

কুন্তী কি ভাবিয়া কহিল, "না না। সেখানে গিয়ে কাজ নেই মা।"

"আমিও তাই বল্‌ছি। কিন্তু জোর ক'রে যদি নিয়ে যায়, তবে কি ক'র্‌ব?"

কুন্তী যেন ভয় পাইয়া মার হাত ছটি চাপিয়া ধরিল কহিল, "না মা, যেও না, কিছুতেই যেতে চেওনা। তুমি না গেলে টেনে হেঁচড়ে ত নিয়ে যেতে পার্‌বে না।"

"মা, তা কি আর কেউ পারে? তবে খুব গোলমাল একটা বাধাবে—পাঁচজনকে ডেকে যা তা ব'লবে। তখন কি মুখ তুলতে পার্‌ব—না কথাটি বল্‌তে পার্‌ব? সবাই জোর ক'রে, ব'ল্‌বে যাও। থাক্‌তে পার্‌ব কি মা? থাক্‌লে যে আরও কত কথা হবে।"

কুন্তী একটু ভাবিয়া কহিল. "তা তুমি কোথায় যেতে চাচ্চ এখন?"

কমলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "কোথায়ই বা আর যাব? তবে ভাব্‌ছিলাম ভবানীদিদির ওখানে—"

কুন্তী বলিয়া উঠিল, "ছি ছি! না মা, আর ওখানে যেওনা।" আরও শক্ত করিয়া সে মার হাত চাপিয়া ধরিল।

কমলা কহিলেন, "কোথায় কার কাছে আর যাব মা! আমি যে ভেবে কুল পাচ্চিনে। তবু তারা একটা বুদ্ধি ত দিতে পার্‌বে? তা তুই বড় হ'য়েছিস মা, সব বুঝিস, আর বিপদে লজ্জাই বা কি? তোকে খুলেই সব বলি! একটা বুঝতেও হয়ত,—ওরা যে সব কথা ব'ল্লে—ওই শিবুর কথা তা ওরাত ওই কথা ব'ল্লে। হয়ত কথাই একটা হ'য়েছে তা কপালে যদি থাকে, হতেও পারে কিন্তু বল্‌তে ত পাবিনে, কিছু যদি মিছেই হয়—আশা যদি কিছু নাই থাকে—তবে মিছে একটা গোলমাল ক'রে থেকেই বা কি হবে? কেবল কলঙ্ক বাড়্‌বে বইত নয়? বরং যাব, শেষে কপালে যাই থাক্‌।"

কুন্তীর শিথিল হাত দুখানি মার হাত হইতে আলগা হইয়া পড়িল। একটি নিশ্বাস সে ছাড়িল। কমলা কন্যার পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তা হ'লে আসি মা।"

কুন্তী কহিল "যা—ও। কিন্তু—কাকার সঙ্গে সঙ্গে না গেলে কি চ'ল্‌বে না?"

কমলা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "দেখি। যেতে কি আমিই চাই? তবে এদিকে আশা যদি কিছু নাই থাকে—"

কুন্তী বলিয়া উঠিল, "ওসব আশার কথা কিছু মনে রেখো না। তবে কাকার সঙ্গে যাব না,—জোর ক'রে না নিয়ে যেতে পারে, তার একটা উপায় ক'রো।"

"আচ্ছা—যাই ত দেখি।"

কমলা উঠিলেন। কুন্তী কহিল "এখন এই অন্ধকারে যাবে মা? ভয় ক'র্‌বে না?"

"ভয়! ভয় কি আর আছে মা? মাথার যার এত বড় বিপদ, তার কি আর ভয় থাকে মা? আমি যে সাপ বাঘের মুখেও গিয়ে আজ দাঁড়াতে পারি।"

"কেউ যদি দেখে, কি ব'ল্‌বে?"

এ সম্ভাবনাটা কমলা চিন্তা করেন নাই। একটু ভাবিয়া কহিলেন, "তা—না হয় ব'ল্‌ব, তোর খুব অসুখ ক'রেছে, ক'ব্‌রেজের বাড়ী যাচ্ছি। কে জানে যদি কেউ খোঁজ নিতে আসে, ব'লবি, আমার পেটে খুব ব্যথা ধ'রেছে, মা, ক'ব্‌রেজের বাড়ী গেছে ঔষধ আন্‌তে।"

চুপি চুপি কমলা বাহির হইয়া গেলেন।

(৩২)

"কে, কমলা ? ও মা, এই রাত্তিরে একা যে ? কারও কোনও অসুখ হয়নি তো বোন্?"

বলিতে বলিতে ভবানী একটি আলো ধরাইয়া বাহির হইলেন। কমলা কহিলেন, "না দিদি, অসুখ কারও কিছু হয়নি। তবে বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। একটা গতি আমাদের ক'রে দিতে হবে।"

"কি, কি হ'য়েছে! কিসের বিপদ! অম্বিকে ত আজ বাড়ী এসেছে, শিবুর সঙ্গে তার মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল—"

"তাই ত দিদি, ওঁরা আমাকে না ব'লছেন এমন কথা নেই। আমি ত কিছুই জানিনে দিদি,—কিছুই ত আমি করিনি। শিবু কুন্তীকে বিয়ে ক'রবে, এত বড় একটা দুরাশা কি আমি মনে আনতে পারি? তা—"

নিবারণ তার ঘর হইতে ডাকিল, "কে মা? কার সঙ্গে কথা ব'লছ?"

ভবানী কহিলেন, "একটু উঠে আয় এ ঘরে।"

নিবারণ বাহির হইয়া আসিল।

একি! খুড়ী মা! আপনি এত রেতে—"

"বড় বিপদে প'ড়ে এসেছি বাবা। তা, ঘরে চল দিদি, কেউ যদি দৈবি দেখে তবে সর্ব্বনাশ হবে।"

তিনজনে ঘরে গিয়া উঠিলেন।

কমলা সকল কথা বলিলেন। ভবানী নিবারণের দিকে একবার চাহিলেন। এই কুৎসার মূলে কোনও সত্য থাকিতে পারে, এরূপ কোনও সন্দেহ কি তাঁহার মনে উঠিয়াছিল? মুখ তুলিয়া নিবারণও মাতার মুখের দিকে চাহিল। অগ্নিবর্ণ চক্ষু দুটির সেই নির্ভীক জ্বলন্ত দৃষ্টি সহজ সরলভাবে ভবানীর সেই ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিলিত হইল। ভবানী যেন একটু লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিলেন। ছিঃ! তিনি মা, তিনিই যদি সন্দেহ করেন, অন্য লোকে কি না বলিতে পারে? অবশ্য নিবারণের এ কথা মুহূর্ত্তের তরেও মনে হইল না যে, মাতার মনে একটা সন্দেহের কিছুমাত্র আভাস কখনও উঠিতে পারে। একটু কি ভাবিয়া ভবানী কহিলেন, "তা এখন কি ক'রতে চাও বোন্?"

কমলা কহিলেন, "তাই ত তোমার কাছে এসেছি দিদি। ত বড় ভয় পাই। কি জানি ওদের মনে কি আছে? হয়ত নিয়ে গিয়েই একটা হাভাতে বুড়ো কি মাতাল দাঁতালের হাতে মেয়েটাকে ফেলে দেবে। তার চাইতে—কুলীনের মেয়ে না হয় বিয়ে নাই হবে।"

নিবারণ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "তা যদি মনে করেন খুড়ী মা, তা হ'লে যাবেন না—কিছুতেই যাবেন না।"

"যাব না—কি ক'রে থাকব? কোথায় থাকব? জোর ক'রে যে নিয়ে যাবে। সবাইকে ডেকে এই সব কথা ব'লবে, কত বকাবকি ক'রবে। শিবুর সঙ্গে রাধারাণীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল—ওদের মনে একটা সন্দেহ হ'য়েছে, কুন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তাই বড় রেগে গেছে। হাঁ দিদি, তা এই কথাটা কি ক'রে উঠল, আমি ত কিছুই জানিনে।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "ওই ছেলেদের পাগলামো বোন্। শিবুর বাবা তা ক'রবেন কেন? তাঁর হ'ল টাকার দরকার। টাকা তুমি কেত্থেকে দেবে? আর সত্যিই কি বাপের অমতে ছেলে গিয়ে জোর ক'রে বিয়ে ক'ত্তে পারে? ক্ষ্যাপা ছেলেদের যত পাগলামো!"

কমলা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "তা—এখন কি ক'রব দিদি?"

"কি ব'লব বোন্, বড় শক্ত কথা। না গেলে ওরা যে রকম লোক নানারকম কথা হবে—শেষে কি ক'রবে?"

কমলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "সব বুঝি দিদি, কিন্তু নিয়ে গিয়েই যদি মেয়েটাকে জলে ফেলে দেয়, কি উপায় কর্‌ব তখন? বড় দুঃখী আমি, কিন্তু তবু ত প্রাণে ধ'রে এখনও যার তার হাতে ওকে দিতে পারি নি। দেখতে—ভাল টাকা দিয়েও ত শিবঘাটের রায়েদের ঘরে ওকে নিতে চেয়েছিল। তা ষাট বছুরে বুড়ো দিদি, পেটের দুটি ভাতের জন্য মা হ'য়ে কি ক'রে সেই জানা আগুনে ওকে ফেলে দিই?—আমি ভিক্ষে ক'রে খাওয়াচ্ছি। বামুনের মেয়ে—ও না হয়, ভাত রেঁধেই খাবে। ওরা বড় শত্তুর ওরা, দুষ্টবুদ্ধি ক'রেই নিয়ে যেতে চাচ্চে—গিয়েই হয়ত টাকা খেয়ে লক্ষীছাড়া কারও হাতে ওকে ফেলে দেবে। কি উপায়ে তখন কি ক'রব দিদি?"

নিবারণ কহিল "আপনি যাবেন না, খুড়ীমা। মা, তুমি কিসের ভয় ক'চ্চ! ধর্ম্ম আছেন এতবড় একটা মিছে কথা কখনও দাঁড়াতে পারে না। ওর বিয়ে—তা

না হয় দুবছর দেরীই হবে। কিন্তু হবে, এমন লোক পৃথিবীতে দুর্লভ নয়, যারা এই সব মিছে নিন্দে গ্রাহ্য না ক'রে এমন দুঃখী মেয়েকে আদর ক'রে বিয়ে ক'র্‌বে।"

ভবানী কিছু বলিলেন না। ইহার ফল যে ভাল হইবে না,—নিবারণের পক্ষেও না, কুন্তীর পক্ষে ত নয়ই তা তিনি বেশ বুঝিলেন। কিন্তু কমলার দুঃখে তাঁহার কোমলচিত্ত বড় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। একটু জোর করিয়া যাইতে তাহাকে উপদেশ দিবেন, সে ভরসাও হইতেছিল না। সত্যই ত, ওরা যে রকম লোক, গিয়াই যদি মেয়েটা একটা অতি কুপাত্রে ফেলিয়া দেয়! সেই ভয়ে যাইতে চায় না, তিনি কি করিয়া বলেন, যাও। এমন একটা সর্ব্বনাশ যদি হয়, ধর্ম্মের কাছে যে তিনি দায়ী হইবেন। আবার নিবারণও হয় ত মনে করিবে, মা তাকে সন্দেহ করিয়াই কুন্তীকে গ্রাম হইতে সরাইয়া দিতে চাহিতেছেন! ছি ছেলে এমন কথা ভাবিবে! মনে করিবে, মিথ্যা সন্দেহে মা পরেরমেয়ের সর্ব্বনাশ করিতেছেন!

ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন,—"তা হ'লে—যেও না। ওরা গাল দেবে দিক্। কতই ত দেয়, চুপক'রে স'য়ে যাবে।"

"তা কি পার্‌ব দিদি! সবাইকে ডাকলে একটা হুলস্থুল গোলমাল বাধাবে, সবাই শেষে জোর ক'রে পাঠিয়ে দেবে। আমি কি থাকতে পার্‌ব ?"

"তবে কি ক'র্‌বে? কোথায় যাবে? অবিশ্যি এই একটা কথা না হ'লে আমার ঘরেই এসে থাক্‌তে পার্‌তে,—"

"না—না। তা কি আর পারি দিদি? তবে পাড়ায় যদি কেউ আশ্রয় দেয়। চিরকাল ত থাক্‌ব না,—কটাদিন—"

ভবানী মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—"না দিদি, এ পাড়ায় নয়। ভাব্‌তেও আমার ভয় ক'চ্চে—অবিশ্যি একথা তোমাকে ব'ল্‌তে পারিনে যে তুমি অম্বিকের সাথে যাও। তবে বাড়ী ছেড়ে এলেই দশটা কথা হবে। এ পাড়ায় এলে ত রক্ষে নেই। আর এই কথা হ'লে পাড়ার কেউ কি তোমায় একদিনও রাখ্‌তে চাইবে? আরও আমাকে এসে পাঁচ কথা শোনাবে।"

"তবে কোথায় আর যাব দিদি? কে আর আমাকে ঠাঁই দেবে।"

ভবানী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—"বাড়ীতে থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল হ'ত বোন্। তবে ভরসা যদি নাই পাও, তবে কোথায় আর যেতে পার, এক শীতল চক্কোত্তী আছে তোমার সম্পর্কে ভাই, তার বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে পার। তবে যে ভয় ক'চ্চ সে ত সেখানেও ঘট্‌তে পারে। তারা যদি গোলমাল করে, দশজনকে ডেকে বলে, সেইখানে গিয়েই কি ব'ল্‌তে পারবে না? পালিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লে, সেটা আরও দোষের দেখাবে।"

নিবারণ কহিল,—"কিছু দোষের দেখাবে না মা। তারা এসে গোলমাল ক'রে, উনিও ব'ল্‌বেন জোর করে নিয়ে বুড়োর সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে,—তাই আমি পালিয়ে এসেছি, বাবনা।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "সে কথা ত বাড়ীতে থেকেও বলা যেতে পারে।"

কমলা কহিলেন,—"তা পারে দিদি। কিন্তু পাড়ায় ত কেউ আমার সহায় নেই,—একা মেয়ে মানুষ আমি। কে জানে ওদের মনে কি আছে,—বড় ভয় করে দিদি।"

"তাহ'লে তাই কর। শীতল চক্কোত্তীর বাড়ীতে গিয়েই থাক ক'দিন। দেখ কি হয় তার পর যাহা হয় দেখা যাবে।"

"যেথানে হয় আজ রাত্তিরেই যেতে হবে দিদি। কাল দিনে আর পারব না। আর শীতল দাদাই কি সাহস করে আমায় আশ্রয় দেবেন? ওদের সঙ্গে একটা শত্রুতা এ নিয়ে হবে, তিনি ভয় পাবেন। এই যেতে গিয়ে উঠব হয়ত অমনি ব'ল্‌বেন, না এখানে থাক্‌তে পাবে না,—আর কোথাও যাও।"

নিবারণ কহিল "আচ্ছা আমি, এক্ষুনি চক্কোত্তী খুড়োর কাছে যাচ্চি। যাতে গোলমাল তিনি না করেন, যদ্দিন দরকার আপনাকে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে দেন, তা করা যাবে। খরচপত্তরের জন্যে তাঁর ভাবনা কিছু নেই—, সেটা চালিয়ে দেওয়া যাবে। তা হ'লে আপনি উঠুন খুড়িমা। আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আমি চক্কোত্তী খুড়োর কাছে এক্ষুণি যাচ্ছি। তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি এগিয়ে আপনাদের তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।"

কমলা কহিলেন "তুমি যাবে বাবা আমার সঙ্গে? না থাক্, শীতল দাদার ওখানেই যাও। আমি একাই এক্ষুণি যাব।"

"একা! একা কি ক'রে যাবেন।"

"একাই ত এসেছি—"

"একা এসেছেন? কি সর্ব্বনাশ!"

"এ আর কতটুকু সর্ব্বনাশ বাবা? যে বিপদে পড়েছি তার কাছে এ আর একি?"

ভবানী কহিলেন "তা ঠিকই ত। ও একাই যাক্ নিবু। তুই ওর সঙ্গে ওদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাস্‌নি, কেউ যদি দৈবি দেখে—"

নিবু ঠোঁটে কামড় দিয়া মুখ নীচু করিল। এ আপত্তির কারণটা সে বুঝিতে পারিল—মনে মনে যেমন লজ্জা তেমনই রাগ তার হইল। ঘোষালদের কাহারও হাতের কাছে পাইলে সে বোধ হয় তখন নখে চিরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত।

রাত্রি আরও প্রায় চারিদণ্ড অতীত হইয়াছে। অন্ধকার পথে নিবারণ শীতলচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ঘোষালদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। শীতল চক্রবর্ত্তী দরিদ্র,—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, তারিণী বাড়ুর্য্যের বাড়ীতে একটি পাঠশালার গুরুমহাশয় তিনি ছিলেন। ঘোষালদের তিনি ভয় করিতেন। কমলাকে এরূপ অবস্থায় আশ্রয় দিতে প্রথমে তিনি বহু আপত্তি করিয়াছিলেন। নিবারণ অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক ভরসা দিয়া শেষে তাহাকে রাজি করে। তখন তিনি বলিলেন, "একা আমার বড় ভয় করে বাবা তুমি আমার সঙ্গে চল। ওদের এখানে পৌছে দিয়ে তারপর যেও। বরং একটু ফাঁকে ফাঁকে আগ্‌লা থাকবে—ডাকলে যেন পাই।"

নিবারণ অগত্যা তাঁহার সঙ্গেই গেল।—অন্ধকার পথে তারা চুপি চুপি যাইতেছিল। হঠাৎ বেণীবসুদের বাড়ীর সরকার নিমাইঘোষ পার্শ্বের এক পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। সে কোথায় কি কাজে গিয়াছিল, এখন বাড়ীতে ফিরিতেছে।

"কে ও?"

"আমি—অমি—শীতল চক্কোত্তী!"

"এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চেন চক্কোত্তী মশাই?"

একটা জরুরী কাজে এদিকে—যাচ্ছি দাদা! একটি লোককে আজ রাত্তিতেই একটা খবর দিয়ে আস্‌তে হবে—

"সঙ্গে ও কে—গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোল?"

"কই—দেখিনি ত!"

"বটে!" হঠাৎ নিমাইঘোষ গাছের দিকে ঘুরিয়া গিয়া পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালাইলেন। নিবারণ সামলাইতে পারিবার আগেই সেই আলোতে নিমাইঘোষের দৃষ্টিগোচর হইল।

"একি! নিবু গাঙ্গুলী যে!—কোথায় যাওয়া হচ্ছে দুজনে এই রাত্তিরে?"

চোর ধরা পড়িলে যেমন হয়, শীতল চক্রবর্ত্তী। তেমনই অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।—নিবারণ অগ্রসর হইয়া, কহিল, "আমি আমার একটা কাজে যাচ্ছিলাম—কারও সঙ্গে দেখা হয়, এটা—আমার ইচ্ছে ছিল না—তা হ'ল ত হ'ক!"

নিমাই ঘোষ একটু সন্দিগ্ধ ভাবে ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজের পথে চলিয়া গেল।

শীতল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "কাজটা—ভাল হ'ল না বাবাজি!"

"তা ত নয়ই। তবে আর উপায় কি?"

"আমি বলি, আজ থাক্। কাল সকালে গিয়ে বরং আমি—"

"না না! সে হ'তে পারে না। তাঁকে ভরসা দিইছি। তিনি পথচেয়ে বসে আছেন। কে জানে, কাল দিনে হয়ত মোটে হবেই না।"

অগত্যা শীতলচক্রবর্ত্তী গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। কিছু কাল পরেই তিনি কমলা কুন্তী ও কেতুকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নিবারণ পশ্চাতে একটু দূরে আসিতেছিল। ইহার বাড়ীতে পৌছিলে সেও গৃহে গেল। কিন্তু তার মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। নিমাই ঘোষ দেখিল,—কাজটা মোটেই ভাল হইল না।

(ক্রমশঃ)

বাঁশীর সুর

ডুমাল কোটের রাজকুমারী মিরণবাই ঘুমের ঘোরে ভোরের বেলায় বাঁশীর রবে জ্বালাতন। বাঁশী যেন কথা বলে, মিরণ যেন তাহা বোঝে। তাই সে আকুল হয়, চোখের ঘুম ছুটে পলায়। আবার সাঁজের বেলা সেই বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠে, আর রাজকুমারীর কানের কাছে ফিসফিস্ করিয়া কথা বলে। চোখের পাতা মুদিয়া যায়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নেও যেন সে সুরের রেশ লাগিয়া থাকে।

সকাল সাঁঝে বাঁশীর কোনও বিরাম নাই। সে বাঁশীর রব যেন কোন সাধকের সাধনা, কোন উপাসকের উপাসনা। তাই তাহা না থামিয়া সময় মত উপাস্যের নিকট ছুটিয়া যাইতে লাগিল। রাজকুমারীর নূতন যৌবন তাই তিনি বাঁশীর সাধনা কিছু বোঝেন। তাই তিনি কিছু বিরক্ত, কারণ তা'তে তিনি কিছু আসক্ত।

অনেক চিন্তার পর রাজকুমারী ঠিক করিলেন—বাঁশী শোনা ভাল নয়। তাই পিতার নিকট নালিশ হইল বাঁশী যেন আর না বাজে। রাজা মেয়ের কথা শুনিতেন, এবারও শুনিলেন। বাঁশী নীরব হইয়া গেল।

মিরণ ভাবিল আপদ গেছে। কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিল বড় একটা অভাব, বিরাট একটা আকাঙ্ক্ষা প্রাণের ভিতর জড়িত রহিয়াছে। বাঁশীর সুরেই সে অভাব যেন মিটিবে, সে আকাঙ্ক্ষা যেন পূরিবে। বাঁশী আর বাজে না—ঘুমও আর আসে না—মানসপটে রঙ্গিন স্বপ্নও আর ভাসিয়া উঠে না। মিরণ দেখিল বড় মুস্কিল।

মিরণ মাতার আঁচল ধরিয়া ঈষদ্ রাঙা মুখখানা কিছু নমিত করিয়া বলিল—"মা! বাঁশী আর কেন বাজে না?" মা মেয়ের অভাব বুঝিলেন। বংশী বাদকের ডাক পড়িল। তার বাঁশীর আজ পরীক্ষা হইবে।

এক পূর্ণাবয়ব গৌরকান্তি যুবক বংশী হস্তে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূজার অর্ঘ্য যেন তা'র যোগান ছিল। পূজিতে পাইলেই যেন তাহা সার্থক। তাই পূজার সুযোগে সে আজ আনন্দিত।

পুরশ্চারিণী নারীবৃন্দ দ্বারা চতুষ্পার্শে বেষ্টিত হইয়া মা'র সহিত মিরণ একই সিংহাসনে উপবেশন করিলে যুবক ধীরে একটী নিম্ন আসন অধিকার করিয়া সকলকে সলাজ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। সে দৃষ্টি যখন মিরণের উপর আসিয়া স্থির হইল তখনি যুবকের চোখের পাতা মুদিয়া গেল। বাঁশীও অমনি বাজিয়া উঠিল।

বাঁশী আজ বড় জীবন্ত। স্বর্গের সুর যেন সে ধরিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিল। বিশ্ব জগতের করুণ গীতি যেন সেই সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বাঁশী যেন প্রাণে প্রাণে কথা কয়। মিরণ তাই বাঁশীর সুরে আপন হারা হইল। [illegible] সকলে স্তম্ভিত ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ডুবিয়া গেল।

রাজা রাজকার্য্য ফেলিয়া অন্তঃপুরে ছুটিয়া আসিলেন। রুদ্ধ বাঁশী আবার বাজে কেন! শাসনের সীমা লঙ্ঘনের সাহস এতদূর! বাঁশী আপন সুরেই বাজিতে লাগিল, রাজার আগমন জানিলও না, কাণেও তুলিল না। রাজা সে দৃশ্যে মোহিত আর বাঁশীর সুরে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাই শূন্য আসন অধিকার করিয়া আপনা ভুলিয়া রাজা বাঁশীর সুরে মিশিয়া গেলেন।

রাজভৃত্য কতবার ফিরিয়া গেল, বাঁশীর সাধনা ভাঙ্গিতে সাহস করিল না। যে যেমন ছিল তেমনই রহিল। সহসা গভীর গর্জ্জনে ডুমাল কোট কাঁপিয়া উঠিল। বাঁশীর তান ভাঙ্গিয়া গেল। যুবক চক্ষু মেলিয়া দেখিল দৌবারিকের ছুটাছুটি। ডুমালকোট শত্রু দ্বারা আক্রান্ত। যুবক বাঁশী ফেলিয়া অসি লইয়া ছুটিল। মিরণ সযত্নে বাঁশীটী তুলিয়া লইল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। যুবকের বীরত্বে ডুমাল কোট আজ মুখরিত। রাজকুমারী বড় আনন্দিত। এ ভীষণ যুদ্ধেও বাঁশীর কোনও বিরাম নাই। সময় মত সকাল সাঁঝে তাহা আপন সুরে বাজিয়া উঠে।

শত্রু বড় প্রবল, ব্যক্তিগত বীরত্বে আর কি হইবে! ডুমাল কোট আজ যায় যায়। কিন্তু শত্রুর বড় দয়া; তাই সে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। রাজা আনন্দ ফিরিয়া পাইল। সন্ধির ফলে শত্রু মিত্র হইয়া পড়িল। মিরণের সহিত তাহার পরিণয় হইবে নতুবা ডুমালকোট আর থাকিবে না।

বাঁশী আর বাজিল না। যুবক ধীরে ধীরে শুষ্ক বয়ানে মিরণের নিকট হইতে বাঁশী চাহিয়া লইল। মিরণ সিক্ত আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাঁশী প্রত্যর্পণ করিল। পা আর উঠে না, তবুও যাইতে হইবে। সহসা বন্যার ন্যায় শক্তি আসিল যুবক দূরে ছুটিয়া গেল। মিরণ কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যা গ্রহণ করিল।

রাজপুরী আজ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত কারণ মিরণের আজ বিবাহ। কিন্তু যাহার জন্য সব তাহার মুখ খানা আজ বড়ই শুষ্ক ও বিষণ্ণ। চোখের কোণের জল মুছিলেও যায় না। মনের মাঝে কিসের সুর যেন বাজিয়া উঠে। নয়নের যেন তাহার সহিত বড়ই সহানুভূতি। এক দিকে পিতা অপর দিকে চিন্তা—মিরণ কিছুই ভাবিয়া ঠিক পায় না। সে যেন এক অসীম অকূলে ভাসমান।

মিরণ আজ যুক্ত করে ভগবানকে ডাকিতে বসিল। বালিকার সে মর্ম্মকথা তিনি কি শুনিবেন? মিরণের [illegible]

গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। তবুও ভগবানের করুণা বর্ষিত হইল না—পরিত্রাণের কোনও উপায় হইল না। হায় তিনি কি নিষ্ঠুর!

"অমঙ্গল তাঁহারি দান"—এই ভাবিয়া মিরণ তাহার প্রর্থনা শেষ করিল। আর অমনি সখিগণ আসিয়া তাহাকে সকলের সাক্ষাতে শত্রুরাজ কিরণ সিংহের সহিত পরিণয় সূত্রে বাঁধিয়া দিল। মিরণ দেখিল শুধু হাতখানা বাঁধা পড়িল প্রাণ যেন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড় কঠিন।

বিবাহের পর কিরণ সিং মিরণকে লইয়া দেশে চলিল। মিরণ মায়ের গলা ধরিয়া কত কাঁদিল! মাতা অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তারও যে দুঃখের সীমা নাই—চোখের জল মিথ্যা প্রবোধ মানিবে কেন? পিতা আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। মিরণ পিতার চরণ স্পর্শ করিল। ক্ষত্রিয়রাজ বিগলিত নয়নে কন্যাকে উঠাইয়া বক্ষে লইলেন। তাহার আদরের দুলালী দূরে সরিয়া পরিবে—এযে বড় অসহ্য। রাজা বক্ষের ধন রাণীর ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্নেহের ভগ্নপঞ্জরগুলি নিরীক্ষণ করিতে অবসর গ্রহণ করিল।

মিরণ আপনার অন্তরের তীব্র দুঃখটুকু আরও চাপিয়া ধরিল। সে দুঃখের আভাস বাহিরের কাহাকেও জানিতে দিল না। তাহার জন্য সাধের ভুমাল কোট দুঃখ পাইবে কেন? সংসারের জ্বালা জুড়াইবার জন্যইত রমণীর সৃষ্টি, দুঃখ বৃদ্ধি করিবার জন্যত নয়। তাই রুদ্ধ-ঝটিকা বক্ষে চাপিয়া মিরণ কিরণ সিংহের সহিত যাত্রা করিল।

স্বামীর দেশ অনেক দূর। কত পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইতে হয়। কত ভয়! কত ভাবনা তবে সঙ্গে অগণিত সৈন্য তাই এত সাহস।

পাহাড়ের গায় এক ক্ষুদ্র ঝরণা মধুর রবে আকাঙ্ক্ষিতের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার এক পার্শ্বে একটা পাথরের উপর বসিয়া একটী যুবক বংশী বাদন করিতেছে। চক্ষু দু'টী তার মুদ্রিত। তাহার পশ্চাতে একটা সুন্দর বর্ম্ম একখানা অসি, একটা সুদীর্ঘ বর্শা, ও একটা রাজকীয় পরিচ্ছদ। কিরণ সিংহ মিরণকে লইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সৈন্যগণ গতি সংযত করিতে আদিষ্ট হইল।

মিরণ বাঁশীর সুরে যুবককে অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই চিনিয়াছিল। তাই তাহার দোলাটী আসিবার পূর্ব্বেই মুখ বাহির করিয়া দেখিল সেই বটে। কিরণ সিং যুদ্ধে যুবকের বিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই তাহার তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। তাই সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটা শিলা খণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধবৎ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। সহসা নিকটবর্ত্তী অস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সে ক্ষণেকের তরে শিহরিয়া উঠিল। তখন বাঁশীর সুর ধীরে ধীরে প্রকৃতির নীরব গীতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গেল। যুবক চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিল, সেই শত্রু। শেষ প্রতিশোধ লইতে হইবে—বুকের জ্বালায় রক্তের আহুতি পড়ুক—এই ভাবিয়া যুবক অস্ত্র গ্রহণের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। এমন সময় কিরণ সিং ছুটিয়া আসিয়া যুবকের করধারণপূর্ব্বক বলিল—"সখা! আমাকে চিন্‌তে পার নি! আমি যে তোমার বাল্য-বন্ধু কিরণ।" "অাঁ! তুমি কিরণ! তোমার সহিত যুদ্ধ করেছি! তুমিই আমার বুকের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়াছ! তোমার জন্য আমি সব হারিয়েছি! যুবক শিহরণ কম্পনের মধ্যে এই কথা কয়টী বলিয়া অধোবদনে রহিল। কিরণ সিং অপরাধীর ন্যায় বন্ধুর নিকট লজ্জায় অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় সহসা কি যেন পড়িয়া গেল। যুবক ও কিরণ চক্ষু উঠাইয়া দেখিল মীরণ এক শিলা খণ্ডের উপর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। যুবক ছুটিয়া গিয়া মিরণকে ভাল করিয়া শয়ন করাইল। কিরণ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

তখনও মিরণের চেতনা লুপ্ত হয় নাই সে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "ভয় নাই—আমি মরছি, বিষ খেয়েছি। বাঁচাতে পারবে না।" কিরণ তখনই বলিয়া উঠিল—"কেন মিরণ! বিষ খেলে কেন? মিরণ বলিল, "চুপ কর! আর কিছু বলিও না—শান্তিতে মরতে দাও। সব চুরমার করেছ—আবার জিজ্ঞাসা করছ বিষ খেলে কেন? আমাদের কি এমন একটা মন নাই যাহা রাজনৈতিক যুদ্ধ বিসম্বাদাদির বাহিরে দুটী প্রাণের কথা নিয়ে থাকতে পারে! তা' ছিল। তুমি সেই কথা কয়টী যুদ্ধে বলি দিয়েছ। কি করব? তাই বিষ খেয়েছি। নইলে আজ—" মিরণ আর বলিতে পারিল না। তার শেষ নিশ্বাসটুকু তখনই বাহির হইয়া গেল। যুবকের অশ্রুধারা মিরণের নিস্পন্দ মুখখানা সিক্ত করিয়া ফেলিল।

কিরণ নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে সেই দৃশ্য মুগ্ধচিত্তে দর্শন করিতেছিল। সে যোদ্ধা আর কত অপেক্ষা করিবে। তাই ডাকিল, "সখা?"

যুবক তাহার রক্তবর্ণ জলভরা আনত চক্ষু দুটী উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল—"সখা! কিরণ! আমার এই প্রথম এবং শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। তুমি দেশে যাও। আশীর্ব্বাদ করি সুখে রাজ্য শাসন কর। আমাকে আর এখানে কোন কথা বলিও না। আমি আর দেশে যাব না।

কিরণ আর কি করিবে! বন্ধুকে রাখিয়া দুঃখ বিজড়িত মিরণের স্মৃতিটুকু লইয়া সে দেশে চলিয়া গেল। আর যুবক সেই মৃত দেহটী বুকে করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। মিরণ যে তাহারই।

সাঁঝের আলো যখন নিভিয়া যাইতে সুরু করিল, বিহঙ্গ কলতানে যখন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল তখন

যুবক বাঁশীটী মুখে লইয়া তাহার সাধনার শেষ আহুতি প্রদান করিল। হায়! মিলন আজ কত নিষ্ঠুর! সে ঘুমের ঘোরে অচেতন রহিল—ভক্তের সঙ্গিতোপহার লইতে নিমেষের জন্যও জাগিয়া উঠিল না।

তার পর অন্ধকারের গাঢ় আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে দুটী দেহ এক সঙ্গে গড়াইতে গড়াইতে ঝরণা স্রোতে পড়িয়া বিশ্ব সঙ্গীতে মিশিয়া গেল তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও রহিল না। কিন্তু বাঁশীর সুরের মৃত্যু নাই, বিরাম নাই। তাই এখনও সে সুর ঝরণা স্রোতে গাহিয়া যায়, "বিচ্ছেদ আছে, মিলন আছে—ভয় কিসের?"

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

রঙ্গ কৌতুক

(১)

"দেখ হরি, তুমি এইখানে থাক। যে কেউ পূজার দালানে যেতে চাবে, আগে জুতো খুলিয়ে নিয়ে তবে যেতে দেবে। বুঝলে?"

"যে আজ্ঞে।"

সার্ব্বভোম মহাশয় কিছু ফলমূল ও কয়েকটি ফুলবিল্বপত্র লইয়া পূজা দিবার মানসে ঠাকুরদালানে উঠিতেছিলেন। এমন সময় হরি তাঁহার পায়ের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর মশাই, আপনার জুতো?"

"বলিস্ কি হরি! মায়ের পূজো এনেছি, জুতো পায়ে কি আস্তে পারি?"

হরি প্রমাদ গণিল। মনিবের আদেশ অমান্যই বা করে কেমন করিয়া? বলিল, "ঠাকুর মশাই, আপনি বড়ই মুস্কিলে ফেল্লেন যে। কর্ত্তার কড়া হুকুম, 'আগে জুতো খুলিয়ে নিয়ে তবে যেতে দিতে হবে।' তা আপনার পায়ে জুতোই নেই, খুলিয়ে নেব কি ক'রে? আর না নিয়েই বা মন্দিরে যেতে দিই কি করে—কর্ত্তার হুকুম—"

(২)

বিজয়া দশমীর দিন বৃদ্ধ পুরোহিত সকলকে শান্তির জল দিতেছিলেন এমন সময় পাড়ার ব্রজহরি এক বৎসরের এক পুত্রসন্তান কোলে করিয়া আসিয়া পুরোহিত মহাশয়ের উদ্দেশে বলিল "হতভাগা ছেলেটা সারারাত চোখে পাতা এক করতে দেয় না। কেঁদে কেঁদে এমনি অশান্তিই ক'রে তোলে! ভট্টাচাজ্জি মশাই এটাকে একটু বেশী ক'রে শান্তির জল দিয়ে দিনতো।"

(৩)

যতীশবাবুর বাড়ী কড়া নাড়িলেই দরজা খোলা পাওয়া যাইত। পাড়ার বদমায়েস ছেলেরা তামাসা দেখিবার নিমিত্ত কড়া নাড়িয়াই পলাইয়া যাইত। শীতকাল। যতীশবাবু বিরক্ত হইয়া একদিন ছেলেকে বলিলেন,—"দেখ, এইবার যেই ব্যাটারা কড়া নাড়্বে, অমনি দোর খুলেই গায়ে জল ঢেলে দিবি।" পর দিন যেই কড়া নাড়া অমনি ছেলেও একবালতি জল ঢালিয়া দিয়া :পলায়ন। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন যতীশবাবু উপরের বারান্দাতেই ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বাল্যবন্ধু বিনোদের অভ্যর্থনা করিলেন। বিনোদ জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—"শীতকালে পাদ্যঅর্ঘ্যটা দিলে ভাল।"

(৪)

পরাণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া একে একে সকলের বক্তব্য শুনিতেছিলেন। হরির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তুমি এ সম্বন্ধে কি জানহে ছোক্‌রা?"

"আজ্ঞে, গোবিন্দ পরেশবাবুকে বিশ্রী গালাগালি দিয়েছিলো।"

"তুমি দেখেছিলে?"

"আজ্ঞে না। আমি তখন পুকুরে স্নান করছিলুম, তবে তার গলার আওয়াজটা আমার কাণে গিয়েছিল।"

"কেবল কাণে শুনেছ। চোখে দেখনি? যাও হে ছোকরা যাও, আমরা শোনা কথা বিশ্বাস করি না।"

অপমানিত হরি বৈঠকখানা ঘরের বাহিরে পা দিয়াই চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরাণবাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে অভদ্রের মত হাস্‌ছিলে যে?"

"কেউ হাসতে দেখেছেন?"

"দেখ্‌তে হবে কেন? এরা সকলেই ত শুনেছেন।"

"শুনেছেন!" পরে জোড়হাতে বিনয়ের ভাণ করিয়া কহিল,—"আজ্ঞে, শোনা কথা বিশ্বাস করা যায় কি?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক ও প্রবন্ধের বিষয়

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

(২) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

(৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডল।

(৪) রামগোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

(৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

পুরস্কার

(৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তা প্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩১৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

চন্দননগর পুস্তকাগার

৪টি সাহিত্যিক পুরস্কার।

১। তিনকড়ি স্মৃতি পদক (সুবর্ণ) পুস্তকাগারের সুযোগ্য কোষাধ্যক্ষ, কর্ম্মবীর ৺তিনকড়িনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় পত্নী শ্রীমতী সুকেশিনী বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

বিষয়—(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা।

(খ) মাইকেলের মেঘনাদ বধের ৩য় স্বর্গ।

২। নৃত্যগোপাল স্মৃতি পদক (সুবর্ণ); বিষয়—গার্হস্থ্য-জীবনে হিন্দুরমণীর শিক্ষার উপকারিতা, হিন্দুরমণীর উপযোগী শিক্ষা কি এবং বাঙ্গালীবহুল ক্ষুদ্র সহরে উক্তরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তনের উপায় কি?

৩। শ্রীযুত ভূষণ পাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত রৌপ্যপদক। বিষয়—আমাদের আত্মোন্নতির উপায় কি?

৪। নৃত্যগোপাল পারিতোষিক অন্যূন ১২৲ টাকা মূল্যের পুস্তক অথবা যিনি পুরস্কার পাইবেন তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে রৌপ্যপদক।

বিষয়—কৃত্তিবাসের রামায়ণ—আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড।

যে কেহ (পুরুষ বা মহিলা) ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত ২য় ও ৩য় পুরস্কারের কোন একটি বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বৈশাখ মাসের মধ্যে পুস্তকাগারে সম্পাদকের নিকট পৌছান আবশ্যক। প্রবন্ধের কলেবর ফুলস্কেপ কাগজের ২৫ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। কোন প্রবন্ধই ফেরৎ পাঠান হইবে না এবং ইচ্ছা করিলে কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। প্রবন্ধ পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত না হইলে পুরস্কার দেওয়া না হইতে পারে।

১ম ও ৪র্থ দফা পুরস্কারের জন্য পরীক্ষার্থী চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর বা চুঁচুড়াবাসী হইবেন। ১ম শ্রেণী ফার্ষ্ট ক্লাস ও তন্নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রেরাই ৪র্থ দফা পুরস্কারের জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে। পরীক্ষা জুনমাসের প্রথমেই চন্দননগর পুস্তকাগার গৃহে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীগণ ২০শে মে (১৯১৬) তারিখের পূর্ব্বে নাম, ধাম ইত্যাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।